নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

অষ্টাদশ খণ্ড—১৩০৭।

কলিকাতা,
১৫৩ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-প্রেসে, শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত,
২১০।৪নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

All rights reserved

TRACING LAMINATED.

POOR CONTRAST.

বিষয়। পৃষ্ঠা।

৪৬। বীরপূজা। (শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম-এ) ৩৭
৪৭। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্ম। (শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম-এ) ... ৩১৩
৪৮। বেঙ্গল গেজেট। (শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি) ১৩১
৪৯। বেঙ্গল গেজেট ও সমাচার দর্পণ। (ঐ) ৬২৬
৫০। বেদান্ত দর্শন ও অদ্বৈতবাদ। (শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম-এ, বি-এল) ৯, ৮৩, ১৮৭
৫১। ব্রহ্ম ও জগৎ। (শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম-এ) ৯১, ২১৬, ২৬৭, ৫৮০, ৬৪০
৫২। ব্রাহ্মণ ও জাতিভেদ। (শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু) ২৫২
৫৩। ভারত মাতার আক্ষেপ। (পদ্য) (শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার, বি-এ) ... ৫৬৮
৫৪। ভারতের স্বাধীন রাজগণের স্বাধীনতা। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, Bar-at-L. সং ৩২৩
৫৫। মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম। (শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী) ৫১
৫৬। মলিনা। (পদ্য) (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী) ৬৪৭
৫৭। মানুষ ও সমাজ। (শ্রীরাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস, বি-এ) ২৭২
৫৮। যুগান্তরে। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ) ৬৫৮
৫৯। রাজতরঙ্গিণী। (৺ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল) ... ৮৮
৬০। রাজা রামমোহন রায়। (শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি) ১৮
৬১। রাজা শশিশেখরেশ্বর বাহাদুর ও রাজকুমার কলেজ। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম-এ, বি-এল) ৯৯
৬২। রাজা সুবোধ নারায়ণ। (শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী) ৩৫৮
৬৩। রাবণের ধর্ম্ম দীক্ষা। (শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস, C. I. E.) ১৪৬
৬৪। রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার। (৺ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল) ... ১৮০
৬৫। শিক্ষিত শ্রেণীর বর্ত্তমান অভাব। (শ্রীমন্মথনাথ বসু) ৫৭১
৬৬। শোকগাথা। (পদ্য) (শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী) ৫৩৪
৬৭। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। (সমালোচনা) (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম-এ) ... ৪৩০
৬৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। (শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম-এ, বি-এল) ... ১১০
৬৯। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। (শ্রীম-কথিত) ... ২৭, ২৯৫, ৩৪০, ৪২৩, ৫৫৮, ৬২৩
৭০। সত্য এবং সাহিত্য। (সম্পাদক) ৩০৫
৭১। সত্যলাভ। (পদ্য) (শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী) ৭
৭২। সমন্বয় ভাষ্যের সমালোচনা। (শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম-এ) ৩৮৪, ৪০৯, ৪৩৬
৭৩। সমস্যা-কল্পলতা। (সমালোচনা) (শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ, এম-এ) ... ৬৪৫
৭৪। সংবাদপত্র ও থিয়েটর। (শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত) ৬১৮
৭৫। সংশয় ও বিশ্বাস। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ২৭৮
৭৬। সাবিত্রী তত্ত্ব সমালোচনা। (শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম-এ) ... ৩০৯
৭৭। ঐ (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ) ... ৩৬৩
৭৮। সাবিত্রীতত্ত্ব সমালোচনা সম্বন্ধে ক্ষীরোদ বাবুর নিকট চন্দ্রনাথ বাবুর পত্র। ৪৯৪
৭৯। সাবিত্রী তত্ত্ব ও ক্ষীরোদ বাবু। (শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি-এ) ... ৪৯৮
৮০। সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব। (শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত) ৫৭
৮১। সুলভ সাহিত্য। (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি,এল) ...
৮২। সাহিত্য সম্বাদ। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম-এ) ১৪৩
৮৩। সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র। (শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়) ৩৯১, ৪৪৯
৮৪। স্মরণার্থ। (পদ্য) (আনন্দচন্দ্র মিত্র) ৩৮২
৮৫। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। (শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীমধুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা, শ্রীপ্রেমানন্দ, ৺ পঙ্কজিনী বসু, শ্রীপ্রিয়বালা রায়, শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার, বি-এ, শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, বি-এল, শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, শ্রীঅন্নদাসুন্দরী ঘোষ, শ্রীদ্বিজরচন্দ্র মজুমদার, বি-এল, শ্রীশশধর রায়, এম-এ, বি-এল, শ্রীহেমন্তকুমারী সেন গুপ্তা, শ্রীনগেন্দ্রবালা দাসী, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী, ২২১, ৩০৩, ৩৮৮, ৪৪১, ৬১৪, ৬৩৩

TRACING LAMINATED.

POOR CONTRAST.

অষ্টাদশ খণ্ড নব্যভারতের সূচী পত্র।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	অধিকারী ও অনধিকারী। (পরমহংস শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ স্বামী) ...	৫০৬
২।	অনন্ত সংগ্রাম। (সম্পাদক)	১
৩।	অন্তঃশয্যায়। (পদ্য) (শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী)	১৬৩
৪।	অযাচিতা। (শ্রীমনোরঞ্জন গুহ)	৩২০
৫।	আমার কৈফিয়ত। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ) ...	৫০২
৬।	ইতিহাস-ঘটিত বিচার। (শ্রীবনমালী বিদ্যাভূষণ)	১৫৩
৭।	ঋগ্বেদ সংহিতা ও ব্রহ্মসঙ্গীত। (শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য) ...	২২৫
৮।	কর্ম্মফল ও করুণাবাদ। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, Bar-at-law) ...	৫৮৭
৯।	কানীনতা। (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ)	৪১২
১০।	কালনিদ্রা। (পদ্য) (শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার, বি-এ)	৪৩৩
১১।	কৃষ্ণদত্ত ও দ্বারবঙ্গের রাজবংশ। (৺ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল)	২৮৪
১২।	খ্রীষ্টীয়ান ও চীন বিভ্রাট। (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ...	২৬৩
১৩।	চেৎমীননাথ। (শ্রীমনোরঞ্জন গুহ)	১৫৭
১৪।	চৌধুরীর লড়াই। (শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি-এ) ২১৮,	৪৬৯
১৫।	জাতিভেদ হিন্দু শিক্ষাপ্রণালী। (শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু)	৪১৭
১৬।	জীবন-সায়াহ্নে। (পদ্য) (শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার বি-এ)	৮৩
১৭।	টমাস কার্লাইল। (শ্রীকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম-এ)	৬৫২
১৮।	দলাদলি। (সম্পাদক)	২০৩
১৯।	দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। (শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম-এ, বি-এল)	৬০৫
২০।	দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন। (ঐ)	৩২৯
২১।	দ্বিজত্ব। (শ্রীমধুসূদন সরকার)	১১৬
২২।	দেবদূত। (শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম-এ)	৫৬৮
২৩।	দ্বৈতাদ্বৈত চিন্তার অনুশীলন। (সম্পাদক)	৫৮২
২৪।	ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান। (শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-বি, এম-আর-সি-পি) ...	৫১৯
২৫।	নারী জাতির উচ্চ শিক্ষা। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ...	৪৫৬
২৬।	নারী বিষয়ক কর্ত্তব্য। (পরমহংস শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ স্বামী) ...	৫৯৩
২৭।	নিশা শেষে। (পদ্য) (শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী)	১০৯
২৮।	নীতির মূলতত্ত্ব কি? (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)	৩৬৭
২৯।	পীযূষধারা। (সমালোচনা) (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম-এ) ...	৬০৩
৩০।	পূজ্যপাদ ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রদত্ত উপদেশ। ৬,	১৪৮
৩১।	পূর্ণ বাবুর নূতন চিন্তা। (সমালোচনা) (শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ, এম-এ)	৫১৩
৩২।	পৌনঃপুনিক অভিনয়। (সম্পাদক)	৪৮৮
৩৩।	পৌরাণিক পূজা। (পরমহংস শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ স্বামী) ...	৪৩৫
৩৪।	প্রতিবাদ। (শ্রীগোপালনারায়ণ মজুমদার)	৬৪৮
৩৫।	প্রাচীন খ্রীষ্টীয় পূজাবিধি। (শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ) ৯৪, ১৬৪,	৩৯০
৩৬।	প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ... ১৪০, ২২৩, ৪৪৪, ৫৩৬, ৬১৫,	৬৬৫
৩৭।	প্রেম। (শ্রীহেমচন্দ্র বসু, এম-এ)	১৭০
৩৮।	বর্ণভেদ ও জাত্যন্তর পরিণাম। (শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু)	৬৯
৩৯।	বর্ণসাম্য ও ধর্ম্মসাম্য। (শ্রীমধুসূদন সরকার)	৪৮৩
৪০।	বর্ষার গাথা। (পদ্য) (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী)	২৫১
৪১।	বাঙ্গালা বর্ষমালার অসম্পূর্ণতা। (শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস গুপ্ত, এম-এ) ...	২০৮
৪২।	বারভূঞা। (শ্রীআনন্দনাথ রায়)	৬৩৩
৪৩।	বিলাতী জীবন। (শ্রীসুকুমার রায় চৌধুরী)	১২১
৪৪।	বিরুদ্ধমতের সামঞ্জস্য। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)	৫৩৭
৪৫।	বীর কি বঙ্গে অসম্ভব? (শ্রীচন্দ্রশেখর ... Bar-at-law) ...	৪৭৮

Correction TRACING LAMINATED.

POOR CONTRAST.

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
৪৬।	বীরপূজা। (শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম-এ)	৩৭
৪৭।	বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্ম। (শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম-এ) ...	৩১৩
৪৮।	বেঙ্গল গেজেট। (শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি)	১৩১
৪৯।	বেঙ্গল গেজেট ও সমাচার দর্পণ। (ঐ)	৬২৬
৫০।	বেদান্ত দর্শন ও অদ্বৈতবাদ। (শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম-এ, বি-এল) ৯, ৮৩, ১৮৭
৫১।	ব্রহ্ম ও জগৎ। (শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম-এ) ৯২, ২১৬, ২৬৭, ৫৮০, ৬৪০
৫২।	ব্রাহ্মণ ও জাতিভেদ। (শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু)	২৫২
৫৩।	ভারত মাতার আক্ষেপ। (পদ্য) (শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার, বি-এ) ...	৫৬৮
৫৪।	ভারতের স্বাধীন রাজগণের স্বাধীনতা। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, Bar-at-L, ...	৩২৩
৫৫।	মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম। (শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী)	৫১
৫৬।	মলিনা। (পদ্য) (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী)	৬৪৭
৫৭।	মানুষ ও সমাজ। (শ্রীরাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস, বি-এ)	২৭২
৫৮।	যুগান্তরে। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ)	৬৫৮
৫৯।	রাজতরঙ্গিণী। (৺ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল) ...	৮৮
৬০।	রাজা রামমোহন রায়। (শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি)	১৮
৬১।	রাজা শশিশেখরেশ্বর বাহাদুর ও রাজকুমার কলেজ। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম-এ, বি-এল)	৯৯
৬২।	রাজা সুবোধ নারায়ণ। (শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী)	৩৫৮
৬৩।	রাবণের ধর্ম্ম দীক্ষা। (শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস, C. I. E.)	১৪৬
৬৪।	রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার। (৺ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল) ...	১৮০
৬৫।	শিক্ষিত শ্রেণীর বর্ত্তমান অভাব। (শ্রীমন্মথনাথ বসু)	৫৭১
৬৬।	শোকগাথা। (পদ্য) (শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী)	৫৩৪
৬৭।	শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। (সমালোচনা) (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম-এ) ...	৪৩০
৬৮।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। (শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম-এ, বি-এল) ...	১১০
৬৯।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। (শ্রীম-কথিত) ... ২৭, ২৯৫, ৩৪০, ৪২৩, ৫৫৮, ৬২৩
৭০।	সত্য এবং সাহিত্য। (সম্পাদক)	৩০৫
৭১।	সত্যলাভ। (পদ্য) (শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী)	৭
৭২।	সমন্বয় ভাষ্যের সমালোচনা। (শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম-এ) ৩৮৪, ৪০৯, ৪৬৪
৭৩।	সমস্যা-কল্পলতা। (সমালোচনা) (শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ, এম-এ) ...	৬৪৪
৭৪।	সংবাদপত্র ও থিয়েটর। (শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত)	৬১৮
৭৫।	সংশয় ও বিশ্বাস। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)	২৭৮
৭৬।	সাবিত্রী তত্ত্ব সমালোচনা। (শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম-এ) ...	৩০৯
৭৭।	ঐ (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ) ...	৩৬৩
৭৮।	সাবিত্রীতত্ত্ব সমালোচনা সম্বন্ধে ক্ষীরোদ বাবুর নিকট চন্দ্রনাথ বাবুর পত্র।	৪৯৪
৭৯।	সাবিত্রী তত্ত্ব ও ক্ষীরোদ বাবু। (শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি-এ) ...	৪৯৮
৮০।	সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব। (শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত)	৫৭
৮১।	সুলভ সাহিত্য। (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি,এল) ...	
৮২।	সাহিত্য সম্বাদ। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম-এ)	১৪০
৮৩।	সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র। (শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়) ৩৯১, ৪৪৯
৮৪।	স্মরণার্থ। (পদ্য) (আনন্দচন্দ্র মিত্র)	৩৮২
৮৫।	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। (শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা, শ্রীপ্রেমানন্দ, ৺ পঙ্কজিনী বসু, শ্রীপ্রিয়বালা রায়, শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার, বি-এ, শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, বি-এল, শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, শ্রীঅন্নদাসুন্দরী ঘোষ, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, শ্রীশশধর রায়, এম-এ, বি-এল, শ্রীহেমন্তকুমারী সেন গুপ্তা, শ্রীনগেন্দ্রবালা দাসী, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী, ২২১, ৩০৫, ৩৮৮, ৪৪১, ৬১৪, ৬৬৩

এসো, তিনি রামলালকে অনেক করে বলেদিয়েছেন, মাকে কষ্ট দিয়ে কখন ঈশ্বরকে ডাকা হয়? একবার দেখা দিয়ে বরং চলে এসো।'

ভক্তের মজলিস্ ভাঙ্গিলে পর, মহিমাচরণ হাজরাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইলেন। মাষ্টারও আছেন।

[মাতৃসেবা ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

মহিমাচরণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সহাস্যে) মহাশয়, আপনার কাছে দরকার আছে। আপনি কেন হাজরাকে বাড়ী যেতে বলেছেন? ওর সংসারে আবার যেতে ইচ্ছা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওর মা রামলালের কাছে অনেক দুঃখ করেছে, তাই বল্লুম, তিন দিনের জন্য না হয় যাও, একবার দেখা দিয়ে এসো। মাকে কষ্ট দিয়ে কি ঈশ্বর সাধনা হয়? আমি বৃন্দাবনে রয়ে যাচ্ছিলাম, তা মাকে মনে পড়ল, ভাবলুম মা যে কাঁদবে, তখন আবার সেজো বাবুর সঙ্গে এখানে চলে এলুম।

"আর সংসারে যেতে জ্ঞানীর ভয় কি?" মহিমাচরণ (সহাস্যে)। মহাশয় জ্ঞান হলে তো হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাজরার সবই হয়েছে—একটু সংসারে মন আছে—মাগ ছেলেরা রয়েছে, কিছু টাকা ধার রয়েছে—মামীর সব অসুখ সেরে গেছে, একটু কসুর আছে——(সকলের হাস্য)।

মহিমা। কোথায় জ্ঞান হয়েছে মহাশয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিয়া)নাগো তুমি জান না। সব্বাই বলে হাজরা একটী লোক রাসমণীর ঠাকুর বাড়ীতে আছে। হাজরারই নাম করে—এখানকার নাম কেউ করে? (সকলের হাস্য)।

হাজরা। আপনি নিরুপম—আপনার উপমা নাই, তাই কেউ আপনাকে বুঝতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবেই নিরুপমের সঙ্গে কোন কাজ হয় না—তা এখানকার নাম কেউ করবে কেন?

মহিমা। মহাশয় ওকি জানে—আপনি যেরূপ উপদেশ দেবেন ও তাই করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন, তুমি ওকে বরং জিজ্ঞাসা কর, ও বলেছে 'তোমার সঙ্গে আমার লেনা দেনা নাই।'

মহিমা। ভারি তর্ককরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও মাঝে মাঝে আমায় আবার শিক্ষা দেয় (সকলের হাস্য)। তর্ক যখন করে হয় তো আমি গালাগাল দিয়ে বসলুম। তর্কের পর মশারির ভিতর গিয়ে হয় তো শুয়েছি—আবার কি বলেছি মনে করে বেরিয়ে এসে হাজরাকে প্রণাম করে যাই। তবে হয়।

[বেদান্ত ও শুদ্ধাত্মা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)। তুমি শুদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন? শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থার সাক্ষীস্বরূপ। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য ভাবি, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলি। যেমন চুমুক পাথর অনেক দূরে আছে, কিন্তু ছুঁচ নড়ছে—চুমুক পাথর চুপকরে আছে, নিষ্ক্রিয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেবক হৃদয়ে।

মহিমাচরণ ও হাজরার সহিত কথোপকথনের পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ একাকী বিচরণ করিতেছেন—সন্ধ্যা আগত প্রায়। ভক্তদের মধ্যে অনেকে বিদায় গ্রহণ করিয়া-

TRACING LAMINATED.

POOR CONTRAST.

ছিলেন। কয়েকজন ছিলেন। তাঁহারা সপ্তদিন মহাপুরুষ সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, মনে কত ভাবের উদয় হইতেছে। একজন ভাবিতেছেন—

"রামের ইচ্ছা—এটী তো বেশ কথা! এতে তো Predestination আর Free will, Liberty আর necessity এসব ঝগড়া মিটে যাচ্চে। আমায় ডাকাতে ধরে নিলে 'রামের ইচ্ছায়' আবার আমি তামাক খাচ্চি 'রামের ইচ্ছায়' আমি ডাকাতি করছি 'রামের ইচ্ছায়' আমায় পুলিশে ধরলে 'রামের ইচ্ছায়' আমি সাধু হয়েছি 'রামের ইচ্ছায়' আমি প্রার্থনা করছি 'হে প্রভু আমায় অসদ্বুদ্ধি দিওনা—আমাকে দিয়ে ডাকাতি করিও না—এও রামের ইচ্ছা। তবে সৎ ইচ্ছা, অসৎ ইচ্ছা তিনিই দিচ্চেন। তবে একটা কথা আছে, অসৎ ইচ্ছা তিনি কেন দেবেন—ডাকাতি করবার ইচ্ছা তিনি কেন দেবেন? তার উত্তর বোধ হয় এই—তিনি জানোয়ারের ভিতর যেমন বাঘ সিংহ সাপ করেছেন, গাছের ভিতর যেমন বিষ গাছও করেছেন, সেইরূপ মানুষের ভিতর চোর ডাকাতও করেছেন। কেন করেছেন, তা কে বলবে? ঈশ্বরকে কে বুঝবে?

"কিন্তু তিনি যদি সব করেছেন, তাহলে Sense of responsibility তো যায়। তা কেন যাবে? ঈশ্বরকে না জানলে, তাঁকে না দর্শন হলে 'রামের ইচ্ছা'ইটি ষোল আনা বোধই হবে না। তাঁকে লাভ না করলে এক প্রকার বোধ হবে, আবার ভুল হয়ে যাবে। যতক্ষণ না পূর্ণ বিশ্বাস হয়, ততক্ষণ পাপ পুণ্য বোধ, Sense of responsibility বোধ থাকবেই থাকবে। ঠাকুর যা বুঝালেন, রামের ইচ্ছা তোতা পাখীর মত মুখে বল্লে রামের ইচ্ছা হয় না। যতক্ষণ ঈশ্বরকে জানা না হয়, ততক্ষণ তাঁর ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা এক না হয়, যতক্ষণ না আমি যন্ত্র ঠিক বোধ হয়, ততক্ষণ তিনি পাপ পুণ্য বোধ রেখে দেন, সুখ দুঃখ বোধ রেখে দেন, শুচি অশুচি বোধ রেখে দেন, ভাল মন্দ বোধ রেখে দেন, Sense of responsibility ইত্যাদি রেখে দেন। তা না হলে তাঁর মায়ার সংসার কেমন করে চলবে?

আর একটী কথা আজকের মনে পড়েছে। ঠাকুরের ভক্তির কথা যত ভাবিতেছি, ততই অবাক্ হইতেছি। কেশব সেন হরিনাম করেন, ঈশ্বর চিন্তা করেন, অমনি তাঁকে দেখতে ছুটেছেন—অমনি কেশব আপনার লোক হলে—তখন কাপ্তেনের কথা আর শুনলেন না—তিনি বিলাত গিয়াছিলেন, সাহেবের সঙ্গে খেয়েছেন, কন্যাকে ভিন্ন জাতিতে বিবাহ দিয়েছেন, এসব কথা ভেসে গেল। "কুলচী থাই কাঁটায় আমার কি কাজ।" ভক্তি সূত্রে সাকারবাদী, নিরাকারবাদী এক হয়, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান এক হয়, চার বর্ণ এক হয়। ভক্তিরই জয়। ধন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ তোমারই জয়। তুমি সনাতন ধর্ম্মের এই বিশ্বজনীন ভাব আবার মূর্ত্তিমান্ করিলে। তাই বুঝি তোমার এ'তো আকর্ষণ! সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের তুমি পরমাত্মীয়—নির্ব্বিশেষে আলিঙ্গন করিতেছ। তোমার এক কণ্ঠী পাথর ভক্তি। তুমি কেবল দেখো অন্তরে ঈশ্বরে ভালবাসা ও ভক্তি আছে কি না। যদি তা থাকে, অমনি সে তোমার পরম আত্মীয়। হিন্দুর যদি ভক্তি দেখো, অমনি সে তোমার আত্মীয়—মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার আপনার লোক—খ্রীষ্টানের যদি যিশুর উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার পরম আত্মীয়। তুমি ব'ল যে সব নদীই ভিন্ন দিগ্দেশ হইতে আসিয়া এক সমুদ্র মধ্যে পতিত হইতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক সমুদ্র।

"ইনি এই জগৎ স্বপ্নবৎ বলছেন না। বলেন তা'হলে ওজনে কম পড়ে। মায়াবাদী নয়—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কেন না জীবজগৎ অলীক বলছেন না, মনের ভুল বলছেন না। ঈশ্বর সত্য আবার মানুষ সত্য, জগৎ সত্য। জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম।

"শুনিলাম, এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড মহা চিদাকাশে আবির্ভূত হইতেছে, আবার কালে লয় হইতেছে—মহাসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে, আবার কালে লয় হইতেছে। আনন্দসিন্ধুনীরে অনন্তলীলালহরী! এ লীলার আদি কোথায়, অন্ত কোথায়! তাহা মুখে বলিবার যো নাই—মনে চিন্তা করিবার যো নাই! মানুষ কতটুকু—তার বুদ্ধিই বা কতটুকু। শুনিলাম, মহাপুরুষরা সমাধিস্থ হয়ে সেই নিত্য পুরুষপুরুষকে দর্শন করেছেন—নিত্যলীলাময় হরিকে সাক্ষাৎকার করেছেন। অবশ্য করেছেন, কেন না ঠাকুর রামকৃষ্ণও বলিতেছেন—তবে এ চর্ম্মচক্ষে নয়—বোধ হয় দিব্য চক্ষু যাহাকে বলে, তাহার দ্বারা। যে চক্ষু পাইয়া অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন। যে চক্ষুর দ্বারা ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। যে দিব্য চক্ষুর দ্বারা ঈশা তাঁহার স্বর্গীয় পিতাকে অহরহ দর্শন করিতেন। সে চক্ষু কিসে হয়? ঠাকুরের মুখে শুনিলাম, ব্যাকুলতার দ্বারা হয়। এখন সে ব্যাকুলতা হয় কেমন করে? সংসার কি ত্যাগ করতে হবে? কৈ তাও তো আজ বল্লেন না?"

* * * *

সন্ধ্যা আগত প্রায়। ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মাষ্টার একাকী বসিয়া আছেন ও কি চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর হঠাৎ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "গোটা দুএক মার্কিনের জামা দিও, সকলের জামা তো পরি না—কাপ্তেনকে বোল্‌বো মনে করেছিলাম, তা তুমিই দিও।" মাষ্টার দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন, 'যে আজ্ঞা।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা-সঙ্গীত ও ঈশান সংবাদ।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে ধুনা দেওয়া হইল। তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিয়া, বীজমন্ত্র জপিয়া, নামগান করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে অপূর্ব্ব শোভা। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি। বিমল চন্দ্রকিরণে এক দিকে ঠাকুরবাড়ী ভাসিতেছে, আর একদিকে ভাগীরথীবক্ষ সুপ্ত শিশুর ন্যায় ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে। জোয়ারপূর্ণ হইয়া আসিল। আরতির শব্দ গঙ্গার স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রবাহ-সমুদ্ভূত কল কল নাদ সঙ্গে মিলিত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছিল। ঠাকুরবাড়ীতে এককালে তিন মন্দিরে আরতি—কালীমন্দিরে, বিষ্ণুমন্দিরে ও শিবমন্দিরে। দ্বাদশশিবমন্দিরে—এক একটী করিয়া শিবলিঙ্গের আরতি। পুরোহিত শিবের এক ঘর হইতে আর এক ঘরে যাইতেছেন—বামহস্তে ঘণ্টা, দক্ষিণ হস্তে পঞ্চ প্রদীপ। সঙ্গে পরিচারক—তাহার হস্তে কাঁসর। আরতি হইতেছে—তৎসঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর

দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে রোসনচৌকির সুমধুর নিনাদ শুনা যাইতেছে। সেখানে নহবৎখানা সন্ধ্যাকালীন রাগরাগিণী বাজিতেছে। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব—যেন জীবকে স্মরণ করিয়া দিতেছে, 'কেহ নিরানন্দ হইওনা—ঐহিকের সুখ দুঃখ আছেই—থাকে থাকুক—জগদম্বা আছেন—আমাদের মা আছেন—আনন্দ কর। দাসীপুত্র ভাল খেতে পায় না, ভাল পরতে পায় না, বাড়ী নাই, ঘর নাই—তবু বুকে জোর আছে, তার যে মা আছে। মার কোলে নির্ভয়। পাতানো মা নয়, সত্য করে মা। আমি কে, কোথা থেকে এলুম, আমার কি হবে, আমি কোথায় যাব, সব মা জানেন! কে অত ভাবে! আমার মা জানেন। আমার মা, যিনি দেহ মন প্রাণ আত্মা দিয়ে আমায় গড়েছেন। আমি জান্‌তেও চাই না। যদি জানবার দরকার হয়, তিনি জানিয়ে দেবেন। অত কে ভাবে! মায়ের ছেলেরা সব আনন্দ কর।'

বাহিরে কৌমুদী-প্লাবিত জগৎ হাসিতেছে—কক্ষমধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ হরিপ্রেমানন্দে বসিয়া আছেন। ঈশান কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, আবার ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে। ঈশানের ভারি বিশ্বাস। বলেন যে, একবার যিনি দুর্গা নাম করে বাড়ী থেকে যাত্রা করেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শূলপাণি শূল হস্তে যান, আর বিপদে ভয় কি? শিব নিজে রক্ষা কর্‌বেন।

[বিশ্বাস ও ঈশ্বর লাভ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। তোমার খুব বিশ্বাস—আমাবের কিন্তু অতো নাই। বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়।

[কর্ম্মযোগ ও ঈশান।]

"তুমি জপ, আহ্নিক, উপবাস, পুরশ্চারণ এই সব কর্ম্ম কর'ছ। তা বেশ। যার আন্তরিক ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তাকে দিয়ে তিনি এই সব কর্ম্ম বরিয়ে লন।

"ফলকামনা না করে এই সব কর্ম্ম করে যেতে পার্‌লে নিশ্চিত তাঁকে লাভ হয়।

[বৈধীভক্তি ও রাগভক্তি; কর্ম্মত্যাগ কখন?]

"শাস্ত্রে অনেক কর্ম্ম কর্‌তে বলে গেছে। তাই কর্‌ছি, এরূপ ভক্তিকে বৈধীভক্তি বলে। আর এক আছে রাগভক্তি। সেটী অনুরাগ থেকে হয়। ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে হয়। যেমন প্রহ্লাদের। সে ভক্তি যদি আসে, তাহলে আর বৈধী কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না।

"গ্রীষ্ম বোধ হলে ঠাণ্ডা হবার জন্য কোথা পাখা জোগাড় কর্‌তে হয়? কিন্তু দক্ষিণে হাওয়া যদি আপনি বইতে থাকে, তাহলে পাখা ফেলে দেয়। রাগভক্তি এলে আর শাস্ত্রের নানা কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না।

"যদি ঈশ্বরের নামে পুলক আর অশ্রু পড়ে, তাহলে আর সন্ধ্যাদি কর্ম্মের দরকার নাই।

এইরূপ অনেক ঈশ্বরীয় কথা হইতে হইতে রাত্রি হইল। ঈশান বিদায় গ্রহণের সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মাষ্টারও প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। অতো নমস্কার কেন গো?

ঈশান (শ্রীম'র প্রতি)। ম—বাবু কি আমাদের সঙ্গে যাবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) হাঁ, এক সঙ্গেই সব এসো।

বীরপূজা।

কর্ম্মবীর মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্ম-সৌরজগতের সূর্য্য রাজা রামমোহন রায়, পৃথিবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং চন্দ্র কেশবচন্দ্র সেন। যেমন সূর্য্য আমাদিগের সৌরজগতের প্রসবিতা, সেইরূপ রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের স্রষ্টা বা প্রসবিতা। সূর্য্যমণ্ডল হইতে তেজোরাশি বিনির্গত হইয়া যেমন গ্রহ উপগ্রহাদির সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ সেই মহাপুরুষের অধ্যাত্ম তেজের অনুক্রমণে ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতে এই নব সূর্য্যের আবির্ভাবে এক নব যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। সে সূর্য্যমণ্ডল এক্ষণে ভূলোক ছাড়িয়া দ্যুলোকে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়া অযোগী ব্যক্তি স্থূল চক্ষুতে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না বটে, কিন্তু যোগিগণ যোগচক্ষুতে তাঁহার অধিকতর স্ফুরিত দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেছেন। ভূলোকের ব্রহ্মলীলা—দ্যুলোকের ব্রহ্মলীলার প্রতিবিম্ব মাত্র—সুতরাং ছায়াবহুল ও ক্ষণস্থায়ী। দ্যুলোকে ব্রহ্মের যেরূপ লীলা হইবে—ভূলোকে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িবেই পড়িবে। কিন্তু ছায়ালীলা—বা ছায়াবাজি—ক্ষণকালের জন্য মাত্র লোক-লোচনকে মায়ামুগ্ধ করিয়া দ্যুলোকস্থ—কূটস্থ—স্বাধারে বিলীন হইয়া যাইবে। তথায় উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে বহুকাল বিরাজমান থাকিয়া সেই ব্রহ্মজ্যোতিঃ কলা—অব্যক্ত ব্রহ্মবিন্দুতে লয়প্রাপ্ত হইবে। এ ধরিত্রী যেমন সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিক্ষিপ্ত তেজোরাশির সমষ্টি মাত্র—সেইরূপ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাতেজাঃ রাজা রামমোহন রায়-বিকীরিত তেজঃপুঞ্জের আধারমাত্র। যদিও ব্রাহ্ম সমাজের আদি সূর্য্য দ্যুলোকে গমন করিয়াছেন—তথাপি তাঁহার তেজঃপুঞ্জ ঘনীভূত হইয়া মহর্ষিতে বিরাজমান রহিয়াছে। তাহাতেই ব্রাহ্মসমাজ এখনও লয় প্রাপ্ত হয় নাই। মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজকে বক্ষে ধারণ করিয়া অন্তর্নিহিত তেজে মৃদু-অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই ধরিত্রীর উভয় কেন্দ্রস্থিত দুইটী ধ্রুবতারা—রামতনু লাহিড়ী ও রাজনারায়ণ বসু ভূলোক ছাড়িয়া দ্যুলোকে গমন করিয়াছেন। ইহার একমাত্র শশী কেশবচন্দ্র সেন অমৃত জ্যোতিতে কিছুকাল ভূমণ্ডলকে স্নিগ্ধ ও আলোকিত করিয়া দ্যুলোকে গমন করিয়াছেন। ব্রাহ্ম-সৌরজগতের রবি শশী অস্তমিত এবং তারাগণও এক একটী করিয়া অস্তমিত হইতেছেন। ধরিত্রীও জরাজীর্ণ। কে বলিতে পারে যে, এই ধরিত্রীর তিরোধানে ব্রাহ্মসৌরজগৎ প্রকাণ্ড হিন্দু সৌরজগতের অন্তর্লীন হইবে না? ব্রাহ্মগণের বিপ্রকর্ষণী শক্তি সত্ত্বেও প্রকাণ্ড হিন্দু সমাজের সঙ্কর্ষণ শক্তিবলে—ক্ষুদ্র সমাজ মহাসমাজের অন্তর্লীন হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা। এই দুইটী সমাজ বহু দিন হইতে পরস্পরকে কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এক্ষণে যে যোগ্যতম, সেই বাঁচিবে—অপরটী নিশ্চয় উহার কুক্ষিগত হইবে।

রাজা রামমোহন রায়ের তিরোভাবের

পর কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় প্রতিভাশালী মহাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজে আর আবির্ভূত হন নাই। মা ব্রহ্মময়ী তাঁহাকে নেতৃত্বে পযোগী সমস্ত গুণে বিভূষিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আশৈশব গম্ভীর, দুরবগাহ, স্থিরধী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও মন্ত্রগুপ্তি-পরায়ণ ছিলেন। আত্মতৃপ্ত, আত্মপর্য্যাপ্ত ও আত্মভাবে মগ্ন—এরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজে আর জন্মিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। পরপ্রদর্শিত পথে গমন করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য না হউক—বিশেষ কষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজের রাখালগণের সহিত পূর্ণ বাল্যলীলা করিয়াও তাহাদিগকে কখন ধরা দেন নাই—কখন তাহাদিগকে বুঝিতে দেন নাই যে, তিনি ব্রহ্মের পূর্ণাবতার—সেইরূপ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার লালসহচরগণের সহিত পূর্ণ মিশিয়াও তাহাদিগকে কিছুতেই জানিতে দেন নাই যে, তিনি একজন অসাধারণ-প্রতিভাশালী মহাপুরুষ। মহাপুরুষগণ প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর পরিমাণে জাতিস্মর—অর্থাৎ তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত ও বর্ত্তমান জন্মের ব্রতের স্মৃতি তাহাদের মনে সতত জাগরূক থাকে। কোন্ কোন্ জন্মে কি কি করিয়াছিলেন—এবং এই জন্মেই বা কি করিতে আসিয়াছেন—স্বপ্নবৎ সে সকল বিষয়ে স্মৃতি তাঁহাদিগের মনে সদা ভাসমান থাকে। দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় তাঁহাদিগের মনের গতি সেই লক্ষ্যের দিকে—সেই মরণান্ত ব্রতের দিকে সদা স্থির থাকে। প্রথমে কেহ তাহা জানিতে পারে না—জানাইলেও বিশ্বাস করে না—বা বুঝিতে পারে না। ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড যে কালে বিশাল গিরিমালায়, কিম্বা ক্ষীণা রজতসূত্রপরিমিতা নির্ঝরিণী যে দিগন্তব্যাপিনী মহানদীতে পরিণত হইবে—তাহা সহজে কেহ ধারণ করিতে পারেন না। গগনের মেঘনিঃসৃত রবিকণা হইতে যে মহাসাগরের উৎপত্তি হইয়াছে—এ কথা বলিলে বক্তাকে কে না বাতুল বলিয়া পরিহাস করিবে? অথচ এই সকল কার্য্যকারণ ভাব বৈজ্ঞানিকের নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

কেশব বাবু যে সমাজের নেতা হইবেন, তাহার আভাস তাঁহার বাল্যজীবনেই পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার সহচর-বৃন্দ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত—অথচ প্রাণ দিয়া তাহার বিনিময়ে তাহারা তাঁহার প্রাণ পাইত না। তাহারা তাঁহার নিকট তাহাদিগের অন্তরের দ্বার উদ্ঘাটন করিত—কিন্তু তাঁহার অর্গলবদ্ধ হৃদয়-মন্দিরে তাহারা কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা-জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা তাঁহাকে নেতৃত্ব-পদে বরণ করিয়াছিল। তাঁহার আকর্ষণ-শক্তি অতিক্রম করিয়া যাওয়া তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইত। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত এই আকর্ষণশক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চরমা কাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

এই আকর্ষণ বা সঙ্কর্ষণ শক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য ভগবানের একটী নাম "কৃষ্ণ" হইয়াছে। এই জন্যই আমরা প্রবন্ধান্তরে কেশব বাবুকে 'কেশবাবতার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। ইহা-অপেক্ষা অধিক প্রশংসা মানুষকে করা যাইতে পারে বলিয়া আমার ধারণা ছিল না। কেশব বাবুর এই সঙ্কর্ষণ শক্তি তাঁহার

যৌবনে ও প্রৌঢ়ে অতিশয় পরিপাক-প্রাপ্ত হইয়াছিল। নরনারী তাঁহাকে দেখিলেই স্বতঃই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত। তাঁহার সুমধুর সারগর্ভ ও হৃদয়ের অন্তস্তল-স্পর্শিনী বচন পরম্পরা শুনিলে চিত্ত স্বতঃই উন্মাদিত হইত। বোধ হইত যেন তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে নিরন্তর অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে! যাঁহারা নিকটে থাকিতেন, তাঁহারা মনে করিতেন যেন অমর-কুণ্ড হইতে সুধা-ধারা বিনির্গত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিসিঞ্চিত করিতেছে। সমীপস্থ নরনারী সমভাবে ইহা অনুভব করিতেন—এই জন্য তাঁহারা তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিতে চাহিতেন না। অথবা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার তাঁহাদিগের শক্তি থাকিত না। তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতেন বা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেন। আমরাও এক দিন এই অবস্থায় পড়িয়াছিলাম—এবং তাঁহার প্রভাবে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। মানব সমাজের উপর এরূপ আধিপত্য করিতে আমি আর কোন বাঙ্গালীকে কখন দেখি নাই।

কেশব বাবুর নিকটে আবাহন বিসর্জ্জন ছিল না। তিনি কাহাকে আহ্বান করিয়াও আনিতেন না, অথচ আসিলেও কাহাকে যাইতে বলিতেন না। অথবা একবার তাঁহার নিকট আসিলে—তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলে কেহ আর তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেন না। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত তাঁহার মন্দিরে এরূপ জনতা হইত যে, দেখিলে বোধ হইত যেন কোন সমারোহ ব্যাপার উপস্থিত। কিন্তু তাহা নহে—ইহা নিত্য ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার এরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য ছিল যে, তিনি সামান্য একটু দুগ্ধ পান করিয়া সমস্ত দিন লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন—অথচ ক্লান্তি অনুভব করিতেন না। নানা লোকে নানা প্রশ্ন করিত; তিনি কাহারও উপর বিরক্ত না হইয়া সকলেরই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে পরিতৃপ্ত করিতেন। যাহার যে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইত—তিনি তর্ক ও যুক্তি দ্বারা সুমধুর ভাষায় তাহার সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিতেন। সে সময় নাস্তিকতা ও সংশয় বুদ্ধির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল। কেশব বাবু যেন সেই বিশ্বব্যাপিনী নাস্তিকতা ও সংশয়-বুদ্ধি নিরসনের জন্যই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহারা নাস্তিক বা সংশয়বাদী ছিলেন, তাঁহারা দলে দলে কেশব বাবুর শিষ্য হইতে লাগিলেন। নর নারী পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবংশীয় শিষ্যগণ বর্ণনির্ব্বিশেষে তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক তাহা অঙ্গরাগ করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। হিন্দুসমাজ যেন টলমল করিতে লাগিল। প্রত্যেক হিন্দুপরিবার হইতে দুই একটী তারা খসিয়া ব্রাহ্মসমাজক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

কেশব বাবু এই সময় আদি সমাজের উপাচার্য্য ছিলেন। আদিসমাজ বেদ উপনিষদ্ ও তন্ত্রের ভিত্তির উপর ব্রাহ্মসমাজমন্দিরকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া পরম ব্রহ্মের উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন। ইহা

তখন একটী শ্রেষ্ঠ উপাসক সম্প্রদায়মাত্র বলিয়া উদ্ঘোষিত ও পরিগৃহীত হইয়াছিল। হিন্দুসমাজের সহিত এত দিন ইহার কঠোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া উভয় সমাজে ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসাধক সম্প্রদায় তৎকালে একটী স্বতন্ত্র সমাজে পরিণত হয় নাই। ইহা তখনও হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত ছিল। বর্ণাশ্রমের বিরোধী না হওয়ায়, হিন্দুসমাজ ইহাকে নিষ্কাসিত করে নাই। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুমোদিত বর্ণাশ্রমের গণ্ডীর ভিতর অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। তিনি হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দুসমাজের অস্থিস্বরূপ বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেই—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার মতবিরোধ উপস্থিত হইল। আদিসমাজ সনাতন ধর্ম্ম ও তদাশ্রিত হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জাভূত বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন না। তাঁহারা কেবল সাকার উপাসনা বা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন মাত্র। সুতরাং বৈপ্লবিক কেশবচন্দ্র আর সে সমাজের উপাচার্য্য থাকিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে সে সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইল। এই নব ব্রাহ্মসমাজের নাম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইল। কেশবের স্বাধীন চিত্ত পরপ্রবর্ত্তিত পথে কখনই বিচরণ করিতে পারিত না। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'—'যে পথে কোন মহাজন গমন করিয়াছেন—সেই পথই প্রশস্ত পথ' কেশব বাবু মহাভারতের এই সুবর্ণময় উপদেশ বচন লঙ্ঘন করিয়া আপনার কক্ষ আপনি কাটিয়া লইলেন। ব্রাহ্মসৌরজগতের শশী নির্দ্দিষ্ট-কক্ষ-ভ্রষ্ট হইয়া নব কক্ষে ভ্রাম্যমান হওয়ার পর হইতেই ব্রাহ্ম সৌরজগতের সৌষ্ঠব নষ্ট হইল। ইহার শক্তিসাম্যও বিচলিত হইল।

প্রথমে বোধ হইল যেন ব্রাহ্ম-সৌরজগতের চন্দ্র কক্ষভ্রষ্ট হইয়া রবিকক্ষায় অনুক্রমণ করিয়াছে। যেন কেশবচন্দ্র সেন রাজা রামমোহন রায়ের শূন্য আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। পৃথ্বী-স্বরূপ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বচন্দ্র হইতে [illegible] হইয়া যেন চিরতিমিরে আচ্ছন্ন [illegible] যেন আদি সমাজকে চির-অমানিশি [illegible] আলিঙ্গন করিল। সকলেই বিষাদে [illegible] আদি সমাজ যেন যায় যায় হইয়া উঠিল।

এদিকে এই নব সূর্য্যের অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অরুণপ্রভা ধারণ করিল। অসংখ্য নর নারী এই অরুণপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিলেন। শাস্ত্র ও বর্ণাশ্রমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়—একাকারের স্রোত প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই প্রচণ্ড তরঙ্গের আঘাতে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। যাহা কিছু পুরাতন ও সনাতন—যাহা কিছু হিন্দুদের প্রাণভূত—সমস্তই এই স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, মহাপ্রলয় উপস্থিত। যিনি এ প্রচণ্ডবেগের সৃষ্টিকর্ত্তা—তিনি রুদ্ররূপী—তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

অনন্তরূপী হিন্দুসমাজ আদিব্রাহ্মসমাজকে অনন্তফণায় ধারণ করিয়া এত দিন মহা নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, অনন্ত দেব যখন ভূমণ্ডলকে এক ফণা হইতে ফণান্তরে স্থাপিত

করেন—সেই সময়েই ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু এবার তাহার বিপরীত ঘটিল। এবার আদি ব্রাহ্মসমাজরূপ ভূমণ্ডলের উৎকম্পে বাসুকীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি অনন্ত ফণাস্থিত অনন্ত লোচন বিস্ফারিত করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ ভয়ে কম্পমান হইয়া করযোড়ে অনন্ত দেবকে বলিলেন যে—'আমার এই উৎকম্পের কারণ ঐ নবোদিত সূর্য্যের বিরাট আকর্ষণ।' তখন অনন্ত দেবের রোষ-কশায়িত দৃষ্টি সেই নবোদিত সূর্য্যের ও তাহা হইতে উৎক্ষিপ্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজরূপ নব-সৌরজগতের দিকে পতিত হইল। সেই অবধি কেশব-প্রতিষ্ঠাপিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অনন্তরূপী হিন্দুসমাজের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইলেন।

অনন্তদেবের অনন্ত ফণার তর্জ্জন গর্জ্জন সত্ত্বেও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কেশবচন্দ্রের পূর্ব্ব প্রভায় ক্রমশঃ পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিলেন। ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রভাবে হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর দেব-দেবী—হিন্দুর আচার পদ্ধতি ও রীতি নীতি—এবং হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জাভূত বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে যেন সমস্ত শিক্ষিত সমাজ অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। ইহার অনুকূলে কেহ কোন কথা বলিলে তাঁহার মাথা রাখা ভার হইত। এই বৈপ্লবিক দল—শিক্ষিত নর নারী—ক্রমে ক্রমে বৈপ্লবিক নেতা কেশবচন্দ্র সেনের পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। 'ভাঙ্গ!—'ভাঙ্গ!!'—'চুরমার করিয়া ভঙ্গ!!'—চতুর্দ্দিকে এই বৈপ্লবিক রব শ্রুত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত! শ্রদ্ধাস্পদ অনরেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় স্থিরধী আর্য্য নীরবে নির্জ্জনে হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর বিশুদ্ধাচার—রক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন অধিকাংশ সুশিক্ষিত নর নারী এই প্রলয়কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। একদিকে যেমন সংস্কৃত কালেজে কোন কোন অধ্যাপক প্রকাশ্যরূপে নাস্তিকতা প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেইরূপ অন্য দিকে ব্রাহ্মগণ হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকগণ বেদিপীঠে উপবিষ্ট হইয়া পৌত্তলিকতা, বর্ণাশ্রম, বাল্যবিবাহ, অবরোধপ্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া অনন্তরূপী হিন্দুসমাজকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিলেন। সেই বিরাট সমাজ চিরলালিত তন্দ্রা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হাই তুলিতে তুলিতে মৃদঙ্গ ও করতাল লইয়া হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে হরিসভা স্থাপিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মপ্রচারকগণের আদর্শে হিন্দুপ্রচারকগণ বেদিপীঠে আসীন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মগণের উপর গালিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ঘোরতর ধর্ম্মবিদ্বেষে উভয় সমাজ কলঙ্কিত হইতে লাগিল। উভয় সমাজে বিদ্বেষভাব যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল—অন্য দেশ হইলে ইহার পরিণাম অতিশয় শোচনীয় হইত। বাক্‌যুদ্ধ ক্রমে ঘোরতর সংগ্রামে পরিণত হইত। প্রোটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে প্রোটেষ্টাণ্টগণের সহিত ক্যাথলিকগণের যেরূপ সংগ্রাম বাধিয়াছিল—ভীরু ও শান্তিপ্রিয় হিন্দু ও ব্রাহ্মে সেরূপ কোন সংগ্রাম বাধে নাই। তাঁহাদের ধর্ম্ম-সংঘর্ষ কেবল বাক্‌যুদ্ধেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

সে সময় অনেক সুশিক্ষিত যুবক পৌত্ত-

লিকতা ও বর্ণাশ্রমের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কিম্বা সুশিক্ষিতা স্ত্রী পাইবার আশায় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন। কেশবপ্রচারিত নব ধর্ম্ম সে অভাব পূরণ করায় আর কেহ খ্রীষ্টান্ হইতে যাইতেন না—পরন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা নবপ্রতিষ্ঠাপিত ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশঃই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল। ইহাতে খ্রীষ্টান্ মিসনরিগণ কেশব বাবু ও তদধিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বক্তৃতা করিয়া ও পুস্তিকাপ্রচার দ্বারা কেশব বাবু ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে সবিশেষ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কেশব বাবু তাঁহার চিত্তপ্রমাথিনী বক্তৃতা দ্বারা ও সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রচার করিয়া তাঁহাদিগের তর্কজাল খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রতিভাপ্রভাবে সুশিক্ষিত দল খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের কবল হইতে রক্ষা পাইলেন। এই বীরোচিত কার্য্যের জন্য হিন্দু ও ব্রাহ্ম—উভয় সমাজই তাঁহার নিকট সবিশেষ ঋণী আছেন। এ সময় কেশব বাবু কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে হয় ত এত দিনে খ্রীষ্টান্ হইয়া যাইতেন।

যখন পঞ্জাবে দলে দলে হিন্দুকে মুসলমান করা হইতেছিল—সেই সময় তথায় ধর্ম্মবীর গুরু নানকের আবির্ভাব হয়। নানক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের বিমল জ্যোতিতে ও তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের পবিত্রতায় উজ্জ্বল ও পূত হইয়া পঞ্চ নদ প্রদেশস্থ হিন্দুগণ যাবনিক ধর্ম্মগ্রহণে বিরত হইলেন। এই মহাপুরুষের যথা-সাময়িক আবির্ভাবে পঞ্চনদ প্রদেশ ধর্ম্মবিপ্লব হইতে রক্ষা পাইল। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে 'যখনই যখনই সনাতন ধর্ম্মের গ্লানি ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের উৎপীড়ন আরম্ভ হইবে—তখনই যুগে যুগে আমিই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা ও ধার্ম্মিকগণের উদ্ধার সাধন করিব।' এই ভগবদ্-বাক্য অব্যর্থ। নানক সেই ভগবদ্-বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার জন্যই যেন ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গুরু নানকের শিষ্য—বীর-সন্ন্যাসী গুরুগোবিন্দ সিংহ ভারতের ভবিষ্য মঙ্গলের জন্য হিন্দু যবন মিশাইয়া একটি অপূর্ব্ব রাজনৈতিক জাতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই মিলিত জাতি শিখসম্প্রদায় নামে খ্যাত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ প্রতিষ্ঠাপিত এই জাতি এক সময় ভারতীয় সমস্ত হিন্দু ও যবনকে কুক্ষিগত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। গুরুগোবিন্দ স্বয়ং ভগবতী ভবানীর নিকট নরমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া বর পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার শিষ্যগণ প্রত্যেকে তাঁহার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিবে—এবং তাহারা রণে অজেয় হইবে। এই বর পাইয়া তিনি তন্ত্রোক্ত বিধিমতে হিন্দু যবন উভয়কেই মন্ত্রশিষ্য করিতে লাগিলেন। নবধর্ম্মের নবীন উৎসাহে মাতিয়া—ও 'ভবানীর বরে তাহারা রণে অজেয়' এই বিশ্বাসে প্রোৎসাহিত হইয়া শিষ্যগণ—'সমস্ত পঞ্চনদ প্রদেশে গুরুর জয়' উদ্ঘোষিত করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে প্রচণ্ড স্রোতস্বিনীর নিকট যবন সেনা তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দিল্লীর সিংহাসন টলমল করিতে লাগিল। এই সময় ঘাতক হস্তে গুরুগোবিন্দ সিংহের মৃত্যু না হইলে শিখ সম্প্র-

দায় যে কি মহাশক্তিতে পরিণত হইত, কে বলিতে পারে?

নানক ও গুরুগোবিন্দের ন্যায় বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামমোহন ও কেশব—সকলেই ভারতের জাতীয় একতা সম্পাদনের চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় একতা ব্যতীত ভারতের গৌরব রক্ষা হইবে না—ইহা তাঁহারা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রত্যেকে বিভিন্ন বিভিন্ন উপায়ে এই মহালক্ষ্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালে এই জাতীয় একতা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে অশোকের জয়স্তম্ভ মণ্ডদ্বীপে নিখাত হইয়াছিল। পৃথিবীর সমস্ত রাজা তৎকালে অশোকের আদেশ শিরোধার্য্য করিতেন। কিন্তু সম্রাট্ অশোক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম একবারে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণগণকে ও বৌদ্ধ শ্রমণগণকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন এবং সমদৃষ্টিতে দেখিবার জন্য প্রজাবৃন্দের উপর আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দু ও যবন মিলিত না হইলে ভারতের জাতীয় জীবনের কোনও আশা নাই, এই বিশ্বাস নানকের সময় হইতে ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইতেছে। কিরূপে এই অসাধ্যসাধন সম্পন্ন হইতে পারে—এই চিন্তা সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মাত্রকেই আশ্রয় করিয়া আসিতেছে। যখন বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি হয়—তখন ভারতে যবনের আবির্ভাব হয় নাই। তখন এখানে শুদ্ধ জেতা আর্য্যজাতি ও বিজিত শূদ্র জাতি অবস্থান করিতেছিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ আর্য্যেরা বিজিত অনার্য্য বা শূদ্র জাতিকে আপনাদিগের ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। আর্য্যজাতি গুণকর্ম্ম বিভাগ বশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণে বিভক্ত হইলেন। যাঁহারা সত্ত্বগুণী ছিলেন ও নিরন্তর অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বর্ণ হইলেন। যাঁহারা রজোগুণী, তাঁহারা যুদ্ধ বিগ্রহ প্রজাপালনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ক্ষত্রিয়বর্ণ হইলেন। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞ—অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মদর্শন পাইয়াছেন বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—তিনিই ব্রাহ্মণ। আর যিনি স্বদেশীয়গণকে শত্রুর অস্ত্র-জনিত ক্ষত হইতে রক্ষা করেন—তিনিই ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় (ক্ষতাৎ ত্রায়তে চঃ সঃ ক্ষত্র)। আর যাঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে সর্ব্বত্র গতিবিধি করিয়া থাকেন—তাঁহারাই বৈশ্যবর্ণ হইলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের যৌগিক অর্থ—(১) ব্রহ্মজ্ঞ, (২) ক্ষতত্রায়ক, ও (৩) দেশব্যাপক। বিজিত বা শূদ্রজাতি সাধারণতঃ তমোগুণী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিল বলিয়া তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত করা হইল। এইরূপে হিন্দুজাতি চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইল। কিন্তু সমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুণকর্ম্মের সংমিশ্রণ হইতে লাগিল। চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত থাকায়, ক্রমে অসংখ্য শঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইতে লাগিল। এই সকল শঙ্করবর্ণ আপন আপন প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন বিভিন্ন জীবিকা অবলম্বন করিতে লাগিল। ইহাতে বিজ্ঞান ও শিল্পের ভূয়সী চর্চ্চা আরম্ভ হইল।

ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্যা মাতার অনুলোমমিলনে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হইল। এই বৈদ্যজাতি চিকিৎসা শাস্ত্রকে আপনাদিগের জাতীয় ব্যবসায় রূপে গ্রহণ করিলেন।

TORN PAGE(S).

এই বৈদ্যজাতি হইতে চিকিৎসা বিদ্যা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এই সঙ্করবর্ণ সাধারণতঃ নবশাখায় বিভক্ত হইলেন। এই সকল বর্ণের স্বরূপ ও কার্য্য নির্ণয় করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্য নহে। সুতরাং ইহার উৎপত্তির উল্লেখ মাত্র করিয়া এখানে ক্ষান্ত হইব।

গুণ কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে প্রথমে বর্ণভেদ হয়। তাহাতে পুরাকালে অমৃতময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে এই বর্ণভেদ এরূপ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহা আমাদিগের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী হইয়া পড়িয়াছে। যাহা একদিন অমৃতময় ফল প্রসব করিয়া ভারতীয় হিন্দু জাতিকে জগতের আরাধ্য করিয়া তুলিয়াছিল, সেই বর্ণভেদ এক্ষণে ভারতীয় জাতীয় উন্নতির পথে কণ্টক-স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। যদি প্রত্যেক বর্ণ আপন পিতৃ-পৈতামহিক কর্ম্মে রত থাকিয়া তাহাতে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে ভারতের এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। কিন্তু বৈদেশিক সংমিশ্রণ আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই—এই বর্ণভেদের মূল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৈদেশিক রাজার অধীনে বর্ণগত কর্ম্ম-পার্থক্য ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে এই বর্ণগত কর্ম্ম-পার্থক্য কিয়ৎ পরিমাণে ছিল—সুতরাং তখন বর্ণভেদ তত ক্লেশকর হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বকালে বর্ণগত কর্ম্ম-পার্থক্য প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিল। বীজ-নিহিত গুণপার্থক্য একবারে বিলুপ্ত হইবার নহে বলিয়াই এখনও ইহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। কিন্তু এইরূপভাবে সমাজবন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইলে—আর দুই এক শতাব্দীর মধ্যে বর্ণভেদ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের কার্য্য যজন যাজন ও অধ্যাপনা—ক্ষত্রিয় তাঁহার কার্য্য যুদ্ধ-বিগ্রহাদি কার্য্যে নিরত থাকিয়া এবং তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনে ও রাজার উৎসাহে অন্যান্য বর্ণও আপনাদিগের জাতীয় ব্যবসায়াদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজপ্রাসাদ ভোগের অভিলাষে পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। উচ্চ নীচ লঘুগুরু জ্ঞান ক্রমশঃই লোপ হইয়া যাইতেছে। এই বর্ণ-সংঘর্ষে উচ্চবর্ণের বিশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকে কোন স্থান হইতে নামান যেন সকলেরই লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য বর্ণ রাজার সহিত এ বিষয়ে যোগ দিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে না নামাইতে পারিলে বৈদেশিক রাজা তাঁহাদিগের উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। সর্ব্ববর্ণ অকপট ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন—কিন্তু রাজপুরুষগণকে সেলাম করেন। ইহা তাঁহাদিগের অসহ্য। এইজন্য রাজপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের অধিকতর আদর আরম্ভ করিয়াছেন। কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতিকে যে পরিমাণ উচ্চপদ দিতেছেন—ব্রাহ্মণগণকে সে পরিমাণে দিতেছেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা আজও সমাজপতি ও আধ্যাত্মিক নেতা রহিয়াছেন। এইজন্য ইংরাজ-রাজপুরুষগণের সহিত ব্রাহ্মণগণের ভিতরে ভিতরে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাব মহারাষ্ট্রদেশে পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্যান্য দেশে ইহা প্রধূমিত হইয়াছে মাত্র। ইংরাজ-রাজের সন্ন্যাসিগণের উপরও বিষদৃষ্টি পড়িয়াছে। পরস্পর সংঘর্ষ উৎপাদন করিয়া

রাজত্ব করা ইংরাজ রাজনীতির একটী প্রধান অঙ্গ। তাহা ভারতে পূর্ণমাত্রায় প্রকটীকৃত হইয়াছে। আমরা অল্পবুদ্ধি—সুতরাং আমরা এই কূট নীতির মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া এক্ষণে বর্ণসংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কেশব বাবুর অভিপ্রায় মহান্ হইলেও—তাঁহার প্রচার-কার্য্যের ফল অমৃতময় হয় নাই। বৈদেশিক শাসনের সময় অন্তর্বিচ্ছেদ হওয়া কোন মতেই প্রার্থনীয় নহে। বর্ণাশ্রমের উপকারিতা একবারে নাই—একথা কেহ বলিতে পারেন না। এই বর্ণাশ্রম থাকায় কোন বিজেতৃ-জাতি আজ পর্য্যন্ত হিন্দুজাতিকে কুক্ষিগত করিতে পারেন নাই।

এই বর্ণাশ্রমের মহিমায় আমরা সাতশত বৎসরের দাসত্বেও আমাদিগের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছি। মুসলমানেরা কত পুরুষপ্রদর্শন ও কত লোভ দেখাইয়াও হিন্দুজাতিকে কুক্ষিগত করিতে পারেন নাই। উচ্চবংশের দুই চারিজন ও নিম্নশ্রেণীর কতকগুলিকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে পারিয়াছিলেন মাত্র। হিন্দুর যে বর্ণাশ্রম হিন্দুজাতিকে এই সাতশত বৎসরের দাসত্বের সময় পূর্ণধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছে, সে বর্ণাশ্রমের কোনও মহিমা নাই, এ কথা কে বলিতে পারেন? এত দিনের একটী প্রকাণ্ড এবং বজ্র অপেক্ষা কঠিন অট্টালিকাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে চেষ্টা করা সমীচীন নহে। এই ঘোর বৈপ্লবিককালে আমাদিগের মস্তিষ্ককে স্নিগ্ধ রাখা অতি কঠিন বটে, কিন্তু এই মস্তিষ্কের চঞ্চলতার সময় আমাদিগের প্রাচীন সমস্ত আচার ব্যবহার, রীতি নীতি আমূল পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করা কোন মতেই উচিত নহে। ইহার ফল নিশ্চয় বিষময় হইবে।

কেশব বাবু হিন্দু শাস্ত্র ও বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হওয়ার কিছুকাল পরেই বিলাতযাত্রা করেন। তথায় তিনি যেরূপ সম্মান পাইয়াছিলেন—রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত আর কোন বাঙ্গালী তাদৃশ সম্মান পান নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাসাদে অদ্যাপি কেশব চন্দ্র সেনের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। তাঁহার খাতিরেই সম্রাজ্ঞী কেশবদুহিতা কুচবিহারের মহারাণীকে তাঁহার পার্শ্বের আসনে সমাসীন করিয়াছিলেন। কেশব বাবু যে শুদ্ধ রাজসম্মান পাইয়াছিলেন—এরূপ নহে। তিনি প্রায় সর্ব্বত্র সমান আদর পাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টানেরা তাঁহাকে আপনাদের দলের অন্যতম নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অমানুষী বক্তৃতায় বিলাতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

বিলাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের মহিমা স্বচক্ষে দেখিয়া কেশব বাবুর চিত্ত খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই বিলাতে অবস্থিতিকালেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মের আদর্শে গঠিত করার সঙ্কল্প মনে মনে পোষণ করেন। তাই বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি প্রচার করেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টীয়ান্ এক, একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন নাই বটে—কিন্তু তাঁহার যিশুখ্রীষ্ট (Jesus Christ) নামক বক্তৃতায় তিনি খ্রীষ্টকে প্রকারান্তরে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বিলাত হইতে

TORN PAGE(S).

ফিরিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদিপীঠে বসিয়া যে সকল হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দিয়াছিলেন—আমরা সে সকল বক্তৃতা স্বকর্ণে শুনিয়াছিলাম। সে সকল বক্তৃতায় ঈশ্বরের স্বরূপ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছিল—তাহাতে ঈশ্বরকে রূপ ও গুণের আধার করা হইয়াছিল। তিনি স্বর্গের রাজা—স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া মানুষের পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া—তাঁহার পাপের দণ্ডবিধান করিতে থাকেন বা গুণের পুরস্কার দিয়া থাকেন—এ সকল ভাব তাঁহার তাৎকালিক বক্তৃতায় স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছিল। উপনিষৎ ও বেদান্ত-প্রচারিত অদ্বৈতবাদ হইতে কেশব-প্রচারিত দ্বৈতবাদ সুদূরপ্রক্ষিপ্ত। নিরাকার ব্রহ্ম—নিষ্ক্রিয় নির্গুণ নামরূপ-বিহীন—অব্যক্ত—অনন্ত, আর তাঁহার ঈশ্বর ক্রিয়ান্বিত—গুণযুক্ত—নামরূপবান্—ব্যক্ত ও সসীম।

পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কালে হিন্দুধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ সাধকগণের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মের যে রূপকল্পনা * করিয়াছিলেন—সেই স্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনাকেই ব্রাহ্মেরা পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করিয়া নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নামরূপ-বিহীন পরম ব্রহ্মের উপাসনা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় কোন নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করেন নাই। তিনি হরিহর বিধিবেদ্য ঋষিগণের ধ্যানগম্য জন্ম-মরণ-ভীতি-ভ্রংশি নিখিল-ভুবনবীজ সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের পূজাপদ্ধতির পুনরাবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র। জনসধারণ এই সূক্ষ্ম পূজায় অনধিকারী বলিয়া ঋষিগণ তাহাদিগের জন্য স্থূল বাহ্য পূজার অবতারণা করিয়াছিলেন। যাহারা পৃথিবী কখন ভ্রমণ করে নাই—এবং করিতে পারিবেও না—তাহাদিগের নিকট শিক্ষকগণ যেমন গোলোক (globe) বা মানচিত্র (map) ধারণ করিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীর স্থূল অবয়ব ও পৃথিবীস্থ দেশ রাজ্য, নগর, নদ, নদী, গিরি, গুহা প্রভৃতি বুঝাইয়া দেন, সেইরূপ ঋষিগণ স্থূল উপাসকমণ্ডলীর সুবিধার জন্য ব্রহ্মের রূপকল্পনা করিয়া তাঁহার সৃষ্টিস্থিতি প্রভৃতি রূপ ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা পুত্তলী-পূজা (idol-worship) নহে, অব্যক্ত ব্রহ্মের ব্যক্ত রূপের সাঙ্কেতিক (symbolic) পূজামাত্র। ঋষিরা জানিতেন ব্রহ্মের লিঙ্গ নাই। সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মশব্দকে ক্লীবলিঙ্গ করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা তাঁহাকে কখন জগদম্বা, কখন জগৎ-পিতা বলিয়া স্তব করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শিব মুকুট কালীকে স্তব করিতে গিয়া তাঁহাকে জায়া ও জননী—দুইই বলিয়াছেন। নিত্য-যুগার সাধক তাঁহাকে কখন কি বলিয়া না ডাকিয়া থাকেন। মহাম্মদও ঈশ্বরকে 'অল্লা' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। 'অল্লা' সংস্কৃত শব্দ—ইহার প্রয়োগ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। 'অল্লা' শব্দের অর্থ 'অম্বা'—জগদম্বা ইহার যোগরূঢ়ি অর্থ। তন্ত্রই মাতৃ ভাবে সাধনা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। বেদেও মাতৃভাবে সাধনা অলক্ষিত ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। কারণ সূর্য্য হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সূর্য্যকে 'প্রসবিতা'—'সবিতা'—'প্রসবিত্রী' প্রভৃতি শব্দে স্তব করা হইয়াছে। কিন্তু তন্ত্রই স্পষ্টাক্ষরে সূর্য্যকে স্ত্রী ও চন্দ্রকে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা তন্ত্রের গুহ্যসাধনের অভ্যন্তরে বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

* সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

পরম ব্রহ্মের উপাসনা লোক সাধারণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করেন। এই পরম ব্রহ্মকে নির্গুণ ব্রহ্ম কহে—আর দেবদেবীগণকে সগুণ ব্রহ্ম কহে। যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় অধিকারী, রামমোহন রায় তাঁহাদিগকে লইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে আরম্ভ করেন। এই আদি ব্রাহ্মগণ উপাসক সম্প্রদায়মাত্র ছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজ একটী সামাজিক দলে পরিণত হইল। যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইয়া এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাদিগকেই এই সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া লওয়া হইত। যে যে কারণে সুশিক্ষিত হিন্দুগণ পূর্ব্বে খ্রীষ্টান হইতেন, সেই সেই কারণেই তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে কেশব বাবু এই স্রোতের গতি ফিরাইয়া ব্রাহ্ম ও হিন্দু—উভয়েরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। কারণ কেশব বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মকে খ্রীষ্টধর্ম্মের আদর্শে গঠিত করিবার চেষ্টা করিলেও—ইহা বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় বিশাল হিন্দুধর্ম্ম তরুর একটী শাখামাত্র। সুতরাং ব্রাহ্মগণ আপনাদিগকে হিন্দু না বলিলেও—হিন্দুসমাজ ইঁহাদিগকে অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আপনার বস্তু—কখন পর হয় না, আর পর কখন আপনার হয় না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বৈদেশিক ধর্ম্ম—ইহার অবলম্বনে দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানগণ আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপে হিন্দুসমাজ হইতে সুদূর-বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং ইহারা হিন্দুদিগের সহিত কখনই মিশিতে পারিবেন না; কিন্তু ব্রাহ্মগণ সহজেই পারিবেন—যেহেতু ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপ এখনও হিন্দুসমাজের অনুগামী আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু পরিবারের সহিত ব্রাহ্ম পরিবারের আভ্যন্তরীণ অবস্থাগত পূর্ণ পার্থক্য এখনও অনুভূত হয় না। সুতরাং অগ্রগত হিন্দু পরিবারের সহিত ব্রাহ্ম সমাজের ক্রমশঃ মিল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এখনই স্পষ্ট দেখা যায়, উভয় উভয়কে আকর্ষণ করিয়াছেন। এক ভাই ব্রাহ্ম ও এক ভাই হিন্দু—একত্র অবস্থিতি করিতেছেন—অথচ হিন্দুসমাজ হিন্দুভ্রাতাকে জাতিচ্যুত করিতেছে না। যেখানে পিতা ব্রাহ্ম—পুত্র হিন্দু—সে স্থলেও হিন্দুসমাজের এইরূপ উদারতা উপলক্ষিত হইতেছে। কেবল বিবাহাদি কার্য্যের সময় ব্রাহ্ম পিতা পুত্র বা ভ্রাতাকে—হিন্দুপুত্র—পিতা—বা ভ্রাতার গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয় মাত্র। এ সামান্য শাসন কালে অন্তর্হিত হইবে—তখন ব্রাহ্মগণ বৈষ্ণবগণের ন্যায় হিন্দুসমাজ মধ্যে পরিগৃহীত হইবেন। কেশব বাবু সেই বৈপ্লবিক কালে বীরের ন্যায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মস্রোতের সম্মুখে দণ্ডায়মান না হইলে আজ হিন্দুসমাজের বিশেষ দুর্গতি হইত, সন্দেহ নাই।

শিখ সম্প্রদায়ের আদিগুরু নানক যেমন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে যাবনিক ধর্ম্মের গতিরোধ করিয়াছিলেন—রাজা রামমোহন রায় সেইরূপ বেদ উপনিষৎ ও তন্ত্রোক্ত নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের গতিরোধ করিয়াছিলেন।

গুরুগোবিন্দ সিংহ যেমন হিন্দু ও যবন মিশাইয়া তাঁহার সম্প্রদায়কে একটী মহাশক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন—কেশব বাবুও সেইরূপ সর্ব্বজাতি মিশাইয়া বঙ্গের ব্রাহ্মসমাজকে সেইরূপ একটী মহাশক্তিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদি কুচবিহারের বিবাহ বিভ্রাটে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু জগদম্বার ইচ্ছা অন্যরূপ হওয়ায় তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। তাঁহার মনোরথ অঙ্কুরে বিদলিত হইয়া গেল। যে ব্রাহ্মসমাজকে মহাশক্তিতে পরিণত করিবার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন—ঘটনা-স্রোতে পড়িয়া তিনিই সেই সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তিনিই আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। আবার তিনিই স্ব-প্রতিষ্ঠাপিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে দ্বিধা বিভক্ত হইতে দিলেন। ইহাতে তাঁহার দোষ অধিক—কি বিদ্রোহি-দলের দোষ অধিক—ইহার বিচার করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। তবে ইহা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্রাট্ হইয়া রামের ন্যায় প্রজারঞ্জন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র সীতাকে পরম সতী জানিয়াও প্রজারঞ্জনানুরোধে পূর্ণ গর্ভাবস্থায় নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। কোন দেশের কোন রাজা প্রজারঞ্জনের এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই। সেই দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, কেশব বাবুর ন্যায় মহামতি ধর্ম্মাচার্য্য, কন্যার বিবাহে শিষ্যানুরঞ্জনার্থ আত্মত্যাগ দেখাইতে পারিলেন না—ইহা মহা ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। তিনি ব্রাহ্মগণের বিবাহের জন্য যে তিন আইন (Act III of 1872) জারি করাইলেন—নিজের কন্যার বিবাহে তাহার অন্যথা করিলেন বলিয়া তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে বেদিচ্যুত করিলেন। তিনি তাঁহাদিগাক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির হইতে বিদূরিত করিলে—তাঁহারা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' আখ্যা ধারণ করিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য রহি[illegible] অবশেষে তিনি সমাজের নাম 'নববি[illegible] প্রদান করিয়া ইহার আচার্য্য পদে [illegible] হইলে—ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ভ[illegible] বর্ষীয় বাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে [illegible] ষ্ঠাপিত হইলেন। এইরূপে অর্দ্ধ[illegible] ব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ স্রোতস্বিনী হিন্দুস[illegible] মন্দাকিনী হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গা, য[illegible] সরস্বতী ও গোদাবরী—এই চতুঃস্রো[illegible] বিভক্ত হইয়া পড়িল। আদিসমাজ [illegible] তোয়া গঙ্গা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স[illegible] ক্ষেত্র। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কা[illegible] যমুনা নববৃন্দাবনকে পবিত্র করিয়া [illegible] হিত মিলিত হইয়াছেন। সাধারণ [illegible] সমাজ অন্তঃসলিলা সরস্বতী। ইহা [illegible] আড়ম্বর নাই বটে, কিন্তু ইহা ধী[illegible] একটী রাজনৈতিক ধর্ম্মসমাজের [illegible] ধারণ করিতেছে। সরস্বতীর বর[illegible] প্রধানতঃ ইহার পৃষ্ঠপোষক। 'নববিধান' পুণ্যসলিলা গোদাবরী—ইহার বিস্তৃতি বিশাল ও লক্ষ্য মহৎ। কিন্তু ইহার স্থিতি কাল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

নববিধান—স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নহে—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় মাত্র। যে দিনে পৃথিবীতে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় হইবে, সেই দিনেই পৃথিবীর সুখসমষ্টি

চরমসীমায় উপনীত হইবে। যুদ্ধ বিগ্রহ—বিবাদ বিসম্বাদ—তখন থাকিবে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাকে বাইবেলে মিলেনিয়ম (Millennium) বলিয়াছে। খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করেন যে, যিশু পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর রাজা হইবেন—এবং সমস্ত পৃথিবীতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। আর্য্যেরা সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াও কখন ভাবেন নাই যে, তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীতে প্রচারিত হই[illegible] এই জন্য এই স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের [illegible] গীতাতে দেখিতে পাওয়া যায়। 'স্ব[illegible]র্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'—ভগ[illegible]ন্ শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছেন যে স্বধর্ম্মে থাকিয়া বরং জীবন উৎসর্গ করিবে, সেও ভাল—তথাপি পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না—কা[illegible] পর-ধর্ম্ম ভয়াবহ। কিন্তু কেশব বাবু সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া যিশু ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও উদারতায় পরাস্ত করিয়াছেন। কারণ তাঁহার নিকট পর-ধর্ম্ম নাই, সকলই স্বধর্ম্ম। তৎপ্রচারিত 'নববিধান' সর্ব্বধর্ম্মকে কুক্ষিগত করিয়া বিশ্বরূপ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভাব এত মহান ও সূক্ষ্ম যে ইহাকে ধারণা করা সাধারণ লো[illegible] কার্য্য নহে। যে কক্ষা সমস্ত ব্রহ্মা[illegible]কে ধারণ করে—তাহার পরিমাপ করে কাহার সাধ্য? কত কত ছায়াপথ, গ্রহনক্ষত্রাদি, কত কত ধূমকেতু আপন আপন কক্ষায় ইহার অভ্যন্তরে যে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে—তাহা চিন্তারও অগম্য। ব্রহ্মবিন্দুর তত্ত্ব যাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন—তাঁহারা সমাধিযোগে এই মহাকক্ষার কিছু সন্ধান পাইলেও পাইতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান ইহাকে কোন কালেই আয়ত্ত করিতে পারিবে না। অযোগী ব্যক্তিও কখন ইহার সন্ধান পাইবে না। সেইরূপ একটী ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যখন একটী জীবনে কুলায় না, তখন সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্বকে আ[illegible] করিয়া তাহার মীমাংসা করা যে, যে-সে ব্য[illegible]ক্ত বিশেষের সাধ্যায়ত্ত, তাহা আমাদের ধারণা হয় না। তবে কেশব বাবুর ন্যায় যোগারূঢ় ও অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসাধ্য, একথা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার সাধ্য হইলেও তাঁহার সম্প্রদায়স্থ সমস্ত ব্যক্তির ইহা সাধ্যায়ত্ত, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। যদি তাহা না হয়—তাহা হইলে এরূপ বিশ্বরূপ ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা জগতের বিশেষ কি শুভ সম্পাদিত হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে কেশব বাবুর কল্পনায় এরূপ একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার আসিয়াছিল বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি গাঢ়তর হইয়াছে মাত্র। তিনি যে জীবন্মুক্ত, ইহা তাহার বিশেষ পরিচায়ক। তিনি শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিঃসঙ্গ যোগতাপস না হইলে তাঁহার কল্পনায় এরূপ সূক্ষ্ম অথচ মহান্ বিশ্বরূপ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইতে পারিত না। ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী, সুতরাং অতীন্দ্রিয়। যাহা বিশ্বব্যাপী, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ তাহা মহান্ হইলেও সূক্ষ্মতম। সেইরূপ যে ধর্ম্ম বিশ্বরূপ—তাহার স্বতন্ত্র স্বরূপ কেহ দেখিতে পাইবে না। সুতরাং সে ধর্ম্ম সাধন ভজন ও ক্রিয়াকলাপের উপযোগী হইতে পারে না।

কেশব বাবু স্বরূপতঃ তান্ত্রিক যোগী ছিলেন। কারণ তিনি ভোগ ও যোগ উভয়কেই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। জনকাদির ন্যায় তিনি সম্ভোগের মধ্যে থাকিয়াও পরম যোগী ও ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। বৈদিক সন্ন্যাসে কামিনীকাঞ্চন বর্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু তান্ত্রিক সন্ন্যাসে কামিনীকাঞ্চন সাধনার উপকরণ সামগ্রী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। "বিকারের কারণ থাকিতে যাহাদিগের চিত্ত বিকৃত না হয়, তাঁহারাই প্রকৃত ধীর।"(কুমার সম্ভব) এই উপদেশের মর্ম্মগ্রহণ করিলে উপলব্ধি হইবে যে, বর্জ্জনে পূর্ণ পরীক্ষা দেওয়া হইতে পারে না। যাঁহারা ভোগ করিয়াও ভোগে আসক্ত হন না—তাঁহারাই সিদ্ধ পুরুষ। কালীদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন যে, রঘুবংশীয় রাজারা 'অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ'—অনাসক্ত হইয়া সুখভোগ করিতেন। ইহা মহাভোগের অবস্থা। কিন্তু সে ভোগ বৈধ দেওয়া চাই। কেশব বাবু ভোগী হইলেও—অবৈধ ভোগশীল ছিলেন, একথা কেহ কখন বলে নাই—বলিতেও পারে না। কেশব বাবুর ন্যায় জটিল চরিত্র

কেবল যোগিজনেরাই ধারণা করিতে পারেন। অযোগী জনে কখন তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই—পারিবেও না। এই মহা পুরুষকে আমি বার বার নমস্কার করি।

সাংসারিক ভোগী যে দ্রব্য একবার ভোগ করেন, তাহার আস্বাদ ভুলিতে না পারায়, সেই দ্রব্য পুনঃ পুনঃ ভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ইহাতে অনন্ত বাসনার সৃষ্টি হয়। জন্ম বাসনামূলক। এ জন্মে যদি সমস্ত বাসনা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে অতৃপ্ত বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহার পুনরাবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ জন্ম হইবে। কিন্তু যিনি আস্বাদিত বিষয়ে অনাসক্ত ও অনাস্বাদিত বিষয়ে বাসনাহীন, এরূপ ব্যক্তি সংসারে অতি দুর্ল্লভ *। প্রথম শ্রেণীর লোককে বুভুক্ষু কহে, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোককে মুমুক্ষু কহে। সংসার মধ্যে বুভুক্ষুরূপ ন্যায়মুমুক্ষু ব্যক্তির সংখ্যাও অল্প নহে। কিন্তু যাঁহারা ভোগ-মোক্ষ-বাসনা-শূন্য, এরূপ মহানুভব ব্যক্তির সংখ্যা সংসারে আরও বিরল।* এরূপ ব্যক্তির বন্ধ মোক্ষ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই শেষ অবস্থায় আসিবার ক্রম আছে। ভোগ ব্যতীত ভোগের বাসনার লয় না। এই বিষয় লইয়া বেদে ও তন্ত্রে মতভেদ আছে। বেদ বলেন 'ন তেন কামঃ কামানানুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥' কাম্য বস্তু উপভোগের দ্বারা কামনা নিবৃত্ত হয় না। ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি যেমন অধিকতর প্রজ্জলিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানাঙ্কুশ দ্বারা কামনা দমন না করিয়া, কাম্য বস্তুর ভোগ করিলে, কামনা দিন দিন বাড়িতে থাকে। তন্ত্রের মত "কণ্টকে নৈব কণ্টকম্।" কণ্টক দ্বারাই, কণ্টক উত্তোলিত করিতে হইবে; 'বিষস্য বিষমৌষধম্'—বিষের ঔষধ বিষই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এলোপ্যাথিক ও কবিরাজী চিকিৎসা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কোন্ চিকিৎসা-প্রণালী বা কোন্ সাধন প্রণালী শ্রেষ্ঠ, তাহার সমালোচনা করা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে এইমাত্র বক্তব্য যে, কেশব বাবু প্রকৃতিতঃ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তিনি প্রথম বুভুক্ষু, পরে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু, তৎপরে মুমুক্ষু—এবং সর্ব্বশেষে ভোগমোক্ষ-নিরাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন। এই শেষ অবস্থায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পরমহংস দেব তাঁহাকে বাগানে প্রথম দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে—'এরই ল্যাজ খসেছে দেখ্‌ছি'। এই কথা শুনিয়া সভাশুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিয়াছিলেন—কিন্তু কেশব বাবু তাঁহাদিগকে স্থির হইতে বলিয়া পরমহংস দেবকে তার অর্থ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—'যতদিন বেঙাচির ল্যাজ না খসে, ততদিন সে কেবল জলে থাকে, পাড়ে উঠে ডেঙ্গায় বেড়াইতে পারে না। কিন্তু যাই-তার ল্যাজ খসে, অমনি সে ল্যাফ্ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন সে জলেও থাকে, আবার ডাঙ্গাতেও থাকে। তেমনই মানুষ; যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, ততদিন সংসার জলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খস্‌লে, জ্ঞান হ'লে, তবে মুক্ত হ'য়ে বেড়াতে পারে। আবার ইচ্ছা হ'লে সংসারেও থাক্‌তে পারে।' ইহাই প্রকৃত জীবন্মুক্ত অবস্থা। ভগবান্ রামকৃষ্ণ অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাকে বিশদীকৃত করিয়াছেন। বেঙাচির ল্যাজ যেমন তাহার তীরে উঠিবার অন্তরায়, সেইরূপ মানুষের বাসনা তাহার ঊর্দ্ধগতির রোধক। ল্যাজ খসিলে বেঙাচি যেমন ইচ্ছামত জলেও থাকিতে পারে, স্থলেও উঠিতে পারে—সেইরূপ বাসনা নিবৃত্ত হইলে মানুষও ইচ্ছামত সংসারে থাকিয়াও সংসারাতীত হইতে পারেন। পদ্ম পত্রস্থিত জলের ন্যায় তখন তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও সংসারে লিপ্ত নন।

এরূপ মহাপুরুষের সংখ্যা জগতে অতি বিরল। এ অবস্থায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—জীবন মরণ—কিছুরই উপর হেয়োপাদেয়তা, জ্ঞান থাকে না। সংসার বিনষ্ট হউক্, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা নহে, আবার সংসার স্থিতি বিষয়েও তিনি উদাসীন। জীবিকানির্ব্বাহার্থ যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রাপ্ত হন, তিনি তাহাতেই সুখে কাল যাপন করিয়া থাকেন *। এই প্রকার ব্যক্তিই ধন্য। মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন এই দশায় উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ধন্য ও জগন্মান্য। তাঁহাকে আমরা বার বার নমস্কার করি। তিনি অনুরাগিনী স্ত্রী ও মৃত্যুকে সমচক্ষুতে দেখিতেন বলিয়া (অ,ব, সংহিতা দেখ) তাঁহাকে আমরা মুক্ত পুরুষ জ্ঞানে বার বার নমস্কার করিতেছি। হে দেব! তুমি আমার পূজা গ্রহণ কর। ওঁ শান্তি।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

* * অষ্টাবক্র সংহিতা, ১৭, ৪।৫।৬।৭

মহম্মদ ও মুসলমান ধর্ম্ম।

পশ্চিম আসিয়া বহুসংখ্যক একেশ্বরবাদী মহাপুরুষের জন্মস্থান। প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল। সাধারণকে একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিতে গিয়া একেশ্বরবাদী মহাপুরুষেরা ঘোরতর নির্য্যাতন সহ্য করিয়া গিয়াছেন। লুত, শেম, হউনস্, আরমিয়া, ইয়হা, ইলিয়াস্, হস্তা, খেজরা, সালেহ, নোয়া, ইব্রাহিম প্রভৃতি মহাপুরুষগণের মধ্যে কেহই উৎপীড়কের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। কেহ কেহ আততায়িহস্তে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। মহাত্মা ইব্রাহিম, বাবিলের রাজার অত্যাচারে প্রিয়তম জন্মভূমি পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন। এমন হজরত মুসার রাজা জনওয়াস্, বহুসংখ্যক একেশ্বরবাদীকে আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছিল। মহাত্মা ঈশা, ক্রশ-যন্ত্রে আরোপিত হইয়া দেহ বিসর্জ্জন করেন। ধর্ম্মের এমন মধুর ভাব এবং সত্যের এমন বিশ্বজয়িনী শক্তি যে, কোনরূপ বিভীষিকা তাঁহাদিগকে অবলম্বিত ব্রত হইতে পরাঙ্মুখ করিতে পারে নাই।

একেশ্বরবাদিগণের মধ্যে ইব্রাহিম ও তাঁহার বংশধর মহম্মদ, পৌত্তলিকতার নিতান্ত বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, অনন্ত জগদাধার সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরকে পরিমিত বস্তুতে আবদ্ধ করার ন্যায় অপরাধ আর নাই। ইব্রাহিম, স্বহস্তে অনেক প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। মহম্মদ শিষ্যেরা প্রতিমার বিষম শত্রু। যে সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, বহুসংখ্যক দেবমন্দিরে বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল ও হইতেছিল, তৎকালে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে না আসিলে এতদিন দেবগণের বংশ এত বাড়িত যে, হিন্দুর বৈষয়িক কর্ম্ম করিবার অবকাশ থাকিতনা। তাহাদের সন্তোষ সাধনার্থ সমস্ত সময় ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত।

লোকে যাহা শুনিতে চায়না, তাহা শুনাইয়া তাহাদের বিরাগভাজন হইতে অনেকেই ইচ্ছা করেনা, বরং আপনাদের বিশ্বাস গোপন করিয়া, জনসাধারণের মতে মত দিতে অনেকেই ব্যগ্র হয়, কিন্তু অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর প্রেমিকদিগের রীতি স্বতন্ত্র। তাঁহারা গড্ডালিকা প্রবাহের মধ্যে পতিত না হইয়া আপনাদের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া জগতের হিতকামনায় বিচরণ করেন। লোকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের প্রতিকূলতাচরণ করে; কিন্তু তাঁহারা অদম্য উৎসাহে স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হন। সমসাময়িক লোকে তাঁহাদের মহিমা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারিলেও তাহাদের বংশধরেরা তদীয় শিষ্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনী, ইহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। মহাপুরুষেরা ভগবানের বিশেষ বিধান প্রচারার্থ পৃথিবীতে আগমন করেন, যথাসাধ্য সেই বিধান প্রচারিত করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

মহাপুরুষ মহম্মদ, যখন আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে আরবের সর্ব্বস্থান, ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। আরবের লোক নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে অনুক্ষণ বিবাদ বিসংবাদ লাগিয়া থাকিত। আরবের লোকের বীরত্বের অভাব ছিলনা বটে, কিন্তু সে বীরত্ব লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডে পর্য্যবসিত হইত। নারীজাতির দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিলনা। কোন কোন সম্প্রদায়ে বালিকা বধের রীতি ছিল, কন্যাকে জীবিত অবস্থায় ভূপ্রোথিত করা হইত। দাস দাসীদের প্রতি নিষ্ঠুর

TORN PAGE(S).

ব্যবহার হইত। নৈতিক জীবনের ন্যায় ধর্ম্ম জীবনের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। উপাস্য দেবতার সংখ্যা ছিল না। কাষ্ঠখণ্ড ও লোষ্ট্রখণ্ড ও দেবতা বলিয়া পূজিত হইত। পূজিত কাষ্ঠও লোষ্ট্রখণ্ড অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রখণ্ড পাইলে পূর্ব্ব-গুলি পরিত্যক্ত হইত। এক কোরেশ সম্প্রদায়ে পনর শত দেবতা ছিল। ইব্রাহিম, মক্কার কাবা মন্দির, ঈশ্বরোদ্দেশে নির্ম্মাণ করেন, সেই মন্দিরে ছোট বড় অনেক গুলি দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আরবের এইরূপ শোচনীয় সময়ে মক্কা-নগরে কোরেশ সম্প্রদায়ে মহম্মদের জন্ম হয়। মহম্মদের বাল্যজীবনের কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না। মহম্মদ লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই। উষ্ট্রপৃষ্ঠে পথ বাহিত করিয়া দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেন। ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার ধর্ম্ম জীবন লাভ হয়। মহম্মদীয় শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার প্রেরিত্ব লাভ হয়। মুসলমানেরা বলেন, তিনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। "ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, আমি এই মত প্রচারার্থ আদিষ্ট হইয়াছি" মহম্মদ আপনার এইমত, প্রথমতঃ, স্বীয়পত্নী খদিজার নিকট ব্যক্ত করিলেন। খদিজা শ্রদ্ধা সহকারে স্বামীর মত গ্রহণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে জামাতা আলি ও কন্যা ফতেমা তাঁহার মত অবলম্বন করিলেন। আগুন কতকাল চাপা থাকে? ক্রমে আবুবেকর ও আরও কতিপয় ব্যক্তি এই নবীন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মহম্মদ আপনার ধর্ম্মমত প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহম্মদ, কাবা মন্দিরের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে বন্ধুগণ! ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তিনি ভিন্ন অন্য উপাস্য নাই। আমি তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। তিনি আমাকে প্রত্যাদেশ যোগে কোরাণ নামক গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন। তোমরা অন্তিম দিবসের বিচারের ভয় কর। সেদিবস প্রত্যেক পাপ ও প্রত্যেক পুণ্যের বিচার হইবে। পুণ্যবান্, অনন্তসর্গে ও পাপী অনন্ত নরকে গমন করিবে। ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তোমরা কোন প্রতিমাকে ঈশ্বর বোধে উপাসনা করিওনা।" এই সকল নূতন কথা শুনিয়া মক্কার লোক চমকিয়া উঠিল। তাহারা মহম্মদকে, দেবগণের নিন্দা করিতে নিষেধ করিল। মক্কার কোরেশগণ যখন দেখিল, মহম্মদ নিষেধ মানিলেন না, তখন প্রথমতঃ ভয় প্রদর্শন ও পরে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। মহম্মদ ও তাঁহার সহচরগণ দশবৎসর যাবৎ যাদৃশ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন, পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপ্রচারক তাদৃশ উৎপীড়ন সহ্য করেন নাই। আত্মীয় বন্ধুগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। নিদারুণ দারিদ্র্য তাঁহাকে নিষ্পেষিত করিতে। তিনি অকাতরে সমস্ত সহ্য করিতেছিলেন, একদা তাঁহার কন্যা ফতেমা, তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বাবা! আমরা তিন দিন অনাহারে আছি," মহম্মদ, ফতেমাকে বলিলেন, "বৎসে! আমি চারিদিন অনাহারে কাটাইতেছি।" ভগবানের নামামৃত তাঁহাদের জীবনের অন্নপান হইয়াছিল। দারুণ অপমান ও শত্রুর উৎপীড়নে তাঁহারা অভিভূত হন নাই।

মহম্মদ, যখন কোরাণ পাঠ করিতেন, তখন শত্রুগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া উপহাস করিত। কেহ বলিত, মহম্মদ ইন্দ্রজাল জানে। কেহ বলিত, মহম্মদ নিজে অর্থ, যখন এমন পরিশুদ্ধ কথা বলিতেছে, যখন ভাল লোক দিয়া রচনা করাইয়া মুখস্থ করিয়া আনে। কেয়ামত অর্থাৎ অন্তিম বিচারের দিন উপলক্ষ করিয়া কেহ কেহ মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিত, 'মহম্মদ! আমাদের প্রতি কবে শাস্তি অবতীর্ণ হইবে?' মহম্মদ ধীরভাবে উত্তর করিতেন, "আমি জানিনা, আমার প্রতিপালক পরমেশ্বর জানেন।" তাহারা বলিত, "আমাদের এত গুলি ঈশ্বর দ্বারা জগতের কার্য্য ভাল করিয়া চলিতেছেনা, তোমার একটী ঈশ্বর কিরূপে জগৎ চালাইবেন?" কেহ কোন অলৌকিক কার্য্য করিতে বলিলে, মহম্মদ বলিতেন "বন্ধুগণ! আমি তোমাদের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন নহি। আমার প্রতিপালক, আমাকে যাহা বলিতে বা করিতে বলেন, আমি তাহা ভিন্ন কিছু বলিতে ও করিতে পারিনা। তোমরা পরমেশ্বরকে ভক্তি

কর। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জগতের যাবতীয় বস্তু তাঁহার অনন্ত মহিমা ঘোষণা করিতেছে, তোমরা কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেছ না?" কোরেশগণ, মহম্মদের প্রাণ নাশার্থ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। একদা ওমর নামক বীর পুরুষ, মহম্মদের প্রাণ নাশার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়া তীক্ষ্ণধার শস্ত্র হস্তে গমন করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন যে, নিজের ভগ্নী ও ভগিনী-পতি, মহম্মদের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। ওমর, কুপিত কেশরীর ন্যায় ভগিনীর আলয়ে উপনীত হইয়া, ভগিনীপতি ও ভগিনীর যথোচিত দুর্দ্দশা করিয়া তাহাদের দ্বারে বসিয়া রহিলেন। প্রহৃত দম্পতী, যাতনার অবস্থাতেও ভক্তিভরে নিশাযোগে কোরাণ পাঠ করিতে লাগিলেন। দুর্দ্দান্ত ওমরের অন্তরে সহসা অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার অন্তর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত। ওমর মহম্মদের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইলেন। ওমরকে আসিতে দেখিয়া মহম্মদের সহচরগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ওমর অশেষ গুণশালী তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। মহম্মদ, পূর্ব্ব-রজনীতে ওমরের মত পরিবর্ত্তনের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ওমর আসিয়া দীন ভাবে মহম্মদের নিকট প্রণত হইলেন। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত, ওমর আপনার এই বিশ্বাস উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করিলেন। ধর্ম্মজগতে এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন বিরল নহে।

বিরোধিদল, মহম্মদের দল বৃদ্ধি দেখিয়া অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইল। মহম্মদের এক প্রতিবেশীর স্ত্রী মহম্মদের গমন পথে কাঁটা পুতিয়া রাখিত, উদ্দেশ্য যে, মহম্মদের পায়ে কাঁটা ফুটিলে আনন্দ পাইবে। মহম্মদের সঙ্গিগণ, বিরোধীদের সহ বিবাদ করিতে চাহিলে, তিনি তাহাদের মন পরিবর্ত্তনের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে বলিতেন। ক্রমে অত্যাচারের মাত্রা এত বাড়িয়া উঠিল যে, মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন করা শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইল। অল্পমাত্র আনুযাত্রিক সহ মহম্মদ, মক্কা পরিত্যাগ করিলেন। শত্রুগণ, পশ্চাৎ ধাবিত হইল। মহম্মদের বিশ্বাস ছিল, যখন পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন, তখন শত্রুগণের তাবৎ দুশ্চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। মহম্মদের শ্বশুর আবুবেকর, মহম্মদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি মহম্মদের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন। মহম্মদ, অতি কষ্টে মদিনায় উপস্থিত হইলেন।

মদিনার লোক, মহম্মদের মত অবলম্বন করিল। কোরেশগণ, তখনও মহম্মদের প্রতি শত্রুতা বিস্মৃত হয় নাই। যাহারা মহম্মদের মত অবলম্বন করিয়াছিল তাহারা মক্কায় অত্যন্ত উৎপীড়িত হইতেছিল। দশবৎসর শান্তভাবে ধর্ম্মপ্রচারে অকৃতকার্য্য হইয়া মহম্মদ বুঝিতে পারিলেন, আরবের দুর্দ্দান্ত মূর্খদিগকে কেবল মৌখিক উপদেশে ধর্ম্ম পথে আনয়ন করা যাইবেনা, বল প্রয়োগের প্রয়োজন। মহম্মদ অনুচরগণের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মহম্মদের মুখে তাহারা শুনিতে পাইল, জেহাদে অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণ স্বর্গলোকে পরমসুখে কালাতিপাত করিবে। সহচরগণ, পার্থিব সম্পদ্ ও পারলৌকিক সুখ লাভের আশায় উৎফুল্ল চিত্তে মহম্মদের প্রস্তাবে সম্মত হইল। দুই একটী যুদ্ধে পরাজিত হইলেও মহম্মদের সর্ব্বত্রই জয়লাভ হইল। অনেক লোক মুসলমান হইল। নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত আরবের লোক এতকাল পরস্পর শত্রুতা করিয়া আসিতেছিল, এখন মুসলমান হইয়া পরস্পরকে বন্ধু-রূপে আলিঙ্গন করিল। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণ, একবার মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ ও একবার মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও মুসলমানদের দল পুষ্টি হইতে লাগিল। মহম্মদের মৃত্যুর পর আবুবেকর, ওমর, ওস্মান্ ও আলী যথা ক্রমে মহম্মদীয় মণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা আদর্শ চরিত্রের মনুষ্য ছিলেন। আবুবেকর ও ওমরের ত্রিসীমায় বিলাস পৌঁছিতে পারিত না। মস্‌জেদের সোপান ও তরুতল, ওমরের প্রাসাদ ছিল।

অচির কাল মধ্যে মহম্মদীয় ধর্ম্ম ও মুসলমান রাজ্য ভারতবর্ষের পশ্চিম হইতে

TORN PAGE(S).

আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ৪৪ বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করিয়া মহাত্মা শাক্য সিংহ, মৃত্যুকালে পাঁচ হাজারের অধিক বৌদ্ধ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু মহম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আবুবেকর, পঁয়ত্রিশ হাজার মুসলমান সেনা, সিরিয়া জয় করিতে পাঠাইয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্ম যে কেমন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছিল, এই ঘটনায় তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। মুসলমানদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে পূর্ব্বরোম সাম্রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িল এবং পারস্য সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইল।

কোরাণে মুশায়ি, ঈশায়ি, অগ্নিপূজক ও পৌত্তলিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে। মুশার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে মুশায়ি, খ্রীষ্টানদিগকে ঈশায়ি ও পারসীকদিগকে অগ্নিপূজক বলা হইয়াছে। সে কালে আরবীয়েরা পৌত্তলিক ছিল। মহম্মদের বিশ্বাস ছিল, ঈশায়ি ও মুশায়িদের গ্রন্থে তাঁহার প্রসঙ্গ আছে, ইহুদি ও খ্রীষ্টানেরা কুবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মগ্রন্থের তত্তৎ অংশের পরিবর্ত্তন করিয়াছে। পৌত্তলিক ও অগ্নিপূজকগণ আপনাদের দুর্ব্বল ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল।

মুসলমান ধর্ম্মে দাস্য, ও সখ্য ভাবের উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। কেয়ামত অর্থাৎ বিচারের একটা নির্দ্দিষ্ট দিবস, অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকে মুশায়ি, ঈশায়ি, ও মুসলমানদের সমান বিশ্বাস। কোরাণে যেমন ভয় প্রদর্শন আছে, তেমনি ঈশ্বরের ক্ষমাশীলতা ও দয়ার বর্ণনারও অভাব নাই। হিন্দুর পৌরাণিক স্বর্গ ও মুসলমানদের স্বর্গে ভোগবাসনা চরিতার্থ করার সামগ্রীর অভাব নাই। যেমন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সাধকগণ, পৌরাণিক স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকের আকাঙ্ক্ষা করেন, তদ্রূপ উচ্চশ্রেণীর মুসলমান সাধুগণও স্বর্গসুখ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ঈশ্বর-সান্নিধ্যই মহাকৃতার্থতা মনে করেন। মুসলমান ধর্ম্ম খুঁটিনাটিতে পূর্ণ নয়। মুসলমানদের উপাসনা প্রণালী অতি সহজ। বাহ্য আচার অপেক্ষা অন্তঃশুদ্ধির গৌরব করিয়া কোরাণ অতি মহতী শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। মুসলমান ধর্ম্মের প্রগাঢ় সাম্যবাদ কোটি কোটি নর নারীকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। মুসলমানদের উপরে হিন্দুজাতির যে একটু ঘৃণা আছে, মুসলমানদের শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলে বোধ হয় তাহার লাঘব হইত। মুসলমানেরা আমাদের প্রতিবেশী, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের অন্তরে কোন ঘৃণার ভাব পোষণ করিতে নাই। আমি কোরাণ হইতে কয়েকটী উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম।

(১) ধনবান্‌কে অনুরোধ করিয়া দরিদ্রকে কিছু দেওয়াইলে অনুরোধকারী পুণ্যভাগী হয়। (২) সত্যকথা বক্রভাবে বলিও না, বা তাহার কোন অংশ গোপন করিও না। (৩) যে কুকর্ম্ম করিবে, তাহার শাস্তি হইবে, মুসলমান বলিয়া শাস্তির লাঘব হইবে না। (৪) কাহার প্রতি বিশ্বাস বা ভক্তি হইলে তাহার গুণানুবাদে সীমা লঙ্ঘন করিও না। যতদূর সত্য, তাহা বলিবে। (৫) ঈশ্বর কার্য্য সম্পাদনে যথেষ্ট। তাঁহার চলে সাহায্যকারীর আবশ্যকতা নাই। (৬) ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, পরাক্রান্ত, নিপুণ, ক্ষমাশীল, দাতা ও দয়ালু। (৭) বিবাহবন্ধন ও ক্রয় বিক্রয়াদিতে যে অঙ্গীকার করিয়া থাক, তাহা পূর্ণ করিও। (৮) ঈশ্বরের নামে যে সকল বস্তু চিহ্নিত হইয়াছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিওনা। (৯) যে কার্য্য দ্বারা কাফেরগণ, ঈশ্বরের সম্মান করে, তাহাতেও হস্তক্ষেপ করিও না। (১০) যখন স্বর্গের সোপান স্বরূপ নমাজে প্রবৃত্ত হইবে, তখন স্বীয় মুখ ধৌত করিবে, অর্থাৎ তাহা সংসারের অভিমুখে স্থাপিত ছিল, অনুতাপ ও প্রার্থনার জলে ধৌত করিবে। সংসার-লিপ্ততা হইতে হস্তকে ধৌত করিবে। মস্তকে হস্তাবমর্শন করিবে অর্থাৎ ঈশ্বরের পথে পশুজীবনকে মস্তক হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবে। (১১) সত্য বিষয়ে শত্রু মিত্র তুল্য। (১২) ঈশ্বর ন্যায়বান্‌দিগকে প্রেম করেন। অত্যাচারী সম্প্রদায়কে প্রেম করেন না। (১৩) সুরাপান ও দ্যূতক্রীড়া করিওনা। (১৪) হে ঈশ্বর! আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তুমি

জানিতেছ। ঈশ্বর অন্তর্যামী। (১৫) স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে, তাহা ঈশ্বরের। (১৬) ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য পরলোক কল্যাণের আলয়। (১৭) তত্ত্ববাহক মনুষ্য ভিন্ন নহে, তাঁহা দ্বারা কোন অসাধ্য কার্য্য হইতে পারে না। চক্ষুষ্মান্ ও সাধারণ মনুষ্যে যে প্রভেদ, তাঁহাতে ও সাধারণ মনুষ্যে সেই প্রভেদ। (১৮) অরণ্যে ও সমুদ্রে যাহা আছে, তাহা ঈশ্বরের। তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন বৃক্ষপত্রের ও শস্যকণারও পতন হয় না। (২০) যাহারা স্বীয় ধর্ম্মকে ক্রীড়া ও আমোদ স্বরূপ করিয়াছে, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দেও। (২০) জগতের সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের নিদর্শন সকল রহিয়াছে। চন্দ্র সূর্য্যে, জীবন ও মৃত্যু নরনারীর, আলোক ও অন্ধকারে, বৃক্ষপত্রে ও তৃণে সকলে ঈশ্বরের উজ্জ্বল নিদর্শন রহিয়াছে। (২১) নিরাশ্রয়ের সম্পত্তির নিকট বঞ্চক হইও না। (২২) ন্যায়ানুসারে তুলও পরিমাণে পূর্ণ করিও। (২৩) প্রকৃতধর্ম্ম, সত্যে প্রতিষ্ঠিত। (২৪) নিষিদ্ধ কর্ম্মে অর্থব্যয় করিও না। (২৫) উপাসনার সময়, বিশুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করিও। (২৬) জ্ঞানযোগে, ঈশ্বর সকল বস্তু ঘেরিয়া রহিয়াছেন। (২৭) মূর্ত্তিপূজকেরা, নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিতে সক্ষম হয় না। যে পর্য্যন্ত না সম্মুখে একদা মূর্ত্তি দেখিতে পায়, সে পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করে না। (২৮) পরমেশ্বর, দয়ালুদের মধ্যে মহা দয়ালু। (২৯) পরমেশ্বর! তুমি আমাদের বন্ধু। আমাদিগকে দয়া কর ও ক্ষমা কর। (৩০) যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অত্যাচার করে, তাহাকে ক্ষমা করিও। বৈধ বিষয়ে আদেশ করিও। নীচ অজ্ঞানদের সঙ্গে বিবাদ করিও না। (৩১) ঈশ্বরের পূজা না করিলে মনের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। (৩২) সহিষ্ণু হও, ঈশ্বর সহিষ্ণুদের সঙ্গে আছেন। (৩৩) লুণ্ঠনের জন্য জেহাদ্ করিবে না। (৬৪) যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য সংগ্রহ করিয়া ঈশ্বরের পথে ব্যয় করে না, তাহাদের জন্য ভয়ানক শাস্তি আছে। (৩৫) ঈশ্বর, নির্ম্মলদিগকে প্রেম করেন। (৩৬) সরল পথে চলিলেই, ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। (৩৭) ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর অপেক্ষা, পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় এক ঈশ্বর কি ভাল নয়? (৩৮) যে ব্যক্তি ধর্ম্মভীরু হয়, ধৈর্য্যাধারণ করে, ঈশ্বর সেই ব্যক্তির পুরস্কার বিনষ্ট করেন না। (৩৯) প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে বস্তুজাত ও মনুষ্য দেহের ছায়া ভূমিতলে পতিত হয়, উহা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে নমস্কার স্বরূপ। (৪০) আত্মাভিমানের ন্যায় গভীর অন্ধকার আর নাই। এই অন্ধকার দূরীভূত হইলে পুণ্যস্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব হৃদয়-দর্পণে প্রতিভাত হয়! (৪১) লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা, অহঙ্কার—এই গুলি নরকের দ্বার। (৪২) বহিঃরাজ্যের নদীর ন্যায় অন্তর রাজ্যে আসক্তি, বিষাদ, লোভ প্রভৃতি নদী আছে। নির্ভরের নৌকায় আরোহণ করিলে আসক্তি নদী, সন্তোষ-তরণী দ্বারা বিষাদ নদী এবং ধৈর্য্যপোতে লোভ নদী পার হওয়া যায়। (৪৩) ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের ব্যবহার বিশুদ্ধ দুগ্ধের ন্যায় নির্ম্মল হওয়া উচিত। উহাতে যেন কপটতা না থাকে। (৪৪) দাস, প্রভুর জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, ধূমে ও উত্তাপে কষ্ট পায়। প্রভুর উচিত যে, তাহাকে লইয়া একত্র বসিয়া ভোজন করেন ও তাহার মুখে দুই চারি গ্রাস অর্পণ করেন। (৪৫) ঈশ্বর সম্বন্ধে উপন্যাস সকল বলিও না। (৫৬) ধার্ম্মিকের অন্তঃকরণ, বিশ্বাসেতে বিশ্রাম প্রাপ্ত। (৪৭) প্রত্যেক ব্যক্তি, নিজের পাপের ভার বহন করে, অন্যের ভার বহন করে না। (৪৯) অপব্যয় করিও না। অপব্যয়িগণ, শয়তানের ভ্রাতা। একটী যব কণিকাও অনর্থক ব্যয়িত হইলে অপব্যয় হয়। (৪৯) চিকিৎসক যেমন কাহারও প্রতি উষ্ণতা ও কাহারও প্রতি শীতলতার ব্যবস্থা করেন, তদ্রূপ জগদীশ্বর কাহাকেও ধন দান, কাহাকেও বা দারিদ্র্যদশা দান করেন। (৫০) মিথ্যা সাক্ষ্যদান করিও না। অঙ্গীকার পূর্ণ করিও। পৃথিবীতে আমোদের ভাবে চলিও না। (৫১) দেবতা ও মনুষ্যগণ, বাক্যের রসনায় ভগবানের স্তব করে। অপর সমুদায় জীব ও জড় পদার্থ, ভাবের রসনায় স্তব করে। সমুদায় পদার্থই ছায়া দ্বারা ভগবানের নিকট প্রণত হয়। (৫২) পারলৌকিক জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন ক্ষণমাত্র।

TORN PAGE(S).

এই সুদীর্ঘ পারলৌকিক জীবন লাভের জন্য ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন ব্যয় করা কি বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়? (৫৩) কেহ কঠোরাচরণ করিলে কোমল বাক্য দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করা উচিত। (৫৪) কুৎসা ও যাদু করিও না এবং সাধ্বী নারীদিগকে অপবাদ দিও না। (৫৫) পরমেশ্বর, মনুষ্যদিগকে সম্পদ্ ও বিপদ্ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। (৫৬) ঈশ্বরের একদিন ও সহস্র দিন সমান, যে হেতু তাহাতে কালের অধিকার নাই। (৫৭) পরমেশ্বর বিবধ ব্যবস্থা দ্বারা তোমাদিগকে আটিয়া ধরেন নাই এবং শক্তির অতীত ভার বহনে তোমাদিগকে নিযুক্ত করেন নাই। (৫৮) ধর্ম্মযুদ্ধ দুই প্রকার; এক ঈশ্বর-দ্রোহীদের সঙ্গে সংগ্রাম। অন্য কু-প্রবৃত্তিদের সঙ্গে সংগ্রাম। শেষোক্ত সংগ্রাম হইতে কখনও নিবৃত্ত হইবে না। (৫৯) দয়া ও ক্ষমা দ্বারা অপরাধীদের অপরাধ ভুলিয়া যাও। অত্যাচারকে উপকার দ্বারা দূর কর। (৬০) ঈশ্বর প্রতিকূলতা দ্বারা মনুষ্যদিগকে এই পরীক্ষা করেন যে, উহারা সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ, না অধীর ও অকৃতজ্ঞ? (৬১) বিপৎ-পরীক্ষার আক্রমণ ব্যতীত ধর্ম্মবল প্রকৃতরূপে উপার্জ্জিত হয় না। (৬২) উপাসনা, দুষ্ক্রিয়া ও অবৈধ কর্ম্ম হইতে মনুষ্যকে নিবারণ করে। (৬৩) ঈশ্বর, সমুদায় গুণের স্বামী, ক্ষমা ও কল্যাণের আকর। (৬৪) ঈশ্বর, বিলাসী ও অভিমানীকে প্রেম করেন না। (৬৫) অহঙ্কার করিয়া তুমি কাহা হইতে মুখ ফিরাইও না, বরং বিনম্র ভাবে লোকদিগকে সমাদর করিও। (৬৬) পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি লেখনী হয় ও সাগর মসী হয়, তথাপি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা পরিসমাপ্ত হইবে না। ঈশ্বর বিজ্ঞানময় ও বিজেতা। (৬৭) পরমেশ্বর পাপ ক্ষমাকারী, অনুতাপ গ্রহণকারী, কঠিন শাস্তিদাতা ও মহিমান্বিত। (৬৮) সেই ঈশ্বর, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে অবস্থান ভূমি ও আকাশকে গুম্বজ স্বরূপ করিয়াছেন, তোমাদিগকে আকৃতিবদ্ধ করিয়া বিশুদ্ধবস্তু দ্বারা জীবিকাদান করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরই তোমাদের পালক। (৬৯) তিনিই বাঁচান ও মারেন। যখন কোন বস্তুর সৃষ্টি করেন, তখন হউক ভিন্ন বলেন না, তাহাতেই হয়। (৭০) তোমরা চন্দ্র ও সূর্য্যকে প্রণাম করিও না, যিনি উহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাকে প্রণাম কর। (৭১) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের একদল যেন অন্য দলকে উপহাস না করে, হয়ত তাহারা উহাদের হইতে উত্তম। (৭২) মনুষ্যের মন, তাহাকে যে কুমন্ত্রণা প্রদান করে, ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন। ঈশ্বর তোমাদের প্রাণের শিরা অপেক্ষাও তাহাদের নিকটবর্ত্তী। (৭৩) হে বিশ্বাসী লোক সকল! তোমাদের ধন সম্পত্তি ও সন্তান লাভ যেন তোমাদিগকে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ হইতে শিথিল না করে। (৭৪) কলঙ্কিত হৃদয়-পবিত্রতা হইতে মুক্ত না হইলে ও হৃদয়ে পবিত্রতা লাভ করিতে না পারিলে স্বর্গেতে কেহই প্রবেশ করা যায় না। (৭৫) ঈশ্বর কি-মাত্র, নিষ্কাম, জাত নহেন, মনুষ্যবৎ কাহার ও জন্মদাতা নহেন, তাঁহার তুল্য কেহ নাই।

কোরাণ, এতাদৃশ বহুমূল্য উপদেশে পরিপূর্ণ। কোরাণের ধর্ম্ম অতি জীবন্ত ধর্ম্ম। ধর্ম্ম প্রচারার্থ মুসলমানেরা যে ক্ষয়াঘাত করিয়াছিল, এখন তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত। খ্রীষ্টানেরা, ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের প্রতি অল্প অত্যাচার করে নাই। শান্তিনারায়ণ হিন্দুও যে, বৌদ্ধদের প্রতি অল্প অত্যাচারী হইয়াছিলেন, তাহা নহে। কেবল বৌদ্ধদের এ বিষয়ে কোন দুর্নাম নাই। এখন স্বাধীন মতেরই সর্ব্বত্র আধিপত্য দৃষ্ট হইতেছে। যদি কখনও পৃথিবীতে ধর্ম্ম-সমন্বয় হয়, তবে বেদ, বাইবল ও কোরাণ, কেহই অনাদৃত হইবে না। পরমেশ্বর, সেই সত্যযুগ পৃথিবীতে আনয়ন করুন, যে যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান মতবৈষম্য ভুলিয়া গিয়া, আপনাদিগকে একই ভগবানের সমান স্বত্বাধিকারী প্রজা বলিয়া বিবেচনা করিবে।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব।*

সৃষ্টি-রহস্য অজ্ঞেয়, মনুষ্য-প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়। সৃষ্টির মুখাবরণ উন্মোচিত করিয়া এবং মনুষ্য-প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, যে শক্তিধর পুরুষ কোন অলৌকিক সত্য বা মূলতত্ত্ব প্রকটিত করেন, তিনি মানব-সমাজের বন্ধু,—সমগ্র পৃথিবীর পূজাস্পদ। প্রধানতঃ বিষয়-বিতৃষ্ণ, জ্ঞানমার্গাবলম্বী,—সাধক, যোগী ও তত্ত্বজ্ঞানী এই পথের পথিক। ইঁহারা অন্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে,—জীবের ও জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়াও ইঁহারা সংসারীর জন্য চিন্তা করেন; মানব-হিতের জন্য ইঁহারা প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ইঁহাদের সাধনা সমুদ্ভূত, ধ্যান ও ধারণা-প্রসূত মহাসত্যের দুই একটা কণিকা লইয়া,—ভক্ত ও ভাবুকের অভ্যুদয়। কবি ও দার্শনিক,—সেই ভক্ত ও ভাবুকের ক্ষুদ্র শিষ্য। চিন্তা ও ভাব-রাজ্যের অধিপতি হইলেও, কবি ও দার্শনিককে,—প্রকৃত ভক্ত ও ভাবুকের নিকট মস্তক অবনত করিতে হয়; কারণ প্রকৃত কবি ও দার্শনিক,—অহমিকা-শূন্য;—সত্য ও সৌন্দর্য্যের চরণে বিলুণ্ঠিত হওয়া তাঁহারা শ্লাঘার বিষয় বোধ করেন। প্রকৃত ভক্ত ও ভাবুক সেই সত্য ও সৌন্দর্য্যের প্রকট মূর্ত্তি।

সত্য ও সৌন্দর্য্য হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি। সত্যের ধারণা ও সৌন্দর্য্য বোধ যাঁহার যে পরিমাণে অধিক, তিনি সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করেন। যাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি করিবার সৌভাগ্য নাই; তিনি সেই শক্তি বিষয়ান্তরে নিয়োজিত করেন। মানব-সেবাই তাঁহার ধর্ম্ম; মনুষ্যত্ব অর্জ্জনই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। আর যে ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহের একাধারে এই দুই শক্তি থাকে, মনুষ্যবেশে তিনি দেবতা। সমগ্র দেশ, সমগ্র সমাজ, সমগ্র পৃথিবী,—চিরদিন তাঁহাকে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি উপহার দেয়।

এখন, এই সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব কি, অদ্য তাহাই আমাদের আলোচ্য। সংক্ষেপে ব্যষ্টিভাবে আমরা এই কথাটীর আলোচনা করিব।

যে দিন জগতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভাষারও সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যের হৃদয়-নিহিত ভাবের সমষ্টিই ভাষা,—এবং সেই ভাব প্রকাশের নামই ভাষা। জাতি বিশেষের সাহিত্য নাই বটে, কিন্তু ভাষা সকল জাতিরই আছে। সেই সনাতন বৈদিক যুগ হইতে অনাদি কাল ধরিয়া যে ভাব-স্রোত চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ভাষা। ভাষা,—সাহিত্যের প্রসূতি। সাহিত্য হইতে সমাজ, সমাজ হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে মনুষ্যত্ব। পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ; পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী। একটী ছাড়িলে আর একটি নিষ্প্রভ হয়; একটির অস্তিত্ব অভাবে আর একটির অস্তিত্বও ক্রমশঃ বিলয়প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত সাহিত্যকার এই তিনকে একই কেন্দ্রে পরিণত করিয়া, তাঁহার অমানুষী প্রতিভা পরিচালিত করেন। তাহার ফলে মানুষের কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্রিক্ত হয়, কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি পায়, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি জন্মে। সহানু-

* কলিকাতা—বহুবাজার সরস্বতী ইউষ্টিটিউটের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।—২৩শে বৈশাখ, ১৩০৭।

ভূতি হইতে একতা, একতা হইতে সভ্যতা, সভ্যতা হইতে জাতীয়তা উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাতীয়তাই জাতীয় জীবনের উন্নতির সোপান। যে জাতির জাতীয়তা বা একপ্রাণতা নাই, সে জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত। সে জাতি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে,—পরপদ লেহন করিবে বলিয়া; সে জাতি বাঁচিয়া থাকে,—অন্যের উপহাসাস্পদ হইবে বলিয়া; সে জাতির অস্তিত্ব,—পরস্পর রেষারিষী-দ্বেষাদ্বেষীতে জলিয়া মরিবে বলিয়া। "তাহারা জাগিয়া থাকে, ঘুমাইবার লোভে; ঘুমায়,—আর জাগিতে পারে বলিয়া"।—আলস্যে তুড়ি দিয়া জৃম্ভন তুলিতে তুলিতে, অদৃষ্টের নামে কাপুরুষতার দোহাই দিতে দিতে, তাহারা দিনের পর দিন গণিয়া যায়; আর কালের ডাকে, যথাকালে ইহলোক হইতে সরিয়া পড়ে!

এই নিদ্রালস জীবন্মৃত জাতিকে উদ্বোধিত ও সঞ্জীবিত করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি করিতে হয়। কারণ সাহিত্যই সর্ব্ব বিষয়ের মূল এবং মেরুদণ্ড। মূল এবং মেরুদণ্ডকে সর্ব্বাগ্রে পোষণ ও রক্ষা না করিলে, কিছুই থাকে না, কিছুই হয় না। বুনিয়াদ পোক্ত না হইলে সুরম্য হর্ম্ম্য ঝঞ্ঝাবাতে পড়িয়া যায়; জাতীয় সাহিত্যের মূল দৃঢ় না হইলে জাতীয় জীবনেরও অবসান হয়;—তাহার রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ও, আধারাভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সাহিত্যই এই সকলের আধার। সাহিত্যকে অতিক্রম করিয়া কিছুই চলিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও পরিপুষ্টি আবশ্যক। সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া,—সমাজ, ধর্ম্ম, জাতীয়তা,—সকলই পরিচালিত করিতে হইবে। সত্য অপেক্ষা মহৎ আর কোন বস্তু নাই;—সেই সত্য সাহিত্যের অন্তস্তরে নিহিত। ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম বন্ধু আর কেহ নাই;—সেই ধর্ম্ম সাহিত্যের উচ্চতর সোপান। উচ্চে উঠিবার অগ্রে, আপনাকে, তথা সাহিত্যকে শক্তিশালী করিতে হইবে। প্রাণ দিয়া, প্রেম দিয়া, উন্মাদিনী শক্তি দিয়া সাহিত্যকে জীবনের আদর্শ করিতে হইবে। ভক্ত যেমন প্রীতিভরা অশ্রুজলে হৃদয় তল ধৌত করিয়া আরাধ্য দেবতার অর্চ্চনা করেন,—প্রকৃত সাহিত্যসেবীও তেমনই সর্ব্বান্তঃকরণে, অকপটে সাহিত্যধর্ম্মের সেবা করেন। তাঁহাতে কৃত্রিমতা বা ভাণ, পরমুখপ্রেক্ষিতা বা লাভ-লোকসানের খতিয়ান্ থাকিতে পারে না। তিনি সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের সেবা করেন; সত্যের জন্য সত্যের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। এই সাহিত্যই—সাহিত্য। এই সাহিত্য প্রাণের স্পৃহনীয়,—আত্মার খাদ্য। কবিত্বই ইহার প্রাণ; উচ্চ আদর্শই ইহার লক্ষ্য। এই সাহিত্য হইতেই ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্ম হইতেই মনুষ্যত্ব।

মনুষ্যত্ব কি? উত্তরে অনেক কথা আসে,—অনেক মতও আসিয়া পড়ে। সে কথা, সে মত সম্যক আলোচনার স্থান ইহা নহে। সংক্ষেপে, একটি কথায়, আমরা ইহার উত্তর দিব। মনুষ্যত্ব কি? উত্তর—

"জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে।"

কথাটা যতবার যেমন ভাবে আলোচনা করিয়াছি, মনের মধ্যে ঐ একই উত্তর পাইয়াছি,—"জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে।'—হিন্দুর চরম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও এই উপদেশ দেয়, মুসলমানের কোরাণও এই শিক্ষা দেয়, আর খ্রীষ্টানের বাইবেলও এই কথা বলে। সৎসাহিত্য বা কাব্য, এই মহাভাবের প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রকৃত সাহিত্যকার এই মহাভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাঁহার বিশাল কাব্য-চিত্রপটে, জীব ও জগৎ অঙ্কিত করেন। জগতের বুকে যে কথা লুকানো আছে, তাহা টানিয়া বাহির করেন। জীব কি, জগৎ কি, উভয়ের সম্বন্ধ কি, মানবের কর্ত্তব্য ও পরিণাম কি, ইত্যাকার এবং আরও অনেক প্রকার চিন্তা ও ভাব, আপন তীক্ষ্ণ অনুভবক্ষম বিশাল হৃদয়ে আয়ত্ত করিয়া,—সেই ক্ষণজন্মা শক্তিধর পুরুষ, কাব্যে বা সাহিত্যে তাহাই চিত্রিত করিয়া থাকেন। কারণ, "কবির সৃষ্টি, জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া আমি মনে করি না। জগতের বুকে যে কথা লুকানো আছে, হৃদয়ের ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়া কবি আপনার জগৎ সৃষ্টি করেন। সত্য ও সৌন্দর্য্যই জগতের প্রাণ; সত্য ও সৌন্দর্য্য কাব্যেরও প্রাণ। সুতরাং কবির প্রধান কাজ,—সত্য ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। প্রকৃতির ছায়া এই সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কোমল ও কঠোর, দুই লইয়াই প্রকৃতি। চিত্র অঙ্কিত করিতে যেমন আলোক ও ছায়ার প্রয়োজন, প্রকৃতির পূর্ণতার জন্য সেইরূপ কোমল ও কঠোর,—দুয়েরই প্রয়োজন। এই দুয়ের সমাবেশ বড়ই গভীর ও রহস্যময়। এবং এই কোমল ও কঠোরের সমাবেশে, মানব জীবনের মহাসমস্যা 'ছকে' মিলাইয়া, কবিকে একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে হয়। সুতরাং কবির কাজ অতি উচ্চ ও মহৎ।" এই জন্যই আমি প্রবন্ধের 'মুখবন্ধে বলিয়াছি, প্রকৃত কবি ও দার্শনিক,—সাধক, যোগী বা তত্ত্বজ্ঞানী, এবং ভক্ত ও ভাবুকের ক্ষুদ্র শিষ্য। সংসারে থাকিয়াও তাঁহাদিগকে একটু স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে হয়; একটু নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে হয়। সাধারণ বিষয়ী লোকের মত তাঁহাদের ধাত হইলে তাঁহাদের লেখার ধাতও খাঁটী হয় না, স্থায়ী সাহিত্যেও তাহা স্থান পায় না। কারণ সত্যসেবী, সত্যের উপাসক, সত্যের প্রচারক হইতে হইলে, তাঁহাকে বড় কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে হয়;—সাময়িক সুখ্যাতি অখ্যাতি, নিন্দা যশঃ, লাভ ক্ষতি, শত্রুতা মিত্রতা, এ সকলকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া আপন গন্তব্য পথে চলিতে হয়। সত্যের ধ্যান ও ধারণায় তন্ময় হইয়া,—বাক্যে কর্ম্মে মনে জ্ঞানে, ভাবে, ব্যবহারে;—অসত্যের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ না করিয়া, তাঁহাকে থাকিতে হয়। সংসারের নিষ্ঠুরতা ও নির্য্যাতন, অদৃষ্টের তাড়না ও বিড়ম্বন, পদে পদে তাঁহাকে সহিতে হয়। কোন এক ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "দ্বাদশ বর্ষকাল অনন্যমনা হইয়া সত্যের সেবা করিলে, মিথ্যায় আর মন আসিবে না; অসত্যে আর প্রবৃত্তি হইবে না।"—হায়, দ্বাদশ বর্ষ! মোহান্ধ মায়ার জীব,—দ্বাদশ মুহূর্ত্ত, দ্বাদশ পল সত্যে অটল আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কি না, তাহাই সন্দেহ স্থল। এমত অবস্থায় নিত্য ও অনন্তকাল স্থায়ী সাহিত্যের উদ্ভব হইবে কিরূপে? সেই জন্যই না হিন্দুর বেদই এক মাত্র সনাতন সাহিত্য? আর সত্যময় হইয়াছিলেন বলিয়াই না ভারতকার ব্যাস আপন মাতৃজারত্বও অম্লানবদনে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? আর, সেই জন্যই না সেই পঞ্চমবেদ-প্রণেতা 'ব্যাসো নারায়ণঃ হরিঃ' ইত্যাকার বিশেষণে অভি-

হিত হন? হায় সত্য! তোমার সৌন্দর্য্যে যে বিমোহিত হইয়াছে, সে কি আর লোক-লৌকিকতার ধার ধারে? না, পৃথিবীর যশঃ নিন্দায় স্ফীত বা সঙ্কুচিত হয়? তোমাতে মোহিত হইয়া ছিলেন বলিয়াই মহাত্মা সক্রেটিশ বিষপান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই; আর মহামতি খ্রীষ্ট জীয়ন্তে ক্রুশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ দিতেও পশ্চাদ্‌পদ হন নাই!

এই সত্য, এই সৌন্দর্য্য, এই মহাদর্শ, এই অলৌকিক জীবন্ত চিত্রে আকৃষ্ট হইয়া কবি ও দার্শনিক ক্ষণকালের জন্য বাহ্য-জগৎ বিস্মৃত হন, আপনাকে বিস্মৃত হন, গভীর ভাব-সমুদ্রে ডুবিয়া রত্ন আহরণ করেন। সেই রত্নের বিমল শোভা দেখিতে দেখিতে, ক্রমেই মানবের জ্ঞানচক্ষু ফুটিতে থাকে; হৃদয় ও মন প্রশস্ত হয়; হিংসা দ্বেষ, কুটিলতা বক্রতা এবং নীচতা ও স্বার্থপরতা ক্রমেই বিদূরিত হইয়া যায়। তখন মানব,—"জীবে প্রেম, স্বার্থ ত্যাগ, ভক্তি ভগবানে"—এই মহাসত্য ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের অধিকারী হয়।

সাহিত্যের এই যে উচ্চ আদর্শ, ইহা এখন পাইব কোথায়? ইহা দিবে কে? ধর্ম্মগ্রন্থ, শাস্ত্রগ্রন্থ, অথবা নীতিগ্রন্থ ত তেমন সহজ-পাঠ্য নয় এবং সেই হিসাবে ইহা তেমন মনোজ্ঞও নয়;—তবে সাহিত্যের ঐ উচ্চ আদর্শপূর্ণ গ্রন্থ দেয় কে? দার্শনিক ত একটা গম্ভীর বিষয় লইয়া তাহার বিশ্লেষণ করিতে করিতে মন-মরা করিয়া মাথা ঘুরাইয়া দেন; বৈজ্ঞানিক তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন,—তিনি আবার প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ আবিষ্কারার্থ কতই না সংশ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, একীকরণ, যন্ত্রসংযোগ প্রভৃতিতে ক্ষীণপ্রাণ মানবের সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করেন; প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পুরাকালীন তত্ত্বসংগ্রহে ও তাহার আমূল ইতিবৃত্ত সঙ্কলনেই তৎপর; এখন মানুষকে অপেক্ষাকৃত সহজে ও স্বল্পায়াসে, আশার মোহনমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যায় কে?—মহাপ্রাণ কবিই সে ভার গ্রহণ করেন। তিনিই মানবের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক, আশ্বাসদাতা, বন্ধু ও গুরু। বস্তুতঃ, কবির তুল্য লোকশিক্ষক আর কেহই নন। কবিই প্রকৃত সাহিত্যকার, এবং কবিতাই প্রকৃত স্থায়ী সাহিত্য। কবিতা অর্থে এখানে কেবলই ছন্দো-বন্ধ-সুর-তান-লয়ে-গাঁথা—পদ্য বুঝিতে হইবে না,—সত্য ও সৌন্দর্য্যময়, চির নূতনত্ব পূর্ণ, বৈচিত্র্যময় গদ্য সাহিত্যও কাব্যনামে অভিহিত হইয়া থাকে। দেশ কাল পাত্র ভুলিয়া,—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বিস্মৃত হইয়া,—যথাসত্য, যথাজ্ঞানে, মনুষ্য জীবনের প্রহেলিকা চির-দিনের জন্য লোকশিক্ষার বিষয়ীভূত করিতেই কবির জন্ম। জগতের অভ্যন্তরস্থ করুণ ক্রন্দন, বিশ্ববাসী নরনারীর অরুন্তুদ রোদন,—আপন প্রাণে উপলব্ধি করিতেই বুঝি কবির অভ্যুদয়। মহাপ্রাণ কবি গভীর সহানুভূতির সহিত জগতের সেই মহাদুঃখ দূর করিতে সচেষ্ট হন। আশ্বাস দিয়া, উপায় দেখাইয়া, পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া, তিনি তাঁহার ভক্তবৃন্দকে সান্ত্বনা করেন। পুলপিটে দাঁড়াইয়া, বক্তৃতা না দিয়া, 'এই কর' না বলিয়া, তিনি একটী 'মনের মানুষ' অঙ্কিত করিয়া দেন, এবং তাহার পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও কার্য্যাবলী এমনই ভাবে চিত্রিত করিয়া থাকেন যে, নিরাশপ্রাণ মহাদুঃখীও তাহা দেখিয়া সান্ত্বনা পায়,

কাঁদিতে কাঁদিতেও নির্ম্মল সুখের আস্বাদন পাইয়া থাকে। এই শ্রেণীর কবির যে কাব্য, তা পদ্যই হোক্ আর গদ্যই হোক্, স্থায়ী সাহিত্যে তাহারই স্থান সকলের উচ্চে। এই জন্য সকল দেশে, সকল সমাজেই কাব্য গ্রন্থের এত আদর! কাব্য,—উচ্চ আদর্শপূর্ণ, চির-নূতনত্বময়; তাই সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানুষ সহজেই তাহাতে আকৃষ্ট হয়। অবশ্য সকলকে সংসার-ধর্ম্ম করিতে হইবে, ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইবে, জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে,—এমত অবস্থায় কেবলই কাব্য লইয়া থাকিলে চলিবে না—তজ্জন্য ঘটনামূলক স্থূল সাহিত্য এবং সাময়িক সংবাদাদি পূর্ণ হিসাব-নিকাশ-বিশিষ্ট জীবিকা-উপায়োপযোগী গ্রন্থেরও প্রয়োজন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, স্থায়ী সাহিত্যে উহার স্থান অল্প। যাহা "সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের," তাহাই উৎকৃষ্ট সাহিত্য, এবং সেই সাহিত্য হইতেই মনুষ্যত্ব।

এ পর্য্যন্ত আমি কবি ও কাব্যেরই উল্লেখ করিয়াছি। আমার আশঙ্কা হইতেছে, পাছে কেহ মনে করেন, সাহিত্যের নামে, কবি ও কাব্য আসিল কেন? এ কথায় আমার বক্তব্য এই,—প্রকৃত কাব্যই—সাহিত্য। কাব্যকে ছাটিয়া ফেলিলে সাহিত্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। মহামতি দক্ষরাজ শিবকে বাদ দিয়াও যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন! সেইরূপ, কাব্যকে বাদ দিয়া সাহিত্যের আলোচনা করাও একরূপ স্পর্দ্ধার কথা। দিন কাল যেরূপ পড়িয়াছে, তাহাতে এই কৈফিয়ৎ টুকু দিবার প্রয়োজন আছে। কেন আছে,—সে কথা হয়ত আমায় আর এক দিন বলিতে হইবে।

এখন যে কথা বলিতেছিলামঃ—সাহিত্য হইতেই মনুষ্যত্ব। "আপনাকে লইয়া থাকাই মনুষ্যত্ব নহে। যাহা নিকৃষ্ট জীবের লক্ষ্য, মনুষ্যের লক্ষ্যও তাহাই নহে। মনুষ্যকে তাহার লক্ষ্য বুঝাইতে, তাহার অন্তরে জ্ঞানশিক্ষা প্রজ্বালিত করিতে, এবং রক্ত মাংসের শরীর ভুলাইয়া চিন্তা ও বুদ্ধির সর্ব্বপ্রথম অধিকার দিতে,—এক কথায় দেহকে ছাড়িয়া মনকে বুঝিতে শিক্ষা দেওয়াই, কবির কাজ। সর্ব্বথা, প্রতিভাবান্ কবিও তাহাই করিয়া থাকেন। সেইজন্যই কবি জগতের বন্ধু,—সমগ্র নরনারীর প্রীতির পাত্র। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যখন মূলের অনুসন্ধান করিতে করিতে বিদ্যা, বুদ্ধি ও চিন্তার অতীত রাজ্যে গিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন, তখন এক হিসাবে তিনিও কবি হন; তাঁহার তত্ত্ব তখন কবির স্বভাবজাত সৌন্দর্য্যে মিশিয়া এক হইয়া যায়;—সে এক মহাযোগ! দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে মৃত্যুকে উল্লেখ করিতে পারা যায়। মৃত্যুর পরে যে কি হইবে, তাহা কবিও যেমন বুঝেন, দর্শনিকও সেইরূপ বুঝেন, বৈজ্ঞানিকও তদ্রূপ বুঝিয়া থাকেন। অথবা, এ তিনের কেহই কিছুই বুঝেন না। না বুঝিয়া, শেষোক্ত দুই জন কিছু সন্দিগ্ধ-চিত্ত হন; কিন্তু প্রথম জন তখনও আশা ছাড়েন না,—তখনও তিনি আশার অমৃতময়ী দেব-বাণী শুনাইতে থাকেন। সে কি অপূর্ব্ব গভীর সান্ত্বনা!

কিন্তু হায়! পাশ্চাত্য জগতে এক রব উঠিয়াছে, 'বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সহিত

কবিতা ক্রমশই লয় প্রাপ্ত হইবে।' কিন্তু কথাটা কি ঠিক? কবিত্বের বিলোপ,—ইহা কি সম্ভবপর? "না, একথা মানিতে আমরা প্রস্তুত নই। যখন সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কবিতার উৎপত্তি, তখন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কবিতাও অনন্তকাল স্থায়িনী হইবে। মানুষ যত দিন মানুষ থাকিবে, অথবা মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব লাভ করিবে, তত দিন কবিতাও সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ করিতে থাকিবে। এবং সেই সঙ্গে তাহার শোভা, শ্রী, সৌন্দর্য্য ও স্ফূর্ত্তি সম্যকরূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে। যাহা সত্য ও সুন্দর, যাহা সার ও শুভপ্রদ, যাহা জীবনের সান্ত্বনা এবং আত্মার আহার, তাহাই কবিতা,—এবং তাহার অনুশীলন করাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।"

কবিতার বিলোপ অসম্ভব! বিজ্ঞানের আলোকে কাব্যের স্ফূর্ত্তি হয় না—একথা কখন বুঝিতে পারিলাম না। কাহারও কাহারও ধারণা,—কবিতা অর্দ্ধ নিদ্রা অর্দ্ধ জাগরণ, অর্দ্ধ চেতনা অর্দ্ধ স্বপ্ন, অর্দ্ধ স্মৃতি—অর্দ্ধ বিস্মৃতি!—যেন প্রাণটা কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন, প্রখর রবি-কিরণে তাহা ফুটিয়া উঠে! কিন্তু বিজ্ঞানের আলোক এতই সত্য, এতই তীব্র, এতই জ্বালাময় যে, ক্ষীণপ্রাণ কবিতা প্রাণভয়ে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!—এ কথা আমরা এত দিন বলিতে শিখি নাই—শুনিয়াছি নাকি, এ কথা কোন্ সুসভ্য, সুশিক্ষিত সুদূর প্রদেশ হইতে আসিয়াছে! আমরা তাঁহাদের কাছেই ইহা শুনিয়াছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও শুনিয়া থাকি যে, সেই দেশে যখন বিজ্ঞানের বড় আদর, বড় খ্যাতি, বড় স্ফূর্ত্তি, কবিতা তখনও সেখানে রত্ন সিংহাসনে রাজ-রাজেশ্বরী রূপে অধিষ্ঠিতা! তাই বলিতেছিলাম, কবিতার বিলোপ নাই। তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব কবিত্বময় নিখিল সংসার,—এই অসীম রহস্যময় মানব-জীবন সঙ্গে সঙ্গেই যে বিলুপ্ত হইবে! হায়! সে অনন্ত শূন্যে, জানি না, কোন্ মহাপুরুষ বিজ্ঞানের অসাধারণ ক্রীড়া-কৌতুক দেখিবার জন্য জাগিয়া থাকিবেন!

এখন, এ মহাবস্তু কবিতা পাইব কোথায়? মহাকবির কাব্য-আলেখ্যেই তাহা পাইব। বিশ্ব-প্রকৃতির জাগ্রৎ জীবন্ত ভাব দেখিয়া যে মহাদর্শের সৃষ্টি, যাহা ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয় এবং প্রাণের আবেগে বলিতে হয়—'হে কবি! কোথায় তুমি? হে প্রকৃতি! তুমি কে? কবি কে?'—প্রকৃত সাহিত্যকার কবি সেই মহা সত্য প্রচার করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হন, এবং সেই সত্যের আলোকে মনুষ্যত্ব শিক্ষা করিয়া আমরাও ধন্য হই।

বলিবে, অনেক সময় সাধারণ মনুষ্যের অনতিক্রমণীয় পথে মহাকবির মহতী প্রতিভা চলিতে থাকে,—তাহাতে সমাজের লাভ কি? লাভ আছে বৈ কি? "সেই প্রতিভা মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া অনন্ত গগনে বিলীন হইয়া যায়—যাউক; মায়া-মন্ত্রে স্বপ্নরাজ্যে বিভোর হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকে থাকুক;—কল্পনা-রথে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে, লোক লোকান্তরে বিচরণ করে করুক; তাহাতেই সেই প্রতিভার সম্যক স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। পরন্তু, সেই প্রতিভাকে আবার মনুষ্য-সমাজে ফিরিতে হয়। উষার স্নিগ্ধ আলোকে আপন কুলায় ছাড়িয়া যে পক্ষী অনন্ত গগনে উঠিয়া অমর সঙ্গীতে জগৎ প্লাবিত করিয়াছে,

সন্ধ্যার স্নিগ্ধ মধুর ছায়ায় তাহাকে আবার নামিতে হয়।"

কাব্যেরও সেই রূপ—কখন কখন মানসচক্ষের অতি দূরে ঊর্দ্ধ-গমন আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহা যতই ঊর্দ্ধে বিচরণ করুক, তাহার মূল তোমার আমার অন্তরের অন্তরে নিহিত আছে! লকে-বাঁধা ঘুঁড়ি, কত ঊর্দ্ধে উঠিবে উঠিতে দাও—সেত ক্রীড়ার পদার্থ মাত্র। আমার প্রাণের কথা বলিতে বলিতে যখন তোমার মহতী প্রতিভা অনন্ত শূন্যে উঠিতে থাকিবে, তখন কি তুমি মনে কর, আমিই পড়িয়া থাকিব? না, আমার প্রাণও সেই সঙ্গে সঙ্গেই উঠিতে থাকিবে! পথ অনন্ত, জীবনও অনন্ত।—অনন্তে তোমায় আমায় একাকার হইয়া যাইব! যদি প্রতিভার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে সে কেবল ঐ লকে-বাঁধা ঘুড়ির মত—একবার উঠিল, আবার বালকের ইচ্ছানুরূপ অল্প আকর্ষণেই নামিয়া পড়িল। তাহা প্রতিভা নহে,—প্রতিভার ভ্যাঙ্গানি মাত্র!

সুতরাং, কাব্য সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তার অতীতে অগ্রসর হইলে, নিরাশায় নয়ন ফিরাইও না। কাব্য কেবল ইহ-লোক বা ইহ-জীবন লইয়া নহে। তাহা হইলে ইহার রূপান্তর হইত। যতই ঊর্দ্ধে উঠুক,—কাব্য, তোমাকে আমাকে ভুলিবে না;—ভুলিতে পারে না। কারণ তোমার আমার ক্ষুদ্র হৃদয়-পটে বিশাল বিশ্বের মহাদর্শ দেখাইতে তাহার প্রয়াস!

এই জন্যই, কাব্য কখন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে পারে না। দেশ কাল পাত্র বিশেষ লইয়াই, তাহার পরিতৃপ্ত হয় না। তবে আবশ্যক বোধে, কবি দণ্ড-পুরস্কারের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু তাহাও অতি সাবধানে,—অতি বিচক্ষণতার সহিত।—আবশ্যক বোধে কবি তখন সমাজের নেতা হন, এবং অন্য অপেক্ষা অল্পায়াসে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। কারণ সমাজের উপর—তথা মনুষ্যের হৃদয়ের উপর তাঁহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ জন্য সৎ কাব্য পাঠে সমাজের যেমন হিত হয়, অসৎ কাব্যে আবার তেমনই অহিত সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং কবিকে অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে চলিতে হয়। তাঁহার দায়িত্ব অতি গুরুতর। দেশাধিপতি বহিঃরাজ্য শাসন করেন, আর কবি মানবের অন্তর্রাজ্যে আধিপত্য করিয়া থাকেন!

যে কবি বা সাহিত্যকার এই গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ভুলিয়া বিপথে চালিত হন, তিনি দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু, সমগ্র মানব জাতির শত্রু।*

* এখানে একটী গল্প মনে পড়িল। গল্পটি ইতি পূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে লিখিয়াছি।—ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এক লেখককে লক্ষ্য করিয়া, জনৈক নীতিবেত্তা উপদেশচ্ছলে এই গল্পটি করিয়াছেন। গল্পটির মর্ম্ম এই:—এক ফরাসী লেখক বহু গ্রন্থ লিখিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। পরলোকে ঈশ্বরের কাছে তাঁহার পাপ পুণ্যের বিচার হইল। বিচারে লেখক মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইলেন। তাহার ফলে, উত্তপ্ত লৌহকটাহে উষ্ণ তৈলে তাঁহাকে নিক্ষিপ্ত করা হইল। লেখকের পার্শ্বে ঐরূপ তপ্ত তৈলে আর একটি জীবও দণ্ডভোগ করিতেছিল। সে,—দস্যু। কিন্তু তাহাকে বেশ শুষ্ক ইন্ধন সাহায্যে আগুন করিয়া তপ্ত তৈলে ভাজা হইতেছে। আর লেখক মহাশয়ের ভাগ্যে যত রাজ্যের কাঁচা কাঠ পড়িয়াছে। তাহার ফলে তিনি ধিকি ধিকি করিয়া, দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া সেই তপ্ত তৈলে পুড়িতেছেন। নিকটে রক্ষক দণ্ডায়মান। রক্ষককে দেখিয়া লেখক কাতর বচনে কহিলেন,

কথাটার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। তবে কথা এই, যাঁহারা লোক-শিক্ষকের পদে আসীন হইয়া, ক্ষুদ্র স্বার্থানুরোধে আপন কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বিস্মৃত হন, তাঁহারা দেশের উপকার করিবার ব্যপদেশে, ঘোর অপকার করিয়া থাকেন। অবশ্য ইঁহাদের অস্তিত্ব, সাহিত্য জগতে অধিক দিন থাকে না। সম সাময়িক পত্র-সম্পাদকের সুখ্যাতি বা অখ্যাতি পাইয়া, শীঘ্রই ইঁহারা অনন্ত কাল-বুদ্বুদে লীন হন। সেই যা আশার কথা।

পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি, "জগতের বুকে যে কথা লুকানো আছে, হৃদয়ের ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়া কবি আপনার জগৎ সৃষ্টি করেন।"—জগতের বুকে লুকানো আছে কি? ব্যথা, দুঃখ, অবসাদ, কান্না, মর্ম্ম-কাতরতা,—এই সব। কিন্তু ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন সুখের কোন ছবি কি জগতের বুকে নাই? আছে।—কিন্তু তাহার স্মৃতি বড় অস্পষ্ট, বড় ম্লান। সে ক্ষীণ সুখের আলোকে দুঃখের চিত্র আরও ঘনীভূত হয়। ঘোর নিশীথে, বিজন প্রান্তরে, আলেয়ার আলোর মত তাহা আরও ভীতিপ্রদ হইয়া থাকে। কাঁদিতেই মানুষের জন্ম, কাঁদিয়াই মানুষের শেষ। এই অনন্ত দুঃখ-পারাবারে সুখের যে একটি ধ্রুব-তারা দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা সেই ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমচ্ছায়া। সেই ছায়ার অন্য নাম ধর্ম্ম। প্রতিভাবান্ কবি প্রখর অন্তর্দৃষ্টিবলে, সেই ছায়ালোকে জীব ও জগৎ দেখিয়া লন এবং কাব্যচিত্রে তাহাই অঙ্কিত করেন। তিনি দেখিয়া লন, পুত্র-শোকাতুরা জননী ক্রন্দন করিতেছেন,—তাহাতে কি অপূর্ব্ব কাব্য ফুটিতেছে! দেখিয়া লন, সতী মৃতপতি কোলে লইয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছেন,—তাঁহার মুখে কি গভীর মর্ম্ম-যন্ত্রণা প্রকাশ পাইতেছে! দেখিয়া লন, নীরব নিশীথে, বিজন অরণ্যে, স্ফুটচন্দ্রালোকে নিরাশ-প্রাণ-প্রণয়িনী এক হস্তে লতাপাশ কণ্ঠে দিয়া অন্য হস্তে অশ্রুমোচন করিতে করিতে প্রেমের কি জীবন্ত অভিনয় করিতেছেন!

"বাপু, এ তোমাদের রাজ্যের কেমন বিচার! ঐ দস্যু সারা জীবন পরের কাড়িয়া খাইয়াছে; কত লোককে প্রাণে মারিয়াছে; আর আমি গ্রন্থকার,—কত কষ্টে কয়েক খানা বই লিখিয়া কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছি;—তা ওর আর আমার এক বিচার হইল! বাঁড়ার ভাগে ওকে বেশ শুক্‌নো জ্বালানি কাঠ দিয়ে জ্বাল দিবার ব্যবস্থা? হ'য়েছে, আর আমার ভাগ্যে রাজ্যের কাঁচা কাঠ!—কেবলই ধোঁয়া,—ধ'রে ধরে না। বাপু, তপ্ত তেলে ঝল্‌সে পুড়িয়ে ভেজে মার্‌বে, এতেও ইতর বিশেষ?" রক্ষক হাসিয়া উত্তর দিল—"গ্রন্থকার মহাশয়! এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হ'লে আর আপনি গ্রন্থকার হন? বলি, ও তো ডাকাত; ওর মানুষ-মারার ত একটা সংখ্যা আছে; কিন্তু আপনার কাণ্ডটা কি, ভাবুন দেখি? জীয়ন্তেও আপনি সহস্র সহস্র লোককে মারিয়াছেন, আবার মরণান্তেও আপনি সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ-বধের বীজ পৃথিবীতে রাখিয়া আসিয়াছেন!—আপনার কেতাবের জড় ত শীঘ্র মরিতেছে না!" শ্রোতৃবৃন্দ বুঝিবেন, তখন ফরাসী রাজ্যের অবস্থা কিরূপ ভীষণ! লোকের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; পরকালে আস্থা নাই; পাপ পুণ্যের ধারণা নাই;—উচ্ছৃঙ্খলতায়, অরাজকতায় ও যথেচ্ছাচারিতায় তখন দেশ পূর্ণ; ভোগসুখ ও ইহকাল লইয়াই ফরাসী তখন দিশাহারা। সেই ভীষণ ভয়াবহ সময়ের চিত্র,—সত্য ও অভ্রান্তভাবে প্রতিপন্ন করিয়া উক্ত লেখক মহাশয়, লোকের হৃদয়ের উপর প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাই বিধাতার বিধানে লোকান্তরে তাঁহার এই দুর্গতি।

দেখিয়া লন, অনন্ত-বিস্তৃতা স্রোতস্বতী কেমন কুলু কুলু রবে কাঁদিতে কাঁদিতে আপন মনে চলিয়াছে! দেখিয়া লন, দুর্ভিক্ষে অগণিত বুবুক্ষু নরনারী জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া, কেমন ধীরে ধীরে মাটীর দেহ মাটীতে মিশাইয়া রাখিতেছে! মানস-নয়নে এই সব দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, আর সেই কান্নার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি তাঁহার আলেখ্য সম্পূর্ণ করেন। লীলাময়ী প্রকৃতি নীরবে এই যে সব নিষ্ঠুর খেলা খেলিতেছে, কবি প্রতিনিয়তই তাহা মানসচক্ষে অবলোকন করিতেছেন,—আর কাব্যে ও সাহিত্যে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের সহানুভূতি আকর্ষণে সচেষ্ট হইতেছেন। অতএব দুঃখেই মনুষ্যত্বের বিকাশ, এবং এই মনুষ্যত্ব হইতেও সাহিত্যের উদ্ভব।

পক্ষান্তরে স্বর্গভ্রষ্ট সোণার শিশু সুধা-মাখা হাসি হাসিয়া জননীর কোল আলোকিত করিতেছে; শরতের চাঁদ জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশে ভাসিতে ভাসিতে, সুধা-কিরণ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছে; নব দম্পতী সুস্মিত বদনে পরস্পরের পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া কত আশা মনে মনে গড়িতেছেন;—কি সুখের দৃশ্য! কে বলে সংসার দুঃখময়? কিন্তু হায়! মুহূর্ত্তের অভিনয়, মুহূর্ত্তেই শেষ! অকস্মাৎ ও কি হইল? সহসা ঝড় উঠিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, সূচীভেদ্য ঘন অন্ধকারে আকাশ-মেদিনী এক হইয়া গেল, মুহুর্ম্মুহু বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল,—হায় হায়, ও কি হইল? দেখিতে দেখিতে চারিদিক্ প্রকম্পিত করিয়া আকাশের বজ্র নিম্নগামী হইল;—যে সুসজ্জিত কক্ষে, যে সুরম্য পালঙ্কে এই পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে উল্লসিত নবদম্পতী আশার স্বপ্ন বুকে লইয়া সংসারে নন্দনকাননের সৃষ্টি করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে দেখিতে হায়! সেই কাননের একটী ফুটন্ত ফুল বজ্রদগ্ধ হইয়া ঝলসিয়া পড়িল,—আর সেই সঙ্গে আর একটি অফুটন্ত বালিকা-জীবন চিরঅন্ধকারময় হইয়া গেল! আর ওদিকে, আর এক স্থানে, সেই যে সোণার শিশু, মায়ের অঞ্চল ধরিয়া আঙ্গিনায় নাচিতে নাচিতে অস্ফুট ভাষায় কত খেলাই খেলিতেছিল,—ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে, সে গিয়া কুটীরে উঠিল;—ঝড়ের প্রাণে বুঝি ইহা সহিল না, সে রাগিয়া—আরও গর্জ্জিয়া সেই কুটীরখানি ভূমিসাৎ করিয়া দিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, সেই মাকে জীবিত রাখিয়া, মায়ের জীবনের অধিক স্নেহের নিধিটীকে ছিনাইয়া লইল। অভাগিনী জননী শিহরিয়া দেখিলেন, এবং খণ্ড বংশ তাঁহার বুকের নিধির বুক ভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশে বাহির হইয়াছে! 'যাদু আমার!' বলিয়া জননী মূর্চ্ছিতা হইলেন, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না! অ-হ-হ! নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

কবি বলিতেছেন, "দেখ দেখি ভাই! আমি দুঃখের চিত্র অঙ্কিত করি বলিয়া তুমি অনুযোগ কর; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোন্ খান্‌টায় আছে বল দেখি? 'সুখ' বলিয়া লোকে যাহাকে গ্রহণ করে, প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহা সুখ নয়, তাহা দুঃখেরই আর একটা দিক্। সুখ পাইবার আশায় লোকে সুখের অভিনয় করে মাত্র; প্রকৃত সুখ পায় না। প্রকৃত সুখ সংসারে নাই। যদি থাকে, তো এক ভগবৎ প্রেমে, আর আত্মবিসর্জ্জনে। এই আত্ম বিসর্জ্জনেই মনুষ্যত্ব। আমি দুঃখের চিত্র দিয়া মনুষ্যত্বের

প্রচার করি। আমাকে না বুঝিয়া তুমি দোষ দাও!

"দেখ, অমন যে কুসুম, তাহাতে কীট আছে; অমন যে কমল, তাহাতে কণ্টক আছে; অমন যে চন্দ্র, তাহাতে কলঙ্ক আছে; অমন যে প্রণয়, তাহাতে বিচ্ছেদ আছে; আর অমন যে জীবন, তাহার পশ্চাতেও মৃত্যু আছে। এত সত্ত্বেও তুমি সংসারে সুখের আশা কর কি বলিয়া?"

এক হিসাবে এ সকল নিরাশা কাব্যের কথা। জগৎ দুঃখময়, জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই, মায়া নাই—মমতা নাই—দয়া নাই বিচার নাই। আমরা কেবল দুঃখ সহিবার জন্যই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি; যত দিন বাচিয়া থাকি, কেবল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করি, তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে চির বিদায় গ্রহণ করি। কোথায় যাই, কে বলিতে পারে? যদি জগদন্তর থাকে, তবে সেখানে ইহাপেক্ষাও যে দুঃখ নাই, কে বলিতে পারে? এইরূপ নিরাশার বাণী যে কাব্যের প্রাণ, তাহা নিরাশা কাব্য। আমি এমন কথা বলিতে পারি না যে, এই কাব্যকার যাহা বলেন, তাহা ঠিক নয়। তবে আমার বিরোধ এই, তিনি কেবল একটা দিক দেখিয়াই সৃষ্টি-রহস্য বুঝিতে চান। মানব সাধারণতঃ অবস্থা ও ঘটনার দাস; প্রতিকূল ঘটনার স্রোত মানুষকে প্রায়ই ভাসাইয়া লইয়া চলে; যদি কেহ সেই অবস্থায় সহানুভূতি করিয়া সান্ত্বনা দেয়, তবে মানব প্রাণ তাহারই দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়। এই জন্য নিরাশা কাব্যে জগতের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কা কিছু অধিক। প্রতিনিয়ত প্রতিকূল ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া মানব প্রাণ উন্মত্ত হয়। তখন দিগ্বিদিক হারাইয়া, মানুষ—হয় আত্মঘাতী হয়, নয় জীবন্মৃত হইয়া সংসারে অভিশপ্ত দেহ-ভার বহন করে! সুখের বিষয়, আমাদের কাব্যের উপাদান এরূপ নহে। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা কাব্যের মধ্যে যতই নিরাশার কথা আনিনা কেন, তথাপি সেই নিরাশার মধ্যেও আমরা সুখের চিত্র না দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইহা আমাদের অস্থি মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে শুভ্র ফেনরাশির উদ্ভব হয়, যেমন মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হইয়া মনোরম বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়—সেইরূপ নানা দুঃখ অশান্তির ভিতর দিয়া সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা কখনই ভগবানে বিশ্বাস হারাইতে পারি না। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, জীবনের এ হাহাকার,—হাহাকারেই পরিসমাপ্ত হইবে না, প্রাণের এ ক্রন্দন সেই সর্ব্বনিয়ন্তার চরণে স্থান পাইতেছে। দুর্দ্দিনের অবসানে, আবার আমরা আলোক দেখিতে পাইব!

এই আশার বাণী কেবল সান্ত্বনা মাত্র নহে। কোন্ হিন্দু ইহজীবনের সুখদুঃখে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন? কোন্ হিন্দু সর্ব্বকর্ম্মের ভিতরও কোন অদৃশ্য অথচ স্পষ্ট অনুভবনীয় কালের পানে না তাকাইয়া থাকেন? এই জন্য আমাদের কাব্যে, আমাদের সাহিত্যে, জগতের সার কথা আলোচিত হইয়া থাকে। অন্য দেশের কাব্য যতই উৎকর্ষ লাভ করুক, তাহা আমাদের আদর্শেই অগ্রসর হইতেছে মাত্র। তবে আমরা যে নিরাশা কাব্যের এতটা প্রশ্রয় আজকাল দিয়া থাকি, তাহার কারণ, আমরা এখন কিছু আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছি। হৃদয়ের

বিশ্বাস যেন হারাইয়াছি। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, আমরা কিছু আত্মপ্রিয়, সুখান্বেষী, ও ইহকাল সর্ব্বস্ব হইয়াছি! সুখান্বেষী হইয়াও সুখের আস্বাদ পাইতেছি না। তাই কাতর প্রাণে হাহাকার করিতে করিতে জীব-লীলা শেষ করিতেছি!

সুখ আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নহে, আত্ম-বিসর্জ্জনে। এ কথা অতি প্রাচীন। কিন্তু হায়, আজিও ইহা শিখিবার বিষয়! আমরা এখনই ইহ জীবনের সুখে এতই অন্ধ হইয়াছি যে, কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া সুখের মাত্রা ঠিক করিতে যত্নপর হই! কাব্যের উচ্চ আদর্শ সেই জন্য এখন নামিয়া অমূলতেছে, মনুষ্যত্বেও মানব সেই জন্য হীনবীর্য্য হইতেছে! তাই এখন এ দেশে নিরাশা কাব্যের আদরও ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে! আর্য্য সাহিত্যকারগণ বিবিধ দুঃখের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহার ভিতর দিয়াও সুখের একটু অনাবিল সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছেন। সে টুকু হিন্দু সাহিত্য ছাড়া, আর কোথাও বড় মিলিবে না। আশার মধুর বাণী শুনাইতে অদৃষ্টবাদ ও জন্মান্তরে বিশ্বাস রাখিতে, এমন কোন জাতি আর শুনায় নাই। এটী হিন্দুর নিজস্ব; এটি হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্মভাব। এই ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুকে সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে। অন্য দেশের কথা যাহাই হোক্, আমাদের এ দেশ যদি কখন আবার উঠে, তো সে এই ধর্ম্ম ভাবে। উঠিয়াছিলও এক দিন যাহা, তাহাও এই ধর্ম্মভাবে। সেই ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। সাহিত্য ও মনুষ্যত্বের ভিতর দিয়াই তাহা করিতে হইবে।

তবু বলি, কান্না ভাল। বুকের অনেক উত্তাপ, অনেক মলা, অনেক কালি ইহাতে ধুইয়া যায়। করুণতা জগতের প্রাণ, করুণ রস কবিরও সর্ব্বস্ব। তাই না সেই আদি কবি মহাকবির মুখনিঃসৃত করুণরসপূর্ণ "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং" ইতি শীর্ষক সেই আদি শ্লোক? মহাকবি মানসনেত্রে যেন মূর্ত্তিমতী করুণাকে দেখিয়া চরাচর বিশ্বের ক্রন্দনের সুর সম্যক উপলব্ধি করিয়া, হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে, যেন এই প্রথম কান্না কাঁদিলেন এবং তারপর সেই সুরে অপূর্ব্ব রামচরিত লিখিয়া, জগতকে মন্ত্রমুগ্ধ করিলেন!

"দেখ, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় জীবনের সেই প্রথম মুহূর্ত্তের সেই প্রথম কান্না, আর শেষদিনে বিদায়ের কালে সেই শেষ কান্না,—ভাল করিয়া ছকে মিলাইয়া দেখ, মধ্যকার ঘটনাগুলি যেন একটা দুর্জ্ঞেয় যাদুমন্ত্র! অথচ আবার একটু ভাল করিয়া দেখ, সেই একই সারিগান,—সেই একই কান্নার সুর,—সারাটা জীবন ব্যাপিয়া, তোমার হৃদয়ের উপর কি প্রবল আধিপত্য করিয়া গেল!

"সে দিন একখানা কাগজে পড়িতেছিলাম, একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন,—"মানুষ যে মরে, সে কেবল মরণ কামনা করে বলিয়া; মৃত্যুর ভাবনা ভাবে বলিয়া; নহিলে মানুষ অমর হইতে পারিত।" কথাটার আর কোন মূল্য না থাক্, ইহা ঠিক যে, মানুষ চিরদিন পুরাতন লইয়া থাকিতে ভালবাসে না; একঘেয়ে, একটানা জীবন ক্রমেই তাহার কাছে বড় বেশী ভারবহ বোধ হয়;—নূতন দেখিব, নূতন পাইব, মরণেই বুঝি সুখ, এই রকম একটা ভাবনা, বুঝি তাহার মনের মধ্যে কখন কখন উঁকি

ঝুকি মারিতে থাকে, আর সেই অবস্থায় সে তখন আপন মনে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে থাকে,—"কোথা তুমি হে জীব-জীবন! কোথা তুমি, হে নিখিল-নির্ভর! কোথা তুমি, হে মহাদর্শ! চিরদিন কি তোমায় আমায় প্রভেদ থাকিব? এ অভেদে প্রভেদ কি ঘুচিবে না? তোমার সহিত কি আমার মিলন হইবে না?"—এই রকম একটা কান্নার সুর, কখন জ্ঞাতসারে এবং কখন বা অজ্ঞাতসারে, মানুষের মর্ম্মস্থলে বাজিতে থাকে।—ইহাকে যা খুসী বলিতে ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু কথাটা খাঁটী।

"আর হাসি? যে হাসিতে সুধা ক্ষরে; যে হাসি দেখিয়া স্বর্গের কথা মনে পড়ে; যে হাসিতে অনাবিল, শুভ্র, শান্ত, পবিত্র হৃদয়-জ্যোতি ফুটিয়া উঠে; ভগবদ্ভক্ত পরম-প্রেমিক যে হাসির গুণে সেই রসরাজ, শ্রীরাসেশ্বর সচ্চিদানন্দের অপূর্ব্ব লীলা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুগ্ধ হন;—জীবন্মুক্ত পুরুষ যে হাসিতে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে একটা মায়ার খেলা ভাবিয়া, সদানন্দে জীবন অতিবাহিত করেন,—সেই স্বর্গীয় আসক্তিহীন হাস্য ও কি এই কবিতা হইতে উদ্ভূত নয়?" কিন্তু এ হাসি হাসিতে পারে কয়জন? কাজেই কবিকে মনুষ্য-প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাহার বুকের ব্যথা ও প্রাণের কথা টানিয়া বাহির করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসির কিরণ দেখাইয়া তৎপ্রতি তাহার প্রাণকেও আকৃষ্ট করিতে হয়।

বিজ্ঞানালোকে কবিতা লোপ পাইবে? একথা তুমি মনেও ঠাঁই দিও না! "এই অনন্ত জীবজন্তু-পরিপূরিত প্রাণি-জগৎ,—এই অসংখ্য নদ-নদী-সাগর-ভূধর-অরণ্যময় জল ও স্থল,—এই চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারাভরা উদার আকাশ,—এই অপূর্ব্ব শোভার ভাণ্ডার শস্যশ্যামলা মেদিনী,—এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,—যত দিন ইহার স্থিতি, ততদিন কবিতারও স্থিতি। ইহাও ছাড়িয়া দাও,—একবার ভাই, তোমার অন্তর্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,—তোমার অন্তর্নিহিত স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা,—পক্ষান্তরে শোক, বিরহ, মর্ম্মকাতরতা,—তোমার ধর্ম্ম, তোমার মনুষ্যত্ব,—কোন্ দিকে তুমি কবিতার হাত হইতে অব্যাহিত পাইবে? ভাবময়ী এই পৃথিবীতে বাস করিয়া, কখন সুখের উচ্চশিখরে উঠিয়া, কখন বা অবস্থান্তর অবনতির গহ্বরে লুটিয়া, ভাবময়ী কবিতার অস্তিত্ব লোপের কল্পনাও তুমি করিতে পার না!

"তারপর ধর,—তোমার সমাজ, বৈষয়িক ব্যবহার, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায় ইত্যাদি; বেশ কথা। কিন্তু ভাই! কবিতা ভিন্ন সর্ব্বাগ্রে কে তোমায় মানুষ করিবে? কে তোমায় দয়া, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার এহিাহন মন্ত্রে আহ্বান করিবে? এবং কেই বা তোমাকে প্রকৃত পুরুষসিংহের ন্যায় মহৎকার্য্যে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করিতে অগ্রসর হইবে? অগ্রে তুমিই যদি না মানুষ হইলে, ত তোমার সমাজ, ব্যবহার, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায়—টিকিবে কি প্রকারে? তাই বলি, ভাই! প্রকৃত কবিতাকে পূজা কর এবং সেই গৌরবে তুমি গৌরবান্বিত হও। ছন্দোময় সুরলয়ে-গাঁথা কেতাবী কবিতা না পড়,—তোমাকে মনে মনে সেই বিশ্বেশ্বরের বিশাল কার্য্য-কবিতার,—পরিদৃশ্যমান্ এই অনন্ত বিশ্বের মহিমা,—ধ্যান করিতেই হইবে। নহিলে, ভাই! তুমি মানুষই থাকিবে না,—দেবত্ব লাভ ত দূরের কথা!"

একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বিজ্ঞান ও কাব্যে বিশেষ বিরোধ নাই। আমরা স্থূল ভাবে যাহা দেখি, তাহাতেই বুঝি, উভয়ে যেন উভয়ের ছাড়া ছাড়ি। কবিই কেবল আদর্শ লইয়া থাকেন—আর বৈজ্ঞানিক জড় পদার্থ লইয়াই জীবন অতিবাহিত করেন। একথা কিন্তু ঠিক নহে।

কাব্যের উচ্চ আদর্শ প্রতিনিয়ত মানুষকে আহ্বান করিতেছে,—"এস তুমি, শ্রান্ত পথিক! জীবনের এ অনন্ত পথে, অনন্ত সুখ দুঃখ, তোমাকে লইয়া কত খেলাই খেলিতেছে,—এস এস, দেখ কি অমূল্য উপহার তোমার জন্য রাখিয়াছি। তুমি কি সংসারে তুচ্ছ সুখ দুঃখ লইয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে? এই দেখ, অনন্ত দুঃখ তোমার জন্য রাখিয়াছি,—এই দেখ অনন্ত সুখও তোমার জন্য রাখিয়াছি। অনন্ত কালের জন্য অনন্ত জীবন তুমি পাইয়াছ; অনন্ত সুখ দুঃখ ভিন্ন তুমি কি পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেহ? এই দুঃখ দেখিয়া শিহরিও না; এই সুখ দেখিয়া চঞ্চল হইও না। আত্মপর, ভেদাভেদ ভুলিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। ঈশ্বরে ভক্তি, মানবে প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি তিন মিলিয়া তোমার জীবন মধুময় করিবে, তখন তুমি প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে।"

এই ভাবে যিনি সাহিত্যের আলোচনা করেন, তিনিই প্রকৃত কবি। "তাঁহার সৃষ্টি,—সেই বিশ্বেশ্বরের সৃষ্টির অন্যতম অংশ। জগতের বুকে যে কথা লুকানো আছে, হৃদয়ের ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়া, কবি নিজেও কৃতার্থ হন, আর জগৎকেও কৃতার্থ করেন। সুতরাং কবিই, প্রকৃত লোক-শিক্ষক, এবং কবিতার অনুশীলনই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।"

এইরূপেই, সাহিত্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ, এবং মনুষ্যত্বে সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি! মানুষ যতদিন মানুষ থাকিবে, ততদিন সাহিত্যের সমাদর করিবে,—এবং সাহিত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত হইবে।

২২শে বৈশাখ। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত

বর্ণভেদ ও জাত্যন্তর পরিণাম।

বিগত প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে সৃষ্টিকাল হইতে মানবসমাজের কর্ম্মক্ষেত্র যেমন প্রসারিত হয়, অমনি তৎসঙ্গে লোকমণ্ডলী চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এ বিভাগ সেই লোকসমাজের অন্তর্নিহিত গুণানুসারে স্বভাবিক নিয়মে সংঘটিত হইতে থাকে। সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র সেই গুণ সকলের ক্রমশই স্ফূর্ত্তিসাধন করিতে থাকে। অবশেষে সমাজ চারিবিধ গুণবিশিষ্ট লোকে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এ বিভাগ একদিনে সম্পন্ন হয় না, কিন্তু তাহা সম্পন্ন করিতে এক যুগ লাগে। এক যুগ লাগিলেও তাহা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে একে একে সম্পন্ন হয়। কিরূপে একে একে সম্পন্ন হয়, তাহা আমরা দেখাইতেছি।

মহাভারত বলিয়াছেন, "সমুদায় জগৎ ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে।" মহাভারতের এই কথা পূর্ব্ব প্রস্তাবে আলোচিত হইয়াছে। একথা যদি সত্য হয়, তবে বল না কেন, "কর্ম্ম"ই বর্ণ-বিভাগের কারণ। এই "কর্ম্ম"

TORN PAGE(S).

যেমন নিজক্ষেত্র সংসারে প্রসারিত করিতে থাকে, অমনি তৎ সঙ্গে সঙ্গে লোকের অন্তর্নিহিত গুণ সকল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং লোকমণ্ডলী যতই সংসার-লীলায় রত হয়, ততই তাহারা সমাজ মধ্যে চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়ে। "কর্ম্ম"ই যদি বর্ণ-বিভাগের কারণ হইল, তবে যে গীতায় উক্ত হইয়াছেঃ—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

ভগবানের এই উক্তি কিরূপে সঙ্গত হয়? গীতা বলিয়াছেন,—চাতুর্ব্বর্ণ ভগবান্ কর্ত্তৃক সৃষ্ট,—একথা বলিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। একথার রহস্য কেবল বৈদিকতত্ত্বে প্রকাশিত।

আর্য্যশাস্ত্র কেবল যে আদি সৃষ্টিকেই সৃষ্টি বলিয়াছেন এমত নহে, অন্যবিধ সৃষ্টির নাম নিত্যসৃষ্টি। পুরাণ চতুর্ব্বিধ প্রলয় বর্ণন করিয়া সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন।

"প্রকৃতি হইতে যে মহদাদি প্রসূতি, তাহা প্রকৃতি সৃষ্টি, অবান্তর প্রলয়ের পর যে চরাচর সৃষ্টি, তাহা দৈনন্দিনী সৃষ্টি নামে কথিত। যাহাতে ভূতগণ অনুদিন জন্মায়, পুরাণার্থ-বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তাহাকে নিত্য সর্গ বলেন।" বিষ্ণুপুরাণ, ১ অংশ-৭ অধ্যায়

প্রতিপ্রলয়ের পর যে কল্পারম্ভ হয়, যাহা ব্রহ্মার দিবাভাগ নামে কথিত, তাহাই দৈনন্দিনী সৃষ্টি। এবং যে নৈসর্গিক ব্যাপার প্রতি জীবে প্রতিক্ষণে ঘটিতেছে, যদ্দ্বারা প্রতিজীবে প্রতিমুহূর্ত্তে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইতেছে, তাহা নিত্যসৃষ্টি। শুধু তাহা ই যে নিত্যসৃষ্টি এমত নহে। প্রতি জীবের জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, মৃত্যু, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু এ সমস্ত ঘটনাও সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।

"ভূতান্যনুদিনং যত্র জায়ন্তে মুনিসত্তম।
নিত্যঃ সর্গঃ স তু প্রোক্তঃ পুরাণার্থবিচক্ষণৈঃ॥"

"হে মানসত্তম, যাহাতে ভূতগণ অনুদিন জন্মায়, পুরাণার্থ-বিচক্ষণেরা তাহাকে নিত্য সর্গ (সৃষ্টি) বলেন।"

হিন্দুশাস্ত্রমতে চরাচর জীবের দ্বিবিধ শরীর—স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীর। স্থূল শরীরে যেমন অনুদিন, অনুদিন কি, অনুক্ষণ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, সূক্ষ্ম শরীরেও তাই। জীবের সূক্ষ্ম শরীর প্রতিদিন নূতন হইয়া সংগঠিত হইতেছে। সংগঠিত হইয়া কালে কালে নূতন জীবের উদ্ভব হইতেছে। আমি শৈশবে যাহা ছিলাম, তরুণকালে কি তাই? তরুণ কালে আমি নূতন হইয়া জন্মিয়াছি, আবার তরুণ বয়সে আমার যেরূপ প্রকৃতি ছিল, তাহা কি চিরদিনই একরকম ছিল, তাহার কি কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই? অবশ্যই তাহার সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এত পরিবর্ত্তন যে, আমি সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতির লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। যৌবনের পর প্রৌঢ়াবস্থা; প্রৌঢ়াবস্থায় আমার ইতাকৃতির পরিচয় পাইলে, তুমি আর আমাকে যৌবনকালের শ্যাম, রাম বলিয়া চিনিতে পারিবে না। আমি আর সে শ্যাম, রাম নাই, আমার প্রৌঢ়াবস্থায় আমি এক নূতন শ্যাম, রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছি। এ সমস্তই আমার সূক্ষ্মদেহের পরিবর্ত্তন ও সৃষ্টি। শেষে অন্তিমকালে মৃত্যুশয্যায় আমি যে অবস্থায় পরিণত হইয়াছি, হিন্দু শাস্ত্র বলেন, সেই দশাগ্রস্ত হইয়া আমার আবার নূতন শরীর হইবে। সেই নূতন স্থূল শরীর পরিগ্রহ কালে আমি এক নূতন জীব। আবার এই নূতন জীবের জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস ও মৃত্যু হইবে। এইরূপে জীবের জন্মজন্মান্তর ঘটিয়া আসিতেছে। যতদিন তাহার সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর থাকে, ততদিন তাহাকে স্থূল শরীর পরিগ্রহ করিয়া সংসারে যাতায়াত

করিতে হয়। তাহার সংসারযাত্রা কিছুতেই ঘোচে না। যতদিন দেহী কর্ম্ম করিবে, ততদিন তাহার লিঙ্গশরীর একরূপে না হয় অন্যরূপে সঞ্জাত হইবে। সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে জীব যেরূপ প্রবৃত্তিপরায়ণ হইবে, যেরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবে, তাহার তদ্রূপ অভ্যাস হইয়া আসিবে। এই অভ্যাস বশতঃ তাহার লিঙ্গদেহের প্রকৃতি সংগঠিত বা সৃষ্ট হইয়া আসিবে। মৃত্যুকালে স্থূল দেহের পতন হইলে এই লিঙ্গদেহই পরলোকগামী হইয়া নূতন দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

জীবের এই নূতন দেহ পরিগ্রহ কি নিয়মে সম্পন্ন হয়? তাহাতে কি জীবের কিছু হাত আছে? জীবশরীর যখন মৃত্যুমুখে আইসে, তখন তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। এই তমোগুণ যেমন স্থূল শরীরের ধ্বংস সাধক, লিঙ্গেরও তেমনি আবরক। সুতরাং মৃত্যুকালে লিঙ্গ যে অভিভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহাকে জড় প্রায় অবসন্ন করিয়া রাখে। নবদেহ ধারণ করিয়া লিঙ্গ তাই পূর্ব্বের মত অচেতন ও অবসন্ন অবস্থায় থাকে। এখন কথা এই, জীবের মৃত্যুর পর দেহীকে কে চালনা করে? চালনা করিয়া তাহাকে যথাস্থানে বিনিয়োগ পূর্ব্বক নবদেহ ধারণে সমর্থ করায়? এই স্থলে ভগবৎশক্তির হাত। ভগবৎশক্তি দ্বারা জীবের সূক্ষ্মশরীর উপযুক্ত স্থূল শরীরে আকৃষ্ট হইয়া তাহা সেই শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়। যে "রাগ-বিরাগ" দ্বারা ত্রিভুবন সৃষ্ট, সেই রাগবিরাগশক্তিই সূক্ষ্ম শরীরকে তদুপযোগী শরীরে আকর্ষণ করে এবং তদনুপযোগী শরীর হইতে পৃথক করিয়া দেয়। এই রাগবিরাগশক্তিই যে ভগবানের হস্তদ্বয়। ভগবানের শাক্তশরীর পঞ্চ মহাভূত নামক পঞ্চ দেবশক্তিতে সম্পন্ন। ভগবান সেইরূপ শক্তিতে সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বশক্তিমান।

জীবের এই লিঙ্গশরীরই পরলোকগামী। শাস্ত্র বলেন, দেহীর স্থূল শরীর পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকে এবং ক্রমশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহার লিঙ্গের বিনাশ নাই। এই সূক্ষ্মকায়া মৃত্যুকালে যেরূপ দশায় আসিয়াছে, তাহা তদনুরূপ নূতন জীবকায়া লাভ করে; লাভ করিয়া নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। এই লিঙ্গই নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া নিজ ফল ভোগ করিতে থাকে। নানা যোনি ভ্রমণ করিবার সময়ে তাহা নানা জীবসমাজে নিজ লীলায় অনুরক্ত হয়। এই লিঙ্গের কর্ম্মফল ভোগ জন্য আমরা ইহলোকে এত প্রকার জীবসৃষ্টি দেখি। কর্ম্মফল নানাবিধ হওয়াতে জীবসৃষ্টির এত বৈচিত্র্য হইয়াছে। সুতরাং যাহাকে আমরা ইহলোক বলি, তাহা লিঙ্গশরীরের পরলোক। ইহলোক, পরলোক এইরূপ নিয়তই বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা আমার ইহজন্ম, তাহা পূর্ব্ব জন্মের পরলোক। এসমস্ত কথার প্রমাণ—যোগিদিগের আত্মপ্রত্যক্ষ।

আমরা শাস্ত্রাবলম্বন করিয়া জীবের কর্ম্মফল ভোগার্থ তাহার যোনিভ্রমণে আসিয়াছি। এই যোনিভ্রমণে জীবের কর্ম্মফল ভোগ হইলে সে আবার পূর্ব্বকায়া ধারণ পূর্ব্বক নূতন মনুষ্যদেহে সমাগত হয়। মনুষ্য দেহে সমাগত হইলে যে লিঙ্গ শূদ্রোচিত গুণযুক্ত, তাহা শূদ্রশরীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়, যে বৈশ্যোচিত, সে বৈশ্যদেহে, যে ক্ষত্রিয়োচিত, সে ক্ষত্রিয় দেহে এবং যে ব্রাহ্মণোচিত, সে ব্রাহ্মণদেহে আসিয়া জন্মলাভ করে। কি ব্রাহ্মণকুল, কি ক্ষত্রিয়কুল, কি

বৈশ্যকুল, কি শূদ্রকুল, সমস্ত কুলই এইরূপ জন্মমৃত্যু দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শুধু যে গুণ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয় এমত নহে, ভগবান তাহা জন্ম দ্বারাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাই ভগবান পতঞ্জলি মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন :—

"সর্ব্বে এতে শব্দাঃ গুণসমুদায়েষু বর্ত্তন্তে, ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্র ইতি আতশ্চ গুণ সমুদায়ে। এবং হ্যাহ—'তপঃ শ্রুতঞ্চ যোণিশ্চ এতদ্ ব্রাহ্মণ কারণম্। তপঃ শ্রুতাভ্যাং যোহীনো জাতি ব্রাহ্মণ এব সঃ।"

ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় অর্থ করেনঃ—

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই শব্দ গুলি কতিপয় গুণসমষ্টির বাচক। এই কথা বলিয়াছেন * তপঃ (ব্রহ্মচর্য্য ব্রত) শ্রুত (বেদাধ্যয়ন) এবং যোনি বলিতে বীজ ও ক্ষেত্র (পিতা ও মাতার ব্রহ্মকুলে জন্ম)—এই গুণ সমুদায় ব্রাহ্মণবর্ণতাকে প্রাপ্ত করায়।"

অতএব, ব্রাহ্মণকুলে, ক্ষত্রিয়কুলে, বৈশ্যকুলে এবং শূদ্রকুলে জন্মলাভ না করিতে পারিলে সেই সেই বর্ণধর্ম্মাক্রান্ত হওয়া যায় না।

আর্য্যশাস্ত্রের মীমাংসা এই। আর্য্যশাস্ত্র বলিতেছেন, যাহার লিঙ্গ মৃত্যুকালে ঠিক যে কুলোচিত হইয়াছে, জন্মকালে তাহার সেই কুলে জন্ম হয়। জন্ম মৃত্যুর এই সাধারণ নিয়ম। এ নিয়ম শুদ্ধ হিন্দুসমাজে খাটে, এমত নহে, সর্ব্বসমাজেই এই নিয়ম। সর্ব্বসমাজেই বিশ্ববিধাতা এই নিয়মে সর্ব্বজীবের জাত্যন্তর পরিণাম সাধন করিতেছেন। তুমি জোর করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হইতে পার না। ঠিক তুমি কোন্ কুলোচিত, মৃত্যু ও জন্মকালে ভগবান্ তাহা অবধারিত করিয়া দেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র লইয়া সর্ব্ববিধ মনুষ্যসমাজ গঠিত। সকল সমাজে তাহাদের নামকরণ সমান না হউক; যা বলিয়া হউক, তাহাদের নামকরণ কর, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু গুণ ধরিয়া তাহারা সর্ব্বসমাজেই বিদ্যমান আছে। শুদ্ধ গুণ নয়, ভগবান প্রতি সমাজেই যে যেমন ধর্ম্মীয় জীব, তাহাকে তজ্জাতীয় কুলে জন্মনির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যাঁহার জন্ম যেরূপ, তিনি সেই রূপ জ্ঞাত বলিয়া জন্মই জাতি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। হিন্দু সমাজে তাই জন্মানুসারে "জাতি ভেদ" প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অন্য সমাজে সেরূপ প্রথা না থাকিলেও সমাজ মধ্যে সজাতীয় ধর্ম্ম বিশিষ্ট লোকমণ্ডলীর অভাব নাই। ভগবানের এই মাত্র নিয়ম যে, সজাতীয়ের সহিত সজাতীয় আকৃষ্ট হইবে। এই নিয়মে চালিত হইয়া সমস্ত জীবসংঘই জন্ম পরিগ্রহ করে। সুতরাং হিন্দুসমাজের মত অপরাপর মনুষ্য সমাজে বাহ্য "জাতিভেদ" প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও ভগবানের নিকট সে জাতিভেদ সম্পূর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে। যে, যে জাতীয় লোক, ভগবানের নিকট তাহা অবিদিত নাই; সুতরাং ভগবান্ তাহার ঔরসে বা গর্ভে সমজাতীয় জীবের সঞ্চার করিয়া দেন। সে জীব সমজাতীয় পিতা মাতা লাভ করিয়া নিজ প্রকৃতির অনুরূপই লালিত পালিত এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকেন। এই "জাতিভেদ" এজন্য ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে— কর্ম্মবিভাগানু-

* মহর্ষি পতঞ্জলি বলিলেন "এই কথা বলিয়াছেন।"—"এবং হ্যাহ" অতএব তাঁহার ন্যায় মহর্ষি যখন নাম করিয়া বলিলেন না কে বলিয়াছেন তখন অবশ্য বুঝিতে হইবে, এবাক্য তাঁহার অবগত শ্রুতি বাক্য।

সারে ভগবান কর্ত্তৃক চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে।

অতএব, যে জীবলিঙ্গ যে জাতীয় বা যে বর্ণোপযুক্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট, মৃত্যুর পর তাহার তদনুরূপ "জাত্যন্তর" পরিণাম হয়। এইরূপ জাত্যন্তর পরিণাম হয় বলিয়া মনুষ্যসমাজের শৈশবকালে বা সত্যযুগে সেই সমাজস্থ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ বিশেষ জাত্যন্তর পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া বর্ণবিভেদ কার্য্যের সহায়তা করিয়া দিয়াছিলেন। যে ব্যক্তির লিঙ্গ যে বিশেষ প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল; তাহার তদনুরূপ জন্মলাভ হইয়াছিল। সে জীব তদনুরূপ জন্মলাভ করাতে তাহার বিশেষ ভাবের ক্রমশই বৃদ্ধি হইয়াছিল। এইরূপে শিশুসমাজের বর্ণভেদ উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়াছিল। এককালে যে ভেদ অস্পষ্ট ছিল, তৎপরবর্ত্তী কালে, তাহার কথঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তিসাধন হইয়াছিল। আবার তৎপরবর্ত্তী কালে সেই ভেদরেখা আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছিল। লোকের যেমন জন্ম জন্মান্তর লাভ হইয়াছে, যেমন বংশপরম্পরা বাড়িয়া আসিয়াছে, অমনি তাহারা সমজাতীয় কুলে জন্মলাভ করিয়াছে, জন্মলাভ করিয়া আরও বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য জীবের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি সঞ্জাত হওয়াতে শিশুসমাজে বর্ণভেদ ঘটিতে অধিক কাল অতিবাহিত হয় নাই। ত্রেতাযুগে এই চতুর্ব্বর্ণ সম্পূর্ণরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছিল।

হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রে 'জাত্যন্তর' পরিণামের কথা অতি পরিষ্কৃতরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই 'জাত্যন্তর' পরিণাম বিশ্বের এক বৃহৎ নৈসর্গিক ব্যাপার। এই জাত্যন্তর পরিণামই হিন্দুশাস্ত্রোপদিষ্ট "জন্মান্তরবাদের" মূল নিয়ম। এই নৈসর্গিক ব্যাপারে জগতের জীববৈচিত্র্য সাধিত হইতেছে। জগতে আমরা যে অসংখ্য জীব দেখিতেছি, তাহারা সমুদায় এই জাত্যন্তর পরিণামের ফল। এই জাত্যন্তর পরিণামই জাতি হইতে ব্যক্তির সৃষ্টি করিতেছে,—অনুদিন সৃষ্টি করিতেছে। জীব সকল এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে জন্মজন্মান্তরে পরিণত হইতেছে। মনুষ্য শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, শৃগাল আবার মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছে। একই মনুষ্য নানা জীবজাতিতে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া আবার মনুষ্যলোকে আসিয়া উপনীত হইতেছে। কখন হইতেছে? যখন তাহার কর্ম্মফল ভোগ শেষ হইয়াছে।

তাই আমরা বেদে দেখিতে পাই, জৈবসৃষ্টির সর্ব্বশেষে মনুষ্য জাতির উৎপত্তি। অগ্রে যে জীবজাতি সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারাই মনুষ্যজাতির পরিণাম—পূর্ব্ব কল্পের পরিণাম। পূর্ব্ব কল্পে যে সকল মনুষ্যেতর জীবজাতি ছিল, তাহাদের সৃষ্টি হইয়া গেলে মনুষ্যজাতি তাহাদেরই "জাত্যন্তর" পরিণামে আবার সমুদ্ভূত হইয়াছিল। এক এক জীবজাতি তদেতর জাতির পরিণাম। তাহাতেই সমস্ত তির্য্যগযোনির সৃষ্টি। বেদ উপদেশ করিয়াছেন, তির্য্যগযোনির সৃষ্টির পর মনুষ্যের উৎপত্তি। ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী সরস্বতী মহাশয় ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তের পঞ্চম মন্ত্রের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

"সেই আদি পুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ড হইল। সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকেই অধিকরণ করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড শরীরাভিমানী কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। তিনি জন্মিয়া দেব তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি বিবিধরূপ জীবভাব প্রাপ্ত হইলেন।" ইত্যাদি

সৃষ্টিতত্ত্বে ব্যক্ত হইয়াছে যে, এই অনি-

TORN PAGE(S).

র্ব্বচনীয় পুরুষই ব্রহ্মা। ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শাক্ত শরীরই জীবসমূহের সমষ্টি শরীরের বীজ-শরীর। এই বীজ শরীরেই সৃষ্টিবিকাশে প্রথমে দেবশক্তি সকল সমুদ্ভূত হইয়াছিল, পরে তির্য্যক্ শরীরের আবির্ভাব এবং তৎপরে মনুষ্যজাতির উদ্ভব হইয়াছিল।

তবে যে, ঐতরেয় শ্রুতি বলিয়াছেন, অগ্রে একমাত্র পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাঁহাকে দেখিয়াই দেবগণ বলিয়া উঠিয়াছিলেন, এই পুরুষই অতি সুন্দর ও সুনির্ম্মিত, একথা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

বেদ বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, এবং পাদদেশ হইতে শূদ্র হইল।' কি অর্থে তবে বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে? তাহাদের অর্থ একটী মাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র নহে, তাহাদের অর্থ, ব্রাহ্মণ্য বা ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট, ক্ষত্রিয়ত্ব বা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাক্রান্ত, বৈশ্যত্ব বা বৈশ্য-গুণসম্পন্ন এবং শূদ্রত্ব বা শূদ্রধর্ম্মীয় জনগণ। বেদ অতি সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ করেন। সেই সূক্ষ্ম হইতে স্থূলার্থ সংগৃহীত হয়। যে বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বৈদিক ব্যাকরণ, এই অর্থ সেই ব্যাকরণ সঙ্গত। সামাধ্যায়ী মহাশয়ও সেইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারিটি শব্দ এখানে ধর্ম্মপর (অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মণ্যদেব, ক্ষত্রিয়ত্ব বা নরদেব, বৈশ্যত্ব বা আর্য্যদেব, শূদ্রত্ব বা দাসদেব) ধর্ম্মিপর নহে।"

যে অর্থে শ্রুতিতে এই ব্রাহ্মণাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থেই উক্ত "পুরুষ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরুষত্ব সম্ভূত হইলেই পুরুষ ধর্ম্মীয় নরনারী সম্ভূত হইতে আর বাকী থাকে না। এবং নরনারিত্বের সৃষ্টি হইলে আর নরনারী জাতীয় ব্যক্তি-পুঞ্জের অভাব হয় না।

তবেই "জাত্যন্তর" পরিণাম-প্রণালীক্রমে তির্য্যগযোনি হইতে যেরূপে মনুষ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা এখন বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। এক্ষণে কথা এই, সেই মনুষ্যজাতির মধ্যে এত ব্যক্তি মনুষ্য কিরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল। এই "জাত্যন্তর" প্রণালী ক্রমেই প্রতি মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব ঘটে।

মানব সমাজ পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীত হয়, কোন দুইটী লোক ঠিক এক সমান নহে। তাহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিতে পারে—বর্ণগত, জাতিগত, প্রকৃতিগত, আকারগত, ধর্ম্মগত, প্রবৃত্তিগত সাদৃশ্য থাকিতে পারে; দুই জনের রূপ এক প্রকার, প্রকৃতি এক প্রকার, আচার ব্যবহার এক প্রকার, চরিত্র এক প্রকার, সবই এক প্রকার হইতে পারে, কিন্তু সাদৃশ্য সেই পর্য্যন্তই শেষ। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষায় পরিদৃষ্ট হয়, সেই দুই জনের মধ্যে আবার ভিন্নতা আকাশ-পাতাল বিশেষ। সকলই এক প্রকার বটে; কিন্তু কিছুই এক নহে। একত্ব কেবল প্রতি ব্যক্তির বিশেষ ভাব। এই ব্যক্তিগত একত্ব প্রতিব্যক্তির বিভিন্ন প্রবৃত্তি, রুচি ও প্রকৃতি হইতে জন্মে। পাঁচ সহোদর একই প্রকার বটে, কিন্তু এক সহোদর হইতে অন্য সহোদরে অনেক প্রভেদ। সে ভিন্নতা তাহাদের বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তি ও স্বভাব জনিত। সেই বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তি, ও স্বভাব ইহজন্মে যেরূপে পরিণত হইতেছে, তদনুযায়ী তাহার সূক্ষ্মশরীর সৃষ্ট হইতেছে। তাহার সূক্ষ্মশরীর যেরূপ সৃষ্ট হইতেছে, তদনুসারে তাহার ব্যক্তিত্ব

জন্মিতেছে। প্রতি জীবের এই সূক্ষ্মদেহ স্বতন্ত্র বলিয়া, তাহার ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র। এই ব্যক্তিত্ব অনুসারে প্রতি জীবের মৃত্যুর পর যখন জাত্যন্তর পরিণাম হয়, তখন তাহার সেই ব্যক্তিত্ব অনুসারেই দেহলাভ হয়। সহোদরে, সহোদরে এই রূপ ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়া তাহাদের আকার প্রকার এবং প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিলেও সেই আকার প্রকার এবং প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইয়া সমাজের কিছু যমকের মধ্যেও এই স্বাতন্ত্র্য [illegible]ত হয়। এই স্বাতন্ত্র্য [illegible] ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়া যমকেরাও স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়া পড়িয়াছে। দুই জনের লিঙ্গদেহ পূর্ব্বজন্মে যেরূপে বিভিন্ন হইয়া গঠিত হইয়াছিল, পরজন্মে সেইরূপ ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াছে।

প্রকৃতি এইরূপ ব্যক্তি জীবের সৃষ্টি করে বলিয়া আদি সৃষ্টিকালে একই মনুষ্য-জাতি হইতে "বর্ণ"-গত বিভেদ সহজেই ঘটিয়া গিয়াছে। জাতিগত বিভিন্নতা ক্রমশই ব্যক্তিগত বিভিন্নতায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তাহাতেই আদি সমাজের লোকমণ্ডলীর গুণসাদৃশ্য ক্রমশ পৃথকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। গুণগত সাদৃশ্য হেতু যে মানবজাতি প্রথমে একই বর্ণভুক্ত ছিল, তাহারা ক্রমে দুই বর্ণভুক্ত,—এক বর্ণ আর্য্য, অন্য বর্ণ অনার্য্য। ক্রমে আর্য্যগণ মধ্যে চারিবর্ণের উৎপত্তি। ভারতে যাহা ঘটিয়াছিল, প্রাচীন সর্ব্ব মনুষ্যসমাজেও ঠিক তাহাই ঘটিয়া প্রতি সমাজেই চারি বর্ণের লোক-বিভাগ দেখা দিয়াছিল।

এই ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিভেদের সৃষ্টি করে কে?—কর্ম্ম। কর্ম্মই লিঙ্গদেহের সৃষ্টিকর্ত্তা; লিঙ্গদেহভেদই ব্যক্তিভেদের কারণ। সুতরাং কর্ম্মই ব্যক্তিভেদ করিয়া দেয়। প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে আমি যেরূপ কর্ম্মপথ অবলম্বন করিব, সেই অভ্যাস বশতঃ আমার লিঙ্গশরীর তদ্রূপই তৈয়ারি হইয়া আসিবে এবং আমার মানসশরীর যেরূপ তৈয়ারি হইয়া আসিবে, আমার ব্যক্তিত্ব তদ্রূপ হইবে। এ নিয়ম সর্ব্ব মনুষ্যেই প্রতিপালিত হইতেছে। সুতরাং সর্ব্ব মনুষ্যসমাজ এই কর্ম্মবন্ধের বন্ধতায় আবদ্ধ রহিয়াছে। ব্যক্তিত্ব অনুসারে যদি জাত্যন্তর পরিণাম হয়, তবে সর্ব্ব মনুষ্য সমাজেই জাত্যন্তর পরিণাম হইতেছে।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই কর্ম্মই বর্ণভেদের কারণ। এক্ষণে দেখা গেল, এই কর্ম্ম আবার ব্যক্তিভেদের কারণ। সুতরাং এই কর্ম্মবিভাগের যতই বৃদ্ধি হইয়াছে, ততই আবার প্রতি বর্ণ মধ্যে নানা উপবিভাগ হইয়া গিয়াছে। এই উপবিভাগ সমস্তই হিন্দু সমাজস্থ "জাতিভেদের কারণ। এই "জাতিভেদ" বর্ণভেদের পরে হয়। যে জাতিভেদ আদি সৃষ্টি কালে বর্ণভেদের পূর্ব্বে হয় এবং যদ্বারা মনুষ্য-জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, সেই জাতিভেদ যেমন ঈশ্বর সৃষ্ট ও স্বাভাবিক ব্যাপার, বর্ণভেদের পরে যে জাতিভেদ হয়, যাহা হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে, সে জাতিভেদও তদ্রূপ ঈশ্বরসৃষ্ট এবং স্বাভাবিক ব্যাপার। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, স্বাভাবিক বর্ণভেদ প্রতি মনুষ্য সমাজে বিদ্যমান, সে সমাজ আর্য্য হউক, অনার্য্য হউক; বন্য হউক, সুসভ্য হউক; সর্ব্বসমাজেই সেই সমাজের অবস্থানুসারে ভাল মন্দ লোক সাত্ত্বিকগুণ বিশিষ্ট এবং অসাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন লোক, ঘোর প্রবৃত্তির দাস এবং প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারে, এমন লোক আছে।

সেই ভালমন্দের মধ্যে আবার ইতর বিশেষ আছে। খুব ভাল লোক আছে, খুব মন্দ লোক আছে; আবার তাহাদের মধ্যাবস্থ লোকও আছে। গুণানুসারে প্রতি সমাজেই লোকবিভাগ আছে। এই গুণানুসারে যে লোকবিভাগ, তাহাকেই বর্ণভেদ বলা যাইতে পারে। আবার সেই গুণানুসারে সমজাতীয় বিভাগেরও নানা উপবিভাগ আছে। এই উপবিভাগ সকল কর্ম্মবিভাগ হেতু উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দু-দার্শনিক বলেন, শুধু গুণ নহে, শুধু কর্ম্ম নহে, নৈসর্গিক "জাত্যন্তর" পরিণাম এই বিভাগদ্বয়কে প্রধানতঃ সৃষ্টি করিয়াছে।

"জাত্যন্তর" পরিণাম এইরূপ স্বভাবিক ব্যাপার এবং ভগবানের হস্তে ন্যস্ত আছে বলিয়া হিন্দুসমাজ তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করে না। যাহা ঈশ্বরের হাতে, সামান্য মনুষ্য তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে কেন? যে সমাজ জানে না যে, জাতিভেদ ভগবান কর্ত্তৃক সৃষ্ট, সেই সমাজেই বাহ্য জাতিভেদ প্রথার প্রচলন নাই *। না থাকিলে কি হইবে, সে সমাজের অন্তরে জাতিভেদ বিলক্ষণ প্রবর্ত্তিত আছে। কোন সমাজেই উচ্চকুলের লোক, নীচকুলের সহিত কোন রূপে মিশে না। না ভক্ষ্যভোজ্যে মিশে, না আচার ব্যবহারে মিশে, না বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে মিশে। সর্ব্ব সমাজেই উচ্চকুলের সহিত নীচকুলের আকাশ পাতাল প্রভেদ। মধ্যবর্ত্তী কুল সকলও সেই নিয়মে চলে। নিজ নিজ থাক মধ্যেই ক্রিয়া-কলাপ অধিকাংশ চলে। দুই একটা যাহা এই নিয়ম ব্যতিক্রম করে, তাহা সাধারণ নিয়মের নিপাতন মাত্র। নিয়মের নিপাতন ধর্ত্তব্য নহে। তাহা সাধারণ নিয়মকেই সমর্থন করে। যাহারা এই নিপাতনগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিরুদ্ধমতের সিদ্ধান্ত করিতে যান, তাঁহারা সাধারণ নিয়মের অজ্ঞতারই পরিচয় দেন। ব্যভিচার নিয়ম নহে; তাহা নিয়মের ব্যভিচার মাত্র।

এই জাত্যন্তর পরিণাম পর্য্যালোচনা করিয়াছিল। যে সকল লোকের সহিত সকল লোকের বীজগত পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য সহজে অপনীত হইবার নহে। সেই পার্থক্য বশত প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। অবশ্য সৎকর্ম্ম, সাধু ব্যবহার, এবং সুশিক্ষা দ্বারা এই বীজগত পার্থক্য অনেক পরিমাণে সংশোধিত এবং অপনীত হইতে পারে। একজন শূদ্র অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারেন। তদ্রূপ উৎকর্ষ লাভ করিবার পন্থাও হিন্দুর বর্ণাশ্রম নিয়মে নির্দ্দিষ্ট আছে। হিন্দুসমাজে যেমন কর্ম্মগত জাতিভেদ আছে, যেমন গুণগত বর্ণভেদ আছে, তেমনি আবার এমত শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত আছে—বর্ণাশ্রমনিয়ম যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে—যদ্দ্বারা একজন ব্রাহ্মণেতর জাতীয় লোক অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারেন। তবে কেন, হিন্দুসমাজ তাহাকে ব্রাহ্মণকুলান্তর্গত করিতে পরাঙ্মুখ? হিন্দুসমাজ যেমন একজন শূদ্রকে ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিবে না, তেমনি একজন ব্রাহ্মণকেও শূদ্রত্বে নামাইবে না। তাহার কারণ এই, প্রতি বর্ণবিভাগ মধ্যে অনেক জাতিবিভাগ আছে। একজন শূদ্র অনেক দূর ব্রাহ্মণ্য লাভে সমর্থ হইতে পারে, কিন্তু সে ঠিক কোন্ জাতি মধ্যে প্রবেশ করিবে, তাহা অবধারণ করা মানুষের

* এই বৈদিক জ্ঞান কেবল হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে।

সাধ্যাতীত। শূদ্রের শূদ্রত্ব হাড়ে হাড়ে সংবিদ্ধ,—জন্মাবচ্ছিন্ন অদৃষ্টবশত সে শূদ্র;—শূদ্রশ্রেণীর যোগ্য বলিয়া সে শূদ্র জাতি মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে প্রারব্ধ লইয়া সে শূদ্রকুলে জন্মলাভ করিয়াছে, সে প্রারব্ধ ও দৈব পুরুষকারে কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা কি সহজ কথা? সে শূদ্র মুক্তিপথে গিয়া জাতির বাহিরে থাকুক, তাহা সমাজের কিছু ক্ষতি নাই। মুক্তির পথ তাহার জন্য খোলা রহিয়াছে। একজন ব্রাহ্মণ যেমন ধর্ম্মপথের পথিক হইতে পারে, একজন শূদ্র তদ্রূপই হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত, তিন আশ্রম-নিয়মই শূদ্র অবলম্বন করিয়া ভক্তি-পথে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া কি চতুর্ব্বর্গের ফল, কি সালোক্য বা স্বর্গ, কি সামীপ্য বা দেবোপমত্ব, কি স্বারূপ্য বা দেবত্ব লাভ করিতে পারেন, কিন্তু কিন্তু তিনি সংসর্গ দোষে কোন জাতিকুল নষ্ট এবং অপবিত্র করিতে পারেন না। কেন না, তিনি কোন্ জাতিকুলের ঠিক যোগ্য, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। যে যোগ্যতা কেবল ঈশ্বর জানেন। আজি যদি একজন শূদ্রের মৃত্যু হয়, আজই তাহার যোগ্যতা অনুসারে পরলোকে যথাস্থানে তাহার গতি হইবে। হিন্দুসমাজ সাধুকে যথোচিত পূজা করিবে, তাহাকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া তাহার পাদসেবায় প্রবৃত্ত হইবে, কিন্তু জাতি মধ্যে তাহাকে প্রবিষ্ট হইতে দিবে না। কারণ, সাধু যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহা জাতি নিয়মের বহির্ভূত। যদি সে জাতি নিয়মের বহির্ভূত না হইতে পারে, তবে সে সাধু কিসে? সাধুত্বের লক্ষণ ও পরীক্ষাই তাই। এই জন্য মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেঃ—

"অনার্য্যমার্য্য কর্ম্মাণমার্য্যঞ্চানার্য্য কর্ম্মিণম্।
সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি॥"

মনুসংহিতা। ১০ম—৭৩।

"ব্রহ্মা সবিশেষ ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন যে, দ্বিজাতির কর্ম্ম করিলে দ্বিজাতি হয় না এবং দ্বিজাতি শূদ্রের (একজাতি) কর্ম্ম করিলে শূদ্র হয় না; যে হেতু শূদ্র ও ব্রাহ্মণ ইহারা পরস্পরের বিপরীত কর্ম্ম করিয়া পরস্পর সমান হইতে পারে না, অন্যপক্ষে ইহারা যে পরস্পর অসমান বা জাত্যন্তর, তাহাও নহে।"

ভগবান্ মনূক্তি এই। তিনি বলিয়াছেন, ইহলোকে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে পারেন না, এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। কেন হইতে পারে না, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই অসাম্য নীতি ব্যক্ত করিয়া ভগবান পরেই সাম্য নীতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একবার বলিলেন, "সম' নয়, তৎপরে বলিলেন, "অসম"ও নয়। "সম" নয় কেন, তাহা বলা হইয়াছে, "অসম" নয় কেন, তাহাই বক্তব্য। হিন্দুশাস্ত্রে, কি সাম্যনীতি কি অসাম্যনীতি, উভয়ই বিদ্যমান। ব্যক্তি বিশেষের সহিত ব্যক্তি বিশেষ সমান নহে এবং অনেকাংশে সমানও বটে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, সর্ব্বজীবেই ভগবান বর্ত্তমান। সর্ব্বলোকেই যেমন পশুত্ব বিদ্যমান, তেমনি দেবত্ব বিদ্যমান। পশুত্ব সর্ব্ব লোককে অবনত করিয়া দেয়, কিন্তু দেবত্ব সকলকে উচ্চে তুলিয়া লয়। এই পশুত্ব এবং দেবত্বের অনুসারে মনুষ্যের সহিত মানুষ সমান এবং অসমান। যে মনুষ্যে এই দেবত্বের যত স্ফূর্ত্তি হইবে, তিনি ততদূর দেবোপম হইতে পারিবেন। এই দেবত্বের স্ফূর্ত্তিতে ক্রমশঃ মানব সামীপ্যমুক্তি লাভ

করিতে পারেন—ক্রমে তিনি ঈশ্বরের সমীপস্থ হইতে পারেন। তাঁহার সামীপ্য হইলে তবে তিনি স্বারূপ্য মুক্তির অধিকারী হয়েন। এই দেবত্বের এক এক স্তরে আসিয়া মানবগণ সাম্য লাভ করেন। সে সাম্য কিসে হয়? সে সাম্য কেবল তপস্যায় সাধ্য। যে সকল লোকে একরূপ দেবভাব বিদ্যমান, তাঁহারা সমান। আবার সে সকল লোকে একরূপ পশুত্ব বিদ্যমান, তাহারাও সমান। এই দেবভারই মানুষকে মানুষ করিয়া তুলে,—মানুষকে মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি সাধন করে। প্রথমে নরাকার পশু মানুষ হয়, তৎপরে দেবতা হয়। কেবল সংযম ও আত্মশুদ্ধিতে এই তপস্যা সিদ্ধ হয়,—শূদ্র ব্রাহ্মণ্য লাভ করে।

শূদ্রকে মনু একজাতি বলিয়াছেন, অপর ত্রিবর্ণ দ্বিজাতি। অপর বর্ণত্রয়ের দুইবার জন্ম হয়—একবার স্থূলশরীর পরিগ্রহ, আর একবার ধর্ম্মশরীর পরিগ্রহ। কিরূপে শূদ্রও এই দ্বিতীয় প্রকার শরীর গ্রহণ করিতে পারেন? করিয়া দ্বিজত্ব লাভ করিতে পারেন? কিরূপে দ্বিজাতির সহিত শূদ্র সমান হইতে পারেন? ধর্ম্মশরীর পরিগ্রহ করিয়া। এই ধর্ম্মশরীর আভ্যন্তরিক বিষয়। কে ইহলোকে কিরূপ ধর্ম্মশরীর লাভ করিয়া দ্বিজাতির সহিত সাম্যলাভ করিয়াছেন, ভগবান পরজন্মে তাহা অবধারণ করিয়া দেন। শূদ্রের জাত্যন্তর পরিণাম হয়। শূদ্র একজাতি হইতে দ্বিজাতিত্বলাভ করেন। তদ্রূপ বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণও পরজন্মে শূদ্রত্ব লাভ বা ক্রমাবনতি লাভ করেন। জন্মজন্মান্তরে জাত্যন্তর পরিণাম হইলে এই সামাজিক পরিবর্ত্তন সম্পন্ন হয়। মনু যেমন বলেন, সর্ব্বলোকই অসমান এবং সমান, মহাভারত সেই কথাই বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেনঃ—

"জীব তীর্য্যক্ যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমতঃ পুক্কশ বা চাণ্ডাল যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শূদ্রতা লাভ করে। তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাহার বৈশ্যতা; বৈশ্যতা লাভের পর এক লক্ষ অশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্ষত্রিয়ত্ব এবং ক্ষত্রিয়ত্বলাভের পর একশত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশত ষোড়শ কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অক্রূরজীবী ব্রাহ্মণের কুলে, তৎপরে চতুঃ ষষ্টি সহস্র অষ্ট শত কোটি বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রীসেবী ব্রাহ্মণবংশে এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুই শত উনষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রিয় গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করে। ঐ শ্রোত্রিয় বংশে পরিভ্রমণের সময় হর্ষ, শোক, কাম, দ্বেষ, অভিমান ও বৃথা বাঞ্ছিতা তাহাকে আক্রমণ করে। ঐ সময় যদি সে হর্ষ শোকাদি শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সদ্গতি লাভ হয়।"

অনুশাসন পর্ব্ব। ২৮ অধ্যায়।

সাম্যনীতির এই সাধারণ নিয়ম। এই নিয়মে সর্ব্বসাধারণ জনগণ আবদ্ধ। জাত্যন্তর পরিণাম দ্বারা এই সাম্যলাভ হয়। মহাভারত সাম্যলাভের পক্ষে যে কোটি কোটি বৎসরের যোনিভ্রমণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই যোনিভ্রমণের মধ্যে অনেক প্রকার যোনিলব্ধ হইয়া থাকে। একজন ক্ষত্রিয় একেবারেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন না। ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে ব্রাহ্মণত্বে আসিতে হয় ত লক্ষ লক্ষ যোনিভ্রমণ হইয়া যায়। ক্ষত্রিয় যে স্থান হইতে অবনত হইয়াছেন, সেই স্থানে উপনীত হইতে তাহাকে লক্ষ লক্ষ যোনির কর্ম্মভোগ করিতে হয়। কর্ম্মফলভোগ শেষ হইলে সে আবার সেই সেই স্থানে উপনীত হইয়া উন্নত হইতে

থাকে। এইরূপ নিয়ম সর্ব্ব বর্ণেই আছে। বর্ণের অন্তর্গত যে জাতিভেদ আছে, তন্মধ্যেও আছে। সামান্য দৃষ্টিতে এতত্ত্ব প্রতীত নহে। এ তত্ত্ব কেবল অলৌকিক জ্ঞানে প্রতীত। তাই ইন্দ্রের মুখ দিয়া মহাভারত এ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা যেস্থল উদ্ধৃত করিয়াছি, ইন্দ্র, মতঙ্গকে তাহা বলিয়াছিলেন। ইন্দ্র কে? ইন্দ্র দেবরাজ। যে লোকে দেবতারা অধিষ্ঠিত, সেই লোকের তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। সেই লোকের নাম স্বর্গলোক। যাঁহারা দেবত্ব লাভ করেন, তাঁহারা সেই লোকে যান। দেবত্ব কিসে লব্ধ হয়? সংযম ও আত্মশুদ্ধি দ্বারা। সেই স্বর্গলোকের শ্রেষ্ঠত্ব ও সেই সংযম ও শুচিতা দ্বারা লব্ধ। যেমন ইহলোকে নানা স্তরের দেবত্ব আছে, তেমনি স্বর্গলোকেও দেবত্বের তারতম্য আছে। সমান দেবত্ব-সম্পন্ন লোক সকল এক লোকে থাকেন। তাহাই সালোক্য মুক্তি বা স্বর্গলোক। প্রাণ্ড সেই শুচিতার শ্রেষ্ঠত্ব হেতু এক এক জন ইন্দ্র হয়েন। যে দেবতার শুচিতা তাই রাজ্ঞী, তিনিই ইন্দ্র। শচী প্রতি ইন্দ্রেরই রাজ্ঞী। দেবলোকে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বিভিন্ন ইন্দ্র হইতেছেন, কিন্তু দেবলোকের ইন্দ্রাণী শচী নিত্য প্রতিষ্ঠিত। একজন ইন্দ্র একে একে ক্রমোৎকর্ষ লাভ করিয়া আরও উচ্চস্তরে গিয়া সামীপ্য লাভ করেন। একস্তর হইতে মুক্ত হইয়া অন্য স্তরে যাওয়ার নামই মুক্তি। মনুষ্য যখন মনুষ্যত্বের স্তর অতিক্রম করিয়া দেবত্বের স্তরে আসিয়া উপনীত হয়েন, তখন তিনি সালোক্য মুক্তি লাভ করেন বা স্বর্গীয় দেবলোকে আসেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটুও অপবিত্রতা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের হাত হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারেন না। একথা বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, অনেকে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছেন, অনেকের দেবলোক লাভ হয় নাই। এই দেবলোক লাভ কিসে হয়? দেহত্যাগের পর জাত্যন্তর পরিণামে এই দেবত্বলব্ধ হয়। যিনি ইন্দ্রত্ব পান, শুচিতার শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তাঁহাতে দিব্যজ্ঞান পরিস্ফুট হয়। সেই দিব্যজ্ঞানে মনুষ্যের সমস্ত যোনিভ্রমণ সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। তাই, মহাভারত ইন্দ্রমুখে উক্ত অলৌকিক জ্ঞানের কথা দিয়াছেন।

আমরা স্বর্গে দেবত্বের তারতম্য অনুসারে যে সকল লোকের কথা বলিয়াছি, এই স্থূল মনুষ্য সমাজে ও তদ্রূপ লোক সকল(Circle of men) বিদ্যমান। সাম্যনীতি অনুসারে এই সকল লোক লব্ধ হয়। সমাজমধ্যেও যাহারা পশুত্ব অংশে বা মনুষ্যত্বাংশে সমান, তাহারা সমাজের এক এক লোক অধিকার করিয়া আছেন। এই লোকসকলেই সমাজের এক এক শ্রেণীবিভাগ এক এক জাতির circle,—যে circle (চক্র) বা লোক মধ্যে তাহারা আবদ্ধ। এই শ্রেণীবিভাগই সর্ব্বসমাজে জাতির সৃষ্টি করে। কিরূপে করে, বলিতেছি।

প্রথমে রাজবংশ ধরুন। যদিও এক দেশের রাজা এবং রাজবংশীয়গণ অন্য দেশের রাজা এবং রাজবংশীয়গণের সহিত এক স্থানে অবস্থিত নহেন, তাহাদের রাজ্য ও বসবাস অনেক দূরে দূরে। তথাপি, স্বধর্ম্মীয় হইলে তাহারা একই লোকে বাস করেন। বলিতে গেলে, একই ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ রাজগণ এক এক জাতীয় লোক। তাঁহারা এক স্বতন্ত্র জাতি। তাঁহারা এক জাতি

TORN PAGE(S)

ও এক লোকে থাকেন বলিয়া তাঁহাদের লোক-লৌকতা সেই জাতি মধ্যেই নিবদ্ধ। যে লোকে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের সেই লোক অনুসারে লৌকতা হয়। রাজাদের বিবাহাদি ক্রিয়া-কাণ্ড সকলই রাজসংসারে আবদ্ধ। সমজাতীয়ের সহিত সমজাতীয়ের মিলন ও সদ্ভাব। তাঁহারা স্বভাবতঃই নীচ শ্রেণীস্থ জনগণকে অবজ্ঞা চক্ষে দেখেন। নীচ জাতীয়ের সহিত বড় মিশিতে চাহেন না। কাজ চালাইবার জন্যই কেবল তাঁহারা মন্ত্রিগণের সহিত সংসর্গ করেন। নহিলে তাঁহাদের প্রকৃত সংসর্গ ও আলাপ কেবল সমকক্ষ রাজবংশীয়গণের সহিত। তাহাদের সহিতই আহার, ব্যবহার, শিষ্টাচার ও মন খুলিয়া আলাপ পরিচয়। যদি বল বিবাদ বিসম্বাদ এবং যুদ্ধ বিগ্রহও ত তাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ আছে। এক জাতীয় এবং স্বসম্পর্কীয় হইলেই পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কুটুম্ব সাক্ষাতের সহিত এবং একজাতীয় লোকে পরস্পরের সহিতই কলহ-বিবাদ ঘটে। যাহার সহিত যাহার স্বার্থ এক, তাহাদের মধ্যে কলহ ঘটে। সুতরাং এই যুদ্ধ বিগ্রহ বরং একজাতীয়তাই সপ্রমাণ করে। রাজগণ সকলে একজাতি বলিয়া রাজকুলে জন্মলাভ করা সৌভাগ্য রূপে গণ্য হইয়া থাকে। জন্মজন্মান্তরে পুণ্য না থাকিলে রাজকুলে জন্মলাভ করা যায় না। সুতরাং জাত্যন্তর পরিণামেই এই রাজ জাতির সৃষ্টি হয়।

তৎপরে সম্ভ্রান্ত সমাজ। এই সম্ভ্রান্তগণই সর্ব্বদেশে রাজবংশের নিম্নশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত। সকল দেশের সম্ভ্রান্ত এবং জমিদারগণ যে একস্থানে বাস করেন, এমত নহে; কিন্তু এক স্থানে বাস না করিলেও তাঁহারা এক জাতিভুক্ত। রাজবংশীয়গণের মধ্যে যেরূপ সামজিক নিয়ম প্রচলিত, সম্ভ্রান্তগণ মধ্যেও ঠিক তাই। সম্ভ্রান্তগণ (Lords) কেবল অপর সম্ভ্রান্তগণের সহিতই মিলিয়া মিশিয়া থাকেন। এমত কি, সম্ভ্রান্ত বংশীয় নহিলে, ঠিক মিশ খায় না। একজন (Commoner) নীচ শ্রেণীস্থ লোক যদি কোন ক্রমে সেই জাতি মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন, তবে সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ তাঁহার সহিত ঠিক মিশিবে না, বরং তাহার বংশধরগণের সহিত মিলিবেন। সুতরাং সমস্ত সম্ভ্রান্তবংশীয় একলোকে বাস করেন ও একজাতীয় লোক। কেবল জন্ম ও জাত্যন্তর পরিণাম দ্বারাই এই জাতি মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায়।

যে নিয়মে সমাজ মধ্যে রাজবংশীয় এবং সম্ভ্রান্তগণ পরিচালিত হয়েন, সেই নিয়মেই সমাজের (Merchant Class) উচ্চ কুলস্থ বণিক ব্যবসায়ী এবং (military class) ক্ষত্রিয় ধর্ম্মীরা জনগণও চলিয়া থাকেন। তাহারাও সকলে এক লোকে বাস করেন এবং এক জাতীয় লোক। তৎপরে দেখ, সমাজের কামার, কুমার, সূত্রধর, তাঁতী প্রভৃতি লিঙ্গ ব্যবসায়িগণ মধ্যেও সেই একই নিয়ম। তাহারাও সমস্ত এক জাতীয় লোক। হিন্দু সমাজের মত অপর দেশীয় সমাজ মধ্যে "জাতিভেদ" প্রথা প্রচলিত না থাকিলে যে তাহা একেবারেই নাই,—তাহা যে গুহ্যভাবে সমাজকে বিভক্ত করে না, এমত নহে। যাহা স্বাভাবিক, তাহা অবশ্যম্ভাবী। যাহা মনুষ্যের প্রকৃতিগত, মনুষ্য সমাজ তাহার হাত হইতে কিরূপে মুক্ত হইতে পারেন?

অতএব, দেখা যাইতেছে, দেবতারা যেমন একলোকে বাস করেন, মনুষ্যলোকে, সমাজস্থ জনগণও তদ্রূপ এক এক লোকে বা জাতিতে বিভক্ত। হিন্দু সমাজে "জাতিভেদ" প্রথা প্রচলিত থাকাতে, জন্মহেতু জাতিকুল বিভাগ সামাজিক নিয়মেই ঘটিয়াছে। অপরাপর সমাজেও জন্মহেতু জাতিকুল বিভাগ হইতেছে। সকল সমাজেরই জাতি বা লোক বিভাগকে এক এক চক্র (circlein which men of the same class move live) রূপে পরিগণিত করা যাইতে পারে। সেই চক্র মধ্যেই এক জাতীয়-মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিয়া থাকে এবং সেই চক্র মধ্যেই তাহারা আবদ্ধ।

যে স্থলে এক জাতীয় জনগণের এক বাস সম্ভব, সে স্থলে তাহারা একত্র বাসও করিয়া থাকে। এই কলিকাতা নগরমধ্যেই দেখিতে পাইবে, খ্রীষ্টানেরা এক স্থানে থাকেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মেরা, মারওয়াড়ীরা, পোট্টারা, মুসলমানেরা এবং হিন্দুরা। এক এক স্থানে যাও, দেখিতে পাইবে, সেখানেও এক স্থানে বসুপাড়া, অপর স্থানে ব্রাহ্মণ পাড়া, ডোমপাড়া প্রভৃতি পাড়ায় পাড়ায় লোক বিভক্ত হইয়া বাস করিতেছে। পল্লী গ্রামেও সেই নিয়ম। প্রতি পল্লীতে পাড়ায় পাড়ায় লোক বিভক্ত হইয়া বাস করিয়া থাকে। বিলাতে Yorkshire এবং Manchester প্রভৃতি স্থানে কাহারা একত্র বাস করেন?

অতএব, সর্ব্বসমাজেই লোকবিভাগ বর্ত্তমান। এই লোকবিভাগই এক এক চক্র—যে চক্রমধ্যে সমধর্ম্মীয় এবং সমজাতীয় লোক একত্র মিলিত এবং আবদ্ধ। প্রতি মনুষ্যে ব্যক্তিগত বিভিন্নতা থাকিলেও জাতিগত সাদৃশ্য ও সাম্য বিলক্ষণ আছে। সেই সাম্যহেতু তাহারা এক লোকে আনীত ও আকৃষ্ট হয়। কেমন এক স্বাভাবিক টানে তাহারা একত্ব আকৃষ্ট হয়। এই স্বাভাবিক সংস্কারই জাতিভেদ। জাতিভেদ জন্ম দ্বারাই প্রধানতঃ সম্পন্ন হয়। জাত্যন্তর পরিণাম বশতঃ জন্মলাভ হয়। চক্রীর চক্রানুসারে যেমন সংসার চলিতেছে, তেমনি সমস্ত লোকসমাজও চলিতেছে। তিনিই প্রতি ব্যক্তিকে ঠিক চক্রে আনিয়া জাত্যন্তর পরিণাম দ্বারা লোক সমাজের সহিত মিলিত করিয়া দেন। সমস্ত লোকসমাজ তাঁহারই চক্রে ভ্রাম্যমান।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু

"জীবন সায়াহ্নে।"

আজি ব্রত অবসান—
জীবনেরর খেলা শেষ;
নাহি মান অভিমান,
নাহি সুখ দুখ লেশ।

ওই ডুবে আলো রেখা
পশ্চিমের মেঘ গায়;
মেলিছে বিহঙ্গ পাখা
উড়িতে অনন্ত ছায়।

এস আজি বন্ধুগণ,
আজি শত্রু নাহি মোর;
সব ভাই প্রিয়জন
ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর।

আজি বড় সাধ মনে
তোমাদের বুকে ধরি,
বিজয়ার আলিঙ্গনে
শূন্য প্রাণ পূর্ণ করি।

TORN PAGE(S)

ভুলে যাও, ক্ষমা কর,
বরিষ আশীষ শিরে ;
অন্তিম মিনতি ধর
মুছে নাও আঁখি নীরে।

এত দিন বুঝি নাই
জীবনের মূল্য কত,
আজি অনুতাপে তাই
পুড়িতেছি অবিরত।

স্বার্থ-সাধনের করে
ভা'য়ের কোমল প্রাণে,
দারুণ বিরাগ ভরে
হানিয়াছি বিষবাণে।

অন্ধ হ'য়ে ভ্রান্ত মতি
আপনে ক'রেছি পর ;
ভাবি নাই কিবা গতি
হবে মোর অতঃপর।

যাহা দিনু আপনারে
তাই হ'ল অন্তরায় ;
ঢালিনু যা পর দ্বারে
সেই আজি সঙ্গে যায়।

খ্যাতি, রূপ, ধন, মান,
সকলি রহিল পিছে ;
আজি লভিয়াছি জ্ঞান
বুঝিয়াছি সব মিছে।

আমিত্বের গুণপণা
কিছু নয়—কিছু নয় ;
ধরণীর ধূলিকণা
ধূলিতে মিশায়ে রয়!

আজি এ অন্তিম ক্ষণে
বুঝিয়াছি এই সার,
ধর্ম্ম শুধু এ জীবনে
থেকে যায় আপনার।

তোমরা জীবনপথে
নবীন পথিকগণ ;
রেখে দিও প্রাণে গেঁথে
অভাগার এ বচন।

যদিও বিদ্বেষ, দন্দ্ব
বিষময় করে প্রাণে ;
প্রণয়ের মধু ছন্দ
বাজে তলে মৃদুতানে।

শুধু হেরি অন্ধকারে
উঠিও না শিহরিয়া ;
আলোকের সুধা-ধারে
পুলকিত ক'রো হিয়া।

কত প্রেম, কত স্নেহ
চারিদিকে অগণন ;
তাহা না দেখিবে কেহ ?
শুধু দেখ নির্য্যাতন ?
আপনার বন্ধু ভাই
শত্রু কর অকারণে ;
হৃদে তব ক্ষমা নাই ?
ক্ষমা কর পাপী জনে।

সকলেরে ভালবাস
সমুন্নত কর মন ;
স্বার্থ নীচতারে নাশ
কর বিশ্ব আলিঙ্গন।

প্রেম জীবনের শক্তি
কোমলতা মধুময় ;
প্রেম জীবনের মুক্তি
অনন্তের পরিচয়।

প্রেম জীবনের জ্যোতি
প্রাণময় বারিধারা ;
প্রেম জীবনের গতি
প্রেমে হও আত্মহারা।

ধর্ম্মপ্রেম, প্রেম ধর্ম্ম,
ভেদাভেদ কিছু নাই
প্রেমের প্রকৃত মর্ম্ম
এই সবে জেনো ভাই।

মর যদি ভালবেসে
জীবন সে মৃত্যু নয় ;
প্রেমেতে বাঁচিবে শেষে,
প্রেম চির মৃত্যুঞ্জয়।

ওই ডুবে আলো রেখা
পশ্চিমের মেঘ গায় ;
মেলিছে বিহঙ্গ পাখা
উড়িতে অনন্ত ছায়।

রুদ্ধ হয় কণ্ঠ স্বর
বলিতে শকতি নাই ;
ডাকিছে মৃত্যুর চর
—বিদায়! চলিনু ভাই!!

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

বেদান্তদর্শন ও অদ্বৈতবাদ। (২)

বেদান্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত।

বেদান্ত শাস্ত্র বড় দুর্বোধ্য। ইহার প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি বুঝা বড় কঠিন। উপযুক্ত অধিকারী না হইলে সেই জন্য বেদান্তশাস্ত্র আলোচনা করা বিড়ম্বনা। দর্শনশাস্ত্রের কূটযুক্তি ও সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল বিশেষ মার্জ্জিত বুদ্ধি ব্যতীত ধারণা করা দুঃসাধ্য। * আর শুধু ধারণা করিলেই যথেষ্ট হয় না। মূল সত্য গুলি প্রত্যক্ষ করিতে হয়—তত্ত্বদর্শী হইতে হয়। তাহার জন্য বিশেষ সাধনা আবশ্যক। সে সাধনা এক্ষণে আমাদের নাই।

সমস্ত দর্শনশাস্ত্র মধ্যে বেদান্ত শ্রেষ্ঠ। আর অদ্বৈতবাদ বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত। দুঃখের বিষয়, আমরা এই বেদান্ত শাস্ত্রের অমূল্যত্ব বুঝি না। আমাদের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন বটে। কিন্তু আমাদের নিজের দর্শন শাস্ত্র আমরা আয়ত্ব করিতে অসমর্থ। আমাদের দর্শন শাস্ত্র আয়ত্ব করিতে যে আজীবন শিক্ষা ও গুরুর উপদেশ প্রয়োজন হইত, সে শিক্ষা ও সে উপদেশ আমরা আর পাই না।

সুখের বিষয়, অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত আমাদের দেশের দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনের স্থান কত উচ্চে—তাহা তাঁহারা বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত জানিতে পারিলে আমাদের মধ্যে অনেকের বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নে আস্থা জন্মিতে পারে। এই আশায় এস্থলে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য কয়েক জন পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা হইল।

* বেদান্ত দর্শনের শাঙ্করভাষ্য সম্বন্ধে পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলিয়াছেন,—

"But I must warn you that his (Sankara's) style, though much more like the style of an ordinary book, is difficult to follow, and requires the same effort of attention which we have to bestow on the intricate arguments of Aristotle or Kant."

Vedant Philosophy, p 62.

ফরাসি দার্শনিক শ্রেষ্ঠ কুঁজে, তাঁহার কৃত দর্শন ইতিহাসে বলিয়াছেন —

"প্রাচ্য দেশের এবং প্রধানতঃ ভারতের কাব্য ও দর্শনের কীর্ত্তিস্তম্ভ ইউরোপে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই সকল যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে তাহাতে এত গভীর সত্য নিহিত আছে, ও তাহাদের তুলনায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গবেষণার ফল এত নীচ বলিয়া বোধ হয় যে, আমরা প্রাচ্য দর্শনের সম্মুখে অবনত হইতে বাধ্য হই, এবং মানবজাতির এই শৈশবলীলা-ক্ষেত্রেই সর্ব্বোচ্চ দর্শনের প্রকৃত জন্ম স্থান বলিয়া বুঝিতে পারি।" (১)

পণ্ডিতবর কুঁজে আর একস্থানে বলিয়াছেন, যে, "ভারতের দর্শন শাস্ত্র এত বিস্তৃত যে, আমরা ইহাকে সমগ্র দর্শন ইতিহাসের সার সংগ্রহ মাত্র বলিতে পারি।" (২)

প্রসিদ্ধ, জর্ম্মান পণ্ডিত সেলিগেল বলিয়াছেন,—

"এমন কি, ইউরোপের যে সর্ব্বোচ্চ দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানের মায়াবাদ গ্রীসীয় দার্শনিকদিগের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও প্রাচ্য মায়াবাদের পূর্ণ আলোক ও তেজের নিকট, মধ্যাহ্ন সূর্য্য কিরণের পূর্ণ আলোক ও শোভার সম্মুখে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।" (৩)

ইহার পর আমরা অতি প্রসিদ্ধ জর্ম্মান দার্শনিক পণ্ডিত সপেনহরের কথা উল্লেখ করিব। সপেনহরের স্থান জর্ম্মান দার্শনিকদিগের মধ্যে অতি উচ্চে। (৪) সুতরাং তাঁহার অভিমতের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। পণ্ডিতবর সপেনহর বলিয়াছেন—

"মানবজ্ঞানের ও বুদ্ধির চরম সীমায় আসিলে তবে বেদরূপ ফল লাভ হয়। সেই বেদের সারভাগ উপনিষদ্—এই শতাব্দীর (উনবিংশ শতাব্দীর) শ্রেষ্ঠতম উপহার স্বরূপ আমরা লাভ করিয়াছি।" (৫)

সপেনহর অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন—

"বেদের পবিত্র ভাবে উপনিষদ্ কি সুন্দর ও পূর্ণ রূপে অনুপ্রাণিত! যিনি যত্ন পূর্ব্বক এই অতুলনীয় গ্রন্থ আলোচনা করিবেন, তাহারই অন্তঃকরণ ইহার ভাবে আমূল আলোড়িত হইবে। ইহাতে মন কেমন পবিত্র হয়। ইহুদী ধর্ম্ম এবং তৎপোষক দর্শন আলোচনাজাত কুসংস্কার উন্মূলিত হয়। এমন উপকারী ও পবিত্রকরী গ্রন্থ আর নাই,—আর জগতে থাকাও সম্ভব নহে। ইহা ইহ জীবনে আমাকে শান্তি দান করিয়াছে এবং মৃত্যু কালেও শান্তিদান করিবে।" (৬)

এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, পূর্ব্বে সম্রাট আকবরের সময়ে যে কয়েকখানি প্রধান উপনিষদের পারসি ভাষায় অনুবাদ হইয়াছিল, তাহা হইতে যে ফরাসি অনুবাদ হয়, তাহাই সপেনহারের সময়ে ইউরোপে প্রচারিত হইতেছিল। সপেনহর তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এই উপনিষদ অবলম্বনে রচনা করেন। (৭)

সে যাহা হউক, যে সকল নরদেবতা বা ঋষিদিগের নিকট বেদ ও উপনিষদের তত্ত্বসকল প্রথম স্ফুরিত হইয়াছিল—তাঁহাদের সম্বন্ধে এই মহাজ্ঞানী জর্ম্মান পণ্ডিত কি বলিয়াছেন, তাহাও আমাদের মনে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে পতিত আমরা সেই ঋষিদিগের প্রতি ভক্তি করিতে শিক্ষা পাইব। তিনি বলিয়াছেন,—

"প্রথম যুগে যাঁহারা মানব জাতির উৎপত্তি কালের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাই তাঁহারা জগতের প্রকৃততত্ত্ব আরও সহজ ও পরিস্ফুট রূপে ধারণা করিতে সমর্থ ছিলেন। তাই তাঁহারা আরও ভালরূপে আধ্যাত্মিক জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত করিতে পারিতেন। তাই ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণ ঐ সকল তত্ত্বের অমানব ধারণা করিতে স্বতঃই সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং তাহা বেদের উপনিষদে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।'(১)

পণ্ডিত সপেনহর আরও একস্থানে বলিয়াছেন,—

"বেদের উপনিষদ্ রচয়িতা ঋষিগণ মানুষ ছিলেন না। এক্ষণকার অবনত মানবজাতি অপেক্ষা তাঁহারা আরও পরিষ্কার ও গভীররূপে বস্তুতত্ত্ব ধারণা করিতে সক্ষম ছিলেন।" (২) (শঙ্করাচার্য্যও ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছেন। তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।)

উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে উপনিষদ্ ও উপনিষদ্ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সম্বন্ধে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ সপেনহরের কি অভিমত, তাহা বুঝা যাইবে। প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে সাধারণত হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সপেনহরের কিরূপ অভিমত ছিল, তাহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

---

(১) When we read with attention the poetical and philosophical monuments of the East, above all, those of India, which are beginning to spread in Europe, we discover there many a truth, and truths so profound, and which make such a contrast with the meanness of the results at which the European genius has sometimes stopped, that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East, and to see in this cradle of the human race the native land of highest philosophy."

Cousin's History of philosophy vol I, p 32.

(২) "The Indian Philosophy is so vast that we can literally say that it is an abridgement of the entire history of Philosophy."

Do. Do.

(৩) "Even the loftiest philosophy of the Europeans, the idealism of reason, as it is set forth by the Greek philosophers, appears in comparison with the abundant light and vigor of oriental idealism, like a feeble Promethean spark in the full flood of heavenly glory of the noonday sun....."

(৪) এই সপেনহর সম্বন্ধে আধুনিক জার্ম্মন পণ্ডিত ও দর্শনাধ্যাপক পল ডিউসেন সাহেব বলিয়াছেন—

"The stand point of reconciliation of all contradictions has been attained in the main, we believe, by mankind in the idealism founded by Kant, and wrought out to perfection by his deciple Schoupenheaur ....." No Sculptor's chisel, no poet's hymn can worthily celebrate him (Schoupenheaur) for it."

Elements of Metaphysics. p VI & 97.

পণ্ডিত সোক্ষমূলর সপেনহর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"A philosopher, thoroughly acquainted with all the historical systems of philosophy.....and certainly not a man given to deal in extravagant praise of any philosophy but his own."

Vedant philosophy p 62.

(৫) "Vedas—the fruit of the highest human knowledge and wisdom, the kernel of which has at last reached us in the Upanishads, the greatest gift of this century."

Schoupenheaur's world as Will and Idea, vol I, p 461.

(৬) "How thoroughly does the Oupnekhat (Upanishad) breathe the holy spirit of the Vedas, and how does every one who by diligent perusal has familiarised himself with .....this incomparable book, feel himself stirred to his innermost, by that spirit, And Oh! how the mind is here washed clean of all its early ingrafted Jewish superstition, and all philosophy servile to that superstition! It is the most profitable, and the most elevating reading which is possible in the world. It has been the consolation of my life, and will be the consolation of my death."

Schoupenheaur's Paregrá vol. II. Sec 185.

(৭) সপেনহর তাঁহার "World as will and Idea" পুস্তকের মুখবন্ধে বলিয়াছেন—"If the reader has also received and assimilated the sacred primitive Indian wisdom, then he is best of all prepared to what I have to say to him.....Each one of the individual and disconnected aphorisms, which make up the Upanishads, may be deduced as a consequence from the thought I am going to impart."

(১) Yet in the Early ages, those who stood nearer to the beginning of the human race had both greater energy of the intuitive faculty, and a truer disposition of the mind, so that they were capable of a purer, more direct comprehensions of the inner being of nature, and were thus in a position to satisfy the metaphysical need in a more worthy manner. Thus originated in the primitive ancestors of the Brahmans, *Rishis*, the almost superhuman conceptions which were afterwards set down in the Upanishads of the Vedas."

Schoupenheaur's world as Will and Idea, vol. II, p 362.

(২)...to those sublime authors of the upanishads of the Vedas, who can scarcely be thought of as mere men,.....we must ascribe this immediate illuminations of their mind to the fact that these wise men standing nearer the origin of our race in time, comprehended the nature of things more clearly and profoundly than the already detiriorated race ..... is able to do."

Do. Do. vol. III, p 265.

তাঁহার মতে হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কার পূর্ণ নহে—ইহা সত্য ধর্ম্ম। (১) তাঁহার বিশ্বাস, ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। ভারতের দর্শনশাস্ত্রই ইউরোপে প্রচার হইয়া তথাকার জ্ঞান ও চিন্তাস্রোত ফিরাইয়া দিবে। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সফল হইতেছে। সপেনহরের কথার ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। (২) সে কথাগুলি মনে রাখিলে আমাদের বিশেষ উপকার হইতে পারিবে।

এই সপেনহর ব্যতীত আমরা আর এক জন জর্ম্মান পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিব। ইঁহার নাম পাল ডুসেন। ইনি জর্ম্মানির কিল নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক। ইনি বেদান্তদর্শনের শাঙ্কর ভাষ্য জর্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন—ও ভারতের দর্শনের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। (১) সুতরাং ইহার কথার গুরুত্ব কম নহে। ইনি বলিয়াছেন,—

"অতি প্রাচীনকাল হইতে ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ভারতে পূর্ব্বপর প্রচলিত যে সুসংস্কার বদ্ধমূল আছে, তাহা আধুনিক বিকৃত ও বিপ্লবকারী যুগধর্ম্মের

(১) পণ্ডিত সপেনহর বলিয়াছেন—

"Our krowledge of Hindu literature is still very imperfect. Yet as we find their ethical teaching—variously and figuratively expressed in the Vedas, Purans, poems, myths, legends, maxims we see that inculcates love of our neighbour, with complete renunciation of self-love, —love generally not confined to mankind, but including all living creatures, benevolence even to the giving away of the hard earned wages of daily toil, unlimited patience towards all who injures us, the requietal of all wickedness however base with goodness and love, abstinence from animal food, perfect chastity and renunciation of all sexual pleasures for him who strives after holiness ; the surrender of of all possessions, the forsaking of every dwelling place and of all relations, deep unbroken solitude spent in silent contemplation, with terrible pennance for the mortification of the will.....and yet even those precepts, whose origin reached back more than four thousand years, are carried out in practice, in some cases even to the utmost extreme--and this notwithstanding the fact that the Hindu nation has been broken up into so many parts : a religion which demands the greatest sacrifices and which has yet remained so long in practice in a nation, that embraces as many millions of persons cannot be arbitrarily invented superstition, but must have its foundation in the nature of man."

Schopenheaur's 'World as Will and Idea vol. I, p. 502.

(২) "Broken up as this noblest and most ancient nation is in may parts, this myth (of transmigration) yet reigns as the universal belief of the people, and has the most decided influence upon the life today, as four thousand years ago, Therefore Pythagoras and Plato have seized with admiration, at the no *plus ultra* of mythical representation, received it from India or Egypt, honored it, made use of it, and we know not how far relieved it.

We on the contrary now send the Brahmans, English clergymen and evangelical linnenweavers to set them right out of sympathy, and to show that they were created out of nothing, and ought thankfully to rejoice in the fact. But it is just the same as it we fired a bullet against a cliff. In India our religions will never take root. The ancient wisdom of the human race will not be dispersed by what happened in Gallillee On the contrary Indian philosophy streams back to Europe, and will produce a fundamental change in our knowledge and thought."

Do. Do. vol. I, p. 461.

(১) এই পালডুসেন সম্বন্ধে প্রফেসর মোক্ষমূলর বলিয়াছেন—

"Professor Deussen...the German professor, who did not shrink from the trouble of learning Sanskrit with the sole object of studying the Vedant philosophy ... ..a well-schosled philosopher...deeply versed in Plato,Aristotle, Spinoza and Kant —did not think it waste of time to devole some of the best years of his life to the Vedanta, nay to make a journey to India in order to come in contact with the still living representations of the Vedant philosophy."

The Vedant Philosophy. p. 120.

প্রভাবে উন্মূলিত হয় নাই। * * দীন ভারতের এই দুর্দ্দিনে এ কথা বড় শান্তিপ্রদ। কেন না, ইহকাল অপেক্ষা পরকালের অর্থ গুরুতর। আর উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্র ও কাণ্ট প্লেতোর সমকক্ষ শঙ্করকৃত তৎভাষ্য—এ সকলের প্রতিষ্ঠিত বেদান্তশাস্ত্র—নিত্যতত্ত্ব অন্বেষণে মানব-প্রতিভা-জাত চেষ্টার সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য ফল।" (২)

পরিশেষে পণ্ডিত মোক্ষমূলের অভিমত উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তাঁহার দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি ঋগ্বেদের প্রকাশক, প্রাচ্য ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশক, তিনি বেদান্তদর্শন ও আমাদের ষড় দর্শন সম্বন্ধে ইংরাজীতে পুস্তক লিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মত পণ্ডিতের নিকট সহজেই আমরা প্রবাকথা পাইবার আশা করি। কিন্তু ফোঁ বিষয়, তিনি স্বধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান বটে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে পারেন নাই। তিনি ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন জন্য সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছেন, খ্রীষ্টধর্ম্মরের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য ও প্রাচ্য শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে। (৩) তাই তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন,—

(২) In India the influence of this perverted and perversive spirit of our age has not yet overthrown in religion and philosophy the good traditions of the great ancient time.. ...The fact may be for poor India a great consolation : for the eternal interests are higher than the temporary ; and the system of Vedanta as founded on the Upanishads and the Vedant sutras and accomplished by Sankara's commentaries on them—equal in rank to Peato, and Kant—is one of the most valuable products of the genius of mankind in its search for the eternal truth."

Paul Deussen's "Philosophy of the Vedanta."

(৩) মোক্ষমূলর নিজে বলিয়াছেন—

"Under these circumstances it was felt that nothing would be of greater assistance to the missionaries in India than an edition of the Rig Veda.....

Chips from German Workshop, vol. I, p 309.

"It was for this very purpose, for the purpose of enabling the missionaries to study the religion of those whom we wish to convert, that I published a series of translations of the sacred books of the East, which now amounts to nearly fifty volumes. If Government sends out officers to explore the fortresses and to examine the strategic peculiarities of the frontiers of our neighbours would it not be well, that missionaries also, who are to conquer the whole world, should act as spies, should make themselves acquainted with the sacred books of their religions, the very fortresses of those whom they wish, if not to conquer, yet to convince and to convert."

Professer Max Muller's article in the Nineteenth Century, September, 1895.

"আপনারা (সাধারণ শ্রোতাগণ) মনে রাখিবেন যে, এই বেদান্তশাস্ত্র কখন গুপ্তবিদ্যা ছিল না। ইহাতে সকলেরই অধিকার ছিল। এই শাস্ত্র এরূপ লোকের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছিল—যাহারা শিক্ষা ও সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে এস্থলে সমবেত আমাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা অনেক হীন ছিল। কৃষ্ণ চর্ম্মাবৃত ভারতবাসী দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তাহা কি এতই উচ্চ ও এতই গভীর যে, তাহা আমাদের আয়ত্বের অতীত হইবে?" (১)

যাহা হউক, এই পণ্ডিত মোক্ষমূলরই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—

"গ্রীস দেশের, মধ্যযুগের ও বর্ত্তমান কালের দার্শনিক পণ্ডিতগণ অপেক্ষা ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণের আত্মতত্ত্বজ্ঞান অধিক ছিল।" (২)

(১) Remember that all this Vedant philosophy was never esoterie, but that it was open to all and was elaborated by men who in culture and general knowledge stood far below than any one of us here present.....should the wisdom reached by the dark skinned inhabitants of India two or three thousand years ago be too deep or too high for us ?

Vedant philosophy

(২) "The old Indian philosophers knew more about the soul than Greek mediæval or modern philosophers."

India, p. 9.

তিনিই বলিয়াছেন,—

"মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার পক্ষে বেদান্ত দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর দর্শন আর নাই।" (৩)

এই মোক্ষমূলরই অন্যস্থলে শাঙ্কর দর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"এই দর্শনে যুক্তিপরম্পরা এরূপ সুন্দর ভাবে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ আছে, এবং প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতি বরাবর এরূপ লক্ষ্য রাখিয়া সমুদায় সুমীমাংসা হইয়াছে যে, প্লেতার সময় হইতে কাণ্টের সময় পর্য্যন্ত কোন দর্শন শাস্ত্রে সেরূপ পাওয়া যায় না। (৪) শঙ্করাচার্য্যের যুক্তিপ্রণালী এরূপ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও ন্যায় সঙ্গত যে, কি ভারতবাসী, কি ইউরোপীয় যে কোন বিরুদ্ধ মতবাদী দার্শনিকের মত খণ্ডন করিয়া তিনি তাঁহার নিজ মত সমর্থন করিতে সক্ষম ছিলেন।" (৫)

সে যাহা হউক, খ্যাতনামা পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের উল্লিখিত কয়েকটী অভিমত হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, বেদান্ত দর্শন সর্ব্বরূপে, কি প্রাচীন কি আধুনিক, সর্ব্বদেশের সর্ব্বদর্শনের শীর্ষস্থানীয়। অদ্বৈতবাদ তাহার চরম পরিণতি। এই বেদান্ত দর্শন ও অদ্বৈতবাদ আমাদের আলোচ্য। কিন্তু সে আলোচনার পূর্ব্বে অনেক আনুসঙ্গিক বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে ও এই উপক্রমণিকায় এই সকল বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

(৩) "If philosophy is meant to be a preparation of happy death or Eusthanasia, I know of no better preparation for it than the Vedant philosophy."
Ibid p. 8.

(৪) "But while in the Upanishads these various guesses at truth seem thrown out at haphazard, they were afterwards woven together with wonderful patience and ingenuity. The uniform purpose running through all of them, was clearly brought out, and a system of philosophy was ereeted out of such diverse materials, which is not only perfectly coherent, but quite clear and distinct in almost every point of doctrine. Though here and there sutras admit of divergent interpretations, no doubt is left on any important point of Sankara's philosophy which is more than can be said of any system of philosophy from the days of Kant to the days of Kant."
Ibid p 35.

(৫) Sankara the author of the great commentary, knows how to reason accurately and logically, and would be able to hold his own against any opponent whether Indian or European."
Ibid p. 45.

রাজতরঙ্গিণী (৭)

লৌকিকাব্দ ও শকাব্দ।

'রাজতরঙ্গিণী'র আরম্ভে কহ্লণ পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তিনি চতুর্ব্বিংশ লৌকিকাব্দে এবং ১০৭০ শকাব্দে 'রাজতরঙ্গিণী, রচনা করেন। ইহা হইতে কাশ্মীর এই উভয় অব্দ প্রচলনের বিষয় জানা যাইতেছে।

"লৌকিকেহব্দে চতুর্ব্বিংশে, শককালস্য সাম্প্রতং।
সপ্তত্যত্যাধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ॥"(১।৫২)

লৌকিকাব্দের অর্থ সপ্তর্ষি সংবৎসর। কলিযুগাব্দের ২৫ অব্দে সপ্তর্ষি সংবৎসরের কাল গণনা আরম্ভ হয়। লৌকিকাব্দের সহিত ২৫ যোগ করিলে, অতীত কলিযুগাব্দ পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে, লৌকিকাব্দের সহিত ৪৬ যোগ করিলে, অতীত শকাব্দ পাওয়া যায়। শকাব্দের ন্যায় লৌকিকাব্দের কাল গণনা প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে আরব্ধ হয়। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদে বৎসরের গণনা আরব্ধ হয় এবং পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিমাস শেষ হয়। লৌকিকাব্দের সহিত ৮১ যোগ করিয়া, অতীত বিক্রমাব্দ এবং ২৪—২৫ যোগ করিয়া খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় *। লৌকিকাব্দে শত ও সহস্র গণি[illegible] না।

(১) লৌকিকাব্দ + ২৫ = অতীত কলিযুগাব্দ।
(২) লৌকিকাব্দ + ৪৬ = অতীত শকাব্দ।
(৩) লৌকিকাব্দ + ৮১ = অতীত বিক্রমাব্দ।
(৪) লৌকিকাব্দ + ২৪। ২৫ = খ্রীষ্টাব্দ।

কলিযুগাব্দের ৩১৭৯ বর্ষে শকাব্দের; ৩১০১ বর্ষে খ্রীষ্টাব্দের এবং ৩০৪৪ অব্দে সংবৎসরাব্দের কাল গণনা আরব্ধ হয়। এক্ষণে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক হইতে আমরা কি ফল পাইতেছি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। ১০৭০ শকাব্দকে কলিযুগাব্দে পরিণত করিতে হইলে, তাহার সহিত ৩১৭৯ যোগ করিলে কলিযুগাব্দ পাওয়া যাইবে। উভয়ের যোগফল হইতে ২৫ অন্তর করিলে, লৌকিকাব্দ বা সপ্তর্ষি সংবৎ জানা যাইবে।

১০৭০ শকাব্দ
+৩১৭৯
৪২৪৯ কলিযুগাব্দ
—২৫
[৪২] ২৪ লৌকিকাব্দ
+২৪।২৫
[১১]৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দ

রাজা ভীমগুপ্তের রাজত্বকালে পামপুর বাসী বিখ্যাত বৈয়াকরণ কৈয়টের রচিত 'দেবীশতকে'র টীকা ৪০৭৮ কলিযুগ অব্দে এবং ৫২ অতীত লৌকিকাব্দে রচিত হয়। অতীত ৫২ লৌকিকাব্দের অর্থ প্রচলিত ৫৩ লৌকিকাব্দ। ৫৩ সংখ্যার সহিত ২৫ যোগ করিলে ৭৮ হয়। ৪০৭৮ হইতে ৩১৭৯ বাদ দিলে, ৮৯৯ অতীত শকাব্দ পাওয়া যায়। ৫৩ + ৪৬ = ৯৯। ৫৩ + ৮১ = ১৩৪। ৫৩ + ২৪।২৫ = ৭৭-৭৮। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, দেবীশতকের টীকা কৈয়ট কর্ত্তৃক প্রচলিত ৫৩ লৌকিকাব্দে, ৮৯৯ অতীত শকাব্দে, ৯৩৪ অতীত বিক্রমাব্দে এবং ৯৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহা হইতে মহাভাষ্যের 'ভাষপ্রদীপ' নামে টীকা প্রণেতা কৈয়টের সময় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগ বলিয়া জানা যাইতেছে। ডাক্তার বার্ণেল তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

"বসু-মুনি-গগনোদধি-সমকালে যাতে কালাস্তথা
লোকে।
দ্বাপঞ্চাশে বর্ষে রাজ্ঞি ভীমগুপ্তে নৃপে ভূঃ
শাসতি ভীমগুপ্তে নৃপে॥

অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ সাহেব লৌকিকাব্দে লিখিত কতকগুলি হস্তলিখিত পুস্তকের সময় নির্ণয় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মের সত্যতা দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

(১) বার্লিন রাজকীয় পুস্তকালয়ের একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ প্রচলিত সপ্তর্ষি সংবৎ ৬৯ (৪৮৬৯) অব্দে লিখিত হয়। তখন কলিযুগের (৬৯ + ২৫) ৪৮৯৪ অব্দ অতীত হয়। ৪৮৯৪ হইতে ৩১৭৯ বাদ দিলে, ১৭১৫ অতীত শকাব্দ পাওয়া যায়। (৬৯ + ৪৬ = ১১৫) এবং (৬৯ + ৮১ = ১৫০)। সেই সময়ে ১৮৫০ বিক্রম সংবৎ অতীত হয়। তখন ১৭৯৩—৯৪ খ্রীষ্টাব্দ প্রচলিত ছিল।

(২) সপ্তর্ষি সংবৎ ৪৯৬৫ অব্দের একখানি কাশ্মীরী পঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, সেই সময়ে কলিযুগের ৪৯৯০ অব্দ, শকাব্দের ১৮১১ এবং বিক্রম সংবতের ১৯৪৬ বর্ষ সেই সময়ে অতীত হয়। তখন খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯০-৯১ প্রচলিত ছিল।

(৩) ডাক্তর ষ্টাইনের সংগৃহীত একখানি

* Indian Antiquary, XX. 149.

কায় ইংরেজ-গৌরব-রক্ষার ভার ন্যস্ত হইল, তিনি নিজেও অধঃপতিত হইলেন এবং ইংরেজকেও উচ্চ আসন হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় অধঃপতিত করিলেন। ইংরেজ-প্রাধান্যের ভিত্তি এই সময়ে সমূলে কম্পিত হইল। ইংরেজের সততার প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার আস্থা টলিল। ক্রুগার এই সময় যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, যদি তদপেক্ষা উদার নীতি অবলম্বনে কার্য্য করিতেন, তবে ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্যের স্থায়িত্বের ভিত্তি অক্ষয় পাষাণে গ্রথিত হইত এবং বুয়র ইংরেজাপেক্ষা প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রাধান্য অন্য ভাবে স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইলেন। তিনিও নিজকে নিজে প্রধান বলিয়া প্রচার করিয়া প্রধান হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস যে, যিনি নিজকে নিজে বড় বলেন, তাঁহার মনেই একটা ধারণা থাকে যে, কেহ তাঁহাকে নিশ্চয়ই ছোট বলিতেছে, এবং তদ্রূপ বলিবার কারণও আছে।

ইংরেজ ভগবানের যেরূপ অনুগৃহীত, তাহাতে কি তাঁহার অস্ত্রবলে প্রাধান্য স্থাপন, সঙ্গত? অস্ত্রবলে, অত্যাচারবলে ত দস্যুও ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রধান হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের প্রকৃত প্রাধান্য তাহার সদ্দৃষ্টান্তে, উদ্যমে, এবং শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারে। বুয়র যদি এই ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেন, ইংলণ্ড তাহার শিরশ্ছেদনের নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিতে কখনই সম্মত হইতেন না। কিন্তু বলের পরীক্ষায় ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া বুয়রের মূর্খতার পরাকাষ্ঠা।

কেহ বলিতে পারেন, বুয়র জয় পরাজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধার্থী হইয়াছিলেন না, জয় এবং পরাজয় ভগবানের প্রতি অর্পণ করিয়া কেবল মনুষ্যের ন্যায়ানুগত সত্ত্ব এবং স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। বুয়র যদি অগ্রণী হইয়া পর-রাজ্য আক্রমণ না করিতেন, যদি ইংরেজাধিকারের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত ও গৃহাদি ভস্মীভূত না করিতেন, কেবল আত্মরক্ষার নিমিত্ত লিউনিডাসের ন্যায়—মহারাজা প্রতাপসিংহের ন্যায়—বদ্ধপরিকর হইয়া শত্রু-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেন, শত্রুর গতিরোধ করিতেন, তবে এ কথার সত্যতা আমরা অম্লান বদনে স্বীকার করিতে পারিতাম। কিন্তু বুয়রের কার্য্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ, তিনি আক্রমণকারী, আক্রান্ত নহেন।

মানুষ যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, নিয়তিচক্র অতিক্রম করা তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। বুয়র নির্ব্বোধ নহেন, ক্রুগার একজন অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান বলিয়া বিখ্যাত, অথচ তিনি ভূয়োভূয়ঃ এইরূপ ভুল করিলেন! আর সেই ভুলের ফলে আজি বুয়রের জাতীয় জীবন নিঃশেষিত।

দক্ষিণ আফ্রিকার কি দুরদৃষ্ট! যে তিনটী লোকের উপর অদৃষ্ট প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছিল, সে কয়েকটী লোকই কি ভগবান এক ধাতুতে গড়াইয়াছিলেন? সার আলফ্রেড্ মিলিনার এবং প্রেসিডেণ্ট ষ্টিনেরও বোধ হয় পূর্ব্বার্জ্জিত কোন পাপ ছিল, নচেৎ এই ক্ষেত্রে এই প্রকার কার্য্যের সহযোগীতা করা তাঁহাদিগের অদৃষ্টে ঘটিল কেন? সার আলফ্রেড্ কোন কার্য্যের নিমিত্ত নিজে দায়ী নন। তিনি ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে প্রেরিত হন। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত একেবারে নীরবে ছিলেন, ভাল মন্দ কোন কথাই বলেন নাই। তাহার পর যখন নিজে

সমস্ত দেখিলেন, বুঝিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন, তখন ইংলণ্ডকে সকল কথা জানাইলেন। ইংলণ্ডের তখন কালনিদ্রা ভাঙ্গিল। পূর্ব্বে যখন ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্য ধনমদে মত্ত হইয়া ন্যায়ানুগত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপথে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, যখন ইংলণ্ডের কথার প্রতি তাঁহাদিগের আস্থা ছিল, তৎকালে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে ন্যায়ানুগত পথ দেখাইলে, তাঁহারা ধন্যবাদের সহিত সেই পথে অগ্রসর হইতেন। তখন ইংলণ্ডের চক্ষে ক্রুগারের ন্যায় লোক আর কোথায়? ক্রুগার যাহা করেন, তাহাতেই বাহাবা। তারপর যখন চক্ষু মেলিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে, কার্য্য বড়ই অন্যায় হইয়াছে। সেই পূর্ব্বকৃত ত্রুটী সংশোধন করিতে যাইয়া আরো সহস্র ত্রুটীর জন্য দায়ী হইলেন, নিজের অবহেলায় যে প্রাধান্য হারাইয়াছেন, তাহা পুনঃস্থাপনের চেষ্টায় ব্যগ্র হইয়া আরো নীচতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইলেন। মিলিনার কি করিবেন? কর্ত্তব্যের বোঝা মাথা পাতিয়া লইয়াছেন, প্রাণপণে বহন করিয়াছেন, অকারণে তিরস্কৃত হইয়াছেন, সমুদয় সহ্য করিয়াছেন। পরের কার্য্যের নিমিত্ত অম্লান বদনে তিরস্কার সহ্য করা কম মহত্ত্ব নহে। কিন্তু তাঁহার মহত্ত্বে যায় আইসে কি? আফ্রিকার অদৃষ্টচক্রে তিনি উপগ্রহ মাত্র, প্রধান গ্রহ হইলে হয়ত আমরা অন্য ফল দেখিতে পাইতাম।

আমরা এতৎপূর্ব্বে যাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা ব্যতীত আর একজন লোক আফ্রিকার বর্ত্তমান অবস্থার নিমিত্ত অনেক পরিমাণে দায়ী। শক্তি, শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা এবং স্বার্থত্যাগে তিনি আদর্শ, তিনি পরিণামান্ধও ছিলেন না। কিন্তু বুয়র জাতির দুরদৃষ্ট বশত তিনিও এই ক্ষেত্রে তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অশক্ত হইলেন। আমরা ফ্রিষ্টেটের প্রেসিডেণ্ট ষ্টিন সাহেবের কথা বলিতেছি। অনেক নীচমনা লেখকের লেখনী ষ্টিনকে কলঙ্কিত করার নিমিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে মসিবর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু মহত্ত্বের উজ্জ্বল জ্যোতি স্বতঃ উদ্ভাসিত, যিনি যত আবর্জ্জনা তাহার উপর নিক্ষেপ করুন না কেন, কালে তাহা সমুদয় ভস্মীভূত এবং অপসারিত করিয়া সে জ্যোতি নরচক্ষের সমক্ষে বিভাসিত হইবেই হইবে। ষ্টিন ভ্রান্ত হইলেও, তাঁহার ভ্রান্তি উচ্চ প্রাণের বিচারভ্রান্তি, দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ত্তব্য মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপনের অসামর্থ্য। এবং একটী কর্ত্তব্যকে ফলনিরপেক্ষ ভাবে অপরটী হইতে শ্রেষ্ঠতর মনে করার ফল। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

সমাজ-শক্তি।

ধর্ম্মের দুই প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি, রাজা এবং সমাজ। রাজা এবং সমাজ উভয়ই মানবকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার সোপান। রাজা ব্যক্তিগত পাশব শক্তি, সমাজ সমষ্টিগত বিবেক শক্তি। রাজা পাশব-শাসন বলে এবং সমাজ প্রেম-বিবেক-বলে এ জগতের শাসন সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। রাজশক্তি যেখানে সমষ্টিগত সাধারণ শক্তিতে অভ্যুত্থিত, তথায় শান্তি বিরাজ করে, শাসন, সংরক্ষণ শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হয়। অন্যত্র কঠোর শাসন থাকিলেও অশান্তি এবং পাপ নির্ম্মূল হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে মানবকে রক্ষা করিবার জন্য একমাত্র সমাজ-শক্তিই দণ্ডায়মান। পাপী, সকলকে তুচ্ছ করিতে পারে, কিন্তু সমাজ-বিবেকের নীরব শাসনকে উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু বিবেক যদি ম্লান হয়, সমাজ যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, স্বেচ্ছাচারিতা যদি তথায় রাজত্ব করে, তবে মানবকে রক্ষা করিবে কে? রক্ষা করিবার বুঝিবা প্রত্যক্ষ আর কেহ নাই।

বিবেক প্রতি মানুষকে অসৎ হইতে সতে, প্রেয় হইতে শ্রেয়ে, অসুরত্ব হইতে দেবত্বে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উত্তেজনায় বা অবহেলায়,

কলেজের প্রস্তাব তুলনা করিলে, উদারতা ও বুদ্ধি সম্বন্ধে উভয় ব্যক্তি মধ্যে কত অন্তর, তাহা অনুভব হইবে।

রাজা শশীশেখরেশ্বরের আরও একটী ধারণা আছে যে, জমীদারদিগের পুত্রগণের গৃহশিক্ষকগুলি প্রায়ই ছাত্রের মন যোগাইয়া কার্য্য করে। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণনগরে একটী গল্প প্রচলিত আছে। কৃষ্ণনগরের রাজপুত্রকে একটী শিক্ষক রাজবাটীতে পড়াইতেন। তাঁহাকে নীলমণি মাষ্টার বলিয়া লোকে জানিত। নীলমণি মাষ্টার পাঠকালীন রাজপুত্রকে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু প্রহার দিতেন। একদিন মাত্রা এত অধিক হইয়া গিয়াছিল যে,নীলমণি মাষ্টার তাহাতে একটু ভীত হইয়া রাজবাটী ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় মহারাজা তাঁহাকে উপর হইতে ডাকাইয়া তাঁহাকে অভয় দান করিয়া সেই দিনের মত বিদায় করিলেন। আমি যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে নদীয়া মহারাজার ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলাম, তখন নীলমণি মাষ্টার বিধবা ব্রাহ্মণী ষ্টেট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেন। যদি তিনি জীবিত থাকেন, বোধ হয় অদ্যাপিও পাইতেছেন।

যেমন একজন মদ্যপায়ী শিক্ষকের দৃষ্টান্তে মহারাজ সাধারণ সমুদয় বা অধিকাংশ শিক্ষক মদ্যপায়ী, ইঙ্গিতে প্রমাণ করিতে চাহেন, সেইরূপ, অপূর্ব্ব যুক্তিতে তিনি তিনটী শিক্ষক তাঁহাদিগের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের ম্যানেজার হইয়াছেন, তাহার দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, অধিকাংশ শিক্ষক ছাত্রদিগের জমীদারীর ম্যানেজার হয়েন এবং ম্যানেজার হইতে ইচ্ছুক। এইটী রাজার ভ্রমমাত্র।

জমীদারের পুত্রের শিক্ষক যদি সুশিক্ষিত হন, তাহা হইলে জমীদারের সরকারে কাজ করিতে বা তাহার ম্যানেজারি করিবার জন্য লালায়িত হন না। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। (১) জমীদারী Selfishness, hypocrisy and intrigue এর ভিতর অনেক স্থলে পড়িতে হয়। (২) সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে জমীদারগণ প্রায়ই উপযুক্ত বেতন দিতে অসমর্থ বা কাতর। (৩) অধিকাংশ জমীদার নিজে সুশিক্ষিত নহেন, অথচ অহঙ্কারে পরিপূর্ণ, নিজের শিক্ষা সমীচীন ভাবে না হইতে হইতেই অন্যকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা সুশিক্ষিত, স্পষ্টবাদী, পরামর্শদাতা ম্যানেজারের সংসর্গ সহ্য করিতে পারেন না। (৪) আমাদিগের দেশের অধিকাংশ জমীদারগণ, জমীদারী কিরূপে উন্নত করিতে হয়, কিসে প্রজার অবস্থা ভাল করিয়া আপনার অবস্থা ভাল করিতে হয়, তাহা জানেন না ও ভাবেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধি খরচ করেন, তাঁহারা প্রায়ই কিসে নিরিখ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, বা কি প্রকারে বলে, কৌশলে অধিক টাকা আদায় করা যায়, কিসে বা জমীর দখল বা দখলের প্রমাণ রাখা যায়, ইত্যাদি বিষয় লইয়াই বিব্রত থাকেন। এই জন্য তাঁহাদিগকে সকল সময়ই ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে যাইতে হয়। আদালত প্রমাণের উপর বিচার করেন। প্রমাণ, দুই, সাক্ষী আর দলিল। সাক্ষী ও দলিল সত্য হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। সমুদয় সত্য সাক্ষ্য ও সত্য দলিল দিয়া প্রায়ই মোকদ্দমাতে জয় লাভ হয় না। কোন্ মোকদ্দমায় কিরূপ প্রমাণ আবশ্যক, উকিলের নিকট

জানা হয়। কতকগুলি লোক আছে, তাহাদিগের ব্যবসা, যেখানে প্রমাণের অভাব, সেখানে মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করা—অর্থাৎ সাক্ষী শিখান প্রভৃতি। যেখানে মোকদ্দমা অধিক, সেখানে মিথ্যা সাক্ষী শিখান ইত্যাদি। জমীদারের ঘরে মামলা অধিক। মামলাতে যাহাতে জয়লাভ হয়, তাহা করা ম্যানেজারের একটা প্রধান কাজ। সুতরাং ম্যানেজার যদি সাক্ষী শিখাইতে অসম্মত হন, অথবা নিজে যদি মিথ্যা সাক্ষী না দেন, তাহা হইলে জমীদারের ঘরে তাহার পক্ষে কার্য্য করা কঠিন হয় এবং তিনি বিশেষ দক্ষ ও কার্য্যপটু হইলেও, যখনই কোন মিথ্যা মোকদ্দমায় তাঁহার সংস্রব ঘটিয়া যায়, তখনি তাঁহার মনে হয়,কি নরকে আসিয়াই পড়িলাম। সুতরাং সৎ শিক্ষক জমীদারের ম্যানেজারির জন্য লালায়িত নন। যেখানে তিনি ম্যানেজারি করেন, যতদিন পারেন, জমীদারীর বর্ত্তমান সাধারণ কার্য্যপ্রণালী সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন, জমীদারকে সেই পথে লইয়া যাইতে প্রয়াসী হন, অথবা দুই এক বৎসর মধ্যেই নিজে সৎপথ পরিত্যাগ করা অপেক্ষা পদত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া কাজ ছাড়িয়া দেন। সুতরাং এরূপ স্থলে সুশিক্ষিত শিক্ষক ম্যানেজারি পদে অভিষিক্ত হইবার জন্য রাজা শশীশেখরেশ্বর যেরূপ ব্যাকুল মনে করেন, তত ব্যাকুল নহেন।

বস্তুতঃ আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যেমন পুলিশে ভাল লোক কাজ করিলে দেশের একটা বিশেষ মঙ্গল সাধন হয়, জমীদারিতে যদি শিক্ষক শ্রেণীর সজ্জন কার্য্য করেন, তাহা হইলে রাজকুমার কলেজ সংস্থাপন অপেক্ষা অধিক উপকার হইতে পারে।

আমাদিগের দেশের অনেক অসার ব্যক্তি শিক্ষকদিগকে সম্মান করিতে জানে না। কিন্তু রাজা শশীশেখরেশ্বর আমাদিগের দেশের শিক্ষাবিভাগের সংস্কার করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন। তাঁহার মত ব্যক্তিকে শিক্ষকদিগের সম্বন্ধে ভ্রান্ত দেখিলে দুঃখের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের দেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষক বা গৃহ-শিক্ষকের প্রতি অধিকতর আস্থা ও শ্রদ্ধাবান হওয়া উচিত।

আমি প্রথমে গৃহশিক্ষকের কথা বলিব। ইউরোপে প্রথম প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত বা দার্শনিক বা সাধুজনকে গৃহশিক্ষকের কার্য্য করিতে দেখা যায়। আর যেখানে শিক্ষক বিদ্বান ও সজ্জন, (রাজা শশীশেখরেশ্বর তাঁহাদিগকে সম্মান করুন আর না করুন) ইউরোপে বা এদেশে ছাত্রগণ তাঁহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন।

ধর্ম্মতত্ত্বের সংস্থাপক Adam Smith দ্বাদশ বৎসর গ্ল্যাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করার পর, ইংলণ্ডের একটী প্রধান মনস্বী ব্যক্তির * অনুরোধে, তরুণবয়স্ক জমীদার Duke of Buccleugh এর শিক্ষক হইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে স্মিথের Theory of moral sentiment প্রকাশিত হওয়ায়,তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি একজন জমীদার পুত্রের শিক্ষকতার

* The Hon. Mr. Townsend "the cleverest fellow in England" at that time.

Brittle pages
#90 to 103. Filming not possible

ভার লইয়াছিলেন। আর এই জমীদারটী চিরকাল তাঁহার শিক্ষকের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকের বৃত্তি বা পেন্‌সন নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং যত্ন করিয়া Adam Smithকে স্কটলণ্ডের Commissioner of the Custom নিযুক্ত করা পক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন। সাহিত্য-জগৎ ইহাতে Adam Smith নবীন জমীদারের খোসামোদ করিয়াছিলেন, মনে করে নাই। আর Duke of Buccleugh যে তাহার ভূতপূর্ব্বক শিক্ষককে বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে, তাঁহাকে কেহ নির্ব্বোধ মনে করে নাই, বরঞ্চ তাহাতে তাঁহার নাম ইতিহাসে রহিয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডের কথা ছাড়িয়া ফরাসিদেশের একজন private tutor এর কথা উল্লেখ করি। তিনি Fenelon, (ফেনিলং) প্রসিদ্ধ টেলিমেকস-রচয়িতা। চতুর্দ্দশ লুইর পৌত্রের (Duke of Burgundyর) শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতি উচ্চ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীন বংশে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতার নাম Count Pons de Salignac। Fenelon এর প্রসিদ্ধ উপন্যাস Telemaque তাঁহার ছাত্রকে সরস ভাবে উপদেশ দিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। তিনি শিক্ষকের কার্য্যে এরূপ বিশুদ্ধ ও উন্নত ভাবে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে ভক্তিরসে হৃদয় পরিপ্লুত হয়। শশীশেখরেশ্বরের নিকটে Fenelon শ্রদ্ধার পাত্র কিনা, জানিনা। কিন্তু জানি,সুশিক্ষিত জগৎ এতাবৎকাল তাঁহাকে "as a man he is one of the greatest figures in a great time" এইরূপ মনে করিতেছে। এমন কি সাধু Channing বলিয়াছেন, "When we think of Fenelon in the palace of Louis XIV, it reminids us of a seraph sent on a divine commission into the abodes of the lost" চতুর্দ্দশ লুইর রাজপ্রাসাদ (was) "Distinguished and disgraced by selfishness,hyprocrisy and intrigue." আমাদিগের দেশে অধিকাংশ জমীদারের বাটীতে কি প্রকার selfishness,hyprocrisy and intrigue দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করি।

ফেলিলনের কথা ছাড়িয়া বর্ত্তমান জর্ম্মান সম্রাটের শিক্ষকের কথা ধরুন। সম্রাট তরুণ বয়সে (Dr. Hinrzpeter) হিন্‌টজ পিটারের নিকট পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এত মান্য করিতেন যে, তিনি সম্রাট হইলেও অনেক দিন তাঁহার বুদ্ধিতে চলিয়াছিলেন। ইহাও প্রকাশ, তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে যে সকল সৎকার্য্যও সাধারণের হিতকার্য্য হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই এই শিক্ষকের দ্বারা প্রণোদিত।

এক্ষণে গৃহ-শিক্ষকদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের কথা আলোচনা করা যাউক। ইউরোপ হইতে উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। আমাদিগের দেশের লোকের কয়েকটী শিক্ষকের নাম করিলে যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা সকলেই পূজনীয় ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ সরকার,শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় চরিত্র ও শিক্ষা দ্বারা দেশের যে উপকার করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের

চরিত্রের স্মৃতি আজিও যে উপকার করিতেছে, তাহা আমাদিগের দেশে অন্য শ্রেণীর মধ্যে কয়জন ব্যক্তি করিয়াছেন? ঋষি রামতনু, ঋষি রাজনারায়ণ; জ্ঞানী ভূদেব, জ্ঞানী প্যারীচরণ—ইঁহাদিগের তুলনা কোথায় মিলে? জীবিত শিক্ষকদিগের নাম করিব না। তবে এই বলিতে পারি, তাঁহাদিগের মধ্যেও এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহাদিগের বিনয়, পাণ্ডিত্য, পরহিতব্রত, স্বাধীন প্রকৃতি দেখিলে রাজা শশীশেখরেশ্বর উপকার লাভ করিতে পারেন। ইঁহারা ধন, মান, পদাকাঙ্ক্ষা পায়ে ঠেলিয়া, মিছা গণ্ডগোল ত্যাগ করিয়া নীরবে কর্ত্তব্য কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

আমাদিগের দেশে যদি কোন শ্রেণীর ভিতর মনুষ্যত্ব ও চরিত্র বল থাকে, তাহা শিক্ষকদিগের মধ্যে আছে।

শিক্ষক শ্রেণীর প্রতি রাজা শশীশেখরেশ্বর ইঙ্গিতে ও ভাবে যে অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য এতদূর লিখিতে হইল।

এক্ষণে প্রস্তাবিত রাজকুমার কলেজের শিক্ষক যে সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অপেক্ষা ভাল হইবে, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে? শিক্ষক নির্ব্বাচনের ভার কাহার উপর থাকিবে? যদি গবর্ণমেণ্টের উপর থাকে,তাহা হইলে সাধারণ গবর্ণমেণ্ট কলেজের অপেক্ষা ভাল শিক্ষক নির্ব্বাচিত হওয়া সম্ভব নহে। যদি ম্যানেজিং কমিটির উপর এই ভার ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে এই কমিটির সভ্য নির্ব্বাচনের ভার কাহার উপর থাকিবে? তাঁহারা অনুরোধ বা আলস্যে মন্দ শিক্ষক নিযুক্ত করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি? রাজা শশীশেখরেশ্বরের উপর যদি ভার থাকে, তিনি নিজে পাণ্ডিত্যে ও চরিত্রবলে এই গুরুতর ভার বহন করিবার উপযুক্ত, তাহারই বা কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে?

অধিকাংশ লোকই স্তবে তুষ্ট। স্তব করিয়া রাজকুমার কলেজে মদ্যপায়ী শিক্ষকও কার্য্য চাহিবে না, তাহার প্রমাণ কি?

রাজকুমার কালেজের জন্য টাকা কোথা হইতে আসিবে? যদি তাহা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া করার প্রস্তাব হয়, সেই টাকা অপব্যবহৃত হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? আমাদিগের দেশে সাধারণের টাকা যখন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে ন্যস্ত হয়, তখন অনেক স্থলেই কি নানা অবিশ্বাস বা অসন্তোষের কথা শুনা যায় না? অমুক বাটী সাধারণের সম্পত্তি, অমুক পরিবার ক্রমে তাহা দখল করিয়া নিজ সম্পত্তি করিয়া লইয়াছে। অমুক বিদ্যালয় সাধারণ সম্পত্তি, এক্ষণে ব্যক্তিবিশেষে তাহাকে নিজ সম্পত্তির ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, অমুক ফণ্ডে এত টাকা ছিল, তাহা গেল কোথায়? অমুক ফণ্ডের কতকগুলি ট্রষ্টি ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তেজস্বী কয়েক ব্যক্তি যখন মরিলেন, অমনি আর একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ফণ্ডের উপর একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ অসন্তোষজনক কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সমাজের নগণ্য ব্যক্তি নহেন। সুতরাং রাজকুমার কলেজ যদি চাঁদার টাকায় চলে, সেই টাকার সুব্যবহার হইবে, তাহার প্রমাণ চাহি। অন্যের টাকা না লইয়া নিজের টাকায় এইরূপ কলেজ করিতে পারেন, এমন কোন রাজা (যেমন

দ্বারবঙ্গের বা বর্দ্ধমানের রাজা) ইহাতে ব্রতী হইলে অর্থ সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রমাণ চাহিবার অধিকার থাকিত না।

তাহার পর,যদি এই কলেজে প্রধানতঃ ধনী লোকের সন্তান পাঠ করে; তাহাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতার উৎসাহ কম থাকিবে। মধ্যবিত্ত লোকের পুত্রগণকে খাটিয়া খাইতে হইবে; তাহাদিগের ভবিষ্যতের উপজীবিকা ও মান তাহাদিগের পরিশ্রমের ও অধ্যয়নের উপর নির্ভর করে। সুতরাং তাহারা যত পরিশ্রম করে, আমাছিগের দেশের ধনীগণ তত শ্রম করে না। বাটীতে আমলাগণ ও স্ত্রীলোকগণ সতত বলিয়া থাকেন যে, "জমীদারের পুত্র লেখা পড়া না করিলে ক্ষতি কি,তাহার ত চাকুরী করিতে হইবে না"। জমীদার পুত্রও ভাবেন "ঠিক কথা, আমি জমীদারের ছেলে, সামান্য লোকের ছেলের মত শ্রম করিয়া পড়িবার দরকার কি ?"সুতরাং প্রস্তাবিত রাজকুমার কালেজ স্থাপিত হইলে, তাহা একটী অলস, শ্রমপরাঙ্মুখ, পরস্পরের আলস্য-পরিপোষক সম্মিলনের স্থান হইবে। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে যে সকল জমীদার পুত্রগণ স্কুলে আসিয়া নিজে লেখা পড়া করিত না, অন্য ছাত্রকেও লেখা পড়া করিতে দিত না, তাহাদিগকে লইয়া একটা Babus' class গঠিত হইত। প্রস্তাবিত রাজকুমার কলেজ একটা Babus' class বিশেষ হইবে। যে জমীদার পুত্রের প্রকৃত শিক্ষা চাহেন,তিনি মিথ্যা অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পুত্রকে রাজকুমার কলেজে না পাঠাইয়া সাধারণ কলেজে পাঠাইয়া দিবেন। এদিকে বোর্ডিং স্কুল না করিলে সমীচীন শিক্ষা হওয়া কঠিন। কিন্তু জমীদারের পরিবারের বিদেশে নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিত ব্যক্তির হস্তে আদরের প্রাণের পুত্তলিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সমর্পণ করিবেন না। কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা আমলাদিগের সংসর্গ হইতে দূরে রাখিবার জন্য কখন কখন নাবালককে দূরে পাঠান হয়। তাহাতে নাবালকের মাতা (বা অপর যিনি অভিভাবক থাকেন) বিশেষ আপত্তি করেন। উচিত ভাবে শিক্ষা দিতে যত্ন করায় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিযুক্ত কোন কোন শিক্ষককে বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। এমন কি, আমি দুইটী শ্রদ্ধেয় "private tutor and guardian" মুখে শুনিয়াছি যে, পাছে নাবালকের মাতা বা মাতুল পক্ষ হইতে লোক নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে গুপ্ত প্রহার দেয়, তজ্জন্য সাবধান থাকিতে হইত। অতিলালিত জমীদার পুত্রকে তাঁহার পিতা বা মাতা যে বাল্যকালে রাজকুমার কলেজে বাস করিতে পাঠাইয়া দিবেন,তাহার ভরসা কম।

সংক্ষেপে, (১) জমীদারদিগের দেশে এমন বিশেষ মান সম্ভ্রম নাই, যাহাতে তাহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ আবশ্যক। (২) রাজা শশীশেখরেশ্বরের এই বিষয়ের নিজের অর্থ সংস্থান নাই। (৩)ইহা যদি গবর্ণমেণ্ট কলেজ হয়, তাহা হইলে অন্য গবর্ণমেণ্ট কালেজ অপেক্ষা কি বিশেষ ভাল হইবার সম্ভাবনা, তাহা বুঝা যায় না। (৪) যদি সাধারণের চাঁদা লইয়া হয়, সাধারণের অর্থ সুব্যবহার হইবে, তাহার প্রমাণ আবশ্যক। (৫) সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক যে রূপে নির্ব্বাচিত হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবে শিক্ষক নির্ব্বাচিত হইবার উপায় দেখান হয় নাই। (৬) পাণ্ডিত্যে বা অন্যগুণে রাজা শশীশেখরেশ্বর শিক্ষা-সংস্কারক হইবার উপযোগী, বিশেষ প্রমাণ এতাবৎকাল পাওয়া যায় নাই। (৭)রাজকুমার কলেজ সংস্থাপিত হইলে শিক্ষার বিশেষ উপযোগী সময় অর্থাৎ বাল্যকালে সেখানে অনেক জমীদার পুত্র প্রেরণ না করিতে পারেন। (৮) এবং যাঁহারা সেখানে পাঠ করিবেন, তাঁহারা অলস ও দাম্ভিক হইবারই সম্ভাবনা। (৯)এবং এইরূপ কলেজ করায় জমীদার ও মধ্যবিৎ ব্যক্তিদিগের মধ্যে নিষ্প্রয়োজনে একটী ভ্রান্তিজনক ব্যবধান সৃষ্টি করা হইবে।

ভরসা করি, রাজা বাহাদুর এই নূতন সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া যাহাতে তাঁহার পুরাতন চেষ্টা "সালিসী পক্ষ বিচার" সফল হয় এবং যাহাতে সেই কার্য্যটী বহ্বাড়ম্বরে লঘু ক্রিয়া না হইয়া যায়, তৎপ্রতি যত্ন করেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

নিশা শেষে।

১

যামিনী পোহায়—
প্রাণময়ী সুখময়ী নিশা চলি যায়!
কত সুখ, কত প্রীতি, কত বিষাদের গীতি,
কত কি, সে বেঁধে নিল আঁচল-কোণায়;
আর সব যা'ক নিয়ে, মোরে শুধু যা'ক দিয়ে,
আমি যা' লভেছি পুণ্য চির সাধনায়।
অই যামিনী পোহায়।

২

যামিনী পোহায়—
ওগো! তুমি যাও দূরে, দিয়ে যাও প্রাণে পূরে,
আদর, মমতা, দয়া, দেহ যা' আমায়;
রাখিয়া প্রাণের সবি, যাও ত্রিদিবের কবি,
তোমার নন্দন বন ডাকিছে তোমায়!
অই যামিনী পোহায়।

৩

যামিনী পোহায়—
অই যে কনকাচলে, ঊষার মুকুট জ্বলে,
এখনি দেখিবে বিশ্ব চাহিয়া তোমায়;
সে চাহনি প্রীতি শূন্য, উদাস, অসূয়া পূর্ণ,
আমি তা, কেমনে স'ব, বুক ফেটে যায়!
অই যামিনী পোহায়।

৪

যামিনী পোহায়—
লহ লহ আঁখি তুলি, আমি এ জড়তা ভুলি,
আবার আসুক বল বিভল হিয়ায়;
যেন গো দাঁড়াতে উঠি, নাহি পড়ি মাথা লুটি
পুনঃ যেন রক্ত বহে শিথিল শিরায়!
অই যামিনী পোহায়।

৫

যামিনী পোহায়—
তুমি শুধু যাও রেখে, বুকে মেখে, প্রাণে মেখে
যা' দিয়েছ সারা নিশা, স্নেহ করুণায়—
প্রেমের সঞ্জীব স্পর্শ, সে সুখ, উল্লাস, হর্ষ,
সে যে কত, সে যে কি, তা বলা নাহি যায়!
অই যামিনী পোহায়।

৬

যামিনী পোহায়—
সে অমিয় মাখা চিত্র, সদ্য, স্নিগ্ধ, সুপবিত্র,
যেন গো জাগিয়া থাকে নিরালা হিয়ায়;
এমনি মন্দার-বাসে, যেন গো পরাণ ভাসে,
এ জাগ্রতি থাকে যেন আঁখির পাতায়!
অই যামিনী পোহায়!

৭

যামিনী পোহায়—
জগতে আসুক ঊষা, আমার অমূল্য ভূষা
এই নিশা—বেঁচে থাক্ দেবাশীষ প্রায়;

এ অমৃত করি পান, অমর হইবে প্রাণ,
কৈশোর, যৌবন রবে মরম-তলায়।
অই যামিনী পোহায়।

৮

যামিনী পোহায়—
অই দেখ নিশা শেষ, ডাকে তোমা সুর দেশ,
তোমার মিলন মাগে কত দেবতায়;
কুসুমিত পথ দেখে, বেলফুলে পদ রেখে,
ধীরে ধীরে যাও তব প্রিয় অমরায়;
শত বরষের শেষে, যাই যদি সেই দেশে,
এমনি এ হৃদি খানি দিব পুনরায়।
আর বেশী ক'ব কিবা, নিঠুর নয়নে দিবা,
এখনি এখনি বুঝি দেখিবে তোমায়!
যাও যাও পায়ে পড়ি, যামিনী পোহায়।

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

নবম অধ্যায়।

"পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধি ভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে।
নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে॥

অষ্টম অধ্যায়ে নাড়ীদ্বারে সগুণ ধারণা যোগ কথিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে কালান্তরে অর্চ্চিরাদি ক্রমে ব্রহ্মপ্রাপ্তি লক্ষণ অনাবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সেই যোগই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়, অন্য কোন উপায় নাই, পাছে তাহা হইতে এইরূপ আশঙ্কা হয়, এই জন্য এই অধ্যায় সাক্ষাৎ বা সদ্য মোক্ষপ্রাপ্তিসাধন ব্রহ্মজ্ঞান বা সম্যক্‌জ্ঞান—বাসুদেবই সব, আত্মাই সব, 'এক অদ্বিতীয়,—এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে (শঙ্কর)।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে মূর্দ্ধন্য (সুষুম্না মধ্যস্থ ব্রহ্ম বা চিত্রা) নাড়ী দ্বারে হৃদয় কণ্ঠ ভ্রু (পদ্ম) মধ্যে ধারণা সহকৃত সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দ্বার সংযমযুক্ত যোগে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উৎক্রান্ত প্রাণের অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি, ও সেখানে সম্যকজ্ঞান লাভান্তর কল্পান্তে পরব্রহ্ম প্রাপ্তিলক্ষণ ক্রমমুক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু গীতায় অন্যত্র (৮ অধ্যায়েরই ১৪ এবং ২২ শ্লোকে) অনন্যভক্তির দ্বারা পরমপুরুষ প্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান হইতে সাক্ষাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির বিষয় কথিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত ক্রমমুক্তির উপায় ক্লেশকর, কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান ও ভগবৎ ভক্তির দ্বারা সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি অল্পায়াসসাধ্য। নবম অধ্যায়ে সেই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে, অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যেয় ব্রহ্ম নিরূপণ ও সেই ধ্যান নিষ্ঠের গতি উক্ত হইয়াছে, আর নবমে জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিরূপণ ও জ্ঞান নিষ্ঠের গতি উক্ত হইয়াছে। (মধুসূদন)।

পরমেশ্বরতত্ত্ব ভক্তি দ্বারা সুলভ। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও ভক্তের অসাধারণ প্রভাব উক্ত হইয়াছে। (স্বামী; বলদেব)।

এই অধ্যায়ে ভক্তিরূপ উপাসনার স্বরূপ কথিত হইয়াছে। (রামানুজ)

ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি?—এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম বিষয়ক প্রশ্নদ্বয় নবম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। (নীলকণ্ঠ)

সপ্তম অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। (মাধ্ব ভাষ্য)।

শঙ্কর ও মধুসূদনের ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, গীতায় দুইরূপ মুক্তির কথা উক্ত হইয়াছে। ক্রমমুক্তি, ও সদ্যমুক্তি। যোগ বা ব্রহ্ম ধ্যান দ্বারা ক্রমমুক্তি হয়; আর জ্ঞান বা ভক্তি সাধনা দ্বারা সদ্যমুক্তি হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা কতদূর সঙ্গত, বলা যায় না। একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই আছে—যোগের দ্বারাই কেবল ভগবানকে সমগ্র বা সম্যকরূপে জানা যায়। সেই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের কথা সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সেই অধ্যায়ে আছে—"নিত্যযুক্ত এক ভক্তিমান জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ," কেননা, বাসুদেবই সব এই জ্ঞান প্রকৃতরূপে লাভ করিয়া বহু জন্ম পরে জ্ঞানী ভগবানকে প্রাপ্ত হন। ঐ অধ্যায়ের

অসূয়া বিহীন তুমি, কহিব তোমারে
বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞান গুহ্যতম,
জানি যাহা, মোক্ষ পাবে অশুভ হইতে॥১॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্য পবিত্র উত্তম
প্রত্যক্ষ গোচর ইহা, হয় ধর্ম্মযুত,
নিত্য আর আচরণে অতি সুখকর॥২॥

শেষে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা মোক্ষলাভ জন্য ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া যোগ করেন, তাঁহারাই সম্পূর্ণ রূপে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন—অর্থাৎ ব্রহ্মের অধ্যাত্ম, অধিকর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ প্রভৃতি তত্ত্ব জানিতে পারেন, এবং মৃত্যু কালেও তাঁহার সে জ্ঞান অবিকৃত থাকে। এজন্য অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিয়া যে কলেবর ত্যাগ করে সে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়, (৫ শ্লোক)। আর ব্রহ্মবিদ্‌জন অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন (২৪ শ্লোক)।

সুতরাং গীতায় বিশেষতঃ এই অধ্যায়ে সদ্যমুক্তির কথা আছে, এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলা যায়না। পূর্ব্ব অধ্যায়ের (২৪ শ্লোকের) টীকায় দেখান হইয়াছে যে, ছান্দোগ্য উপনিষদ, প্রশ্নোপনিষদ,প্রভৃতিতে ও বেদান্ত দর্শনে কেবল এই ক্রমমুক্তির কথা আছে। কেবল বৃহদারণ্যকে (৪।৪।৬) "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" এই উক্তির দ্বারা সদ্যমুক্তির আভাস আছে। শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন প্রভৃতি অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণের মতে গীতার নবম অধ্যায়ে এই সদ্যমুক্তিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে ঠিক, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই জন্য এই অধ্যায় সম্বন্ধে স্বামী, বলদেব, মাধ্বাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অধিক সঙ্গত বোধ হয়।

(১) অসূয়া বিহীন—দোষ দৃষ্টি হীন; ভগবৎ স্বরূপে উপদেষ্টা পুনঃ পুনঃ স্বমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন, এজন্য তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা বা দোষ দৃষ্টি সম্ভব থাকিলেও, যিনি তাঁহাতে দোষদৃষ্টি বিহীন (স্বামী)। গুণে দোষদৃষ্টি—অসূয়া; সর্ব্বদা আত্মৈশ্বর্য্য উপাখ্যান দ্বারা আত্ম-প্রশংসা হেতু উপদেষ্টার প্রতি দোষদৃষ্টি সম্ভব হইলেও যিনি এরূপ দোষদৃষ্টি বিহীন। ইহা দ্বারা আর্জ্জব সংযম প্রভৃতি শিষ্যগুণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে (মধুসূদন)।

বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান—(সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। অনুভবযুক্ত সম্যক্ সাক্ষাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি সাধন জ্ঞান (শঙ্কর)। বিশেষ জ্ঞান, অর্থাৎ যাহা দ্বারা বিশেষ রূপে জানা যায়, সেই উপাসনাই বিজ্ঞান (স্বামী)। শব্দ প্রমাণক ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান; বিজ্ঞান সহিত অর্থাৎ ব্রহ্ম অনুভব পর্য্যন্ত (মধু)। উপাসনাগত বিশেষ জ্ঞানই বিজ্ঞান (রামানুজ)।

গুহ্যতম—অতি গোপনীয় (শঙ্কর, মধু)। "ধর্ম্ম জ্ঞান—গুহ্য, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান—গুহ্যতর; আর পরমাত্মজ্ঞান, অত্যধিক রহস্যযুক্ত বলিয়া গুহ্যতম (স্বামী); অথবা দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান—গুহ্য,ভগবানের ঐশ্বর্য্য বিষয়ক জ্ঞান,—গুহ্যতর, আর পরমাত্মজ্ঞান,—গুহ্যতম (বলদেব)।

অশুভ—সংসার বন্ধন (শঙ্কর, স্বামী, মধু) ভগবানকে পাইবার বিরোধী সমুদায়ই অশুভ (রামানুজ)।

(২) রাজবিদ্যা—বিদ্যার রাজা, (রামানুজ) সর্ব্ববিদ্যা অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যাই নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর) সর্ব্ব অবিদ্যা বিনাশক বলিয়া বিদ্যার রাজা (মধু)।

রাজগুহ্য—গুহ্যদিগের মধ্যে রাজা (শঙ্কর) গোপনীয় বিদ্যার মধ্যে অত্যন্ত রহস্যযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ (স্বামী)। অনেক জন্ম সুকৃতসাধ্য বলিয়া অধিকাংশ লোকের অজ্ঞাত (মধু)।

রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য,—অর্থাৎ রাজাগণের বিদ্যা—রাজাগণের গোপনীয়। এরূপ অর্থও হইতে পারে (স্বামী)। যাঁহারা রাজাদিগের ন্যায় উদারচেতা ও স্বর্গাদি ভোগে নিস্পৃহ, যাঁহারা রাজাগণের মন্ত্রণা গোপনের ন্যায় এই ব্রহ্ম বিদ্যা গোপনে সাধন করেন, তাঁহাদের এই বিদ্যা (বলদেব)। রাজার ন্যায় মহামনাগণই এই তত্ত্ব জানিতে পারেন (রামানুজ)

উপনিষদ,বিশেষতঃ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের অনেক স্থলে পাওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয় রাজাদের নিকট হইতেই ব্রাহ্মণগণ অনেক স্থলে এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। আর গীতার চতুর্থ অধ্যায়

হইতে জানা যায় যে, এই গীতোক্ত ধর্ম্ম ভগবান প্রথম বিবস্বতকে বিবস্বত মনুকে ও মনু পরবর্ত্তী ক্ষত্রিয়-রাজাগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং এ ধর্ম্ম পূর্ব্ব হইতেই বরাবর ক্ষত্রিয় পরম্পরা চলিয়া আসিয়াছিল, ইহা গীতা হইতেই জানা যায়।

এই ব্রহ্ম বিদ্যা গোপনীয় কেন, তাহার কতকটা কারণ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৬—২৯ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

পবিত্র, উত্তম—অত্যন্ত পূতকর, শুদ্ধিকর। শুদ্ধিকর যাহা কিছু আছে, সর্ব্বাপেক্ষা এই ব্রহ্মজ্ঞান উৎকৃষ্ট। কেননা, অনেক সহস্র জন্ম সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ কর্ম্ম মূল ইহা দ্বারা ক্ষণমাত্রে ভস্মীভূত হয়, (শঙ্কর) ও পুনর্ব্বার পাপ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব হয়।

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কোন একটী পাপ নিবৃত্ত হয়, নিবৃত্ত হইয়া স্বকারণে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, পুনরায় সূক্ষ্মাবস্থা হইতে পুরুষেরা সেই পাপ বৃদ্ধি করেন। কিন্তু এই জ্ঞান অনেক সহস্র জন্ম সঞ্চিত সমুদায় স্থূল সূক্ষ্ম পাপ ও তৎকারণ অজ্ঞানকে সদ্য উচ্ছেদ করে, এইজন্য ইহা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রকর। (মধু)।

প্রত্যক্ষ গোচর—(মূলে আছে) "প্রত্যক্ষাবগমং")। সুখাদির ন্যায় অনুভবযোগ্য (শঙ্কর)। যাহার স্পষ্ট অবরোধ হয়, যাহার ফল দৃষ্ট (স্বামী)। অবগম—অর্থাৎ বিষয়, যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়। যে ভক্তিযোগে আমার উপাসনা করে, আমি তাহারই অন্তরে প্রত্যক্ষ হই (রামানুজ)। ইহা দ্বারা প্রত্যক্ষ জানিতে পারা যায়; অবগম—অর্থাৎ প্রমাণ; অর্থাৎ ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। অথবা প্রত্যক্ষ দ্বারা পাওয়া যায়—এই অর্থে অবগম, অর্থাৎ ফল; যাহার ফল প্রত্যক্ষ। এই জ্ঞান স্বরূপতঃ অন্তঃসাক্ষী-প্রত্যক্ষ—এই জন্য ইহার অবগম বা প্রমাণ-প্রত্যক্ষ; ফলেতেও ইহা অন্তঃসাক্ষীপ্রত্যক্ষ, কেননা আত্মা দ্বারা ইহা বিদিত হইয়াছে অর্থাৎ আমি ইহা জানিয়াছি, অতএব ইদানী ইহা ইষ্ট নহে-এস্থলে আমার অজ্ঞান রহিয়াছে, এইরূপ সর্ব্ব লোকের আত্মসাক্ষী অনুভব হয়।" (মধুসূদন)। অর্থাৎ এইরূপে সকলেই আপনার অন্তরে দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা আত্মার অনুভব করেন। কিন্তু এই আত্মানুভূতির দ্বারা পরমাত্মাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করার কথা এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

এই অধ্যায়ে যে ঈশ্বরতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, সেই তত্ত্বজ্ঞান অপরোক্ষ অনুভবসিদ্ধ, অথবা অন্তঃপ্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে, কিন্তু কেবল "অধ্যাত্মভাব—উপলব্ধির দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় না। অধিভূত, অধিযজ্ঞাদি ভাবের অন্তরপ্রত্যক্ষ না হইলে সমগ্র জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না।

ধর্ম্মযুত—(মূলে আছে "ধর্ম্ম্য") ধর্ম্ম সঙ্গত। বৈদিক যজ্ঞ (যেমন শ্যেন যাগ) অনেক গুণযুক্ত হইলেও হিংসাদি জন্য—ধর্ম্মবিরোধী। কিন্তু আত্মজ্ঞান সেরূপ ধর্ম্মবিরোধী নহে। (শঙ্কর) যজ্ঞে পশু বলির ব্যবস্থা আছে। এই বলি অহিংসা ধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু যজ্ঞ দ্বারা অনেক অদৃষ্ট ফল লাভ হয়—তাহাতে শুভাদৃষ্ট লাভ হয়। অতএব বৈদিক কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই লাভ হয়। এজন্য যজ্ঞফলে মুক্তি হয় না—স্বর্গভোগের পর সেই ধর্ম্মক্ষয়ে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু জ্ঞান সেরূপে কোন ধর্ম্মবিরোধী নহে। এজন্য ইহা সম্পূর্ণ ধর্ম্মসঙ্গত।

ইহা (অর্থাৎ এই জ্ঞান) দ্বারা বেদোক্ত সর্ব্ব ধর্ম্ম ফল লাভ হয় (স্বামী)। ইহা দ্বারা অনেক জন্ম সঞ্চিত নিষ্কাম ধর্ম্ম ফল লাভ হয় (মধু)। নিঃশ্রেয়সরূপ আত্যন্তিক আমার প্রাপ্তি সাধন (রামানুজ)।

নিত্য—ইহার ফল অক্ষয় (স্বামী, মধু), যে কর্ম্ম অল্পায়াসসাধ্য, তাহার ফল অল্প। যাহা দুষ্কর, তাহাতে মহতী ফল লাভ হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এই ধর্ম্ম আচরণে সুখকর হইলেও ইহাতে অনন্ত ফল লাভ হয়, কেন না, মোক্ষেও এই জ্ঞান থাকে। (শঙ্কর, মধু)।

আচরণে সুখকর—অল্পায়াস সাধ্য (স্বামী); ইহাতে কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজন নাই। শ্রবণ মনন দ্বারা গুরু দর্শিত উপায়ে বেদান্ত বাক্য বিচার দ্বারা সহজে লাভ করা যায়। ইহা দেশ কালাদি ব্যবধান অপেক্ষা করে না। প্রমাণ বস্তুপরতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান এরূপ অনায়াসসাধ্য (মধু)।

শ্রুতিতে আছে "যোবা এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষ সহস্রাণ্যন্তর দেবাস্য তদ্ভবতীতি।

এই ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন পুরুষ যাহারা
না লভি আমারে, তারা করে আবর্ত্তন
হে অর্জ্জুন, মৃত্যুযুত সংসারের পথে ॥৩॥
অব্যক্ত মূরতি—আমা দ্বারা আছে ব্যাপ্ত
এ জগৎ সমুদায়, আমাতে সংস্থিত
সর্ব্বভূত, নহে আমি তাহে অবস্থিত ॥৪॥
নহে পুন ভূতগণ আমাতে সংস্থিত,

(৩) এই ধর্ম্মে—আত্মজ্ঞানে (শঙ্কর, মধু); ভক্তি সহিত জ্ঞান লক্ষণ ধর্ম্মে (স্বামী); উপাসনাখ্য ধর্ম্মে (রামানুজ) ভক্তি লক্ষণ ধর্ম্মে (বলদেব, বিশ্বনাথ)।

শ্রদ্ধাহীন—আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ে এবং তাহার ফলে শ্রদ্ধাবিরহিত নাস্তিক পাপকারী অসুরদের উপনিষদ্ হইতে দেহ মাত্র আত্মা এইরূপ দৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে। (শঙ্কর)

শঙ্করাচার্য্য এস্থলে ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের ৭।৮ খণ্ডের ইন্দ্রবিরোচন সংবাদ উল্লেখ করিয়াছেন।]

বিশ্বাস পূর্ব্বক শ্রদ্ধা যাহার নাই (রামানুজ)।

না লভি আমারে—ঈশ্বর প্রাপ্তিমার্গসাধন বেদ ও ভক্তি মাত্র না পাইয়া(শঙ্কর), আমার প্রপ্তি জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া যত্ন করিয়াও আমার না পাইয়া (স্বামী)।

বেদ বিরোধী কুহেতু দর্শন দূষিত অন্তঃকরণ বশতঃ এই ধর্ম্মকে প্রামাণ্য বলিয়া অস্বীকারকারী আসুর সম্পদযুক্ত পাপী লোক স্বকপোলকল্পিত শাস্ত্র অবিহিত উপায়ে কথঞ্চিৎ সাধনা করিয়াও আমাকে পায় না। (মধু)।

ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন অর্থাৎ এই ধর্ম্মকে যাহারা শ্রদ্ধা করে না, বা বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করে না। (স্বামী)।

মৃত্যুযুত সংসারের পথে—নরক তির্য্যগাদি প্রাপ্তি মার্গে (শঙ্কর, মধু)।

(৪) অব্যক্ত মূরতি—করণ বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্বরূপে (শঙ্কর); অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তিতে (স্বামী); সর্ব্বইন্দ্রিয়ের অগোচর, স্বপ্রকাশ, অদ্বয়, চৈতন্য, সদানন্দ রূপে (মধু)। অপ্রকাশিত স্বরূপে, অন্তর্য্যামীরূপে (রামানুজ)।

আমা দ্বারা—আমার শ্রেষ্ঠ ভাব দ্বারা (শঙ্কর); কারণভূত আমাদ্বারা (স্বামী); অন্তর্য্যামী আমা দ্বারা—অধিষ্ঠান পরমার্থসত্বা স্ফুরণরূপ আমা দ্বারা (মধু)।

এ জগৎ সমুদায়, আমাতে সংস্থিত—সর্ব্বভূত, নহে আমি তাহে অবস্থিত। নহে পুন ভূতগণ আমাতে সংস্থিত,

আছে ব্যাপ্ত—শ্রুতিতে আছে;—

"স সৃষ্টা তদেবানুপ্রবিশদিতি (স্বামী)।

যেমন রজ্জুতে সর্প—অজ্ঞানজ কল্পনা বলে ব্যাপ্ত, সেইরূপ ব্যাপ্ত (মধু)।

ঈশোপনিষদের প্রথমেই আছে:—"ঈশাবাস্য মিদ্ধং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

এ জগৎ সমুদায়—ভূত, ভৌতিক ও তৎকারণ রূপ দৃশ্যজাত আমার অজ্ঞান কল্পিত সর্ব্বজগৎ (মধু)।

সর্ব্বভূত—ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমুদায় (শঙ্কর); চরাচর (স্বামী); স্থাবর, জঙ্গম সমুদায় (মধু)।

আমাতে সংস্থিত—ব্যবহারিক ভাবে নিরাত্মক কোন ভূত কল্পিত হয় না, এজন্য তাহারা আত্মস্বরূপ আমা দ্বারা আত্মরূপে স্থিত (শঙ্কর)।

অন্তর্য্যামী রূপে স্থিত (রামানুজ) শ্রুতিতে আছে "যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরযময়তি যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো সময়তি ইতি।" অতএব ভগবান নিয়ামকরূপে জগতে স্থিত (রামানুজ)।

মূঢ় বুদ্ধিরাই বলে যে, সেই সকল ভূতগণের আমি আত্মা। এই জন্য আমি তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিত। এইরূপ ধারণা নিবারণ জন্যই পরে বলা হইয়াছে, "নহে আমি তাহে অবস্থিত" (শঙ্কর)।

নহি অবস্থিত—আমি অমূর্ত্ত, ভূতগণের সহিত অসংশ্লিষ্ট, আকাশকেও আমি ব্যাপিয়া আছি, এই জন্য (শঙ্কর)। নিমিত্তকারণ মৃত্তিকা যেমন কার্য্যরূপ ঘটে অবস্থিত, আকাশের ন্যায় অসঙ্গ বলিয়া আমি সেরূপ অবস্থিত নহি (স্বামী)। পরমার্থতঃ আমি কল্পিত ভূতগণ মধ্যে অবস্থিত নহি, কেননা, কল্পিত ও অকল্পিত মধ্যে সম্বন্ধযোগ নাই (মধু)। জগতের স্থিতি আমার অধীন, কিন্তু আমার স্থিতি জগতের আয়ত্ব বা অধীন নহে (রামানুজ)।

(৫) নহে আমাতে সংস্থিত—যাহার কিছুরই সহিত সংসর্গ নাই, যাহা অসঙ্গ বা সম্বন্ধ বিরহিত, তাহা আধেয় ভাবেও থাকিতে পারে না, একারণ ভূতগণ আমাতে অবস্থান করে না, ইহা বলা যায়

হের মম ঐশ্বরীয় যোগ,—আত্মা মম
ভূতভর্ত্তা, ভূতপাতা—নহে ভূতেস্থিত ॥৫॥

(শঙ্কর)। যেমন জলতরঙ্গে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য বহুরূপে প্রতিভাত, সেইরূপ ভূতগণও আমাতে কল্পিত। পরমার্থতঃ তাহারা আমাতে অবস্থিত নহে (মধু)। যেমন জল ঘটে অবস্থিত, কিন্তু ঘট জলে অবস্থিত নহে (রামানুজ)।

হের—প্রাকৃত বা সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া দেখ (মধু)।

ঐশ্বরীয় যোগ—(মূলে আছে 'যোগৈশ্বরং') ঈশ্বরের মাহাত্ম্য (শঙ্কর); অসাধারণ অঘটন ঘটনা চাতুর্য্য, যোগমায়া বৈভব (স্বামী, মধু)। আমি কিছুরই আধেয় নহি, আধারও নহি; তথাপি সর্ব্বভূত আমাতে ও আমি সর্ব্বভূতে অবস্থিত। ইহাই মহতী মায়া (মধু)। ব্রহ্মের সহিত জগতের এই সম্বন্ধ ব্রহ্মের সংকল্পজাত এই যোগ—অন্যত্র অসম্ভব, ইহা অসাধারণ (রামানুজ)

ভূতভর্ত্তা—(মূলে আছে 'ভূতভৃৎ') ভূতধারক (স্বামী); কার্য্যরূপ ভূতগণকে উপাদান স্বরূপে ধারণকর্ত্তা ও পোষণকর্ত্তা (মধু),।

ভূতপাতা—(মূলে আছে—ভূতভাবন) ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি কর্ত্তা (শঙ্কর); ভূতগণের পালনকর্ত্তা (স্বামী); কর্ত্তৃত্ব হেতু সর্ব্বভূতের উৎপাদক (মধু)। এইরূপে অভিন্নভাবে ভূতগণের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। (মধু) আমি ভূতগণের কর্ত্তা, কিন্তু ভূতগণ কেহই মমাকার নহে। আমার আত্মাই ভূতভাব; আমার মনোময় সংকল্পই ভূতগণের ভাবী পিতা ও নিয়ন্তা (রামানুজ)।

আত্মা মম—আমার পরম স্বরূপ (স্বামী); আত্মার অন্য আত্মা নাই। রাহুর শিরের ন্যায় ইহা কল্পনা ষষ্ঠী। যেমন দেহধারী ও দেহপালক জীব অহঙ্কারবশে আপনাকে দেহ সংশ্লিষ্ট মনে করে; কিন্তু অহঙ্কারবিহীন বলিয়া আমি ভূতগণকে ধারণ ও পালন করিলেও আমি তাহাতে অবস্থিত নহি (স্বামী, শঙ্কর) পরমার্থ স্বরূপ; সচ্চিদানান্দঘন অসঙ্গ, অদ্বিতীয় স্বরূপ (মধু)।

নহে ভূতেস্থিত—পরমার্থতঃ ভূতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে—স্বপ্নে দৃষ্ট সম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধযুক্ত

মহান সর্ব্বত্রগতি বায়ু যেইরূপ
আকাশে সংস্থিত, নিত্য; জানিও সেরূপে
সমুদায় ভূতগণ আমাতে সংস্থিত ॥৬॥

(মধু)। শ্রুতিতে আছে "অনঙ্গোঽয়ং আত্মা" সাংখ্য প্রবচনে আছে—"অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ।"

(৬) সংস্থিত—সংশ্লেষ ব্যতীত অবস্থিত (স্বামী, মধু)।

স্যাগর সন্নিবৃত্তি রিন্দোর্ব্বিভাগঃ।
স্ফুরাণি বায়ো নিয়মদ্বিহঙ্গা
গতযস্ত রাম বিষ্ণেহানিত্বিত্রা ঃ প্রভবন্তি মায়া ॥

শাস্ত্রে আছে—"যথা দুর্ব্বেদবিদঃ মেধোদয়ঃ

শ্রুতিতে আছে, এতস্য বা "অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতা তিষ্ঠতঃ।"

অন্যত্র আছে—

"ভীষা স্মাদ্বাতঃ বহতে ভীষাদেতি সূর্য্যঃ
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চন্দ্র মৃত্যু র্দ্ধাবতি পঞ্চম।"

অতএব ভগবানের সংকল্প হইতেই সকলের স্থিতি। (রামানুজ)।

নিত্য—সর্ব্বদা, উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার কালেও প্রবাহিত (মধু)।

উল্লিখিত তিন শ্লোকে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, ইহাই গুহ্যতম তত্ত্ব। বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞানই রাজগুহ্য বিদ্যা। সুতরাং এস্থলে এই তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। আমরা উল্লিখিত শ্লোক হইতে এই কয়টী তত্ত্ব পাইয়াছিঃ—

১। ভগবানের অব্যক্ত মূর্ত্তির দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত।

২। ভূত সকল তাঁহাতে স্থিত, আবার ভূত সকল তাঁহাতে স্থিত নহে।

৩। ভগবান—ভূতভর্ত্তা ও ভূতভাবন অথচ তিনি ভূত সকলে অবস্থিত নহেন।

একে একে আমরা এই সকল তত্ত্বের সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

১। ভগবানের অব্যক্ত মূর্ত্তির দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত। এই অব্যক্ত মূর্ত্তি কি কূটস্থ চৈতন্য ভাব? প্রায় সকল ভাষ্য ও টীকাকারগণ এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু এই "অব্যক্ত মূর্ত্তির অর্থ অন্যরূপ করা যায়। যাহা ব্যক্ত মূর্ত্তি নহে, যাহা manifest হয় না,

phenomenon রূপে যাহা প্রকাশিত হয় না, যাহা immanent নহে, যাহা noumenon, absolute, unmainfested, এক কথায় যাহা transcendental তাহাই এই অব্যক্ত মূর্ত্তি। এই জ্ঞানাতীত transcendent ভাবের অন্তর্গত জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধ হইতে যে পর্য্যন্ত আমাদের এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞেয়, অব্যক্ত ভাব—তাহা immanent। এই immanent অব্যক্ত ভাবই জীব ও জগৎ রূপে অভিব্যক্ত। অতএব জগৎ সমুদায় ব্রহ্মের immanent ভাব দ্বারা ব্যাপ্ত। আর সেই immanent ভাব transcedent ভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত।

গীতায় সর্ব্বত্র এইরূপ কথাই আছে। গীতার সমস্ত অধ্যায় বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মের জড়রূপা অপরা প্রকৃতি আর জীবরূপা পরা প্রকৃতি, জগতের যোনী। ইহাই মহৎ ব্রহ্ম; আদি শক্তিরূপে জগতের উপাদান কারণ। আর ব্রহ্মের পরম পুরুষ ভাব—Logos, idea—রূপে জগতের নিমিত্ত কারণ। শব্দ ব্রহ্মরূপে সেই idea গণের অভিব্যক্ত হয়। Logos এর ideas বীজ রূপে মহৎ ব্রহ্মে বা প্রকৃতি রূপা ব্রহ্মে নিহিত হইয়া—তদনুসারে প্রকৃতিকে পরিণত করে। ব্রহ্ম পুরুষের সংকল্প বা ঈক্ষণ হইতেই শক্তিময়ী ব্রহ্মপ্রকৃতিতে এই জগতের বিকাশ হয়। আমরা জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধ বিহীন absolute, transcendent ব্রহ্মতত্ত্ব এই জ্ঞানে অর্থাৎ জ্ঞাতা-জ্ঞেয়রূপ দ্বৈতাত্মক জ্ঞানে জানিতে পারি না। কিন্তু জগৎ ও জীবের সহিত সংসৃষ্ট relative transcendet ব্রহ্মতত্ত্ব সাধনাবলে বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারি। আমাদের এই মায়াবদ্ধ অজ্ঞানাবৃত দেশকালসীমাবদ্ধ জ্ঞানে বলিতে পারি যে, ব্যক্তজগৎ অব্যক্ত ব্রহ্মের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ। "পাদোঽস্য বিশ্ব-ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" অতএব আমাদের এই জ্ঞানে transcendent ব্রহ্মের অতি ক্ষুদ্র অংশ immanent ব্রহ্ম।

যাহা হউক, গীতা হইতে আমারা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মের দুই ভাব। এক—পরম অব্যয় অনুত্তম (absolute, transcendental) ভাব। আর এক—অব্যক্ত ভাব (immanent) যাহা ব্যক্ত বা manifest হয় (গীতা—৭।২৪।৮।১৮। যাহা পরম অব্যয় অক্ষর ভাব, তাহা এই অব্যক্ত ভাবের অতীত, সেই ভাব হইতে ভিন্ন, অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন (৮।২০)। গীতাতে এই transcendental ব্রহ্মকেও পরম পুরুষ বলা হইয়াছে। ইতি অজ, অনাদি লোক মহেশ্বর (১০।৩)। ইনিই পরমব্রহ্ম, পরমধাম, পরমপবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, নিত্যবিভু বলিয়া কথিত। ইনি কূটস্থ হইতে ভিন্ন(১৫।১৭) ইনিই immanentভাবে সর্ব্বভূতাশয়স্থিত আত্মা, সর্ব্বভূত বীজ ও একাংশে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন (১০।১২) জীবভূত পরাপ্রকৃতি তাঁহারই একাংশ। বিরাটরূপ ইহারই ব্যক্ত ঐশ্বরীয় রূপ (১১।৩)।....।

২। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, জগৎ ও ভূত সকল অজ্ঞান কল্পিত। অজ্ঞান বশে যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান নিহিত—সেইরূপ ব্রহ্মেতেই জগৎ জ্ঞান নিহিত। সুতরাং ব্যবহারিক ভাবে ভূতগণ ব্রহ্মে অবস্থিত; কিন্তু পরমার্থিক ভাবে জগৎ মিথ্যা বলিয়া ভূতগণ ব্রহ্মে অবস্থিত নহে। দ্বৈতবাদীরা বলেন, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় ভূতসকল ব্রহ্মে স্থিত অথচ স্থিত নহে। অর্থাৎ স্থিত বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট নহে। ষষ্ঠ শ্লোকের আকাশ ও বায়ুর তুলনায় এই কথা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

অন্যত্রও এই কথা আছে—

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতে দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥
(গীতা ১৩।৩২)

সে যাহা হউক, উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বলা যায় যে, transcendent ব্রহ্মের সহিত জীবের কোন সংস্রব নাইত; immanent ব্রহ্মেই তাহারা অবস্থিত। এই immanent ভাব সম্বন্ধেই গীতায় উক্ত হইয়াছে—

বহিরন্ত ভূতানাং অচরং চরমেবচ
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চতৎ।
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্ত মিব চ স্থিতং
(১৩।১৫-১৬)

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
(১৩।২৭)

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃর্দ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
(১৮।৬১)

৩। উল্লিখিত কারণেই ব্রহ্ম immanent রূপে সর্ব্বভূতের আত্মা, তাঁহারই একাংশ জীবরূপে অভিব্যক্ত, সুতরাং তিনি ভূতভাবন ও ভূত ভর্ত্তা; কিন্তু—transcendent রূপে তিনি জগতে বা ভূত সকলে অবস্থিত নহেন—সে রূপে তিনি unrelated absolute.

আরও এক কথা বলা যায় যে,যাহা যাহার ব্যাপক সে তাহাতে অবস্থিত হইতে পারে না। অংশ কোন পাত্র মধ্যে থাকিলে, সেই পাত্রস্থ বায়ুকে সমগ্র বায়ু বলা যায় না। অতএব ব্রহ্মের সামান্য অংশ ভূত সকল হইলেও—ভূত সকলে সমগ্র ব্রহ্ম অবস্থিত হইতে পারেন না। নিষ্কল ব্রহ্মের অংশ কল্পনা ভ্রমাত্মক হইলেও অবিরোধ ভাবে এ সকল তত্ত্ব বুঝিতে হইলে এরূপ কল্পনা করিতে বাধ্য হইতে হয়।

যাহা হউক, এ বিষয়ের আর বিস্তারিত আলোচনার এস্থলে প্রয়োজন নাই। তবে আর একটী কথার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এইস্থলে দেখা যায়, ব্রহ্মতত্ত্বে পরস্পর বিরোধী তত্ত্বের সামঞ্জস্য হইয়াছে। ব্রহ্ম, ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত; ব্রহ্ম immanent অথচ transcendent; ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে অবস্থিত অথচ সর্ব্বভূতে অবস্থিত নহেন; ভূত সকল ব্রহ্মে অবস্থিত, আবার ভূত সকল ব্রহ্মে অবস্থিত নহে। ব্রহ্মতত্ত্বে এই সকল দ্বন্দ্বের বা thesis ও antithesis এর synthesis বা সামঞ্জস্য বা একীভূত করাই আশ্চর্য্য ঐশ্বরীয় যোগ। [জর্ম্মাণ পণ্ডিত সেলিং ও হেগেল হইতে—এই সামঞ্জস্য তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়।]

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

দ্বিজত্ব।

পূর্ব্বে এক প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, হিন্দু-জীবনের আদ্যকালে, প্রায় ৬০০ বৎসর ব্যাপক সময়ে জাতিভেদ প্রথা ছিল না; কিন্তু ছিল আর্য্যানার্য্যের বিবাদ। রাজত্ব-লোভী শ্বেতকায় আর্য্যগণ কৃষ্ণকায় অনার্য্যগণের দেশ, বাড়ী, ঘর বিধ্বস্ত করিয়া, গো, মেষ, মহিষ ও কৃষিজাত দ্রব্যসকল অপহরণ করিয়া আপনারা যত ক্ষমতাশালী ও লব্ধাধিকার হইতেছিলেন, অনার্য্যগণ তাঁহাদিগকে তত শত্রু মনে করিয়া প্রত্যেক সুবিধায় আক্রমণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। যে জাতি হইতে শ্যামবর্ণ লঙ্কেশ্বর রাবণের উৎপত্তি বলিয়া বর্ণিত, যে জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ দুর্য্যোধন উত্তর-ভারতের সিংহাসন শোভিত করিয়াছিলেন বলিয়া কল্পিত, বেদ-বর্ণিত সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে জ্ঞান, বুদ্ধি ও ক্ষমতায় নিতান্ত হীন ছিলেন, এরূপ বিবেচনা করা ভুল। তবে অল্প সংখ্যক জাপকর্ত্তৃক সেদিন আমাদের চক্ষের উপরে চীনগণ যেমন লাঞ্ছিত হইলেন, অল্প সংখ্যক ইংরেজ হস্তে যেমন মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল; অল্প সংখ্যক পাঠানেরা যেমন হিন্দু রাজত্ব বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তেমন অল্প সংখ্যক আর্য্যগণ বৈদিক সময়ে অনার্য্য ভারতে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের চীনগণ যেমন জাপদিগের নিকট অস্পৃশ্য নহে, মোগলের পক্কান্ন যেমন ইংরেজদের অখাদ্য নহে, হিন্দুর হস্তে খাইলে যেমন পাঠানের জাতি যাইত না, সেই প্রকারে জিত অনার্য্যগণের অন্নজল গ্রহণে জেতৃজাতি আর্য্যগণের জাত্যংশে কোন দোষ আসিত না। ফলে সেই সময়ে জাতি-ভেদ কুপ্রথার সৃষ্টি হয় নাই।

কিন্তু হিন্দুজীবনের প্রথম ৬০০ বৎসরের পরে জাতিভেদের কিঞ্চিৎ সূচনা হইল। নূতন দেশে অধিকার বিস্তার ও তত্রত্য ফল-

শস্যের অপর্য্যাপ্ততা বশতঃ যখন সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন পূর্ব্বের অতি সরল উপাসনা পদ্ধতি বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞাড়ম্বরে পরিণত হইল। যে সকল আর্য্যগণ পূর্ব্ব কবিগণের ঋকগুলি অধিকতর অভ্যাস ও কণ্ঠস্থ করিতেন, সমাজে তাঁহাদের একটী বিশেষ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিল; কেন না, তাঁহারাই আড়ম্বরপূর্ণ বৃহৎ যজ্ঞ সম্পাদনে অধিকতর যোগ্য বিবেচিত হইতেন। যোদ্ধৃবর্গকে অনবরত দেশ জয় ও দেশ রক্ষা করিতে হইত। কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায়িগণের দ্বারও উন্মুক্ত। তাঁহাদের শক্তিও সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতে লাগিল। অনার্য্যগণ জিত হইলেও এই ত্রিবিধ সামাজিক শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে প্রথমতঃ চারিটী শ্রেণীর রেখাপাত হইল। (১) পুরোহিত, (২) রাজকর্ম্মচারী ও যোদ্ধৃবর্গ, (৩) বাণিজ্য ও কৃষি-ব্যবসায়ীগণ, (৪) প্রত্যেক বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বী অনার্য্যগণ। ইঁহাদেরই শাস্ত্রীয় নাম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। কিন্তু এ সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণী বিশেষ (classes), কিন্তু পানাহারবর্জ্জিত জাতিবিশেষ (caste) নহে।

ভাবিয়া দেখিলে বর্ত্তমান সময়েও আমরা এইরূপ একটী শ্রেণীবিভাগের অন্তর্গত। যে অবস্থায় এদেশে একবার জাতিভেদের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল, আমরা ঠিক সেই অবস্থার সন্ধিস্থলে সম্প্রতি দণ্ডায়মান আছি। আজও দেশে জেতৃজাতি সেই শ্বেতবর্ণ আর্য্যগণের একটি শাখা; আর, অধুনা ভারতীয় যাবতীয় অধিবাসী জিত ও শতকরা ৭৫ জনেরও অধিক কৃষ্ণ বা তন্নিকটবর্ত্তি-বর্ণান্বিত। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের ভারতীয় জনসংখ্যাকে চারিভাগ করিলে, সেই প্রাচীন চারিভাগের সহিত অতি সুন্দর সাদৃশ্য স্থাপিত হয় এবং জাতিভেদের স্থূল মর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়।

(১) ব্রাহ্মণ (Missionaries) বা জেতৃ-জাতীয় ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়।

(২) ক্ষত্রিয় (civil and military servants) শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারী ও যোদ্ধৃগণ।

(৩) বৈশ্য (Merchants and planters) বাণিজ্য ও কৃষি-ব্যবসায়ি-জেতৃগণ।

(৪) শূদ্র (natives) সকল বিভাগে অল্প বিস্তর লব্ধ প্রবেশ ও শ্রমবিভাগের দেশীয়গণ।

সুতরাং আজ ইংরেজজাতি ভারতীয় অধিবাসী সম্বন্ধে যেরূপ সামাজিকাবস্থাপন্ন, সে সময়ের আর্য্যজাতিও অনার্য্যজাতি সম্বন্ধে সেইরূপ বরং তদপেক্ষা গাঢ়তর সামাজিকতায় আবদ্ধ ছিলেন। কেননা, ইংরেজ এ দেশে বিদেশীয়, কিন্তু আর্য্যজাতি উপনিবেশী, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয় ছিলেন না। দেখ, এই অল্পকালের মধ্যেই দুইশত বৎসর অতীত হইতে না হইতেই এবং অন্যত্র স্বজাতি ও বাসগৃহ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ কত বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন করিয়াছেন। ভারতবাসিনীর গর্ভে যেমন ইংরেজের সন্তান উৎপন্ন হইতেছে, তেমন ইংরেজ-মহিলার গর্ভে ভারতবাসীর সন্তানোৎপত্তিও বিরল নহে। সুতরাং যখন আর্য্যজীবন ভারতবর্ষে ৬০০ বৎসর অতীত হইয়া গেল, তখন পূর্ব্বোক্ত গাঢ়তর সম্বন্ধ বশতঃ ভারতবাসী অনার্য্যগণের সহিত তাঁহাদের কিরূপ রক্ত-বিনিময় হইতেছিল, তাহাত সহজেই বুঝা যায়। এই প্রকারে দ্বিজত্বের সৃষ্টি।

বর্ত্তমান সময়ের ইউরোপীয় এবং ভারত-

বাসী কর্ত্তৃক ইংরেজ মহিলা গর্ভজাত সম্প্রদায় যেমন দেশীয়গণের সহিত না মিশিয়া জেতৃ বিদেশীয়গণের সহিত মিশিতেছেন, * সেই সময়ের অনুলোম ও প্রতিলোম দ্বিজগণও বর্ণভেদ না থাকায় এবং শ্রেণীভেদেরও প্রখরতা না থাকায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবিধ আর্য্যগণের সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন যে সকল শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের সমকক্ষ ছিলেন, তাঁহারা বর্ণভেদ প্রথা না থাকা বশতঃ তত্তৎশ্রেণীর সহিত যে আদান প্রদানে বিরত ছিলেন, তাহারই বা প্রমাণ কোথা? অতএব আদি শ্রেণী চতুষ্টয়ে (বর্ণভেদ প্রথা রীতিমত স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই) দ্বিজত্বের দুটী স্তর অনুভব করা যায়। (১) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীত্রয়ের আদান প্রদান বশতঃ দ্বিজত্ব। (২) শঙ্করোৎপন্ন জনসংখ্যার সহিত মৌলিক শ্রেণী চতুষ্টয়ের সংশ্রবোৎপন্ন দ্বিজত্ব। প্রথম প্রকার দ্বিজের উত্তম উদাহরণ ব্যাসদেব। দ্বিতীয় প্রকার দ্বিজের উত্তম উদাহরণ অশ্বত্থামা। †

দ্বিজত্বই সকল অনর্থের মূল। ইহার প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যেই বর্ণভেদের সৃষ্টি। দ্বিজত্ব হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রমশঃ বর্ণের গৌরবত্ব পরিহার করিয়া কৃষ্ণবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং শূদ্রগণও দ্রুতবেগে গৌরত্বাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন দেখা গেল যে, কৃষ্ণবর্ণের সহিত আদান প্রদান রহিত করিতে না পারিলে অচিরে আর্য্যগণের গৌরবর্ণত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হইবে। এজন্য আর্য্যহৃদয়ে পৃথক থাকিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। বোধ হয়, এতাদৃশ ইচ্ছা হইতেই অহোরাত্র যজ্ঞোপবীত ধারণের ইচ্ছা অঙ্কুরিত হইল। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভরদ্বাজ, মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি ঋগ্বেদীয় ঋষিগণ যে যজ্ঞোপবীত পরিহিত হইয়া গাত্রশোভা বিবর্দ্ধিত করিতেন, ইহার ত সম্পূর্ণই প্রমাণাভাব; তবে ইহাদের পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ রচনাকালে যজ্ঞোপবীত ব্যবহারের সূচনা হইয়াছে সত্য। শতপথব্রাহ্মণ (২।৪।২) এবং কৌষীতকী উপনিষৎ (২।৭) অনুসারে উপলব্ধি হয় যে, তখন যজ্ঞকালে যজ্ঞোপবীত ব্যবহারের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। * এই যজ্ঞোপবীত অহোরাত্র পরিধান করাই এক্ষণ অনার্য্য সংশ্রব হইতে পৃথক্ থাকিবার উপায় স্থিরীকৃত হইল। এই সময় যদি আর্য্যগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের গাত্রচর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন শ্বেত বা গৌর বর্ণ থাকিত এবং অনার্য্যগণের গাত্র চর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণ থাকিত, তবে সূত্রধারণ রূপ পার্থক্যের কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের কোন কারণ থাকিত না। যদি সুদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় ইংরেজগণ মাতৃদেশ

(*)ইউরোপীয়গণের-Imperial Anglo Indian Association নামক সভার উদ্দেশ্য যাহারা অবগত আছেন, তাঁহারা আমাদের কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

† মহাভারত পাঠে জানা যায়, দ্রোণাচার্য্য কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্বেতবর্ণ আর্য্যজাতি বিনা অনার্য্যসংশ্রবে কৃষ্ণবর্ণ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং অশ্বত্থামা শঙ্করজ সন্দেহ নাই।

* The Yajnopovita was worn in this ancient period by Brahmans, Kshatriyas, and Bisyas alike but only at the time of performing Yajna or vedic works or sacrifices.

Mr. Dutt's Ancient India, Book II, page 174.

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং বর্ণপ্রাধান্য রক্ষার জন্য অধুনা যে শ্রেণী চতুষ্টয় বিদ্যমান আছে, তদবলম্বনে বর্ণ-ভেদ প্রথার পুনরভিনয় করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে অপ্রাপ্ত দ্বিজত্ব ও প্রাপ্তদ্বিজত্ব অর্থাৎ বৃটিশবর্ণ ও ইউরেশীয় সম্প্রদায় মিশ্রিত হইয়া দেশীয়গণ হইতে পৃথক্ থাকিবার জন্য যে গ্রীবাদেশে ফিতা-বন্ধন বা অন্য কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন না, ইহাই বা কে বলিতে পারে? ফলে সে সময়ে তাঁহাদের মধ্যেও দ্বিজত্ব নিবন্ধন কৃষ্ণবর্ণত্বের এত আধিক্য হইবে যে, নিরবচ্ছিন্ন শ্বেতবর্ণত্ব অবলম্বনে পৃথক থাকা সুবিধাসঙ্গত হইবে না। ঠিক সেই প্রকারে বর্ণভেদ-প্রথা রীতিমত প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই আর্য্য-রক্তে অনার্য্যরক্তের বিলক্ষণ প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই প্রবাহ নিয়মিত করিবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু নিবারিত করিবার উদ্দেশ্যে নহে, যত বর্ণভেদের সৃষ্টি।

কিন্তু ইহাও বড় সহজ কথা নহে। বর্ণভেদের প্রস্তাবে কেবল শূদ্রগণ বিরক্ত হইলেন, এমত নহে। বৈশ্য, ক্ষত্রিয়েরও বিরক্তির যথেষ্ট কারণ ছিল। ঘোরতর আত্মকলহ উপস্থিত হইল। অধিকাংশ অনার্য্য জাতি এক পক্ষ হইলেন। দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় কোন কোন শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহায়তা করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ও স্বার্থত্যাগী কোন কোন ক্ষত্রিয় অনার্য্যপক্ষ অবলম্বন করিলেন। কর্ণের ন্যায় দ্বিজসত্ত্ব মিশ্রবর্ণের অনেকে শূদ্রপক্ষাবলম্বনই শ্রেয়স্কর মনে করিলেন। পক্ষান্তরে ধৌম্যের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ ব্যাপ্তীকৃত (baptized) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে দীক্ষিত অনার্য্যগণ সহ কোন কোন ক্ষত্র-বিশ্বের সহায়তার, বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ১১:৭ এর অনুপাতে অনার্য্য ও আর্য্যপক্ষে ভারতবাসিসকল সজ্জিত হইল। বর্ণভেদের সূচনায় এই মহাসমর সংঘটিত হইল। ইহাকেই কুরুপাঞ্চাল-যুদ্ধ বা ভারত-যুদ্ধ কহে।*

এই যুদ্ধের ফলে বর্ণভেদ স্থাপিত হইল। যাহা শ্রেণী ছিল, তাহা জাতি হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিটী বর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইতঃপূর্ব্বেই দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অপ্রাপ্ত দ্বিজত্ব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া লইবার উপায় থাকিল না। তাঁহাদিগকে কাজে কাজেই তত্তৎ বর্ণের সহিত মিশাইয়া লইতে হইল। দ্বিজত্ব প্রাপ্ত অনেক শূদ্র মৌলিক শূদ্রের সহিত জাতিবদ্ধ হইলেন। যাহা হউক, এই জাতিভেদের উদ্দেশ্য বর্ত্তমান জাতিভেদের ন্যায় পানাহার বর্জ্জিত করা নহে। ইহার উদ্দেশ্য অনার্য্য রক্ত পরিশ্রুত করিয়া আর্য্যদেহে ধারণ। এজন্য স্থিরীকৃত হইল, সবর্ণের মধ্যেই বিবাহ শ্রেয়স্কর; তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কন্যা, ক্ষত্রিয় বৈশ্য কন্যা এবং বৈশ্য শূদ্র কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে। ইহার বিপরীত

* অনার্য্য কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণীর হরণ ও বিবাহ এবং মহাভারতোক্ত অন্যান্য বিবাহের বিবরণ পাঠে এবং যুধিষ্ঠিরের পাচক শূদ্র ছিলেন ইত্যাদি ঘটনা লক্ষ্য করিলে, ভারতীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে শ্রেণীবিশেষই মনে করা যায়, আদান প্রদান রহিত ও পানাহার বর্জ্জিত জাতি বলিয়া মনে করা যায় না।

ভাবে বিবাহ নিন্দনীয় এবং তদুৎপন্ন সন্তান সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। ইহাতেও অনার্য্য রক্তের সহিত আর্য্য রক্তের বিনিময় চলিতে লাগিল; কিন্তু খুব নিয়মিত প্রকারে। মনে কর ক, খ, গ ও ঘ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-জ্ঞাপক। গ, ঘয়ের কৃষ্ণবর্ণা কন্যা বিবাহ করিল এবং তাহাতে গয়ের এক কৃষ্ণবর্ণা কন্যা জন্মিল, সেই কন্যা খ বিবাহ করিল। তাহাতেও এক কৃষ্ণবর্ণা কন্যা উৎপন্ন হইল; তাহাকে ক বিবাহ করিল। সেই বিবাহে ক'য়ের যে কন্যা জন্মিল, তাহাও মাতৃ লক্ষণাক্রান্ত কৃষ্ণবর্ণা হইল এবং সেই কন্যাকে অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করিলেন। এই প্রকারে অনার্য্যরক্ত আর্য্যত্বের উচ্চতম শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া অন্তঃসলিলা ভোগবতীর ন্যায় খেলিতে লাগিল। পক্ষান্তরে আর্য্য-রক্তও প্রতিলোম প্রণালী অনুসারে শূদ্র-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরিষ্কৃত করিতে লাগিল। এই প্রকারে দ্বিজত্বের আর একটী স্তর স্থাপিত হইল। ইহাই দ্বিজত্বের তৃতীয় স্তর।*

এই ভাবে কয়েক শতাব্দী চলিলে এদেশ বৌদ্ধবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। প্রায় ১০০০ বৎসরের বৌদ্ধরাজত্ব ও ধর্ম্ম-সংশ্রবে দেশের যে অনেক লোক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। উক্ত ধর্ম্মে জাতিভেদ প্রথা না থাকায় ভারতের অনেক অধিবাসী জাতি-বিযুক্ত হিন্দু মধ্যে পরিগণিত হইলেন; তবে জাতিযুক্ত হিন্দু যে ছিলেন না, তাহা নহে। কুমারিল ভট্ট হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্থাপয়িতৃগণের যত্নে দেশে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের উদ্ভব হইতে লাগিলে আবার নূতন করিয়া বর্ণভেদ করিতে হইল। এই বর্ণভেদের সময় পূর্ব্ব বর্ণভেদের রেখাপাতের চিহ্ন প্রায়শঃ বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং ব্যবসায় অবলম্বনেই এই এই ভেদ করিতে হইল। যে শ্রমণ হয়ত পূর্ব্বে নাপিত ছিলেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ করিতে হইল; যে যোদ্ধা হয়ত রজক ছিলেন, তাঁহাকে ক্ষত্রিয়, কায়স্থ বা ছত্রীর সহিত মিশ্রিত করিতে হইল; যে ব্যবসায়ী হয়ত চুপড়ীবুনানের সম্প্রদায় হইতে জাত, তাঁহাকে বৈশ্য বা নবশাক করিতে হইল; এবং শ্রমজীবিগণকে ব্যবসায় অনুসারে অসংখ্য খণ্ডে খণ্ডীকৃত করা হইল। এই রূপ অসংখ্য খণ্ডকে চির পৃথক রাখা অর্থাৎ তন্মধ্যে আদান প্রদান রহিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এজন্য স্পর্শ-দোষ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া পানাহার বর্জ্জিত করা হইল। জাতি আর জাতি থাকিল না; অসংখ্য খণ্ডে খণ্ডীকৃত পুরুভূজের ন্যায় অসংখ্য স্বতন্ত্র জাতি হইল। ব্রাহ্মণগণ প্রাধান্য রক্ষার মানসে এই সহস্র সহস্র জাতিখণ্ডের সহিত খণ্ডীকৃত হইয়া অপদেবতার ন্যায় তত্তৎ খণ্ডের ঘাড় চাপিয়া বসিলেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বর্ণ ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিলেন, জাতি সাধারণের অধঃপাতের সহিত তাঁহাদের অধঃপাতেরও চরম সীমা অধিকৃত হইল। এই প্রকারে নব জাতিভেদ সময়ে মিশ্রিত জনসংখ্যাকে আবার যখন বিভক্ত করিতে হইয়াছিল, তখন যে দ্বিজত্ব বা শঙ্করত্বের আর একটী স্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাতে কি সন্দেহ হইতে পারে? সুতরাং বর্ত্তমান ভারতীয় হিন্দুজনসংখ্যার মধ্যে দ্বিজত্ব বা শঙ্করত্বের চারিটী স্তর অনুভব করা যায়।

(ক) আদি আর্য্যানার্য্য রক্ত-সংশ্রব বশতঃ দ্বিজত্ব।

(খ) বর্ণভেদ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে শঙ্করগণের সহিত শ্রেণীচতুষ্টয়ের রক্ত-সংশ্রব এবং সামান্য মিশ্রণ বশতঃ দ্বিজত্ব।

(গ) বর্ণভেদের পরবর্ত্তী সময়ে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহোৎপন্ন দ্বিজত্ব।

(ঘ) পৌরাণিক বর্ণভেদ কালীন সাধারণ মিশ্রণ বশতঃ দ্বিজত্ব।

এই প্রকারে হিন্দুর জাতীয় দেহ চতুর্ব্বিধ দ্বিজত্বের স্তরে সংগঠিত। ফলে বর্ত্তমান সময়ের হিন্দুত্বই দ্বিজত্ব ও দ্বিজত্বই হিন্দুত্ব।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

* সূত্র সাহিত্য দেখ। ঋগ্বেদীয় কল্পসূত্রের অন্তর্গত বশিষ্ঠের ধর্ম্মসূত্রের ১৮শ অধ্যায়ে চণ্ডাল বৈণ, অন্ত্যাবসায়ী, রামক, পুল্কস, সূত, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ এবং পারশব এই দশটী দ্বিজ বা শঙ্করজাতির উল্লেখ আছে।

বিলাতী জীবন।

দাদা মহাশয় আর দিদিমাদের তাড়নায় বাড়ী থেকে বাহির হইবার সুবিধা হয় না। তাঁহাদের ভয়, সঙ্গ দোষে—অভিভাবক অভাবে ছেলে মেয়েদের চরিত্র দূষিত হইবে। এখানে গেলে গাধা হবে, ওখানে গেলে ছাগল হবে, সেখানে গেলে ভেড়া হবে। লেখা পড়া করা প্রায়ই বাড়িতে বা স্থানীয় পাঠশালাতে হয়; চাকুরিটাও গ্রামে পেলেই ভাল হয়। কিছু না পেলে, অগত্যা মা অন্নপূর্ণার সেবায় বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইতে হয়। এই সকল দোষ আমাদের দেশে প্রত্যেক স্থানেই, জাতীয় আচার, ব্যবহার, ভাব, জ্ঞান যুগযুগান্তর হইতে সম ভাবে প্রভাবিত করিয়া আসিতেছে। সেই কারণে আমাদের চরিত্রে অনেক স্থলে গুণ ও অনেক স্থলে সাধারণতঃ দোষ লক্ষিত হয়। গুণের মধ্যে স্নেহশীলতা, অনুরাগ, সদ্ভাব, আনুগত্য প্রধানতঃ লক্ষ্য হয়। দোষের মধ্যে বুদ্ধির সঞ্চার হয় না, বহির্জগতের সঙ্গে ভাবের অদল বদল হয় না। কোন স্থলে চরিত্র বিনয় ও নম্রতার আদর্শ, কোন স্থলে সে মহাগুণে বঞ্চিত। যাঁহাদের জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, যাঁহারা শিক্ষা-পিপাসু তাঁহারা বিদেশ ভ্রমণে প্রচুর উপকার লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা স্বগৃহে মূর্খ বিশেষ, তাহাদের বিদেশ যাওয়া বহুরূপী সাজার মত। কেবল সং দেখিয়ে সকলকে আমোদিত করা মাত্র। "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" যেমন আমাদের উপদেশ য়ুরোপেও ঠিক তাই।

নিজের দেশ, জনসমাজ বা তত্রত্য জ্ঞানে বীতরাগ হইয়া উন্নতির ইচ্ছায় বিদেশ গমন করা চঞ্চলতার লক্ষণ। বৃদ্ধ অভিভাবকেরা যে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা অমূল্য। আমাদের জন্য তাঁহাদের ভীতির কারণ যথার্থ, তাঁহারা দূরদর্শী, ভুক্তভোগী, জ্ঞানী; আমরা বিদ্যার যতই বড়াই করি না কেন, তাঁহাদের বিদ্যার উপর কলম চালাইবার ক্ষমতা কাহারও হয় নাই। তাঁহাদের চরিত্র অপেক্ষা আমাদের চরিত্রের কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা প্রত্যহ লক্ষিত হইতেছে। দেশের কথা লিখিয়া হাস্যাস্পদ হইবার বাসনা নাই। কারণ সব কথা জানি না। বিলাতী ২।৪ কথা

লিখিবার বাসনা। আমার কথা অনেক বাদ দিয়া বিশ্বাস করিবেন। কারণ সব ঠিক বুঝিয়াছি, কিনা বলিতে পারি না। এবং যাহা বুঝিয়াছি তাহাও ঠিক বলিতে পারিব কি না, জানি না।

বিলাতে পুরাকালে যে আচার ব্যবহার ছিল, আমাদের দৈনিক আচার ব্যবহারের সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্য আছে। খ্রীষ্টের চরিত্র আদর্শ করিয়া যাঁহারা চলিতেন,তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে সচ্চরিত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ধর্ম্মের কূট প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা আমার হয় নাই। আমি সাধারণ সচ্চরিত্রতার যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আমাদের দেশীয় উপদেশ হইতে পৃথক্ নহে। পোষাকে পরিচ্ছন্নতা আমাদের দেশীয়, পানাহারে পবিত্রতা আমাদের দেশীয়। সেবা, বিনয়, ত্যাগ, আচার, সভ্য অসভ্য সকল প্রকৃতিকে মধুর করে। কিন্তু প্রতিদিন সকল দেশেই তাহার বিপরীত দৃষ্টিগোচর হইতেছে। শিক্ষার ভাণ সভ্যতার ট্রেডমার্ক; সকলেই স্বার্থপর; ধর্ম্ম কাগজে কলমে, সময়ের অনটন। আমাদের দেশীয় বসন দেখিলে সাহেবেরা হাসেন, মেম সাহেবেরা মূর্চ্ছা যাইবার ভাণ করেন কিন্তু অদ্যাপি কোন চিত্রালয়ে কোন সুন্দর প্রতিকৃতি বিলাতী বসনে আচ্ছাদিত আমি দেখি নাই। সে কথা প্রকাশ করিলে মেম সাহেবেরা দুঃখিত হন, চিত্রকরদের ধিক্কার দিয়া শান্তি ভোগ করেন। সকলে আমাদিগকে অপরিষ্কার বলিয়া তুচ্ছ করেন। কিন্তু ডাক্তারেরা বলেন যে, রোগীরা জুতা খুলিলে শ্রীচরণের দুর্গন্ধে গৃহে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু আমাদের দেশে সকলে দিন দুইবার স্নান করে, চারিবার গা ধোয়, সকালে বিকালে কাপড় ছাড়ে, অথচ বাড়ীর চেহারা দেখিলে স্বয়ং গৃহদেবতা গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন। এখানে অনেকে প্রত্যহ স্নান করে, অনেকে আবার আজীবনে ১২ বার মুখের উপর জল বুলান—আর ৫২ বার হাত প্রক্ষালন করা ভিন্ন অন্য প্রকারে পরিষ্কার থাকিতে চান না। পরিচ্ছন্নতা কমনীয়। বিলাতে পথের ভিখারীর সামান্য কুটীরও পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ভাবে সাজান। কখন কখন ঘরের মেজেটা কার্পেট মোড়া, কিন্তু খাটের নীচে জঙ্গল রাশীকৃত। মেম সাহেবেরা চীন দেশের মেয়েদের ঠাট্টা করে, তাহারা নাকি লোহার জুতা পরিয়া বাল্যাবধি পা ছোট করে। কিন্তু যদি কেহ সাহস করিয়া বলে, বিলাতী সভ্যতায় সরু বুট পরা সেই জন্য; অনেকের পায় ঘা হয়, অনেকে চলিতে পারে না; তাহা হইলে মেয়েদের কোপের পরিমাণ সহ্য করা আমাদের দুঃসাধ্য। প্রকাশ্যে অঙ্গের বর্ণনা করা অসভ্যতা।

আহার্য্য সামগ্রী প্রতি দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন মাংস খরচ কম হইলেও সকলে অতি মাত্রায় আমিষভোজী বলিয়া দন্তরোগের পরবশ। সকল সাহেব, মেম কৃত্রিম দন্ত বসাইয়া লয়েন। যত মাংস খরচ হয়, তাহার অধিকাংশ বিদেশ হইতে লবণে রক্ষিত হইয়া আসে, সে মাংস সস্তা, কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়। মাংস টাট্‌কা খায় না, কারণ টাটকা মাংস সুস্বাদ হয় না। ভাল মাংসের সের ১৸০। মাছের দামও তদ্রূপ। ফল, ফুল, শাক, সব্‌জী প্রচুর পরিমাণে বিদেশ হইতে আইসে। দেশে যা জন্মে, তাহা পল্লীগ্রামে নগর অপেক্ষা সস্তা নহে। উত্তম সামগ্রী লণ্ডনে প্রেরিত হয়। আজ কাল চাউল ও মুসুরীর ডাল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

পোষাক নানাবিধ। পুরুষের পোষাক বাঙ্গালীর পোষাকের মত কাছা আল্‌গা, কোঁচা লম্বা, হাত থা আঁটা নয়,মেড়ুয়াদের মত মালকোচা মারা। সকলেই সদা সর্ব্বদা শয়নকাল ভিন্ন প্রতি মুহূর্ত্তে বাড়ীর বাহির হইতে প্রস্তুত। চিত্রাদিতে পুরাতন পোষাকের যে ছাঁট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আজ কাল নাই। কোট আজানুলম্বিত চাই। মাথার উপর লম্বা ধামা না হইলে সভ্যতা হয় না। সচরাচর অন্য টুপীতে চলে। মেম সাহেবদের পোষাকেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। যুবতীরা বলেন, তাঁহাদের দিদিমারা কি মূর্খ ছিল। ওরূপ কুৎসিত পোষাক পরিধান করা অসাধ্য। কোন কোন পোষাকে ছাঁট আছে। কোন কোনটা বালিশের খোলের মত। আজ কাল সভ্য সমাজে মেয়েদের যে পোষাক ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা বর্ণনার অযোগ্য, কিন্তু রেশম মখমলের হইলে সভ্যতা বজায় থাকে। বিধবাদের পোষাক কাল, অন্য সকলের পোষাক সকল রঙ্গের চলে। বিলাতেও মেয়ে মহলে গয়নার আদর আছে। কিন্তু দাম বড় বেশী। সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তথাপিও এক ছড়া চেইন হার,ঘড়ি, দু চারিটী আংটী ও একছড়া রূপার কোমরবন্ধ থাকা চাই। কেহ কেহ ইয়ারিং ব্যবহার করে। পোষাকে যত চক্‌চকে, তত সৌখীন। সে বিষয়ে ছোট বড়, বিধবা সধবা ভেদ নাই। আমাদের দেশের শাটিন, মসলিন বা রেশমের যে এখানে কত আদর বলিতে পারি না। স্বয়ং মহারাণী বড় বড় বিবাহাদিতে শাল উপহার দিয়া থাকেন। এখানে শাল বা মলিদার বড় আদর। ভেলভেটও ব্যবহৃত হয়। বড় বড় বাড়ীতে আমাদের দেশের বা তুর্কীস্থানের কার্পেট পাতা আছে। কিন্তু এ সকল জিনিস এত অধিক দামে বিক্রীত হয় যে, বড় লোক ভিন্ন লোক ক্রয় করিতে পারে না। অপরে দোকানে সে সকল জিনিসের সৌন্দর্য্য দেখিয়া হাহুতাশ করে। প্রদর্শনী, মিউজিয়ম ইত্যাদি স্থানে যাঁহারা আমাদের দেশের শিল্প বা স্বর্ণকারের কার্য্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে বলেন, য়ুরোপীয় জিনিস কোন অংশে তাহাদের তুল্য নহে। পুরুষের মত breeches পরা, সার্ট গায়, তাহার উপর tie ও কোটপরা মেয়ে মহলে দিন দিন প্রসার পাইতেছে। এখনও অনেকের পছন্দ তত উন্নত হয় নাই, কিন্তু দেরীও নাই। টুপীটাও পুরুষের টুপী। কিছু কাল পূর্ব্বে ছেলে মেয়েরা পিতামাতাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। Sire ও governor বলিয়া সম্বোধন করিত। তখন পিতামাতা সন্তানবর্গের সঙ্গে পানাহার করিতেন, মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিতেন তাঁহাদের মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতে সন্তানেরা উৎসুক থাকিত, তাঁহারা উত্তম উত্তম পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইতেন, সুতরাং শিশুরা সচ্চরিত্র হইত। আজ কাল মধ্যবৃত্তি লোক এতই ব্যস্ত যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও ছেলেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে তাহারা পারে না। ছেলে মেয়েরা বাড়ীতে যৎসামান্য পড়ে। ৮।১০ বৎসর বয়সে পাঠশালে যায়। গরীবের ছেলেদের মাসহারা দিতে হয় না। সকলে ট্যাক্স দিয়া গরীবের শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান করে।

স্কুলেই পাঠ দেওয়া ও শিক্ষা সম্পন্ন হয়। মাঝে মাঝে বাড়ী আসিতে পায়। শিক্ষকগণ ছাত্রদের সঙ্গে খেলা করেন। মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে তত্ত্বাবধান করেন। স্কুলেই ধর্ম্মশিক্ষা, চিত্রশিক্ষা, ইত্যাদি সকল প্রকার উপকারী শিক্ষা হয়। পরে বোর্ডিং স্কুলে যায়। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বাস করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে শিক্ষকদের সঙ্গে বাস করিতে পারে। সেখানে শিক্ষা সমাপন হয়। দেশীয় বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। শিক্ষক ও ছাত্র পিতা-পুত্র রূপে কালযাপন করে। কিন্তু বোর্ডিং স্কুলে শিক্ষার খরচ অনেক—বাৎসরিক খরচ ১০০।১৫০ পাউণ্ড। সকলের ভাগ্যে সে সুখ হয় না। সেই জন্য Public স্কুলে শিক্ষার পরেই ছেলে মেয়েরা বাড়ীতে শিক্ষা করে। সে শিক্ষা অনেক স্থলেই ভাল। যত উত্তম উত্তম শিক্ষাপ্রদ পুস্তক পাঠ করে। অনেক অনেক পুস্তক পড়ে মাত্র, অনুধাবন করে না। প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে পারে না। নভেল পড়া খুব প্রচলিত, তাহাতে শিক্ষার কিছুই নাই। Dickens বা Thackeray বা Shakespeare নভেলের মধ্যে গণ্য নহে। অনেকে এ সকল পুস্তকাদি পড়েন বটে, কিন্তু বিদ্যার জাহাজ কেহ নন্—কুটির পান্‌সী। আজ কাল ভাল বই প্রায় পাওয়া যায় না। অনেকে সে অভাব অনুভব করিতেছে। আজ কাল কার বই খুব চক্‌চকে, ছবি রাশীকৃত, কিন্তু কেবল প্রণয়-গল্প মাত্র। অনেক স্থলে ছেলে মেয়ের হাতে দিবার অনুপযুক্ত। এই সময় চাকরীর অন্বেষণ হয়। খরচ ভয়ানক। বাড়ী ভাড়া ভয়ানক। আমাদের উপযুক্ত একটী বাড়ী লণ্ডন হইতে ১৫ মাইলের মধ্যে মাসিক ভাড়া ৩০।৪০ পাউণ্ড বা পাঁচ ছয় শত টাকা। লণ্ডনের স্থান বিশেষে তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন জলের ট্যাক্স, গ্যাসের ট্যাক্স, গরীবের স্কুলের ট্যাক্স, নিঃসম্বল লোকের ভরণ-পোষণের ট্যাক্স, সে সব যোগ দিলে প্রায়ই বাৎসরিক ট্যাক্স্ বাড়ী ভাড়ার এক তৃতীয়াংশ। খাই খরচ অনেক, সভ্য ভব্য পোষাকের দাম ২ পাউণ্ডের কমে হয় না। জুতা ১৫ শিলিং। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গরীবের জিনিস অনেক সস্তায় পাওয়া যায়, সস্তা বা মহার্ঘ্য হউক, জিনিস গুলি সুশ্রী হওয়া চাই।

সচরাচর ট্রেন্ ভাড়া প্রতি মাইলে ৩য় শ্রেণীতে ১ আনা। ৩য় শ্রেণীর গাড়ীও গদি আঁটা। ছোট ছোট লাইনে পায়খানা নাই। রাজা রাম দেব ও গঙ্গারাম তেলী সহযাত্রী। এদেশে জাতি ভেদ নাই। পয়সা থাকিলে সকলে সমান সুখ পায়। গ্রীষ্মকালে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে যাতায়াত সচরাচর এক দিক্‌কার ভাড়ার অর্দ্ধেকেও চলে। পোষাক দেখিলে জমীদার বা চাকর ভেদ করা যায় না। পেটে অন্ন না থাকিলে কি হয়? পান খাওয়া চাই। "ঋণংকৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"

কুলি মজুরেরা কোন স্থলে ঘণ্টায় এক শিলিং উপার্জ্জন করে। দৈনিক আয় ২৷৷ শিলিংএর কম নয়। নকল নবিশেরা সপ্তাহে ১৫।২০ শিলিং আয় করে। বাড়ীতে ঘর খালি থাকিলে ভাড়া দেয়।

সচরাচর চাকরাণীদের মাহিনা বছরে ১৪।১৫ পাউণ্ড, তার সঙ্গে খাই খরচ পোষাক দিতে হয় না। চাকর রাখিতেও

ট্যাক্স লাগে। সেই সকল কারণে লোকে চাকর রাখিতে পারে না। বাড়ীর মেয়েরাই সকল কাজ করে। সময় সময় নিজেদের পোষাক তৈয়ারি করে। কটু কথা শুনিতে কেহ রাজি নয়। আজকাল বিদেশ হইতে চাকরাণীর আমদানী হইতেছে। এক চাকরাণীতেই সকল কাজ চলে। এক চাকরাণীও অতি বিরল। বাড়ীর কর্ত্তারা বাড়ী পরিষ্কার করিতে মেয়েদের সাহায্য করেন। বিলাতী চাকর বা চাকরাণী ইংরেজী ধরণে শিক্ষিত ও পরিষ্কার। কিন্তু আমাদের চাকরদের মত বাধ্য বা সেবক নয়। বিপদ আপদে নির্ভর করিতে পারা যায় না। বড় লোকেরা টাকা দিয়া ভাল চাকর পান না। নিঃস্বার্থ প্রভুপরায়ণ চাকর পাওয়া দুষ্কর। বিদেশী চাকরের উপর নির্ভর করিতে হয়। আমাদের দেশের শত শত লোক য়ুরোপের জাহাজে বাবুর্চ্চি বা নাবিকের কাজ করিতেছে। তাহারা ভাল খানসামা। জর্ম্মনীর মেয়েরা ভাল চাকরাণী।

ছেলে মেয়েরা বয়স বাড়িবার সঙ্গে ক্রমশঃ পিতা মাতা হইতে পৃথক হইতে আরম্ভ করে, ক্রমে এত পৃথক হয় যে, সম্পর্ক বুঝা যায় না। প্রধান প্রধান উৎসবে যথা বিবাহাদিতেও পিতা মাতার অনুমতি লইতে হয় না। সকলে স্বয়ংবর করেন। বিবাহের পর মনোমিলন না হইলে ঝগড়া কলহ করিয়া পৃথক্ হওয়া যায়। উভয় পক্ষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, কোন কোন স্থলে ২।৪ ঘণ্টার মধ্যে নূতন বিবাহ হইতে দেখা গিয়াছে। বিলাতে ভিক্ষা করা আইনবিরুদ্ধ। দরিদ্রদের জন্য কর্ম্মস্থল আছে। তথায় যৎসামান্য কাজ করিলেই অন্ন পাওয়া যায়। সাধারণ লোককে ট্যাক্স্ দিয়া এই সকল খরচ বহন করিতে হয়। অপর দিকে ধনীরা সদ্যজাত শিশুকে চাকর চাকরাণীদের হাতে সমর্পণ করেন। শিশুরা দাসদাসীদের সঙ্গে বাস করে। ক্বচিৎ কখনও পিতা মাতাদের পদ্মপলাশলোচন আকর্ষণ করে। সপ্তাহে যদি একবার সুন্দর বেশভূষায় আচ্ছাদিত জনক জননীর বদনমণ্ডল অবলোকন করিবার অনুমতি পায়, কৃতার্থ হয়। অনেক স্থলে শিশুরা প্রকৃত পিতা মাতার পরিচয় পায় না। লেখা পড়াও দাস দাসীর কাছে, না হয় মাষ্টারের কাছে হয়; উপযুক্ত বয়সে স্কুলে প্রেরিত হয়। যৌবনে বিদেশে শিক্ষার্থ আদিষ্ট হয়। সুশ্রী বিলাতে প্রবেশ করে নাই, এ কথা বলিলে মেম সাহেবদের রাগ দুর্ব্বাসা মুনির রাগ অপেক্ষাও বেশী হয়। কিন্তু আমি কখনও কোন স্থলে ছবিতে বা পুস্তকে শ্রীর জন্য বিলাতী মেয়েদিগকে তুলিত হইতে দেখি নাই। সকল স্থলেই বিদেশী, অধিকাংশ স্থলে আসিয়ার মেয়েদের স্বদেশী পোষাকে রঞ্জিত দেখি। আজ কাল ছেলেমেয়েরা যদি পিতামাতাদের Sir বা mother বলে, তাঁহারা ধন্য। এখানকার সুপুত্রের সদ্ব্যবহারে আমাদের মূর্চ্ছা হয়। পিতামাতার সঙ্গে সুরাপান বা তাম্রকূট সেবন করা দৈনিক ব্যাপার। অনেকে সুরাপান করে না, কিন্তু কাহারও অঙ্গল কামনায় সুরাপান করা অনেক স্থলে দোষের নয়। পিতামাতাদের হাস্যাস্পদ করা, তাঁহাদের প্রতিবাদ করা বা তাঁহাদের সহিত তর্ক করা দৈনিক ব্যাপার। বিলাতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য অসংখ্য কাগজ বা মাসিক পত্র আছে। সুন্দর সুন্দর বিষয়ের আলোচনা শিক্ষিত লোকে করিয়া

থাকেন। উত্তম চিত্রে সে সকল কাগজ রঞ্জিত। ছোট বড় সকলে পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। অল্প দামের কোন কোন কাগজে রসিকতার ছটা চমকায়। সে সকল কাগজ শিশুদের প্রিয়; কাট্‌তি অসংখ্য। কোন কোন কাগজের কাট্‌তি লক্ষাধিক। মধ্যে মধ্যে যে সকল কুৎসিত রসিকতা সে সকল কাগজে দেখা যায়, তাহা সমাজের অযোগ্য। প্রতিদিন পরিবারের সকলে সে সকল রসিকতা আবৃত্তি করিয়া কালক্ষেপণ করে এবং মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণাদিতেও বন্ধুবান্ধব, পিতা মাতা, শিশু সকলে উৎসাহের সহিত সেরূপ রসিকতাতে যোগ দিয়া থাকেন। রসিকতার নমুনা যথা—জনৈক ভদ্রলোক মাংসের দোকানে গিয়া একটী বালককে বলিলেন "ওহে আমার একটী ভেড়া চাই।" বালক—"যে আজ্ঞে, বাবাকে পাঠিয়ে দেব, আপনি যান।" আর একজন আস্তাবলে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার গাধাটা কোথায়; শিশু উত্তর দিল "আপনি বসুন, বাবা এলেন বলে"। লোকে গাধার গাড়ীতে চড়ে। আর একটী মা ছেলেকে বুঝাইতেছেন—"দেখ যাদু, যে ভদ্রলোকটী আমার কাছে রোজ আসেন, তিনি আমার প্রেমে ধরা পড়েছেন; আমি তাঁকে বিয়ে ক'রব। তুমি তাঁকে বাবা ব'লে ডেক ইত্যাদি।

অনেক স্থলে বড় লোকের সমাজের মেয়েরা চুরুট পান করে। বিলাতে বদ্‌হজমী ও সর্দ্দি ইত্যাদি প্রধান রোগে—অনেকে ক্ষয়কাশে বা অজীর্ণ রোগে কষ্ট পায়। প্রত্যেক সহরে জনসমাজ দুই রাজনৈতিক দলে বিভক্ত। অনেক স্থলে স্ত্রীলোক পুরুষ, অপেক্ষা বেশী উৎসাহী। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক সহরে আরও অনেক সভা-সমিতি ইত্যাদি আছে। তাহাদের উদ্দেশ্যও মহৎ। মহারাণীও রাজকুমারগণ সে সকল কাজে উৎসাহের সহিত যোগ দেন। পুস্তকাগার সচরাচর সাধারণের ব্যবহারের জন্য স্থাপিত। পৃথিবীতে প্রধান প্রধান পুস্তকাগারে যত পুস্তক আছে, তাহার সংখ্যা এই—

British museum—2,000,000, volumes. Parish museum—2,500,000; St petersburg Imperial library—1,000,000; Munich library—1,000,000: Library of Congress washington—900,00; Berlin library—800,000; Public library Boston—600,000 volumes.

থিয়েটার ও সঙ্গীত সমাজ অসংখ্য। থিয়েটার অনেক স্থলে শিক্ষাপ্রদ। থিয়েটারের নায়িকাগণ অনেকেই সদ্বংশজাত। সঙ্গীত সমাজ প্রায়ই কুৎসিত—ভদ্রলোকের অযোগ্য। সকল স্থলেই প্রেমের গান বা চর্চ্চা হয়। মদের স্রোত, চুরুটের ফোয়ারা ও হাসির রোল ত ধর্ত্তব্য নয়। সকলে ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে না, এক একটী বেশ ভালও আছে। উত্তম উত্তম গায়কগায়িকারা দেশ প্রসিদ্ধ; বিদেশপ্রসিদ্ধ ম্যাডাম প্যাটি একজন প্রসিদ্ধ গায়িকা। তিনি স্পেন দেশীয় মহিলা, কিন্তু ইংরেজী আচার ব্যবহার। তাঁহার জীবনে ২৪বার এক রাত্রে ২৪০০ টাকা রোজগার করিয়াছেন। সৎস্বভাব অর্থে লেখাপড়া জানা চাই, অপরকে সম্মান করা চাই। পরস্পরকে বিপদে সাহায্য করা, অভিবাদন করা, ধন্যবাদ দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। মেয়েদের তোষামোদ করা সভ্যতা। কোন স্থানে একটী সুশ্রী যুবতী আসিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে মৌমাছির মত সকল পুরুষে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে। তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সকলে টক্কর দেয়,

অপর সকলে ত্যক্ত আমের আটীর মত পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ বা পাড়ার কুকুরের মত প্রত্যাশী। সুরূপ অর্থে মেয়েদের পক্ষে লম্বা হওয়া চাই, নাকটী উঁচু চাই, তাহার সঙ্গে যদি নম্রতা (যথার্থ বা ভাণ) থাকে দাম বড় বেশী। সেই সকল মেম সাহেবদের সেবা করার জন্য সকলে লালায়িত। পূর্ব্ব জন্মকৃত ধর্ম্মের বলে কেহ কেহ মেমসাহেবের রুমাল কুড়াইতে পারে, গ্রীষ্মে বাতাস করিতে পারে, তৃষ্ণায় গেলাশে মদ ঢালিতে পারে।

পূর্ব্বোক্তরূপে স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান দেখাইতে যাঁহারা প্রস্তুত, তাহারাই বিনয় নামক তক্‌মাধারী পুরুষ। সেই টিকিটের খাতিরে তাঁহারা party ইত্যাদিতে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। সেই সকল মেম সাহেবদের সঙ্গে নাচিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্য; বড় দুর্ল্লভ। দেশে বসন্তের প্রত্যূষে দোয়েলের গানের মত কোন সমাজে যদি সুশ্রী সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত মহিলাগণ দুটী মৃদু কথা বলেন বা দৈবাৎ সঙ্গীত করেন, ভদ্র লোকদের হৃদয় শীতল হয়, সকলে পবিত্র হয়। তাঁহাদের অধরের মৃদু-হাসি সকলের নিকট অন্ধকার নিশিতে চপলার মত, নাবিকের পক্ষে তরঙ্গাস্থিত সাগরে আলোক মঞ্চের মত। সে সৌভাগ্য দুর্লভ। খবরের কাগজে দেখা যায়, অমুক রমণী কাল কয়েক জনকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তিনি আদর্শ। সে দিন খবরের কাগজে দেখিলাম, বাবু নগেন নাগ আগ্রাতে (wereless telegraply) বিনা তারে বৈদ্যুতিক সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে ঘটনা আমাদের দেশে নূতন হইতে পারে। আমরা বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ নিত্য দেখিতে পাই।

বিলাতের ধর্ম্মভাবও পূর্ব্ববৎ বলবতী নহে। স্বাধীনতা ও উন্নতি যমজ ভাই। শিক্ষা উন্নতির প্রসূতী, মহত্ত্বের লক্ষণ, কিন্তু সকল বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকা চাই। দুঃখের বিষয় বিনয় নামে একটী জিনিস যে বিলাতে আগে ছিল, কেবল কবিদিগের মহিমায় আজ তাহা জগতে প্রসিদ্ধ। বিলাত সভ্য বলিয়া ঘোষিত। অনেকে শিক্ষিত, কিন্তু লোকে শিক্ষালাভ করিয়া কি অশিক্ষিত! ইহারা কি বর্ব্বর অপেক্ষা বিনীত বা নম্র হইয়াছে? ভূতপ্রস্থ অসভ্য জগতে যত বিনয় দেখা যায়, শিক্ষিত নামধারী লোকসমাজে তাহা কচিৎ দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ আজ জগতের সর্ব্বত্র। অসভ্য, সভ্য, বর্ব্বর, নরমাংসাষী প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ। কিন্তু স্বয়ং বিলাতে ব্যাপার দিন দিন ঘনীভূত হইতেছে। সকলেই উচ্ছৃঙ্খল। আবাল বৃদ্ধ সকলে বয়স জ্ঞান তুচ্ছ করিয়া ছোট বড় সকল বিষয়ে তর্ক করিতেছে। মতদ্বন্দ্ব হইতে ক্রমে গৃহবিচ্ছেদ, ঝগড়া কলহ করিতেছে, সে সকল কি শিক্ষার লক্ষণ! তর্ক করা চাই। অনেক সময় তর্কের বিষয় কিছুই নাই। স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া শিক্ষার ভাণ করিয়া খ্রীষ্টের এক মন্দির দুই ভাগে বিভক্ত হইল, ক্রমে দুই ভাগ হইতে ১০।১২ ভাগে বিভক্ত। বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। নগণ্য বালক পর্য্যন্ত শুভ্র বেশ ধর্ম্মবীরগণের সহিত তর্ক করিতে প্রবৃত্ত। দিন দিন গৃহ বিচ্ছেদ বাড়িতেছে।

কেবল টুপী তুলিলে ও গুডমর্ণিং বলিলেই কি ভক্তি দেখান হয়? আমার ভয় হয় যে, লোকে প্রকাশ্যে সর্ব্বদা যেরূপে

মত লইয়া তর্ক করে, পরস্পরকে তাচ্ছিল্য করে,যদি তাহার সংশোধন না হয়, এজাতির পতনের বেশী দেরী নাই। অপরকে ঠাট্টা করিলে কি হইবে, নিজের চরিত্র সংশোধন করা চাই। আমাদের দেশের বেদপাঠের মত এখানেও আচার্য্যগণ সুর করিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সময় সময় দুই ঘণ্টা-ব্যাপী উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু চার্চ্চের বাহিরে টুপী মাথায় দিলেই লোকের কান্ধে ভূত চড়ে।

প্রতি বৎসর পৃথিবীর বড় বড় রাজ্যে যত পুস্তক ছাপা হয়, তাহার তালিকা—

Germany—24000 ; France—13000 ; Italy—9,5000 ; Great Britain—7,500 ; United states—5,300; Netherlands—2,500 ;

কেবল পুস্তক ছাপাইলে উন্নতি হয় না। গ্রামে গ্রামে বৎসর বৎসর চার্চ্চের সংখ্যা বাড়িতেছে, কোন কোন চার্চ্চ গগনভেদী, স্বয়ং (St Paul) ৪০৪ ফিট উঁচু। যত-পুস্তক প্রতিবৎসর বিলাতে ছাপা হয়,তাহার অধিকাংশ অপাঠ্য প্রেমের লহরী। বিলা-তের বাৎসরিক নভেল সংখ্যা অপর দেশের নভেল অপেক্ষা ২, ৪৩৪, খানি অধিক।

সে সকল নভেলে উপকারী বিষয় অতি সামান্যই থাকে। লোকচরিত্র সে সকল পুস্তক পাঠে বেশ বুঝা যায়। কিন্তু সমা-জের উন্নতি হয় না। জর্ম্মানীতে সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক প্রতিবৎসর ৫,৪৪২ খানি অন্যদেশ অপেক্ষা বেশী ছাপা হয়। বিজ্ঞা-নাদিতে ২,৯৩৪ খানি, পত্রাদিতে ২,৪৫৩ খানি এবং ভ্রমণ ইত্যাদিতে ১,১৩৯ খানি পুস্তক ইংরেজের দেশ অপেক্ষা অধিক সংখ্যা প্রতিবৎসর ছাপা হয়।

ফরাসীজাতি ইতিহাস-প্রিয়। তাহারা ইতিহাসে, ১,১৬৪ খানি পুস্তক প্রত্যেক বৎসর অপর দেশ হইতে অধিক সংখ্যায় ছাপায়। পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের যে সব উৎ-সব করিত, আজকাল তাহার উল্লেখ পঞ্জিকা ভিন্ন অন্য স্থলে পাওয়া দুষ্কর। বড় দিন বা গুডফ্রাইডের নাম মাত্র বজায় আছে। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা অনুতাপ করেন। তাঁহারা বলেন, যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত তাঁহারা বন্ধু বান্ধব লইয়া সকল উৎসব আন্তরিক ভক্তির সহিত বজায় রাখিতেন। আজকাল কিছু দেখা যায় না। কোন কোন উৎসব আমাদের দেশের বড় লোকের বাড়ীর দুর্গোৎসবের মত। উচ্ছিষ্ট কলাপাতাই তাহার লক্ষণ। "মিষ্টান্ন মিতরে জনা"।

গ্রীষ্মকাল বিলাতে বড় সুখের। গ্রীষ্মের আধিক্য প্রায়ই অনুভব করা যায় না। ১৩।১৪ ঘণ্টাব্যাপী সূর্য্যরশ্মি পৃথিবী উজ্জ্বল করে। অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা সপরিবারে ভ্রমণে বাহির হন। দলে দলে যুবকযুবতীরা পার্কে বা পল্লিগ্রামে আসেন। সাইকেল অসংখ্য। অল্পখরচে ট্রেণে বিভিন্ন স্থানে দু এক দিনের জন্য যাওয়া চলে। সমুদ্রতটে নির্ম্মল বায়ু সেবন করা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু অপরা-পর সময় জল বায়ু অনিশ্চিত। বসন্তে আকাশ কখন কখন পরিষ্কার থাকে। কিন্তু প্রায়ই বৃষ্টি ও ঝড় হয়। কোন দিন ঠাণ্ডা লাগে, কোন দিন বা গরম লাগে। হেমন্ত কালও সেইরূপ। হেমন্ত ও শীত এই দুই ঋতু লোকেরা সতর্কে কাটায়। দিনের উত্তাপ ঠিক করা যায় না; সর্ব্বদা উত্তাপ পরিবর্ত্তিত হওয়াতে লোকে প্রায়ই জ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জায় কষ্ট পায়। শীতকালে লোকে ভেকের মত সময় সময় মৃতপ্রায়

অবস্থায় বাড়ীতে বসিয়া থাকে। কর্ম্ম-জীবী লোকে বাহির হয়। সারাদিনরাত ঝড় বৃষ্টি লাগিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে শীতের প্রকোপ ভয়ানক হয়। পানীয় দুধ ও জল জমিয়া যায়; গ্যাশের পাইপ ফাটিয়া যায়। মাঝে মাঝে তুষারে পৃথিবী শ্বেতবর্ণ ধারণ করে।

তুষারপাতের সময় আকাশ নীরব, নিশ্চল, গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে। সকল দিক অন্ধকার হয়। মুহূর্ত্তে তুষারপাত আরম্ভ হয়। তুষারপাত আমাদের দেশের শিমূল তুলা বৃষ্টির মত। বাড়ীর ছাদ, কর্ণিশ, গাছের ডাল পালা, পাতা প্রভৃতি সকল জিনিস তুষারে আবৃত হয়। ভূমি স্নিগ্ধ, শান্ত, প্রশস্ত সাগরের আকার ধারণ করে। ভূমিতে মাঝে মাঝে সাগরের লহ-রীর মত রেখা দৃষ্টিগোচর হয়। কলমের গাছ বা চারা গাছ সকল তুষারাবৃত হইলে চিনির মঠের আকার ধারণ করে। তুষার অনেক পরিমাণে ভূমি উৎকর্ষণে সহায় হয়; জমি উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়। বিলাতে প্রচুর পরিমাণে শস্য বা শাক সব্জীর চাষ হয়। কিন্তু কৃষকেরা আমাদের দেশের কৃষক অপেক্ষা সুখী। ভূমিতে জল সেচন করিতে হয় না। বৃষ্টি বা হিমে সে অভাব পূর্ণ করে। তাহাদের সুখ দেখিলে আমাদের মনে হয়, যদি আমাদের কৃষকেরা সে সুখ পাইত, প্রতিবৎসর দুর্ভিক্ষে লোক মারা পড়িত না। শীতকালে ছেলেরা খেলিয়া নিজেদের প্রফুল্ল করে। প্রতিদিন বাড়ীতে বসিয়া থাকা চলে না। কখন কখন দিনের বেলা বাতি জ্বালিতে হয়। শীতের আধিক্যে জলাশয় জমিয়া গেলে স্ত্রীপুরুষ skating করিয়া পরম আনন্দ ভোগ করে। কিন্তু গত কয়েক বৎসর সে সুবিধা হয় নাই। শীতকালে অনেক ফল, মূল কৃত্রিম রূপে তাপ দিয়া পাকায়। সর্ব্ব দেশের প্রচলিত প্রথার মত বিলাতের লোক মিউসিয়ম ইত্যাদি স্থানে সচরাচর যায় না। বিদেশীরাই সে সকল স্থানের অনুরাগী। শিক্ষা-পিপাসুরা সে স্থানে অধ্যয়ন করে, কিন্তু সাধারণে যায় না। আমাদের বিশ্বাস, 'ফুরিয়া গেলে আর পাবিনা।' কিন্তু অধিবাসীরা সে বিষয়ে আমাদের দেশের তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার মত। কিন্তু অপর স্থানে থিয়েটার বা concert বা crystal palace এ বা কোন বক্তৃতা ইত্যাদিতে এত ভিড় হয় যে, সকলের স্থান হয় না।' কোন প্রসিদ্ধ গান বা অভিনয় শুনিতে বা দেখিতে এত ভিড় হইবার সম্ভাবনা যে, ৪।৫ মাস পূর্ব্বে সর্ব্ব-সাধারণকে সেই বিশেষ বিষয়ের তারিখ জানান হয় এবং পর মুহূর্ত্ত হইতে পঙ্গপালের মত সকলে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য দৌড়ায়। কাগজের সংখ্যা ত কম নয়। প্রত্যেক সহরে, গ্রামে ২।৪ খানা কাগজ আছে। কাগজ সকল বিষয়ের বার্ত্তাবহ। দৈনিক সংবাদ, রাজনীতি আলোচনা, অপ-রাপর পাঠ্য বিষয়, সর্ব্বাধিকাংশে বিজ্ঞাপন। দৈনিক সংবাদ পত্রে জিনিসের দর জানা যায়। অনেক স্থলে সে দরের অধিক দরে জিনিস বিক্রয় করিবার অনুমতি নাই। পুলিশ পাহারা দিতেছে, খাস দ্রব্য পরীক্ষা করিতেছে।

এদেশের ঘোড়া, মেষ, গাড়ী ও বলদ অতি সুস্থকায় ও বৃহদাকার। ঘোড়াই দেশের সকল কাজ করে। বাকী কাজ কলে চলে।

পৃথিবীতে জীবিত জন্তুর সংখ্যা এই—

ঘোড়া ১৬, ৫৩৭, ৫২৪

খচ্চর ২,০৮৬, ০২৭
গাভী ইত্যাদি—৪৩,৯০২, ৪১৪,
মেষ ৪১, ৮৮৩, ০৬৫।

গত বৎসর যে ঘোড়া ডার্বি ঘোড়া দৌড়ে বাজী জিতিয়াছিল, সে দিন সেটী ৩৬ হাজার পাউণ্ডে অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। ইংলণ্ডের অশ্ব-সংখ্যা ১৫১৭১৬০; গোমেষাদি—৬৬২২ ৩৬৪ + ২৬৭৪৩১৯৪; শূকর—২৪৫১৫৯৫।

বিলাতে অনেক শস্য জন্মে না। এবং বিলাতে উৎপন্ন অনেক শস্য ও ফল মূল প্রভৃতি সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য পরিমাণে অনেক কম। সেই জন্য প্রতিদিন বিদেশ হইতে জাহাজে নানাপ্রকার শস্য, উদ্ভিদ ফল, ফুল আমদানী করিতে হয়। নিম্নে সামান্য একটী তালিকা দেওয়া গেল।

শস্য	অপর সাধারণ রাজ্য হইতে আমদানী	ইংলণ্ডের অধিনিবেশ হইতে আমদানী।
১৮৯৮গম—	৫০৪৬৫৮২০ হন্দর	১৪৭৬
		২.০০
মটর বড়বটী ইত্যাদি		৪১৪১৫৭০৮
		৪১৪৯৫০৪
মাখন ইত্যাদি—৩৭১৪০২৭		৩৯৫৭৪১
পণির—	৪৭২৫৫৫	১৪৭৭০৬২
ড্রিম—	১৬৪০৬২৬৫৬০	সংখ্যা; ৯০৩২
		৫৫৬০ সংখ্যা
মাংস	৭০৩০২৭১	৬৫৩২৫০
	২৪৫৪৮৬২	৬৪৫৯৫৯
	১৩৭৯৭১৮হন্দর	১৯৩৪২৪৩হন্দর
	৫৪৭৪৭২	১০১৩০
	১১৬৬২১৯	৩০৪৬৩৩

উপরোক্ত পরিমাণ মাংসের কতক প্রায় টাট্‌কা মাংস; কতক লবণে সিক্ত থাকে। দেশের কোন মাংস ৭।৮ বা তদধিক দিন না মজিলে রান্না করে না।

শস্য	অপর স্বাধীনরাজ্য হইতে আমদানী	ইংলণ্ডের অধিনিবেশ হইতে আমদানী।
১৮৯৮। আপেল (কাঁচা)		১৮৪৮১৪৬
১৬১০৭৭০ টুকরী		টুকরী।
পেঁয়াজ (কাঁচা) ৫৯২৪১৯৯		৭৮৩১৬
আলু ৫৪৯৯৩৫২ হন্দর		১২৫২২৯৬
মাছ ২৪৭৫১৮৯		৫০৫৯২৪

ইত্যাদি।

বিলাতে যে সকল খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আটা ও আলু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দিন খরচ চালাইতে পারে। কিন্তু কোন জিনিসের পুঁজি ৩ মাসের অধিক ঠিকিবে না। সেই জন্য সকলে বিদেশের নিকট ঋণী। আজ যদি যুদ্ধ হেতু য়ুরোপের ২।৩ স্বাধীন রাজ্য ইংলণ্ড আক্রমণ করে বা কোন কারণ বশতঃ ইংলণ্ডে খাদ্য দ্রব্য চালান না করে, তাহা তাহা হইলে অচিরে সকলকে অন্ন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। দেশের আয়তন ১২১১১৫ বর্গ মাইল। জন সংখ্যা ১৮৯৯ খৃঃ ৪০৫৫৯৯৫৪; ১৮৯৮ সালে জন্ম ১১৫৯১৯২; মৃত্যু ৭১২৮৯৬; বিবাহ ৩০৯৪৯২ জনের। দেশের অর্দ্ধেকেরও অধিক জমিতে চাষ হয়। আড়াই কোটী বিঘা জমিতে শস্য উৎপন্ন হয়। এক কোটী পঁচিশ লক্ষ বিঘায় শাক সবজী ও তরকারী জন্মে। সত্তর লক্ষ বিঘায় ফল বাগান। বাকী জমিতে গরু বাছুরের জন্য ঘাস রক্ষা করিতে হয়। কতক জমি জঙ্গলে আবৃত। তথায় হরিণ, শৃগাল প্রভৃতি জন্তু পাওয়া যায়। আমেরিকাবাসীদের অনেকে সে সকল জঙ্গলের অধিকারী। প্রতি বৎসর শীতকালে জমীদারগণ, বন্ধু বান্ধব চাকর নফর সঙ্গে লইয়া এই সকল জঙ্গলে শীকার করিতে আইসেন। আমাদের গৌরবস্থল জগদ্বিখ্যাত ইংলণ্ডের নয়নতারা কুমার রণজিৎ সিংহজীও, কিছু জমি ক্রয় করিয়াছেন।

শ্রীসুকুমারচন্দ্র রায়।

বেঙ্গল্ গেজেট্।

(সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয়-সমাচার-পত্রিকা)।

যে সমস্ত প্রতীচ্য পণ্ডিত-নিচয়, অতুলনীয় অধ্যবসায়-সহকারে ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি লাভ-কর, চমৎকার-কারক ব্যাপার কিংবা আশ্চর্য্য-কার্য্যাদি-প্রদর্শনার্থে—কি, বিদ্যা-বিনিময়-সূত্রে বহু-দিবসাবধি ভারতবর্ষে সমুপস্থিত থাকিয়া, বঙ্গদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন—সেই সমুদায় পাশ্চাত্য-বিবুধ-মণ্ডলীর ঘোরতর, দৃঢ়-মূল সংস্কার—ইংরাজ-জাতীয় সুধী-সমূহ কর্ত্তৃকই, ভারতে য়ুরোপীয় সভ্যতার তাবৎ তত্ত্বই—বিদ্যা ও জ্ঞান, বোধ-শক্তি ও বাণিজ্য-কার্য্যাদি—অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয়-গুলি,—সুচারু নিয়মাবলীর সুসংযত, অচঞ্চল শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল। কেবলই যে, পূর্ব্বতন সাহেবগণ, উক্ত মতে আস্থাবান্ ছিলেন, তাহা নহে। অধুনাতন প্রায় সকল সাহেব, ঐ সব অসম্ভব অভিমতিতে অতি-মাত্র প্রীতিমান্ ও আগ্রহবান্। এইখানেই যদি ঐ রহস্য-মূলক অভিনয়ের জবনিকা-পতন হইত, তাহা হইলেও, তাহাই কতকটা প্রবোধের বিষয় হইত না কি? সাহেব-সমূহের অভিপ্রায়ে সায় দেওয়ায়, যে বাঙ্গালী-গুলি, অত্যন্তই অভ্যস্ত,—তাঁহারাই, নির্ব্বিবাদে—অবিসংবাদে—উক্ত অভিমতের অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়াছেন। এমন কি, এখনও তাঁহারা, তত্তাবৎ ভ্রান্ত মতের অনুগমনের একান্ত পক্ষপাতী! প্রথমোক্ত বিষয় অপেক্ষা শেষোক্ত বিষয়, নিতান্তই মর্ম্মান্তিক নয় কি?

তাদৃশ অনুকরণে ভারতীয় আমরাও, বুঝি বা কতই উপকৃত! সুতরাং আমরা, সর্ব্ববিষয়েই যেন, না জানি, সম্যক্-প্রকারে কতই সমুন্নত! সকল য়ুরোপীয়ই যে, এই মতের প্রবর্ত্তক, সে কথার অবতারণা করা, এখানে আমাদের অভিপ্রায় নয়। য়ুরোপীয়—বিশেষতঃ, ইংলণ্ডীয় কতিপয় রাজপুরুষই, উল্লিখিত-মতাশ্রয়ী। কিন্তু এটী, একটী নিতান্ত ভ্রান্তি-ময় মত। যাঁহারা বিদেশীয়, বিজাতীয় বা বিধর্ম্মীয়—তাঁহাদের ভ্রম হওয়া, বরং সহজ কাজ (১)। তাহাদের উক্ত মত, কোন অভ্রান্ত নয়—সেই বিষয়টী, পশ্চাৎ যথা-স্থানে আমাদের কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত হইবে।

এই কথাটী, আপাততঃ শুনিতে ও বলিতে, যেমন কতই সুন্দর প্রতিভাত হয়! কিন্তু সর্ব্ব-দেশীয় ও সর্ব্ব-কালীয় পুরাবৃত্ত, প্রাচীন ইতিবৃত্ত, প্রকৃত তথ্য, প্রত্নতত্ত্ব, যাঁহারা যত অবগত—তাঁহারা, কখনও ঐ আপাত-প্রতীত, মনোহর, ব্যাপার-বিষয়-নিচয়ে সায় দিতে কিছুতে সম্মত হইবেন না। যে কারণে, এই বৃত্তান্ত, এক্ষণে এখানে অবতারিত হইতেছে, তন্ন তন্ন ভাবে তাহার

(১) কিন্তু এতদ্দেশে জাত ব্যক্তি সমস্ত, বৈদেশিকগণের পথে পদার্পণ করিয়া, ভ্রান্তি-বিজড়িত হইয়া গড়েন, তাহা অপেক্ষা, কষ্টকর কাজ, আর কি আছে?

মূলানুসন্ধান করিতে গেলেই, প্রকৃত তত্ত্ব, আপনা হইতেই সুব্যক্ত হইয়া পড়িবে।

এই উপলক্ষ্যে এই প্রবন্ধের আনুষঙ্গিক আরও একটী বিষয়, এই খানেই বলিয়া লইতে চাহিতেছি।

য়ুরোপীয় পণ্ডিত-কুল, চিরকালই আপনাদিগকে সচরাচর সর্ব্ব-ব্যাপারের অভিজ্ঞান-নিপুণ, কার্য্যকুশল ও প্রাজ্ঞ জ্ঞান করিয়া থাকেন। মানুষ, আপনাকে আপনি সর্ব্ব-ব্যাপার-বেত্তা, জ্ঞানবান্ জন জ্ঞান করিবেন,—এটী, কথনই বিচিত্র বিষয় নয়। মানব, স্বভাবতঃই স্বীয় অভাব-অনুভবে একান্তই অন্ধ। এটীই, মানব-স্বভাব। ইহাই, মানব-চরিত্রের মর্ম্ম। এইটী, মানবের একটী প্রাকৃতিক ধর্ম্ম।

আমরা অকপট অন্তরে অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত আছি—আজ আমাদের যে, এতাদৃশ অভ্যুদয়, ইংরাজ-রাজ, তাহার মূলাধার। বিলাতীয়-প্রথা-ক্রমে স্ত্রীশিক্ষা-ব্যবস্থা, ইংরাজি-বিদ্যা ধন-বিধান, বিধবা-বিবাহ-বিধি প্রভৃতিতে, ইংরাজের যুক্তিযুক্ত স্তুতি-গীতি ইত্যাদির অসীম মহিমাই, সুব্যক্ত করিতেছে। এখানে অবনত মস্তকে আমাদিগকে ইংরাজ-মাহাত্ম্য, স্বীকার করিতেই হইবে। আর, ইংরাজি-সমাচার-পত্র-প্রচারেও ইংরাজ-রাজের জয়-জয়কার। কিন্তু বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রিকার প্রচারে বাঙ্গালীই, কেবল অগ্রসর। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালী-সকলই, ঐ ভ্রান্ত মতে আস্থাবান্। তাঁহাদের ভ্রান্ত দৃষ্টান্তে অনেকেই, অত্যন্ত ভ্রমান্ধ। সুতরাং এ সব, সর্ব্বথা অতৃপ্তিকর।

সুতরাং সুস্পষ্টই সুব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে—"শ্রীরামপুরের" পাদ-রিপুঙ্গব (২) পুঙ্গবের একান্ত যত্ন ছিল—তাঁহাদের সম্পাদিত ও পরিচালিত "সমাচার-দর্পণ"-পত্রই, বঙ্গদেশ-প্রচারিত 'বঙ্গীয় প্রথম সমাচার-পত্রিকা'। কিন্তু ঐ কথার অন্যথাভাবপ্রদর্শন করিতে পারিলেই, "দর্পণের" প্রথমত্ব, অব্যাহত থাকিবে না। উহার প্রথমত্ব-প্রণাশের সঙ্গেই, অন্যান্য বিষয়ে উহার প্রাধান্যের ব্যতিক্রমও, কেমন মনোরম,—পাঠক! দেখিতে চাহেন—না, শুনিতে চাহেন? সুতরাং সর্ব্বাগ্রেই সত্যাপালপ-কারকদিগের (স্বজাতীয় সুধী-সমূহের) বচন-পরম্পরায় উক্ত পাদরি-নিকরের বাক্যগুলি, অনৈক্য ও অসামঞ্জস্য দোষে দুষ্ট কি না, তৎ-প্রদর্শনোদ্দেশে বদ্ধ-পরিকর হইতেছি। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বহু আড়ম্বর বর্জ্জন পূর্ব্বক আমরা, প্রমাণ-প্রয়োগে বলীয়ান্ হইতেছি। "বেঙ্গল্ গেজেট্" যে, বয়োজ্যেষ্ঠ—তাহাই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে। "সমাচার-দর্পণ" "বেঙ্গল্ গেজেটের" যথেষ্টই বয়ঃকনিষ্ঠ। প্রথমের বয়ঃক্রম, দ্বিতীয় অপেক্ষা কম নয়—বরং খুবই অধিক।

বাঙ্গালা-সমাচার-পত্রিকার প্রাথম্য-নির্ণয়-বিষয়ে দুইটী মত, প্রচলিত ছিল। অধিক কি, অধুনাপি তদ্রূপ মতামতই, বিদ্যমান থাকিতে দৃষ্ট হইতেছে। বাম দিকে ভ্রান্ত মত, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে, দক্ষিণ দিকে বিশুদ্ধ মতের প্রসঙ্গ, নির্দ্দেশিত হইতেছে। পাঠক-বর্গের সুবিধার নিমিত্ত পার্শ্বা-পার্শ্বি ভাবে উভয় মতের বিষয়, এইরূপেই আলোচিত হওয়া সুবিধাজনক।

---

(২) "প্রকৃতি"-নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকায় "পাদরি-পুঙ্গব" শব্দ, এই প্রবন্ধ-লেখক কর্ত্তৃকই, বঙ্গসাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। তদবধি "হিতবাদী" প্রভৃতি পত্রে উহার প্রকৃষ্ট প্রচার চলিতেছে।

যে যে পত্রিকা, যে যে পুস্তক, যে যে ব্যক্তি, "সমাচার-দর্পণ"কে 'প্রথম বঙ্গীয় সংবাদ-পত্র' নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এখনও করেন, তাহার কাল-ক্রমিক তালিকা, নিম্নে নিবদ্ধ হইতেছে।

(1) "Friend of India" (Monthly Edition)—Form 1818 A. D. to 1820 A. D. (ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া অর্থাৎ 'ভারত-সুহৃদ্'(১২২৫ সাল হইতে ১২২৭ সাল) পর্য্যন্ত।

(2) "Friend of India" (Quaterly Edition)—Form 1821 A. D.—to1836 A. D.

ফেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া—(ত্রিমাসিক সংস্করণ)—(১২২৮ সাল হইতে ১২৪৩ সাল)।

(3) "Friend of India" (Weekly Edition) 1837 A. D. ফেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া, (সাপ্তাহিক সংস্করণ,) ১২৪৪ সাল)।

(4) "History of Bengal, by John Clarke Marshman" (1st Edition), 1837 A. D.

বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত, জন্ ক্লার্ক মার্শমান্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত (প্রথম সংস্করণ), ১২৪৪ সাল।

(৫) "সমাচার-দর্পণ"১৮৩১খৃঃ, ১১ই জুন (১২৩৮ সাল, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ)।—

ইহা, এই সময় হইতে দ্বিভাষিক পত্রিকা হইয়া চলিতেছিল।

(6) "Friend of India" (Weekly Edition) 13th Vol, 19th Sep, 1850 A D. ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া, ১২৫৭ সাল, ৪ঠা আশ্বিন।

(৭) "প্রথম-শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস"—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ বি এল্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত (প্রথম সংস্করণ), ১৮৭৪ খ্রীঃ (১২৮১ সাল)।(৩)

গত বর্ষ (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্রাকার পুস্তকের ৫৯শ (ঊনষষ্টিতম) সংস্করণ হইয়াছে। তাহাতেও ঐ বিষম ভ্রম, রহিয়া গিয়াছে। " অনুসন্ধান"-নামক পত্রে (১৩০৬ সাল, ৭ই অগ্রহায়ণে) উক্ত ভ্রান্তির উল্লেখ করিয়াছিলাম। তথাপি এখনও ঐ অশুদ্ধিই, রহিয়া যাইতেছে।

---

(৩) "পুরোহিত ও অনুশীলন" তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ৪৮পৃ, দ্রষ্টব্য। অথবা, মৎ-সঙ্কলিত "সন্দর্ভ সংগ্রহ" 'ভরদ্বাজ-গোত্র' প্রবন্ধ, ৪৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

যে সমস্ত সংবাদ-পত্রিকা, যে সকল পুস্তক, যে যে ব্যক্তি—"বেঙ্গল্ গেজেট্কে" প্রথম সংবাদ-পত্র বলিয়া নিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তৎ-সমুদয়ের কাল-ক্রমানুসারিণী তালিকা, এই খানেই লিপিবদ্ধ করা গেল।

---

(১) 'বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের ইতিহাস' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, ১২৫০ সাল, ১লা বৈশাখ (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ই এপ্রিল।

(2) Descriptive Catalogue of Bengali Works, by (Rev) J. Long, 1850 A. D.

(৩) 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব'—রামগতি ন্যায়রত্ন-সঙ্কলিত, ১২৮১ সাল, ১১ই আষাঢ় (১৮৭৪ খ্রীঃ, ২৪শে জুন।

(৪) (ক) "বঙ্গীয় সংবাদ-পত্রের বিবরণ" ১২৮২ সাল, ২৮শে বৈশাখ (১৮৭৪ খ্রীঃ, ১০ই মে)।

(৪) (খ) "বঙ্গীয় সংবাদ-পত্রের বিবরণ" ঐ বর্ষ (১২৮২ সাল), ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ [১৮৭৫ খ্রীঃ, ১৭ই মে]।

(৫) "বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্য-বিষয়ে বক্তৃতা" (বক্তা—শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার), ১২৮৬ সাল, আষাঢ় (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ, জুলাই)।

(৬) "সমাচার চন্দ্রিকা" ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ, (১২৪১ সাল)।

(৭) "নবজীবন" দ্বিতীয় ভাগ। উহার সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিএ, বি এল্।

প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৪)।

(৮) "জন্মভূমি" ষষ্ঠ ভাগ, ১৩০৩ সাল, আশ্বিন মাস—(১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ, সেপ্টেম্বর)।

(৯) "বঙ্গীয় সংবাদ পত্র"।—"সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"—১৩০৪ সাল, ২৮শে শ্রাবণ

---

(৪) ইনি স্বনামখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা। ইনি চতুর্থ সংবাদ-পত্রের ("প্রথম-বঙ্গদূতের") সম্পাদকের (নীলরত্ন হালদার মহাশয়ের) দৌহিত্র।

—(১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, ১২ই আগষ্ট)।—চতুর্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

(১০) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"—১৩০৫ সাল, ৫ম ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা। লেখক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

(১১) "অনুসন্ধান" (সাপ্তাহিক পত্র), ১৩০৬ সাল, ৭ই অগ্রহায়ণ (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ২২শে নবেম্বর)। প্রবন্ধের নাম—"বাঙ্গালার প্রথম সংবাদ পত্র"। লেখক—ঐ বিদ্যানিধি।

(১২) (ক) প্রবন্ধের নাম—"বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্র"। "দৈনিক সমাচার" (প্রাত্যহিক পত্রিকা), ১৩০৬ সাল, ৬ই চৈত্র। (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ, ১৯শে মার্চ্চ)। (লেখক—ঐ)।

(১৩) (খ) প্রবন্ধ-নাম—"বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্র"—"দৈনিক সমাচার"—১৩০৬ সাল, ১৫ই চৈত্র (১৯০০ খৃষ্টাব্দ, ২৮শে মার্চ্চ)। (লেখক—ঐ)।

এই বাঙ্গালা-দেশই, ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের 'আকর'। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারিতে যে পত্রিকার উদ্ভব হয়, তাহার নাম—"হিকিজ্ গেজেট্" (Hickey's Gazette)। নাম শুনিলেই, বোধ হয়, উক্ত পত্রিকা-খানি, ইংরাজি-ভাষায় চালিত হইত। যাহা,বৈদেশিক ভাষার পত্রিকা,তাহার সঙ্গে আমাদের কোন প্রকার প্রয়োজন নাই। সুতরাং আমাদিগকে খাস্ বাঙ্গালা-পত্রিকার আমলে গিয়া পড়িতে হইতেছে।

এত ক্ষণের পর "বেঙ্গল্ গেজেটের" বৃত্তান্ত, লিপিবদ্ধ করিতে, আমরা অবসর প্রাপ্ত হইলাম। প্রথম ইংরাজি-পত্রিকার নামের শেষার্দ্ধের সহিত অভিন্নতা হেতু, "বেঙ্গল্ গেজেট্কেও" বিলাতী পত্রিকা মনে হইয়া,ভ্রান্তি সংঘটন হওয়া,সম্ভব। উল্লিখিত-জাতীয় বস্তুই, কিন্তু 'বঙ্গীয় প্রথম বার্ত্তাবহ,' বহু প্রাচীন কাল হইতে, এদেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তি-ব্যূহের এই ভয়ঙ্কর ভ্রান্ত সংস্কার-মূলক মতই,বদ্ধমূল হইয়াছিল যে,শ্রীরামপুরের "সমাচার-দর্পণই" বঙ্গের প্রাচীন ও প্রথম পত্র। সুতরাং, উহাই, প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রিকা। এই ভ্রম-ময় ধারণা, বহু-কালাবধি কেন দৃঢ়-প্রোথিত মতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ, ১২৩৮ সালে (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে) ঐ মতই,অতীব বলবৎ ছিল। ঐ মতামত, এতই প্রচলিত ও প্রবল ছিল যে, তন্নিবন্ধন প্রকাশ্য-পত্রিকাতেও,তদ্বিষয়ের বিপুল বিতণ্ডা, সমগ্র বঙ্গভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক ভারত-বিখ্যাত হইয়াছিল এবং তৎপরেই তাহাকে নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক হইতে, শোনা গিয়াছিল বলিলেও, কোনও হানি হয় কি ?

আমাদের মৌখিক বা লিখিত উক্তিতে কাহারও আস্থা-স্থাপনের জন্য আমাদের কোনরূপ অনুরোধ নাই। অস্মৎ-প্রদত্ত প্রমাণ, সন্তোষ-জনক না হইলে, কাহাকেও তাহা,বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে বলিব না। সে অসঙ্গত মতে সায় দিবার নিমিত্ত, যত্ন বা প্রয়াস পাওয়া, সর্ব্বথা বৃথা—নিতান্তই নিষ্ফল। বাক্যাড়ম্বরের আধিক্যে মনোনিবেশ, অশেষ প্রকারে না হউক—কিয়ৎ-পরিমিত মাত্রায়ও স্থল-বিশেষে অনাবশ্যক। এখন তাই প্রকৃত তত্ত্বে আমাদিগকে অভিনিবিষ্ট হইতে হইতেছে।

১২৩৮ সালের "সমাচার-দর্পণে" এক পত্র প্রেরক মহাশয়, যে রূপে লেখনী ধরিয়াছিলেন—তাহারই মর্ম্ম, উপস্থিত ক্ষেত্রে বিনিবদ্ধ হইবার একান্ত উপযুক্ত। সেই প্রস্তাবিত বৃত্তান্ত, পশ্চাৎ লিখিত হইল।

'সমাচার-দর্পণের' ৬৮০ (ছয় শত আশী)

সংখ্যায় এক পত্রপ্রেরক, অনেক কথার অবতারণা করেন। তদনুষঙ্গিক তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"এই অপূর্ব্ব 'সমাচার দর্পণাবতারের' পূর্ব্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল না যে, বাঙ্গালা-সমাচার-পত্র'-নামে কোন পদার্থ আছে। (৫)।

ঐ বর্ষের (১২৩৮ সালের)৩০শে জ্যৈষ্ঠের ২। ৪ (দুই বা চারি) দিন পূর্ব্বে "সমাচার-চন্দ্রিকার" (৬) কোন পত্র-প্রেরক মহাশয়ও, ঐ প্রবন্ধ-কারককে "বিজ্ঞতম" আখ্যায় শ্লেষ করেন।

তদ্ভিন্ন তিনি যে কয়টী কথা বলেন, তাহা এই,—

(ক) "সমাচার-দর্পণ" আদিম অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষায় লিখিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক 'সমাচার-পত্রিকা' নয়।

তিনি ইহাও বলিয়া ফেলিয়াছিলেন,—

(খ) "সমাচার-দর্পণের" উক্ত পত্র প্রেরক মহাশয়, বোধ হয়, কলিকাতা-বাসী নহেন। তাহার কারণ,রাজধানীর লোকেরাই—ভাল-মন্দ, হিতাহিত, ভদ্রাভদ্র, শুভাশুভ, পবিত্রাপবিত্র বোঝেন। অর্থাৎ সহরের সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকেরই মানস ও অভিলাষ, প্রয়াস ও প্রযত্ন, সংস্কার এবং ধারণা এই যে, যাহা স-ঠিক্ সংবাদ, তাঁহাদের মতে তাহারই সমাদরের দরকার।

(গ) তাহার পর "চন্দ্রিকার" পত্রপ্রেরক মহোদয়ের লেখা হইতে, আরও কি কি বিষয়, প্রাপ্তব্য,—তাহাও দেখুন।

(১) কোন্‌টী, বাস্তবিকই আদিম বঙ্গীয় বার্ত্তাবহ। অর্থাৎ সেই পত্রিকার কি নাম ?

(২) সম্পাদকের নাম কি ?

(৩) তিনি কোন্ জাতীয় ?

(৪) সম্পাদকের অপরাপর প্রকৃত কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি না ?

(৫) তিনি কোন্ গ্রাম-স্থিত ?

(৬) পত্রিকার মূল্য কত ছিল ?

(৭) স্থায়িত্বই বা কত দিন ?

(৮) অন্যান্য কথা। যথা,—প্রবন্ধাদির রচনা-প্রণালী। লেখার নমুনা কিছু কিছু উদ্ধৃতাংশ।

ক্রমশঃই আমাদিগকে এই কথাগুলির উত্তর দিতে হইবে।

১। "বেঙ্গল্ গেজেট্" প্রথম বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্র।

২। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, উহার সম্পাদকতায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু "চন্দ্রিকার" পত্রপ্রেরক, তাঁহাকে "গঙ্গাকিশোর" নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। উহা, নিশ্চয়ই ভ্রান্তিময়ী উক্তি। সৎকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, লঙ্ সাহেব, রামগতি ন্যায়রত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতি, আমাদের উক্ত উক্তির সপক্ষীয় সাক্ষী।

৩। তিনি দ্বিজাতি—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।

৪। কুলীন না হইলেও, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, মনোহরণ-কারক, মনীষী মনুষ্য।

৫। "বহড়া" গ্রামের তিনি অধিবাসী ছিলেন। এই 'বহড়া' শ্রীরামপুরের সন্নিকটস্থ। "বহড়া" গ্রামের বর্ত্তমান নাম বা সংক্ষিপ্ত নাম—'বড়া' (৭)।

৬। মাসিক ১ (এক) টাকার দর্শনীতে সর্ব্ব-সাধারণে "বেঙ্গল্ গেজেটের" সাক্ষাৎ-

(৫) "সমাচার-দর্পণ" —১৮৩১ খ্রীঃ, ৬৮০ সংখ্যা।
(৬) "সমাচার-চন্দ্রিকা" চতুর্থ বঙ্গীয় বার্ত্তাবহ। সময়ান্তরে তাহার প্রসঙ্গ বিবৃত হইবে।

(৭) সাধকপ্রবর, সুবিখ্যাত, সঙ্গীতরচক রসিকচন্দ্র রায় মহাশয়ও, এই গ্রামেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সুতরাং সাহিত্য ও ইতিহাসের সংস্রবে স্বীকার করিতে হইতেছে—এই গ্রামের সুখ্যাতি, সম্যক্ প্রশংসনীয়।

কার করিতে পাইত। বার্ষিক দ্বাদশ মুদ্রা—১২৲ [বার টাকা], উহার মূল্য। সুতরাং দর্শনীটী, একপ্রকার অকিঞ্চিৎকর বলা যায়। সম্ভবতঃ, উহা অগ্রিম দেয় মূল্য নয়। কারণ, তখনও খবরের কাগজের দর বা আদর, বরাবর তেমন সুবিধাজনক ছিল না।

৭। এক বৎসর বৈ উহার পরমায়ুঃ নয়।

'সংবাদ-পত্রিকার' ঐতিহাসিক তালিকায় নিম্নোক্ত ৫টী (পাঁচটী) বিষয়, সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা স্মরণীয়।

(ক) "বেঙ্গল্ গেজেট্"—এই নামক সাপ্তাহিক পত্র।

(খ) উহার সম্পাদক "গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য।"

(গ) ঐ গেজেটের প্রকাশ-কাল—"১২২৩ সাল"। অর্থাৎ—

(ঘ) ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ।

(ঙ) সম্পাদকের নিবাস-স্থল—"বহড়া" বা 'বড়া' গ্রাম।

(চ) প্রকাশ-স্থান—"কলিকাতা"।

এই উপলক্ষ্যে "বেঙ্গল্ গেজেট্" ও "গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য" এই নাম-দ্বয়; ১২২৩ সাল বা ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ, এই সময়টী; "বহড়া" ও 'কলিকাতা' (কার্য্যালয়); এই ছয়টী বিষয় প্রত্যেকেই—চিরস্মরণীয় ব্যাপার। গঙ্গাধরের নামের আনুষঙ্গিক বাঙ্গালী কর্ত্তৃক সমাচার-পত্রের সম্পাদকত্বও, সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

পৌরাণিক গঙ্গাধর, শঙ্কর। তিনিই শিব-দাতা (মঙ্গল-বিধাতা)। তাঁহার সাহায্য বিনা ভগীরথের ক্ষমতায় মর্ত্তধামে মন্দাকিনীর অবরণ-ব্যাপার ঘটিত না। মহাদেব, বিপুল-বিক্রমে মন্দাকিনীর বেগ-ধারণে স্বীকৃত ও সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, মর্ত্তলোক, গঙ্গা-মহাদেবীর পরম-পূত বিমল সলিলে পবিত্র ও নির্ম্মল হইতে পরিয়াছে। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, সমাচার-পত্রিকার সম্পাদন-রূপ প্রথম কর্ম্মে, বঙ্গদেশের আর্য্য হিন্দু সমাজে, আজও পর্য্যন্ত মহামহিম-ময়! গঙ্গাধরের কেমনই নাম-মাহাত্ম! বার্ত্তাবহ-সমূহের প্রচারে কত দায়িত্বের প্রয়োজন, তাহা সমস্ত বঙ্গ, পরিজ্ঞাত না থাকুক,—সমাজ-রাজনীতি-বেত্তারা, সম্যক্-বিদিত। বঙ্গের অঙ্গে যখন দ্বিতীয় সংবাদ-পত্র (৮), শোভা পাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা, অত্যন্ত ভয়াবহ ও আশঙ্কা-সঙ্কুল। সেই ঘটনাটী, এই সূত্রে উল্লিখিত হইবার উপযুক্ত বিবেচনায়, এই স্থানেই তৎ-প্রসঙ্গ, বর্ত্তমান প্রতিপাদ্য ব্যাপারের প্রসঙ্গে বর্ণিত করিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মিতেছে। সেই প্রস্তাবিত বৃত্তান্ত, পাঠকদিগকে এবম্ভূত ভাবে বিস্মিত ও স্তম্ভিত, চকিত ও চমকিত, ত্রস্ত ও বিমোহিত করিয়া দিবে, যাহা ভাবিতে গেলেও, মানবের বুদ্ধি-বৃত্তি, স্তব্ধ হইয়া যায়। কিয়ৎকালের কারণ, তাহাতে সকলকে নীরব ও নিঃশব্দ করিয়া তোলে! আর বাক্যাধিক্যে আস্থাবান্ হইলে, চলিতেছে না। এখন প্রকৃত কথার (যথার্থ তথ্যের) অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়াই, সর্ব্বোপায়ে শ্রেয়স্কর।

এ পর্য্যন্ত আমরা, যে সকল লিপির উপর নির্ভর করিয়া, এই সন্দর্ভ-সমূহের অনুসন্ধানে করিতেছি, তাহার একটা তালিকা, বর্ত্তমান ক্ষেত্রের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেই প্রবন্ধবলী, আমাদেরই লেখনী-মুখ-নির্গত। কিন্তু, তাই বলিয়া, এ-স্থলে কেবল পুরাতন কথারই আলোচনা করা যাইবে না। কারণ, চর্ব্বিতচর্ব্বণ, আমাদের লক্ষ্য হয়।

প্রতি-বারেই সচরাচর নূতন ঘটনা, নূতন বিবরণ, অভিনব সংবাদ ও নবীন তত্ত্ব-কথার সমাবেশে, আমাদের সেই সন্দর্ভ, এক দিকে যেমন সুন্দর, অন্য দিকে প্রণালীর নূতনত্বে ও বিষয়-সমাবেশের বিবিধত্বে, তেমনই এক অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ-প্রদর্শন না করিলে, আমাদের হৃদ্‌গত মতামত, বিজ্ঞাত হইবার পক্ষে হয় তো পাঠকদিগকে বিকট-বিভ্রাটে পড়িতে হইবে। সুতরাং, মনোগত কথা—সরল সুন্দর ভাষায়—হৃদয়-গ্রাহিণী প্রথায়—সুশোভন-বিবরণীতে—ব্যক্ত করিতে হইতেছে।

১৩০৩ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে 'জন্মভূমিতে' যৎকালে 'বেঙ্গল্ গেজেট্'-নিকটে আমরা, উপস্থিত হই, তৎকালে ঘটনার দৈন্যে আমাদের অগণ্য ও বিশেষ মানসিক ক্লেশেই, উহা লিখিত হইবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হই। সেই প্রবন্ধ, প্রথম অপেক্ষা, বহুল বিবিধ ঘটনা-সঙ্কুল। তাহার পর, যখন "অনুসন্ধান"-পত্রে সেই প্রস্তাবেরই আবির্ভাব হইল, তখন আমাদের অব্যর্থ অন্বেষণ-নিবন্ধন, অনেকানেক কত শত অজ্ঞাত-পূর্ব্ব বৃত্তান্তই, বিদিত হইয়াছিল! তৎপরে "দৈনিক সমাচার"-নামক প্রাত্যহিক সংবাদ-পত্রে উক্ত 'বেঙ্গল্ গেজেট্'-নামক প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রিকার তদপেক্ষাও অধিকতর সমাচার-বিষয়ক বিস্তর সুন্দর সুন্দর সামগ্রী, সম্যক্ নূতন ভাবে ও নব প্রথায়, প্রদত্ত হইয়াছিল। এখন দেখিতেছি, তাহাও, সম্পূর্ণাবয়ব নয়। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিস্তর সমাচারের, সুবিস্তর-রূপে তাহাতেও প্রচার হয় নাই। অগত্যা, অধুনা আমাদিগকে আবার সেই সমাচারের অধিক অংশকে, এই অন্তিম প্রস্তাবেই চরম ও চূড়ান্ত ভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইতেছে। এই নিষ্পত্তিটী, অতিশয় সুন্দর, মনোহর, চমৎকার-জনক। এখন পাঠকগণ, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে নয়ন নিয়োজন করিলেই, নিরীক্ষণ করিতে পারিবেন—আমাদের উক্তি, সারবতী—কি না।

অদ্য পর্য্যন্ত বঙ্গীয়-বার্ত্তা-বিষয়িণী পত্রিকার ইতিবৃত্তের যত বৃত্তান্ত, অস্মদীয় লেখনী-মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে—তাহাদের একটা কাল-ক্রমানুসারিণী তালিকায় পাঠকদিগকে প্রকৃষ্ট প্রথায় দেখাইব,—কত যত্নে, অবিরাম কত শ্রমে, অশেষ অধ্যবসায়ে এতদ্বিষয়ে আমরা অভিনিবিষ্ট। মুখে বা লেখায়, আড়ম্বরের আবশ্যকতা কি? আমাদের কৃত কার্য্যেই, আমাদের কৃতকার্য্যতা, অনুভূত হউক। সেই গুরুতর ব্যাপার—আশ্চর্য্য কার্য্য—বিস্ময়োদ্রেক-প্রদায়ক ও চিত্তচমৎকারক। কঠোর কার্য্যে আর্য্য জাতিরই একান্ত যোগ্যতা। অতএব, আর বাগাড়ম্বরের দরকার নাই। প্রকৃত তত্ত্ব, এই খানেই এই ভাবেই লিপিবদ্ধ হউক্।

(ক) জন্মভূমি—(মাসিক পত্রিকা), ১৩০৩ সাল, জ্যৈষ্ঠ।

(খ) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—(ত্রিমাসিক পত্র), ১৩০৫ সাল। ৪র্থ ভাগ, ৫ম সংখ্যা।

(গ) অনুসন্ধান—(সাপ্তাহিক পত্র), ১৩০৬ সাল, ৭ই অগ্রহায়ণ।

(ঘ) দৈনিক সমাচার—(প্রাত্যহিক পত্র), ১৩০৬ সাল, ৫ই চৈত্র।

(ঙ) দৈনিক সমাচার, ১৩০৬ সাল, ১৫ই চৈত্র।

বাঙ্গালা ভাষায় সমাচার-পত্রিকার আমলে আসিয়া পড়িতে গেলেই—উহার সূত্র ধরিতে চেষ্টা করিলেই—নিরপেক্ষ, নিরীহ, নির্ভীক পাঠকের চক্ষের সমক্ষে একেবারেই "বেঙ্গল্ গেজেট্‌কে" সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকটস্থ ও সন্নিকৃষ্ট দৃষ্ট হইবে। এটা, একটা—যে সে কথা নয়! এই প্রবন্ধের আনুষঙ্গিক কথার

(৮) অর্থাৎ "সমাচার-দর্পণ"।

সঙ্গে সঙ্গে, ইহা, অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, এই বঙ্গদেশই, ভারতের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা সাতিশয় সৌভাগ্যশালী। যে বাঙ্গালী জাতির গুণাবলীর কীর্ত্তনই, এখন অবনীর সভ্য অথচ অপক্ষপাতী জাতি-সমুচ্চয়ের মহোচ্চ চিত্তের পরিচায়ক,—সেই জাতির প্রিয়তম জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, কেন অশেষ সুযশের আধার না হইবে, বল দেখি? ভারতভূমি, চির-দিনই বীরপ্রসূ। তবে বাঙ্গালা, কি কেবলই একেলা, শূন্য অথবা অসারত্বপূর্ণ গৌরবে মাতিয়া বেড়াইবে! আর, অন্তঃসার-রহিত আমরা, অম্লান-বদনে—স্ফূর্ত্তি বিহীন প্রাণে—স্বদেশের ও স্বীয় জন্মভূমির ব্যর্থ বাক্যাড়ম্বরে সগর্ব্ব হইব?

যে বঙ্গভূমিই, প্রথম ইংরাজী-পত্রিকার আকর—তাহার শ্লাঘার অভাব কি? কোন্ অনির্দ্দেশ্য সময়ে, বলিলেই চলে—বঙ্গের অঙ্গে "হিকিজ্ গেজেটের" আবির্ভাব, প্রাদুর্ভাব ও প্রচার হয়!—সেই কালে—সেইস্মরণাতীত সময়ে—ইংরাজ-রাজত্বের আদ্যাবস্থায়, "হিকিজ্ গেজেট্' জন্মগ্রহণ করিয়াছিল!

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাত! আর—১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে "হিকিজ্ গেজেট্" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং উহাদের অন্তরালে ৩৪ (চৌত্রিশ) বৎসরের অন্তর। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ, নিঃসন্দেহই, কেমন সুপ্রাচীন ক্ষণ,—তাহার আর সংশয় কোথায়! কেবল পুরাতন কালই বলি বা কেন? ঐ সাল, শুভসূচকও ছিল বটে। সে সাল, আমাদিগকে অভিনব উপাদেয় দ্রব্য দিয়াছে—ভাল ভাল আবশ্যকীয় অভাব-বিমোচন করিয়াছে—তাহার যদি যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা না হয়, তবে আর কিসের সমাদরের সম্যক্ এবং সমীচীন প্রয়োজন—তাহা উন্নতচিত্ত ব্যতীত অপরের বুদ্ধির অপার—জ্ঞানের অগম্য, এ কথা আবার কি খুলিয়া বলিয়া দিতে হইবে?

ঐ ইংরাজি-সালের (১৭৯০ খ্রীষ্টীয় অব্দের) ২৯শে জানুয়ারীতে উহার উদ্ভব হয় (৭)। কিন্তু উহা ইংরাজী খবরের কাগজ। একে-বিজাতির বস্তু, তাহার উপর বৈদেশিক ভাষায় তাহার প্রচার! এই দুই কারণ-নিবন্ধন তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিতে হইতেছে। উপকারক পদার্থের সঙ্গ-ত্যাগে প্রথম প্রথম কিছু কিছু মনোভঙ্গের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। যাহা হউক, যাহার সহিত অব্যবহিত সম্বন্ধ, সেই প্রকৃষ্ট-বিষয়ক প্রবন্ধই, উৎকৃষ্ট। সম্প্রতি অতিমাত্র প্রীতি, যত্ন এবং সমাদর-সহকারে বঙ্গীয় পাঠককুলের গোচরে উত্থাপিত করা যাউক না কেন?

এখন বঙ্গীয়-বার্ত্তাবহ-নিবহের কালক্রমিক তালিকা এবং তাহার আনুষঙ্গিক আখ্যায়িকাদি, নিবদ্ধ করিবার আমাদের কামনা। সেই তালিকায় আদিম বস্তুটীর নাম—"বেঙ্গল্ গেজেট।"

যৎকালে ভারতবর্ষের ৩য় গবর্ণর জেনেরেল্ লর্ড ওয়েলেস্লির আমল,—সেই সময়ে, এই পত্রিকা, জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে অনেক সুদূরবর্ত্তী কালের কথা। তখন ১২২৩ সাল (১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ), বিলক্ষণ প্রবল বেগে প্রচলিত ছিল!

কুপিত-কপিল-কোপানলে সৌর-কুলীয় সগর-বংশ, সবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাই তদ্বংশাবতংস (সূর্য্য-গোত্র-সম্ভূত), অষ্টাবক্র মুনির বর-পুত্র ভগীরথ কর্ত্তৃক মহীতলে গঙ্গানয়নের সম-কালে পরকীয় শুভদাতা অথচ সংহারকর্ত্তা, প্রকৃতি-পিতা ও বিশ্ব-

(৭) অন্যত্র ৩০ জানুয়ারি লিখিত আছে। উহা ভুল।

পাতা, দেবাদিদেব, মহান্ দেব, মহাশিব-প্রদাতা, মনোহর-বর-প্রদান-কারক শঙ্কর, স্বীয় জটাভ্যন্তর দিয়া মন্দাকিনীর প্রবল প্রবাহের স্রোতোবেগ ধারণ করিয়াছিলেন। তাই তদবধি তাঁহার নামান্তর হইয়াছে—গঙ্গাধর। মঙ্গলপ্রসূ ও স্বয়ম্ভূ, শম্ভু ও শঙ্কর—গঙ্গাধর-সংজ্ঞায় সমধিক খ্যাতনামা ও সুন্দর। তাহা হইলেই, দেখিতে পাইতেছি, গঙ্গাধর, সৎ ও মহৎ, কঠোর বা সুন্দর, উৎকট অথচ উৎকৃষ্ট, কার্য্যের কর্ত্তৃত্বে অদ্বিতীয়।

"গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য"-নামক এক প্রধান ও প্রাচীন রাঢ়ীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের গুণে বঙ্গদেশ, অশেষ ক্লেশ সহিয়াও, বঙ্গীয় সংবাদ-পত্রের নমুনা, বঙ্গ দেশের মধ্যে দর্শাইয়াছিলেন।

১। ইংরাজ-রাজের আজও পর্য্যন্ত যে সমস্ত কীর্ত্তি-কলাপ, অবলোকিত হইতেছে, তত্তাবতের অপলাপ করা, কার সাধ্য? তাঁহাদের অনুষ্ঠিত বা প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম-সকলের অধিকাংশ বিষয়ই, আমাদের আত্যন্তিক-হিত-সাধক। কিন্তু সেই সংস্রবে একটা স্পর্দ্ধা ও আত্ম-শ্লাঘার কথা আছে। অধুনাতন সংবাদ-পত্র-সমূহের মূল-স্থল—য়ুরোপ-খণ্ড। সম্প্রতি-শ্রীবৃদ্ধি-সম্প্রাপ্ত "বঙ্গের" সেই অপরূপ মহাধনের মূল মালিক—খ্রীষ্টান-পাদরিগণ নহেন। উক্ত ঘটনার সংঘটনে এখানে এখন আমরা, একটী নিরীহ বন্ধুকে হিন্দুত্ব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকে দেখিতেছি।

২। উক্ত ব্যক্তি, সম্পাদকোচিত বিবিধ-গুণালঙ্কৃত, রাজনীতিক-কাণ্ডের পারাপারের উপযুক্ত কাণ্ডারী। অতি সুন্দর কার্য্যকারী কর্ম্মচারী, স্পষ্টবাদী অথচ মিষ্টভাষী, সুবক্তা ও সুলেখক তিনিই ছিলেন! তিনি প্রবাসী; কিন্তু রাজধানী, তাঁহার স্থিতি-স্থান। তিনি উপনগর-নিবাসী। কেন না, "বহড়া" গ্রামে তাঁহার বাস। কলিকাতায় সুন্দর বাস-স্থল ছিল। "বহড়া" চাতরা-শ্রীরামপুরের সান্নিধ্যে অবস্থিত। সুতরাং "বহড়া", কলিকাতার সহরতলী—সুন্দর উপনগর। ঐ ভট্টাচার্য্যকে যথাযোগ্য পাত্র বলিয়া অস্বীকার করিতে গিয়া দ্বিধা করিলে, চলিবে না। কতকগুলি রাঢ়ীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বিদ্যমানতা-সত্ত্বেও, এই বঙ্গীয় বিপ্র, বিবিধ গুণে কেবলই সৎ-সাহসী ছিলেন। তিনিই কেবল রাঢ়ীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণের প্রশংসা-ভাজন নহেন। অপিতু, বঙ্গীয়-বার্ত্তাবহ-নিবহের প্রবর্ত্তক বলিয়াই তো, বাঙ্গালী-মহলে এই সুদূর কালেও—জঞ্জাল-জাল অথবা প্রত্যূহ-সমূহ প্রবিষ্ট হইতে পায় নাই!

৩। অধিকন্তু, কি শুভাদৃষ্টের বিষয় দেখুন, কোলাহল-কৌতুকের আকর, এই সুবিস্তীর্ণ বাঙ্গালা মুলুকই, উক্ত সংবাদপত্রিকার ("বেঙ্গল্ গেজেটের") লীলা-খেলার সুযোগ্য পবিত্র ক্ষেত্র। "বেঙ্গল্ গেজেটের" নিকট কোন, আগন্তুক কখন উৎকট ব্যাপার প্রকটনের প্রত্যাশা করিতেন না। উপর্য্যুপরি প্রকৃষ্টপদ্ধতির প্রত্যাশাপন্ন হওয়াই, সন্নিকটস্থ মনাগন্তুক লোকদিগের পক্ষে স্বভাব-সঙ্গত কার্য্য। সুতরাং তাঁহাকে অদূরদর্শক ও অবিবেচক, অপ্রবীণ ও অনিপুণ বলা যাইতে পারে না। তাঁহাকে জনগণের সমীচীন ও সুযোগজনক কর্ম্ম-সম্পাদক, উপযুক্ত পত্রিকা-সম্পাদক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে বিলম্ব ঘটনার সম্ভাবনাও নাই। দূরস্থদেরই যত দূর দূরবস্থা! তাহারাই বিকট বিস্তর বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া থাকে।

"বেঙ্গল্ গেজেট্ই" প্রথম হইল। সুতরাং তদানুষঙ্গিক বাচিক ও আন্তরিক অকপট,

অগণ্য-প্রাধান্য-সম্পন্ন-ধন্যবাদ করিতে হয়। উহার অ-সম্পূর্ণত-সম্প্রদানে মিশনরিগণের প্রাণপণ যত্ন প্রমাণীকৃত করিতে, কিম্ভূত কিমাকার প্রভূত তন্ময়ত্ব সহিত এবং সুপ্রচুর মধুর প্রয়াস পাইতে দেখা গিয়াছিল! সে সব, সম্পূর্ণই উপহাসাস্পদ—কৌতুকাকার! প্রোক্ত অদ্ভুত মত, এত কাল ব্যাপিয়া বরাবরই প্রচলিত ছিল। যথা,—

(ক) ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। শেষ অব্দে উহার বিস্তর বিস্তর বিতণ্ডা চলিয়াছিল। তদর্থে কত শত মনীষীকে বিস্মিত করিয়া দিত। সেই অ-সুন্দর অবসরে প্রকাশ্য-পত্রিকাদিতেও, তুমুল কোন্দল-কোলাহল চলিয়াছিল।

(খ) মধ্যে শুদ্ধ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডের ন্যায় হল্ল-ফল্ল লোক-সকলই, ঐ সব অসম্ভব ব্যাপারের রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া দেন। তদবধি পাদরিরা, বেশ জব্দ। কেন না, এখানে পাদরিই (লঙ্ সাহেবই), অপরাপর পাদরিদের (মার্শমান প্রভৃতির) পৃষ্ঠ-ভক্ষক।

অপর বারে "বেঙ্গল্ গেজেটের" অবশিষ্টাংশ এবং "সমাচার-দর্পণের" আমূল বিবরণ-প্রকটনের প্রয়াস রহিল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

সাহিত্য সম্বাদ।

জীব পর্য্যায়ে মৎস্য একটী পদস্থ জীব, কীট পতঙ্গের উপরে, পক্ষীর নিম্নে। অথচ মৎস্য শব্দহীন মূক জীব। পক্ষী গান করে, কীট পতঙ্গেও শব্দ করে। মৎস্যের উপরে সরীসৃপ, গোধা প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর সরীসৃপ শব্দ করিতে পারে, তক্ষকনামে এক শ্রেণীর গোধার শব্দে চমকিয়া উঠিতে হয়। কিন্তু হেলে, দাঁড়াস ও গো শ্রেণীর সর্পকে শব্দ করিতে শোনা যায় না। ইহাদের কি শব্দ করিবার শক্তি নাই? বাগযন্ত্র ব্যাবৃত হয় নাই? তাহাত নহে।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পিপীলিকা শ্রবণ শক্তি শূন্য। অতি ক্ষীণ স্বরে এবং অতি উচ্চ স্বরে, সপ্তগ্রামে, শব্দ করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহারা শুনিতে পায় না। অথচ পিপীলিকার শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যাবৃতিশূন্য নহে। পিপীলিকা সোঁয়া বা শুঁড় দ্বারা কথাবার্ত্তা কহে বা ইসারায় মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাও ইহাদিগকে বধির বিবেচনা করিবার একটী কারণ। বস্তুতঃ এক শ্রেণীর পিপীলিকাকে শব্দ করিতে শোনা গিয়াছে। মনুষ্যের উচ্চারিত যে কোন শব্দ শুনিতে না পাইলেও পিপীলিকারা বধির নহে। ইহারা ইসারায় কথাবার্ত্তা অধিক কহিলেও ইহাদের ভাষা আছে।

মৎস্যও বধির নহে। মৎস্যের শ্রবণ শক্তি প্রখর। আমার মত যাহাদের মাছ ধরিবার ঝাতিক আছে, তাহারা সকলেই মৎস্যের শ্রবণ শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। মৎস্য বধির নহে, তবে মূক হইবে কেন? সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, মৎস্যদের ভাষা আছে। একজন বৈজ্ঞানিক পিঁজারার মধ্যে বসিয়া তাড়িতালোক সঙ্গে লইয়া ভূমধ্য সাগরের গর্ভে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটী ফনোগ্রাফ যন্ত্র ছিল। সাগর গর্ভে নামিয়া সহসা তাড়িতালোক প্রজ্বলিত করিলে জলচর

দিগের মধ্যে একটী কোলাহল উপস্থিত হইল। ফনোগ্রাফে সে শব্দগুলি লিপিবদ্ধ হইল। এখন বুঝা গিয়াছে, মৎস্যরাও কথা, বার্ত্তা কহিয়া থাকে। আমাদের বহুকালের পোষিত একটী ভ্রম দূর হইয়াছে।

মানুষের আর একটী ভ্রম সম্প্রতি দূর হইয়াছে। বরফ সাদা, এজন্য সাদা রঙ্গ ঠাণ্ডা বলিয়া সকলের ধারণা ছিল। কাল রঙ্গ গরম। তাই আমরা শীতকালে কাল রঙ্গের ও গ্রীষ্মকালে সাদা রঙ্গের বস্ত্র ব্যবহার করি। বস্তুতঃ ইহার বিপরীত যাহা তাহাই সত্য। জীবের আত্মরক্ষার্থ অবস্থা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ব্যাবৃত হয়। মীসরে নীল নদের বন্যায় অনেক স্থান বৎসরের অধিকাংশ সময় জলে ভরিয়া থাকে। কাজেই শক্তি বিশেষ ব্যাবৃত না হইলে আহারাভাবে সেখানে পায়রাদিগের প্রাণান্ত হইত। নীলতটে পায়রার পায়ে হাঁসের পায়ের মত পাতা হয়। তাহার সাহায্যে নীলতটের পায়রারা হাঁসের মত জলের উপর সাঁতার দিয়া আহার সঞ্চয় করিয়া প্রাণ রক্ষা করে। শীত প্রধানদেশে শীতের আধিক্য হইতে প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য জীবজন্তু সকলেই শ্বেতবর্ণে আপনাদের দেহ আচ্ছাদন করে। এই কারণেই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকে কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই কারণেই শ্বেতবর্ণ মনুষ্য গ্রীষ্মে অধিক কষ্ট পায়। ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন উত্তাপ তাপমানে পরীক্ষিত হইয়াছে। শ্বেতপদ্মের উত্তাপ অপেক্ষা রক্ত পদ্মের স্বাভাবিক উত্তাপ অল্প।

বাওয়া ডিম কাহাকে বলে, যাঁহারা হাঁস কি পায়রা পুষিয়াছেন, তাঁহারা জানেন। যাঁহারা মৎস্যমাংস আহার করেন না, নিরামিষ আহারের নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা তিন চারিটী হংসী পালন করেন, তাহার মধ্যে একটীও হংস থাকে না। এই হংসীদিগের যে ডিম হয়, তাহাকে বাওয়া ডিম বলে। বাওয়া ডিমে সন্তান হয় না। সুতরাং বাওয়া ডিম খাইলে জীব হত্যা হয় না। সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কার্বোনেট অব ম্যাগনেসিয়ার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে বাওয়া ডিমেও সন্তান উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই পরীক্ষা হইতে অনেক কথা কল্পনা করা যায়। মানব প্রকৃতি দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছিলাম, হরকোষ ও গৌরীকোষের মিলনে জীবোৎপত্তি ঘটে। হয়ত শত বৎসর পরে নূতন বৈজ্ঞানিককে এ কথা অসত্য প্রমাণ করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

সঙ্গীত-সমাজ ভাঙ্গিয়া দুইটী হইয়াছিল। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দুইটী হইয়াছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ সাহিত্য-সভার সারথী। সাহিত্য-সভার পত্রিকা সাহিত্য-সংহিতা বেশ চলিতেছে।

বুদ্ধদেবের একটী নাম "তথাগত"। তথাগত শব্দের অর্থ কি? আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা বলেন, যেরূপে পুনরাবৃত্তি না হয় সেইরূপে গত বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত। শব্দটীর অর্থ এরূপ হইলে বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থায় কেহ তাঁহাকে এইরূপে সম্বোধন করিতে পারিত না। অথচ বুদ্ধদেবকে এই নামে অভিহিত করিবার শত দৃষ্টান্ত জাতক মালায় দেখিতে পাওয়া যায়। "অরি" শব্দের অর্থ কি? দেশীয় পণ্ডিতেরা বলেন ঋ ধাতু গমন করা, যে বিরোধ প্রাপ্ত হয়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, পালীভাষায় অরি শব্দ অরণ্যবাসী অর্থে ব্যবহৃত হয়। অরণ্যবাসী বর্ব্বরেরা আর্য্যদিগকে সর্ব্বদা পীড়ন করিত। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট অরণ্যবাসী ও শত্রু সমান অর্থ বাচক হইয়াছিল।

"পাজি" শব্দের অর্থ কি? গালাগালি দিতে শব্দটী ব্যবহৃত হয়। সিংহলে পাজ্জা পাজা বা পাজায়া শব্দে নীচ জাতি বুঝায়। সিংহল দেশীয়েরা ব্যাধদিগকে "পাজা" বা নীচজাতি বা চণ্ডাল বলে? পাদ্য শব্দ হইতে কি উহার উৎপত্তি হইয়াছে। মানব প্রকৃতি প্রথম খণ্ডে সিংহলের ব্যাধদিগের অনেক কথা লিখিত হইয়াছে; একটী কথা হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর পরিব্রাজকেরা উল্লেখ করিয়াছেন যে, যুদ্ধে কোন শত্রু পরাস্ত করিলে ইহারা তাহার নাক ও ঠোঁট কাটিয়া ছাড়িয়া দিত। উলঙ্গ হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিত ও বনফল ভক্ষণ করিত।

কিন্তু হরিণের মাংস ইহাদের প্রধান ও প্রিয়তম খাদ্য ছিল, সিংহলে মধুও যথেষ্ট জন্মিত। কোন প্রাচীন বৃক্ষের কোটরে ইহারা মধু সঞ্চয় করিয়া তাহাতে হরিণের কাঁচা মাংস টুকরা টুকরা করিয়া ডুবাইয়া রাখিত। অন্য আহার্য্যের অভাব হইলে এইরূপে রক্ষিত হরিণ মাংস আহার করিত। মধুর মধ্যে ডুবিয়া থাকাতে মাংস কোন প্রকারে নষ্ট হইত না। মধুর মধ্যে ডুবাইয়া এদেশ হইতে বিলাতে আম পাঠান হইতেছে। মধুর মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে এক বৎসরেও আম পচে না।

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ হিজিরা ৯৩২ অব্দে, শুক্রবার ঘটে। সে দিবস ৭ই রজব কি ৮ই রজব, এই লইয়া একটু মতভেদ হইয়াছে। সুলতান সুলেমান সে শুক্রবার ৮ই রজব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় মুসলমান ঐতিহাসিক ফায়েজী ৭ই শুক্রবার প্রাতঃকালে ঐ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয়, স্তাম্বুল অপেক্ষা এক দিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে চাঁদ দেখা গিয়াছিল বলিয়া এই রূপ গোলযোগ ঘটিয়া থাকিবে।

পারস্য হইতে তাড়িত হইয়া পারশীরা যখন ভারতবর্ষে আশ্রয় পাইয়াছিল, তখন তাহারা সঞ্জানের হিন্দু রাজার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিল যে, তাহারা হিন্দুদের মত বেশভূষা করিবে এবং তাহাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হইলে হিন্দু আচার ব্যবহারও অনুকরণ করিবে। পূর্ব্বে পারশীরা হিন্দুদের মত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিত। এখন বাল্য বিবাহ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। আর বেশভূষায় হিন্দুত্বের লেশ মাত্র আছে বলিয়া বোধ হয় না। পারস্য দেশে থাকিবার সময় ছাগল বা কুকুরের ন্যায় পারশীরা শূকর পুষিত। ভারতবর্ষে আসিয়া শূকর ত্যাগ করিতে হয়। এখন শূকরের উপর হিন্দুর ন্যায় ঘৃণা পারশীদের আছে কি না, যাঁহারা ইহাদের সঙ্গে বোম্বাই নগরে একত্র বাস করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত অছেন।

যে পথে মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়, সে পথের অপবিত্রতা ঘুচাইবার জন্য পারশী-শাস্ত্রে বিধান করা হইয়াছিল যে, সেই পথে একটী চারিচক্ষু হরিদ্রাবর্ণের কুকুর লইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কয়েকবার ফিরিতে হইবে, সাদা বর্ণের কুকুরের কাণ দুটা হরিদ্রা বর্ণ হইলেও চলিত। টীকাকার বলেন, দুটী চক্ষুর উপর দুটী দাগ থাকিলে তাহাই চারিটী চক্ষু বলিয়া গণ্য হইত। যাহা হউক, ঐ প্রকারের কুকুর পাওয়া দুর্লভ বলিয়া পারশীরা এ ব্যবহারটী এখন পরিত্যাগ করিয়াছে।

কাহারও মৃত্যু হইলে চিৎকার করিয়া রোদন করা বা ব্রত পূজা উপলক্ষে উপবাস করা পারশী শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। মাংসের বদলে মাছ খাওয়াকেই পারশীরা উপবাস করা বলে।

মান্দ্রাজের সিউয়েল সাহেব বিলাতে যাইয়া এক খানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে তিন শত খ্রীষ্টাব্দ হইতে এ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে, তাহার একটী তালিকা ও বার তারিখ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রহণোপলক্ষে হিন্দুরাজাগণ মুক্তহস্তে দান করেন। এই তালিকা হইতে প্রাচীন দান পত্রের সন তারিখ নিরূপণ করিতে বিলক্ষণ সাহায্য হইবে।

বোমানজী বায়রামজী পাটেল পারশী প্রকাশ নামে গুজরাটী ভাষায় এক খানি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রবেশ সময় হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পারশী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের একখানি ইতিহাস অদ্যাপি রচিত হইল না।

গত বৎসর বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সার ইংরাজী কবিতায় অনুবাদিত করিয়া ইংলণ্ডবাসীদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার মহাভারত সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করিয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহার রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজ সমালোচকেরা এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। আমরা গ্রন্থখানি পড়িয়াছি। যেমন ভাষা, তেমনি চিত্র। রমেশচন্দ্র ভারতের সুসন্তান।

কুরর পক্ষী কোন্ পক্ষী? ইহা লইয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিত মহলে একটু মতভেদ হইয়াছে। অভিধানকার ঈগল পক্ষী বলিয়াছেন।

"দেবীং রোরুয়মানাং কুররী মিবার্ত্তাম"
"ততো মামলয়দ্রক্ষঃ ক্রোশন্তীং কুররীমিব"

আমাদের দেশে কুরর "কোড়ল" পক্ষী নামে অদ্যাপি সুপরিচিত। ইহারা বিলের পার্শ্বে গাছের উপর বসিয়া থাকে, মাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে, আকারে চিলের অপেক্ষা বড়, বুক সাদা, ডানা কাল। ভয়ানক চিৎকার করিতে পারে। চিৎকারের শব্দ অনুসারে—"কোড়ড়"—ইহাদের নামকরণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহাদের চিৎকারে সফরীর জ্বর হয়, সেই প্রকারের জ্বরকে কুটজ্বর বলে। একথা কত দূর সত্য, আমি বলিতে পারিব না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। মানব-প্রকৃতি। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ; ৬৪ নং অখিল মিস্ত্রীর লেন, হিন্দু-মেসিন প্রেসে শ্রীহরিদাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। এই একখানি পুস্তক লিখিয়া ক্ষীরোদ বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হইয়াছেন। যদিও ইহা মৌলিক গ্রন্থ নহে, কিন্তু ভাষার লালিত্যে ইহা উপন্যাসের ন্যায় চিত্ত-আকর্ষক হইয়াছে। মানব প্রকৃতি ক্রম-বিকাশশীল, ডারউিন, ওয়ালস্, জলি, রোমানিস্, মেন, লবক, স্পেন্সার, টাইলার, মিবার্ট, গাল্টন, হুইটলি, মোক্ষ মূলর, সেইস প্রভৃতি মহা পণ্ডিতগণ যে বিষয়ের অভিব্যক্তির জন্য বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এই একখানি গ্রন্থে তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। এরূপ পাণ্ডিত্য এবং গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল। বহু দিন পর এইরূপ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, ইহাতেই বাঙ্গালী পাঠকের মনের গতি বুঝা যায়। ক্ষীরোদ বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন পরম ভক্ত। ইহার উন্নতির জন্য তাই, এখনও, এরূপ পুরস্কার প্রাপ্তির পরও প্রভূত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন। ক্ষীরোদচন্দ্র আমাদের পরমবন্ধু, অধিক কথা লিখিতে তজ্জন্য কিছু সঙ্কুচিত। ক্ষীরোদ বাবুর ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন করেন, ইহা দেশের পরম সৌভাগ্য। মানব-প্রকৃতি বাঙ্গালা ভাষায় অমূল্য গ্রন্থ।

২। আদর্শ কবিতা। শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু, বি-এ, বিরচিত। মূল্য ।০; সিটি-বুক সোসাইটী,—নব্যভারত প্রেস, ১/৩ শঙ্কর ঘোষের লেন, শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত। আদর্শ কবিতায় মোট ত্রয়োদশটী বিষয় লিখিত হইয়াছে। আমরা সমস্ত পুস্তক খানি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। বিষয় গুলি এমন প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে, কেবল বালকগণ নয়, বালকগণের অভিভাবকগণেরও ইহা পাঠে উপকার হইবে। কেমন সুন্দর সুন্দর কবিতা ইহাতে আছে, দুই একটী স্থল হইতে নমুনা তুলিয়া দিতেছি।

অনাথনাথ—

"বরষার ঘন মেঘ ঘিরেছে আকাশ;
শন্ শন্ মহাবেগে বহিছে বাতাস॥
ঝম ঝম বারিধারা ঝরে অবিরল;
কল কল খরস্রোতে ছুটিয়াছে জল।
মাঝে মাঝে কড় কড় গরজে অশনি,
বিদ্যুৎ প্রভায়, ঘন চমকে ধরণী।
এ হেন সময়ে, কোন বিজন কুটীরে
তৈলহীন দীপ এক জ্বলে ধীরে ধীরে।
রোগ-শয্যা'পরে, সেথা, নারী একজন
করিছেন অবিরাম অশ্রু বিসর্জ্জন
বিশুষ্ক মূরতি তাঁর, নেত্র আভাহীন,
রুক্ষ কেশ, ছিন্ন বেশ, বদন মলিন।

অষ্টম বর্ষীয় এক শক্তি সুকুমার
পদতলে বসি তাঁর ফেলে নেত্রাসার।
সহজে সরল শিশু চিন্তা নাহি চিতে,
কেন যে কাঁদে মাতা না পারে বুঝিতে।
তথাপি মায়েরে তার হেরিয়া কাতর,
নীরবে নয়ন-ধারা ফেলে দরদর।"

বর্ণনা কেমন স্বাভাবিক, কেমন হৃদয়-স্পর্শী। অনাথ-নাথ পড়িবার সময় আমরা অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারি নাই।

যোগীন্দ্রনাথের স্কুল-পাঠ্য কবিতার ইহা দ্বিতীয় চেষ্টা। কবিতাপ্রসঙ্গ অপেক্ষাও ইহার অনেক স্থান ভাল হইয়াছে। স্কুল পাঠ্য হওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী। কর্ত্তৃপক্ষ এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক খানিকে সাদরে গ্রহণ করিয়া এদেশের বালক বালিকার উপকার করিবেন, আমরা আশা করি।

৩। ভারতবর্ষীয় ইষ্ট্যাম্প বিষয়ক ইং, ১৮৯৯ সালের ২ আইন। শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার, বি-এল উকীল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, ১/৩ নব্যভারত প্রেস, শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ৸০। রাজবাড়ী, (ই-বি-এস-আর) প্রাপ্তব্য। রয়াল আটপেজী ফর্ম্মার ৩০ ফর্ম্মায় পুস্তক খানি সমাপ্ত। অনুবাদ, টীকা, নজির প্রভৃতি সমস্ত এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গৃহীমাত্রেরই নিত্য প্রয়োজনীয় এই সুলভ আইন খানি সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, আমরা আশা করি। গুরুগোবিন্দ বাবু এই সংস্করণ খানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন।

৪। ফুলের বাগান। শ্রীহারাণ চন্দ্র রক্ষিত প্রণীত ও সম্পাদিত, ১৭ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন, কালিকা যন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, মূল্য, ১৲। হারাণ বাবু এবং তাঁহার সহোদর বিপিন বিহারী রক্ষিতের রচনার সম্মিলনে এই পুস্তক প্রকাশিত। আটটী গল্প, আটটী প্রবন্ধ এবং ২টী সমালোচনা-প্রবন্ধ এই পুস্তকে আছে। বিপিন বিহারীও তাঁহার জ্যেষ্ঠের ন্যায় সুকবি। এই গ্রন্থ গদ্যে লিখিত, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের যথেষ্ট সমাবেশ হইয়াছে। পুস্তক খানি ভ্রাতৃ-যুগলের সাহিত্য-সেবার উজ্জ্বল কীর্ত্তি। পড়িয়া সুখী হইলাম।

৫। স্বর্গ ও নরক। শ্রীগিরীশ চন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত, রঙ্গপুর জয়যন্ত্রে শ্রীগোপাল চন্দ্র আচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। রচনা উচ্চদরের না হইলেও লেখক যে একজন ভাবুক ব্যক্তি, তাহার পরিচয় পাইলাম।

৬। ভবভূতি ও তাঁহার বাক্য। শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ প্রণীত, সান্যাল এণ্ড সন্স, ২৩ডাক্তারের লেন। এই পুস্তক খানি বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিলাম। নবোদিত সূর্য্যের কিরণের ন্যায় গ্রন্থকারের প্রতিভা-কিরণের উজ্জ্বল জ্যোতি এই পুস্তকে বিকীরিত হইয়াছে। গভীর গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বঙ্গীয় সাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করুন।

৭। শান্তিকুসুম। শ্রীশশিভূষণ মজুমদার প্রণীত, মূল্য।০। বরিশাল সত্য প্রকাশ যন্ত্র। ছাপা খারাপ, লেখাও নীরস। এ পুস্তক স্কুল-পাঠ্য শ্রেণী ভুক্ত হইবার যোগ্য নয়।

৮। বীণা। শ্রীহরিদাস ঘোষ প্রণীত, মূল্য ১৲। হরসুন্দর যন্ত্র। পুস্তকের ছাপা এবং কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু হইলে কি হয়, ইহাতে না আছে কবিত্বের সৌন্দর্য্য, না আছে ভাষার লালিত্য, না আছে ছন্দের পারিপাঠ্য—না আছে যতির পরিশুদ্ধি। মনোযোগ করিয়া সমস্ত পড়িলাম, কিন্তু মনে হইল যে, সমস্ত সময় বৃথা গেল।

রাবণের ধর্ম্মদীক্ষা।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাবণের চরিত্র অত্যন্ত উদ্ধত ছিল। জানকীর অপহরণ প্রয়াসই তাঁহার চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত কলঙ্ক বিমোচিত করিবার কোন চেষ্টা করিব না। বাল্মীকি স্বয়ংই জানকীকে লঙ্কানগরীতে বহুকাল অবস্থিতি করাইয়া এবং জানকীর চরিত্রের সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্কত্ব বর্ণন করিয়া রাক্ষসাধিপতি দশাননের চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রকারান্তরে প্রকটিত করিয়াছেন। বাল্মীকির পরবর্ত্তী কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণও সীতার চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া সেই প্রসঙ্গে রাবণের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন।

আমি এস্থলে লঙ্কাবতারসূত্র নামক এক খানি প্রাচীন বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থের মত অবলম্বন করিয়া রাবণের ধর্ম্মদীক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, লঙ্কাধিপতি বোধিসত্ব রাবণ কিরূপ ধার্ম্মিক ও ভক্তিমান নরপতি ছিলেন।

এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ সমুদ্রতীরবর্ত্তী লঙ্কানগরীর মলয়শিখরে বিহার করিয়াছিলেন। ঐ নগর বিবিধ রত্ন ও পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা পরিশোভিত ছিল। তদানীং ভগবানের সহ এক মহৎ ভিক্ষুসংঘ অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা জ্ঞানী এবং বিবিধ বুদ্ধক্ষেত্র হইতে সমাগত। সেই সকল ভিক্ষু বোধসম্পন্ন ও মহাতেজস্বী। তাঁহারা অনেক প্রকার সমাধি, বশিতা, বল ও অভিজ্ঞা প্রভৃতিতে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাহারই এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধ সাগর নামধেয় নাগরাজের ভবন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কোটিসংখ্য নাগকন্যা দ্বারা সমাদৃত ও সমাহূত হইয়া লঙ্কাদ্বীপে আগমন করেন।

তিনি মলয়শিখর অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন:—

"সম্যক বোধসম্পন্ন ও পূজ্য পূর্ব্বতন অর্হদ্‌গণ এই লঙ্কাপুরীর মলয়শিখরে আসীন হইয়া ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আমিও এই স্থলে রক্ষোযক্ষাধিপতি রাবণকে সম্বোধন করিয়া এই সকল বিষয় উদ্ভাবন পূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিব।"

এই সময়ে দশাননও ভগবানের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিলেন:—

"আমি গিয়া প্রার্থনা করতঃ ভগবানকে লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করাই; দেবতা ও মনুষ্যদিগের প্রয়োজন, হিত ও সুখবিধানের নিমিত্ত আমার জীবন সুদীর্ঘ হউক।

অনন্তর যক্ষরাক্ষসাধিপতি রাবণ শুক ও সারণ নামক অমাত্যদ্বয়ের সহ সপরিবারে পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক যেস্থলে ভগবান বিরাজিত ছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। বিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সপরিবারে তিনবার ভগবানকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদন করতঃ ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা উদ্ভাসিত দণ্ড হস্তে ধারণ পুরঃসর প্রবালখচিত ও উত্তম বসনে আচ্ছাদিত বীণা পার্শ্ব

দেশে স্থাপন করিয়া হর্ষসহকারে ষড়্‌জ প্রভৃতি পঞ্চবিধ স্বরে সংগীত আরব্ধ করিলেন।

"হে নায়ক! আপনি এখানে আমাদের চিত্ত স্বভাবকে বিনীত করিবার নিমিত্ত বিধি-সঙ্গত, বিরুদ্ধ-মত-হীন ও নির্ম্মল ধর্ম্মনীতির উপদেশ প্রদান করুন। হে মুনে, আপনি লঙ্কায় গমন করিয়া নির্ব্বাণ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করুন। এই লঙ্কানগরী পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধগণ ও তাঁহাদের সন্তান সন্ততি দ্বারা অধিষ্ঠিত। হে নাথ, এখানে পরমধর্ম্মের উপদেশ করুন। বহুরূপধারী রক্ষোযক্ষগণ আপনার ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছে।

আমি দশগ্রীব রাক্ষসেন্দ্র রাবণ এখানে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব হে প্রভো, লঙ্কায় আগমন করিয়া আমাকে আর এই সকল পুরবাসীকে অনুগৃহীত করুন।

পূর্ব্ববর্ত্তী সম্বুদ্ধগণ রত্নখচিত মলয়-শিখরে অবস্থিতি করিয়া লঙ্কাপুরে প্রত্যাত্ম-গতি-গোচর ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ও সেই রত্নমণ্ডিত শিখরে জিন-পুত্রগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া বিরজঃ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করুন। এই লঙ্কাপুরী দিব্যরত্নে বিভূষিত, ইহার পর্ব্বত সকল শীতল ও রমণীয়। হে ভগবন, রাগদ্বেষ-নির্মুক্ত প্রত্যাত্মগতিচিন্তক যক্ষরক্ষোগণ এখানে বাস করিতেছেন। কুম্ভকর্ণ প্রমুখ রাক্ষসগণ মহান ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন। হে মুনে, আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া জিনপুত্রগণের সহিত গমন করুন।

আমি বুদ্ধগণের ও জিনপুত্রদিগের আজ্ঞাকারী। হে মহামুনে, আমার এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আপনার দেয় নহে। আমার প্রতি আপনি অনুকম্পা করুন।"

ত্রিলোকেশ্বর ভগবান বুদ্ধ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "হে যক্ষরাক্ষ-সেন্দ্র, অতীত নায়কগণ এই রত্নময় পর্ব্বতে প্রত্যাত্ম ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনাগত বুদ্ধগণও এই রত্নময় পর্ব্বতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন। ইহা দৃষ্টধর্ম্মবিহারী যোগিগণের স্থান। হে যক্ষেন্দ্র, আপনি আমার ও অন্যান্য সুতগণের অনুকম্পার পাত্র।"

এই কথা বলিয়া ভগবান্ কিছুক্ষণ তূষ্ণী-ম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর রাবণ কর্ত্তৃক আনীত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাবণ এবং অন্যান্য বিশারদ জিনপুত্রগণের সহ অপ্সরাগণের হাস্যনৃত্যগীতাদিতে আপ্যায়িত হইয়া লঙ্কাপুরে প্রবেশ করি-লেন। রাবণ প্রভৃতি যক্ষবর্গ, যক্ষিণী ও যক্ষকন্যাগণ রত্নাদি দ্বারা ভগবানকে পূজা করিলেন। রাবণ ভগবান বুদ্ধের এবং জিনপুত্রগণের মস্তক রত্নবিভূষিত হার দ্বারা সুশোভিত করিলেন। ভগবান্ জিনপুত্র-গণের সহ পূজা গ্রহণ করিয়া প্রত্যাত্মগতি-গোচর ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন।

অনন্তর দশানন কৃতাঞ্জলি পুটে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"ভগবন্, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং কিরূপে জীব ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পর পারে গমন করিতে পারে?"

তখন ভগবান্ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন। রাবণ কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে বলিলেন, "ভগবন্, পূর্ব্ব বুদ্ধগণের নিকট আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলাম, কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ের কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। আপনার এই সুমধুর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। আমি আপনার শরণাগত

হইলাম। আজ হইতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের আশ্রয় লইলাম।" তদনন্তর রাবণ ভগবানের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ১০৮টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্নগুলি এই:—

(১) তর্কের প্রণালী কিরূপ?
(২) ভ্রান্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়?
(৩) কাহারা তীর্থিকপদ বাচ্য?
(৪) জিনপুত্র কাহাকে বলে?
(৫) জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পরিণাম কি?
(৬) সংসার বন্ধনে আবদ্ধ লোক কিরূপে মুক্তি লাভ করে?
(৭) ধ্যানের বিষয় কি? ইত্যাদি।

রাবণের প্রশ্ন সমূহ শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করি-লেন। রাবণের প্রশ্নমধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই অন্তর্নিহিত ছিল। রাবণের প্রশ্ন সমূহ ও ভগবানের উত্তর পরম্পরা পাঠ করিয়া প্রাচীন ভারতের অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়।

এই লঙ্কাবতার গ্রন্থ কতকাল পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান্ বুদ্ধ রাবণকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন, তাহা লইয়া লঙ্কাবতার সূত্র বিরচিত হইয়াছিল। চীনদেশীয় ইতিহাস পাঠে জানা যায়, লঙ্কাবতার গ্রন্থ তিন বার চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। ৪৪৩ খ্রীঃ অব্দে গুণভদ্র, ৫১৩ খ্রীঃ অব্দে বোধিরুচি এবং ৭০৪ খ্রীঃ অব্দে শিক্ষানন্দ নামক পণ্ডিত সংস্কৃত লঙ্কাবতার চীন ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনপরি-ব্রাজক হুয়েন্ সাঙ্ ভারত ও সিংহল দেশে পরিভ্রমণ করেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, পুরাকালে লঙ্কামলয় শিখরে আসীন হইয়া ভগবান্ বুদ্ধ লঙ্কাবতার সূত্রের উপদেশ প্রদান করেন।

৮ম শতাব্দীর শেষভাগে ভগবান্ শঙ্করা-চার্য্য বেদান্তভাষে লঙ্কাবতার সূত্রের মত উদ্ধৃত ও খণ্ডিত করিয়াছেন।

১৪শ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের বৌদ্ধ দর্শন পরিচ্ছেদে লঙ্কাবতার সূত্রের উল্লেখ ও ভগবান্ বুদ্ধের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১২শ শতাব্দীতে উদয়নাচার্য্য আত্মতত্ত্ব-বিবেক বা বৌদ্ধধিক্কার নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ-দর্শনের মত সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিয়া-ছেন।

১৫শ শতাব্দীতে রঘুনাথ শিরোমণি নামক সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক নবদ্বীপে জন্ম-গ্রহণ করিয়া মিথিলায় দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করেন। উক্ত নৈয়ায়িক শিরোমণি আত্ম-তত্ত্ব বিবেকের বিশদ ব্যাখ্যা রচনা করিয়া-ছেন।

অনেকে বলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম ১০ম বা ১১শ শতাব্দীতে ভারত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতা-ড়িত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যদি চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধগণের তাৎকালিক আচার ব্যবহার বর্ণন করিতে পারিতেন না। উদয়নাচার্য্যের সময়ে যদি বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে তিনি বৌদ্ধধিক্কার গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। বস্তুতঃ উদয়ন

ও মাধব বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে শেষ কুঠার নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।

আমি তিব্বত হইতে "কাবাব ছুন্ দেন্" বা "সপ্ত আজ্ঞা পূরণ" নামক একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ আনিয়াছি। উহা সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় লামা তারানাথ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। ইহাতে তান্ত্রিক ধর্ম্ম ও ভারতের ইতিবৃত্ত উভয়ই লিপিবদ্ধ আছে। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, বুদ্ধদেবের প্রচারিত সুবিমল ধর্ম্ম কাল সহকারে কিরূপ কুসংস্কার পরিপূর্ণ ও হেয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই গ্রন্থে ১১শ শতাব্দী হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম কালের পরিণামে নিম্ন শ্রেণীর লোকমধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। ডোম, ইষুকার প্রভৃতি জাতীয় লোকই এই ধর্ম্মের শেষ আশ্রয় স্থান। ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, ধান্যকটক, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম বিরাজিত ছিল। এই গ্রন্থে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের যেরূপ ঘৃণিত ও পৈশাচিক ব্যবহার বিবৃত আছে, তাহাতে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, কলুষিত বৌদ্ধধর্ম্মের সমূল সংহারই উক্ত উন্নত ধর্ম্মের গৌরবব্যঞ্জক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাশ।

পূজ্যপাদ ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রদত্ত উপদেশ।

হরিনাম;—"হরি" এই শব্দ মাত্র হরিনাম নহে। যে নামে যাহার পাপের হরণ হয়, তাহার তাহাই হরিনাম। দুর্গা, কালী, রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, আল্লা, খোদা, যিশু, যিনি যে নামে বিশ্বাসী, তাই তাঁহার হরিনাম।

মানুষের স্বাধীনতা;—মানুষের স্বাধীনতা কিছু আছে। যদি একটা গরুর গলায় রজ্জু বাঁধা থাকে, দড়ি যতদূর লম্বা, গরু ততদূর ঘুরিতে ফিরিতে পারে। দড়ির পরপারে যাইতে পারে না। সেইরূপ মনুষ্য আপন প্রবৃত্তির বিষয় যতটুকু, ততটুকু স্বাধীন ভাবে চলিতে পারে। চক্ষুর দৃষ্টি, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার ঘ্রাণ প্রভৃতি শক্তি সীমাবদ্ধ। দৃষ্টি দেখে, কর্ণ শুনে, তাহার উপরে যাইবার ক্ষমতা নাই। নিজের ছেলেকে যেমন ভালবাস, অন্য ছেলেকে তেমন ভালবাসিতে পার না। হাজার চেষ্টা করিলেও অন্তরে তাহা আনিতে পার না। সুতরাং মানুষ বাঁধা গরুর মতন স্বাধীন।

মোহ অজ্ঞানতা যতদিন, ততদিন জীব আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। প্রত্যেক জীবের এক একটী কার্য্য আছে, সেই কার্য্য সাধনের জন্য যতটুকু স্বাধীনতার প্রয়োজন, তাহা আছে। দড়ি গাছ যতদূর লম্বা, গরু ততদূরই চলিতে পারে।

পাপও অনুতাপ;—কৃপা হইলে মুহূর্ত্তে পাপ নষ্ট হয়। ভোগ একদিন যাহা, শত বৎসরেও তাহা। সাধুর কৃপাতে পাপী যখন আপন পাপ অনুভব করে, তখন তাহার অনুতাপ এত প্রবল হয় যে, তাহার নিকট যন্ত্রণা তুচ্ছ। জগাই মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর গৌরবর্ণ কালো হইয়া গিয়াছিল। পরে জগাই মাধাইয়ের রোদনে নবদ্বীপের পশুপক্ষী কাঁদিয়াছিল।

ক্রোধ ও তেজ;—অভিমানজনিত হইলে ক্রোধ বলে। যদি ন্যায় ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য হয়, তবে তাহাকে তেজ বলে। তেজ মনুষ্যের ধর্ম্ম।

কলিযুগ ও শূদ্রজাতি;—মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা লইলেন, শিক্ষা লইলেন রায় রামানন্দের কাছে। লোক শিক্ষার জন্য এ সমস্ত করিয়াছেন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। মহাপ্রভুর শিক্ষাতে আর প্রয়োজন কি? কেবল লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যে, জাতি গৌরব নষ্ট করিবার জন্য শূদ্র জাতির নিকট শিক্ষা লইলেন। মহাপ্রভুর নিকট কোনও ব্রাহ্মণ শিক্ষা লাভ করিতে গেলে রায় রামানন্দের নিকট পাঠাইতেন। কলিকালের নামই "শূদ্রযুগ।" এযুগে শূদ্র জাতি ধর্ম্মসাধন করিয়া মহৎ জীবন লাভ করিবে।

রথের কথা;—রথ মনুষ্যদেহ, ইহার তিন তলা। উপর তলায় সহস্রদল পদ্মে শ্রীশ্রীবামনদেব অর্থাৎ জগন্নাথ বিরাজ করেন। বামন অবতারে ত্রিভুবন অধিকার করেন, এজন্য জগন্নাথ। এই রথে বামনদেব দর্শন করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না।

মধ্য তলায় সমস্ত দেবদেবী এক এক পদ্মে ও কুটিরে বিরাজ করেন।

নীচের তলায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ-মদ, মাৎসর্য্য রিপুগণ তাহাদের পরিবারগণের সহিত বাস করে।

বামনদেব রথে উঠিবামাত্র চারি দিকে শংখ, ঘণ্টা বাজিতে থাকে।

নীচের তলায় সিড়ি পড়ে, চারি দিক হইতে ভক্তমণ্ডলী আসিয়া ভিড় করেন। কাম, ক্রোধগণ সপরিবারে পলায়ন করে। তখন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গাছা প্রকাণ্ড কাছি বাঁধিয়া রথ টানা হয়। সুখ-দুঃখময় কালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুর মন্দিরের নিকট হইলে কাছি খসিয়া যায়।

পরমহংসজী শ্রীরামকৃষ্ণ;—ঢাকা হইতে কলিকাতায় গিয়া (পরমহংসদেবকে) দর্শন করিতে গেলাম। আমাকে বলিলেন যে, "তোকে নাম দিতে বলিলাম, কামিনী-কাঞ্চন হইতে তফাৎ থাকিবি, অর্থাৎ তোর স্ত্রী আছে, ব্যবহার করিবি না।" আমি বলিলাম, এখনও আমার কাম আছে। এই কথা শুনিয়া আমাকে উলঙ্গ করিয়া * * স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন, "যা সচ্চিদানন্দের আনন্দে ডুবে যা।" একি মানুষে পারে? এসকল কথা বলিতে নাই, অপার দয়া। কেশব বাবুকে দেখিয়া আসিয়া বলিলেন যে, "কেশব আমাকে পূজা করিয়াছে, কিন্তু ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে, উহার লোকেরা পাছে টের পায়। তা দরজা বন্ধ হইবে।"

তিনি (পরমহংসদেব) যখন বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময় আমাকে বলেন যে, "লোককে নাম দাও।" আমি বলিলাম, আপনার নাম দিব? তিনি বলিলেন "দিবে।" আমি ঢাকা আসিলাম, কেদার বাবুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আমার নাম দিবে না, শাস্ত্রে যে সকল নাম আছে, তাহাই দিতে হইবে। যাহাকে যে নাম দিবে, আমি বলিয়া দিব।"

কাম, ক্রোধ দমন;—যতদিন মনের কার্য্য থাকে, ততদিন স্ত্রী পুরুষের বা বিষয় বিষয়ীর আকর্ষণ থাকে। মন লয় হইলে কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকে, কিন্তু কার্য্য স্বতন্ত্র হয়, স্ত্রীলোকের সঙ্গে আকর্ষণ থাকে না। এ সম্বন্ধে আমি শাস্ত্রের কথা বলিতেছি না, আমি নিজে অত্যন্ত কামুক ও ক্রোধী

ছিলাম। এই দুই রিপু আমার অত্যন্ত প্রবল ছিল। ব্রাহ্ম সমাজে কত চেষ্টা করিলাম, গেল না। পরে সাধন লইয়াও অনেক চেষ্টা পাইলাম। সেবারে সমস্ত রাত্রি জাগিতে লাগিলাম, কেন জাগিতেছি। জানি না, শুইতে ইচ্ছা হয় না। একদিন বৃন্দাবনে ভোরে শুইয়াছি, আমার সমস্ত শরীর ছারপোকায় ধরিয়াছে, হাজার ছারপোকা; একি, আমার বোধ নাই কেন? তারপর হইতে দেখি, কাম, ক্রোধ নাই। একটা বেড়ার এক পার্শ্বে শ্রীধর, অন্য পার্শ্বে আমি, শ্রীধরের দিকে ছারপোকা নাই।

একজন ব্রাহ্ম-সাধন-প্রার্থীর প্রতি;—ব্রাহ্ম সমাজের প্রণালীতে উপাসনা এতদিন যাহা করিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইলে সেই প্রণালীতে যাঁহারা তৃপ্তি-লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন, হঠাৎ অন্য সাধন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, মহর্ষি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন।

কীর্ত্তনে নৃত্য;—কীর্ত্তনে ভাব তিন প্রকার হয়। সত্ত্ব ভাব উপস্থিত হইলে লোকের উপকার হয়। রজঃভাবে অন্য লোকের কখনও উপকার, কখনও অপকার হয়। তমঃ ভাবে উপস্থিত লোকদিগের উৎপাত বোধ হয়। কারণ তমঃগুণের নৃত্য অধিকাংশ বেতালা হইয়া হইয়া লম্ফ ঝম্ফ হয়। নৃত্যকারীর পা লাগিয়া অনেকে খোঁড়া হয়, ঘরের দ্রব্যাদি নষ্ট হয়, বালকগণ ভয় পাইয়া চিৎকার করে।

দলে থাকিলে ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হয় না। অবিরত ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণ ভগবানের অধীন হইয়া সত্যকে অকপটে গ্রহণ করিতে হয়, সংসারের যাহা ধর্ম্মপথের অন্তরায়, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। লোকনিন্দা, লোকপ্রশংসা অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

সত্যবাদী;—সত্যবাদী হইলে তাহাতে ১৩টী গুণ থাকিবে। ১। পরনিন্দা থাকিবেনা। ২। আত্মপ্রশংসা থাকিবে না। ৩। স্বার্থ থাকিবে না। ৪। ক্ষমা থাকিবে। ৫। শৌচ থাকিবে। ৬। অহিংসা থাকিবে। ৭। জীবে দয়া থাকিবে। ৮। ৯। পিতৃমাতৃ ভক্তি থাকিবে। ১০। সৌভ্রাত্র থাকিবে। ১১। ১২। প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসীর প্রতি প্রেম থাকিবে। ১৩। ছলনা-রাহিত্য থাকিবে।

কয়েকটী অবস্থার কথা;—নাম করিতে করিতে যে অবস্থা হয়; অথবা যে দর্শন হয়, তাহা ধরিয়া রাখার নাম ধারণা।

হঠাৎ এক সময় কিছু খুলিয়া যাইবে না। ক্রমে লাভ হইবে। যথা প্রবল কাম কমিয়া গেলে, ক্রোধ কমিয়া গেলে, জীবে দয়া প্রকাশ পাইবে।

আত্মা প্রস্তুত হইলে তবে ভগদ্দর্শন আরম্ভ হয়।

সংসার থাকিবে না, কাম; ক্রোধ, বাসনা এ সকল থাকিবে না।

ঈশ্বর-দর্শনের পূর্ব্বে মহাপুরুষ ও দেবতা দর্শন হয়। তাহাতে হৃদয়ের বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হয় না। ভগবদ্দর্শনই লক্ষ্য।

বেদপুরাণ যত শাস্ত্র, এ সমস্ত কি ভাবে হইয়াছে, এই সকল প্রকাশ হইতে হইতেই মায়া চলিয়া যায়। তখন সমস্ত ব্রহ্মময় হয়। আবার সৃষ্টি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন ভগবল্লীলা দেখা যায়।

জ্ঞানবান্ হইয়া যাঁর শিশুর ন্যায় অবস্থা, সেই পরমহংস।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাবধানতা;—স্বামী ও স্ত্রী একত্রে বসিয়া সাধন করিতে পারেন। অন্য পুরুষ স্ত্রী সেখানে থাকিবে না। অন্য স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া কখনই সাধন করিবে না। স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক স্থান থাকা উচিত। যদি একটী মাত্র ঘর হয়, তবে একটা পরদা দিয়া স্ত্রীলোক ও পুরুষের পৃথক স্থান করিতে হইবে। স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা সমস্ত সাধন ভজন নষ্ট হইতে পারে। ভাগবতে আছে:—

মাত্রা স্বস্রাদুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনে বসেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।

মাতা (বিমাতা প্রভৃতি) ভগিনী, কিম্বা দুহিতার সহিতও নির্জ্জনে একাসনে বসিবেনা। বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ও আকর্ষণ করে।

একদণ্ডী ভগবানের এই বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিদ্বান্ ব্যক্তি কখনই ইন্দ্রিয়বশ হয় না। ঘটনা চক্রে ঐ দণ্ডীর আশ্রমে অন্ধকার রাত্রিতে একটী স্ত্রীলোক আশ্রয় লইয়াছিল। এবং সে গৃহান্তরে দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিল। দণ্ডী রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীলোকটীর অনেক সাধ্য সাধন করিল। কিন্তু রমণী কিছুতেই সম্মত হইল না। তখন দণ্ডী চালা ছিদ্র করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু দৈববশে ইহাতে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, ঘরের নীচেও নামিতে পারিল না, উপর হইতে বাহির হইতেও পারিলনা। প্রাতঃকালে সমস্ত লোক দণ্ডী স্বামীর ঐ দুরবস্থা দেখিয়া সকলেই বলিল "তুমিই ব্যাসের লেখা কাটিতে গিয়াছিলে?" এ অবস্থা সকলেরই ঘটিতে পারে। এজন্য সর্ব্বদা স্ত্রী পুরুষ সাবধানে থাকিতে হইবে।

কাম নিবৃত্তির একটী উপায়;—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে মানসিক দৃষ্টি রাখিয়া-অন্তরে ভগবানের নাম করা। রাস্তায় মাটির দিকে চাহিয়া চলিবে এবং কর ধরিয়া নাম করিবে। ইহাতে মনোযোগ বাড়ে।

জন্মমৃত্যু;—জন্মমৃত্যু জ্ঞান একটা মোহ। যখন জন্মমৃত্যুকে বৃক্ষপত্রের পতন ও গজানবৎ বোধ হইবে, তখনই যথার্থ আমি কি, বুঝিতে পারিবে।

জীবের ইচ্ছা,—অনেক সময় নিজের ইচ্ছা দেখে এমন মনে হয়, উহা কিছুই নয়। যখন যাহা প্রয়োজন, ভগবদিচ্ছায় সম্পন্ন হয়। যথার্থ যদি শিশুর মতন থাকিতে পারি, তাহা হইলে মাতা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন।

যখন চিকিৎসা করিতাম, মনে হইত, এই ঔষধটী দিলেই এই রোগ সারিবে। ক্রমে দেখিলাম, তাহা হয় না। এইরূপ দেখিতে দেখিতে বুঝিলাম যে, ঔষধ কিছুই নহে, ভগবানের কৃপা চাই। প্রচার করিতে গেলাম, প্রথমে যেখানে যাই, সমস্ত লোক একবাক্যে আমার কথা শুনে, সাহায্য করে। ক্রমে দেখি, লোকের সে ভাব নাই, আর আমার কথায় কিছু হয় না। তখন বুঝিলাম, আমার শাস্ত্রজ্ঞান ও বক্তৃতার ক্ষমতা কিছুই নহে; ভগবৎ কৃপাই সমস্ত। এইরূপ পুরুষকারে অর্থাৎ খাইয়া খাইয়া এখন বুঝিয়াছি, আমি কিছুই না, অসারের অসার। ভগবান্ই সর্ব্বময় কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক বিধাতা।

আমার নিজের জীবন চিন্তা করিয়া দেখি, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই করি নাই। টোলে পড়িতাম, গোঁড়া হিন্দু ছিলাম। হঠাৎ সংস্কৃত কলেজে গেলাম। অজ্ঞাতসারে বৈদান্তিক হই-

লাম। পরে ব্রাহ্মসমাজে গেলাম। প্রচার করিলাম, চিকিৎসা করিলাম। আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় নাই। যতদিন পুরুষকার থাকে, ইচ্ছা না করিয়া পারে না, কিন্তু যাহা হইবার, তাহা হইবে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ;—সম্বন্ধ দুই প্রকার, দৈহিক ও আত্মিক। আত্মিক সম্বন্ধ সহজে হয় না। শোক মোহ দৈহিক সম্বন্ধ জনিত। দৈহিক শোক মোহ অনিত্য, অস্থায়ী। আত্মিক সম্বন্ধে শোক নাই, বিরহ আছে। সে বিরহ আশাজনক এবং নিত্য-কালস্থায়ী। এরূপ আত্মিক সম্বন্ধ হইলে মিলন হয়। দূরে থাকিলেও উভয়ের মধ্যে একটী সূত্রের বন্ধন থাকে, তাহাতে সর্ব্বদা মিলিত মনে হয়।

স্ত্রী পুরুষের ভগবৎ লক্ষ্য হইলে ইহারা সতী ও সৎ হয়। এই দুই ভাবের প্রেম বিশেষ ভাবে লাভ করেন। যেমন সাধুতে। সাধুতে, সেবকে সেবকে, বন্ধুতে বন্ধুতে। আত্মিক সম্বন্ধ অতি বিরল, যদি উভয় আত্মার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবেই আত্মিক সম্বন্ধ দাঁড়ায় ; যেমন ভক্তে ভক্তে।

প্রশ্ন। জীবনের লক্ষ্য লাভ করিবার জন্য যখন বিবাহ উপায় নহে, তখন বিবাহ করায় লাভ কি ?

উত্তর। লাভ কিছুই নাই, কিন্তু প্রয়োজন আছে, নিজের ভোগ কাটাইতে হইবে।

প্রশ্ন। বিবাহের পথে না যাইয়া যেদিক অবলম্বন করিয়াছি, সেই দিকে একটু মাত্রা বাড়াইয়া দেন, তবে ভাল হয় না ?

উত্তর। কৃপাপ্রার্থী হওয়া বড় পরীক্ষার পথ। ভোগ করিয়া ভোগ ক্ষয় করা সহজ। কৃপার পথে একটু আসক্তি থাকিলে সে আসক্তি ছাড়িতে বড় লাগে। যদি আসক্তি না থাকে, তবে কষ্ট হয় না। (ব্যক্তি বিশেষের প্রতি) বিবাহ করিলে সাধনের ক্ষতি হইবে না, বরং না করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এখন শোক আছে, ইহা না থাকিলে শেষকালে নিজের প্রবৃত্তির সহিত সর্ব্বদা সংগ্রাম করা দুঃসাধ্য। এজন্য শাস্ত্রকর্ত্তাগণ বলিয়াছেন যে,গৃহস্থাশ্রমই সাধকের দুর্গ। এখন শোকের সময়, এখন হঠাৎ (কর্ত্তব্য) স্থির করা কঠিন। বিবাহ করিলেই যে অনিষ্ট হইবে, এরূপ নহে, বরং অবস্থানুসারে বিবাহ করিলে উপকার হয়। নিজের যে বিষয়ের ভোগ আছে, তাহা না হইলে বিষয়ে পুনঃ পুনঃ টানে। এজন্য অনেক সন্ন্যাসী বহু বৎসর বনে, গুহায় অনাহারে তপস্যা করিয়াও পুনঃ সংসার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নিজের চিত্ত বুঝা কঠিন। স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া সংসার করা পাপ নহে। সংসার ক্ষয় করিবার জন্য সংসার করিলে উপকার হয়।

স্ত্রীপুত্র,বিষয় কর্ম্ম থাকিলে ধর্ম্ম হয় না, তাহা নহে। তবে যদি বাস্তবিক বৈরাগ্য হয়, তাহাতে সমস্ত ছেদন করিয়া সন্ন্যাসের অবস্থা হয়। সে অবস্থা কর্ম্ম থাকিতে হয় না।

স্ত্রীর মৃত্যু হইলে বিবাহ করিতে নিষেধ নাই।

মতান্তরে বিচ্ছেদ ;—মতান্তরে বিশেষ হৃদয়-বন্ধুর সহিতও বিরোধ হয়। বন্ধু শত্রু হন। বিরুদ্ধ মতকে ঘৃণিত করিবার জন্য সেই মতাবলম্বী লোকদিগের উপর লোকেরা মিথ্যা দোষারোপ করে, চরিত্রে কলঙ্ক দেয়, এজন্য খ্রীষ্টসমাজে কত নরহত্যা হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজেও অনেক ঘটনা হইয়াছে। এই মতের ধর্ম্ম বিদায় না হইলে সত্য ধর্ম্মের শোভা বিস্তার হয় না।

শক্তি সঞ্চার ;—ঈশ্বরের শক্তি সকলের মধ্যেই আছে, একটী মহাপুরুষের প্রবল শক্তি দ্বারা সেই শক্তিকে (যাহাকে পরমাত্মা বা কুলকুণ্ডলিনী বলে) জাগরিত করিয়া দেওয়াকেই শক্তি সঞ্চার বলে। ঐ শক্তি সাধারণতঃ নিদ্রিতাবস্থায় থাকে। শক্তি সঞ্চার দ্বারা জাগরিত করিলেও পুনরায় উহা নিদ্রা যাইবার জন্য চেষ্টা করে। যাঁহারা অনবরত শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম করিয়া উহাকে আর ঘুমাইতে দেন না, তাহাদের শক্তি বেশ খেলিতে থাকে।

সমাধির মধ্যে ভক্তি ;—আম পঁচিলে কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু আঁটিটী নষ্ট হয় না। কাঁচা আম পাকাইলে পঁচিয়া যায়। কিলাইয়া কাঁটাল পাকাইলে তাহা পোকায় ধরে, পঁচিয়া যায়। উজ্জ্বল নিশান উড়িয়াছে, ডঙ্কা পড়িয়াছে, শিশুদের কাজ ঘুম, ঘুম ভাঙ্গাইওনা, যেন তাহারা পুনরায় না ঘুমাইতে চায়।

সেবা অর্থ সাধু খাইয়া ফেলা ; হাড় খাওয়া,মাংস খাওয়া, যেমন খ্রীষ্ট বলিয়াছেন। খাওয়াইলে সেবা হয় না। "যাহারা প্রথম আসিয়াছে, তাহা পরে যাইবে, যাহারা পাছে আসিয়াছে, তাহারা আগে যাইবে।"

সাধনের প্রশস্ত সময় ;—মহাপুরুষেরা রাত্রি ১॥ টার সময় বাহির হন এবং ৪টা পর্য্যন্ত থাকেন। এই সময় রাত্রি জাগা অভ্যাস করা উচিত। এই সময় সাধনের প্রশস্ত সময়। দুই একবার প্রাণায়াম করিয়া নাম করিবে। কোন স্থানে বসিয়া কি মশারির মধ্যে বসিয়া করিলেও হয়। নাম করার সময় মহাপুরুষেরা কাছে আসিয়া দাঁড়ান এবং সাহায্য করেন। যাঁহারা এইরূপ সাধন করেন, তাঁহারা হয়ত কেহ বা গন্ধ, কেহ বা স্পর্শ,এক ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করেন। আর যাহারা কুকাজ করে, তাহাদের নিকট হইতে মহাপুরুষেরা চলিয়া যান। যাহারা নিদ্রা যায়, তাহাদের নিকট হইতেও প্রস্থান করেন।

তমঃবৃদ্ধি ;—নিদ্রা যাইতে যাইতে তমঃগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তমঃগুণে অহঙ্কার আনয়ন করে। অহঙ্কার সকলই নষ্ট করে। এই অহঙ্কার নষ্ট করার উপায় জীবের সেবা। পশু পক্ষীরও পায়ে নমস্কার করিতে হইবে। এমন কি,বিষ্ঠার পোকাকেও ঘৃণা করিবে না। যেমন নক্ষত্র ছুটিয়া পড়ে, তেমনি অহঙ্কারে যোগীদের হঠাৎ পতন হয়।

ক্রমশঃ

ইতিহাস-ঘটিত বিচার।

আদিশূর দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে বেদ-বিহীন ও ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য দেখিয়া কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, লোকের মন হইতে এই ভ্রম দূরীকরণ পূর্ব্বক সত্য সংস্থাপনার্থ বিচার।

সপ্তশতী শ্রোত্রিয়।

চতুর্দ্ধাঃ শ্রোত্রিয়া জ্ঞেয়া সিদ্ধ সাধ্য সুসিদ্ধকাঃ।
অরিরপ্যপরো জ্ঞেয়ো যথার্থং নামতঃ শৃণু॥
সিদ্ধাঃ সিধ্যন্তি কালেন সাধ্যাঃ সিধ্যন্তি বানবা।
সুসিদ্ধা দোষরহিতা অরয়ঃ কুলনাশকাঃ॥
বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম॥

ভাবার্থ।

ঘটকেরা যাঁহাদিগকে বর্ত্তমানে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া বোধ করিলেন না, কিন্তু ভবিষ্যৎকালে সৎকর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবেন, এইরূপ বিবেচনা করিলেন, তাঁহাদিগকে সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, এই সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। আর যাঁহারা প্রথমে শুদ্ধ-শ্রোত্রিয় ছিলেন না, পরে সৎকর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবেন কিনা, যাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল, ঘটকেরা তাঁহাদিগকে সাধ্য-শ্রোত্রিয় পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। আর যাঁহাদিগের কন্যা-গ্রহণ করিলে এককালীন কুলীনের কুলধ্বংস হইয়া যাইবে, স্থির করিলেন, তাঁহাদিগকে কুলের অরি বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। পরন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানে যাঁহাদিগকে কখন দোষস্পর্শ করে নাই ও করিবেনা, যাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, ঘটকেরা সেই সকল স্বাভাবিক নিত্যশুদ্ধ ব্যক্তিকে সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সন ১৩০৫ সালের ১০ই বৈশাখের এডুকেশন গেজেটে উল্লিখিত চারি প্রকার শ্রোত্রিয়ের মধ্যে সপ্তশতীগণ কুলীনগণের শিরোভূষণ বলিয়া বর্ণিত থাকায় এবং দোষরাহিত্য প্রযুক্ত তাঁহারাই সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়। আর কুলীনগণের নিম্নে ক্রমশঃ অধোভাগে কুলপর্ব্বতের অঙ্গস্বরূপ যে সকল শ্রোত্রিয় আছেন, তাঁহারাই সিদ্ধ সাধ্য এবং অরি।

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির শ্রোত্রিয় সন্তানগণ দোষরহিত হইলে কুলীনদিগের উপরি অবস্থান করিতে পারিতেন, না হয়, তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতেন, অন্ততঃ কুল-পর্ব্বত-বর্ণন সময় তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ সুসিদ্ধ-শ্রোত্রিয় পদে অধিষ্ঠিত হইতেন।

পুরাস্মিন বঙ্গদেশে সপ্তশতী সংজ্ঞকাঃ
কেবল মেক শ্রেণী মন্তো ব্রাহ্মণা আসন্।

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ॥

সম্বন্ধ নির্ণয় নামক পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, আদিশূরের প্রভাবে যখন পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান হয়, তখনও সমস্ত বঙ্গদেশ মধ্যে সাতশত ঘরের অধিক ব্রাহ্মণ ছিল না।

প্রতিবাদ।

উপরি লিখিত সকল কথা গ্রন্থকারদিগের স্বকপোল-কল্পিত ও অপ্রামাণিক। কারণ রাজা আদিশূরের যজ্ঞের পূর্ব্বে এ দেশে ব্রাহ্মণেরা দশ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বেদপাঠ করিতেন, এই জন্য সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে বৈদিক বলিয়া জানিত। বৈদিক এই শব্দটী শ্রেণীবাচক নহে। যেমন তার্কিক, বৈদান্তিক প্রভৃতি বিদ্যাঘটিত উপাধি, বৈদিক শব্দটীও তদ্রূপ বিদ্যাঘটিত উপাধি। বৈদিক শব্দের অর্থ শ্রোত্রিয়। যেমন ব্রাহ্মণেরা রাজদত্ত গ্রাম প্রাপ্ত হওয়ায় সেই সেই গ্রামের নামানুসারে ব্রাহ্মণদিগের গাঞি হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পূর্ব্বে যিনি যে প্রদেশ হইতে রাঢ় বা বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রদেশের নাম উল্লেখ করিয়া স্ব স্ব শ্রেণীর পরিচয় দিতেন, এইরূপে রাজা আদিশূরের যজ্ঞের পূর্ব্বে রাঢ়ে বঙ্গে দশ শ্রেণীর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিরাজিত ছিলেন।

প্রমাণ।

আদিশূরের যজ্ঞের পূর্ব্বাবধি যাঁরা।
এ দেশেতে বিরাজিল দশ শ্রেণীতে তাঁরা॥

সে দশের নাম শুন শুদ্ধ বুদ্ধি-বল।
সারস্বত কান্যকুব্জ গৌড় উৎকল॥
মৈথিল বিন্ধ-উত্তর-দেশবাসী দ্বিজ।
পঞ্চেরে গণিল বিধি পঞ্চ গৌড় বীজ॥
কর্ণাট তৈলঙ্গ অন্ধ্র দ্রাবিড়ী গুর্জ্জর।
বিন্ধ্যের দক্ষিণে পঞ্চ বিপ্রের নির্ভর॥
এ দশের সাধারণ নাম কান্যকুব্জ।
তাঁরাই বেদপাঠে বৈদিক বিপ্র অজ॥

নুলোপঞ্চানন কৃত ২য় কারিকা, দ্বাদশ প্রকার ব্রাহ্মণ বর্ণনা॥

পদে পদে সর্ব্বতোভাবে সপ্তশতীর গৌরব প্রদর্শন করায় নুলোপঞ্চাননকে অনেকে সপ্তশতী বিবেচনা করেন, এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ এই স্থলে নুলোপঞ্চাননের পরিচয় লিখিত হইল।

চট্টবংশাবতংস দিনকরের পৌত্র।
চৈতলীর পঞ্চানন শ্রোত্রিয় দৌহিত্র॥
পঞ্চানন গোষ্ঠীকথা সবজাতি লয়ে।
বেঁচেছিল শতবর্ষ পরমায়ু হয়ে॥

কুলচন্দ্র ঘটকের কারিকা॥

উপকারিতা ও তেজস্বিতা।

যখন রাজা বল্লাল সেন রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ করেন, তখন রাঢ় দেশে ৭৫০ জন ব্রাহ্মণ এবং বরেন্দ্র দেশে ৩৫০ জন গণনাতে পাইয়াছিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কেবল সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে স্বরাজ্যে রক্ষা করিবেন; তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। তাহাতে বরেন্দ্র দেশ হইতে আড়াই শত ব্রাহ্মণ নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, রাঢ় দেশ হইতে একজনও নির্ব্বাসিত হয়েন নাই।

বরেন্দ্রে তু তদা সার্দ্ধ ত্রিশতান্যগ্রজন্মনাং।
রাঢ়ায়াস্তু দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধান্তোধি শতানি চ॥
বরেন্দ্র-বাসি বিপ্রাণাং মধ্যে চৈকশত দ্বিজাঃ।
বরেন্দ্রে রক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচার পরায়ণাঃ॥
দ্বিশতাধিক পঞ্চাশদ্ বারেন্দ্রনাং দ্বিজন্মনাং।
পঞ্চাশন্মগধে ষষ্টি র্ভোটে ষষ্টিরভঙ্গকে॥
চত্বারিংশ দুৎকলে চ মৌড়ঙ্গেঽপি তথাঙ্ককাঃ।
দত্তা নৃপতি না হর্ষং বল্লালেন মহাত্মনা॥

গৌড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের ৮৮ পৃষ্ঠা।

বল্লাল যবে করে রাঢ়ী বারেন্দ্র অংশ।
রাঢ়ী বারেন্দ্র হইল এগারশ বংশ॥
রাঢ়ী সাত শত সাড়ে বারেন্দ্র চারিউন।
বারেন্দ্র সাড়ে তিনশ সাড়ে সাতশ রাঢ়ীগণ॥
রাঢ়ীমধ্যে কতক আদানে অগ্রদানী।
বারেন্দ্র পাতকী রাজদণ্ডে নির্ব্বাসনী॥

সম্বন্ধ নির্ণয়, ৩২২।৩২৩ পৃষ্ঠা।

নির্ব্বাসন কার্য্য সমাধা করিতে রাজা বল্লাল সেনের যে কয়েক বৎসর সময় অতীত হইয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে যখন কতকগুলি নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, আর কতকগুলি অবশিষ্ট ব্রাহ্মণের নির্ব্বাসিত হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল, তখন ঐ অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ সাতশতীর সহিত কন্যা আদান প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রমাণ।

মধ্য মৌড়ঙ্ দেশে ত্রিশ মাত্র যায়।
নির্ব্বাসনে ঘটে এই রীতি ভাটে কয়॥
এরা (অবশিষ্টেরা) আদান প্রদানে সাতশতী-দলে।
মিশে বৈদিক বারেন্দ্রে আর উত্তরেতে বলে॥

সম্বন্ধ নির্ণয়, ৩২৩ পৃষ্ঠা কুলজ্ঞ কারিকা॥

এখন বল দেখি, নির্ব্বাসন সময়ে সাতশতীর সহিত কন্যা আদান প্রদানের ফল কি?

উত্তর।—মহাতেজস্বী সাতশতীর সম্পর্ক থাকিলে রাজভয় থাকে না। ক্ষিতীশাদির বংশোদ্ভব রাঢ়ী বারেন্দ্র উভয়ের সমান মান। তবে কেন রাঢ়ী সাড়ে সাতশত জনের মধ্যে কেহই নির্ব্বাসিত হইল না, একটী লোকও কি দোষী ছিল না? ইহা কে মনে বিশ্বাস করিতে পারে? বারেন্দ্র

সাড়ে তিন শত জনের মধ্যে আড়াই শত লোক নির্ব্বাসিত, এইরূপ যখন দেখা যাইতেছে,তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, রাঢ়ীয়গণ সাতশতীর দৌহিত্র। এদিকে সাতশতীগণ মহাতেজস্বী। এমন কি, রাজা পর্য্যন্ত সকল লোকেই সাতশতীর নামে ভীত হইতেন। এই কারণে রাজা বল্লাল সেন রাঢ়ীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বারেন্দ্রগণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এই জন্য বলা গিয়া থাকে—

সাধে কি বল্লাল সেন রাঢ়ীগণ ত্যজে।
রাজদূত পলাইত সাতশতীর তেজে॥
নির্ব্বাসন হইতে রক্ষা সাতশতী করে।
জাতি, কুল, মান, প্রাণ সাতশতী করে॥

ফলতঃ সাতশতীর তেজস্বিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে তদনুকূলে রাঢ়ী বারেন্দ্র সমস্ত কুলশাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সাতশতীগণ রাঢ়ীয় পঞ্চ গোত্রের কেবল মাতুল নহেন, অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা বেদশিক্ষার গুরু ছিলেন। সেইজন্য রাঢ়ী কান্যকুব্জ সন্তান সমূহ রাজপূজ্য হইয়াছিলেন।

প্রমাণ।

যে সাতশতিকা বিপ্রা রাঢ়দেশ নিবাসিনঃ।
ছন্দোগা ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞা নীতিশাস্ত্র বিশারদাঃ॥
এভ্যঃ কন্যাঃ প্রদাস্যন্তি বিপ্রমুখ্যেভ্য এব তে।
এতেষাং নিগড়স্তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
যদি প্রজাঃ প্রজায়েরন্ ভবেন্মম কীর্ত্তি-রক্ষয়া।
কান্যকুব্জ দ্বিজাগ্র্যাণাং বংশোঽস্মিন্ স্থাপিতো ময়া॥
নৃপাজ্ঞয়া দদুস্তেভ্যঃ কন্যাঃ সপ্তশতী দ্বিজাঃ।
রাঢ়ায়াং বহুধান্যায়াং শ্বশুরালয় সন্নিধৌ॥
নিবাসং রুরুচে তেভ্যঃ সমাদৃত্য সুহৃজ্জনৈঃ।
সদৃশান্ জনয়ামাসুঃ তাসু পুত্রান্ কুমারিকাঃ॥
তেজস্বিনো গুণবতো দীপো দীপান্তরাৎ যথা।
ততস্তে ক্রমশো বিপ্রাঃ পরলোক মুপাগমন্॥

(পরে তৎসন্তানেরা মাতুল আশ্রয়ে বাস করিলেন)।

মাতুলাশ্রয়বাসাশ্চ মাতুলাশ্রয়বর্দ্ধিতাঃ।
মাতুলৈ রূপনীতাশ্চ ছন্দোগা অভবন্ তথা॥
সুনীতাশ্চৈব বিদ্বাংসঃ গৌড় রাজসমস্কৃতাঃ।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ নামক পুস্তকে ৭১।৭২ পৃষ্ঠায় ধৃত কুলজ্ঞবচন॥

সন ১৩০৫ সালের ৩রা বৈশাখের এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত।

কুলশাস্ত্র সমালোচন।

সম্বন্ধ নির্ণয়ের ৪৯২ পৃষ্ঠায় সপ্তম পংক্তিতে অনুমান করা হইয়াছে, সাতশতীগণের বৈদিক ক্রিয়াতে জ্ঞান থাকিলে অন্ততঃ উত্তরকালে অর্থাৎ বল্লালের সময় সাতশতীগণের মধ্যে কেহ কৌলীন্য পদে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইতেন। কিন্তু অনুমানে শাস্ত্রলোপ হয় না। অগ্রে জানা কর্ত্তব্য যে, কুলীনের মানে ও সপ্তশতীর মানে বিশেষ তারতম্য আছে কি না। যদি বিচারে কুলীনের মান অপেক্ষা সপ্তশতীর মানের হীনতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সপ্তশতীর কোনও কর্ম্মে দোষ ছিল, বলিতে হইবে। আর যদি কুলীন ও সপ্তশতী উভয়ের মান সমান হয়, তবে কুলীন না হওয়াতে সপ্তশতীর কোনও ক্ষতি নাই, স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমতঃ কান্যকুব্জাগত রাঢ়ী শ্রেণী সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের মান কতদূর, তাহা জানা আবশ্যক।

সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়।

পাকড়াশী পালধি কাঞ্জারী শিমলাল।
কুশারি মাষচটক শিমলায়ী বটব্যাল॥
পৌণ ত্যজে শ্রোত্রিয় যে বসুর আলয়
কুলাচলে অষ্টবসু মেরু চূড়া কয়॥
সাধ্য মধ্যে বাপুলিই সর্ব্বের প্রধান।
কুশারি বদলে কভু সিদ্ধে পায় স্থান॥
কাঞ্জারী শিমলাল বাৎস্যে ত্রৈবিদ্য সিদ্ধ।

পাকড়াশী পালধি শিমলায়ী তদ্ বিদ্য॥
বটব্যাল কুশারি মাষ চটক তেমন।
এ আট ঘর সিদ্ধ দানাদানে সুজন॥
প্রথম চারি মেল সাগর চতুষ্টয়।
সদা এদের প্রার্থনায় কাল করে ক্ষয়।
শ্রোত্রিয় সুমেরু বা কল্পতরু কায়।
কেহ পাদ, কেহ শির, কেহ মর্ম্মে যায়॥
পুতিতুণ্ড, কুলচন্দ্র ঘটককৃত পদ্য।

উল্লিখিত পদ্য সমূহে প্রকাশ পাইতেছে, কষ্টশ্রোত্রিয় কুল পর্ব্বতের পাদদেশ, মধ্যশ্রোত্রিয় মধ্যদেশ, সিদ্ধ শ্রোত্রিয় সুমেরুর চূড়া অর্থাৎ মস্তকদেশ। (শ্রোত্রিয়া মেরবো জ্ঞেয়াঃ কুলীনা দেবতা স্বয়ং) কুলশাস্ত্রীয় বচন অনুসারে তাহার উপরি সুরাই,মাধাই, চাঁদাই প্রভৃতি মেলের কুলীনরূপ সাধারণ দেবতাদিগের মধ্যে অতি উচ্চ সিংহাসনে ফুলিয়া আদি চারি মেল ও সাগর চতুষ্টয়—এই অষ্টমূর্ত্তি বিশিষ্ট কুলীনত্ব রূপ মহাদেব অধিষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার চূড়ায় সপ্তশতীরূপ চন্দ্র অবস্থান পূর্ব্বক সকলের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। চূড়াতে অবস্থান হেতু সপ্তশতীর মহিমার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। ইহা হইতে এ জগতে উচ্চ ও গৌরবান্বিত পদ নাই। ঘটক বিশারদ লুলোপঞ্চানন চন্দ্রের সহিত সপ্তশতীর তুলনা দিয়াছেন, যথা—

চন্দ্রশিবের মাথায় রহে তবু ক্ষীণ।
কপালগুণে আর তা নাহি হয় ভিন॥

ব্রাহ্মণ্য বিচার।

চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ, সকলেই জানেন। পোনের কলা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অবশিষ্ট এক কলা বিশিষ্ট হইয়া শিব-শিরোভূষণ হইয়া থাকেন, এই দৃষ্টান্তে স্থিরীকৃত হইল যে, লুলোপঞ্চাননের সময় সাত শত ঘর সাতশতীর মধ্যে পোনের ভাগ তিরোহিত হইলে অবশিষ্ট ক্ষীণ এক ভাগ মাত্র কুলাচল চূড়াস্থ কান্যকুব্জরূপ শিব-শিরঃস্থিত হইয়া যখন সকলের শোভা সম্পাদন করিতেছেন, তখন বল্লাল সেনের সময় পূর্ণ সংখ্যাবিশিষ্ট সপ্তশতীর প্রভা কতদূর ছিল, কে তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারে? ফলতঃ রাজা বল্লাল সেনের সময় কৌলীন্য পদ অপেক্ষা শ্রোত্রিয় পদের গৌরব অধিক ছিল; এই কারণে সুসিদ্ধ সপ্তশতীগণ পদ গ্রহণ করেন নাই।*

দেখা গেল যে, বিজ্ঞতম পণ্ডিতগণের লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের মধ্যে আদিশূরের যজ্ঞের পূর্ব্বে এ দেশে ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য এবং কৌলিন্যের প্রশংসার চরম বর্ণনা রহিয়াছে, সুতরাং আধুনিক সমগ্র ভারতেতিহাসের সংক্ষিপ্ত সার নামক পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "আদিশূর বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে বেদবিহীন ও ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য দেখিয়া পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন," এই কথা নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক, অসার ও অসঙ্গত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

শ্রীবনমালিবিদ্যাভূষণ।

* সন ১৩০৫ সালের ১০ই বৈশাখের "এডুকেশন গেজেট" দেখুন।

"চেৎমীন নাথ!"।

পরের সামান্য পদস্খলন দেখিলে আমরা তাহার উপর কি প্রকার খড়্গহস্ত হই, তাহা সময় সময় নিজেরা দেখিতে পাই না, কারণ তুলনায় বিচারের সময় নিজের দিকে আদৌ তাকাই না—তাকাইবার ক্ষমতাও নাই,তাকাইতে কখন শিখিও

নাই। "সংসার ভয়ানক স্বার্থপর," "সবাই পাপে ডুবিতেছে", ইত্যাদি প্রলাপবাক্য উচ্চারণকালে নিজেকে সন্তর্পণে দুনিয়ার বাহিরে কোন পবিত্র স্থানে বসাইয়া লই। কারণ সমগ্র সংসার যখন স্বার্থপর, পাপী, অত্যাচারী, তখন আমি বাদ যাই কি প্রকারে? আমিও ত সংসারের একজন—তাহা হইলে চলে কৈ? আমি যে বিচারাসনে উপবিষ্ট, আর আমি ছাড়া সবাই আমার আদালতের আসামী।

আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের নিকট মত বিভিন্নতা মহাপাপ। আমার মতামতের সঙ্গে যদি তোমার ষোল আনা কড়ায় কড়ায় মিল না হইল, তুমি অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ, ঘোর অত্যাচারী। এই দারুণ রোগ আমাদের দেশে যে রূপ প্রবল, পাশ্চাত্য জগতে সেরূপ নয়। জগদ্বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ বীক্ষান্ আগাসিজের সহিত বিবর্ত্তনবাদে মানবাত্মাসৃষ্টি সম্বন্ধে মহাত্মা দার্ব্বীনের যখন মতভেদ হইল, তখন আগাসিজ্ ইংলণ্ড পরিত্যাগ করত আমেরিকায় গমন করেন। আগাসিজ্ পরম ধার্ম্মিক ঈশ্বরপরায়ণ ভক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, মনুষ্য সৃষ্টির সময় জড়দেহ সম্বন্ধে ক্রমবিকাশের নিয়ম অবলম্বিত হইলেও তাহার আত্মা প্রেরণ কালে ঈশ্বরের বিশেষ হস্ত ছিল। দার্ব্বীণ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একমাত্র বিবর্ত্তনবাদের নিয়মেরই প্রাদুর্ভাব দেখিতেন। যাহা হউক, আগাসিজ্ আমেরিকাতে সাদরে গৃহীত হইয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিতেছেন, এমন সময় তথা হইতে দুই জন পণ্ডিত ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া দার্ব্বীণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা দার্ব্বীণকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত গুণে তাঁহার সমক্ষে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করাতে বিনয়াবতার দার্ব্বীণ বলিয়া উঠিলেন "why? Aggassiz is three of us rolled into one"—আমার মত তিন জনকে একত্র করিলে যাহা হয়, আগাসিজ্ তাহাই। এখন পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের দেশে ওরূপ স্থলে এইরূপ কথাই হইত "হাঁ আগাসিজ পণ্ডিত বটেন, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, আমার সঙ্গে বরাবর কাজ করিয়া শেষটা বিবর্ত্তনবাদের অমূল্য সত্য সম্বন্ধে মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।" অপরের মতামতের প্রতি সম্মান দিতে আমরা আদৌ শিখি নাই।

সকল মানুষই সমান পুঁজি লইয়া সংসারে আসিয়াছে, সকলেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম, মতামত একরূপ ছাঁচে ঢালা হওয়া উচিত। যাঁহারা এরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অপরের ত্রুটি বা দুর্ব্বলতা দেখিলে চম্‌কিয়া উঠিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? বিশ্বলীলা কি ওরূপ ভাবে সম্ভব হইতে পারে? জন্মের পূর্ব্বে আমরা কে কোথায় ছিলাম, কে কি সম্বল লইয়া আসিয়াছি, কেন সকল বিষয়ে সংসারে এত বৈষম্য? এই সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাঁহারা চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারা সংসার-রহস্য কিছু বুঝিয়া থাকিবেন। তাঁহারা হয়ত অপরের দুর্ব্বলতা উপেক্ষা বা ক্ষমা করিতে জানেন। জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে কতক আলো যেন পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে এমন অনেক উদাহরণ নয়নগোচর হয় যে, অন্যান্য বিষয়ে খুব ভাল লোক হইয়াও কোন

বিশেষ স্থলে নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অক্ষম হইলেন। এ সকল ক্ষেত্রে কর্ম্মফলবাদীরা নিঃসংশয়ে বলিবেন যে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার বশত ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অবশ হইয়া তাঁহার পতন হইল। বাস্তবিক কর্ম্মফল ভোগ সম্বন্ধে প্রকৃত নিয়মাবলী মানব বুদ্ধির অগোচর, তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, উহা বড়ই দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার।

পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফলে যে অতি উচ্চ শ্রেণীর সাধু মহাত্মাগণেরও সাময়িক পতন অনিবার্য্য, তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ পুরাণাদিতে বিস্তর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বজন্মবাদ না মানিলেও ঐ সকল বিবরণ পাঠে যে বিস্তর জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? মানুষ যে কিরূপ অসম্পূর্ণ, দুর্ব্বল, ক্ষণভঙ্গুর জীব, তাহা বুঝিতে পারিয়া আমরা পরস্পরকে ক্ষমা করিতে শিখি, ইহাও কম লাভ নয়।

জন্মান্তরের কৃত কর্ম্মফলে হউক আর নাই হউক, এই সংসারে মোহের যে কি অনির্ব্বচনীয় প্রাদুর্ভাব, তাহা দেখাইবার জন্য অদ্য একটী আখ্যায়িকা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। এই গল্পের দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর সামান্য জীব আমরা কোথায় আছি, মহা মহা সাধু ব্যক্তিগণও সময়ে সময়ে দারুণ মোহের হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এক সম্প্রদায় সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহাদিগকে "গোরক্ষ" সম্প্রদায়ী বলে। মহাত্মা গোরক্ষনাথ হইতে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। কথিত আছে যে, গোরক্ষ নাথের গুরু মীননাথ জীবন্মুক্ত জীব ছিলেন। তিনি কঠোর সাধন দ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ করিলেও কতক সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ তাঁহার বাকী ছিল। একদা গুরু শিষ্যে কোন রাজার প্রাসাদে অতিথি হয়েন। এক দিন, দুই দিন, ক্রমে তিনি দিন রাজ-ভোগে কালাতিপাত করিয়া শিষ্য গোরক্ষনাথ দেখিলেন, গুরুর যেন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা নাই। যোগবলে জানিতে পারিলেন, মীননাথকে কিছু দিন রাজ্য-সুখ সম্ভোগ করিতেই হইবে। জন্মান্তরের কর্ম্মফলে কিয়ৎকালের জন্য রাজ্যভার গ্রহণ তাঁহার অদৃষ্টে আছে। ব্যাপার অনিবার্য্য—

"লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্য,
দৈবোঽপি তম্বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে,
ললাট লেখঃ ন পুনঃ প্রযাতি॥"

ভাবিয়া শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুকে সম্বোধন করত বলিলেন, "গুরুদেব! সন্ন্যাসীর পক্ষে এ প্রকারে রাজভোগে কালাতিপাত করা অন্যায়। তবে আপনি জীবন্মুক্ত নির্লিপ্ত পুরুষ, আপনার ক্ষমতা অসীম, আপনি অনায়াসে অনাসক্ত হইয়া এই সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে সমর্থ, আমার ন্যায় স্বল্পশক্তি জীবের পক্ষে এরূপ পরীক্ষা অশুভ ফলপ্রদ হইবার কথা। অতএব আপনার যদি রাজপ্রাসাদে এই ভাবে অবস্থিতি করা অভিপ্রেত হয়, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বিদায় দান করুন। আপনার সঙ্গে এ অবস্থায় থাকা আমার ক্ষমতার অতীত।" মীন নাথকে তখন মোহ বিলক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়াছে; তিনি প্রাণপ্রিয় শিষ্য গোরক্ষনাথকে বিদায় দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। গোরক্ষনাথ প্রস্থান করিলে

রাজা ক্রমে মীননাথকে জটাবল্কল খসাইয়া দিব্য রাজবেশে সাজাইলেন। মীননাথ অতি সুপুরুষ ছিলেন, রাজভোগ ও রাজ-পরিচ্ছদে দ্বিগুণ সুন্দর হইলেন। অবশেষে রাজা তাঁহার নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিলেন; এবং শুভ দিন দেখিয়া তাঁহার এক মাত্র রূপ-যৌবন-সম্পন্না কন্যার সহিত সন্ন্যাসভ্রষ্ট মীননাথের বিবাহ দিলেন। অল্পকাল পরে রাজা জামাতাকে রাজ্যভার প্রদান করত পরলোক গমন করিলে মীননাথ পুত্র-কলত্রাদি সহ সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মীননাথ এখন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, পূর্ব্ব জীবনের কথা কিছুমাত্র মনে নাই, ঠিক যেন রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করিয়া আশৈশব রাজভোগে লালিত পালিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে সিংহাসন লাভ করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ মীননাথকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর, রাজার মনে আশঙ্কা হয়, পাছে ঐ ব্যক্তি আবার কোন সময় আসিয়া মীননাথকে বুঝাইয়া লইয়া যায়। এই জন্য তিনি আদেশ প্রচার করেন যে, কোন প্রকারের সন্ন্যাসী ফকির রাজপ্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিতে যেন না পারে; মৃত্যু কালেও ঐ আজ্ঞা পুনঃপ্রচারিত করিয়া যান।

সংসারে দেবাসুরের যুদ্ধ প্রতিনিয়ত প্রত্যেক স্থানে চলিতেছে। জীবের কল্যাণের জন্য দেবগণ সর্ব্বদা যেরূপ উৎসুক্য ও আগ্রহের সহিত প্রয়াস পাইতেছেন, অপর দিকে মোহাবতার অসুরগণ তেমনি প্রবল পরাক্রমের সহিত দেবতাদিগের যত্ন পরিশ্রম পণ্ড করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া রহিয়াছে। অবশেষে সর্ব্বত্র সত্যের, পুণ্যের জয় হইতেছে ও চিরকাল হইবে, কিন্তু আপাতত দেখিলে যেন বোধ হয় যে, মায়া মোহের লৌহ-গ্রাস হইতে রক্ষা পাওয়া কোন মতেই সংসারের সাধ্য নয়। বুদ্ধদেবের জন্মকোষ্ঠী দেখিয়া পিতা শুদ্ধোদন যখন জানিতে পারিলেন, শিশু সংসারে থাকিলে মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইবে, কিন্তু বৈরাগ্য আশ্রয় করত সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মজগতে একটা বিরাট ব্যাপার সম্পাদনই উহার অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ আছে, তখন তিনি চারিদিকে আঁটিয়া সাঁটিয়া এমন বন্দোবস্ত ব্যবস্থাপিত করিলেন, যাহাতে বিবেক বৈরাগ্যের কোন প্রসঙ্গ বালকের কর্ণে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, কেবল চূড়ান্ত ভোগবিলাস ও আমোদ প্রমোদের বিপুল আয়োজন ভিন্ন আর কিছু তাহার নয়নগোচর হইবার উপায় রহিল না। এরূপ সুদৃঢ় মোহাসক্তির দুর্গ মধ্যেও দেবগণ এ প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলেন, যাহাতে যুবরাজ শাক্যসিংহ অনায়াসে কঠোর বৈরাগ্যের সরল পথে উপনীত হইলেন। চরমে ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। মীননাথের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। কালপূর্ণ দেখিয়া শিষ্য গোরক্ষনাথ মীননাথের রাজধানীতে পুনরাগত হইয়া রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে "চেৎ মীননাথ! গোর্খা আয়া।" বলিয়া চীৎকার করত টহল দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজাজ্ঞাতে প্রাসাদের ফটক পার হওয়া উদাসীন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষেধ, কাজেই তাঁহার আর অন্য উপায় নাই। কিছুদিন ক্রমাগত এই প্রকারে চীৎকার করিতে করিতে এক দিবস রাজার কর্ণে উহা যেন কোন পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তির আওয়াজ বলিয়া বোধ হওয়ায় তিনি টহলদাতা সন্ন্যাসীকে সম্মুখে হাজির করিবার হুকুম দিলেন। গোরক্ষনাথ রাজসমীপে

উপস্থিত হইলে মীননাথ তাঁহার সচীৎকার টহলের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করায় সন্ন্যাসী নিভৃতে রাজাকে উহার অর্থ জানাইতে পারেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। গোপনে দুইজনে কথাবার্ত্তা হইলে মীননাথের সমস্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়া চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত হইল।

মীননাথ—গোরক্ষ! আমি ত বিষম বিপদে পতিত। এখন এ স্থান ত্যাগ ভিন্ন আর কোন উপায় দেখি না। পুত্র কলত্রাদির মায়া এড়াইয়া তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ ত আমার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। এ ক্ষেত্রে নিশিযোগে সকলের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করাই যুক্তিযুক্ত।

গোরক্ষ—দেখুন, যেরূপ ভাল বিবেচনা করেন। যে কোন প্রকারেই হউক, আপনাকে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির করিতে পারাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অনিবার্য্য কর্ম্মফলে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; এখন পুনরায় সনাতন ধর্ম্মপথে যাহাতে অগ্রসর হইতে পারা যায়, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। শিষ্যের কল্যাণ কামনা গুরুর যেরূপ কর্ত্তব্য, গুরুকে সকল প্রকার বিঘ্নবাধা হইতে রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করাও, তেমনই, শিষ্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উচিত, নচেৎ পতিত হইতে হয়।

মীননাথ—তবে, এক কাজ করিতে হইবে। পলায়ন কালে কতকগুলি বহুমূল্য মণিমাণিক্য সঙ্গে লইতে হইবে, যাহাতে অবশিষ্ট জীবন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভাবিতে না হয়।

গোরক্ষ দেখিলেন, তখনও মীননাথের সাংসারিক বুদ্ধি বিলক্ষণ রহিয়াছে। রাজ্য ও রাজভোগ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু ভবিষ্যতের সম্বল সম্বন্ধে চিন্তা তাঁহাকে ছাড়ে নাই। অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া রজনীর মধ্যভাগে জহরাতের পুঁটুলি সহ উভয়ে জন্মের মত রাজভবন পরিত্যাগ করত পুনরায় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের জন্য বাহির হইলেন। পথিমধ্যে অনেক বুঝাইয়া পুঁটুলিটী মীননাথের হস্ত হইতে গোরক্ষ গ্রহণ করিলেন।

মীননাথ—দেখিও গোরক্ষ! খুব সাবধানে পুঁটুলিটী রাখিবে; উহাই আমাদের উভয়ের জীবনের একমাত্র সম্বল, ওটী গেলেই সর্ব্বনাশ, অন্নভাবে মারা যাইতে হইবে।

(পাঠক দেখুন, তখনও মীননাথের কত মোহ!)

গোরক্ষ—গুরুদেব, আমি থাকিতে আপনি কোন দ্রব্য বহন করেন, এটা কি উচিত? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এই রত্নগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত সঙ্গে রাখিব। রাত্রি অন্ধকারময়। গোরক্ষ গুরুর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতেছেন, আর পুঁটুলি হইতে এক এক খানি জহরাৎ এ দিক ও দিক ফেলিয়া দিতেছেন। মীননাথ ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কেমন গোরক্ষ! পুঁটুলি ত ঠিক আছে?" গোরক্ষ উত্তর দিতেছেন, "হাঁ, গুরুদেব সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।" পরে একবার পশ্চাতের দিকে তাকাইয়া গুরু দেখেন যে, গোরক্ষের হাতে পুঁটুলিটী নাই। অমনি অত্যন্ত কাতর হইয়া হাহাকার রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন গোরক্ষ গুরুকে নানা প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া বিফল হওয়ায় একটী অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন—পথ পার্শ্বস্থ একটী প্রস্তরস্তূপের উপর

মূত্রত্যাগ করিয়া অমানুষিক শক্তিপ্রভাবে সে গুলিকে বহু মূল্য রত্ন খণ্ডে পরিণত করিলেন; এবং এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া গুরুকে সম্বোধন করত গম্ভীর ভাবে বলিলেন "প্রভো! আপনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। আমি আপনার অধম শিষ্য, আপনার শিক্ষা ও উপদেশ গুণে আমার মূত্রের এত ক্ষমতা যে, উহার সংস্পর্শে সামান্য প্রস্তরখণ্ড এরূপ বহু মূল্যবান মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। আপনার পুঁটুলিটীতে কতই বা রত্ন ছিল, সম্মুখস্থ স্তূপের নিকট সে কয়টী কিছুই নয়। এখন আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন, আপনি কোন্ শ্রেণীর জীব, আপনার ক্ষমতা কি পরিমাণ।" এই ঘটনা ও গোরক্ষের স্মারক বাক্য সমূহ দ্বারা মীননাথের আত্মবিস্মৃতি একেবারে ঘুচিয়া গেল। তখন শিষ্যকে আলিঙ্গন করিয়া মীননাথ কতই না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন; এবং আদেশ প্রচার করিলেন যে, তাঁহার শিষ্যগণ ভবিষ্যতে গোরক্ষ-সম্প্রদায়ী বলিয়া পরিচিত হইবে।

বাস্তবিক, বিশ্বেশ্বরের সন্তান হইয়া, বিশ্বসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া আমরা কি প্রকার অসহায় কাঙ্গালের মত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি। পিতা আমাদিগকে কতই না ক্ষমতা দিয়াছেন, যে ক্ষমতার সদ্ব্যবহারে আমরা "as perfect as the Father in heaven" হইতে পারি। এ কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া নরকের কীটের ন্যায় আমাদের দুর্দ্দশা—সামান্য কয়টা দিনের সাংসারিক জীবনের জন্য কতই উদ্বেগ, কতই চিন্তা, কতই ব্যস্ততা, কতই উৎকণ্ঠা, কতই ব্যবস্থা, কতই আয়োজন, কতই বন্দোবস্ত !! হায়! হায়! কি শোচনীয় অবস্থা।

আখ্যায়িকাটীর সকল অংশ হয় ত অনেকে বিশ্বাস করিতে না পারেন, কিন্তু আসল জায়গায়, বোধ হয়, কাহারও আপত্তির কারণ নাই। মোহমুগ্ধ গুরু মীননাথকে যে কথা দ্বারা শিষ্য গোরক্ষ উদ্ধার করিয়াছিলেন, ঐ শব্দ কয়টী আমাদের নিকটও প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হইতেছে। আমরা সকলেই মীননাথ, সকলেই মোহাচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছি। আমরাও মধ্যে মধ্যে বেশ শুনিতে পাই, বিবেক আমাদিগকে সর্ব্বদা চেতন হইতে অনুরোধ করিতেছে—"জাগো ভাই, আর মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিও না; আমি আসিয়াছি, সাহায্য করিতে, উদ্ধার করিতে।" এ কথা বিবেক আমাদিগকে সর্ব্বদাই বলিতেছে। বিবেক-বাণীকে অগ্রাহ্য করিয়া আমরা সবাই বিষয়-সুখ সম্ভোগে মত্ত রহিয়াছি। "চেৎমীন নাথ! গোর্খা আয়া" এই চারিটী কথাতে যে গভীর অর্থ নিহিত, তাহা যেন আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ থাকে; "ঘোর মোহান্ধকারে দিব্য জ্যোতির্বিকাশিনী" মা জগদম্বা সেইরূপ বল আমাদিগকে প্রদান করুন।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

অন্তঃশয্যায়।

(বুয়ার-সেনাপতি জুবেয়ারের উক্তি)

"একি মৃত্যু! অকস্মাৎ অনাহূত রূপে
কেন প্রবেশিছ মোর আনন্দ-মন্দিরে?—
জরাগ্রস্ত দেহ মম, কিন্তু দেখ সখে,
হৃদয়ে বিরাজে সদা তরুণ যৌবন!—
সেই শক্তি, সেই শৌর্য্য, সে দর্প, উদ্যম,
আজিও বাড়িছে মোর—চন্দ্রকলা যথা
বাড়ে নিত্য সিত পক্ষে বিধাতার বরে।
একি হায়, কোথা হ'তে কালরাহু তুমি
আসিলে জন্মের মত গ্রাসিতে আমারে?
কেমনে মরিব আজি—বক্ষ বিদারিয়া
নয়নে ছুটিছে উৎস, মরিব কেমনে?
কেন এ সন্তাপ, মৃত্যু! জন্মি বীর-কুলে
মরণে কাতর আমি?—নহে তা কখন,
দেখ পরীক্ষিয়া মম ধমনী শিরায়
বহিছে আগ্নেয় স্রোত; সাগরের বুকে
যেমতি বাড়বানল!—চূর্ণিয়াছি আমি
বজ্রাধিক শত্রু-অস্ত্র, এই বাহু-বলে!
মরণে কাতর আমি?—জানেন দেবতা,
সহস্র মরণে আমি, দলিয়াছি পদে!
আছিল আকাঙ্ক্ষা মম, "পাই যদি কভু
বিংশতি মানব যোগ্য, স্বাধীনতা তরে—
মরতে ত্রিদিব-নিধি স্বাধীনতা আহা
নর-মানবের!—আমি সেই ধন তরে
নিশ্চিত যুঝিতে পারি জগতের সনে।"
সে সাধ পূরা'তে বিধি ঘটাইলা আসি
প্রবল ইংরাজ রিপু; কেশরী যেমতি
যুঝে শার্দ্দূলের সাথে, তেমতি উদ্যমে
করিনু সংগ্রাম আমি প্রতিপক্ষ সনে!
সম্ভ্রমে বিজয়-লক্ষ্মী দিলা কতবার
জয়মাল্য গলে মম, সুযশ মুকুট
পরাইলা শিরোপরি, দয়াময়ী দেবী!
কাঁপিল বৃটিশ সিংহ, কাঁপিল বৃটনে
শ্বেত দ্বীপ অধীশ্বরী, বিস্ময়ে চাহিল
সমস্ত জগত ক্ষুদ্র "ট্রান্সভাল" পানে!—
মাতৃভূমি মম সেই প্রিয় ট্রান্সভাল!
অনন্ত যশের পুরী, রত্ন প্রসবিনী,
বীর নর নারী সেথা—ভ্রাতা ভগ্নী মিলি,
দেশের কল্যাণে করে আপনা প্রদান!
পুরুষ মুখের গ্রাস নিক্ষেপি ভূতলে
দেশ-বৈরী নাশে ধায়; সে দেশের নারী
ফেলিয়া কোলের ছেলে, সুকোমল তনু
বর্ম্মে ঢাকি, আগ্নেয়াস্ত্র ধরি পদ্ম করে
সমর প্রাঙ্গণে ছোটে; প্রতিজ্ঞা সবার
'জননী জনমভূমি, চির পূজনীয়া
যাবত শোণিত-কণা রহিবে শিরায়,
অধীনতা সে দেশের নারিব সহিতে।'
এ উচ্চ আশায় তারা দলিয়াছে পদে,
হীনতা, নীচতা যত, নির্ম্মল হৃদয়
বিশুভ্র দর্পণ সম! তাহাদের মাঝে
পবিত্র বন্ধন বদ্ধ, মরমে মরমে!
কি বলিব হে কৃতান্ত! সেই সেনাদলে
নায়ক আছিনু আমি, কি উচ্চ গৌরব!—
জীবনের সার্থকতা এর চেয়ে আর
কিবা আছে ভূমণ্ডলে! সে গৌরব-তরে
বৃদ্ধ জুবেয়ার যুবা! যুবার বিক্রমে
সংগ্রামে যুঝিনু আমি, কাল বহ্নি সম!
নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, তুমি হে শমন!
হেন অসময়ে আসি কেন আহ্বানিলে
স্বর্গে যাইবারে মোরে? প্রদীপ্ত অনল
অকালে নিবালে কেন—আকাঙ্ক্ষা তাহার
না মিটিতে, মহাশক্তি মিশিল অঙ্গারে!
কি সুখে হইব সুখী, স্বর্গধামে গিয়া,

স্বদেশের দাস আমি ?—ধিক্ শতবার
তোমারে, জাননা তুমি শত স্বর্গ সুখ
তুচ্ছ, অবজ্ঞেয়, মোর জন্মভূমি-কাছে !
শত্রু-হস্তে দেশ মম বিপন্ন বিষাদে,
সন্ত্রাসিত, প্রপীড়িত সহযোগিগণ ;
এ হেন দুর্দ্দিনে হায়, তা'সবা ফেলিয়া
কেমনে যাইব আমি ?—দাবানল যবে
পশে বনে, মৃগযূথ ফেলি তার মুখে
পলায় কি মৃগরাজ ? ভীষণ ভীষণ
স্বর্গ মম ; বুঝিলাম এতদিন পরে
মরণ নির্ম্মম কত ! বুঝিলাম আর
মানবের বল, দর্প, দৈবের সকাশে
ক্ষুদ্র, তুচ্ছ—অণু কিম্বা পরমাণু সম !
মুহূর্ত্ত দাঁড়াও মৃত্যু ! শেষ রক্ত মোর
দিয়া যাই মাতৃ-পদে আঁখি-জল রূপে !
যাই মা জনম ভূমি ! অশক্ত এ দাস
ছিঁড়িতে মৃত্যুর-পাশ, কিছুই হ'ল না !
মুছিতে অদৃষ্ট-লিপি নহে শক্তিমান
ক্ষুদ্র নর, আর কিবা বলিব জননি ?
চল মৃত্যু ! চল সখে ! থাকুক আমার
জন্মভূমি হেথা ; আহা থাকুক বাঁচিয়া
যোগ্য পুত্র পুত্রী তার ! তাহাদের প্রাণে
থাকুক আমার প্রাণ, অতৃপ্ত কামনা !
আর কি বলিব বেশী—থাকুক জগতে
ধর্ম্ম, ন্যায়, সত্য, পুণ্য, মহত্ত্ব সকলি ;
গেল শুধু হতভাগা জুবেয়ার আজি
ছিন্ন-জিহ্ব সিংহসম, ভাসি নেত্রজলে !"

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

প্রাচীন খ্রীষ্টীয়পূজা-বিধি। (২)

সাধু জেম্‌সের সাধারণ পূজা-বিধি।

প্রাচীন পূজা-বিধিগুলির মধ্যে সাধু জেম্‌সের পূজা-বিধি সম্বন্ধে প্রাচীনতম সাক্ষ্য পাওয়া যায়, এবং পূজা-বিধিটী মালাবার উপকূলের খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে প্রথমাবধিই প্রচলিত, এই দ্বিবিধ কারণ বশতঃ, নমুনা-স্বরূপ এই পূজা-বিধিটীর বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

পূজাটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ সর্ব্ব-সাধারণের সমক্ষে ব্যবহার্য্য। দ্বিতীয় ভাগটী কেবল খ্রীষ্টীয় উপাসকদিগের সমক্ষে ব্যবহার্য্য। সমস্ত পূজা-বিধিটীই গান বা সুর করিয়া আবৃত্তি করার নিয়ম আছে।

প্রথম ভাগ।

পুরোহিত আপনার নিত্য ব্যবহার্য্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, হস্ত প্রক্ষালনান্তর বেদীর সমক্ষে পরিধেয় বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া, পাপ মোচনের জন্য এবং উপস্থিত গুরু কার্য্যের উপযোগী অন্তঃশুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিয়া, সভাস্থিত লোকদিগকে স্বস্ত্যয়ন (intercede) করিতে অনুরোধ করেন।

পরে সন্নিকট হইয়া কহেন—

"আবি আলোহোর বেদীর নিকট, যিনি যৌবনে আমাকে আনন্দে রাখিয়াছেন, সেই আলোহোর নিকট আসিব' (সাম ৪৩।৪)। হে প্রভো, আপনার সিংহাসনের সমক্ষে উপস্থিত, আমার দিকে অবলোকন করুন।"

পরে দক্ষিণে, বামে ও মধ্যে বেদীর উপর তিন স্থানে প্রণিপাত করিয়া বলেন—"বেদী-শৃঙ্গের সহিত রজ্জু দ্বারা আপনি আমাদিগের উৎসব-ডালি বন্ধন করুন।"

পরে আচার্য্য (Deacon) অনাবৃত মস্তকে বেদীর দক্ষিণ পার্শ্বের আলোক জ্বালিতে জ্বালিতে কহেন—"আপনার জ্যোতিতেই আমরা জ্যোতিষ্মান হইব ;"

এবং অপরটী জ্বালিতে জ্বালিতে দুই এক কথায় লোকদিগকে স্বর্গীয় জ্যোতির দিকে মন দিতে বলেন।

এই অবসরে পুরোহিত ধূপ-পাত্রে ধূপ দেন এবং উপস্থিত সকলে—"পবিত্র ত্রিমূর্ত্তির সকাশে ইহা যেন গ্রাহ্য হয়," এই বলিয়া প্রার্থনা বচন উচ্চারণ করেন। পরে পুরোহিত নৈবেদ্য পাত্র অনাবৃত করিলে, আচার্য্য পিষ্টক লইয়া পুরোহিতের সমক্ষে ধরেন। পুরোহিত উহার উপর ক্রুশ (†) চিহ্ন করিয়া এই প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করেন— "ঈশ্বর যেন বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগের নৈবেদ্য গ্রাহ্য করেন।"

পরে বেদীর উপর উহা স্থাপন করিয়া উহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া আইসেয়ার এই কথা আবৃত্তি করেন—"মেষ-শাবকের ন্যায় তিনি বধ্য স্থলে নীত হয়েন, এবং লোমছেদনকারীর নিকট মেষ যেরূপ নিস্তব্ধ থাকে, তিনি সেইরূপ রহেন।

পরে পান-পাত্র লইয়া কহেন—"আমি ত্রাণের পাত্র হস্তে ধারণ করিয়া প্রভুর নাম ডাকিব।"

এবং পাত্রে মধু ঢালিয়া কহেন—"আমাদের প্রভু যেশু-মশিহের পার্শ্ব হইতে যে শোণিত বাহির করা হইয়াছিল, ইহা উহারই প্রতিরূপ ; পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নাম লশ্রয়া আমি ইহা এই পাত্রে পাতিত করিলাম।"

এবং মধুর সহিত কিছু জল মিশাইয়া কহেন—"এই জল যেন, যেশু-মশিহের পার্শ্ব হইতে যে জল বাহির হইয়াছিল, সেই জলের প্রতিরূপ হইয়া মিশ্রিত হয়।"

পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ ধূপ পাত্র দোলাইতে দোলাইতে, এই গান গীত হয়—"আইস আমরা প্রভুর উদ্দেশে গান করি ; আমাদিগের ত্রাণের বলে আইস আমরা হৃদয়ের সহিত আনন্দ করি। আইস আমরা ধন্যবাদ সহকারে তাঁহার সকাশে উপস্থিত হই, এবং সাম-যোগে, তাঁহাতে যে আমরা উল্লাসিত, ইহা প্রকটিত করি।

কারণ প্রভু মহান ঈশ্বর, সকল দেবতার উপর তিনি মহান রাজা।

তাঁহার হস্তে পৃথিবীর চতুষ্কোণ বর্ত্তমান, গিরি-সমুদায়ের বল, তাঁহারই বল।

সমুদ্র তাঁহার, তিনিই উহার স্রষ্টা এবং তাঁহার হস্তদ্বয় শুষ্ক স্থলেরও রচনা করিয়াছে।

ওহে, আইস, আমরা পূজা ও প্রণিপাত করি এবং প্রভু যিনি আমাদের স্রষ্টা, তাঁহার সমক্ষে জানু অবনত করি।

কেননা, তিনি আমাদের প্রভু ঈশ্বর, এবং আমরা তাঁহার চরণ-স্থলের জীব ও তাঁহার হস্তের মেষ। আজ যদি তোমরা তাঁহার স্বর শুনিতে চাও, তবে যেমন তাঁহাকে রাগাইবার দিনে,—যেমন অরণ্যে প্রলোভনের দিনে, করিয়াছিলে ; সেইরূপ তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন করিও না।

* * *

পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার মহিমা হউক।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জগতের শেষ পর্য্যন্ত এই মহিমা স্থির থাকুক।

প্রভো, আমাদের প্রতি দয়া করুন।

হে খ্রীষ্ট, আমাদের প্রতি দয়া করুন।

প্রভো, আমাদের প্রতি কৃপা করুন।

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ; আপনার নাম পবিত্র হউক, আপনার রাজ্য আসুক, আপনার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পালিত হয়, সেইরূপ পৃথিবীতেও হউক। অদ্য আমা-

দের অন্ন দান করুন; এবং আমরা যেমন আমাদের বিপক্ষে যাহারা অপরাধ করিয়াছে, তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করি, আপনিও সেইরূপ আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আর আমাদিগকে প্রলোভনে না ফেলিয়া মন্দ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। যে হেতু আপনার রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা নিত্য নিত্য বর্ত্তমান।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার মহিমা হউক।

ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জগতের শেষ পর্য্যন্ত এই মহিমা স্থির থাকুক।"

এই স্থলে বিশ্বাসীগণের জন্য, আর আর সকলের জন্য, জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের যাহা যাহা আবশ্যক, তজ্জন্য একটী প্রার্থনা হয়। *

এই প্রার্থনাবসানে উপস্থিত সকলে উচ্চৈঃস্বরে এই অবতরণ-স্তোত্র উচ্চারণ করেনঃ—

"ঊর্দ্ধেতে ঈশ্বরের মহিমা,
পৃথিবীতে শান্তি,
মনুষ্য সন্তানদের প্রতি প্রসন্নভাব।"

একটী গীত এই স্থলে গীত হয়। প্রায় কোন প্রাচীন সাধু-রচিত গীত নিরূপিত থাকে।

পরে আচার্য্য সংস্কারটী সম্বন্ধে এক উপদেশ পাঠ করেন। এই দিবসের জন্য নিরূপিত লিপি ও সাম-পুস্তকের কিয়দংশ এই স্থলে পঠিত হয়। পরে পূর্ব্বেকার ন্যায়—"ঊর্দ্ধেতে ঈশ্বরের মহিমা," ইত্যাদি স্তোত্রটী পুনরায় উচ্চারিত হয়।

পরে আচার্য্য সুরীয় ভাষায় সুসমাচারের কিয়দংশ পাঠ করিলে একজন উপাচার্য্য (Sub-deacon) স্থানীয় ভাষায় উহার অনুবাদ পাঠ করেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে আচার্য্য লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহেন—"তোমরা ঈশ্বরের বাক্যরূপ বীজমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ কর; প্রার্থনা করি, যাহারা শ্রবণ করিলে, সকলেই যেন বাক্যের অনুগামী হও।"

এই সময়ে সাধারণ লোকদিগকে আচার্য্য এই বলিয়া বিদায় দেন—

"শ্রোতৃবর্গ, শান্তিতে তোমরা বিদায় হও, শান্তিতে গমন কর। এখন জল-সংস্কার প্রাপ্ত লোক সকল, তোমরা শান্তিতে অগ্রসর হও। * দ্বার রুদ্ধ কর।"

ইহার পরে—

"প্রভু রাজত্ব করিতেছেন, তিনি বৈভবে আচ্ছাদিত, তাঁহার জয় হউক!" ইত্যাদি স্তুতি সম্বলিত কয়েকটী শাস্ত্রীয় বচন আবৃত্ত হয়। জীবিত ও মৃত বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা এবং বিশ্বাস-সার এই স্থলে আবৃত্ত হয়।

* এই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিটী সাধু জেম্‌সের পূজা-বিধির অতি প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটী যুক্তি স্বরূপ। প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগেই খ্রীষ্টীয় পূজা-বিধি এক কালীন বিধিবদ্ধ হয়। 'এপ্‌সল্' ও 'প্রকেট্‌গণ পূজার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে স্বেচ্ছা মত প্রার্থনা করিতে পাইতেন। সাধু জেম্‌সের পূজা-বিধিতে স্থানে স্থানে এইরূপ স্বাধীনতার লক্ষণ রহিয়াছে।

* এই পূজা-বিধির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ইহাও একটী যুক্তি স্বরূপ। যে কালে ও যে দেশে কতক লোক খ্রীষ্টীয়ান ও কতক লোক খ্রীষ্টীয়ানদের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছে মাত্র, সেই কালেও সেই দেশে এই সুরীয় পূজা-বিধি রচিত হয়। যখন পবিত্র পরম-প্রসাদের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য দ্বার রুদ্ধ রাখা আবশ্যক হইত, সেই কালে সুরীয় পূজা-বিধি রচিত হয়।

পরে পুরোহিত আর একবার হস্ত প্রক্ষালন করিয়া লোকদিগকে স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরোধ করেন।

দ্বিতীয় ভাগ।

পুরোহিত। হে আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু, হে মানব-কুল বল্লভ, অপদার্থ যে আমরা, সেই আমাদিগকে এবং এই সকল লোকদিগকে, আপনি এই ত্রাণের উপযোগী করিয়া লউন; যেন সমস্ত কাপট্য ও শঠতা হইতে বিমুক্ত হইয়া, শান্তি ও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া, আপনার অদ্বিতীয় পুত্র, আমাদের প্রভু, ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা যেশু-মশিহের দ্বারা আমরা পরস্পরকে পবিত্র ও স্বর্গীয় ভাবাপন্ন চুম্বন* সহ অভিবাদন করিতে পারি। তাঁহার দ্বারা, তাঁহার সহিত এবং আপনার পরমাত্মা কর্ত্তৃক, আপনার প্রতি মহিমা, সম্মান ও পরাক্রম আরোপিত হউক।

লোকগণ। তথাস্তু।

আচার্য্য তখন স্তোত্র ও প্রার্থনা সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা বিষয়ে একটী ক্ষুদ্র শিক্ষা দেন।

পুরোহিত। আপনার পবিত্র বেদী সমক্ষে অবনত স্কন্ধে যে সকল লোক উপস্থিত হইয়াছে, এই সকল লোকের প্রতি, হে একমাত্র দয়াল প্রভো, আপনি স্বকীয় প্রসাদ প্রেরণ করুন। স্বর্গ আপনার আবাসস্থল, কিন্তু সামান্য ব্যক্তিদের প্রতিও আপনার দৃষ্টি; আপনার একমাত্র পুত্র মশিহের প্রসাদ, সৌজন্য ও প্রেম হেতু আপনি উহাদের আশীর্ব্বাদ করুন। তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার সহিত আপনার মহিমা হউক।

লোকেরা। তথাস্তু।

পুরোহিত। হে পিতা ঈশ্বর, আপনি মনুষ্য জাতির প্রতি আপনার অপার ও অনির্ব্বচনীয় প্রেম হেতু জগতে আপনার পুত্রকে প্রেরণ করিয়া বিধান করিয়া দিয়াছেন যেন পথভ্রষ্ট মেষগণ পুনরায় সুপথে আইসে; আমরা যতক্ষণ এই গণ্ডীর ও শোণিত-রহিত বলিদান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিব, ততক্ষণ আপনি আমাদের প্রতি বিমুখ হইবেন না। কারণ আমরা আমাদিগের স্বকীয় পুণ্যের উপর নির্ভর না করিয়া আপনার দয়ার উপর নির্ভর করি। এ কারণ, আমরা আপনার প্রসাদ যাচ্ঞা ও ভিক্ষা করিতেছি, যেন এই নিগূঢ় কার্য্য, যাহা আমাদের পরিত্রাণের জন্য বিহিত হইয়াছে, আপনার লোকদিগকে দণ্ডার্হ না করিয়া, বরং ইহাদিগের পাপমোচন, অপরাধ মার্জ্জনা এবং আপনার অদ্বিতীয় পুত্রের প্রসাদ ও কমনীয় দয়া দ্বারা বরলাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। তাঁহা দ্বারা ও তাঁহার সহিত আপনার মহিমা হউক।

লোকেরা। তথাস্তু।

আচার্য্য। যে প্রেম ও ভক্তি ঈশ্বর সমক্ষে গ্রাহ্য, সেইরূপ প্রেম ও ভক্তি সহকারে, আপনারা পরস্পরে পরস্পরের নিকটস্থ ব্যক্তিকে অভিবাদন করুন। আসুন, আমরা সবিনয়ে, তদ্গতচিত্তে, সভয়ে ও

* নূতন সংহিতাতেও স্থানে স্থানে খ্রীষ্টীয়ানদিগের পবিত্র চুম্বন সহ অভিবাদন করিবার প্রথার উল্লেখ আছে। গ্রীক মণ্ডলীতে পুরোহিত ধর্ম্ম পুস্তকের উপর প্রত্যেকের চুম্বন গ্রহণ করিয়া মন্দিরে উপস্থিত সকল লোকের নিকট অগ্রসর হয়েন। ধর্ম্ম-পুস্তকের উপর ক্রুশার্পিত প্রভুর চিত্র বা মূর্ত্তিই সকলে চুম্বন করে। মালাবার মণ্ডলীতে ধূপের ধূম লইয়া একজন অন্য জনের মুখের সমক্ষে হস্ত ধারণ করে, এবং ধূপ-গন্ধযুক্ত হস্ত চুম্বন করাই এই মণ্ডলীর নিয়ম।

সকম্পে প্রার্থনা করিতে করিতে, সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান থাকি। স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, এবং পবিত্র আত্মা এই নিগূঢ় পদার্থদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হইয়া উহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন। অহো! দেবগণ ও সুরগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া কি ভয়ানক স্থানে আমরা এক্ষণে দণ্ডায়মান রহিয়াছি! যে সকল দেবতা ও প্রেতাত্মা জ্বলন্ত অগ্নি সদৃশ, তাঁহাদের নিশি-পালনের ও পূজার সহচরত্ব ও ভ্রাতৃত্ব আমরা লাভ করিলাম! প্রত্যুত যে কেহ এই নিগূঢ় বস্তু গ্রহণ করিতে সাহস করিবে, তাহাকেই যে গ্রহণ করিতে আসিতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই; কারণ তিরস্করিণী উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, এবং যে কেহ শুদ্ধ অন্তঃকরণে ও পরিচ্ছন্ন বিবেকে প্রার্থনা করিতেছে, তাহারই উপর প্রসাদ প্রবাহিত হইতেছে এবং দয়া আপ্লুত করিয়া দিতেছে।

[এই সময়ে পুরোহিত তিরস্করিণী (পর্দ্দা) উঠাইয়া দেন ও তিন বার লোকদিগের উপর লক্ষ্য করিয়া ক্রুশ চিহ্ন করেন, ও কহেন।]

পিতার প্রেম, পুত্রের প্রসাদ ও পবিত্র আত্মার আবেশ, তোমাদের সকলের সহিত বর্ত্তমান থাকুক।

লোকগণ। তথাস্তু।

পুরোহিত। তোমাদের হৃদয় উত্তোলন কর।

লোকগণ। হৃদয় আমাদের উন্নত হইয়াছে।

পুরোহিত। আইস আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি।

লোক। ইহাই উপযুক্ত ও বিহিত।

পুরো [প্রণত হইয়া] আপনার মহিমা করা, আপনার কল্যাণ কীর্ত্তন করা, আপনাকে বন্দনা ও পূজা করা, আপনার প্রশংসা করা, সর্ব্বতোভাবে যোগ্য, বিধেয়, উপযুক্ত ও আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। যিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল প্রাণীর স্রষ্টা, স্বর্গ ও স্বর্গোপরি স্বর্গ ও তন্মধ্যগত শক্তিপুঞ্জ যাঁহাকে মহিমা করিয়া থাকে; সূর্য্য ও চন্দ্র ও তারকামণ্ডলী, পৃথিবী ও সমুদ্রচয় ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু, স্বর্গীয় যেরুসালেম, প্রথমজাতদের মণ্ডলী (যাঁহাদের নাম স্বর্গে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে) দেবতাগণ, প্রধান দেবতাগণ, রাজ্যধর, মান্যমান, সিংহাসনবাসী চক্রবর্ত্তী, আধ্যাত্মিক শক্তিপুঞ্জ, স্বর্গীয় বলবিন্যাস, সহস্রাক্ষ ও ষট্‌পক্ষ দেবগণ, যাঁহারা দুইটী পক্ষ দ্বারা আপনাদিগের আস্য এবং অপর দুইটী পক্ষ দ্বারা আপনাদিগের পদ আবৃত করিয়া, অপর দুইটী পক্ষ দ্বারা একত্র উড্ডীয়মান হইয়া, অনবরত উন্মুক্ত ওষ্ঠাধরে স্বর্গীয় অনর্গল বাক্যে, জয়নাদ, গরিমাধ্বনি ও স্তুতি গান করিয়া, উল্লাসিত স্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে কহেন—

লোকগণ। পবিত্র! পবিত্র! পবিত্র!

পুরোহিত। [প্রণত হইয়া] হে অনাদিরাজ, আপনিই প্রকৃতরূপে পবিত্র এবং পবিত্রতার বিধাতা; আপনার অদ্বিতীয় পুত্র আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা য়েশু-মশিহ ও পবিত্র; আপনার পবিত্র পরমাত্মা যিনি সকল বিষয়ের নিরীক্ষক, হে পিতা ঈশ্বর, আপনারও যিনি আভ্যন্তরিক নিরীক্ষক, তিনিও পবিত্র। আপনি সকলের আধার, সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময়, এই জন্য আপনিই পবিত্র। আপনার পুত্র-সহ আপনি পবিত্র, যে পুত্র আপনার হস্তকৃত সামগ্রী মনুষ্যের জন্য নির্য্যাতনের সহভাগী হইয়াছিলেন। হে মঙ্গলময় ঈশ্বর, মনুষ্যকে আপনিই মৃত্তিকা হইতে গঠিত করিয়া আনন্দ-ময় মন্দারকাননে উহার আবাসস্থান স্থির করিয়া দিয়াছিলেন; আর ঐ মনুষ্য যখন পাপাচার দ্বারা পতিত হইল, তখন উহাকে ত্যাগ না করিয়া অতি কমনীয় কৃপার অধিষ্ঠাতা বলিয়া আপনি উহার হস্ত ধরিয়া পুনরায় উঠাইয়া লইলেন। বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা উহাকে আপনি আহ্বান করিলেন; দৈবজ্ঞগণ দ্বারা আপনি উহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন; শেষে আপনার প্রতিকৃতি পুনঃস্থাপন করিবার জন্য আপনি জগতে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রেরণ করিলেন; যিনি অবতীর্ণ হইয়া পবিত্র আচার দ্বারা পুণ্যবতী চিরকুমারী ঈশ্বর-জননী * মারিয়ম হইতে দেহ-ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন; যিনি মনুষ্য সন্তানদের সহিত বাক্যালাপ করিয়া যাহা কিছু মনুষ্যকুলের ত্রাণের জন্য আবশ্যক, বিধান করিলেন।

এই সময়ে পুরোহিত দণ্ডায়মান হইয়া পিষ্টক-খণ্ড লইয়া কহেন,—তাঁহার ঘোর

* পূজা-বিধিটীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এই আর একটী নিদর্শন। খ্রীঃ ৪০০ শতাব্দীতে কনষ্টাণ্টিনোপলের পেট্রিয়ার্ক প্রথমে যীশুখ্রীষ্টের মাতা ঈশ্বর-জননী নামে অভিহিত হইতে পারেন না, এই আপত্তি উত্থাপন করেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মালাবর খ্রীষ্টীয়ানেরা নেষ্টোরিয় দল হইতে বিশপ্ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইঁহারা পূর্ব্বেকার পূজা-বিধির কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না। নেষ্টেরিয় মতের প্রতিকূল প্রাচীন মত এই স্থলে পূজা-বিধি সম্বলিত হইয়া থাকিয়া গেল। অথচ অদ্যাবধি মালাবার খ্রীষ্টীয়ানেরা নেষ্টোরিয় মতাবলম্বী বলিয়া কাথলিকদের দ্বারা নিন্দিত হইয়া আসিতেছে।

ক্লেশ-কর মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস তিনি আপন পবিত্র হস্তে পিষ্টক লইয়া, হে প্রভু য়েশুর পিতা, সকলের অধীশ্বর, তিনি আপনারই প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আপনার স্তুতিবাদ করিয়া † ধন্যবাদ করিয়া † পাবন কার্য্য সহ † উহা বিভক্ত করিলেন, এবং শিষ্যগণকে দিয়া কহিলেন, লও, ইহা হইতে তোমরা সকলে আহার কর, কারণ

† ইহা আমার দেহ †

পরে পুরোহিত পরম-প্রসাদ পাত্রে স্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ-সহ পান-পাত্র উঠাইয়া লইয়া কহেন—এইরূপে নিশি-ভোজনাবসানে তিনি আপন পুণ্যহস্ত দ্বারা এই পান-পাত্র লইয়া, হে ঈশ্বর, আপনার স্তুতিবাদ করিয়া, † ধন্যবাদ সহকারে উৎসর্গ করিয়া, আপন শিষ্যদিগকে এই বলিয়া প্রদান করিলেন, লও, ইহা হইতে তোমরা সকলেই পান কর, কারণ ইহা নূতন সন্ধি সম্বন্ধীয় আমার রক্তের পাত্র (যাহা চিরদিবসের জন্য ধর্ম্মের নিগূঢ় বিষয়), যে রক্ত তোমাদের জন্য ও অনেকের জন্য পাপ মোচনার্থ পাতিত।

লোকেরা। তথাস্তু।

পুরোহিত। ইহা আমার স্মরণার্থ করিও; কারণ আমি যতদিন না পুনরায় আগমন করি, তত দিন যখনই তোমরা এই পিষ্টক ভোজন করিবে এবং এই পান-পাত্র স্থিত মিশ্রিত পানীয় পান করিবে, তখনই আমার মৃত্যু প্রচার এবং আমার পুনরুত্থান স্বীকার করা হইবে।

লোকেরা। হে প্রভো! আপনার মৃত্যু আমরা স্মরণে রাখিব।

† এই এই স্থলে পুরোহিত ক্রুশ চিহ্ন করেন।

পুরোহিত। হে প্রভো, এই ভাবে আপনার মৃত্যু স্মরণ করিতে করিতে, শমন সদন হইতে তৃতীয় দিবসে আপনার পুনরুত্থান স্মরণ করিতে করিতে, পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে আপনার অবস্থান স্মরণ করিতে করিতে এবং ভৈরব-বিক্রমে ও মহিমাতে আপনার দ্বিতীয় আগমন,—যে আগমনে আপনি পবিত্রাত্মাদ্বারা জগতের বিচার করিয়া প্রত্যেক লোককে কর্ম্মানুসারে পুরস্কার দিবেন,—সেই আগমন স্মরণ করিতে করিতে, আপনার উদ্দেশে আমরা এক্ষণে এই ভয়কর, অথচ রক্তপাত শূন্য, বলিদান উৎসর্গ করিতেছি। অতএব, হে প্রভো, আমাদের পাপানুসারে আপনি আমাদের সহিত ব্যবহার না করিয়া, আমাদের কদাচারানুসারে আমাদের প্রতিফল না দিয়া, আপনার অনুচরগণ, আপনার লোকগণ, আপনার প্রজাগণ, আপনার নিকট, আপনার দ্বারা, ও আপনার সহবর্ত্তী হইয়া, পিতার উদ্দেশে এই যে অনুনয় বিনয় করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন।

লোকগণ। হে ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান পিতা, দয়া করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন।

পুরোহিত। হে প্রভো, আমরা আপনার দুর্ব্বল ও কলুষিত দাসগণ আপনাকে ধন্যবাদ দান করিতেছি, সকলের জন্য ও সকলের হইয়া, আপনার স্তুতিবাদ করিতেছি।

লোকগণ। আমরা আপনার প্রশংসা, আপনার মহিমা, আপনার আরাধনা করিতেছি; আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে প্রভো ঈশ্বর, আপনি আমাদের প্রতি কৃপা করুন, এবং আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

পুরোহিত। সাধুদের মধ্যে বিশেষরূপে আমরা পুণ্যবতী মহিমান্বিতা, চির কুমারী, ধন্যা, ঈশ্বর-জননী মারিয়ার স্মরণ কীর্ত্তন করিতেছি।

আচার্য্য। হে প্রভো, তাঁহার অকপট পবিত্র প্রার্থনা সমুদায় আপনি স্মরণে রাখিয়া, ঐ সকলের কারণ, আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন ও আমাদের কথায় কর্ণপাত করুন।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

প্রেম।

প্রবন্ধ প্রারম্ভে বিষয়ের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করায় লেখক ও পাঠক উভয়েরই সুবিধা দেখা যায়। লেখক প্রথম হইতে বিষয়ার্থ স্থিরীকৃত হওয়ায় ভিন্ন অর্থে একই শব্দ প্রয়োগ করেন না এবং পাঠকও তজ্জন্য আদ্যোপান্ত বেশ বুঝিতে পারেন। কিন্তু মনস্তত্ত্বালোচনায় দেখা যায়, আদি সাধারণ (Primary General Idea) ভাবগুলির সংজ্ঞানিরূপণ করা বড়ই কঠিন। কারণ অনেক সময়ে সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে হইলে জাতি ও বিশেষত্ব (Genus and differentia) নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু অদ্বিতীয় হওয়ায় তাহা সম্ভবে না। সেই জন্য অনেক সময় কেবল মাত্র গুণ বা কার্য্য বর্ণনা করিয়াই আমাদের ক্ষান্ত হইতে হয়। বলা বাহুল্য, নিম্নলিখিত প্রবন্ধের বিষয় প্রেম সম্বন্ধে উপরি উক্ত কথাপ্রযুজ্য।

নিত্য বস্তুর প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগের নাম প্রেম। চিৎবৃত্তি, প্রেমবৃত্তি ও কর্ম্মবৃত্তি মানবমনের বৃত্তিত্রয়ের নাম। জ্ঞান চিৎবৃত্তির কার্য্য, ধ্যান, ধারণা, প্রভৃতি ইহার কার্য্য প্রসূত। ভক্তি, ভালবাসা, আনন্দ প্রেমবৃত্তির কতগুলি রূপান্তর মাত্র। আর ইচ্ছা, পূজা অর্চ্চনা, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মবৃত্তির অনুশীলন-সম্ভূত।

সহজভাবে বুঝিতে গেলে কোনও ক্রিয়া বিশেষে দেখাইতে হয়। এই প্রবন্ধ শুনিলে অনেক বিষয়ের জ্ঞান হয়, তাহা চিৎবৃত্তির হেতু। আনন্দ বা তদ্বিপরীত ভাবের উদয় হয়, তাহাই প্রেমবৃত্তির কর্ম্ম এবং আরও শুনিবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা জন্মে, ইহাই হইল তৃতীয় বৃত্তির কার্য্য।

জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলনের কারণ অনুসন্ধানেচ্ছা এবং সন্দেহ, ফল নিশ্চয়তা। প্রেমবৃত্তির স্ফূর্ত্তির কারণ সৌন্দর্য্যবলোকন, ফল শান্তি। কর্ম্মবৃত্তি অতৃপ্ত বাসনায় জন্মে, ফলে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। মনস্তত্ত্বালোচনার ইহা স্থান নহে, সেই জন্য উল্লিখিত বিচার পরম্পরার অবতারণা করা গেল না। তবে ইহা স্বীকার করিতে বোধ হয় কাহার আপত্তি হইবে না যে, বিশ্বাসের উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া প্রেমবৃত্তি মনের যথার্থ শান্তি প্রদান করিতে পারে। সম্বিৎ, হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ভাব ভেদে ভগবানের শক্তিত্রয়ের নাম। ইহাদেরই আংশিক স্ফুরণ মানব মনে বৃত্তিত্রয়ের অস্তিত্বের কারণ।

প্রেম অভিন্ন পদার্থ হইলেও পাত্রভেদে ইহার দুইটী বিভাগ কল্পনা করিতে পারা যায়। পরা ও অপরা।

আত্যন্তিক ভগবৎপ্রেমের নাম পরা প্রেম।

কোন্ সময় হইতে মানব মনে এই প্রেমের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এখন নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ। মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশে যখন পার্থিব ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া মানব পূর্ণ মহত্ত্বের লীলা-বিলাসে আকৃষ্ট হইল, জগতের সেই এক মাহেন্দ্রক্ষণ। সে দিন মানব পৃথিবীর প্রাকৃতিক সুষমাহিল্লোলে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আংশিক স্ফুরণ দেখিতে পাইল, সেইদিন যে জগতের অতি শুভদিন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মনুষ্যভাগ্যে কবে যে সুদিন ঘটিয়াছিল, তাহা এখন নিশ্চয় করিবার উপায় নাই। আর করিবার প্রয়োজনই বা কি? পুরাতত্ত্ব সমালোচনায় জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলন ব্যতীত বিশেষ উপকার আর কি আছে?

এই ভাবকলিকা ক্রমে ক্রমে যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, জগতের ইতিহাসে আমরা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাই। স্থাবর জঙ্গমে, স্রোতস্বিনীর জল কলকলে সেই ভগবানের লীলা যে আমরা অনুভব করি, ইহাও ত তাহারই পরিচায়ক। বৈদেশিক মহা পণ্ডিতগণ এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমাদিগকে মূর্ত্তিপূজক, প্রকৃতিপূজক প্রভৃতি নানা আখ্যা প্রদান করিলেও যথার্থতঃ এ সকল ভাব যে প্রেমপ্রবণতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না।

আমরা ব্যাস প্রণীত বেদান্ত শাস্ত্রের দ্বৈতভাষ্যে ইহার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। জড়, চেতন ও শ্রীকৃষ্ণ এখানে আদি পদার্থত্রয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন। যাহা হউক, নির্গুণ ও সগুণ ভেদে এই বিশ্বজনীন প্রেমের দুইটী বিভাগ কল্পনা করা যায়।

ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রেম ও ভক্তি প্রায় তুল্যার্থ জ্ঞাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্যও আছে। শ্রেষ্ঠের

প্রতি অনুরাগের নাম ভক্তি। সমানের প্রতি প্রেম। ভক্তিতে কিছু যেন দূরত্ব, বা পরত্ব এবং সেই হেতু ভয় মিশ্রিত থাকে। প্রেমে সে টুকু থাকে না, তাই সে বড়ই মধুর, বড়ই সুন্দর। সেই নির্গুণ প্রেম-নিঃসৃত নির্গুণ ভক্তির লক্ষণ ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"মদ্‌গুণ শ্রুতি মাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে,
"মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ
"লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
"অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
৩ স্কন্ধ, ২৯ অ, ১১ শ্লো।

আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে সর্ব্বান্তর্যামী যে আমি আমাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে সমুদ্রগামী গঙ্গা সলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধান-রহিতা এবং ভেদদর্শন-বর্জিতা মনের গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।

ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত এই প্রেমই শ্রেষ্ঠ প্রেম। যে প্রেমিক এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাঁহারা

"সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং নগৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥
৩।২৯।১১

এইরূপ ভক্তি ও প্রেম সাধনের উপায় ভাগবতে ৩ স্কন্ধে, ২৯ অধ্যায়ে, ১৩শ শ্লোক হইতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

এইরূপ ভক্তি স্পৃহনীয় হইলেও আয়াস-সাধ্য। সত্ত্ব, রজ ও তম ভেদে তিনগুণ। মানবমাত্রই এই ত্রিগুণাশ্রিত। বহু সাধনের বলে ও ফলে এই ত্রিগুণাতীত হইতে পারা যায়। ত্রিগুণাতীত না হইতে পারিলে নির্গুণ ভক্তির কল্পনা আকাশকুসুমবৎ অসম্ভব।

শ্বেত বা নীলবর্ণ সাত্ত্বিক গুণের লক্ষণ, জ্ঞান, শান্তি, ইহার কার্য্য; ইহা প্রকাশাত্মক। গীতায় সত্ত্বগুণের বিষয়ে লিখিত আছে—

"সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্"
গীতা—১৪ শ অধ্যায়, ৬ শ্লোক।

রজঃগুণ রক্তবর্ণ। রজোগুণ কর্ম্মাত্মক বা চেষ্টাত্মক; ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। গীতায় আছে "রজঃ কর্ম্মণি" (১৪শ), ৬ শ্লোক, কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণ নিরোধাত্মক। মোহ ইহার লক্ষণ। মোহ সম্বন্ধেও লিখিত আছে—

"অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহএবচ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥
১৪শ, ১৩ শ্লোক।

যাহার যে গুণ প্রধান, তাহার ভক্তি তৎগুণানুমত বিভিন্ন হইবে। তাই শাস্ত্রে বলে—

"স্বভাবগুণ মার্গেণ পুংসাংভাবোবিভিদ্যতে।"
৩।২৯।৬

সূর্য্যরশ্মি এক বর্ণ বিশিষ্ট। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট দর্পণে প্রতিভাত হইয়া বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। তদ্রূপ সেই ভগবদ্‌প্রেমও একরূপ, নির্গুণ, সাত্ত্বিক। কিন্তু বিভিন্ন গুণাশ্রিত মানব মনে প্রতিভাত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রতীয়মান হয়।

গীতায় এই মর্ম্মের উক্তি দেখিতে পাই

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম।"
১৪শ অঃ, ৫শ্লোক।

এই সকলই সগুণ প্রেম এবং এই নিঃসৃত ভক্তিই সগুণ ভক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তামসিক গুণের লক্ষণ লিখিত আছে—

"অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্য মেববা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ।
৩।২৯।৭

হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্য্য করিয়া ক্রোধী পুরুষ ভেদ দর্শন পূর্ব্বক ভগবানে যে ভক্তি করে, তাহাই তামস ভক্তি এবং সেই প্রেমই তামস প্রেম। মোহ বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এইরূপ হইয়া থাকে। রাজস প্রেম নিঃসৃত রাজস ভক্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"বিষয়ান অভিসন্ধায় যশঃ ঐশ্বর্য্য মেববা
অর্চ্চাবর্চ্চয়েম্মোমাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ।
৩।২৯।৮

ভগবানাতিরিক্ত অপর দ্রব্যে স্পৃহা বা যশঃ কিম্বা ঐশ্বর্য্য অভিসন্ধি করিয়া ভেদ দর্শন পূর্ব্বক প্রতিমাতে যে অর্চ্চনা করে, অর্থাৎ ভক্তি করে, তাহা রাজস।

কেহ যেন মনে না করেন যে, এখানে প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে কোনও কথা সূচিত হইয়াছে। ভগবান উভয়ে প্রণয় সম্পদ আকাঙ্ক্ষা বা যশঃ আকরণেচ্ছায় এই প্রণয় পূজাই দূষণীয়; অন্য ভা[illegible] নহে।

সগুণ উৎকৃষ্ট ভক্তিই সাত্ত্বিক ভক্তি, তাহার লক্ষণ লিখিত আছে—

"কর্ম্মনির্হার মুদ্দিশ্যপরস্মিন্ বাতদর্পণং
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথবাভাবঃ সমাত্বিকঃ।
৩।২।৯।৯

আর কর্ম্মনিহার অর্থাৎ পাপক্ষয় বা ভগবৎপ্রীতিকাম হইয়া ভগবানেতে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া অথবা নিত্যবিধি প্রাপ্ত প্রযুক্ত অবশ্যই যজ্ঞ করিতে হইবে, ইত্যাদি বিধি উদ্দেশ করিয়া ভেদদর্শন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে অর্থাৎ ভক্তি করে, তাহাই সাত্ত্বিক প্রেম প্রণোদিত সাত্ত্বিক ভক্তি।

এই উপরি বর্ণিত ত্রিবিধ সগুণ ভক্তিরই একটী বিষয়ে ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই ত্রিবিধ ভক্তিতেই "পৃথকভাবঃ" ভিন্ন দর্শন আছে। তবে অবস্থা বিশেষে কাম্যের প্রভেদ আছে। অহেতুকীভক্তি যাহা পূর্ব্বে নির্গুণ ভক্তির লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ফলাভিসন্ধান আদৌ নাই। ইহাতে তাহা বর্ত্তমান আছে। সাত্ত্বিক ভক্তিরও স্তর আছে। যথাক্রমে পাপক্ষয় উদ্দেশে, ভগবৎ প্রীতি, বা বৈধ আচরণ উত্তম। অর্থাৎ যে কেবল "বৈধ কর্ম্ম করিতেছি" এই ভাবে ভক্তি করিতে পারে, সে শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক। যে "ভগবানের প্রীত্যর্থ" এই ভাবে করে, সে মধ্যম এবং যে "আমার পাপক্ষয় হউক" এই ভাবে ভক্তি করে, সে অধম সাত্ত্বিক। যেমন "শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘণ" বিধি, সেইরূপ সাধনও শনৈঃ কর্ত্তব্য, অন্যথা অসম্ভব।

এইরূপে ত্রিবিধ ভক্তিই উত্তমাধম মধ্যম ভেদে এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্ত্যঙ্গভেদে একাশীতি প্রকার বিভিন্নভাবে কল্পিত হইয়া থাকে, বাহুল্য ভয়ে এখানে অবিচারিত রহিল।

মানবের প্রায়ই দেখা যায়, একটী না একটী ভাব প্রবল। যাহার যে ভাব প্রবল, হিন্দুশাস্ত্র তাহার জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কারণেই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ত্রিবিধ মার্গের অবতারণা। ভক্তি বা প্রেমমার্গের আবার বহু বিভাগ আছে। যে ভাবে যে সাধন করে, সেই ভাবেই সে গন্তব্যস্থানে যাইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রে সকল ভাব সাধনেরই ব্যবস্থা আছে। সম্পর্কভেদে প্রেম সাধনেরও অষ্টবিধ কল্পনা করা যাইতে পারে, মাতৃভাবে, পিতৃভাবে, ভ্রাতৃ বা সখ্য ভাবে পত্নীভাব, উপপত্নীভাব, দাস্যভাব, বাৎসল্যভাব, এবং শত্রুভাব। শাক্তেরা মাতৃভাবে, শৈবেরা পিতৃভাবে, অর্জ্জুন, শ্রীদাম প্রভৃতি সখ্যভাবে, সত্যভামা কুব্জা পত্নীভাবে, ব্রজাঙ্গনারা উপপত্নীভাবে, হনুমান

দাস্যভাবে, নন্দযশোদা বাৎসল্যভাবে এবং রাবণ, হিরণ্যকশিপু শত্রুভাবে সাধন করিয়া, ছিলেন। তাই বলি, হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় এমন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম আর নাই। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ভেদ দৃষ্ট হইলেও অন্তরে ভেদ নাই। শুদ্ধ প্রস্থানভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র। যে ভাবেই সাধন করা যাউক, গন্তব্য একই, একই শান্তির শীতল ছায়া সকলেরই শেষ বিরামস্থল। নানা নদ-নদী যেমন নানাদিকেশ "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা" করিয়া শেষে একই সমুদ্রে মিলিত হয়, মানবগণও সেইরূপ নানা মার্গে নানা রূপ সাধন করিয়া নানা সম্পত্তি লাভ করতঃ শেষে একই শান্তিময়ের পদপ্রান্তে চিরবিশ্রাম লাভ করে।

মহিম্নস্তবে এই ভাবটী কেমন সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে, শুনুন—

"ত্রয়ী সাংখ্যংযোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
"প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি,
"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানা পথজুষাং
"নৃ ণামে কোগম্যস্ত্বমসি পয়স অর্ণবইব।"

বেদত্রয়, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র, পশুপতিমত (শৈব), বৈষ্ণব মত ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থানে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। কিন্তু স্রোতস্বিনীর ঋজু, কুটিল নানা পথ দ্বারা সমুদ্রগমনের ন্যায় রুচি বৈচিত্র্যময় মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন পন্থাদ্বারা তুমিই একমাত্র প্রাপ্তব্য।

যে ভাবেই হউক, প্রেম সাধনের সাধারণ উপায় এবং সাধকের লক্ষণ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে কেমন সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুবিধার জন্য অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত হইল।

"ইষ্টভাবে হৃষ্ট নহে যাহার অন্তর,
"অনিষ্টে বিদ্বেষ নাই সম নিরন্তর,
"ইষ্টনাশে শোক নাহি করেন যে জন
"লাভের বিষয়ে যাঁর লোভশূন্য মন
"শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান যিনি
"নিঃসংশয় ধনঞ্জয় মম প্রিয় তিনি।"
"শত্রু মিত্রে, সুখে দুঃখে মান অপমানে
"সমভাবে থাকে যাঁর অনাসক্ত মনে
"স্তুতিনিন্দা সমজ্ঞান অল্প কথা কন
"সামান্যে সন্তোষ পূর্ণ সর্ব্বদা যেজন
"অতুল ঐশ্বর্য্যে থাকি গৃহশূন্য যিনি
"স্থিরমতি ভক্তিমান মম ভক্ত তিনি॥"

পরা প্রেম স্পৃহনীয় হইলেও সর্ব্বদা মানব জগতে উহার প্রাধান্য দেখা যায় না। আমরা দেখি, মানব কি মোহিনী ডোরে মানব ও অমানব বস্তুতে বদ্ধ, এই মায়া কত মূর্ত্তিতেই বিরাজিত। এই অনিত্য বস্তুর প্রতি অনুরাগই অপরাপ্রেম। জগতে ইহার আধিপত্য অত্যন্ত প্রবল। উপকারিতা বলে— ও বলিতে পারি না।

"স্বভাবগুণ মার্গের প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত যে, যে বিষয় কখনও বহিঃ বা অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূতা না হইয়াছে, তাহার লৌকিকজ্ঞান আদৌ হয় না। অপরা প্রেমের ইহাতেই উপকারিতা কল্পিত হয়। বাৎসল্য ভাব সাধনের পূর্ব্বে গুরু শিষ্যকে জগতের বালকমাত্রই বাল-গোপাল মূর্ত্তিতে ভগবানের অবতার এই শিক্ষা দিলেন, শিষ্যও তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া সাধন করিতে লাগিল। সুতরাং দেখিতেছি, এখানে অপরাপ্রেমই পরা প্রেমের সোপান্। তাই বলি, নিকৃষ্ট হইলেও অপরাপ্রেমের উপকারিতা আছে।

উপরেই দেখিয়াছি, দুই বিভাগে ইহাকে বিভক্ত করা যায়। মানবে মানবে এবং মানব ও মানব বস্তুতে:

এই মানবীয় প্রেমের মধ্যে উপজাতি

করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই জগতে নরনারী কি এক মোহিনী ডোরে বদ্ধ। উভয়ের চরিত্রগত পার্থক্য দেখিলে কতই বিভিন্নতা দেখিতে পাই। এই সকল জাতিবিভাগ করিতে কত মার্জ্জিত মস্তিষ্ক পণ্ডিত জগতের আদিকাল হইতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন।

চরিত্রগত পার্থক্য হইতে আমরা প্রধানতঃ দুইটী বিভাগ কল্পনা করিতে পারি।

প্রথমতঃ বিরুদ্ধ সভাবসম্পন্ন (Complementary character) ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যে প্রেম। তোমার কোনও গুণ আছে, আমার তাহা নাই + তোমাতে আমাতে প্রেম হইবে। কথাটী একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইবে। এক জন গায়ক অপর একজন সঙ্গীতানভিজ্ঞ। উভয়ে প্রণয় হয়। বৈষম্যনিয়মে বা অনুকরণেচ্ছায় এই প্রণয় সঞ্জাত হয়, তাহা আমরা অবগত নহি। যাহাতেই হউক, সে আকর্ষণ যে মহাবলবান, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ প্রেম প্রায়ই শীঘ্রই সঞ্জাত হয়।

দ্বিতীয় সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যে প্রেম। আমার কোনও গুণ আছে, তোমার তাহা অধিকমাত্রায় আছে, তোমায় আমায় প্রেম হইবে। বোধ হয় সমভাবাপন্নতা বশতঃ সহানুভূতিই এ প্রেম উৎপাদনের কারণ। এ প্রেম সঞ্জাত হইতে কিছু বিলম্ব লাগে। কারণ কোনও গুণ বিশেষের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা এবং তাহার আপেক্ষিক আধিক্য (relative greatness) নির্ণয়ে সময় লাগা স্বাভাবিক। Tennyson এর Ænoch Æarden যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, এই তথ্য উহাতে কেমন প্রকটিত হইয়াছে। Ænoch এবং Annic পূর্ব্বভাবের প্রণয়ী, Annic এবং Philip শেষ প্রকারের।

বাঙ্গালায় "মাধবীকঙ্কণে" রমেশ বাবু কতকটা ঐ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বাঙ্গলার ছাঁচে ইংরাজী যতটা ঢালা চলে, রমেশ বাবু উহাতে তাহার প্রয়াস পাইয়াছেন। উহাতে হেমলতা ও নরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বভাবের প্রণয়ী, হেমলতা ও শ্রীশচন্দ্র শেষপ্রকারের, আর জেলেখার নরেন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসা বুঝি উভয়ের সংমিশ্রণ।

চরিত্রগত এই দুই বিভাগের প্রত্যেকটী আবার গুণজ রূপজ ভেদে দুই প্রকারের হইতে পারে।

প্রথমতঃ জ্ঞান মূলক বা (reason based) প্রেমিকের গুণাবলী জ্ঞানবৃত্তির দ্বারা যথাযথ বিচারিত হইয়া তাহার মধ্যে উত্তমাধম স্থিরীকৃত হইয়া যে প্রেম সঞ্জাত হয়, তাহাই জ্ঞানমূলক ভালবাসা। ইহা সঞ্জাত হইতে বিলম্ব হয়। কারণ গুণাবলীর অস্তিত্ব প্রভৃতি উপলব্ধি হইতে সময় লাগা স্বাভাবিক। তাহার পর জ্ঞানবৃত্তির পরিচালন দ্বারা উত্তমাধম বিচার, শক্তি ও সময় সাপেক্ষ।

দ্বিতীয়তঃ ইহা না হইয়া অনেক সময়ে কেবল মাত্র কোনও গুণের প্রথম জ্ঞান মাত্র বা শারীরিক রূপলাবণ্য দর্শন মাত্র ভালবাসার ন্যায় আকর্ষণে মানব আকৃষ্ট হয়। রূপবতীর রূপজ মোহ এই প্রকারের। এই তরল ভাবে মূলক বা (or feeling based) প্রণয় প্রায়ই ক্ষণস্থায়ী। নবীনার নবযৌবন তরঙ্গ ভঙ্গের চারু সুষমানিঃসৃত আনন্দহিল্লোল যৌবন পরিপুষ্ট অঙ্গের পরিণতির সহিত হ্রাস হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই ভালবাসারও

হ্রাস হয়। কিন্তু গুণ বিচার পূর্ব্বক যে প্রেম তাহার হ্রাস সম্ভবে না। বরং ব্যবহারে গুণাবলীর অধিকতর জ্ঞান জন্মে এবং তৎসহিত ঐ প্রেম বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এ বিষয়ে বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষে বলিয়াছেনঃ—

"মনের অনেক গুলিন্ ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্ম সুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হই, তাহাকেই প্রকৃত ভালবাসা বলে। "স্বতঃ প্রস্তুত হই" অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগ লালসা ভালবাসা নহে * * * এ বৃত্তিও জগদীশ্বর প্রেরিতা। ইহার দ্বারাও সংসারের ইষ্ট-সাধন হইয়া থাকে এবং ইহা স্বর্ব্বজীব মুগ্ধকারী * * কলিদাস,বায়রণ, জয়দেব ইহার কবি * * * প্রেম বুদ্ধি বৃত্তি মূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধি বৃত্তির দ্বারা পরিগৃহীত হয় হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকর্ষিত এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মায়। ইহার ফল সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্ম বিস্মৃতি ও আত্ম বিসর্জন; সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, মাদাম্ দেস্তাল ইহার কবি।"

"বিষবৃক্ষে" এ তথ্যটী সুন্দর রূপে দর্শিত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর প্রেম গুণজ প্রেম, সেই জন্য চিরস্থায়ী। নগেন্দ্র নাথ ও কুন্দর প্রেম নগেন্দ্রনাথের পক্ষে রূপজ মোহ, সেই জন্য শীঘ্রই বিকার জন্মিয়াছিল।

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, অনেক স্থলে রূপজমোহ হইতে যথার্থ প্রণয় জন্মে। রূপজ মোহে আকৃষ্ট হইয়া সঙ্গ করিতে করিতে ক্রমে হয় ত গুণাবলী বিদিত হইতে পারা যায়, তখন রূপজ আকর্ষণ প্রণয়ে পরিণত হয়।

প্রেমের জাতি বিভাগ যেরূপেই করা যাউক, আমরা দেখিতে পাই, একটা না একটা গুণের অযথা পক্ষপাত প্রেমের একটা বিষম দোষ। প্রেমিক একটী কোনও গুণ বা বিশেষ গুণাবলীর উপর অযথা প্রয়োজনীয়তা আরোপ করেন। যেন সেই একটী গুণ হইলেই যথেষ্ট হইল। অদৃষ্ট বশে সেরূপ হইলে সুখের হয়, কিন্তু অনেক সময়ে বৈপরীত্য ঘটে।

"দীনবন্ধু বাবুর" কমলেকামিনী যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। শিখণ্ডি কাব্যে নীলাম্বুজ নয়নার কথা পড়িয়াছেন, তাই তিনি আযৌবন নীলাম্বুজ নয়নার পক্ষপাতী। তাই যখন রণকল্যাণীর সহিত তাঁহার প্রথম দর্শন হইল, তখন তিনি অন্য কিছু দেখিলেন না, কেবল দেখিলেন।—

"ইন্দীবর বিনিন্দিত বিশাল নয়ন
মুখ সুখ সরোবরে ভাসিছে কেমন।"

ইংরাজিতে যে বলে Hero is blind, কথাটা পূর্ণ সত্য না হইলেও অনেকাংশে ঠিক। আমাদের বোধ হয়, প্রণয় একদেশদর্শী, ইহারই কথা উপরে উক্ত হইয়াছে। যথার্থ প্রেমে স্থান, কাল, অবস্থা বা পাত্রাপাত্র বিচার থাকেনা। প্রেমে প্রেম চাহে অর্থ বা অন্য বিষয়ে যথার্থ প্রেমের লক্ষ্য থাকে না। সামাজিক জাতি বর্ণভেদ যথার্থ প্রেমে নাই। বিল্ব মঙ্গল ঠাকুরে এ তথ্যটী প্রকটিত দেখিতে পাই।

প্রেম সহজাত বৃত্তি হইলেও পরিপুষ্টির জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। আবাল্য সংসারে এই বৃত্তির অনুশীলন অলক্ষিত ভাবে হইতে থাকে। যেখানে শৈশবে অনুশীলন না হয়, সেখানে হৃদয় অবর্দ্ধিত রহিয়া যায়। "কপালকুণ্ডলায়" আমরা এ বিষয়টী বেশ বুঝিতে পারি।

প্রকৃতিপালিতা কপালকুণ্ডলা আবাল্য কখনও সংসারী মানবকে ভালবাসিতে পায় নাই। তাই সে যৌবনে ভালবাসিতে পারিল না। তাহার ভালবাসা বৃত্তি মুকুলে শুকাইয়া গিয়াছিল। তাই সে নবকুমারের সঙ্গে থাকিয়াও সেই বনশোভা ভুলিতে পারিল না; তাই যখন শ্যামাসুন্দরী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে বলিল যে, সে পূর্ব্বের ন্যায় মুক্তভাবে প্রকৃতিশোভা উপভোগ করিতে পারিলে সুখী হয়।

এই মানবীয় প্রেমেও রাজসিক, তামসিক ও সাত্ত্বিক ভেদ দৃষ্ট হয়। প্রেমের সহিত অস্থিরতা, দারুণ হিংসা, ঈর্ষা, অতৃপ্তপ্রেমে বৈরনির্য্যাতন ইচ্ছা রাজসিক প্রেমের লক্ষণ। মাধবীকঙ্কণে জেলেখার প্রেম এই শ্রেণীর।

প্রেমে মোহ, কার্য্যনাশ, চিত্তবিক্ষেপ, এ সকল তামসিক প্রেমের লক্ষণ। সীতারামের শ্রীর প্রতি আকর্ষণ বুঝি এই পদবাচ্য। আর শান্ত নিরুদ্বিগ্নচিত্তের ভালবাসা, প্রেমের জন্য স্বার্থত্যাগ সাত্ত্বিক প্রেমের পরিচায়ক। পাঠক উপমা চান ত একবার চন্দ্রশেখরের শেষ দৃশ্য স্মরণ করুন। শবরাশির মধ্যে মুমূর্ষু প্রতাপ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; অনুসন্ধান করিতে করিতে রামানন্দ স্বামী গিয়া পৌঁছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রতাপ তুমি কি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে? উত্তর কবির মুখেই শুনুন।

"সুপ্তসিংহ যেন গর্জিয়া উঠিল। বলিল, কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসি * * * আমার ভালবাসার নাম আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা" হিংসা বা মোহে এ আকাঙ্ক্ষা উদ্ভূত হয় নাই, পরমঙ্গলার্থ স্বার্থবিসর্জ্জনেচ্ছায় এ ইচ্ছা সঞ্জাত হইয়াছিল।

অন্যত্র বঙ্কিম বাবু যে বলিয়াছেন, "সুখ আত্ম প্রতিষ্ঠায় নহে, আত্মবিসর্জ্জনে," সে সুখ সাত্ত্বিক পদবাচ্য, রাজসিক, বা তামসিক নহে।

যথার্থ সাত্ত্বিক প্রেমে বিকার জন্মিতে পারে না। ভোগে অন্যস্থলে তীব্র আসঙ্গলিপ্সা জন্মে, সাত্ত্বিক প্রেমে ক্রমে শান্তি উপজিত হয়। অবসাদ যথার্থ প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। যথার্থ প্রেমে সঙ্গলিপ্সা কখনও মিটে না। তাই শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন,

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিণু
নয়ন না তেরপিত ভেল।"

যথার্থ প্রেমিক কখনও দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে পারেন না। ভালবাসার বিকার ত দূরের কথা।

এই সমস্ত স্থলে অপরা প্রেম পরা প্রেমের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

গত শতাব্দীতে ফরাসী পণ্ডিত কোমৎ প্রেমের উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া সমাজ সংস্করণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাতাকে ভালবাস, পূজা করিতে শিখ, স্ত্রীকে ভালবাস, পূজা করিতে শিখ, ক্রমে স্বপরিবার ভালবাসা নিবদ্ধ না রাখিয়া স্বসমাজ, স্বজাতে ক্রমে পৃথিবীকে [illegible] পন পরিবার ভ[illegible] এবং সেইরূপ ভালবাসিতে শিখ। কোমতের আশা, এইরূপে ক্রমে ভবিষ্যতে আদর্শ সমাজ গঠিত হইবে। পূর্ণ মনুষ্যত্বকে ভগবদ্ভাবে পূজা করিতে শিখিলে সমাজ আদর্শত্বে সর্ব্বোচ্চ স্তরে উত্থিত হইবে। এই সমাজে আর অপর ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই।

মনুষ্যত্বই ঈশ্বর। ঈশ্বরস্থানে মনুষ্যত্বকে রাখিয়া ঈশ্বরত্ব লোপ করিয়া কোমৎ যে দর্শনের বীজ বপন করিয়া গেলেন, কালে তজ্জাত বৃক্ষে কুফল ফলিল। লোকে নাস্তিক হইল।

এক শতাব্দ পরে, বিলাতে হার্ব্বার্ট স্পেন্সর আবার স্বার্থ হইতে বিবর্ত্তন নিয়মে নিঃস্বার্থতার উৎপত্তি দেখাইয়া প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইলেন। পার্থিব জড়বস্তুগত বিবর্ত্তনে অপার্থিবভাব সঞ্জাত হইতে পারে কিনা, তদ্বিষয় আলোচনা করিবার ইহা সময় নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, অনেকের মতে তিনি প্রতিপাদ্য বিষয় অপরের অজ্ঞাতসারে মানিয়া লইয়াছেন।

এ সমস্ত বিরোধ যেরূপে ভঞ্জন করিতে পারা যায়, ভাগবতের ৩ স্কন্ধে কপিল দেবহুতি সংবাদে ২৬ অধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ উহা পাঠ করিবেন। তবে ইহার মূল কথাএক—

"সর্ব্বভূতেষু আত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি।"

এখানে আত্মন্ শব্দ সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় ভাবে ব্যাখ্যা করিলেই সমস্ত বিবাদের ভঞ্জন হইতে পারে। সমষ্টি ভাবে আত্মা ঈশ্বর, আর ব্যষ্টিভাবে মানব। অতএব সর্ব্বভূতে ভগবান আছেন। সর্ব্বভূত আমারাছি, আমার প্রিয় বা ভগবান তুল্য আমার এইরূপে প্রেম করিতে শিখিলে আর রূপজমোহ বা ধর্ম্মের বিরোধ [illegible] প্রণয় জন্মে। রূপজ মোহে আকৃষ্ট হইয়া থাকিতে কাহারে?

পৃথিবীতে: একটা নিয়ম দেখিতে পাই যে, কোন বিষয় একদেশগমন দোষে দূষিত হইলে প্রতিকার্য্য দ্বারা ভিন্নদেশগমন করে। কিন্তু ঘাতপ্রতিঘাত নিয়মের বশীভূত হইয়াই হউক বা কোনও প্রাকৃতিক নিয়মবলেই হউক, সেই নূতন কার্য্যও প্রায়ই ক্রমে একদেশগমন দোষে দুষ্ট হয়। অদ্বৈতবাদের প্রভাবে যখন ন্যায়ের কূটতর্কে নাস্তিকতার স্রোতে হিন্দুধর্ম্ম ডুবিয়া গেল, তখন প্রেম-যোগের আবির্ভাব হইয়া "প্রলয় পয়োধি জল" নিমজ্জন হইতে তাহাকে রক্ষা করিল। ক্রমে তাহারও অপব্যবহার হইল এবং প্রেমযোগ অনেক স্থলে কেবল মূর্খ-জনোচিত অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হইল। অবশ্য ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে।

জীবিত ও মৃতের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক আছে, তাহা মানবের নিজস্ব সম্পত্তি। নিম্ন প্রাণীদের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে। স্মৃতিরূপে বিরাজিত এই মধুর ভাব বড়ই প্রাণময়ী। অতীতের শান্তিময় অঙ্ক হইতে কত অর্দ্ধ-বিস্মৃত মধুর ভাব আনয়ন করে। কতকাল পূর্ব্বে কোনও মহাত্মা গতাসু হইয়াছেন, আমরা এখনও কেমন তাঁহার জন্য প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকি। প্রেমের অবিনশ্বরত্বের আর প্রকৃষ্টতর প্রমাণ কি হইতে পারে?

অপরা প্রেমের মধ্যে মানবে মানবে যে প্রেম, তাহার বিষয়ে দুই এক কথা আলোচনা করা হইল। ইহাদের বিশেষত্ব এই, এখানে অনেক সময়ে আদান প্রদান উভয়ই হইয়া থাকে। এই আদান প্রদানই জগতের সুখের কারণ। বঙ্কিম বাবু কপালকুণ্ডলার প্রেম সম্বন্ধে [illegible] এক স্থলে বলিয়াছেন, "আদান প্রদানই জগতে সুখের কারণ" দ্বিতীয় কারণ নাই। মানব ও অমানব বস্তুর সহিত যে ভালবাসা জন্মে, তাহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এখানে প্রদানই আছে, আদান নাই। প্রাণ ভরিয়া কোনও বস্তুকে ভালবাসিলাম, সেত তাহার প্রতিদান করে না।

প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য্যে আমরা বিমোহিত হই। প্রাণের ভাষায় যাহা পাঠ করি, হৃদয়ের ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে প্রয়াস করি। তাহারই ফলে কবিতার সৃষ্টি।

শারদী-জ্যোৎস্না-বিধৌত যমুনার স্বচ্ছ তরঙ্গ-ভঙ্গে পূর্ণ সুধাংশুর অংশুমালা কত রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়; তাহা দেখিয়া কত প্রেমিক হৃদয় নাচিয়া উঠে। নীলাচলে চন্দ্রকর সমুজ্জ্বল বীচিবিক্ষেপে কৃষ্ণপ্রেমের লীলা দেখিয়া ভগবান গৌরাঙ্গদেব বিভোর হইয়াছিলেন। বাসন্তী রজনী শেষে দূরস্থ স্রোতস্বিনীর জলকলকলের মলয়-সমীর-বাহিত অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি সুপ্তোত্থিত প্রবাসীর হৃদয়ে কিবা ভাব-মন্দাকিনীর ধারা ঢালিয়া দেয়। আজীবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আমরা বিমোহিত হই, কিন্তু কৌমুদীস্নাত তরঙ্গের বা জলকলনিনাদের সহিত আনন্দের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা কি আমরা নিশ্চয় করিতে পারি? সত্য বটে, মনের অবস্থা বিশেষে ভাবের তারতম্য হইয়া থাকে। মৃতপুত্রা জননীর যে তরঙ্গভঙ্গ নিনাদে মৃত পুত্রের "আধভাস" মনে পড়ে, প্রেমিকের প্রাণে তাহা হয়ত কোনও পরিচিত প্রেমাস্পদের ভাবময়ী সঙ্গীতের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলেও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যাবলীর সহিত হৃদয়ের এই সমস্পন্দনে কত যেন জন্মান্তরীণ স্থির সৌহার্দ্যের কথা আমাদের মানসপথে উদিত হয়। তাহা অস্বীকার করিতে পারি না।

এই সমস্পন্দনের কারণ নির্ণয় করা দুরূহ। বিশ্বজনীন প্রেম মানবের সহজাত নিজস্ব সম্পত্তি। আমাদের বোধ হয়, জগতের এই সকল দৃশ্যপটে আমরা বিশ্বজনীন প্রেমের আধারভূত ভগবানের সৌন্দর্য্য অঙ্কিত দেখিতে পাই। তাই জড় প্রকৃতিও এত আনন্দের উৎপাদনে সমর্থ হয়।

কেহ কেহ এই ভাবে মাতোয়ারা হইয়া, প্রেমই একমাত্র পদার্থ মনে করেন। বিলাতী কবি শেলী বুঝি এইরূপ প্রেমের লীলাবিলাস পার্থিব বস্তুমাত্রেই দেখিতেন। "মহিলা" নামক কাব্য-রচয়িতা তাহার উক্ত কাব্যের উপক্রমণিকায় প্রেমের উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া কেমন জগতের বিবর্ত্তন দেখাইয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

যথার্থ প্রেম হইতে প্রেমময় ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সুন্দর পদার্থ আমরা ভালবাসি। এই ভালবাসা মনুষ্যের সহজাত বৃত্তি। পাত্রভেদে ইহার দুই পক্ষ—যে ভালবাসে এবং যাহাকে ভালবাসে। মানব ভালবাসে, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। তবে ভালবাসার পাত্র কে, সে বিষয়ে মতবিরোধ হইতে পারে। অনিত্য পরিবার, সমাজ প্রভৃতি সমস্তই শাস্ত্রোল্লিখিত পঞ্চবিধ ক্লেশ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি নানাদোষ-দুষ্ট, কাজেই যথার্থ প্রেমের পাত্র হইতে পারে না। কেবল সেই নিত্য পূর্ণ সুন্দর ঈশ্বরই যথার্থ প্রেমের পাত্র।

শাস্ত্রে ঈশ্বরের লক্ষণ আছে,—

"ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।" পতঞ্জলি, ১ পাদ সূ-২৪।

তে উপরোক্ত দোষ এই পুরুষে নাই, নব-দোষাভাব হেতু তিনি অনিন্দ্যসুন্দর; সেই হেতু যথার্থ প্রেমের পাত্র।

জাতি, উপজাতিগত অনেক কথাই উক্ত হইল। এখন জিজ্ঞাস্য, বাস্তবপক্ষে প্রেমের বিভিন্নতা আছে কিনা? অর্থাৎ কাহারও সন্তান অবলোকনে মনের হর্ষ এবং অর্থ

লাভ-জনিত আনন্দ, উভয়ে বাহ্যবস্তু সম্বন্ধ বশতঃ পার্থক্য বাদ দিলে শুদ্ধ প্রেমাংশে কোনও পার্থক্য থাকে কিনা? ইংরাজী দার্শনিক বেন্থাম (Benthem) প্রেম বা ভালবাসার ষড়্‌গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের সংঘাত বশতঃ পার্থক্য কল্পনাও করিয়াছেন। অনেকের মতে মানসিক বৃত্তি বা ভাবের নাম যে প্রেম, তাহাতে কোনও পার্থক্য নাই। তবে বাহ্য বস্তু বিশেষের সহিত আধার আধেয় ভাবে নিবদ্ধ হওয়ায় প্রেমের জাতিগত বিভিন্নরূপ কল্পনা করিতে পারা যায়। আমাদেরও ইহাই সমীচীন বোধ হয়।

আসুন পাঠক, প্রবন্ধশেষে সেই প্রেমময় ভগবানকে প্রণাম করি।

যাঁর প্রেমডোরে বাঁধা
এই বিশ্ব চরাচর।
যাঁর প্রেমে রবিশশী,
ভাতিছে পৃথ্বী অম্বর॥
যাঁর প্রেম, মায়ারূপে
ভাব মন্দাকিনী চিতে।
যাঁর প্রেম, কর্ণধার
ভবজলধি তরিতে॥

শ্রীহেমচন্দ্র বসু।

রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য।

রামকৃষ্ণ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত গ্রন্থকার। তাঁহার পিতা রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার নবদ্বীপের সুবিখ্যাত স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সমসাময়িক। রঘুনন্দন ও রামভদ্র উভয়েই রামভদ্রের পিতা শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহা হইতে অনুমিত হইতেছে যে, রামভদ্রের পুত্র রামকৃষ্ণ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিলেন। রামকৃষ্ণের রচিত স্মৃতিগ্রন্থগুলি "কৌমুদী" নামে পরিচিত। রামকৃষ্ণের প্রপিতামহ ন্যায়ার আচার্য্য খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মিথিলা হইতে আগমন করিয়া, ভাগীরূপজ বর্তীরস্থিত নবদ্বীপে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই শ্রীকর বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূতবাহনের উল্লিখিত প্রাচীন মৈথিল পণ্ডিত শ্রীকর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি। প্রাচীন শ্রীকর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মিথিলায় আবির্ভূত হন। পঞ্চাদশ শতাব্দীতে যে শ্রীকর মিথিলা হইতে আগমন করিয়া, বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হন, তিনি দায়াধিকার সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে শ্রীকর জীমূতবাহনের দায়ভাগ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে রাজকুমার বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জীমূতবাহন খ্রীষ্টীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন* !! রাজকুমার বাবুর এই মত অসার ও অমূলক বলিয়া 'জীমূতবাহন' প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকর আচার্য্য প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "ব্যাখ্যামৃত" নামে অমরকোষের টীকা রচনা করেন।

শ্রীকর আচার্য্যের পুত্র শ্রীনাথ। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি চৈতন্য দেবের গুরু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সমসাময়িক। শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি জীমূতবাহনের রচিত 'দায়ভাগের' প্রাচীনতম টীকাকার। তাঁহার রচিত 'স্মৃতিতত্ত্বার্ণব,' 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক,' 'শুদ্ধিবিবেক,' 'কৃত্যকাল-বিনির্ণয়,' 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' ও 'নৈষধপ্রকাশ' বিদ্যমান আছে।

* R. K. Sarvadhikári's *Tagore Law Lectures for 1880, p. 400.*

শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির কৃত 'স্মৃতিতত্ত্বার্ণব' ও 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' গ্রন্থের অনুকরণে, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবিংশতি 'স্মৃতিতত্ত্ব' রচিত হয়। স্বরচিত 'দায়ভাগ-টিপ্পনী' গ্রন্থের আরম্ভে শ্রীনাথ আপনাকে 'প্রাচীরত্ন' উপাধিতে পরিচিত করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টাক্ষরে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে তাঁহার জন্ম হয়। মিথিলা শ্রীনাথের জন্মস্থান নহে। তিনি মৈথিল স্মার্ত্ত পণ্ডিত হইলে, স্বদেশ-প্রচলিত 'মিতাক্ষরার' টীকা না লিখিয়া, তদ্বিরোধী দায়ভাগের 'টিপ্পনী' লিখিতে যাইতেন না।

"নব্য-নিরধর-নীলমুল্লসচ্চঞ্চলা-রুচিরুমেদুরাম্বরং।
নৌমি বাঙ্-মনসয়োরগোচরং চিন্ময়ং মুরহরাহ্বয়ং মহঃ
জীমূতবাহন-নিবন্ধমথো বিরুদ্ধ-
-প্রায় প্রসিদ্ধ-মুনি বৃদ্ধ-বচঃ-সমাধি
দুর্ব্বোধমত্র বিষয়ে নিতরাং ময়াতৎ
ব্যাখ্যায়তে হশিত মতি-প্রতিবোধ-হেতোঃ॥
শ্রীকরাচার্য্যপুত্রেণ প্রাচীরত্নেন ধীমতা।
টিপ্পনী দায়ভাগস্য শ্রীনাথেন বিধীয়তে॥" (দায়ভাগ-টিপ্পনী)

"শ্রীকরাচার্য্য পুত্রেণ শ্রীনাথেন সতাং মুদে।
বিবেকঃ শুদ্ধিবিষয়ে ক্রিয়তে পরমাদরাৎ॥"
(শুদ্ধিবিবেক)

প্রণম্য কামদং রামং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।
প্রায়শ্চিত্ত বিবেকোঽয়ং শ্রীনাথেন বিধীয়তে॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীকরাচার্য্য-সূনু-শ্রীনাথাচার্য্য-বিরচিত প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ সমাপ্তঃ।"
(প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে কালাকাল ও বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠেয় বিবিধ কার্য্য কলাপের বিবরণ বিস্তারিত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

"শ্রীগোবিন্দ-পদাম্ভোজ দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্ব সাধ্য ন্যায়ালঙ্কার
বন্দে বৃন্দারক-ধুনী-মকরন্দ-মনোহরং॥ ঘরংশ
শ্রীকরাচার্য্য পুত্রেণ শ্রীমচ্ছ্রীনাথ শর্ম্মণা।
প্রীতয়ে বিদুষাং চক্রে কৃত্যকাল বিনির্ণয়ঃ॥
বিচার্য্য বাচো মুনিপুঙ্গবানাং
নিবন্ধজাতঞ্চ মহার্ণবাদ্যং।
ময়া কৃতঃ কালবিনির্ণয়োঽয়ং
সদা বুধানাং মুদমাতনোতু॥
কৃত্যতত্ত্বার্ণবো নাম নিবন্ধো রচিতো ময়া।
প্রীয়ন্তামত্র বিবুধা ব্যবস্থা-রত্নরাশিভিঃ॥"
(কৃত্যতত্ত্বার্ণব)

শ্রীনাথ আচার্য্যের রচিত নৈষধ কাব্যের প্রথম সাত সর্গের টীকা মিথিলার অন্তঃপাতী দারভাঙ্গা জিলায় মুজোনা গ্রামে বাবুলাল পাঠকের গৃহে বিদ্যমান আছে।

"শ্রীমন্নারায়ণং নত্বা কাব্যে শ্রীহর্ষনির্ম্মিতে।
প্রকাশনং যথাপ্রজ্ঞং শ্রীনাথেন বিধীয়তে॥
প্রণম্য মৌলিনা বন্দ্যান্ সম্প্রদায়বিদঃ সতঃ।
ত্যাজ্যং ত্যাজ্যং অসদ্ব্যাক্যং সদল্পমপি লিখ্যতে॥
কে সদর্থমজানন্তো বৃথাবচনবিস্তরৈঃ
দূষয়ন্তি কবেঃ কাব্যং ধিক তান্ পণ্ডিতমানিনঃ॥"
(নৈষধপ্রকাশ)

এই শ্রীনাথ আচার্য্য সম্ভবতঃ "কোষ্ঠী-প্রদীপ" রচনা করেন। তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। এই পুস্তিকার আরম্ভে তিনি আপনাকে শ্রীনাথ ভট্ট নামে পরিচিত করিয়াছেন। 'শূলপাণি প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শূলপাণি কোথায়ও আপনাকে ভট্ট এবং কোথায়ও ভট্টাচার্য্য উপাধিতে স্বরচিত পুস্তকে পরিচিত করিয়াছেন। নবদ্বীপবাসী শ্রীনাথ আচার্য্যও এই গ্রন্থে আপনাকে 'ভট্ট' উপাধিতে পরিচিত করিয়া থাকিবেন।

'তচ্চিন্তামণিমা ত্রস্য প্রভাবাৎ প্রভবিষ্ণবে।
সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বায় কস্মৈচিৎ শ্রেয়সে নমঃ॥
তন্ত্রাণি যত্নেন বিমৃষ্য ভূয়সা
শুভপ্রভাবোজ্জ্বল সার কল্পনং।

লাভ-জনিত
বশতঃ পা ঃ সুরনিম্নগাতটে
ষ্ঠীপ্রদীপং বিদধে বিচক্ষণঃ ॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)
কোন
দ

শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির পুত্র রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার। তিনিও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সমসাময়িক গ্রন্থকার। রামভদ্র 'দায়ভাগ টীকা' ও 'দায়ভাগ-সিদ্ধান্ত-কুমুদচন্দ্রিকা' রচনা করেন। রাজসাহী জিলার বরিয়া গ্রামে পণ্ডিত মধুসূদন শিরোমণির গৃহে ১৬২৮ শকাব্দের (১৭০৬ খ্রীঃ) লিখিত এক খানি 'দায়ভাগ সিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা' বিদ্যমান আছে।

"আলোচ্য তাতনির্ম্মিত-নিবন্ধমারাধ্য বিশ্বেশ্বরং।
আর্য্যচার্য্য স্তনুতে বিবৃতিমিমাং দায়ভাগস্য ॥...
শ্রীরামভদ্ররচিতাং পাণৌ সংস্থাপ্য দীপিকামেতাং।
জীমূতবাহনকৃতের্গভীরার্থং বিদন্তু বিদ্বাংসঃ ॥

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায় শ্রীনাথাচার্য্যচূড়ামণি তনূজ-শ্রীরামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতা দায়ভাগ-টীকা সমাপ্ত।" (দায়ভাগটীকা)

সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক রামভদ্রের নাম পাওয়া যায়। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌম পিতার নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহুতর গ্রন্থ রচনা করেন। এই রামভদ্রের পুত্রের নাম হরিরাম তর্কবাগীশ। হরিরামের ছাত্র গদাধর। গদাধরের ছাত্র জয়রাম তর্কালঙ্কার। জয়রামের ছাত্র বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন। জগদীশ তর্কালঙ্কারের পুত্র রুদ্রেশ্বর রামভদ্র সিদ্ধান্ত বাগীশের পিতা।

অপর এক রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার যশোহরের রাজা সীতারাম রায়ের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন *। এই রামভদ্রের পুত্রের নাম শ্রীরামবাচস্পতি এবং পৌত্রের নাম মহাদেব ন্যায়বাগীশ। অনুমান ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে সীতারাম রায়ের জন্ম হয়। ১৭১৪ খ্রীঃ বঙ্গের নবাবের সেনাপতি সংগ্রাম সিংহ (সিংহরামসাহা), নাটোরের বিখ্যাত রঘুনন্দন ও দয়ারাম রায়ের সাহায্যে সীতারামকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করেন! এই কারাবাসে ভূষণার রাজা সীতারামের মৃত্যু হয়। সীতারামের পিতার নাম উদয় নারায়ণ বিশ্বাস। লক্ষ্মীনারায়ণ নামে সীতারামের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। সুরনারায়ণ ও শ্যামসুন্দর নামে সীতারামের দুই পুত্র জন্মে। 'বিশ্বাসখাস' নামক অতি হীন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশে সীতারামের জন্ম হয়। সীতারাম দশভুজা দেবী, হরেকৃষ্ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ নামে তিনটী বিগ্রহ বিভিন্ন দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬২১ শকাব্দে (১৬৯৯ খ্রীঃ) দশভুজা, ১৬২৫ শকাব্দে (১৭০৩ খ্রীঃ) হরেকৃষ্ণ, এবং ১৬২৬ শকাব্দে (১৭০৪ খ্রীঃ) লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির সীতারামের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহা হইতে সীতারাম রায়ের সময় নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইতেছে। সুরনারায়ণের পুত্রের নাম প্রেম নারায়ণ এবং পৌত্রের নাম রাধাকান্ত রায়।

"মহীভুজ-রস-ক্ষৌণী-শকে দশভুজালয়ং। (১৬২১)
অকারি শ্রীমতাসীতারামরায়েণ মন্দিরং ॥"
"বাস-দ্বন্দ্বাঙ্গ-চন্দ্রৈঃ পরিগণিত-শকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী (১৬২৫)
শ্রীমদ্বিশ্বাস-খাস-কুলোদ্ভবঃ কুলকমলোদ্ভাসকো ভানুতুল্যঃ।
অজস্রং সৌধযুক্তং রুচিররুচি-হরেকৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারামরায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ ॥"
"লক্ষ্মীনারায়ণ-স্থিত্যৈ, তর্কাক্ষিরস-ভূ-শকে। (১৬২৬)
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থং, সীতারামেন মন্দিরং ॥"

মুনিরাম রায় ঢাকা ও মুরসিদাবাদে নবাব দরবারে সীতারাম রায়ের পক্ষে উকীল নিযুক্ত ছিলেন। এই মুনিরামের পিতার

* নব্যভারত (১২৯৬), ৭। ৪৯৫ দেখুন।

নাম রামভদ্র। মুনিরাম ১৬১০ শকাব্দে (১৬৮৮ খ্রীঃ) ধুলজুড়ী গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। যশোহর জিলার অন্তঃপাতী মহম্মদপুরের দুই ক্রোশ উত্তরে ধুলজুড়ী গ্রামে এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। মুনিরামের প্রপৌত্র প্রাণনাথ রায়ের মুখে শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার এই শ্লোকটী শ্রবণ করেন *।

"স্বর্ণচন্দ্র রসেন্দৌ শকে কৃষ্ণচন্দ্রস্য মন্দিরং।
অকারি মুনিরামেণ রামভদ্রস্য সূনুনা ॥"

দায়ভাগের টীকাকার রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের কৃত "বিদ্বন্মোদিনী" নামে 'রঘুবংশ' কাব্যের টীকা এবং "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নাটকের 'শকুন্তলা-বিবৃতি' নামে টীকা বর্ত্তমান আছে। এই রামভদ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ "কৌমুদী" নামে বহুতর স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুত্রের নাম রাধাবল্লভ। এই রাধাবল্লভের পুত্র কাশীরাম বাচস্পতি স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দনের প্রণীত "স্মৃতিতত্ত্বের" টীকা রচনা করেন। রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর "তন্ত্র প্রমোদ" এবং রঘুমণি 'আগমসার' নামে তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। †

"ক্ব কালিদাস-কবিতা ক্বাহং মন্দমতি র্বটুঃ।
নির্ম্মিতৌ মধুচক্রস্য ন পতঙ্গঃ প্রতুর্ভবেৎ ॥"

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়-রামভদ্র-কৃতা অভিজ্ঞান-শকুন্তলা বিবৃতিঃ-সমাপ্তা। (শকুন্তলা-বিবৃতি)

"বিনায়কং নমস্কৃত্য সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনং।
রঘুবংশ-মহাকাব্য টীকাং কর্ত্তুং সমারভে ॥
ব্যাখ্যায়তে যথাশক্তি নির্ম্মৎসরাধিয়া ময়া,
এতেন প্রীয়তাং নিত্যং পরাত্মা রঘুনন্দনঃ ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীরামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য বিরচিতায়াং বিদ্বন্মোদিন্যাং রঘুবংশ টীকায়াং দ্বাদশসর্গঃ।" (বিদ্বন্মোদিনী)

এই প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের নিম্নলিখিত বংশাবলী প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শিত হইল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এবংবিধ প্রামাণিক বংশপত্রিকা সচরাচর পাওয়া যায় না।

শ্রীকর আচার্য্য
|
শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি
|
রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার
|
রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার — রামেশ্বর — রঘুমণি
|
রাধাবল্লভ
|
কাশীরাম বাচস্পতি

রামেশ্বর রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি শত পটলে "তন্ত্রপ্রমোদ" রচনা করেন। রঘুমণি রামভদ্রের ষষ্ঠপুত্র বলিয়া স্বরচিত "আগমসারে" আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

"যো জাতঃ পৃথিবীতলে দ্বিজকুল-স্রোতস্বতী-নায়কে
রাকা-নির্ম্মল-শর্ব্বরী-পরিবৃঢ়ঃ শ্রীরামভদ্রঃ কৃতীঃ।
ব্রাহ্মণ্যাজেব শৌর্য্যবীর্য্যনিচয়ৈ র্মহ্যাং মহীয়ানসৌ
বিদ্যাভিঃ প্রতিবাসরং কলুষিত-প্রত্যর্থি বিদ্বদ্গুণঃ ॥
ন্যায়ালঙ্কারনামা সুবিদিত সুকৃতাম্ভোধি ভূকীর্ত্তিপূর্ণ
প্রক্ষীণাঙ্ক-ত্রিযামাকর কর-নিকরো দিক্ষু সর্ব্বাসু যোঽয়ং।
ভট্টাচার্য্যঃ প্রসিদ্ধো নিখিলজনপদে জহ্নুকন্যা-প্রতীরে
শ্রান্তং স্বেষ্টামরাঙ্ঘ্রি-দ্বয়-সরসিরুহধ্যান-ধামৈকবন্ধুঃ ॥
দানৈ র্দৈন্যদরৌঘ-দারণ-পটু র্যো ভূমি নাকৌকসাং
খ্যাতশ্চ ক্ষিতিমণ্ডলেশ্বরগণৈঃ সংসেবিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়ঃ।
জ্ঞাত্বায়ং ক্রিয়তে ক্রিয়তেঽখিলাগম-মতং, তস্য দ্বিতীয়াত্মজ-
শ্রীরামেশ্বরশর্ম্মণা সুবিদুষা তৎপ্রমোদঃ শুভঃ ॥
রামেশ্বর-ভূমিসুর-কৃতে তন্ত্রপ্রমোদকে।
সংক্ষেপ-দীক্ষণবিধিঃসপ্তমঃপটলোগতঃ ॥" (তন্ত্রপ্রমোদ

* নব্যভারত (১২৯৪), ৫।৪৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
† Dr. R. L. Mitra's "*Notice of Sanskrit Mss.*," VII. 257, VIII 267, III. 103 and 139—141.

'তন্ত্রপ্রমোদে' রামেশ্বর আপনাকে রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। 'আগমসারে' রঘুমণি আপনাকে রামভদ্রের ষষ্ঠ পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিম্নে 'আগমসারের' দুইটী অনুপ্রাসপূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

"নাবদ্য-দ্যুম্ন-দান-দ্রুত-দলিতত-নসদ্-বিদ্য বিদ্বৎ সমুদ্যদ্
দারিদ্র্য দ্রাবিতারিদ্রুম বিল-বিলসৎ-সৎপ্রতাপৈ
র্বিসর্ব্বঃ।
ন্যায়ালঙ্কার-বিত্তি-র্বিবিধ-বুধবর ব্রাত-দুর্বোধ-বিদ্যা-
ব্যাখ্যানাব্যগ্রবুদ্ধি-ব্যথিত-দিবিষদাচার্য্যকো রামভদ্রঃ।
ভট্টাচার্য্যস্য তস্য স্বগুণগণ রবিম্লাণ গোত্রাম্বু-গাঢ়-
ধ্বান্তঃ স্বান্তান্ত-শান্তেন্দ্রিয়-বিকৃতি-বশী যঃ সুতঃ ষষ্ঠ
আসীৎ।।"

রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নানা বিষয়ে ব্যুৎপন্ন প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'কৌমুদী' নামে নানাশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মৈথিল দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্রের 'শাঙ্খতত্ত্ব-কৌমুদী'র অনুকরণে, "শাংখ্য-কৌমুদী" রচনা করেন।

"কৃষ্ণং প্রণমং পুরুষাৎ প্রকৃতেশ্চ পরং বিভুং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ রম্যেয়ং শাংখ্য কৌমুদী।"
(শাংখ্যকৌমুদী)

রামকৃষ্ণ মীমাংসা দর্শন সম্বন্ধে 'অধিকরণ কৌমুদী' বেদান্ত বিষয়ে 'ভাগবতকৌমুদী' এবং বাদার্থ সম্পর্কে 'শাব্দবোধপ্রক্রিয়া' রচনা করেন।

"নন্দসূনুং নমস্কৃত্য সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরং।
নিরূপ্যকহধিকরণং রামকৃষ্ণেণ বিশ্রুতং॥"
(অধিকরণ কৌমুদী)

"প্রণমং পরমং ব্রহ্ম দুরূহার্থ স্বরূপিনা।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ শ্রীভাগবত কৌমুদী॥"
(ভাগবত কৌমুদী)

"শ্রীরামং সানুজং নত্বা রামকৃষ্ণো বশংবদঃ।
প্রক্রিয়াং শাব্দবোধস্য কুর্ব্বে মত্যনুসারতঃ॥"
(শাব্দবোধ প্রক্রিয়া)

'মন্ত্রকৌমুদী' গ্রন্থে বিবিধ বৈদিক মন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। 'আগম কৌমুদী' ও 'আগমচন্দ্রিকা' পুস্তকে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মন্ত্রাদি দানের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, রামকৃষ্ণর 'আগমচন্দ্রিকা' ১৪৪৭ শকাব্দে (১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত হয়। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, রামকৃষ্ণ ও রঘুনন্দন একই সময়ে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন।

"নমস্কৃত্যাখিলৈ মন্ত্রৈর্বোধ্যং শ্রীপরমেশ্বরং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ রম্যা শ্রীমন্ত্র কৌমুদী॥"
(মন্ত্রকৌমুদী)

"সর্ব্বমন্ত্র সমারাধ্যং কৃষ্ণংন্যস্য হৃদাম্বুজে।
তন্যতে রামকৃষ্ণেন শ্রীমদাগম কৌমুদী॥"
(আগম কৌমুদী)

"প্রণম্য গুরুপাদাব্জং মুনি-বেদ-নৃপে শকে।
শ্রীরামকৃষ্ণঃ সংক্ষিপ্ত তনোত্যাগমচন্দ্রিকা॥"
(আগম চন্দ্রিকা)

"বিরোধভঞ্জনী" নামে মহাভারতের খণ্ডিত টীকা রামকৃষ্ণ রচনা করেন। আদি, সভা, আরণ্যক, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রাস্থানিক, স্বর্গারোহণ, ও হরিবংশ পর্ব্বের টীকা রাজসাহী জিলার বরিয়া গ্রামে মধুসূদন শিরোমণির গৃহে বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে কোন কোন টীকা ১৫৭৮ শকাব্দে (১৬৫৬ খৃঃ) লিখিত হয়।

"শ্রীকৃষ্ণায়ং নমস্কৃত্য মহাভারতবোধিনী।
বিরোধভঞ্জনী রামকৃষ্ণেণ তন্যতে॥"
(আদিপর্ব্বটীকা)

"প্রণিপত্য হরিংভক্তা সর্ব্বলোকেকপালকং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেন সভাপর্ব্ব প্রকাশিনী॥"
(সভাপর্ব্ব)

"প্রণিপত্য হরিং ভক্তা নীনেন্দীবর সুন্দরং।
ক্রিয়তে রামকৃষ্ণেণ ব্যাখ্যারণ্যক-পর্ব্বণঃ॥"
(আরণ্যক)

"ভগবন্তং নমস্কৃত্য ভক্তকাম্যপ্রদং হরিং।
বিরাটপর্ব্বব্যাখ্যানং রামকৃষ্ণেণ তন্যতে॥
(বিরাট)

ভগবন্তং নমস্কৃত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।
উদ্যোগ পর্ব্বব্যাখ্যানং রামকৃষ্ণেণ তন্যতে॥
(উদ্যোগ)

"নারায়ণং নমস্কৃত্য ভক্তাভীষ্ট ফলপ্রদং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ ব্যাখ্যানং ভীষ্মপর্ব্বণঃ॥
(ভীষ্ম)

"চক্রপাণিং নমস্কৃত্য সর্ব্বদা ভক্তপালকং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ ব্যাখ্যা সপ্তমপর্ব্বণঃ॥ (দ্রোণ)
"অর্জ্জুনাখনিয়ন্তারং নমস্কৃত্য হরিংপ্রভুং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ ব্যাখ্যানং কর্ণপর্ব্বণঃ॥ (কর্ণ)
"শ্রীকৃষ্ণ-চরণাম্ভোজে নিবেশ্য স্বাত্ম-ষট্পদং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ ব্যাখ্যানং শল্য পর্ব্বণঃ॥
(শল্য)

"প্রণম্য কৃষ্ণং বরদং বিশ্বকাম্যদ-নামকং।
ব্যাখানং দানধর্ম্মস্য রামকৃষ্ণেণ তন্যতে॥ (শান্তি)
"নারায়ণং নমস্কৃত্য কিরীটিজ্ঞানদীপকং।
পর্ব্বাশ্বমেধিকব্যাখ্যা রামকৃষ্ণেণ তন্যতে॥
(অশ্বমেধ)

"নারায়ণং নমস্কৃত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং।
ব্যাখ্যানং মোক্ষধর্ম্মস্য রামধকৃষ্ণেণ তন্যতে॥
(শান্তি)

"ভগবন্তং নমস্কৃত্য ধৃতগোপাললক্ষণং।
আশ্চর্য্যপর্ব্ব ব্যাখানং রামকৃষ্ণেণ তন্যতে॥
(হরিবংশ)

বর্দ্ধমান জেলায় বৈঁচির সন্নিহিত নিসিড়াগড় গ্রামে পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যারত্নের গৃহে মহাভারতের 'অর্থসংগ্রহদীপিকা' নামে পুস্তকের আদিপর্ব্বের টীকা বর্ত্তমান আছে। ইহা ঈশান মিশ্রের পুত্র অর্জ্জুন মিশ্রের রচিত। সত্যবোধের শিষ্য সন্ন্যাসী দেববোধের রচিত মহাভারতের তাৎপর্য্য দীপিকার আদিপর্ব্ব কলিকাতা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের গৃহে বিদ্যমান আছে। অর্জ্জুন মিশ্র দেববোধের শিষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি দেববোধের টীকা দর্শন করিয়া, স্বরিচত 'অর্থসংগ্রহদীপিকা' রচনা করেন। গ্রন্থারম্ভে অর্জ্জুন মিশ্র বেদব্যাস, বৈশম্পায়ন, দেববোধ, বিমলবোধ, সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ, ভট্ট শাণ্ডিল্য, মাধব ও নিজের পিতা ঈশান মিশ্রকে নমস্কার করিয়াছেন। ১৬০০ শকাব্দের মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষে বৃহস্পতিবার দুর্গারাম শর্ম্মা এই আদিপর্ব্বের টীকা নকল করেন। দেববোধ ও অর্জ্জুন মিশ্র খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গ্রন্থকার বলিয়া অনুমিত হয়।

"যস্যৈকবেণু পরমাণুরপি ক্ষণেন
ধাতুর্দধাতি বিপুলং শমমীপ্সিতেষু।
তন্নো হরের্হরতু পাদসরোরুহযুগ্মং
প্রারিপ্সিত প্রতিহতীরভিতশ্চিরায়॥

বেদব্যাস বৈশম্পায়ন দেববোধ বিমলবোধ সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ ভট্টশাণ্ডিল্য মাধব পিতৃপাদেভ্যো নমঃ।

শ্রীদেববোধ পাদাদিমতমালোক্য যত্নতঃ।
ক্রিয়তেহর্জ্জুন মিশ্রেণ ভারতার্থ প্রদীপিকা॥...

ইতি ভারতাচার্য্য পাঠকরাজ শ্রীমদীশানতনয় ভারতাচার্য্য মিশ্রার্জ্জুনকৃতৌ মহাভারতার্থদীপিকায়াং টীকায়াং আদিপর্ব্ব সমাপ্তং। শকাব্দা ১৬।

মাসে নভসি কৃষ্ণাখ্যে পক্ষে গুরুদিনে মুদা।
টীকেয়ং লিখিতা যত্নাৎ শ্রীদুর্গারামশর্ম্মণা॥"
(মহাভারতার্থ সংগ্রহদীপিকা)

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেও নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞের পরে অর্জ্জুন মিশ্র আবির্ভূত হন। নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ 'মন্বর্থবিবৃতি' নামে মনুসংহিতার সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করেন। ইহাতে তিনি গোবিন্দরাজের মনুভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বতন টীকাকারদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। অধ্যাপক বুলারের গবেষণায় ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের লিখিত নারায়ণের একখানি টীকা পাওয়া গিয়াছে।

নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতে সম্ভবতঃ আবির্ভূত হন। *

"শ্রীনারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ-কৃতিবৃত্তির্মনুস্মৃতেঃ।
কুনিবন্ধকৃতব্যাখ্যামিয়ং দূরে নিরস্যতে॥"

(মন্বর্থ-বিবৃতি)

নীলকণ্ঠ মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার। মহাভারত ভিন্ন ভগবদ্গীতা ও দেবী ভাগবতের টীকা নীলকণ্ঠের দ্বারা রচিত হয়। তিনি শ্রীধর স্বামীর পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হন। শ্রীধর স্বামী মহারাষ্ট্রদেশে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়া, পাণ্ডব প্রতাপ, রামবিজয় ও হরিবিজয় কাব্য সংস্কৃতে রচনা করেন। এই শেষোক্ত হরিবিজয় ১৪৯৩ শকাব্দে (১৫৭১ খ্রীঃ) সমাপ্ত হয়।† এই সকল মূল গ্রন্থ ভিন্ন শ্রীধর স্বামী ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের টীকা রচনা করেন। নীলকণ্ঠ এই শ্রীধর স্বামীর শিষ্য ছিলেন। স্বপ্রণীত দেবীভাগবতের টীকার আরম্ভ নীলকণ্ঠ যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, কাশীনাথ নামে তাঁহার আর এক গুরু ছিলেন। নীলকণ্ঠের পিতার নাম রঙ্গনাথ এবং মাতার নাম লক্ষ্মীদেবী। স্বরচিত বেদান্তভাষ্যে নীলকণ্ঠ বিখ্যাত রামানুজ আচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। নীলকণ্ঠের শিষ্য হরদত্ত খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শকাব্দীতে পশ্চিম ভারতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি আপস্তম্ব ও গৌতম স্মৃতির ভাষ্য ভিন্ন কালিকাবৃত্তির 'পদমঞ্জরী' নামে টীকা রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে মিত্র মিশ্র হরদত্তের "উজ্জ্বলা" ও "গৌতমীয় মিতাক্ষরা" হইতে নানা স্থান স্বরচিত 'বীরমিত্রোদয়ে' উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"নমঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদাব্জায়োকারিণে।
যস্য প্রত্যুপকারায় নম ইত্যেব কেবলং॥
শ্রীমল্লক্ষ্মবতীং লক্ষ্মীং মাতরং দেশিকোত্তমাং।
পিতরং রঙ্গনাথাখ্যং দেশিকোত্তমমাশ্রিয়ে॥
কাশীনাথং গুরুং নত্বা শ্রীধরাখ্যং গুরুংতথা।
অন্যে যে সন্তি গুরব স্তান্ সর্ব্বানভিবাদ্য চ॥"

(দেবীভাগবত টীকা।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের রচিত "স্মৃতিকৌমুদীর" অন্তর্গত 'সঙ্কল্পকৌমুদী', 'প্রায়শ্চিত্ত-কৌমুদী,' ও 'ব্রতোদ্যাপনকৌমুদী' পাওয়া গিয়াছে। শূলপাণি ভট্টের কৃত "প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক" অবলম্বনে রামকৃষ্ণ 'প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী' রচনা করেন।

"প্রণম্য রাধিকাকান্তং ভক্তাভীষ্ট প্রবর্ত্তকং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ রম্যেয়ং স্মৃতিকৌমুদী॥"

(স্মৃতিকৌমুদী)

"প্রণম্য কমলাকান্তং দেববন্দ্যপদাম্বুজং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ রম্যা সঙ্কল্পকৌমুদী॥"

(সঙ্কল্পকৌমুদী)

বিখ্যাত স্মার্ত্তকার হেমাদ্রির সংগৃহীত 'চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণির' অন্তর্গত 'ব্রতখণ্ড' অবলম্বনে, রামকৃষ্ণের "ব্রতোদ্যাপনকৌমুদী" প্রণীত হয়।

"প্রণম্য সারদাং দেবীং শরচ্চন্দ্র সম প্রভাং।
ক্রিয়তে রামকৃষ্ণেণ ব্রতোদ্যাপনকৌমুদী॥
হেমাদ্রিব্রত খণ্ডোক্ত-ব্রতানি কানিচিৎ খলু।
সমাদৃতাতি গৌড়েষু, তানি বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥"

(ব্রতকৌমুদী)

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এবং বারাণসীর স্মার্ত্ত পণ্ডিত রামকৃষ্ণ ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন। এই রামকৃষ্ণ ভট্টের পুত্র বিখ্যাত কমলাকর ভট্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে।

রামকৃষ্ণের পুত্র রাধাবল্লভ ভট্টাচার্য্য স্মৃতি অপেক্ষা সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই রাধাবল্লভের পুত্র ও রামকৃষ্ণের পৌত্র কাশীরাম বাচস্পতি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া, রঘুনন্দনের রচিত "স্মৃতি তত্ত্বের" টিপ্পনী রচনা করেন। কাশীরামের চরিত দায়, উদ্বাহ, একাদশী ও মলমাস তত্ত্বের 'টিপ্পনী' পাওয়া গিয়াছে। এই শেষোক্ত গ্রন্থের অন্তে কাশীরাম আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

"যং প্রাসূত সমস্তশাস্ত্রনিপুণঃ শ্রীরামকৃষ্ণাত্মজঃ
শ্রীরাধোত্তর বল্লভাখ্যঃ সুকৃতী সঙ্গীতচূড়ামণিঃ॥
তেন শ্রীমতা কাশিরামকৃতিনা যত্নেন নিষ্পাদিতা
টীকা নাতিসুশৃঙ্খলাপি কৃতিভিঃ সানুগ্রহৈ
দৃশ্যতাং॥" (মলমাসতত্ত্ব টিপ্পনী)

কাশীরাম বাচস্পতির ন্যায় রাধামোহন গোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতি, চিন্তামণি ন্যায়ালঙ্কার, এবং বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্তবাগীশ, স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের রচিত স্মৃতিতত্ত্বের টীকা প্রণয়ন করেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

*Dr. J. Jolly's *Tagore Law Lectures for 1883*, p. 9-10

† Journal of Bombay branch of Royal Asiatic Society, 1, 6.

বেদান্ত দর্শন ও অদ্বৈতবাদ।

দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিস্তার।

দর্শন শাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি-স্থান ভারতবর্ষ। এদেশে কেবল যে বেদান্ত প্রভৃতি ষড়্দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা নহে। যত প্রকার মূল দার্শনিক মত হইতে পারে, সে সমুদায়ই এই দেশে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল। তবে এই সকল বিভিন্ন দার্শনিক মত কোন সময়ে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, এবং কত দিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। সাধারণতঃ আর্য্যপণ্ডিত মাত্রে বিশ্বাস করেন যে, এই সকল বিভিন্ন মত অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত। তবে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেই সকল বিভিন্ন মত বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এবং যিনি যে মত প্রথম সংকলন বা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাঁহার নামেই সেই মত প্রচলিত হইয়াছে। এ কথা কতদূর সঙ্গত, তাহা এস্থলে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বেদ ও উপনিষদ মধ্যেই সকল প্রকার দার্শনিক মতের আভাষ পাওয়া যায়।(১) আস্তিক দার্শনিক মাত্রেই বেদের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। এমন কি, বৌদ্ধদর্শনও এই উপনিষদ্ ভিত্তির উপর স্থাপিত। (২) অতএব সকল প্রকার

(১) "The beginning of philosophical speculation goes back to a very remote age. Even in the songhita of the Rik we find hymns of high degree of reflection..."

Weber's History of Sanskrit Literature, p. 232.

(২) পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলিয়াছেন,—

His (Buddha's) hostility towards the Brahman's is much exaggerated, and we know by this time that most of his doctrines were really those of the upanishad's.

Vedant Philosophy, p. 113.

পণ্ডিত Rhys David তাঁহার Buddhism নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

It is certain that long before Goutama's time the Brahmans had paid great attention to the deepest questions ontology and Ethics, and were divided into different schools, in one or other of which most of Goutama's metaphysical tenets had previously been taught. (p. 34).

তিনি ঐ পুস্তকের অন্যত্র বলিয়াছেন,—

Goutama was born and brought u

দার্শনিক মতই এদেশে অনাদি বা স্মরণাতীত কাল প্রবর্ত্তিত, ইহা বলা যাইতে পারে।

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ হইতে পাওয়া যায় যে, ভারতে এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ঊনবিংশতি বা বিংশতি প্রকার প্রধান দর্শনিক মত প্রচলিত আছে। এই সকল বিভিন্ন মত ব্যতীত দর্শন শাস্ত্রে আর বড় নূতন মূল মত সৃষ্টি হইতে পারে না। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ফরাসি দার্শনিক কুজেঁ স্বীকার করিয়াছেন যে, "ভারতের দর্শন শাস্ত্র এত বিস্তীর্ণ, যে আমরা যথার্থই বলিতে পারি যে, ইহা সমগ্র দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসের সার সঙ্কলন মাত্র।"

ভারতে এই সকল দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্য কোন দেশে যে দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ নাই। যতদূর জানা যায়, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতের পূর্ব্বে অন্য দেশে প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের প্রচলন আদৌ ছিল না। ভারতে যখন দর্শন শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা হয়, তখন অন্য কোন দেশে এই শাস্ত্রের আলোচনা ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কথিত আছে, মিসর ক্যালডিয়া প্রভৃতি কোন কোন দেশে পুরোহিতগণ গুপ্ত বিদ্যা পরিজ্ঞাত ছিলেন। এরূপ হইতেও পারে যে, ঐ সকল দেশের লোক কতকাংশে ধর্ম্মের মূল সত্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা দর্শন শাস্ত্রের আদৌ আলোচনা করেন নাই। অন্ততঃ এরূপ আলোচনার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অনেকে হয়তঃ মনে করিতে পারেন যে, অতি প্রাচীন কালে মিসর, ব্যাবেলিন, টায়র প্রভৃতি দেশের অবস্থা অত্যন্ত উন্নত হইয়াছিল। এখনও মিসরের পূর্ব্বউন্নতির সাক্ষ্য পিরামিড্ রহিয়াছে। প্রাচীন ইতিহাসেও ঐ সকল জাতির উন্নতির কথা জানা যাইতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে এই মাত্র জানা যায় যে, ইহারা বাণিজ্য, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি বিদ্যার উন্নতি করিয়াছিল মাত্র। ভারত ব্যতীত অন্যত্র যে দর্শন শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা পূর্ব্বে হইয়াছিল, ইহা বলা যায় না। অনেকে বলেন, এই জগত কত দিনের কে বলিতে পারে? পৃথিবীর স্তরসংস্থান হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, প্রায় কোটী বৎসর পূর্ব্বে এ পৃথিবীতে মানুষ বিদ্যমান ছিল। পঞ্চাশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানুষ যে কতকটা সভ্য ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। (৩) তাহা হইলে

and lived and died a Hindu. He was not an enemy to Hindusm. There is not much in the metaphysics and psychology of Goutama which cannot be found in one or other of the orthodox systems, and great deal of his morality could be matched in earlier or later Hindu books (p. 84).

জর্ম্মনি পণ্ডিত ওয়েবার (Weber) সাহেব বলিয়াছেন,—

"Buddhistic doctrine was originally identical with Sankhya system.....The doctrine promalgated by Jagyabalka in Brihadaranyaka are also completely Buddhistic as also that of the Atharva Upanishad of the Joge system."

Weber's History of Sanskrit Literature, p. 252.

সুতরাং বৈষ্ণব বা শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ন্যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশ্বজনীন সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্গত। উপনিষদে পাওয়াযায় যে, "অসদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ।" এই শ্রুতির উপর বৌদ্ধদের শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত।

আর বৌদ্ধদিগের মতে গৌতম বুদ্ধই শেষ বুদ্ধদেব। তাহার পূর্ব্বে অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং গৌতম বুদ্ধের বহু পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ দার্শনিক মত সকল প্রচলিত ছিল—ইহা বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন।

(৩) লায়েন, লাবক প্রভৃতি প্রায় সকল আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের এইরূপ মত। ১৮৮৫ সালের

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে যে দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা হয় নাই, এবং ভারত ব্যতীত অন্য দেশে যে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা হয় নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না। আমরা এই সম্বন্ধে এই মাত্র বলিব যে, এই রূপ অনুমান নিষ্ফল। ইহা অবলম্বন করিয়া কেহই বলিতে পারেন না যে, আমাদের দেশে দর্শনালোচনার পূর্ব্বে অন্য কোন দেশে দর্শনালোচনা হইয়াছিল—অথবা সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বরং আমাদের দেশের অতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতেই দেখা যায় যে, অনাদি বা স্মরণাতীত কাল হইতেই এ দেশে বেদের প্রচার ছিল, ও বিভিন্ন দার্শনিক মতের প্রচলন হইয়াছিল। আমাদের দেশের শাস্ত্রই কেবল পৃথিবী বা মানব জাতির কাল নির্ণয় প্রভৃতি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। তাই শাস্ত্রের কথা একেবারে অবিশ্বাস না করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, ভারতের বেদ যেমন আদি পুস্তক, তেমনি ভারতের দর্শনই আদি দর্শন শাস্ত্র ও ভারতেই দর্শন শাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি।

যখন ভারতে প্রথম জ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ হয়, তখন পৃথিবীর প্রায় অন্য সকল দেশ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সে সকল দেশের লোক অশিক্ষিত, অসভ্য বা অর্দ্ধ শিক্ষিত ছিল। নগ্ন দেহ, আমমাংসভোজী, পশুতুল্য আণ্ডামানবাসী জাতি হইতে, পরকাল ও আত্মচিন্তা বা দর্শনশাস্ত্র-আলোচনানিরত জাতিতে পরিণত হইতে হইলে সভ্যতার কত বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়, ও তাহার জন্য কতযুগের সাধনা ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। পুরাকালে ভারত ব্যতীত যে সকল দেশ উন্নতি সোপানে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কোন জাতি যে সকল স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া ভারতের ন্যায় উন্নতির শেষ স্তরে আসিতে পারিয়ছিল, তাহার কোন রূপ প্রমাণ নাই।

মানুষ ও সমাজের উন্নতির নিয়ম কতকটা একরূপ। 'বাঙ্গালীর অবনতির কারণ' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে লিখিত হইয়াছিল,—

"আদিম অবস্থায় মানুষের জ্ঞানে দুইটী বিষয় প্রতিভাত হয়—আপনি ও জগৎ। তখন মানুষ বাহ্যজগতের দ্বারা চারি দিক হইতে বিপর্য্যস্ত হয়। বাহ্য জড়শক্তির সহিত তাহাকে অবিরত সংগ্রাম করিয়া কোনরূপে জীবন রক্ষা করিতে হয়। সংগ্রাম করিয়া মানুষ ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়ে। শেষে সে জড় শক্তির আশ্রয় লয়। কখন বা দেবতা ভাবিয়া জড় শক্তিকে পূজা করিয়া, তাহাতে আত্মসমর্পণ করতঃ কোন রূপে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। এই আত্মরক্ষার জন্য ক্রমে আদিম মানুষ পরস্পর সমাজবদ্ধ হয়। ইহাই সমাজের প্রথম সূচনা। পরে বাহ্য জগতের সহিত সংগ্রাম করিয়া, বাহ্য জড় শক্তিকে নিয়মিত করিয়া, সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষ

সেপ্টেম্বর মাসের 'নাইন্‌টিন্‌থ সেন্সুরি' পত্রিকায় পণ্ডিত মোক্ষমূলরও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন বা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর এই কথা স্বীকার করিয়াই তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, বেদের সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে যে ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল না, বা কোন পুস্তক রচিত হয় নাই, তাহা বলা যায় না। মোক্ষমূলর আরও বলেন, কোন দর্শনশাস্ত্র বা ধর্ম্মগ্রন্থ অতি প্রাচীন বা সর্ব্বপ্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল, একথা কোন গৌরবের কারণ নহে।

আপনার কথা—অন্য কথা ভাবিতে অবসর পায়। তখন সে আপনাকে—জগৎকে বড় নিয়মিত—বড় সীমাবদ্ধ দেখিতে পায়। এই সসীমের ধারণা হইতে ক্রমে অসীমের বা ঈশ্বরের ধারণা করিতে সমর্থ হয়। এই সময়ই তাহার জ্ঞানে ধর্ম্মবীজ প্রথম উপ্ত হয়।" (নব্যভারত পৌষ, ১৩০১ সাল)

যখন সমাজ এত দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, তখন তাহার জ্ঞান বিকশিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন তাহার ভাবিবার বিষয় হয় তিনটী—আপনি, জগৎ ও ঈশ্বর। তাহার পর দর্শন আলোচনার সময় উপস্থিত হয়। কিন্তু সমাজ উন্নতি সোপানে এতদূর আরোহণ করিবার পূর্ব্বে, তাহাকে আরও কতকগুলি সোপান বা স্তর অতিক্রম করিতে হয়। সমাজ যখন বাহ্য প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া, তাহাকে কতকটা আয়ত্ব করিয়া লয়, তখন সে সমাজে শিল্প ও বাণিজ্য আলোচনার সময় হয়, অর্থাৎ তখন সে সমাজে শিল্প ও বাণিজ্যের বিশেষ চর্চ্চা আরম্ভ হয়। পরে সমাজ যখন দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে, লোকে স্বার্থবৃত্তি সংকীর্ণ করিয়া পরার্থ বৃত্তির অনুশীলন করিতে থাকে, সেই সময় রাজনীতির উন্নতি হয়। ইহা সমাজের দ্বিতীয় স্তর। জগৎতত্ত্ব আরও একটু অধিকতর আয়ত্ত হইলে, সে সমাজে প্রকৃত বিজ্ঞানের চর্চ্চার সময় উপস্থিত হয়। ইহা সভ্য সমাজের তৃতীয় স্তর। অবশেষে চতুর্থ স্তরে আসিয়া সমাজ বাহ্য জগতের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া, অথবা তাহাকে আয়ত্ব করিয়া লইয়া, তবে ইহকালের কথা ছাড়িয়া পরকালের বা ধর্ম্মের কথা বিশেষরূপ ভাবিতে পারে। সমাজ উন্নতির শেষ স্তরে না আসিলে দর্শন বা তত্ত্ব আলোচনার প্রকৃত সময় হয় না। ( )

সকল জাতিকেই উন্নতির এই বিভিন্ন স্তর দিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হয়। দেশকাল এই উন্নতিতে সাহায্য করে মাত্র। যে দেশে প্রকৃতি অনুকূল নহে, যেখানে অনেক দিন ধরিয়া অবিরত প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, সে দেশে সমাজ বহুকাল পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে আয়ত্ব করিতে পারে না। যতদিন না পারে, ততদিন অসভ্য অবস্থায় থাকে—সভ্যতার স্তরে আসিতে পারে না। প্রকৃতিকে আয়ত্ব করিলে তবে সে জাতির

(৪) ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিত কুঁজে, তাঁহার কৃত দর্শনের ইতিহাসে সমাজের অবলম্বনীয় এই পাঁচটী বিষয়ের কথা বলিয়াছেন,—

"Five elements of a nation's life are—industry, state, art, religion, and philosophy.

Humanity gets hold of the five following ideas, viz, the useful, the just, the beautiful, the devine and the true.

The above five elements are based on these five ideas .....

কিন্তু ইঁহার মতে, এই পাঁচটী বিষয়ের একটী না একটীকে—কোন এক বিশেষ সমাজ অবলম্বন করিয়া উন্নত হয়। তাঁহার কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"Every nation is called into existence to represent an idea and it progresses towards the accomplishment of this idea. The different nations of the same epoch represent the different ideas. The nation which represents the idea must in accordance with the general spirit of the Epoch is the nation called to domain. When the idea of a nation has served its time, that nation disappears."

Cousin's History of Philosophy vol II, p. 151.

সুতরাং ইঁহার মত অনুসারে এক এক বিশেষ যুগে এক এক ভাবের প্রাধান্য থাকে। সেই রূপ এক এক জাতি এক এক বিশেষ ভাব লইয়া উন্নতি পথে অগ্রসর হয়। যতদিন পৃথিবীতে যে ভাবের প্রাধান্য থাকে, তত দিন ঐ ভাবেঅনুপ্রাণিত জাতিরই অন্য সকলের উপর আধিপত্য থাকে। যে যুগে সে ভাবের আধিপত্য থাকে না, সে যুগে ঐ জাতির অবনতি হয়, অথবা ধ্বংস হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এগুলি উন্নতির বিভিন্ন স্তর মাত্র।

মধ্যে প্রধানতঃ শিল্প ও বাণিজ্যের চর্চ্চা অধিক হয়—শেষে বিজ্ঞানের উন্নতিও হইতে পারে। যে দেশের অবস্থানবিশেষ বশতঃ সেখানকার লোকের পার্শ্ববর্ত্তী জাতির সহিত সর্ব্বদা সংঘর্ষণ সম্ভব, সেখানে রাজনৈতিক উন্নতি অধিক হয়। কেবল যে দেশের প্রকৃতি মানুষের অনুকূল, যেখানে প্রকৃতি জননীর ন্যায় আপনি সকলের অভাব সহজে মোচন করিয়া দিতে ব্যস্ত—যেখানে কঠোর জীবন-সংগ্রাম নাই, নিজের নিতান্ত অভাব মোচন করিবার জন্য সারা জীবন ব্যস্ত থাকিতে হয় না—সেই দেশই ধর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্যা আলোচনার অনুকূল। সেই দেশেই সমাজ উল্লিখিত কয়টী স্তর অতিক্রম করিয়া শীঘ্র উন্নতির শেষ স্তরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্তরে আসিলে তবে সমাজ স্থায়ী হয়, সমাজের আর উন্নতি হয় না; কেন না, ইহাই উন্নতির চরম সীমা। এস্থলে এ তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ভারতের বিশেষতঃ সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অবস্থান ও প্রকৃতি আর্য্যসমাজের উন্নতির বিশেষ সহায় ছিল। ভারতের ন্যায় পৃথিবীর আর কোন দেশেই প্রকৃতি, মানুষের উন্নতির পক্ষে এরূপ অনুকূল নহে। এই জন্য ভারতবাসী আর্য্যগণ সকল জাতি অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে উন্নতির চরম সীমায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারাই সেই জন্য সকল জাতির পূর্ব্বে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। টায়র, ব্যাবিলন, সিডন্, মিসর প্রভৃতি কোন দেশে কোন জাতি এত দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

অতএব এই সকল যুক্তি হইতে আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, ভারতেই সর্ব্ব প্রথম দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। সুধু যে ভারতেই সর্ব্বপ্রথম দর্শন শাস্ত্র চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নহে। ভারতবর্ষ হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই দর্শন শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল। দর্শন শাস্ত্ররূপ মহাবৃক্ষের মূল ও স্কন্ধ এই ভারতবর্ষে, আর ইহার শাখা প্রশাখা অন্য সকল দেশে ব্যাপৃত হইয়াছে। আমরা এই কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

ভারতের পরেই মিসর (Egypt) দেশ উন্নত হইয়াছিল। তাহারও প্রকৃতি উন্নতির পক্ষে অনেকটা অনুকূল ছিল। ইহা ব্যতীত ভারতের সহিত মিসর দেশের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও ছিল। তথাপি মিসর দেশে যে পূর্ব্বে দর্শন চর্চ্চার সময় হইয়াছিল, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ভারতের সহিত সম্পর্ক জন্য হউক অথবা জাতীয় উন্নতি শক্তির ক্রম বিকাশ নিয়মেই হউক, পূর্ব্বে মিসরে ধর্ম্ম চর্চ্চার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। মিসরবাসীদের ধর্ম্মের সহিত আমাদের ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য ছিল। মিসরীদের পুরোহিতগণ ধর্ম্মের গুঢ় তত্ত্ব (গুপ্ত বিদ্যা) জানিতেন। এই মিসরবাসীদের নিকটই বোধ হয় ইহুদীগণ তাঁহাদের ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মিসরীগণ জন্মান্তর বিশ্বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একেশ্বরবাদও প্রচলিত ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মিসরীগণ প্রকৃত দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করে নাই। তবে দুই চারিটী দর্শন তত্ত্ব ভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত জন্মান্তরবাদ তাহার দৃষ্টান্ত। প্রাচীন চীন, পারস্য, ব্যাবিলন, সিডিয়া, ক্যালডিয়া প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধেও

কতক পরিমাণে এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে।

তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন যে, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ ব্যতীত যদি অন্য কোন দেশে দর্শনের প্রকৃত চর্চ্চা হইয়া থাকে,তবে সে গ্রীস বা উনানিদেশে। অধিকাংশ দর্শন তত্ত্বই উনানি পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিত মাত্রেই উনানী দেশকেই দর্শনশাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি স্থান বলিয়া স্বীকার করেন। উনানি দেশ হইতেই ইউরোপে অন্য সকল দেশে দর্শন শাস্ত্রের প্রচার হইয়াছিল। এই উনানী দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল, তাহা আমাদের প্রথম দেখিতে হইবে।

সার উইলিয়ম জোন্সের পূর্ব্বে অন্য কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত ভারতীয় দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা করেন নাই। এদেশের শাস্ত্রের কথা তাঁহারই নিকট ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রথম জানিতে পারেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পূর্ব্বে দুই চারি জন জর্ম্মান বা ফরাসী পণ্ডিত যদিও সংস্কৃত সাহিত্য বা শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ইউরোপে এ দেশীয় শাস্ত্র প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন নাই। এই সার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন,—

যে ছয় প্রকার দর্শনিক মত (আর্য্য) দর্শন শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে,(প্রাচীন উনানিদেশের) প্লেটোয়া ও লাইসিয়মের সকল প্রাচীন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতই তাহার অন্তর্গত। আর বেদান্ত শাস্ত্র ও তন্মতপোষক অন্যান্য সুন্দর গ্রন্থ পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতে হয় যে, ভারতীয় ঋষিগণের সহিত এক উৎস (উপনিষদ) হইতেই পিথাগোরস বা প্লেটো তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন।' (৫)

পণ্ডিতবর সপেনহরও বলিয়াছেন যে, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি তত্ত্ব প্লেটো ও পিথাগোরাস ভারতবর্ষ বা মিসর দেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৬) ঐতিহাসিক পণ্ডিত হেরোদোতাস্ ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত ভারতীয় ন্যায় দর্শন হইতে যে উনানি পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ আরিষ্টটেল তাঁহার ন্যায়শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, (৭) তাহা সার উইলিয়ম জোন্স প্রমাণ

(৫) "The six philosophical schools whose principles are explained in the Darsana Sastras, comprise all the metaphysics of the old academy, the Stoa and the Lyceum; nor is it impossible to read the Vedanta or the many fine compositions in illustration of it, without believing that Pythagoras and Plato derived their sublime theories from the same fountain with the sages of India."

(Works of Sir W. Jones vol. I. p. 28.

সার উইলিয়ম জোন্স অন্য একস্থলে বলিয়াছেন,—

"The fundamental tenet of the Vedantic school consisted.....in contending that it (matter)has no essence independent of mental perception : that existence and perceptiblity are convertible terms, that external appearances and sensations are illusory and would vanish into nothing if the divine energy which alone sustains them were suspended but for a moment,—an opinion which Epicharmus and Plato seem to have adopted and which has been maintained in the present century with great elegance, but with little public applause."

Work of Sir W. Jones vol I. p. 155-166.

(৬) "Therefore Pythagoras and Plato have seized with admiratioon the *ne plus ultra* of the mythical reprsentation (transmigration of soul), received it from India or Egypt honored it made use of it and we know not how far believed it."

Schopenheaur's World as Will and Idea, vol I. p. 46.

(৭) কূটবুদ্ধি আরিষ্টটেল, লোকে পাছে এইরূপ সন্দেহ করে, এই জন্য "ঠাকুর ঘরে কে? না, আমি ত কলা খাই নাই"—এই ন্যায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার ন্যায়গ্রন্থের উপসংহারে বলিয়াছেন,—"আমার এ গ্রন্থ মৌলিক, কাহারও অনুকরণে লিখিত নহে।" এই কথাটা বড় সন্দেহজনক। তাঁহার কথা এই,—

"We have had no works of predecessors to assist us in this attempt to construct a sceince of reasoning : our own labors have done it all. * * * You will show .....some gratitude for the discoveries it contains."

(Qouted by G. H. Lewis in his Biographical History of Philosophy p. 247).

(৮) সার উইলিয়ম জোন্সের কথা এই,—

"Kallisthenes found a complete system of Logic among the Indians, and sent it to his uncle Aristotle Asiatic Researches Vol. IV, p. 163).

(৯) "On the other hand it must be acknowledged that this part of Aristotle's works contains some intrinsic evidence of aid borrowed from a more ancient School. Besides that imposing appearance which it exhibits of systematical completeness in its innumerable details ; and which we can scarcely suppose that it could have received from the original inventor of the art, there is a want of harmony or unity in some of its fundamental principles, which seem to betray a combination of different and discordant theories."

(Stewart's Philosophy of the Human Mind p. 564).

করিয়াছেন। তিনি বলেন, আরিষ্টটেলের ভাগিনেয় ক্লিস্থেনিস্ এদেশ হইতে ন্যায় দর্শন সংগ্রহ করিয়া আরিষ্টটেলকে পাঠাইয়া দেন। তাহা হইতেই আরিষ্টটেল তাঁহার প্রসিদ্ধ ন্যায় দর্শন সংগ্রহ করেন। (৮)

প্রসিদ্ধ স্কচ্ দার্শনিক ডুগাল্ড্ ষ্টুয়ার্ট ঐ কথা বলিয়া তাহার পোষক প্রমাণ স্বরূপ বলেন, যে আরিষ্টটেলের 'ন্যায়' গ্রন্থ পড়িলেই বুঝা যায় যে, ইহা কোন প্রাচীনতর ন্যায় শাস্ত্র হইতে সংগ্রহীত হইয়াছে।(৯)

(Weber) ওয়েবার সাহেব বলিয়াছেন, ষড়দর্শন মধ্যে ন্যায়দর্শন সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক সেই ন্যায় বা আন্বিক্ষিকী দর্শন বুদ্ধদেব শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা ললিত বিস্তার হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং ন্যায় দর্শন আরিষ্টটেলের সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে।

এইরূপ অধিকাংশ নিরপেক্ষ দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মতে উনানী দার্শনিক পণ্ডিতগণ প্রায়ই তাঁহাদের মূল মত সকল ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগতআছেন যে,অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতের সহিত মিসর, সিডন,টায়র, প্রাচীন রোম প্রভৃতির ঘনিষ্ঠতা ছিল। কতকাল পূর্ব্ব হইতে এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল,তাহা বলা যায় না। তবে আলেক্জাণ্ডারের সময় হইতে গ্রীক্ ও ভারতবাসীগণের সম্বন্ধ যে ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হইয়া আসিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দ) আলেক্জাণ্ডারের সিন্ধুদেশ আক্রমণের কিছুদিন পরে, গ্রীক্ বীর সিলুকাস্ চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে বারবার পরাজিত হইয়া, চন্দ্রগুপ্তের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া খ্রীঃ পূঃ(৩১২ অব্দ) সন্ধি স্থাপন করেন। মিগাস্থেনিস্ এই চন্দ্রগুপ্তের সভায় বরাবর থাকিতেন। পরে অশোকের সহিত গ্রীকদিকের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য নানা দেশে যে সকল ভিক্ষু প্রচারক পাঠান, তাহাদের মধ্যে দুইজন গ্রীকের নাম পাওয়া যায়। তখন ভারতের বৌদ্ধ প্রচারক এসিয়া মাইনরেও ধর্ম্ম প্রচার জন্য গিয়াছিল। 'মিলিন্দা-প্রমাণ' নামে যে বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ভারতের নিকট গ্রীকগণ অনেক উপদেশ লইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে মিলিন্দা ও বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা আছে, তাহা হইতেই এরূপ বুঝা যায়। আলেক্জাণ্ডারের সহিত হিন্দু

দণ্ডীর কথোপকথনের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন।

ভারতবাসী হিন্দুগণ অবশ্য গ্রীস্‌দেশে যাইতেন না। কিন্তু গ্রীক্‌গণ ভারতে তখন প্রায়ই আসিতেন। তাহারা কোন সময়ে ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপনও করিয়াছিলেন। দুই জাতির মধ্যে এইরূপ সংস্রব জন্য আমরা দেখিতে পাই যে,গ্রীকদিগের নিকট, ভারতবাসীগণ শিল্প ও স্থপতি বিদ্যা কতক লইয়াছিলেন। গ্রীকদিগের জ্যোতিষ হইতে অনেক নূতন মতও আর্য্য পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সময় বা তাহার পূর্ব্বে গ্রীক্ বা যবনগণ হিন্দুর নিকট যে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন,তাহা বলিতে পারা যায়।

গ্রীকদিগের দর্শন শাস্ত্র অধিক পুরাতন নহে। থেল্‌স গ্রীসদেশের সর্ব্বপ্রথম দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৬৪০ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিথাগোরাস্ প্রায় ইঁহার সমসাময়িক। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৫৮২অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সক্রেটিস্,প্লেটো, আরিস্‌টটেল প্রভৃতি গ্রীসের প্রধান দার্শনিক পণ্ডিতগণ খ্রীঃ পূর্ব্ব চারি শত বৎসর অগ্রে জীবিত ছিলেন। সুতরাং বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে গ্রীসদেশে দর্শন শাস্ত্র-চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্ব্বে ভারতে সকল প্রকার দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুতরাং গ্রীক বা যবন দর্শনশাস্ত্র আমাদের দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক আধুনিক,তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, গ্রীস দেশের প্রথম কালের দার্শনিক পিথাগোরাস্‌ই অনেক ভারতীয় মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তিনি সেই সকল মত একেবারে ভারত হইতে পাইয়াছিলেন, কি মিসর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন,তাহা ঠিক বলা যায় না।(১০) ঐ সময়ে মিসর দেশে বিদ্যা চর্চ্চার বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহার কিছু দিন পরে আলেক্‌জাণ্ডার মিসর জয় করিয়া আলেকজাণ্ড্রিয়া নগর স্থাপন করেন, ও সেখানে তাঁহার গুরু আরিষ্টটেল ও সেনাধ্যক্ষ টলেমি সোটার খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে এক পুস্তকাগার স্থাপন করেন। সেই পুস্তাকাগারে দেশ বিদেশ হইতে লক্ষাধিক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অনেক দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ছিল, সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐ সময়ে যে ভারতীয় দর্শনাদি গ্রন্থ সমুদায় সে স্থানে নীত হইয়াছিল এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে উহার আলোচনা করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতএব খ্রীঃ পূঃ ৩০০ বৎসরের পর হইতে, ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের জুনানীদেশে ও আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ায় রীতিমত চর্চ্চা ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীস দেশে যখন খ্রীঃ পূঃ ৬০০ বৎসর হইতে দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ হয়, তখন গ্রীসদেশের সহিত ভারতের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কতকগুলি বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা তাহা স্থির করিতে পারি। আমাদের

(১০) এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত নানারূপ যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন যে, এই গ্রীক্ দার্শনিক পিথাগোরাস গৌতম বুদ্ধেরই নামান্তর মাত্র। গ্রীসে পিথাগোরাস বলিয়া কেহ ছিল না। বুদ্ধদেবের মতই পিথাগোরাসের নামে সেখানে প্রচলিত ছিল। এই পিথাগোরাস স্বয়ং বুদ্ধ বা তাঁহার কোন কৃতী ভিক্ষু প্রচারকই হউন, বৌদ্ধ দার্শনিক মতের সহিত যে তাঁহার মতের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। (Weber's History of Philosophyর ২৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।)

দেবদেবী কল্পনার সহিত গ্রীকদের দেবদেবী কল্পনার অনেক সাদৃশ্য আছে। দেবদেবী সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যানের সহিত গ্রীকদের দেবদেবীর উপাখ্যানের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদের দেশের লৌকিক ধর্ম্মের সহিত দার্শনিক তত্ত্বের যে পার্থক্য আছে, গ্রীক্ দেশেও সেইরূপ পার্থক্য আছে। আমাদের দেশের চলিত সংস্কৃত উপাখ্যানের সহিত গ্রীক্‌দিগের উপাখ্যানের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।(১১)একটী আর একটীর অনুকরণ না হইলে এরূপ হয় না। তাহার পর আমাদের দর্শন শাস্ত্রের সহিত গ্রীক্‌দিগের দর্শন শাস্ত্রের সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক। পীথাগোরাসের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক দার্শনিক দিগের বায়ু, অগ্নি বা জল ভূত হইতে জগৎ-সৃষ্টিবাদ, পীথাগোরাসের জন্মান্তরবাদ, ইলিয়াটিক্ প্রভৃতি গ্রীক্ দার্শনিকদিগের অদ্বৈতবাদ, ডিমক্রিটস্ প্রভৃতি দার্শনিকগণের পরমাণুবাদ, সফিষ্টদের গৃহীত বিভিন্ন বৌদ্ধবাদ, আরিষ্টটেলের ন্যায়মত, প্লেটোর জন্মান্তর, নাম, রূপ, ও সারূপ্য মুক্তিমত, আরিষ্টিমাসের চার্ব্বাক মত, ষ্টোইক্‌দিগের পরিণামবাদ,—ইহাদের সহিত আমাদের দর্শনের বিভিন্ন মত ও বাদের এত সৌসাদৃশ্য আছে যে, একটী অপরটীর অনুকরণ বা সম্প্রসারণ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। (১২)

(১১) এ সম্বন্ধে পণ্ডিত মোক্ষমূলর সম্প্রতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"We seem perfectly within our right, when we look upon the numerous coincidences between the fables of Æsopus, and the fables occuring in Sanskrit and and Pali literature as proving the fact that there was a real literary exchange between India, Persia, Asia-minor and Greece beginning with the sixth century B.C."

(Max Muller on Coincidences—Fortnightly Review, July, 1896).

তাহার পর আর এক কথা বিবেচনা করিতে হইবে। দুই কি ঊর্দ্ধসংখ্যা আড়াই শত বৎসর মধ্যেই, গ্রীসের ন্যায় ক্ষুদ্র একটী জনপদে এই সকল দর্শনের এতদূর চর্চ্চা ও উন্নতি হইয়াছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে অন্য জাতির সহিত সংস্রব ব্যতীত স্বাভাবিক জাতীয় পরিণতির নিয়মানুসারে এরূপ চর্চ্চা ও উন্নতি সম্ভব নহে। আজি পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোন দেশে কোন সময়ে দর্শনশাস্ত্রের এরূপ স্বতঃ উন্নতি হয় নাই। ভারতে এই দর্শনশাস্ত্রের পূর্ণ বিকাশ হইতে কত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। অন্ততঃ বেদান্তের সময় হইতে বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব কাল পর্য্যন্ত (অর্থাৎ দুই সহস্র বৎসর)যে অতীত হইয়াছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। তাহার পর আমাদের দেশে দর্শনের যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, গ্রীসে সেরূপ হয় নাই। আর আমাদের দর্শনশাস্ত্র স্থাপনের জন্য বেদ উপনিষদ রূপ যে অতি প্রাচীন মহাভিত্তি ছিল,গ্রীকদিগের সেরূপ কোন ভিত্তি ছিল না। ধর্ম্মের পূর্ণস্ফূর্ত্তি না হইলে দর্শনশাস্ত্র আলোচনার সময় আসে না। গ্রীস দেশে দর্শনশাস্ত্র আলোচনার পূর্ব্বে ধর্ম্মের সেরূপ বিকাশ হয় নাই। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে, সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, যে আমাদের দর্শনশাস্ত্র অব-

(১২) বিলাতী পণ্ডিত ড্রাপার কৃত History of Conflict between Religion and Science পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

"Here it was truly said the genius of the East met the genius of the West" (p. 19).. ...Aristolleian philosophy was the intellectual corner-stone on which the museum (Library) rested (p. 22).....The museum was...the birthplace of modern Science (p. 33).

লম্বন করিয়াই গ্রীক্ দর্শন শাস্ত্রের বিকাশ হইয়াছিল। (১৩)

এ সম্বন্ধে এক আপত্তি এই হইতে পারে যে, যদি ইহাই সত্য হয়, তবে কোন গ্রীক্ দার্শনিক গ্রন্থে বা অন্য কোন গ্রীক পণ্ডিতদের গ্রন্থে একথার উল্লেখ নাই কেন? কোন গ্রীক্ পণ্ডিত এদেশের দর্শন শাস্ত্রের উল্লেখ করেন নাই কেন? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, কোন পণ্ডিতই প্রায় স্বীকার করেন না, তিনি কোথা হইতে তাঁহার নিজ মত সংগ্রহ করিয়াছেন। এই যে সম্প্রতি জর্ম্মানিতে হিন্দু দর্শন শাস্ত্র আলোচনা হইতেছে, এই যে আধুনিক জর্ম্মান দার্শনিক পণ্ডিতগণ আমাদের দর্শন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া নূতন মত উদ্ভাবন করিতেছেন বলিয়া ইউরোপে এত খ্যাতি লাভ করিতেছেন—সপেনহরের ন্যায় বা পল ডুসেনের ন্যায় দুই একজন উদার স্বভাব পণ্ডিত ব্যতীত কয়জন তাহা স্বীকার করিয়াছেন। (১৪)

আমাদের দর্শন শাস্ত্র অবলম্বনে গ্রীক্ দর্শন শাস্ত্র সৃষ্টি হইয়াছিল, এই কথা এত করিয়া বুঝিতে হইতেছে, তাহার কারণ এই যে, বিলাতী পণ্ডিতগণ একথা স্বীকার করিতে বড় প্রস্তুত নহেন—যেন তাহাতে ইহাদের সম্ভ্রমের লাঘব হয়। পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলিয়াছেন, মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া যখন দেখা যায় যে, এক জাতির পক্ষে যাহা সাধ্য হইয়াছিল, তাহা অন্য জাতির পক্ষেও সাধ্য, তখন কেন একথা স্বীকার করিবেন যে, ভারত হইতেই গ্রীক পণ্ডিতগণ দর্শনশাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১৫) পণ্ডিত ইউবারউইগও তাঁহার কৃত দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে এইরূপ সন্দেহ করিয়াছেন। (১৬) পণ্ডিত ওয়েবারও

(১৩) এ সম্বন্ধে ফরাসি দার্শনিক পণ্ডিত কুঁজের কথা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন,—

"These four systems (of philosophy viz, Sensationalism, Idealism, Scepticism and Mysticism), born in the old East, after having shone themselves with splendour on the brilliant scenes of the Greek philosophy, and having traduced, observed but not extinguished in the long night of the middle ages, reappeared in the 16th and 17th centuries in modern philosophy, and present in the 18th century is their fertile the grandest and most instructive spectacle which has ever been offered by the annals of history."

(Cousin's History of philosophy vol, I. p. 311).

(১৪) পণ্ডিতবর সপেনহর তাঁহার সর্ব্বপ্রধান পুস্তকে ("World as Will and Idea") মুখবন্ধে বলিয়াছেন,—

"If the reader has also received and assimilated the sacred primitive Indian wisdom, then he is best of all prepared to what I have to say to him.....each one of the individual and disconnected aphorisms, which make up the Upanishads may be deduced as a consequence from the thought I am going to impart."

পলডুসেন তাহার Element of Metaphysics নামক পুস্তকে বলিয়াছেন,—

"The celebrated "*Tattwamasi*—a sentence which expresses in three words at once the deepest mystery of metaphysics, and the highest aim of morality. An interpretation of this great truth we may consider, as in a wider sense, our whole work...(p. 134).

(১৫) পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলিয়াছেন,—

"...A wider study of mankind has taught us that what was possible in one country was possible in another also. But the fact remains nevertheless that the similarities between these two streams of philosophical thought in India and in Greece are very startling, nay sometimes most perplexing."

(Vedant Philosophy p. 9).

(১৬) পণ্ডিত ইউবার উইগ বলিয়াছেন,—

"To what extent the philosophy of the period, (and hence the Genesis of the Greek philosophy in general) was affected by Oriental influences, is a problem whose definte solution can only be anticipated .....Critics have manifested an increasing tendency to search for the explanation of the various philosophers of the Greeks in the progressive, inner development of the Greek mind: but they have verged perhaps too near to the opposite extreme. The labors of both Gladisch make a reaction against this extreme, both of them laying stress in the influence of the orient. Gladesch..... maintains that this (oriental) element entered into Greek philosophy through the medium of Greek religion.....that therefore the later philosophers.....were indirectly (Plato also directly) affected in the shaping of their doctrine by orien tal influence is quite conceivable, and some of these hypotheses have no slight degree of probability."

(History of Philosophy vol I, p. 31-32).

(১৭) "It is not yet possible to decide whether in the beginning of Greek philosophy any connection with Hindu specication can be established."

(Weber's History of Sanskrit Literature. p. 233).

(১৮) এই দর্শন শাস্ত্রের স্তর বা ক্রম বিকাশের কথা এস্থলে আলোচ্য নহে।

(১৯) মোক্ষমূলর-প্রমুখ পণ্ডিতগণ যে বলিয়াছেন, যাহা এক দেশে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা অন্যদেশেও সম্ভব হইতে পারে, তাহা সকল সময়ে সত্য নহে। যদি তাহা হইত, তবে পুরাকালে ভারত ও গ্রীস ব্যতীত অন্য দেশেও স্বাধীন ভাবে দর্শনের চর্চ্চা হইত। যেমন ব্যাস, বাল্মিকী, কালিদাস, সেক্ষপীয়রের ন্যায় কবি, কপিলের ন্যায় জ্ঞানী, শঙ্কর প্লেটো বা ক্যাণ্টের ন্যায় দার্শনিক, নিউটনের ন্যায় বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি জগতে একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করেন,—যেমন শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা চৈতন্যদেব একবার মাত্র অবতীর্ণ হন, তেমনই এই ব্যক্তিগত নিয়মানুযায়ী কোন বিশেষ জাতি মধ্যেই দর্শনের প্রথম চর্চ্চা হইয়াছিল এবং অন্য দেশের দর্শন চর্চ্চা বিস্তার তাহা হইতেই হইয়াছিল, এই মত অযৌক্তিক নহে।

ঐরূপ কথা বলিয়াছেন (১৭) কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতে যেরূপ পূর্ণরূপে দর্শনের সর্ব্বাঙ্গীন চর্চ্চা হইয়াছিল, এবং তৎপরে যুনানী বা গ্রীসদেশে দর্শনের যেরূপ চর্চ্চা হইয়াছিল, আজি পর্য্যন্ত কোন কালে কোন দেশে দর্শনশাস্ত্রের সেরূপ চর্চ্চা হয় নাই। আজকাল ইউরোপে দর্শনশাস্ত্র চর্চ্চা যথেষ্ট হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও তাহা বাহ্যিক, অপূর্ণ ও একদেশী। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এখনও অধিকাংশ দার্শনিকগণ দর্শনশাস্ত্রের প্রথম স্তর—চার্ব্বাকমত বা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ জড়বাদ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। (১৮) সুতরাং মানবজাতির ক্রমোন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিলে মোক্ষমুলর প্রভৃতি পণ্ডিতদের উক্ত মত সমর্থিত হয় না। (১৯)

যাহা হউক, আমরা আরও স্পষ্ট করিয়া গ্রীক দেশের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, বেদান্তদর্শন অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের দর্শন-চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গ্রীস্‌দেশে থেল্‌স্ হইতে দর্শনশাস্ত্র চর্চ্চা আরম্ভ হয়। যুনানী প্রথম দার্শনিকদিগের নাম থেল্‌স্, আনাক্ষিমন্দার, আনক্ষিমিনিস্, হিরাক্লিতাস্ ও পিথাগোরাস্। ইহারা প্রায় সকলে সমসাময়িক। খ্রীঃ পূঃ ৬০০ হইতে ৫৫০ অব্দ ইহাদের প্রাদুর্ভাব কাল। ইঁহারা প্রথম জগৎ সৃষ্টি তত্ত্ব আলোচনা করেন। ইহার মধ্যে কেহ বেদান্তের (ঋগ্বেদ ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ উল্লিখিত) তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন, জল হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে (আপঃ—বেদান্তদর্শন ২।৩।১১)। কেহ বলিয়াছেন, তেজ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ("তেজোঽতস্তথাহ্যাহ—বেদান্তদর্শন, ২।৩।১০)। কেহ বলিয়াছেন, আকাশ হইতে জগৎ সৃষ্ট ("ন বিয়দ শ্রুতেঃ—বেদান্তদর্শন ২।৩।১)। কেহ বা বেদান্তের জন্মান্তরতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

তাহার পর এই সকল দার্শনিক পণ্ডিতদিগের সমকালবর্ত্তী ইলিয়েটিক পণ্ডিতগণ

বেদান্তের এইরূপ আংশিক মত গ্রহণ না করিয়া একেবারে অদ্বৈত তত্ত্ব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। খ্রীঃ পূ ৫৬৯ অব্দে জেনোকেনিস এই পণ্ডিত দিগের মধ্যে প্রথম জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ইনি প্রায় উক্ত থেল্‌সের সমকালবর্ত্তী। অর্থাৎ ইনি এক জন প্রথম গ্রীক্ দার্শনিক। তাঁহার লিখিত কোন পুস্তকের এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "(এই জগতের ধারণা আর (এক) ঈশ্বরের ধারণা ইহাই দর্শনের দুই চরমসীমা। এ উভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় প্রয়োজন হয়। কেহ জগৎ ও ঈশ্বর এক মনে করেন; কেহ বা এই জগতের বহুত্ব ঈশ্বরের একত্বে ডুবাইয়া দেন; কিম্বা এই বহুত্ব অস্বীকার করেন, এই জগৎ সেই একের মায়াময় ছায়া বলিয়া মনে করেন।" (২০) তিনি যে সকল দার্শনিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বের গ্রীক দর্শন মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না। কোন দেশে, কোন কালে কোন দার্শনিক নিজ প্রতিভা বলে অন্য কোন দেশের দর্শন আলোচনা না করিয়া একেবারে দর্শনশাস্ত্রের এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। অন্তত কখন কেহ এ পর্য্যন্ত পারিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, জেনোকেনিস্ প্রমুখ ইলিয়েটিকদিগের দর্শনশাস্ত্র উপনিষদ বা বেদান্তের আভাস অবলম্বনে রচিত। এই ইলিয়েটিক্‌দিগের মধ্যে জেনোকেনিস, পারমেনাইডিস্, জিনো ও মাইনিমাস্—ইঁহারাই প্রধান।

এই ইলিয়েটিকদিগের পরে সক্রেটিস্ শিষ্যগণের মধ্যে আবার বেদান্তসম্মত বাদের প্রচলন হয়। ইহাদের মধ্যে ইউক্লিড্, প্লেটো ও প্লেটোশিষ্য আরিষ্টটেল উল্লেখযোগ্য। প্লেটোর মত অনেকটা রামানুজ কৃত বেদান্ত মতের সমান। আরিষ্টটেল ন্যায়মতের সহিত বেদান্ত মত একত্র করিয়াছিলেন। ন্যায়ের স্রষ্টা ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে সর্ব্বময় একেশ্বরের কতকটা ধারণা করিয়াছিলেন। ষ্টোইক মত প্রবর্ত্তক জিনো, আরিষ্টটেলের পর, বেদান্তের অনেক মত প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গ্রীকদিগের উক্তরূপ দর্শন আলোচনার সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত ইউরোপে যত দর্শন শাস্ত্র চর্চ্চা হইতেছে বা যত নূতন মত প্রচারিত হইয়াছে, গ্রীক্ দর্শন শাস্ত্র যে সে সকলেরই মূলভিত্তি, তাহা আধুনিক দর্শন শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত মাত্রেই অবগত আছেন সুতরাং তাহা এস্থলে বিস্তারিত উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বেদান্ত শাস্ত্র কিরূপে ভারতে উৎপত্তি হইয়া, ক্রমে কালবশে জগতের উন্নত জাতি মধ্যে সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে দেখান আবশ্যক।

ভারত হইতে গ্রীসদেশে এই দর্শন শাস্ত্রের যেরূপ প্রচার হয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীস্‌দেশে হইতে মিসর দেশে উহা নীত হয়। সে সময় মিসর দেশ গ্রীসদেশের অধীন ছিল। টলেমি সোটর আরিষ্টটেলের সাহায্যে সে দেশে যে অদ্ভুত বিদ্যামন্দির ও পাঠাগার সৃষ্টি করেন। গ্রীসের অধঃপতনের পরে সেই মিসরদেশে উক্ত বিদ্যামন্দিরের প্রভাবে দর্শন শাস্ত্র আলোচনা হইতে থাকে। এই স্থানে দর্শন শাস্ত্র আলোচনাকারী ছাত্রগণ প্রধানতঃ আরিষ্টটেলের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং ইঁহারা কতকটা বেদান্তবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। (২১) ইহাদের ইহুদী আলেক্‌জন্দ্রিয়া সম্প্রদায় বলা হইত। প্রায় সকল জর্ম্মান দর্শনেতিহাস লেখকগণ স্বীকার করেন যে, এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ প্রাচ্য দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২২) সুতরাং কেবল যে আরিষ্টটেল শিষ্য বলিয়া ইহারা কতক-পরিমাণে বেদান্তবাদী হইয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ প্লেটোর দার্শনিক মতের সহিত প্রাচ্য দার্শনিক মত মিশ্রিত করিয়া, ইহাদের মধ্যে নব প্লেটো সম্প্রদায় নামে আর এক শ্রেণীর দার্শনিক দলের এই সময় প্রাদুর্ভাব হয়। ইহাদের দার্শনিক মতের সহিত বেদান্ত মতের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। ফাইলো উক্ত ইহুদী আলেক্‌জন্দ্রিয়া সম্প্রদায়ের অগ্রণী। আমোনিয়োস্, প্লোটিনাস্, অরেনিয়াস্, ফরফেরি—ইহারা নব-প্লেটো সম্প্রদায়ভুক্ত। জামব্লিকাস, প্রোক্লাস প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহারা সকলেই কতকটা বেদান্তবাদী ছিলেন (২৩)। ইহারা সমাধি তত্ত্ব জ্ঞাত ছিলেন।

(২০) "The idea of the world and that of God are the two extremes of all speculation. It remains to find their relation. Some (theists) identity the world with God or God with the world. Pantheism is the conception of the whole world with God alone to merge plurality with unity. The plurality denied, and the world (plurality) is regarded as a deceitful shadow of the absolute unity."

(Quoted from Tenophanesis'philosophical Fragments by Cousin in his History of Philosophy, vol I).

(২১) এ সম্বন্ধে পণ্ডিত ড্রাপার যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণ বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মা দেহের ন্যায় আকৃতি সম্পন্ন (জৈন মত)। খ্রীষ্টানেরা প্রথমে এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রূপ মত ইউরোপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পূর্ব্ব আসিয়ায় (ভারত)সম্পূর্ণ ভিন্ন-মত প্রচলিত ছিল। এই দেশে ব্রহ্মের (impersonal God) ধারণা বা কল্পনা হইয়াছিল; জীবাত্মা এই ব্রহ্মের স্বরূপ ও (স্ফুলিঙ্গ মত) তাঁহা হইতে সৃষ্ট ও লয় কালে তাঁহাতেই একীভূত হয়, সে দেশের পণ্ডিতগণ ইহা বিশ্বাস করিতেন এবং সকল জগৎ পদার্থই ব্রহ্মকারণ হইতে অভিব্যক্ত, ইহা বুঝিয়াছিলেন। সমস্ত বৈদিক ধর্ম্ম এই বিশ্বাসের উপর স্থাপিত ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই বৈদিক ধর্ম্ম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আরিষ্টটেল হইতে এই মত পূর্ব্ব ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। তাহার কথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"Through Aristole these doctsines (of emanation and absorption &c.) were introduced into Eastern Europe indeed, eventually.....he was regarded as the author of them. They exerted a dorminating influence in the later period of the Alexandrian school."

(Draper's conflict between Religion and Science. p. 122).

(২২) ইউবারউইগ্ তাঁহার দর্শনেতিহাসে বলিয়াছেন,—

"This state of Greek philosophy could not but induce a greater susceptibility to oriential influences than hitherto existed and such influences did operate.....to determine the form and substance of the speculation of this period (vol I, p. 222.

পণ্ডিত বিটার তাঁহার দর্শনেতিহাসে বলিয়াছেন,—

"The influence of the orient was an important co-operating factor in determining the character of the philosophy of their per od (vol IV. p 330.)

জিমার ম্যান বলিয়াছেন.—

"Plato's attempt to translate oriental mysticism into scientific speculation, ends in Neo-Platonism, with a retranslation of thought into Images."

(২৩) এই বেদান্ত বাদ কাহাকে বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা বুঝিবার জন্য পণ্ডিত ড্রাপারের কথা নিম্নে লিখিত হইল,—

"Philosophy has never proposed but two hypotheses to explain the system of the world ;—first a personal God existing apart, and a human soul called into existence or created and thenceforth immortal : second an impersonal intelligence, or indeterminate God, and a soul emerg-

এই সকল দার্শনিকগণ খ্রীঃ অঃ প্রথম শতাব্দী হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে জীবিত ছিলেন। ইহাদের পরে ইহুদী ও সারাসেন দিগের মধ্যে দর্শন চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহুদীদিগের "কেবালা" মত কতকটা বেদান্তের সৃষ্টিবাদের অনুরূপ। ইহারাও প্লেটো, আরিষ্টটেলের দর্শন শাস্ত্রের উপর ইহাদের নিজ দার্শনিকমতের ভিত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহেন। ইহুদীগের অপেক্ষা সারাসেন ও আরবি মুসলমানগণ দর্শন শাস্ত্র চর্চ্চায় অধিক অগ্রসর হইয়াছিল। নব ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হইয়া ইহারা অতি অল্পকাল মধ্যেই চারিদিকে নিজরাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের জ্ঞানচর্চ্চাও যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহারা পশ্চিমে ইউরোপের শেষসকদীমা স্পেন হইতে পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। কথিত আছে, স্পেন দেশেই কালিফদের রাজধানীতে রাজকীয় পুস্তকাগারে ছয় লক্ষের অধিক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। সেইরূপ ইহাদের রাজত্বে পূর্ব্বসীমা বগদাদেও যথেষ্ট বিদ্যাচর্চ্চা হইত। এই সারাসেনদের মধ্যে সুতরাং এ সময়ে যথেষ্ট দর্শন চর্চ্চা ছিল। এদেশীয় দর্শনশাস্ত্র সকল সে সময় অনুবাদিত হইয়াছিল। সেই জন্য সারাসেন দর্শনশাস্ত্র যতটুকু পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ আমাদের দর্শন শাস্ত্রের অনুরূপ। আসিয়ার সারাসেন দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যে প্রধান—আলকেন্দি, আন্‌ফারবি, অভিনিয়া, আলগজেলি। ইহাদের মত অনেকটা বেদান্তের অনুরূপ। (২৪) পণ্ডিত ইউবার উইগ বলিয়াছেন, আরিষ্টটেল ও নব প্লেটো সম্প্রদায়ের মতের সমবায়ে এই সকল সারাসেনদের দর্শনশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

স্পেন দেশের সারাসেন দার্শনিকদিগের মত এইরূপে নব প্লেটো ও আরিষ্টটেলের মতের অনুকরণে সৃজিত হইয়াছিল। এই স্পেনদেশীয় সারাসেন দার্শনিকদিগের মধ্যে আবেরোর নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি আরিষ্টটেলের অনুবর্ত্তী ছিলেন। অরিষ্টটেলের দর্শন শাস্ত্র ইনি অনুবাদ করিয়াছিলেন ও ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। ইনি অদ্বৈতবাদ একরূপ মানিতেন, মৃত্যুর পর জীবাত্মা পরমাত্মায় একেবারে লীন হইয়া যায় বা মৃত্যুতে সদ্যমুক্তি হয় ইহা বিশ্বাস করিতেন।

এই আবেরোর নিকট হইতেই ইউরোপে আত্মাসম্বন্ধীয় বেদান্ত মত প্রচারিত

ing from and returning to Him. As to the origin of beings there are two opinions : first that they are created from nothing, second that they come by development from preexisting forms. The theory of creation belongs to the first of the above hypothesis, that of evolution to the last."

(Draper's conflict between Religion and Science p. 140).

এই দুই মতের মধ্যে প্রথম মত ইউরোপের। দ্বিতীয় মত ভারতের। এই দ্বিতীয় মতই বেদান্ত মত। বেদান্ত মতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাঁহা হইতে জীব ও জগৎ অভিব্যক্ত হয়। প্রলয়ে ইহারা তাঁহাতেই লীন হয়। শাস্ত্রে আছে,—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

ইহা যথাস্থলে বিবৃত হইবে।

(২৪) পণ্ডিত ড্রাপার বলিয়াছেন,—

"Philosophy among the Arabs thus took the same direction that it had taken in China, in India, and indeed throughout the East. Its whole spirit depended on the admission of the indestructibility of matter and force.....and the emanation of the spirit of man from the universal intellect, the divinty, and its final reabsorption."

(Draper's Conflict between Religion and Science, p. 140).

হইয়াছিল। (২৫) গ্রীসরাজ্য ধ্বংসের পর সমস্ত ইউরোপ যে অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইয়াছিল, তাহাতে ইউরোপে খ্রীঃ অব্দের প্রথম হইতেই প্রায় জ্ঞান চর্চ্চা একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ প্রকৃত দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন না। যাঁহারা দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই খ্রীষ্ট ধর্ম্মানুমোদিত মতের পোষক যুক্তি দেখাইতেন মাত্র। তখন গ্রীক্‌দের দর্শনশাস্ত্র ইউরোপে প্রচলিত ছিল না। ক্বচিৎ কোন খ্রীষ্টান মঙ্ক গোপনে তাহার আলোচনা করিতেন, এই পর্য্যন্ত। খ্রীঃ অব্দ ৮০০ শতাব্দীতে প্রথম ইরিজিনা নামক পণ্ডিত আরিষ্টটেলের দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তৎপ্রতিপাদিত বেদান্ত মত প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তিনি খ্রীষ্টান পাদরিদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন মাত্র।

তাঁহার পরে খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবেরোর দ্বারাই ইউরোপে উক্ত বেদান্ত মত সর্ব্বত্র প্রচারিত ও গৃহীত হয়। আবেরোর মত স্পেন হইতে দক্ষিণ ফ্রান্স ও তথা হইতে উত্তর ইতালীতে প্রচারিত হইয়াছিল। অন্য দিকে সিসিলি দিয়া দক্ষিণ ইতালিতে উহার প্রচার হইয়াছিল। তাহার পর ইংলণ্ড ও জর্ম্মানিতে ঐ মত প্রচারি হয়। ফ্রান্সে খ্রীষ্টান্ ফ্রান্‌সিস্‌কান্ সম্প্রদায় ঐ মত অবলম্বন করেন। কোন কোন খ্রীষ্টান দার্শনিক পণ্ডিত ঐ মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইউরোপীয় ইহুদি ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে অনেকে ঐ মত অবলম্বন করিলেন। (২৬) তখন খ্রীষ্টান পাদরিদের চক্ষু ফুটিল, তাহারা ঐ মত সমূলে উৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইল। মধ্যযুগের কোন কোন খ্রীষ্টান দার্শনিক বিশেষতঃ এল্‌বার্ট ও টেমাস্ একুইনাস্ ঐ মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্পেনে খ্রীষ্টান পাদরিগণ এই মতাবলম্বী লোকদের উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রায় দশ সহস্র লোককে দগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইল; লক্ষাধিক লোক নির্ব্বাসিত হইল। স্বয়ং পোপ ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। (২৭) এইরূপে খ্রীঃ অঃ ষোড়শ শতাব্দী মধ্যে ইউরোপে এই মত প্রচার একরূপ বন্ধ হইয়া আসিল। (২৮)

কিন্তু যখন একবার ইউরোপে জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন সে বিকাশ বন্ধ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

(২৫) পণ্ডিত ড্রাপার বলিয়াছেন,—

"In the intellectual history of Arab is, the few and the Saracens are continually seen together.....From them conjointly western Europe derived its philosophical ideas which in the course of time culminated in averroism."

The doctrine of emanation and absorption was introduced into Europe by the Spanish Arab.

(Drapers conflict between Religion and Science p. 119-151.)

(২৬) মোক্ষমূলার কৃত Centenary Translation of Kant's Critique of Reason গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ইউরোপের এই সময়ের দর্শনের সাধারণ অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা এইরূপে বিবৃত হইয়াছে,—

"Mediæval philosophy is the Christian philosophy of pure subjectivism—the doctrines of absolute Intelligence or Mind, not of Ego or the subject.....The world was made subjective in God...The doctrine is akin to Platonic Idealism and Pythagorean harmony. Everything it held proceeded by emanation from the Eternal one."

"This led to the renunciation of the objective world and to asceticism and mysticism. Enthusiasm, Ecstacy, subjective absorption in the infinite depths became powerful....."

এই সময়ে ইউরোপে গ্রীক্ ও লাটিন ভাষা চর্চ্চা আরম্ভ হইতেছিল। বিদ্যালয়ে এই সকল ভাষা শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইল। তখন ধীরে ধীরে আবার আরিষ্টটেল ও প্লেটোর মত এবং অন্যান্য গ্রীক্ দার্শনিকদিগের মত প্রচার হইতে লাগিল। তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্লেটোর মত অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। আবার ইউরোপে দর্শন শাস্ত্র আলোচনা আরম্ভ হইল। আবার বেদান্ত মত প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল। মিস্‌টিসিজম্ বা আইডিয়ালিজম্ নামে এই মত প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল। মিস্‌টিসিজম্ কতকটা বেদান্তমত ও যোগমত সমবায়ে সৃষ্ট; জারসন্ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই মত ইউরোপে প্রচার করেন। তাহার পর একার্ট এইরূপ মত অবলম্বন করেন। ব্রনো এইরূপ মত প্রচার করেন—খ্রীষ্টান পাদরিগণ সেজন্য তাঁহাকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল।

আধুনিক অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকদিগের মধ্যে স্পাইনোজা, মেলব্রাঞ্চ, বার্কলে এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন। অধুনা জর্ম্মানি দেশই এই মতের প্রধান প্রতিষ্ঠা স্থান। ক্যাণ্টের সময় হইতে, এ পর্য্যন্ত জর্ম্মান দেশে যে দর্শনশাস্ত্র আলোচনা ও নূতনরূপ দার্শনিক মত প্রচার জন্য জর্ম্মান পণ্ডিতগণ ইউরোপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, জর্ম্মানিতে সংস্কৃত চর্চ্চাই তাহার কারণ। জর্ম্মান পণ্ডিতগণ আমাদের দার্শনিক মত আপনার করিয়া লইয়া তাহাতে আধুনিক রুচিসঙ্গত আবরণ দিয়া সাধারণে প্রচার করিতেছেন। (২৯) জর্ম্মান দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বেদান্ত মত, কেহ সাংখ্য মত প্রচার করিয়াছেন। কেহ কেহ উভয় মত সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতগণের মধ্যে ক্যাণ্ট, ফিক্তে, সেলিং, সেপেনহর, হেগেল, হার্টমেন—ইঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য। সপেনহর ও তৎপরে তাঁহার মতানুবর্ত্তী পলডুসেন যে উপনিষদ হইতে তাঁহাদের দর্শন মত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে ষ্টারলিং, গ্রীন, কেয়ার্ড, ব্রাডলি প্রভৃতি যে মত প্রচার করিতেছেন, তাহা কতক পরিমাণে বেদান্ত মতের অংশ।

আর কেবল দার্শনিকদিগের মধ্যেই যে এইরূপ বেদান্ত মত প্রচারিত আছে, তাহা নহে। অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই এই মতের অনুগামী (৩০) সাহিত্যে, কাব্যে

(২৭) পোপ ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

"Let him be Anathema who says that spiritual things are emanations of the divine substance, or that the divine essence by manifestation or development becomes all things."

(২৮) Ecclesiastical authorities succeeded in repressing them (these opinions) in the sixteenth century, but they never altogether disappeared."

(Draper's conflict between Religion and Science p. 121.)

(২৯) ডেভিস্ তাঁহার হিন্দু ফিলসফি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"It is interesting and instructive to note how often the human mind moves in a circle. The latest German philosophy, the system of Schopenheaur and Von Hartmann is mainly a reproduction of the philosophic system of Kapil."

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"The oldest and the latest system of philosophy though severed in time by more than two thousand years speak with the same voice."

(৩০) সপেনহর স্বীকার করিয়াছেন,—

এই মত প্রবেশ করিয়াছেন। বিলাতের কারলাইল—আমেরিকায় ইমারসন কতকটা এই মত প্রচারক। ইংলণ্ডে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সেলি, টেনিসন প্রভৃতি,ও জর্ম্মানিতে প্রসিদ্ধ গেটে প্রভৃতি কবি এইরূপ মত প্রচার করিতেছেন। "জানোনি" প্রভৃতি অনেক উপন্যাসে এই মতের অবতারণা হইতেছে। সুতরাং খ্রীষ্টান ইউরোপের অস্থি মজ্জায় এই মত প্রবেশ করিয়াছে। খ্রীষ্টের নিকট ইউরোপ কেবল "ভক্তি" "প্রেম" লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ভারত ও গ্রীসের দর্শন হইতেই ইউরোপ জ্ঞানশিক্ষা করিয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা আধুনিক ইউরোপীয় উন্নতির মূলে, যে জ্ঞান চর্চ্চা দেখিতে পাই,সে জ্ঞান ভারত হইতেই ইউরোপে নীত হইয়াছিল। আর সুধু জ্ঞানচর্চ্চা কেন, ইউরোপের ধর্ম্মও আমাদের সনাতন ধর্ম্মের উপর স্থাপিত,বাইবেলের খ্রীষ্ট ধর্ম্মমত সেই জন্য অনেক স্থলে আমাদের ধর্ম্মমতের অনুরূপ। সপেনহরের ন্যায় খ্রীষ্টান নিরপেক্ষ পণ্ডিত সে কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। (৩১) অতএব এক্ষণকার সমগ্র সভ্য জগৎ, ধর্ম্ম ও দর্শনের জন্য একা ভারতের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয়, আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই ঋণ স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। এজন্য তাঁহারা ভারতীয় সমগ্র দর্শন শাস্ত্র নিতান্ত আধুনিক—বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের অনেক পরে রচিত—এমন কি খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর পরে রচিত—ইহা অসার যুক্তি অথবা অযুক্তি রূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্য আমরা এস্থলে এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

"That the inner nature of all things is absolutely the same, this age had already grasped and understood, after the Eleatics, Erigena, Bruno, Spinoza had thoroughly taught, and Schelling had revived this doctrine."

(৩১) সপেনহর বলিয়াছেন,—

'New Testament Christianity... is Indian in spirit and therefore more than probably also of Indian origin, although only indirectly through Egypt."

(World as Will and Idea vol III. p. 281.)

সপেনহর অন্য একস্থানে বলিয়াছেন,—

"True spirit and kernel of Christianity as also of Brahminisn and Buddhism is the knowledge of the vanity of earthly happiness, the complete contempt for it and the turning away from it to an existence of another, nay an opposite kind."

(World as Will and Idea, vol III. p. 226.)

সম্প্রতি রুষীয় পাদ্রি নটভিস্ তির্ব্বত হইতে খ্রীষ্টের যে জীবন চরিত আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্ট স্বয়ং ভারতে ও তির্ব্বতে বহুদিন বাস করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। তবে মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থ জাল বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

দলাদলি।

মানুষ বাল্যকাল হইতে অনুকরণপ্রিয়। সে যেমন দেখিবে, যেমন শুনিবে, সর্ব্বদা সেইরূপ করিতে এবং বলিতে চেষ্টা করিবে। এই অনুকরণপ্রিয়তা উন্নতির মূল। মানুষ যে আজ এত উন্নত হইয়াছে, ইহার মূলে এই অনুকরণ-প্রিয়তা। অনুকরণপ্রিয়তার মূলে বিস্ময়, বিশ্বাস এবং তন্ময়তা। বালক যাহা দেখে, তাহাতেই বিস্মিত এবং তাহাতেই আস্থাবান। আস্থাবান বলিয়াই সেইরূপ করিতে চায়। বিস্ময় এবং তন্ময়তার মূলে শক্তিবোধ এবং মহত্ত্ব-স্মরণ। আমি যাহা পারি না, এ ব্যক্তি তাহা পারে; আমাপেক্ষা এ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, এইরূপ বোধ হইলেই অনুকরণে স্পৃহা

জন্মে। এইরূপ মহত্ত্ব স্মরণ হইতেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ মহত্ত্বের পূজায় উন্মত্ত। যাহার ভিতরে যে বিশেষত্বময় মহত্ত্ব দেখিবে, ইংলণ্ডের নরনারীর মুখে তাহার প্রশংসা আর ধরিবে না। প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে, দলপতিদিগের (Party leaders) মধ্যে মত-সংঘর্ষণ দেখা গেলেও, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, সর্ব্বদা তাঁহারা পরস্পরের মহত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া থাকেন না; যদি থাকিতেন, তবে ইংলণ্ডের এত উন্নতি হইত না। উচ্চ আদালতে প্রতিভাশালী সমকক্ষ আইন-ব্যবসায়ীদিগের তর্ক বিতর্ক, বাগবিতণ্ডা খুব দেখা যায়, কিন্তু ঘরে তাঁহারা পরস্পর বন্ধু। বিলাতের দলপতিদিগের ঝগড়া বিবাদও সেই রূপ—পার্লিয়ামেণ্টের সভায় মনে হয়,তাঁহারা ঘোরতর শত্রু, কিন্তু বাড়ীতে তাঁহারা পরস্পর বন্ধু। বন্ধুত্বের মূলে বিশ্বাস, মহত্ত্ব স্মরণ এবং বিশেষত্ব-বোধ বিদ্যমান। সেখানে প্রতিযোগীতা আছে, কিন্তু আত্মম্ভরিতা বা অহং-সর্ব্বস্ব-ভাব নাই। ভাল বলিয়া না জানিলে কেহ কাহাকে ভালবাসিতে পারে না। পরস্পরের মহত্ত্ব স্মরণ ভিন্ন বন্ধুত্বের উদয় অসম্ভব। আমি তোমাকে যদি ভাল বলিয়া না জানিতাম, তবে তোমাকে কখনও ভালবাসিতে পারিতাম না; ইহার মূলে এইকথা আছে, তোমার ভিতরে আমি এমন কিছু দেখিয়াছি, যাহা অন্যত্র পাই না। সেই জন্যই আমি তোমার জন্য পাগল। তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া আমি যাহা পাইয়াছি, অন্যত্র তাহা পাই নাই, তাই আমি তোমার দাস। এইরূপ বিশেষত্বময় মহত্ত্ব বোধ হইতেই প্রেমের উদয়। অনাবিল প্রেমের মূলেই অনুকরণ-স্পৃহা। বিশ্বনিয়ন্তা প্রেমশৃঙ্খলে নরনারীকে বাঁধিয়া পরস্পরের বিশেষত্ব-অনুকরণে মানুষকে উত্তেজিত করিয়াছেন। উন্নতির সোপান—এই অনুকরণ-স্পৃহা। পরিদৃশ্যমান জগতের, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত, লক্ষিত এবং অলক্ষিত, সকল শিক্ষার মূল অনুকরণ-স্পৃহা। ইহা না থাকিলে মানুষ, বংশপরম্পরায় এত উন্নতি লাভ করিতে পারিত কি না, সন্দেহ। বাণিজ্য, দেশ বিদেশকে আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিয়াছে, অর্থাৎ আপন পরকে, দেশ বিদেশকে এক সূত্রে বাঁধিতেছে—অনুকরণের মহা মেলা খুলিয়া দিতেছে। এই জন্য বাণিজ্যে জগতের এত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। বাণিজ্য, বাহিরের অভাব দূর করিতেছে, অন্তর রাজ্যের অভাবও দূর করিতেছে। মানুষ পরস্পর ভাই ভাই—সব জাতিই আপন, সকলের মধ্যেই বিশেষত্ব আছে, সকলকেই আদর করিতে হইবে, বাণিজ্য জগতে এই মহাশিক্ষা বিস্তার করিতেছে।

আমি বাল্যকালে ভাবিতাম, এ জগতে পর আবার কে, শত্রু আবার কি? যার কাছে যাই, তার নিকটই কিছু পাই;—ছোট বড় ত বুঝি না। বড় এক বিষয়ে বড়, ছোট আর এক বিষয়ে বড়। মহানের ছেলে সকলেই, কোন না কোন বিষয়ে, বা বিভাগে, সকলেই মহান, সকলেই বড়। তুমি বল, ঐ ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে, ঐ ব্যক্তি তোমার অনিষ্টের চেষ্টায় ফেরে। করে করুক, তাহাতে কি? নিন্দা করিয়া বা কে কি করিতে পারে, অনিষ্টই বা কে কি করিবে,যদি আমি ভিতরে খাটী থাকি। আমি যখন মন্দ, তখন জগতের সকলকেই

মন্দ দেখি, আর আমি যখন ভাল, তখন সকলকেই ভাল দেখি। আমিত্বের মলিনতানুসারে জগতের বিকৃতি দর্শন। আমি যখন মন্দ, তখন আমাকে মন্দ বলাই ত উচিত। আমা দ্বারা যদি কাহারও কোন উপকার বা সেবাই না হইল, আমাকে বিনাশ করা বা আমার অনিষ্ট করাই ত ভাল। অন্যে নিন্দা করিলে আমার আত্মদৃষ্টি বাড়ে,—অনিষ্ট যে করিতে চায়, প্রকারান্তরে সে-ই ইষ্ট করে। কাছে আসে, কাছে বসে—বসিয়া বসিয়া অনিষ্ট করিয়া যায় যদি একটু, দিয়া যায় অনেক বেশী। আহা, সে যদি স্বার্থচালিত হইয়া আমার মলিন আমিত্বের নিকট না আসিত, আমি কি তাহার অন্তর রাজ্যের মহাধনে ধনী হইতে পারিতাম? সেই জীবন-উষায় ভাবিতাম, এজগতে পর কেহ নয়, শত্রু মোটেই নাই। শত্রু কেবল আমার রিপু সকল, যাহারা আমাকে পাপের পথে লইয়া যাইয়া বধ করে। শত্রু কেবল সে, যে আমাকে পশুত্বে নমিত করে?

বাল্যকালের এই কথা, এখন বার্দ্ধক্যের উষায়, নিজের এবং অন্যের চরিত্র দেখিয়া যেন অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। দিন দিন আমরা হইতেছি কি? মানুষ মানুষকে আপন ভাবিবে, মানুষ মানুষের মহত্ত্ব দেখিবে, দেখিয়া শিখিবে, উন্নত হইবে, এই ত বিধাতার বিধান। এখন দেখি, মানুষ কেবল রক্ত পানে লালায়িত। ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপনের জন্য এ জগতে ধর্ম্মের উদয়—এখন দেখি, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সাধনে সকল ধার্ম্মিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেখি, মানুষ মানুষকে মারিবার জন্যই দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত। বুয়র সমর এবং চিন সমর—বাহিরে এবং ঘরে ঘরে। হায়রে হায়, জগতের অবস্থা এবং পরিণাম এতই মলিন!!

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এই বঙ্গপ্রদেশ—অনুন্নত, অশিক্ষিত, নির্ধন, দুর্ব্বল, দরিদ্র, অজ্ঞানতার গাঢ় তিমিরে নিমগ্ন। এই বঙ্গপ্রদেশের শতটী ভাইকেও আমরা আপনার করিয়া লইতে পারিলাম না! "ধর্ম্মে দলাদলি, সমাজে দলাদলি, সাহিত্যে দলাদলি, সঙ্গীতে দলাদলি, রাজনীতিতে দলাদলি—পরস্পরের রক্তপানে পরস্পর উন্মত্ত। এরূপ হীনাবস্থা জগতের আর কোথাও দেখিয়াছ কি?"

অনুকরণের মূলে প্রেম, দলাদলির মূলে বিদ্বেষ এবং হিংসা। অনুকরণের রাজ্যে প্রতিযোগীতার সংঘর্ষ আছে, কিন্তু হিংসার তীব্র দাহন নাই। মানুষ একরূপে বড় হইতে চায়—অন্যের প্রতিষ্ঠা এবং মহত্ত্ব অনুকরণ করিয়া। ইহার মূলে উচ্চাভিলাষ ও প্রতিযোগীতা আছে। অন্যরূপে বড় হইতে চায়—অন্যকে বিনাশ করিয়া। ইহার মূলে শুধু বিদ্বেষ। তুমি আমার প্রতিপক্ষ, আমি শক্তিতে কিছুতেই তোমাকে খর্ব্ব করিতে পারিলাম না, তোমাকে বিনাশ না করিলে,আমি আর বড় হইতে পারি না। বড় হওয়া—দুইয়েরই লক্ষ্য; কিন্তু এক স্বর্গ ধরিয়া এবং আর এক নরক অবলম্বনে। রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার তীব্র বাণে মাইকেলকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কেন, পাঠক বিচার করুন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরিয়া যাঁহারা মানুষ, তাঁহারা, বঙ্কিমের স্বর্গারোহণের পর, তাঁহাকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কেন, পাঠকগণ বিচার করুন। বিচার করুন,বঙ্গবাসীতে সঞ্জিবনীতে,আনন্দবাজারে কি দোষ ত্রুটী ভুলিয়া অমৃতবাজারে পবিত্র রজ্জুতে আবদ্ধ হইতে

ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-বিষ সর্ব্বদা উদ্গীরিত হয় কেন? রাজনীতির সভা একটী ছিল, দুটী হইল; সাহিত্য সভা একটী ছিল, দুটী হইল; সঙ্গীত সমাজ একটী ছিল, দুটী হইল; সারস্বত সমাজ ঢাকায় একটী ছিল, দুটী হইল; ধর্ম্মসমাজের কথা আর বলিব কি, সে ইতিহাস ত সকলেই জানেন। এ সকল কেন? আনন্দমোহন কৌন্সিল সভায় সম্মানের আসনে বসিতে চান, সীতানাথ বাধা দেন; শশিশেখরেশ্বর বড় হইতে চান, প্যারীমোহন বাধা দেন। হেরম্বচন্দ্র, কৃষ্ণকুমার জীবনের রক্ত ঢালিয়া আনন্দমোহনের প্রীত্যর্থে কত বৎসর সাধন করিলেন, শেষে অর্দ্ধচন্দ্র পুরস্কার পাইলেন! এখন পৃথক স্কুলের আয়োজন হইতেছে। এ সকল তীব্র হলাহলের ইতিহাস এদেশে অলিখিত থাকে থাকুক, কিন্তু ইহার মূলে কি শিক্ষা? বাঙ্গলার মাসিক পত্র পাঠ কর—মাসিক সাহিত্য সমালোচনার ছলনায় সেখানে ব্যক্তিত্বের বিনাশের কাহিনী লিখিত হইতেছে। একজনকে বধ করিয়া বড় হইবার ইচ্ছা দিন দিন সংক্রামিত ব্যাধির ন্যায় এদেশে বদ্ধমূল হইতেছে। পরনিন্দা, পর কুৎসা পাঠে এদেশের ভাল ভাল লোকের মনও সদা প্রফুল্ল। 'আমি বড়, আমি বড়, আমি ভাল, আমি ভাল, আর সব খারাপ" এই অহঙ্কার মূলক আত্ম-প্রতিষ্ঠা বঙ্গের ঘরে ঘরে। দলাদলি, রক্তারক্তি, ঝগড়া বিবাদ—নিন্দা গালাগালি ভিন্ন আর কিছু যেন এদেশে নাই। অযোগ্য এবং অসংযত পরনিন্দা সাহিত্যের ভিতর দিয়া এখন সমাজের অণুতে অণুতে প্রবিষ্ট হইতেছে। সুরেন্দ্রনাথ এবং মতিলাল, কাব্যবিশারদ, [illegible] বিনয়কৃষ্ণ এবং যতীন্দ্র বোধ হইতেই প্রেমের উদ্দীপেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ এবং রাজেন্দ্রনাথ—ইহাদিগের সকলেই প্রতিষ্ঠিত, প্রতিভান্বিত,—ক্ষমতাশালী, সহৃদয়, দেশানুরাগী, মাতৃবৎসল, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষ্টা কেন, বলিতে পার কি? একতায় উন্নতি, বিভাগে পতন—এই মূল শিক্ষা, উন্নতির এই প্রথম যুগে, মহারথীগণ ভুলিয়া যাইতেছেন কেন, বলিতে পার কি? লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ইহার উত্তর এক ভিন্ন দুই নয়—ইহার মূলে কেবল বিদ্বেষ,—ইহার মূলে কেবল অহং-সর্ব্বস্ব-ভাব। হায়রে বঙ্গদেশ!!

সে দিন একখানি সংবাদ পত্রে গ্রাম্য দলাদলির কথা পাঠ করিতেছিলাম। পাঠ করিতেছিলাম এবং অন্তর দগ্ধ হইতেছিল। বঙ্গদেশের কত পল্লীর কত দলাদলির কথাই জানি। সহরে সহরে বোর্ড, মিউনিসিপালিটী হইয়াছে, সে সকলের দলাদলির কত কথাই জানি। মহা সহর কলিকাতা, প্রতিভা আর পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি আর গবেষণা, কৃতিত্ব এবং জ্ঞান—এ সকলের খনি। একজন মহা পণ্ডিত বলিতেন, আমি কাজের ভিড়ে সদা ব্যস্ত রিপুর কথা ভাবিবার অবসর কোথায়? কলিকাতা কাজের উৎস। এখানে অবিরত কত মানুষ খাটিতেছে,—কাজের বিরাম নাই। এখানে কার্য্যের স্রোতে ভাসিতে পারিলে অসার স্বার্থ এবং রিপুর গণনা কৃতী মানুষের মধ্যে আসিতে পারে কি? কিন্তু হায়, এ হেন সহরেও কলুষিতচিত্ততা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা, হিংসা বিদ্বেষ পূর্ণ মাত্রায় প্রদীপ্ত। একজনের নিকট একজনের প্রশংসা কর, অমনি সেখানে মহা গর্জ্জন আরম্ভ হইবে। স্কুলের ছাত্র হইতে কলেজের শিক্ষক পর্য্যন্ত, হিতৈষীর প্রাঙ্গণ হইতে সম্পাদকের বৈঠক পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই

অবাধ পরনিন্দার গরল সদা উদ্গীরিত হইতেছে। সে কালের কবির লড়াই, এ কালের সংবাদ পত্রের কুৎসিৎ ভাষা পড়িয়া লজ্জা পাইতেছে। সেই জন্যই বুঝিবা কবির দল সকল বিলুপ্ত। তুমি যদি ধৃষ্টতা পূর্ব্বক সম্পাদকগণের নীচতার বিরুদ্ধে লেখ, তুমি রুচিবাগীশ বিশেষণে ভূষিত হইয়া উপহসিত এবং উপেক্ষিত হইবে। কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্র সকল মেছুনীর হাটে পরিণত হইয়াছে, কলিকাতার চাদ্‌নীর দোকানীরা এবং বাজারের মেছুনীরা এখন লজ্জায় অধঃবদন হইয়াছে। দেশের শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিলে প্রাণ অস্থির হয়। গত ৬।৭ বৎসরের মধ্যে যত লাইবেল মকদ্দমা এই বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াছে, বোধ হয়, তাহার পূর্ব্বের ৫০ বৎসরের মধ্যেও তত হয় নাই। মানুষের মান বাড়িয়াছে, আস্পর্দ্ধাও বাড়িয়াছে। দলাদলির নূতন নাটকের নূতন নূতন অঙ্ক প্রত্যহই অভিনীত হইতেছে। গত কয়েক বৎসরের বড় বড় লাইবেল মকদ্দমায় এদেশের বড় বড় লোকেরা কোন না কোন পক্ষ-সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই সূত্র হইতে কলিকাতায় বিষম দলাদলির বীজ রোপিত হইয়াছে। সেই বীজ এখন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। বিভক্ত সভা সমিতির অন্তরালে সেই বীজ মুকুলিত। সম্বাদ পত্র সকল পক্ষবিশেষের মুখ পাত্র-স্বরূপ হইয়াছে। যে পক্ষের কাগজ ছিল না, সে পক্ষ রাতারাতি কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। সংবাদ পত্র বর্ত্তমান যুগের দলাদলির মুখপাত্র স্বরূপ হইতেছে। হিংসা বিদ্বেষের উদ্গীরিত কলুষ রাশিতে দেশ পরিপূর্ণ।

কয়েক বৎসরের মধ্যে এ দেশে অনেক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গলাভাষার গৌরবের বিষয় কেহ কেহ বলেন। কিন্তু পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরের গালাগালি যে কাগজে না থাকে, সে কাগজের তেমন কাট্‌তি নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয়, গালাগালি শ্রবণের জন্য দিন দিন লোকের ঔৎসুক্য বাড়িতেছে। ইহাতে উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় না; ইহা ঘোরতর দুর্দ্দশার কথা। যে দেশের লোকেরা পরকুৎসা করিতে ভালবাসে এবং যে দেশের লোকেরা পরকুৎসা শুনিতে লালায়িত, সে দেশের পরিণাম কি? মহত্ত্ব স্মরণ, মহত্ত্ব চিন্তন ভিন্ন কখনও কোন ব্যক্তি, কোন জাতি উন্নত হইতে পারে না। পরনিন্দা, পরকুৎসা লিখিয়া লিখিয়া, এবং শুনিয়া শুনিয়া আমাদের আত্মা ও মন কলুষিত হইয়া গিয়াছে, আমরা দিন দিন দুর্গতির পূতিগন্ধময় প্রদেশে নিমগ্ন হইতেছি। দুর্গন্ধে মজিতে মজিতে, পচিতে পচিতে আমাদের ভালমন্দ বিচারশক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আমরা দিন দিন মনুষ্যত্বের অযোগ্য হইতেছি। এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে এদেশের আর মঙ্গল নাই। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইয়া উন্নতি লাভের আশা নাই। "বিভাগ করিয়া শাসন করা গবর্ণমেণ্টের দুর্জ্জয় নীতি; আমরা যদি এই কলুষিত রীতিকে পদদলিত করিয়া একতা এবং সাম্য, সদ্ভাব এবং পুণ্যের পথে অগ্রসর হইতে না পারি, এদেশের মঙ্গল নাই। ভারতের দুর্দ্দশা এবং দুর্গতির শেষ নাই, এখন সকলে, ব্যক্তিগত প্রাধান্য ভুলিয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, ব্যক্তিগত দোষ ত্রুটী ভুলিয়া যদি একতার পবিত্র রজ্জুতে আবদ্ধ হইতে

না পারি, এদেশের মঙ্গল নাই। এদেশ ডুবিয়াছে, সকলে একত্র মিলিত না হইলে কখনও এদেশের উদ্ধার হইবে না। হিতৈষীগণ সতর্ক হউন।

বাঙ্গালা বর্ণমালার অসম্পূর্ণতা।

বাঙ্গালা বর্ণমালা দেবনাগরী হইতে উদ্ভূত। সংস্কৃত ভাষা লিখিবার জন্য এই বর্ণমালাই যথেষ্ট। সংস্কৃত মৃতভাষা—বহুদিন মৃত। দীর্ঘকাল ইহার বৃদ্ধি নাই। বৃদ্ধি নাই, সুতরাং নূতন কোন প্রয়োজনও ইহাতে উপস্থিত হয় না। যাহার প্রাণ আছে, যাহার পুষ্টি আছে, পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার নূতন অভাব সকল সমুপস্থিত হয়, এবং এই সকল অভাব মোচনার্থ প্রয়াসেই তাহার উন্নতি।

বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতেরই বংশধর। অধিকাংশ বাঙ্গালা শব্দ সংস্কৃত শব্দের রূপান্তর মাত্র। অপর অনেক বাঙ্গালা শব্দে ও সংস্কৃত শব্দে কোন প্রভেদই নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভিত্তি সংস্কৃত ব্যাকরণের উপরই স্থাপিত। এমন সময় ছিল, যখন বাঙ্গালাতে সংস্কৃত মূলক ভিন্ন অন্য শব্দ স্থান পায় নাই। কালক্রমে অনার্য্য পার্ব্বত্য জাতিদিগের কতগুলি কথা বাঙ্গালাতে প্রবেশ করে। ১২০৭ খ্রীঃ অব্দে মুসলমানেরা বাঙ্গালা জয় করিলে জেতৃগণের সংস্পর্শে বাঙ্গালাতে অনেক আরবী ও পারসী শব্দ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়। আবার যে দিন ইংরেজেরা হতবল মোগল-কর হইতে বাঙ্গালার সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছেন, সেইদিন হইতে নূতন নূতন ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালাতে নিত্যই দত্তকরূপে গৃহীত হইতেছে।

যতদিন আমরা একাকী থাকি, ততদিন আত্মতৃপ্ত থাকি—আপনাদের কোন অভাব বা দোষ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই না। কিন্তু যখন অন্যের সঙ্গে আমাদের দেখা শুনা হয়, তখন তুলনার চক্ষে আমরা আপনাপন অভাব প্রত্যক্ষ করি। ভাষা সম্বন্ধেও এইরূপ—যতদিন বিদেশী কোন ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার তুলনা হয় নাই, তত দিন ইহার যে কিছু অভাব আছে, এরূপ চিন্তা আমাদের আদৌ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ২।১টী বিদেশী ভাষার সম্মিলনে বাঙ্গালার কিয়ৎ পরিমাণ অসম্পূর্ণতা আমাদের নিকট পূর্ণ প্রতীয়মান হইতেছে।

সংস্কৃত মূলক শব্দগুলি লিখিবার জন্য বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালাই যথেষ্ট। কিন্তু অনেক আরবী, পারশী ও ইংরেজী কথা এমন আছে, যাহা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে হইলে বাঙ্গালাতে অক্ষরের অকুলন হয়। এই অভাব মোচনার্থ বাঙ্গালায় নূতন কয়েকটী বর্ণ সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে।

ক, খ, গ বাঙ্গালায় জিহ্বা মূলীয় বর্ণ। পারসীতে এ তিনটী জিহ্বা মূলীয় ছাড়া এতদনুরূপ আর তিনটী কণ্ঠ্য বর্ণ আছে—কাফ (১ম) খে, গায়েন। ইহাদের মধ্যে কোন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ বাঙ্গালায় লিখিতে হইলে শুদ্ধ করিয়া লিখিবার যো নাই। বাঙ্গালায় "কলমের" ক, "খারাপের" খ, ও "দারোগার" গ জিহ্বা মূলীয়, কিন্তু বাস্তবিক পারশীতে ঐ অক্ষরগুলি কণ্ঠ্য। হিন্দিতে নীচে বিন্দু বসাইয়া এই বর্ণগুলি লিখিত হয় বলিয়া ইহাদের উচ্চারণও ঠিক হইয়া থাকে। বাঙ্গালাতেও এই অক্ষর-

গুলি ঐরূপ বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত হইলে মূল ভাষার প্রকৃত উচ্চারণ জ্ঞাপন করিতে পারে। কিন্তু এই অক্ষরগুলি একেবারেই না হইলে নয়, এমন নহে। অনেক আরবী ও পারশী শব্দ বহুদিন বাঙ্গালাতে বাস করিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে। সুতরাং ইহাদিগকে বাঙ্গালা পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিতে অনেকেরই আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু ঐ ভাষাদ্বয় হইতে নূতন কোনও শব্দ বাঙ্গালাতে প্রচলিত করিতে হইলে এই পরিবর্ত্তিত অক্ষরের প্রয়োজন হইতে পারে।

ইংরেজী কথাগুলির কথা স্বতন্ত্র। ইংরেজী বর্ত্তমান রাজভাষা, শিক্ষিত সভ্যদের ভাষা। শুদ্ধরূপে ইংরেজী লেখা ও উচ্চারণ করা প্রত্যেক বাঙ্গালীর অভীপ্সিত। শিশুকাল হইতে আমরা বিশুদ্ধভাবে ইংরেজী বর্ণগুলি উচ্চারণ করিতে যত্নবান হই। ভ্রমেও একটী ইংরেজী কথার উচ্চারণ ভুল হইলে আমাদিগকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালা পুস্তকে ইংরেজী কথা শুদ্ধরূপে লিখিত হউক, এরূপ ইচ্ছা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

ইংরেজীতে 'Z' উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বাগ্র ও দন্তের ভিতর দিয়া শ্বাস বাহির করিয়া দিতে হয়। বাঙ্গালায় এরূপ কোন অক্ষর নাই। 'Z' সম্বলিত কোন ইংরেজী কথা বাঙ্গালায় লিখিতে হইলে 'Z' দ্বারা কাজ সারিতে হয়। কিন্তু ইংরেজী 'Z' ও বাঙ্গালা 'জ'তে আকাশ পাতাল প্রভেদ। হিন্দি রীত্যনুসারে 'জ'র নীচে একটী বিন্দু বসাইয়া 'Z' বানাইলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। সংস্কৃতে 'Z' এর অনুরূপ কোন উচ্চারণ নাই। 'জ' যুক্ত বাঙ্গালা কথাগুলি পূর্ব্ববঙ্গে 'Z' যুক্ত বলিয়া উচ্চারিত হয়। 'জমিদার', 'জবরদস্তি', 'জোর' প্রভৃতি পারশী শব্দ পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরাই শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজকাল পশ্চিমাঞ্চলের অনুকরণে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত অধিবাসীগণও ঐ কথাগুলির উচ্চারণে ভুল করিতেছেন।

ইংরাজীর 'V' বাঙ্গালাতে 'ভি' বলিয়া লিখিয়াছে। বাঙ্গালায় 'ভ' ওষ্ঠ্য বর্ণ; কিন্তু ইংরেজীর 'V' দন্তৌষ্ঠ্য—উচ্চারণে উপরের দন্তপাঁতি দ্বারা অধর ঈষৎ স্পর্শ করিয়া শ্বাস ছাড়িয়া দিতে হয়; আর 'ভ'তে অধর ও ওষ্ঠের সংযোগ, শ্বাস ছাড়িয়া না দিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং 'ভ' দ্বারা 'V' লিখিত হইতে পারে না। বাঙ্গালী শিশুদের জন্য যাঁহারা ইংরেজী ব্যাকরণ লেখেন, তাঁহারা 'Z'কে 'জেড্' ও 'V'কে 'ভি' লিখিয়া বড়ই অনিষ্ট করেন। কারণ শিশুগণ ইহা দ্বারা বিকৃত উচ্চারণ শিক্ষা করিতে থাকে। অনেকে অতি কোমল বয়সে রজতা শিক্ষা করে, বড় হইলে আর তা আকুল করিতে পারে না। বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছাত্রগণ 'V'কে অন্তস্থ 'ব' র মতন উচ্চারণ করিয়া থাকে। তাহাদের এই উচ্চারণও ভ্রমাত্মক; কারণ অন্তস্থ 'ব' র প্রকৃত প্রতিরূপ 'V' নহে, 'W'। কিন্তু এই উচ্চারণ তাহাদের মধ্যে এমন বদ্ধমূল হইয়াছে যে, শতবার সতর্ক করিয়া দিলেও তাহারা 'V' শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় 'V' স্থানে 'হ্ব' এই যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়। 'গভর্ণমেণ্ট' না লিখিয়া মাহ্রাটাগণ 'গহ্বর্ণমেণ্ট্' লিখিয়া থাকেন (সাধনা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম ভাগ, ৫১৮ পৃঃ—'মারাঠী ও বাঙ্গালা'

প্রবন্ধ)। কিন্তু 'হ্ব' 'ভ' অপেক্ষা অনেকটা 'V'র কাছাকাছি হইলেও প্রকৃত পক্ষে এই দুই উচ্চারণ এক নহে। এ স্থানেও 'ভ'র নীচে বিন্দু বসাইয়া এই দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণের অভাব দূর করা যাইতে পারে।

নাগরীতে দুইটী 'ব' আছে। প্রথমটীকে বর্গীয় ও দ্বিতীয়টীকে অন্তস্থ বলা হয়। সংস্কৃত ইহাদের উচ্চারণ স্বতন্ত্র এবং লিখিবার প্রণালীও কথঞ্চিৎ ভিন্ন। বর্গীয় 'ব'য়াওষ্ঠ্য; ইংরেজী 'B' ও পারসী 'বে'র মত উচ্চারিত হয়; উচ্চারণ সময়ে অধরে ওষ্ঠ চাপিয়া, শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। অন্তস্থ 'ব' ইংরেজী W'ও পারসী 'ওয়াও' একই ভাবে উচ্চারিত; উচ্চারণকালে অধরে উপরের দন্ত ঈষৎ লাগাইয়া শ্বাস ছাড়িয়া দিতে হয়। সংস্কৃতে প্রথম 'ব'র বাম ভাগের কোন একটী রেখা দ্বারা কাটিয়া দেওয়া হয়; হিন্দিরও এই রীতি। বাঙ্গালাতেও এই প্রথা চলিত হইলে এই দুইটী বর্ণের উপরহন্ন উচ্চারণে আর কোন গোল থাকেনা। বাঙ্গালাতে বর্ত্তমানে দুইটীই নাই বে লিখিত ও পঠিত হয়। ইংরেজিগের ক' ও বাঙ্গালা 'ফ' এক বর্ণ নহে। বাঙ্গালায় 'ফ' ওষ্ঠ্য বর্ণ—উচ্চারণে শ্বাস মুখের ভিতরেই আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ইংরেজী 'F' দন্তৌষ্ঠ্য; দন্ত ও অধরের ভিতর দিয়া শ্বাস বাহির করিয়া দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। এখানেও হিন্দিতে বিন্দু প্রয়োগই ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। 'ফ'র নীচে একটী বিন্দু বসাইয়া হিন্দি লেখকগণ 'F'এর কাজ চালাইয়া থাকেন। আমরা ইদানীং ইংরেজীর অনুকরণে বাঙ্গালা 'ফ'কে প্রায় 'F' বানাইয়া তুলিয়াছি। ইংরেজীওয়ালাদের মুখে এখন 'ফ' 'F'এ বড় একটা প্রভেদ নাই।

ইংরেজীতে একটী যুক্তাক্ষর আছে 'Zh'; ইহার উচ্চারণ "শ" ও নয়, "জ" ও নয়। তালুতে জিহ্বাগ্র লাগাইয়া একটু জোরে শ্বাস ছাড়িয়া দিলে তবে 'Zh' এর প্রকৃত উচ্চারণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালাতে এই উচ্চারণ বিশিষ্ট কোন শব্দ লিখিবার শিশুপাঠ্য ব্যাকরণ-লেখক ভিন্ন অন্যের বড় একটা দরকার হয় না। আবশ্যক হইলে 'শ'র নীচে একটী বিন্দু বসাইয়া 'Zh' এর কার্য্য চালাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

আচার্য্য মোক্ষমুলর ভূমণ্ডলের যাবতীয় ভাষা রোমান বা বর্ত্তমান ইংরেজী অক্ষরে লিখিত দেখিতে চান। ভারতীয় উর্দ্দু, পালি, খাসিয়া প্রভৃতি ভাষা রোমান অক্ষরে লিখিত হইতেছে। কিন্তু ইংরেজী বর্ণমালার অসম্পূর্ণতা বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে অনেক বেশী। সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভাষার ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ রোমান অক্ষরে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতে পারে না। এই জন্য ইংরেজী বর্ণমালায় অনেকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রচলিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে উর্দ্দু শিক্ষা করা অনেক সময়ে আবশ্যক। কিন্তু পারসীকদিগের লিখিবার প্রণালী এত কদর্য্য যে, ঐ ভাষা শিক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। ঐ ভাষায় লিখনকালে স্বরচিহ্ন সকল ব্যবহৃত হয় না—শব্দগুলি কেবল ব্যঞ্জন সমষ্টি—আবার একই রকমে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ লিখিত হয়; কাজেই পূর্ব্বে উর্দ্দুতে কিছু দখল না জন্মিলে ঐ ভাষা পড়া যায় না। স্বর চিহ্নের অভাব বশত প্রসিদ্ধ মৌলবীগণও অনেক সময়ে পাঠে ভুল করিয়া থাকেন। এবং হস্তলিখিত দলিল, দস্তাবেজ বিভিন্নরূপে পঠিত হইতে পারে বলিয়া আইন আদালতে প্রতারণা অনেক

হয়। বাঙ্গালা অক্ষরে উর্দ্দু শিক্ষার পুস্তক ইতি পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে যে বাঙ্গালী স্বল্পায়াসেই উর্দ্দু শিখিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রস্তাবিত উপায়ে পরিবর্দ্ধিত হইলে বাঙ্গালা বর্ণমালা দ্বারা শুধু উর্দ্দু কেন, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষাই লিখিত হইতে পারিবে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস গুপ্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

কবির মৃত্যু।*

আঁধারিয়া দীন বঙ্গ কবিতা-কানন,
জগতের স্নেহ মায়া ছাড়ি,
কোথা; কোন্ দেশে! কবি করেছ গমন
অশ্রুসিক্ত স্নিগ্ধ পথ ধরি!

(২)

ছায়া সুপ্ত বরষার সস্নেহ পরশে
ফুটিয়াছে যূথী ফুলগুলি,
বিমল "দুইটী তারা" রয়েছে আকাশে,
হায়, শুধু তুমি গেলে চলি!

(৩)

কেমনে ভুলিলে কবি গোলাপবালায়,
সে ত হায় ভুলেনি তোমারে,
আধখানি অঙ্গ ঢাকি শ্যামল পাতায়
দেখ সে নাচিছে ধীরে ধীরে।

(৪)

দেখ তোমা লাগি শ্যাম মাধবী বল্লরী
কিশলয়ে সাজিছে আবার,
সেফালিকা সুপ্তিশেষ দূরে পরিহরি
প্রকাশিছে সুষমা তাহার।

(৫)

ফুলময়ী প্রকৃতির বিলাস বাসর
তুমি কি গো দেখিবেনা আসি?
ধরার এ মনোরম মাধুরী সুন্দর
অনন্তে কি যাবে তবে মিশি?

(৬)

ফিরিবে না আর কি গো এ ধরা মাঝারে
ত্যাজিয়া সে শান্তিময়ী পুরী,
হৃদয় শ্মশান কিগো শুধু চির তরে
রবে তব স্মৃতিটুকু ধরি?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

* কবিভ্রাতা ৺ নিত্যকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত।

রজনী।

আলো করি দশদিক্
চেয়ে আছে অনিমিখ
নির্ম্মল সুনীলাকাশে পূর্ণ শশধর;
ছড়ায়ে সুরভি চুল
হাসিছে কানন-ফুল,
রজত জোছনা মাখা দিক দিগন্তর।
আকুল সে পিককুল ভ্রমে কুঞ্জে কুঞ্জে,
ঘুম ঘোরে প্রজাপতি
শুনিছে স্বপন-গীতি,
প্রকৃতি গাঁথিছে মালা বসি বন-মঞ্চে।
পবিত্র সরল শুদ্ধ নক্ষত্র সুন্দর,
ঝরিয়া শিশির বিন্দু
গড়িতেছে ক্ষুদ্র সিন্ধু,
খুলেছে প্রকৃতি যেন পুণ্যের নির্ঝর।
প্রকৃতির মহা শোভা মহা মহোৎসব,
পথে পথে, ঘাটে মাঠে,
সরসীর শ্যাম তটে,
জোনাকি জোছনা মাখা—কুসুম সৌরভ।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

দয়ার নিদয় রূপ।

হয়েছে তোমার তরে
আকুল আকুল প্রাণ,
দেখাইয়ে প্রেমমুখ
প্রেমময় রাখ প্রাণ ;
জুড়াইবে পাপ আঁখি
জুড়াইবে প্রাণ মন,
নয়নের কোণে দিলে
একবার দরশন।
ঘন ঘটা অন্ধকারে
দিনেশ পড়িলে ঢাকা,
নির্জ্জীব জগৎ হয়
মলিন বিষাদে মাখা ;
না দেখিলে প্রেমমুখ
তোমার তেমতি হায়,
আমার প্রাণের জ্যোতি
একেবারে নিবে যায়!
নয়নে উথলি উঠে
প্রাণের কালিমা রাশি,
কঠোর কুরূপ ধরে
তরুলতা, রবি, শশী ;
জীবন্মৃত হই, হয়
জীবন যাতনাময়,
অন্তরে বাহিরে হেরি
মৃত্যুময় সমুদয়!
কাতরে করুণা কর,
নিরাশ করোনা প্রভু,
দেখাইতে প্রেমমুখ
বিমুখ হ'ওনা কভু ;
আমারে নিদয় তুমি,
এও কি কখন হয়?
দয়াই প্রকৃতি তব,
জানি তুমি দয়াময়!
মিলনে কৃতার্থ তুমি
করেছ করেছ যারে,
বিরহের এ প্রদাহ
সেই তো সহিতে পারে ;
ক্ষীণাঙ্গ পতঙ্গ আমি,
আশ্বাসে জীবন ধরি,
দয়ার নিদয় রূপ
আমি কি সহিতে পারি?
চেয়ে দেখ প্রেমময়,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে
কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
প্রাণ যে কেমন করে!
ঘুচাবে সকল দুখ
ও প্রেম মুখের জ্যোতি,
চেয়ে দেখ প্রেমময়,
প্রেমানন্দের এ মিনতি।

প্রেমানন্দ।

বাঙ্গালির ছেলে।

বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয় ;
নিস্তেজ দুর্ব্বল হিয়া,
প্রলোভনে পদ দিয়া,
শেষে অনুপায় দেখি, করে হায় হায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
লম্ফ ঝম্প, হাঁকা হাঁকি,
দেশোদ্ধারে ডাকা ডাকি
সভায় করিয়া, ঢুকে শৃগাল-গুহায় ;
বাঙ্গালির ছেলে, তোরা কে দেখিবি আয়।
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অনুপম,
বাল্যে তারা রবি সম,
অর্দ্ধমৃত হয়ে যায় যৌবন-ঊষায় ;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
কিশোর বয়স কালে,
কি জানি কি পাপ ফলে,
কলঙ্ক কালিমা কেবা বদনে মাখায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।

সুবিশাল পরিবার
চাহিছে বদনে যার,
বিলাসিতা আসি তারে নাশ করে যায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
বিজাতীয় ভাষা শিখে,
মায়ের অসভ্য দেখে,
অবজ্ঞায় অনাদরে যায় ঠেলে পায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
ফিরায়ে চিকণ বেশ,
চুরুট ফুকায় বেশ,
ছড়ি, ঘড়ি, চশমাতে কিবা শোভা পায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
সদাই হুজুগে চলে,
মোহের কুহকে ভুলে,
প্রেম বলে ফণীহার বাঁধিছে গলায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
বিয়ে করে বাল্যকালে,
যৌবনে সন্তান-জালে
বিজড়িত হয়ে, শেষে দেখে অনুপায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
কে জানে কি ধাতু দিয়া
গড়া তাহাদের হিয়া,
ভুলিলা বিধাতা দিতে সাহস তাহায় ;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবে আয়।
হীনতায় পূর্ণ বুক,
সহিতে না পারে দুখ,
ননীর পুতুল তারা বাতাসে মিশায় ;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
কদাচারে কাঁদে জায়া!
বাপ মারে নাহি মায়া,
ভাই বোনে নাহি পালে স্নেহ মমতায় ;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই,
বিসম্বাদ সর্ব্বদাই,
দেখিতে না পারে এরা কভু একতায় ;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
হারায়েছে মনুষ্যত্ব,
ভুলে গেছে নীতিতত্ত্ব,
আত্মসুখ ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাবে সর্ব্বদায় ;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
শ্রমেতে বিমুখ এরা,
শ্রম করে অসভ্যেরা ;
"সত্য" বাঙ্গালিরা শুধু প্রভু-লাথি খায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
ষাট্ বর্ষে মরে দারা,
তবু দারা গ্রহে তারা,
নাহি লজ্জা বোধ কিম্বা অপযশ তায়।
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
বালিকা বিধবা বালা
সহিছে বৈধব্য জ্বালা,
তার তরে ব্রহ্মচর্য্য আছে ব্যবস্থায়!!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।

শ্রীপঙ্কজিনী বসু।

বৈরাগ্য।

অলক্ষিতে সুখ দুঃখ আসে,
আবার অলক্ষে ভেসে যায়,
ভাবিতে দেয়না অবসর,
কিবা ছিল কিবা গেল হায়!

মোর কেহ সাধনার নয়—
তারা আসে নীরবে পালায়,
মোর হৃদি রঙ্গভূমি যেন,
তারা এসে দুদণ্ড খেলায়!

বিয়োগান্ত নাট্যভূমি সম
পড়ে আছি, নীরব চেতনা—
তারা এসে হেসে দলে যায়,
পড়ে থাকে শ্রান্তির মূর্চ্ছনা!

স্বপনের সম সুখ আসে,
পুনঃ যায় নীরবে সরিয়া,
মেঘমুক্ত শশী সম তাহে
এক জ্যোতিঃ উঠয়ে ফুটিয়া।

সে পবিত্র জ্যোতিঃ মাঝে
কার স্পর্শ অনুভবে পাই,
কে যেন প্রাণের অন্তরালে
বলে মোরে "কেহ নাই নাই"!

আচম্বিতে দুঃখ রাশি আসে,
হৃদি ওঠে সঘনে কাঁপিয়া,
পুনঃ যায় কালের সাগরে
আলেয়ার সম মিলাইয়া।

দুঃখ জ্বালা কেটে যায় যবে,
প্রাণ মোর উঠে জাগরিয়া,
কে আমার হৃদয়েতে যেন
এক কথা বলে আশ্বাসিয়া;—
"এ অনিত্য ধরণীর মাঝে
তারা কেহ চিরস্থায়ী নয়,
সুখ কিম্বা বিভীষিকা আসে
—যায় চলে কি ক্ষতি তাহায়।"

কেনবা সুখের অভিলাষ,
কেন দুঃখে হবে ম্রিয়মাণ,
যাহা মোর ইচ্ছাধীন নহে,
তার তরে ব্যস্ত কেন প্রাণ?

অনিত্য সংসারে সুখ দুঃখ
জীবনের দৈনিক বিকাশ;
কেন রবে শঙ্কা, আরাধনা,
গমনে, স্থাপনে অভিলাষ?

তাদের বিচ্ছেদ আক্রমণে
কেন প্রাণে জাগে অবসাদ?
কেনবা তার অবসানে
থাকে না মধু তিক্ত স্বাদ?

কালের বুদ্বুদ সুখ দুঃখ
তার বুকে নীরবে মিলায়,
তারি টানে আসে তারা নামি,
তার স্রোতে পুন ভেসে যায়।

হেরি এই নিত্য আকর্ষণ,
নিত্য হেরি তাহার নির্ব্বাণ,
আমার হৃদয় বিথারিয়া
এক জ্যোতিঃ হইছে স্ফুরণ।

কামনা, যাতনা, অবসাদ
জীবনের যতেক কালিমা—
সে জ্যোতিঃ মাঝারে ডুবে গিয়ে,
জাগে এক আশা মাধুরিমা।

সকল আঁধার নাশি যবে
সেই জ্যোতিঃ বিতরে আলোক,
অপার অনন্ত শান্তি লভি,
ভুলে যাই আঘাতের শোক।

নির্ভীক, সাহসী সেই হৃদি,
হেরিলে প্রলয় ভয়ঙ্কর,
হাসিয়া উড়ায় অবহেলে;
বিচলিত নহে সে অন্তর।

সে জ্যোতিঃ বৈরাগ্য তার নাম,
আগ্নেয়াস্ত্র তীক্ষ্ম খরধার
পড়িলে তাহার মুখে কাটি
সুখ দুঃখ হয় একাকার।

সুখে তার নাহিক হরষ,
দুঃখে তার নাহিক বিষাদ,
জীবনের অনিবার্য্য পথে
ভ্রান্ত জীব (ই) লভে পরমাদ।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

"জন্ম দিনে"

আজি তব শুভদিনে, প্রকৃতি আপন মনে
আনিয়াছে কত উপহার,
স্নিগ্ধতর ঊষা প্রাণ, ফুল্ল বিহঙ্গের গান
সমীরণে পুণ্য দেবতার।
'বিমল' আকাশ হ'তে নেমে আসে ধরণীতে,
তোমা লাগি আনন্দ সুন্দর;
বিনয়-বিনম্র শিরে, রাখ, বোন, পূর্ণ ক'রে
নিরমল কোমল অন্তর।
অম্বরে, সাগর জলে সুরলোক ধরাতলে
মহিমার রাগিণী ঝঙ্কার;
প্রীতি, পুণ্য সুকোমল, ছেয়েছ ধরণীতল
উচ্ছ্বসিত সুধা-পারাবার।
নব আজি ধরা জীর্ণ, স্বর্গ লোক অবতীর্ণ
সূক্ষ্ম আত্মা তব চারিধারে
জন্ম দিনে দিতে তোমা, এনেছে আশীষ ভূমা
স্নেহ সুধা মরণ মাঝারে।

আজি,
ভুল ক্ষুদ্র আকিঞ্চন, হো'ক তব প্রাণ মম
শুদ্ধ, পূত প্রেমের আলয়;
অপ্রেম, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, জীবনের পূতিগন্ধ
শুভ দিনে হো'ক সবে লয়।
আজি শুধু আলিঙ্গন, শুধু প্রীতি বরিষণ,
আজি স্নিগ্ধ আনন্দ বন্ধন;
উদার, সুন্দর প্রাণে, অনন্তের সন্নিধানে
অশোভন হো'ক্ বিসর্জ্জন।

আজি,
নবীন বরষ কূলে, পুরাতন ফেল খুলে
নূতনেরে কর পরিধান;
অপ্রেমে ফেলিয়া তীরে, খোল তরী ধীরে ধীরে
হাতে ল'য়ে প্রেমের নিশান।
সম্মুখে নবীন রবি, আশা পূর্ণ সেই ছবি
হৃদি মাঝে থাকুক অঙ্কিত;
নিরাশা বেদনা ভার, পশ্চাতের অন্ধকার,
আশালোকে হো'ক তিরোহিত।
ক্ষণকাল চিন্তা কর, হ'ল কি সুন্দরতর
চরিত্রের সুন্দর বরণ;
জীবন নির্ঝর জলে, খেলিছে কি কুতূহলে
ইন্দ্রধনু করুণা কিরণ।
জনক হিমাদ্রি শিরে, চাহিয়া বারেক ফিরে
ভাব তাঁর মহিমা গম্ভীর;
তাঁহা হ'তে যেই প্রাণ, হ'ল কি তা সুমহান
পবিত্র, সরল, শান্ত, ধীর।
সংসারের শত কাজে, সদা যেন মনে রাজে
সেই মূর্ত্তি মহিমা-পূরিত
দিন দিন চিত্তে তব, ভাব ভক্তি অভিনব
রূপে রসে হো'ক বিকশিত।
আজি এ মঙ্গল দিনে, কি দিবে এ দীনহীনে
আমি তব অপদার্থ ভাই;
পবিত্র দেবতা যিনি, তোমারে করুন তিনি
সুপবিত্র—এই ভিক্ষা চাই।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

কবির স্মৃতি *

(স্বর্গারোহণ ২৯আষাঢ়,১৩০৭।১৩ই জুলাই১৯০০)

সেই বন-শোভা তোমারি রচিত,
তোমারি কল্পনা ভরা,
সেই লতিকায় শ্যাম-শুভ্র ফুল,
উপবন আলো করা;

* "সাহিত্য", নব্যভারত," "প্রদীপ", প্রভৃতি মাসিক পত্রাদির বিশিষ্ট সুলেখক, সাহিত্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিবর মহাত্মা নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম, এ, মহোদয়ের স্বর্গারোহণ তাঁহারই উদ্দেশে (অশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত) কবিতাটী রচিত। ইনি কোন্নগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত থাকিয়া কোন্নগরের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন।

সেই সে সকলি তব স্মৃতিময়,
তোমারি কিরণ ঢালে,
তুমি কোথা আজ ? বিভূষিত বুঝি
ত্রিদিবে কুসুম-মালে !
"শোভাময়ী", "উষা"তোমারি রচনা ;
তোমারি আবেশ-মাঝে
কবিবর, তব মানস উছলি'
"উন্মাদিনী" প্রেমরাজে ;
তবু গো দেবতা, হৃদয় আকুল,
স্মরিতে কাহিনী হেন,
শুধু শুধু স্মৃতি ; তুমি কোথা, আজ
শূন্য সিংহাসন কেন ?
কৌমুদী রজনী,— "বিরহী" তথায়
সৃজিয়াছ দেব কবি !—
হৃদীর-নিস্বনে দেছ প্রাণে তার
জাগায়ে প্রেমের ছবি।
প্রভাত-কিরণে সে অপরাজিতা
তোমারি রচনা সেই,
হাসি ভরা গালে সে মাধবী-বালা ;
শুধু আজ তুমি নেই !
তুমি "মোহ"রচি ; সে মোহ-আবেশে,
প্রাণের উছাসে কত,
কহিয়াছ কবি, "হোক উদ্‌যাপন
জীবনে মরণ-ব্রত !"
তোমারি সে "ভুল" তব "তাপহরা,"
করুণ উছাস তুলে,
তোমার করুণ তাপিত নিশ্বাস
আজো জাগে হৃদি-কূলে !
তোমার কবিতা মুরলী-মধুর,
পশে যেন কাণে কাণে,
উদাস-আকুল শোক-স্মৃতি তব,
তায় ভেসে আসে প্রাণে ;
তোমার মধুর উপদেশ দেছে
বিকাশি, জ্ঞানের রবি,
শ্রাবণের ধারে অশ্রু ঝরে তাই ;
শ্রাবণে বিদায় কবি !

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (১৮)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা যেরূপ অনুলোম-ভাবে ব্রহ্মশক্তি হইতে জগতের স্থূলভাবে বিকাশের কথা দেখাইয়াছি, বিলোম ভাবেও, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মশক্তিতেই উপনীত হওয়া যায়। স্থূলশরীরটী মৃত্যুর পর, কেবল মাত্র পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতে পরিণত হয়। কার্য্য তাহার কারণেই লীন হয়—এই নিয়ম বশতঃ শরী-রের স্থূলাংশ বিশ্লিষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম কারণাত্মক উপাদানে—সূক্ষ্মপঞ্চভূতে অর্থাৎ শব্দস্পর্শ-রূপরসগন্ধাত্মক শক্তিতে পরিণত হয়। তখন কেবল জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শক্তি নিচয় (মন ও প্রাণ) এবং ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তি সমন্বিত বুদ্ধি (বুদ্ধি ও অহঙ্কার তত্ত্বদ্বয়) এই কয়েকটী মাত্র শক্তিরূপে সূক্ষ্ম ভাবে বর্ত্তমান থাকে। ইহাই জীবের সূক্ষ্ম শরীর। ব্যক্তি ভেদে এই শরীর গুলি অনন্ত। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারা থাকিবে ; প্রলয়ে কেবল অব্যক্তভাবে থাকে মাত্র। প্রলয়ে এই সূক্ষ্ম শরীর গুলি অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থিত ইন্দ্রিয়শক্তি ও বুদ্ধি বৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায়। তখন কেবল মাত্র বুদ্ধি সত্ত্বা মাত্র অবস্থিত থাকে। এ অবস্থায় বুদ্ধির কোনই বৃত্তির বিকাশ থাকে না। সুপ্তভাবে উহাতেই থাকিয়া যায় ; এবং থাকে বলিয়াই উহাকে কেবল সত্ত্বাত্মক বলে ইচ্ছা, কামনা, কাম, ক্রোধ, হিংসা,

জ্ঞান (thoughts) প্রভৃতি সমুদয়ই বুদ্ধির বৃত্তি (modifications)। সে অবস্থায় এ বৃত্তি গুলি আদৌ বিকাশ থাকে না। কেবল দ্বৈতবর্জ্জিত (unconscious) জ্ঞান ধারা মাত্র রূপে বুদ্ধিটী অবস্থিত থাকে। জীবের ইন্দ্রিয় শক্তি গুলি এবং যে যে ইন্দ্রিয় শক্তি ও বুদ্ধ্যাদি দ্বারা জীব যে সমস্ত ক্রিয়া করি-য়াছিলেন, সেই ক্রিয়ার সংস্কারগুলিও "অদৃষ্ট" রূপে সেই বিলীন, সুষুপ্ত বুদ্ধিতে লীন থাকে। সৃষ্টির আদিতে এই গুলিই আবার যথাযথ ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়। শ্রুতি এই জন্যই ত গাহিয়াছেন যে," * * * ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" ঈশ্বর যেটী যেরূপ ছিল অর্থাৎ যে জীব যেরূপ ভাবে বিলীন হইয়াছিল, সেই ভাবে তাহারা প্রাদুর্ভাব করান। নূতন কিছুই হইল না। এই অব্যক্ত বুদ্ধি গুলি ঈশ্বরচৈতন্যেই বিলীন থাকে। এই অব্যক্ত বুদ্ধি গুলিই সমষ্টিভাবে, ঈশ্বরের শক্তি বা কারণ-শরীর রূপে বেদান্তে কথিত হইয়াছে।

বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই অচেতন, জড় পদার্থ। ইহারা আন্তর্নিহিত অদৃষ্ট বা ক্রিয়া প্রভাবে সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল। ঈশ্বর-চৈতন্যই এই ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক। সৃষ্টির আদিতে তাঁহা হইতেই ঐ অচেতনবর্গের ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনিই বুদ্ধির বৃত্তি-গুলির প্রকাশক। তিনি প্রকাশ না করিলে, বৃত্তি গুলির বোধই জন্মিতে পারিত না। প্রলয়ে বুদ্ধির বৃত্তি লীন থাকা প্রযুক্ত, তৎকালে চৈতন্য কোন বৃত্তি প্রকাশ করেন না, তখন কেবল বুদ্ধিতে চৈতন্যের সত্তাটী মাত্র থাকে। এটী ব্রহ্মেরই জ্ঞানাত্মক সত্ত্বা মাত্র। ইহা আনন্দময় সত্ত্বা। কেন না, ব্রহ্ম-সত্ত্ব, জ্ঞান ও আনন্দময়। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মচৈতন্যই সেই বিলীন বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় শক্তি গুলিকে প্রকাশিত করেন, তাই সে গুলির বোধ জন্মিয়া থাকে। এইরূপে তিনি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির প্রবর্ত্তক ও প্রকাশক। অতএব এক বুদ্ধিরই অব্যক্ত, সূক্ষ্ম এবং স্থূল এই ত্রিবিধাবস্থা। এক বুদ্ধি হইতেই সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয় শক্তি ও পরমাণু সমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অতএব বেদান্ত ও সাংখ্যমতে বুদ্ধিও একরূপ জড় দ্রব্য। বুদ্ধিকে জড় এবং দ্রব্য বলাতে, এখন-কার নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় কেহ কেহ হাস্য করিতে পারেন বটে, কিন্তু যখন বুদ্ধি হইতে পরমাণু জন্মিয়াছে, তখন বুদ্ধি যে পরমাণুর ন্যায় নিতান্ত ব্যাপক পদার্থ, তাহা সাংখ্য শাস্ত্র সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। শক্তিময় ব্রহ্মের এই বুদ্ধিই প্রথম বিকাশ। এ অবস্থায় মায়া নিরতি-শয় সত্ত্বদ্রব্য প্রধান। বীজে যেরূপ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা প্রভৃতি বিলীন থাকে, এই বুদ্ধিতেই তদ্রূপ উহার বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি নিহিত থাকে। সেই গুলির এখনও সূক্ষ্মভাবে বা স্থূল ভাবে বিকাশ হয় নাই। সুষুপ্তি অবস্থায় যেমন ইন্দ্রিয়-শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিগুলির বিলোপ হয় এবং সুষুপ্তির অন্তে পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রকাশ পায় এবং তখন যেমন কেবল মাত্র সত্ত্বাত্মক জ্ঞানটী মাত্র থাকে, অব্যক্তাবস্থায় ব্রহ্মশক্তি বা বুদ্ধিরও ঠিক্ তদ্রূপ অবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় যেমন মন কেবল সংস্কার লইয়া ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ও বুদ্ধির কার্য্য করে, তদ্রূপ সূক্ষ্মা-বস্থায়ও শক্তি ও বৃত্তিগুলি কেবল শক্তিরূপে ক্রিয়াত্মক থাকে। সূক্ষ্মাবস্থায় বুদ্ধিতে, অহঙ্কার (বুদ্ধির বৃত্তি সমূহ) ইন্দ্রিয়শক্তি, মন প্রভৃতি দেখা দিল। অর্থাৎ বৃত্তিরহিত বুদ্ধিতে যে বৃত্তিগুলি নিহিত ছিল, তাহারা দেখা দিল এবং সেই বৃত্তি-সমন্বিত বুদ্ধিতে যে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়াদি নিহিত ছিল, পূর্ব্ববৎ সেগুলিও দেখা দিল। কোন অব-স্থাতেই নূতন কিছু হইল না। যাহা ছিল না, তাহা পরে হয়না। কার্য্য,কারণেতেই থাকে। হয় তাহা স্থূলভাবে, নয় সূক্ষ্মভাবে, নয় অব্যক্ত ভাবে,—এই ত্রিবিধাবস্থায় কার্য্য-কারণে থাকে। সাংখ্যের সঙ্গে বেদান্তের প্রভেদ এই যে, সাংখ্য বলেন যে, সৃষ্টির আদিতে বিলীন কার্য্যগুলির প্রবর্ত্তনের জন্য ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকারের প্রয়োজন কি ? অন্তর্নিহিত ক্রিয়াশক্তি বলে ওগুলি নিয়-মিত ভাবে আপনিই প্রবর্ত্তিত হইবে। বেদান্তমতে শক্তিমানই কেবল একমাত্র

কারণ। শক্তিযুক্ত হইলেই শক্তিমান কার্য্য সমূহকে প্রবর্ত্তিত করান এবং সর্ব্বদা প্রকাশিত করিতেছেন। মায়ানিহিত জীবের অদৃষ্টই, শক্তি ও শক্তিমানের যোগের হেতু। যত দিন না ভোগ হইয়া যাইতেছে, ততদিন এ মায়া বা শরীরের নিবৃত্তি হইবে না।

মাটীতে তুমি একটী বীজ রোপিত করিলে। সূর্য্যকিরণ ও শিশিরবিন্দু ঐ বীজের উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। বীজ হইতে ক্রমে অঙ্কুর, শাখা, পুষ্প, ফলাদি জন্মিল। বীজ মধ্যে নিহিত অসাধারণ শক্তিবশতঃই এই পত্র পুষ্পাদি হইল। সূর্য্যকিরণ ঐ গুলি জন্মিবার সাধারণ কারণ মাত্র। বীজনিহিত অসাধারণ শক্তিই বৃক্ষাদির ভেদের ও শাখা প্রশাখাদির উৎপাদনের কারণ। সূর্য্য কিরণাদিও কারণ বটে, কেন না সূর্য্যকিরণাদি না থাকিলে বীজনিহিত শক্তি, ক্রিয়া করিতেই অবসর পাইত না। শক্তির প্রসরণ হইতেই পারিত না। ঈশ্বর ও জীব সৃষ্টিতে এইরূপ কারণ। মায়ানিহিত শক্তি সমূহ হইতেই নানা জীব নানা ভাবে কার্য্য করে এবং নানা প্রকারের পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। ঈশ্বর সূর্য্যকিরণের ন্যায় ঐ শক্তি প্রভৃতির বিকাশের কারণ। ঈশ্বর চৈতন্য না হইলে, ঐ ক্রিয়া গুলির আদৌ বিকাশ হইতে পারিত না; উহাদের উদ্ভবই হইত না। আবার ঈশ্বর চৈতন্য না হইলে বুদ্ধি বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় শক্তি গুলির প্রকাশ বা বোধ (Consciousness)ও হইতে পারিত না। এইরূপে প্রকৃতিনিহিত ক্রিয়ার প্রধান চালক,—ঈশ্বর। ঈশ্বর, সান্নিধ্য মাত্রেই ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক ও প্রকাশক হন। জীব বাস্তবিক অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, দ্বেষ, ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতি অনুসারেই অর্থাৎ প্রকৃতি বশেই চিরদিন কার্য্য করিতেছে। সে জন্য জীব নিজেই প্রতিবিম্বরূপে ভোগ উপার্জ্জন করিতেছে এবং সেই প্রবৃত্ত্যাদি কার্য্যের জন্যও সুতরাং জীব দায়ী। ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে সেই প্রকৃতি নিহিত শক্তি ও কার্য্য প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করান মাত্র এবং সর্ব্বদাই তিনি সে গুলির প্রকাশ করিতেছেন মাত্র। সুতরাং জীবকৃত কর্ম্মের জন্য তাঁহার কোন দোষ গুণ নাই। জীব নিজের নির্লেপ নিষ্ক্রিয় জ্ঞানময় স্বরূপ ভুলিয়া, প্রকৃতির প্রবৃত্তি, ক্রিয়া প্রভৃতিকে আপনার বলিয়া অভিমান করে। জীবের তাহা পরিত্যাগ না করিলে উদ্ধার নাই। প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হইবেই; ইন্দ্রিয়গুলি স্বীয় শক্তি অনুসারে চলিবেই। ব্রহ্মের তাহাতে সম্পর্ক নাই। এই ভাবে সর্ব্বদা চিন্তা আবশ্যক। এইরূপে আত্মকর্ত্তৃত্ব, প্রকৃতিতে নিহিত দেখিতে হয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়াতেই আত্মার ক্রিয়ার অভিমান হয় মাত্র। প্রকৃতির যোগ না থাকিলে, বাস্তবিক আত্মা নিষ্ক্রিয়। এইরূপে আত্মকর্ত্তৃত্বের বিলোপ করতঃ, আত্মার ও প্রকৃতির স্বরূপ চিন্তা করিতে হয়। এইরূপ করিলে আত্মা প্রকৃতির বশীভূত হইতে পারে না। প্রকৃতির স্থূল অভিব্যক্তি ক্রমে ক্রমে ব্রহ্ম শক্তিতে বিলীন করিয়া চিন্তা করিতে হয়। এইরূপে অনুলোম ও বিলোম ভাবে কার্য্য-কারণাত্মক চিন্তাই বাস্তবিক পক্ষে শ্রুত্যুক্ত "অধ্যাত্মযোগ।" ইহা আমাদের "বিশ্লেষণ প্রণালীরই" নামান্তর মাত্র। এ কথা আমরা আর একদিন বিশদ রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

চৌধুরীর লড়াই।

অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ও প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ৺ আনন্দরাম বড়ুয়া যখন নোয়াখালী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ছিলেন, তখন একদিন মফঃস্বল যাওয়া উপলক্ষে তিনি সহরের ৭ মাইল উত্তরে একটী ক্ষুদ্র একতালা জঙ্গলাবৃত পাকা বাড়ী দেখিতে পান। তিনি গ্রামের কোন বৃদ্ধের নিকট শুনিলেন, যে উহা বাবুপুরের প্রসিদ্ধ

জমিদার বংশের বাড়ী ছিল। তাঁহারা গৃহবিবাদে লিপ্ত হইয়া জমিদারী খোয়াইয়াছেন। তাঁহাদের বৃত্তান্ত এদেশে "চৌধুরীর লড়াই" নামে গীত হইয়া থাকে।

বড়ুয়া মহোদয় বেগমগঞ্জ থানায় পৌঁছিয়া, তত্রত্য দারোগার নিকট "চৌধুরীর লড়াই" গান শুনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দারোগা আলাউদ্দিন নামক প্রসিদ্ধ গায়ককে আনাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চিত্তবিনোদনার্থ গীত আরম্ভ করাইলেন। বড়ুয়া সাহেব গান শুনিয়া প্রীত হইলেন, এবং নোয়াখালীর ইতিহাসের এরূপ একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা এপর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই দেখিয়া আক্ষেপ করিলেন। পরে নোয়াখালী সদরে আসিবার সময় তিনি উক্ত গায়ককে সঙ্গে আনিলেন ও সেই গীত পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করাইলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার কাল হইল। তদবধি "চৌধুরীর লড়াই" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা দূরবর্ত্তী হইল।

সম্প্রতি মহম্মদ আবদুল জব্বর নামক একজন শিক্ষিতব্যক্তি, বড়ুয়া মহোদয়ের সংগৃহীত সেই হস্তলিপি অবলম্বনে উক্ত গীত পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই গীত এতদ্দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এতদূর সমাদৃত যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এমন কি, ইহার মধ্যেই এই পুস্তকের প্রকাশককে জাল জুয়াচুরীর জন্য ক্রেতাগণকে সতর্ক করিয়া বিজ্ঞাপন দিতে হইয়াছে।

"চৌধুরীর লড়াই" কোন্ সময়ের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে উহার মধ্যে যে সকল ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ৮০।৯০ বৎসরের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তখনও নোয়াখালী (সুধারাম) একটী ফৌজদারী শাসন বিভাগে (১) পরিণত হয় নাই; তখন বোধহয় বরিশাল ইহার সদর (Head Quarter).) ছিল, তাহা ঢাকার অধীন ছিল। তখনও ইংরেজের শাসনপ্রণালীর এতদূর কড়াকড়ি হয় নাই, তখন এই জেলার বাবুপুর, দত্তপাড়া, খিলপাড়া, মাইজদী প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ খুব দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন। ইঁহারা অনেক অনেক জাইগিরদার, লাঠিয়াল, ফৌজ, বরকন্দাজ আদি রাখিতেন ও সময়ে সময়ে পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। এইরূপ একটী যুদ্ধের বিবরণ এই গীতে বর্ণিত হইয়াছে।

এই গীতের রচয়িতার নাম কি, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। গ্রন্থের কোন স্থলেই গ্রন্থকারের নাম, বাসস্থান, ব্যবসায় বা বংশাবলীর উল্লেখ নাই। তবে গ্রন্থপাঠে এ পর্য্যন্ত জানা যায় যে, তিনি একজন মুসলমান। গ্রন্থারম্ভে তিনি "নুর হাবির খোদা" আছহাব উল্লত," 'মক্কা মদিনা' প্রভৃতির বন্দনা করিয়াছেন। এই গীত যখন রচিত হইয়াছিল, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে যে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও নোয়াখালির ন্যায় এই দুর্গম গহন অরণ্য মধ্যে তাহার আলোক প্রবেশ লাভ করে নাই। সুতরাং কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারতের ন্যায় এই গীত সাধারণ চলিত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। এই গীত পয়ারছন্দে রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে নির্দ্দিষ্ট অক্ষরের সমতা প্রায়ই রক্ষিত হয় নাই। ইহা সুর করিয়া গান করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল এবং তাহার বেশ উপযোগী। এই গীত রচয়িতা আধুনিক হিসাবে অশিক্ষিত ছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু সরল, সহজ প্রচলিত ভাষায় গীত রচনা করিতে তাঁহার বেশ ক্ষমতা ছিল। এই গীতের রচনা মধ্যে

(১) হাণ্টার সাহেব বলেন, ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুধারামে ইংরেজদের একজন (Salt agent) লবনের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। ১৮২২ সালে এখানে একজন জয়েন্টম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন ও সুধারামের পরিবর্ত্তে জেলার নাম নোয়াখালী হয়। ১৮৬৯ সালে নোয়াখালী একটী জেলায় পরিণত হয়।

আধুনিক শিক্ষিত কবিদিগের রচনার ন্যায় কুত্রাপি কষ্ট-কল্পনা নাই; ইহার কোন স্থান দুর্ব্বোধ্য নহে; আর স্বভাব-কবির স্বভাবসিদ্ধ একটী সহজ প্রবাহ (natural-flow) ইহার সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এই কবির উপমাগুলি, অনেক সময়ে গ্রাম্য কৃষকেরা সর্ব্বদা যে সকল ঘটনা বা বস্তু প্রত্যক্ষ করে, তাহাই অবলম্বনে কল্পিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে স্বভাব-কবির উপযুক্ত কবিত্বের সৌন্দর্য্য ছটাও দেখা যায়। আবার কোন কোন স্থানে বর্ণনা নিতান্ত হাস্যাস্পদও (ludicrous) হইয়াছে।

"চৌধুরীর লড়াই" পুস্তক সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এতদূর আদৃত হওয়ার এক প্রধান কারণ এই যে, ইহা এই অঞ্চলের প্রচলিত ভাষায় রচিত হইয়াছে। লাঙ্গলধারী কৃষক, নৌকাচালক মাঝি, মণিহারীর দোকানদার, চাকর খানশামা, কুলি মজুর পর্য্যন্ত সকলেই ইহা সুর করিয়া পড়িয়া থাকে, এবং সকলেই ইহার অর্থ বুঝিতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কলিকাতা-বাসী কোন সাহিত্য-সমালোচকের নিকট এই পুস্তক পাঠাইয়া দিলে, তিনি ইহার অধিকাংশই বুঝিতে পারিবেন না। এমন কি; আমি নিজে পূর্ব্ববঙ্গবাসী হইলেও এই নোয়াখালীর চলিত ভাষা প্রথমতঃ বুঝিতে পারিতাম না; এবং প্রায় এক বৎসর এখানে অবস্থিতির পরেও এই পুস্তকের অনেক স্থল অন্যলোকের সাহায্য বিনা বুঝিতে পারি নাই। এক বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে যে এতদূর ভাষাগত পার্থক্য আছে, ইহা ভাবিলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি কল্পে বাস্তবিকই হতাশ হইতে হয়। ৺বড়ুয়া মহোদয় সেই বৈষম্য হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে জেলায় জেলায় প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই "চৌধুরীর লড়াই" গীতসংগ্রহও কিয়ৎ পরিমাণে তিনি সেই উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তদবধি বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবীদিগের মধ্যে কেহই আর এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

প্রথমতঃ আমরা "চৌধুরীর লড়াই" গ্রন্থের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত কি, তাহা দেখিব।

এই গ্রন্থের পুরানাম "বাজ নারাণ (রাজ নারায়ণ) ও রাজচন্দ্র চৌধুরীর লড়াই। রঙ্গমালা সুন্দরীর বয়ান।" (১) পাঠকগণ অবশ্য জানেন, ব্রহ্মার সৃষ্টির আদি হইতে প্রায় সকল লড়াইয়ের মূলেই কামিনী কিম্বা কাঞ্চন বিদ্যমান আছেন। এ লড়াইও সেই প্রথমোক্ত কারণে অর্থাৎ কামিনী লইয়া ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, "হাবির খোদা" "আছহাব উল্লত্" "মক্কা মদিনা" "রহমানের রহিম" "বিছমোল্লা" প্রভৃতির বন্দনা করিয়া ও "ইন্দ্রসভার চরণ শিরেতে বন্দিয়া" গ্রন্থকার এইরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেনঃ—

"চৌধুরী ছিল রাজনারায়ণ রাজ্যের অধিকারি।
সিন্দুর কাইতের (২) জঙ্গলা কাটি বান্ধিল রাজবাড়ী"
হাট মিলাল ঘাট মিলাল গল্লি (৩) সারি সারি।
প্রথম দৌলতের কালে রাজগঞ্জের কাছারি॥

এই রাজনারায়ণ চৌধুরী বাবুপুরের জমিদার "সূর্য্যবংশীয় (৪) রাজা"। তাঁহার সমান জমিদার তখন "ভাটির বাঙ্গালায়" ছিল না। গ্রন্থকার এই "ভাটির বাঙ্গলা" বলিতে কোন্ কোন্ জেলা বুঝিতেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে তিনি যে "পিরথিমিতে" না বলিয়া "ভাটির বাঙ্গালা" বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, এইজন্য তাঁহার ভৌগলিক জ্ঞানকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার অধীনে বার তের শত জায়গিরদার ছিল; তাহারা হুকুম পাইলেই লড়াই করিবার জন্য কোমর বাঁধিত। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বলিব—

(১) পাঠক বয়ান অর্থে বদন বুঝিবেন না। বয়ান—বৃত্তান্ত, কেচ্ছা।

(২) সিন্দুরকাইত—গ্রামের নাম। এখানে চৌধুরীদের বাড়ী ছিল।

(৩) গল্লি=গলি।

(৪) অর্থাৎ প্রত্যেক বড় রাজা কি জমিদারকে যেন অবশ্যই সূর্য্যবংশীয় হইতে হইবে!

"যে কালের মহারাজের টাকার কিবা রাট। (১)
যার টাঙ্গনের (২) পিঠে শোভে লাল বনাতের ঠাট।"

অর্থাৎ তাঁহার ঘোড়ার পৃষ্ঠে লাল বনাতের "ঠাট" শোভা পাইত। মহারাজের রাজচন্দ্র নামে এক যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন; তিনি বড় ভ্রাতার পুত্র। তাঁহার মাতা সুমিত্রা দেবী বিদ্যমান। এই কারণে তিনি এক রকম "আলালের ঘরের দুলাল" হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি একটী "রসিয়া নাগর," গৃহে রূপবতী যুবতী স্ত্রী, সোণামালা বর্ত্তমান থাকিতেও তাঁহার মন ঘরে টিকিত না। শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবী তাঁহার "প্রেমের উকীল" ছিল। তাহার মন্ত্রণায় আলাদী নগরের আত্মারাম নড়ের (নট) কন্যা, ও গোলাপ রায়ের ভগিনী রঙ্গমালা সুন্দরীর প্রতি তাঁহার চক্ষু পড়িল। রঙ্গমালার রূপের বর্ণনায় কবি তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পিতা পঁচিশ টাকার লোভে রামগতিয়া নামক এক "কুব্জ পৃষ্ঠ নুব্জ দেহ" বৃদ্ধের সহিত এই কন্যাকে ডুবাইয়া দিল। কিন্তু কন্যাটী ডুবিল না, শ্যামা বৈষ্ণবীর প্রযত্নে আবার ভাসিয়া উঠিল। রাজচন্দ্র বৈষ্ণবীর পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে ভিক্ষা (!) করিবার জন্য রূপার ঘটী (!) গড়াইয়া দিলেন। এবং তিনি পাঁচ শ টাকার অলঙ্কার গামছায় (!) বান্ধিয়া "সোণালী ধুতীর কোচা তেপেচে" করিয়া "গোলাপী চাদর" একখান কান্ধে ফেলিয়া "জরির জুতা পরিয়া, সোণা রূপার জিন, হীরায় "টাক" শোভিত "লেজ বাড়ুয়া বৈল্লা টাঙ্গনে" (৩) চড়িয়া ও "এক দমে কালীনাম হাজার বার নিয়া" রঙ্গমালার দর্শন লাভ বাসনায় গমন করিলেন। ওদিকে রঙ্গমালাও বৈষ্ণবীর "পান পড়া" ও জল পড়ার" চোটে অস্থির হইয়াছিল—

"বিষ বিষ নানে কন্যার অষ্ট অলঙ্কার।
বিষ বিষ নানে কন্যার গজমতি হার॥ (৪)

যাহা হউক, সেই পাঁচ শ টাকার অলঙ্কার পরিলে, কন্যার কিরূপ শোভা হইল, কবি তাহা বর্ণনা করিতেছেন—

"অলঙ্কার পরি কন্যা আনা (১) ধরি চায়।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ভূমিতে উদয়॥
তাড়ল তোড়ল সব দোরা বাজু মল।
মাথার উপরে সিতীপাটি কমরে শিকল॥
সন্ধ্যাকালে ঠাকুর যেমন নামিয়া বসে পাটে।
কপালে সিন্দুর যেন পরায় নানা ঠাটে॥
সিন্দুরের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা।
নবীন মেঘের আড়ে চন্দ্র দিল দেখা॥"

এই রূপে রঙ্গমালা সুন্দরীর সহিত রাজচন্দ্রের প্রণয় জন্মিল। রঙ্গমালার বাপ ও ভাই প্রথমে অনেক ওজর আপত্তি করিয়াছিল, পরে মহারাজ সবংশে কাটিয়া ফেলিবে, এই ভয়ে আর কোন কথা বলিল না। মহারাজার হুকুমে ধন গাজি মন গাজি প্রভৃতি মুল্লুকের ছৈয়ানগণ (ঘরামী) আসিয়া গোলাপ রায়ের "সাত দেউড়ী" ঘর দরজা তুলিয়া দিল। তাহার মধ্যে বালাখানা, "দালান কোটা," "জলটঙ্গি" "ফুলটঙ্গি" প্রভৃতি নানা রঙ্গের ঘর প্রস্তুত হইল। ঢাকা জেলা হইতে "ভিমবরগা" আনাইয়া সেই ঘরের খুঁটী (!) দেওয়া হইল ও বরিশাল হইতে কামরাঙ্গা পাটী আনিয়া তাহা চালে লাগান হইল।

রাজচন্দ্রের এই সকল কীর্ত্তিকাহিনী খুড়া রাজনারায়ণের কাণে গেল। কিন্তু তিনি এ সকল বয়সের ধর্ম্ম বলিয়া কোন কথা বলিলেন না। আর এক দিন কালাযুগী আসিয়া তাঁহার কাছে নালিশ করিল।

"কালাজুগী বলে বাবু কই তোমার ঠাঁই।
তোমার ভাইর বেটার কথা কৈতে দিবা রাত্রি নাই॥
শিকার করিতে গেল করিমসুর পাথরে। (২)
আমার বাড়ীতে গেল সে কিসের খাতিরে॥
গেছে গেছে রায়ত বাড়ী তারে অধিক নাই।
আমার স্ত্রীরে মারে কেবল হামইলে (৩) লটকাই॥"

ইহা শুনিয়া চৌধুরী "ভরম সভার মধ্যে

(১) রাট—ধুমধাম।
(২) টাঙ্গন—ঘোড়া।
(৩) একটা লম্বা লেজযুক্ত ধবল ঘোটক।
(৪) গজমতি হার জিনিসটা কি ও তাহার মূল্য কত, তাহা এই গ্রাম্য কবি বোধ হয় জানিতেন না। নতুবা যে গজমতি হার গলায় পরে, সে "পঁচিশ টাকার গহনা পরিয়া এতদূর উৎফুল্ল হইবে কেন?

(১) আনা—আয়ানা, দর্পণ।
(২) পাথর—ময়দান, মাঠ।
(৩) হামইল—তাঁতের খুঁটী।

সরম পাইল এবং চাঁদ ভাড়ালীকে হুকুম দিল—

তোরে বলি চাঁদ ভাড়ালী কই তোমার ঠাই।
যুগী বাড়ি তুন পিলাইয়ারে বান্ধি আন যাই॥ (১)

এখানে চাঁদ ভাড়ালীর একটু বিশেষ পরিচয় দেই। কেননা, এই নাটকে ইনি একজন প্রধান অভিনেতা। তিনি রাজনারায়ণের খানসামাতে খানসামা, মন্ত্রীতে মন্ত্রী, সেনাপতিতে সেনাপতি, আবার প্রাইভেট সেক্রেটরিতে প্রাইভেট সেক্রেটরি। হুকুম পাওয়া মাত্র চাঁদ ভাড়ালী চারি পাঁচ জন খোট্টা প্যায়দা লইয়া কালাজুগীর বাড়ীতে গেল ও গলায় কাপড় দিয়া বান্ধিয়া "পাগলা চৌধুরী"কে ধরিয়া আনিয়া তাহার খুড়ার কাছে হাজির করিল। বৃদ্ধ খুড়া তাহাকে কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা করিলেন, কিন্তু আবার ঘোড়া কেনার জন্য পঁচিশ টাকা গণিয়া দিলেন, আর বলিলেন "খবরদার" আর কালাযুগীর বাড়ী ঘোড়া দৌড়াইতে যাইও না; আমার আগ দরজায় ঘোড়া দৌড়াও, আমি দোতালায় বসিয়া তামাসা দেখিব।" (দোতালা ছিল কি না সন্দেহ)।

কিন্তু রাজচন্দ্র তাহা শুনিবার জন্য কি দায় ঠেকিয়াছেন? তিনি পূর্ব্ব বাবুপুরের তেরশ জায়গীরদার ডাকাইয়া আনিয়া, লোক লস্কর লইয়া কালাযুগীর বাড়ীতে গিয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া মজা দেখিতে লাগিলেন।

কালাজুগী আসিয়া আবার রাজনারায়ণের নিকট নালিশ করিল। রাজনারায়ণ তাহা শুনিয়া "অগ্নির হুলকা যেন গর্জ্জিয়া" উঠিলেন, ও রাজচন্দ্রের উদ্দেশে অনেক ভৎর্সনা করিলেন; এদিকে রাজচন্দ্রের মাতা সুমিত্রাও একথা জানিতে পারিয়া হুকুম দিলেন—

"তোরে বলি রাজনারায়ণ কই তোর ঠাই।
রাজচন্দ্রের মুখ আনি মোরে দেখাও চাই॥"

চাঁদ ভাড়ালীর কিন্তু একথা সহ্য হইল না। সে আবার অগ্নির হুলকার মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল "ছেলেটাকে কি রকমে মারিয়া ফেলিবে? ইহা শুনিয়া রাজনারায়ণের মনে মায়া জন্মিল, তিনি হুকুম দিলেন, "আচ্ছা তুমি যাও, যুগীবাড়ী হইতে তাহাকে আবার বান্ধিয়া আন।" এদিকে রাজচন্দ্র সে সংবাদ পাইয়া রঙ্গমালার বাড়ীতে গিয়া সে রাত্রি রহিল, পরদিন সকালে বেশ ভালমানুষটীর মত বাড়ীতে আসিল—যেন কিছুই ঘটে নাই। রাজনারায়ণের রাগ তখন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, তিনি কালা জুগীকে ডাকাইয়া সরকার হইতে পাঁচশ টাকা গণিয়া দিলেন। আর বলিলেন—

"আর যদি রাজচন্দ্র তোমার বাড়ী যায়।
নাক কাণ কাটি তার করি বেরি দায়।"

এইরূপে কীর্ত্তিমান রাজচন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপ কোন রকমে বাধা না পাইয়া ক্রমশঃ আরও বাড়িতে লাগিল। একদিন তিনি দোনালী বন্দুক লইয়া ময়দান পাথরে "পাখী শিকার করিতে গিয়াছিলেন। ইতি মধ্যে দেখিলেন, লামচর চৌধুরীর পুত্রবধূ মাইজ্জী চৌধুরীর "মাইয়া" সোয়ারীতে চড়িয়া বাপের বাড়ী "নাইউর" করিতে যাইতেছেন। একটী গরু একখানা শ্যামল শস্য পূর্ণ ক্ষেত্র দেখিলে কি কখনও লোভ সম্বরণ করিতে পারে? রাজচন্দ্রও লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন কেন? তিনি লোকজন লইয়া সেই "সোয়ারী" ঘিরিলেন ও সেই কন্যার সঙ্গে সৈন্য সেনা মারি "ধাবাই" দিলেন। সেই কন্যাটীর নাম চন্দ্রকলা, তিনি বড় বুদ্ধিমতি ছিলেন। তিনি অনেক রকম সম্পর্ক দেখাইলেন; রাজচন্দ্র কিছুতেই মানেন না, তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা চল তোমার বাড়ীতে যাই।" তখন রাজচন্দ্র সেই পাল্কী উঠাইতে হুকুম দিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। এদিকে চন্দ্রকলা; "কার সোয়ারী কার সোয়ারী" বলিতেই একেবারে রাজচন্দ্রের মায়ের কাছে যাইয়া হাজির হইলেন; এবং খুব শক্ত রকম দশ কথা শুনাইয়া দিলেন—

"শুন শুন মা সুমিত্রা কই তোমার ঠাই।
তোমার পুত্র খানি একটী পাল কিসের লাই॥ (১)

(১) যুগীবাড়ী হইতে ছেলেটীকে বান্ধিয়া আন দেখি।

(১) লাই—লাগি।

তোমার দরজাতে মাগো জয়কালী নাই।
জয় কালীর দুয়ারে পুত্র বলি দেও যাই॥"

ইহা শুনিয়া সুমিত্রা কাঁদিতে লাগিল—

"ইহানি (২) আছিল মোর কপালে লিখন॥
আহারে কায়নালী (৩) যম লৈয়া যা মোরে।
কু পুত্র জন্মিল বুঝি আমার উদরে॥"

পরে সুমিত্রা রাগ করিয়া—

"পিছা (৪) হাতে করি তারে দৌড়াইতে লাগিল।
নড় বাড়ীর (৫) দিকে চৌধুরী উঠি লড় দিল।

তখন সুমিত্রা চন্দ্রকলার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন; কিন্তু সেই তেজস্বিনী রমণী সেখানে পানটীও খাইলেন না, কারণ রাজচন্দ্র নড়ের বাড়ী খায়, তাহার জাতি গিয়াছে। পরে সুমিত্রা তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। চন্দ্রকলা মায়ের নিকট কাঁদিয়া সকল কথা কহিলেন। মা ভয়ানক রাগিয়া গেলেন ও শ্রীধর চৌধুরীকে জানাইলেন। তিনি "রাজচন্দ্র চৌধুরীকে বাঁধিয়া আনিব" ও "তাহার সোণার নগর অনলে দহিব" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া টান দিয়া "চিনের কাগজ" বাহির করিলেন ও দেশে বিদেশে যুদ্ধ সজ্জা করিবার জন্য জমিদারদিগকে লিখিলেন। তাহার হুকুম মতে "তেরশ জায়গীরদার কমর বান্ধিল" ও "লাখে লাখে সৈন্য" আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু যুদ্ধ বাধিল না। ইহার "তেলেছ মত (১)" যখন পুরোহিত ঠাকুর শুনিলেন, তখন তিনি আসিয়া শ্রীধরকে বলিলেন—

"কি সর্ব্বনাশ! তুমি কর কি?

"আবুদ্ধীয়া (২) চৌধুরী তোমার কিছু বুদ্ধি নাই॥
মতে মতে (৩) সৈন্য তুমি সাজাত কিসের লাই॥
তেরশ সৈন্য যাও যুদ্ধ করিবারে।
বারশ জাগির্দ্দার আছে তার আগদরজার পরে॥
তেরশত সৈন্য তোমার ফালাবে কাটিয়া।
কাইল বেয়ানে (৪) তোমার বাটী নিবেরে লুটিয়া॥
চান্দা বড় বীর ভাই চান্দা বড় বীর।
একলা চান্দা কাটে নয়শ মানুষের শির॥"

এইরূপে পুরোহিত ঠাকুরের পরামর্শে যুদ্ধ থামিয়া গেল। তাঁহারই পরামর্শে দেশ বিদেশে পত্র পাঠাইয়া "রাজচন্দ্রের গো" জাতি নাশ করিয়া একঘরিয়া করা হইল, ও পূজা বন্ধ হইল। কিন্তু ইহাতে তাহাদের যে বড় কিছু ক্ষতি, কি মনঃকষ্ট, কি অসুবিধা হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থকার লেখেন নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

(২) ইহানি—ইহা নাকি।
(৩) কায়লালী—কাল। (৪) পিছা—বাড়ুন ঝাঁটা।
(৫) নড়বাড়ী—রঙ্গমালার বাড়ী।

(১) তেলেছমত—বৃত্তান্ত।
(২) আবুদ্ধীয়া—নির্ব্বোধ। (৩) মতে মতে—চুপে২।
(৪) বেয়ানে—প্রাতে।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৯। পীরখাঁ নাজির। বগুড়া চৌধুরী প্রেস, দাম চার পয়সা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে পদ্যে পীরখাঁর অত্যাচার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। লেখক এক স্থানে এই উদার কথাটী লিখিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

"একটী কথা বল্‌বো হেথা, হিন্দু সমাজের প্রতি।
দয়া করে বুঝাও মোরে, ওগো সমাজ-পতি।
সরলপ্রাণা, যত ললনা, তাদের কিবা দোষ।
পাপীর সাজা দিতে নার তাতেই এত রোষ?
লজ্জাশীলা, কত মহিলা, পাপীর অত্যাচারে।
মনের আগুন, জ্বলছে দ্বিগুণ, বধ আবার তারে।
এক ঘরে ক'রে তারে, ভাসাও একাকিনী।
কি বিড়ম্বনা, ঘোর লাঞ্ছনা, আহা অনাথিনি!
দারুণ শঠ, ঘোর লম্পট, পুরুষ ত্রাণ পায়।
আর অসহায়া নারীর বেলা, কঠোর বিধি হায়!

১০। স্মৃতি-মন্দির। উপন্যাস। শ্রীকেদারেশ্বর সেন, বি-এ প্রণীত, মূল্য ১।০। হরিনাথ এবং সর্ব্বাণীর চিত্র এই গ্রন্থে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। সেবা পরম সাধন, সেবা পরম ধর্ম্ম, হরিনাথের জীবনে এই সেবাধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে প্রস্ফুট হইয়াছে। গ্রন্থকার সাহিত্য-সংসারে নূতন প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল

এবং মধুর। সামান্য সামান্য যে সকল ত্রুটী আছে, তাহা কালে সংশোধিত হইলে, লেখক চরিত্র অঙ্কনে বিশেষ দক্ষ হইবেন, আশা করি।

১১। অঞ্জলি। বেঙ্গল প্রেস, ২০ নং মদনমিত্রের লেন। গ্রন্থকারের নাম নাই। নিরাশ প্রণয়ের উচ্ছ্বাস। পুস্তকের ছাপা ভাল। লেখা বেশ সরল এবং মিষ্ট। কিন্তু এরূপ গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য কি? পড়িয়া কাহারও উপকার হইবে, সে আশা নাই। হৃদয়ের সকল অসংযত উচ্ছ্বাস কি জগৎকে দেখাইতে আছে?

১২। লিপি-বিজ্ঞান। শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ৵১০, ভারত-মিহির যন্ত্র। পরিষ্কার ছাপা, উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু লিপি-বিজ্ঞানের উপদেশ সকল কে পাঠ করিবে? শিক্ষক না ছাত্র? লেখকের ইচ্ছা, যাহারা "ক, খ," পড়িবে, তাহারা। "দোয়াতটী ডানদিকে রাখিয়া তালপত্র, কদলি পত্র বা কাগজ যাহাতে লিখিতে হইবে, তাহা সম্মুখে রাখিবে।" ইত্যাদি কথা বর্ণজ্ঞানবিহীন বালকেরা কিরূপে বুঝিবে? উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও, বুদ্ধির তারতম্যে অনেক কাজ ভালরূপে সম্পন্ন হয় না; এ কথার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থ।

১৩। অমিয় কবিতা। ঐ গ্রন্থকার, ঐ প্রেস, মূল্য ৵০। তৃতীয় সংস্করণ। মোটের উপর এ পুস্তকখানি স্কুলপাঠ্য হওয়ার উপযোগী হইয়াছে।

১৪। Report of the Chaitanya Library, 1898 99. এই লাইব্রেরি বাঙ্গালীর একটী অক্ষয়কীর্ত্তি। উৎসাহী সম্পাদক বাবু গৌরহরি সেনের কর্ত্তব্যপরায়ণতায় এই পুস্তকালয়টীর দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পুস্তক সংখ্যা ৪৭০৩, বাঙ্গালা ২৭৯৩, ইংরাজি ১৯১০। পূর্ব্বের স্থিত সহ মোট আয় ৩৫৬৫৸৵১৫, ব্যয় ৯৭১/৫; স্থিত ২৫৯৪৸৵১০। কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ লাইব্রেরি হইলে কলিকাতার অপূর্ব্ব শ্রী হইবে।

১৫। The Third Annual Report of the Ram Mohan Ray Seminary, Bankipur, 1890-91 সাধারণতঃ আমাদের দেশে আদর্শ বিদ্যালয় অতি অল্প আছে। চরিত্র গঠনের জন্য অতি অল্প স্কুলেই চেষ্টা করা হইয়া থাকে। ব্যবসার খাতিরে কঠোর শাসন প্রথা উঠিয়া যাইতেছে বলিলেই হয়; পাছে ছাত্রেরা স্কুল পরিত্যাগ করে, এই ভয়ে ছাত্রদের সকল দোষ উপেক্ষিত হইতেছে; দুর্নীতে দিন দিন ছাত্রগণ ডুবিয়া যাইতেছে। রামমোহন রায় সেমিনারি এরূপ স্কুল নয়। আমরা জানি, অনেক খারাপ ছেলে এখানে ভাল হইয়াছে। শিক্ষকগণ সুনীতিপরায়ণ, চরিত্রবান ব্যক্তি—আপন আপন স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া এই স্কুলের উন্নতির জন্য অম্লান চিত্তে পরিশ্রম করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, ছাত্র সংখ্যা আজও ৩১৫ জনের অধিক হয় নাই। এজন্য স্কুলের খুব অর্থাভাব। এই আদর্শ বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য সকল সহৃদয় ব্যক্তির মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। স্কুলের সম্পাদক বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী এক-জন আদর্শ ব্যক্তি।

১৬। The Report of the Calcutta Orphanage for the year 1899. কলিকাতায় যত ভাল কাজ হইতেছে, তন্মধ্যে অনাথাশ্রম অন্যতম। বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, বিধাতার আদেশে, অতি সামান্যভাবে এই কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিধাতার কৃপায়, দিন দিন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে, দিন দিন আশ্রমের উন্নতি হইতেছে। গত বৎসর বালিকা ২০, বালক ৩২, মোট ৫২জন আশ্রমে ছিল। সমস্ত বৎসরের গড় সংখ্যা ৪৬। গতবর্ষের আয় স্থিত সহ ৭৬০৭৷৵৫ পাই, ব্যয় ৩৮৫৮৷৵৫। গড়ে প্রতি জনের প্রতি মাসে ৬/১০। স্থিত ৩৭৪৯৵৷ সৎকার্য্যের সহায় ভগবান, এই আশ্রমটী এই কথার জীবন্ত সাক্ষ্য দিতে বিদ্যমান। আজকাল অনেক বড় বড় লোক ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন, কিন্তু আদিতে প্রাণকৃষ্ণকে কত কষ্টই পাইতে হইয়াছিল! প্রাণকৃষ্ণের এই পুণ্য কীর্ত্তি অক্ষয় হউক।

ঋগ্বেদসংহিতা ও ব্রহ্মসঙ্গীত।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই বিদিত আছেন যে, আমাদের অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ বৈদিক ঋষিগণ অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ ও ইন্দ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক দেবগণের উপাসক ছিলেন। ঋগ্বেদের সংহিতা অংশে এই সকল দৃশ্য অকল্পিত মনোহর দেবগণের স্তোত্রাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা এই স্তোত্রাবলী রূপ স্বচ্ছ মুকুরে তাৎকালিক আর্য্য ঋষিগণের হৃদয় ও মস্তিষ্ক সুস্পষ্ট প্রতিফলিত দেখিতে পাই। কোনও বৈদিক ঋষি "দ্বয়াবিনঃ" হইতে রক্ষাহেতু ব্রহ্মণস্পতি নামক বৈদিক দেবতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। (ঋগ্বেদসংহিতা, ২য় মণ্ডল, ২৩ সূক্ত, ৫ ঋক্।) ঐ ঋকের সায়ণ ভাষ্যে "দ্বয়াবিনঃ' শব্দের এই অর্থ লিখিত আছে; 'মনস্যন্যৎ, ক্রিয়ায়াং চান্যৎ, ইত্যেতৎ দ্বয়ং যেষামস্তি তে দ্বয়াবিনঃ, অর্থাৎ বঞ্চকাঃ"। সুতরাং কখনই এ প্রকার কল্পনা করিতে পারা যায় না যে, বৈদিক ঋষিগণ স্বয়ংই আমাদিগের সহিত বঞ্চকতা করিয়াছেন। এই সকল স্তোত্র তাঁহাদের শুভ্র মানসের সরল বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত, স্বাভাবিক প্রার্থনা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারে পরিপূর্ণ।

এই অসীম বিশ্বমধ্যে তাবৎ পদার্থ ও ঘটনাই সেই ঋষিগণের মনে অলৌকিক বিস্ময় ও ভয় উৎপাদন করিত এবং তাঁহারা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী বা অভিমানিনী দেবতা কল্পনা করিতে স্বভাবতঃ উদ্যত হইতেন। এই জন্যই আমরা ভারত-ইতিহাসের সেই অতীত পুরাতন পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাই যে, মেঘ, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টির ইন্দ্র, অগ্নির হুতাশন বা হুতবহ, দিবাভাগের মিত্র, নিশাভাগের বরুণ, নিশা-শেষাংশের অশ্বিনৌ, প্রাতঃকালের ঊষা, সূর্য্যের সবিতা, অনিলের বায়ু ও ঝঞ্ঝাবাতের মরুদ্গণ দেবতা। প্রথমতঃ ঋষিগণ বহির্জগতের এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ দেবদেবী কল্পনা করিয়া পরে অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই, ব্রহ্মণস্পতি, বাচস্পতি, বাস্তোস্পতি, গণপতি প্রভৃতি দেবগণের নাম শুনা যায়। যেমন পৌরাণিক যুগে কৃষ্ণাষ্টমী, রামনবমী, অনন্তচতুর্দ্দশী ও শিবরাত্রি ইত্যাদি প্রত্যেক ব্রত সম্বন্ধেই 'ইদং ব্রতানাং উত্তমং ব্রতম্' ইহাই সকলব্রতের মধ্যে উত্তম ব্রত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, বৈদিক দেবগণ সম্বন্ধে তদ্রূপ দেখা যায়। ঋষিগণ যে কোনও দেবতার স্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদবী প্রদান করিয়াছেন। বৈদিক কালের এইরূপ অসামঞ্জস্য দর্শনে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। কেননা, তাঁহাদের প্রত্যেক দেবমধ্যেই, আমরা সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, জগৎপালকত্ব প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ সমূহ দেখিতে পাই। প্রকৃত পক্ষে এই ঈশ্বরীয় মহান্ ভাবটী তাঁহাদের বহু দেবদেবীর অস্তিত্বের মেরুদণ্ডস্বরূপ। ইহাই তাঁহাদের দেবতত্ত্বে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিতা। ইহাই বৈদিক দেবপুঞ্জরূপ Algebraic expression এর Common factor; আমরা ইহাকেই সেই প্রাচ্যতম বহু দেববাদের মধ্যে প্রতীচ্যকালীন উপ-

নিষৎ কথিত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মহাবাণীর নিগূঢ়বীজ বলিয়া নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি।

আমার বিশ্বাস, বৈদিক ঋষিগণ, প্রথমে জড় ও চেতন পদার্থদ্বয়ের পার্থক্য রেখা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, সূর্য্য, অগ্নি, মেঘ, বায়ু প্রভৃতিকে সজীব, সচেতন, বহু শক্তি দেব বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন; পরে উহাদিগকে অচেতন বলিয়া জানিতে পারিয়াও সহসা পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিতে সাহসী হন নাই—ঐ সকল নামে উহাদের অভিমানিনী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়াছিলেন। পরিশেষে এতাদৃশী ব্যষ্টি উপাসনাতে অতৃপ্ত হইয়া, তাঁহাদের মধ্যে অনেক মহর্ষিই ক্রমশঃ পূর্ণ একেশ্বরবাদে উপনীত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই এ কথা বলিতে সাহসী হইবেন না যে, হিন্দুধর্ম্মের শৈশবাবস্থা ঋগ্বেদ-সংহিতার কাল হইতে এ সময় পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে কোনও পরিবর্ত্তন বা সংস্কার সংসাধিত হয় নাই। এ কথা যদি সত্য হয় যে, হিন্দুধর্ম্মের সনাতনত্ব ইহার অপরিবর্ত্তনীয়ত্ব বা সংস্কার-বিহীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে এখন আমরা দেখিতে পাইতাম যে, গণেশ ও কালী, হনুমান ও রামচন্দ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা, কার্ত্তিক ও জগদ্ধাত্রী, শিব ও কৃষ্ণ, দুর্গা ও রাধিকা প্রভৃতি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা তান্ত্রিক দেবদেবীর মিশ্রীকৃত পূজাবাহুল্যের পরিবর্ত্তে কেবল অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, দ্যৌস্, দ্যৌসপতিরৌ, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি বৈদিক তেত্রিশকোটী দেবতার অর্চ্চনায় ভারত ব্যস্ত রহিয়াছে। তাহা হইলে ইঁহাদেরই সরল স্তুতি-গীতিতে ভারতাকাশ নিনাদিত হইত। ভারতসমীরণ এই সকল দেবতার উদ্দেশে আবর্জ্জিত সমিধ-প্রদীপ্ত-বহ্নি সম্ভূত পূতহবির্গন্ধ সর্ব্বত্র বহন করিত, এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরিত স্বরে গীত সুমধুর সাম-সঙ্গীতে মুখরিত অগ্নিগৃহ প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে সুরক্ষিত হইত। যদি হিন্দু ধর্ম্মকে সংস্কারণই বলিয়াই তোমার বিবেচনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্বিজ-সন্তানগণ গায়ত্রীগ্রহণরূপ বৈদিকী দীক্ষাতেই নিশ্চিন্ত রহিতেন এবং তুমি তান্ত্রিকী দীক্ষার নামই শুনিতে পাইতে না। সংস্কার বা বিকাশসূত্রে ঋক্‌সংহিতার সময়ের পর হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে নূতন কিছু প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া যদি তোমার প্রতীতি না জন্মে, তাহা হইলে, বল দেখি, দুরাশা সমূহে পরিপূর্ণ উদ্ধত যুবক হৃদয়ের ন্যায় অধুনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক ধমনী মধ্যে কোথা হইতে অবতারবাদ আসিল?

এখন, যদি পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনই হিন্দুধর্ম্মের বিপুলশরীর গঠিত করিয়াছে, তবে ইহার সনাতনত্ব কোথায়? আমাদের হিন্দুধর্ম্ম সনাতন বলিয়া আমরা যে গলাবাজি করি, তাহার মূল ভিত্তি কৈ? যদি হিন্দুধর্ম্ম বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা মহম্মদ প্রভৃতির ন্যায় মহাজন বিশেষের, কিম্বা দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ বা অবতারবাদ প্রভৃতির ন্যায় মত বিশেষের উপর নির্ভর করিত, তবে হিন্দুধর্ম্ম সনাতন হইতে পারিত না, কিন্তু ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই ধর্ম্ম মানব প্রকৃতির অন্তস্তলে নিহিত এবং মানব প্রকৃতি সনাতনী বলিয়া ইহাও সনাতন। মানব-প্রকৃতিতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন যীশু খ্রীষ্ট বলিয়াছেন:—

"Man shall not live by bread alone,but by every word that proceedeth out of the mouth of God." [St. Mathew iv-4.]

এখানে অন্ন (Bread) শব্দটীকে সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার বিশালতর অর্থ পরিগ্রহ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে,বিপুল যশঃ, অতুল সম্পত্তি, সুস্বাদু আহার্য্য, সুগন্ধি দ্রব্য, সুন্দররূপ প্রভৃতি মর্ত্ত্য ঐন্দ্রিয়িক সুখরাশিতে মনুষ্য পরিবেষ্টিত থাকিলেও, তাহার জীবন অকৃতকার্য্য ও অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। বস্তুতঃ এই সকল মনুষ্যাত্মার প্রকৃত সুখের উপকরণ নহে, তাহার আনুষঙ্গিকমাত্র। যদি মনুষ্য উদরপূর্ত্তিকে জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত, তাহা হইলে, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় মনুষ্য নামধেয় দ্বিপদ জন্তু যেরূপ বর্ব্বর দশায় ছিল, বর্ত্তমান সময়েও সেইরূপ থাকিত। কিন্তু অশেষ তাপে তপ্যমান জীবনকে সুবহ করিতে হইলে কেবল অন্নরাশি যথেষ্ট নহে, তাহা হইলে চাই সহানুভূতি, দয়া, স্নেহ ও বিশুদ্ধ উচ্চাভিলাষ। ইহাদের জন্যই মানব মন লালায়িত। ইহাদিগকে একটি কথায় প্রকাশ করিতে হইলে, প্রেম বা ভালবাসা ভিন্ন অপর কোনও শব্দ মনে আইসে না। ঈশ্বর-প্রেমই ভালবাসার পরাকাষ্ঠা এবং ইহাই যীশুখ্রীষ্টের পূর্ব্ব উদ্ধৃত মহাবাক্যের (Word of God.) প্রত্যেক হৃদয়ই এই স্বর্গীয় অনল পোষণ করিতেছে। এই যে অসভ্য জাতিরা কোন একটী বৃক্ষকে সিন্দুররঞ্জিত ও ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধশাখ করিয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিতেছে, ইহাই তাহাদের ঈশ্বর-প্রেমের নিদর্শন, ইহাকে উপেক্ষা করিও না, ইংলণ্ডীয় কবির কথা মনে কর, "Child is the Father of Man." এই অসভ্যেরা (আমরা সভ্য কি না, তাই, উহাদিগকে পৃথক্ করিবার জন্য এই মধুর সম্ভাষণ) কেবল আমপিশিতের উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহাদের সমীপে (Word of God) এই ভাবে প্রকাশিত। উহারা এই প্রকারেই ঈশ্বরকে প্রেম করিয়া তৃপ্ত। কালক্রমে আধ্যাত্মিকী ক্ষুধা বর্দ্ধিত হইলে উহাদের ধর্ম্ম ও বিশ্বাস অন্যবিধ আকার ধারণ করিবে।

যীশুখ্রীষ্টের কথা চিরসত্য বলিয়াই, আমরা মহর্ষিগণকে বেদের রচয়িতা দেখিতে পাইতেছি। যখন এই সকল মহর্ষিগণ সপ্তসিন্ধু প্রদেশে (নব্য পঞ্জাবে) বেদ গান করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা শাক্ত কি বৈষ্ণব, শৈব কি সৌর ছিলেন, এ প্রশ্ন শ্রীমান্ বায়ুদেবানুগৃহীত ব্যক্তিবর্গের মুখেই শোভা পায়, অথবা "আমাদের পূর্ব্বপুরুষাচরিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছি,"এই ভাবিয়া যাঁহারা ফোঁটাতিলক শিখায় স্ব স্ব দেহ ভূষিত করিয়া স্ফীত বক্ষে বিচরণ করেন, এবং ইংরেজ-ঘেঁসা নব্যতন্ত্রের হিন্দুর ছায়াস্পর্শে ভাগীরথী-সলিলে তিনবার অবগাহন করিয়াও স্বীয় আত্মা ও শরীরের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দিহান থাকেন, (অর্থাৎ তাঁহাদের গঙ্গাভক্তি অতিপ্রবলা কি না, এজন্য) তাঁহাদেরই হস্তে এ কূট প্রশ্ন মীমাংসার ভার অর্পণ করিলাম। যাহা হউক, আমি দেখিতেছি যে, এই বৈদিক মহর্ষিগণ আপনাদিগকে হিন্দু সংজ্ঞায় পরিচয় দেন নাই। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে রাধা বা রাধিকা শব্দের ন্যায় সুবিস্তৃত সংস্কৃত ভাষায় "হিন্দু" শব্দটি নাই, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়। তবে দুই এক খানি পুরাণ ও তন্ত্রে "হিন্দু" শব্দের উল্লেখ আছে,কিন্তু ইহারা এত আধুনিক যে,

এই সকল শাস্ত্রে "ইংলণ্ডদেশোদ্ভব ইংরাজগণ ভারত শাসন করিবেন," এই ভবিষ্যদ্বাণী (?)পরিদৃষ্ট হয়। একখানি সংস্কৃত অভিধান "হীনান্ দূষয়তি ইতি হিন্দু নিপাতন সিদ্ধঃ" অর্থাৎ "হীন জনকে দোষ দেয় অতএব হিন্দু, এই শব্দটী নিপাতন সিদ্ধ" এইরূপে হিন্দুশব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন [শব্দকল্পদ্রুমঃ]। আশা করি, বুদ্ধিমান্ পাঠক হিন্দুশব্দ উল্লেখকারী শাস্ত্রকে প্রামাণ্য জ্ঞান করা দুরূহ জ্ঞান করিবেন। আমি কথিত অভিধানের মত পণ্ডিতী ফলাইয়া "হিন্দুকে একেবারে "নিপাত' করিতে নিতান্ত মর্ম্ম বেদনা অনুভব করি। অনেকে 'হিন্দু' শব্দটীকে 'সিন্ধু' শব্দের যাবনিক অপভ্রংশ জ্ঞান করেন। প্রাচীদিক্ অভিমুখীন যাত্রী আর্য্যাংশের একভাগ সিন্ধুতীরে প্রথম বসতি করিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা হিন্দুনামে অভিহিত হন। সংস্কৃত 'সিন্ধু' শব্দটী প্রাকৃতভাষায় 'হিন্দু'তে পরিণত হইতে পারে কি না, এ বিষয়ে প্রাকৃততত্ত্ববিদ্গণের মনোযোগ প্রার্থনা করি, কারণ, তাহা হইলে আর আমাদিগকে যবন-ভ্রাতৃগণের ভাষা আশ্রয় করিতে হয় না। (১)

আজকাল যেরূপ ঘরে বাহিরে নিষ্কাম ধর্ম্মের ধ্বজা উড়িতেছে, তাহাতে আমরা বৈদিক মহর্ষিবৃন্দের নিকট হইতে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারি।

---

(১) মাননীয়া শ্রীমতী সরলা দেবী বি, এ, ভারতীতে (১৩০৬, জ্যৈষ্ঠ) "হিন্দু" ও "নিগর" শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন; "অনেকেরই ধারণা এই যে, পারসীক "হিন্দু" শব্দ সংস্কৃত "সিন্দু" শব্দের রূপান্তর মাত্র। * * * পারস্য ভাষার সহিত কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় থাকিলে এ ধারণা টিকে না। "হিন্দু" শব্দ সংস্কৃত সিন্দু শব্দ হইতে উৎপন্ন নহে, উহা একটি প্রাচীন পারসীক শব্দ, উহার অর্থ কৃষ্ণ, কাল। * * * ইরাণীদিগের জেন্দাবস্থনামক যে প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বেদের সমসাময়িক, তাহাতে হিন্দু শব্দ একবার উল্লিখিত হইয়াছে।" লেখিকা মহোদয়া "হিন্দু" শব্দের কৃষ্ণার্থ দৃঢ় রাখিবার জন্য বলিতেছেন; "পারস্য বণিক্‌গণ যখন সমৃদ্ধ ভারতে পণ্য দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিত, কিম্বা মোগল পাঠানেরা যখন ভারত জয় করিল, তখন তাহারা আমাদের নামকরণ করিয়া থাকিবে 'হিন্দু' অর্থাৎ তাহাদের তুলনায় কৃষ্ণকায়। গোরা সাহেবের তুলনায় আমরা এখন কালা আদ্‌মি, গৌর মধ্য এসিয়া নিবাসীগণের তুলনায় আমরাও সে দিন হিন্দু অর্থাৎ কাল অর্থাৎ কালা আদ্‌মি ছিলাম।"

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বেদ গ্রন্থ রচনা সময়ে 'হিন্দু' শব্দের প্রচলন দেখা যাইতেছে এবং পাঠান ও মোগল কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ-বিজয়ের বহু পূর্ব্বে বিদেশীয় ইতিহাসে ইহা হিন্দুস্থান নামে বিখ্যাত। সেই প্রাচীন বৈদিক সময়ে, পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে সদ্য আগত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌরকায় ছিলেন। তাঁহারা অনেক সময়ে ভারতের আদিম নিবাসী কৃষ্ণকায়গণের বিনাশের জন্য দেবগণ সমীপে প্রার্থনা করিতেন। [ঋগ্বেদ সংহিতা] সুতরাং হিন্দু ও কৃষ্ণ এই দুই শব্দের পরস্পর বিরোধ সূচক অর্থই লক্ষিত হইতেছে।

লেখিকা পুনশ্চ লিখিতেছেন "নিগার বা নিগ্রোর অর্থ সেই এক, উহা লাটিন নিজর হইতে উৎপন্ন, ইহার মৌলিক অর্থ কৃষ্ণ, কাল, আধুনিক অর্থ অসভ্য দাস। পারস্য ভাষায় হিন্দু শব্দের একটি অর্থ দাস। আমাদের "দেব" বা পারসীকদের দৈত্য, আমাদের "অসুর" তাহাদের পূজ্য। অনেক বিষয়েই তাহাদের সহিত আমাদের চিরবিরোধ। সুতরাং যুদ্ধে বন্দী হইলে আমরা হিন্দুরা অর্থাৎ কৃষ্ণকায় মনুষ্যেরা তাহাদের দাস হইতাম। সেই জন্য হিন্দু শব্দ ক্রমশঃ দাসার্থ বোধক হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং সাহেব আমাদের হিন্দু না বলিয়া নিগর বলিয়া সম্বোধন করিলে কোনও ক্রমে অত্যুক্তি হয় না।"

এই অংশ পাঠ করিয়া আমি একবার ভাবিয়াছিলাম, লেখিকা মহাশয়া বুঝি পরিহাস করিতেছেন!

শ্রদ্ধাও ভক্তির সহিত নমস্কারপূর্ব্বক কি ক্ষুদ্র কি মহান্, কি ব্যক্তিগত কি পরিবারগত যে কোনও অভাব উপস্থিত হউক না কেন, তাঁহারা তাহা (২) তাঁহাদের বিশ্বাসের দেবগণ সমীপে আবেদন করিতেন এবং সেই দেবগণের প্রিয় হইবার জন্য সোম ও হোমের ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট দুর্ভিক্ষ আশঙ্কায় বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেন, কৃষ্ণ অনার্য্য রাক্ষসগণের সহিত সমরে বিজয় যাচ্ঞা করিতেন, ধন, গো, অশ্ব, পুত্র প্রার্থনা তাঁহাদের রসনার নিত্য বুলি ছিল। এই দেব-বিশ্বাস কেমন স্বাভাবিক, সরল ও সুন্দর! আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা করিবার জন্য, রোগ-শোক বিপদ ভয় হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য, দৈনিক আহার্য্য সংস্থান করিবার জন্য অদৃশ্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা সহজে আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। আমি একথা বলিতেছি না যে, নিষ্কাম ধর্ম্মযাজন শশশৃঙ্গবৎ একেবারেই অসম্ভব। যদিও গীতায় এই নিষ্কাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হইয়াছে এবং এই ধর্ম্ম আদর্শে অনেক জীবন পরিচালিত হইয়াছে, তথাপি বৈদিক ঋষিগণের ন্যায় সকাম পন্থানুসরণ করা আমাদের অধিকতর প্রকৃতিসঙ্গত। কামনা বিনাশ নহে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল কামনারাশি দমিত করিয়া ভগবানের মহতী কামনার অনুগত করাই যদি নিষ্কাম ধর্ম্মের অন্যতম সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে "Thy will be done" এই কথাটি নিষ্কাম ধর্ম্মের চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

কিন্তু সমগ্র প্রবন্ধটির গুরুগম্ভীর "চাল" দেখিয়া সে ধারণা তিরোহিত হইয়াছে। ঋগ্বেদসংহিতায় দেবগণকে পুনঃ পুনঃ অসুর শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। "অস্যতি শত্রূন্ ইতি শেষঃ' বেদে এই অর্থে দেবগণকে অসুর বলা হইয়াছে। বৈদিক "অসুর" ও পারসীক "অগর" একই জিনিষ। হিন্দু শব্দের প্রথম প্রচলন কালে, সেই বৈদিক সময়ে, হিন্দু ও পারসীকগণের মধ্যে "চিরবিরোধ" ছিল না, প্রত্যুত বহুবিষয়ে ইহাদের ঐক্য ছিল [ম্যাক্সমূলর, হিবার্ট লেক্‌চর্।]

লেখিকা এই প্রবন্ধের এক স্থলে বৈয়াকরণগণকে আক্রমণ করিয়াছেন, "এই সকল তথ্য পর্য্যালোচনা করিয়া আমার বোধ হয় আর্য্যেরা যখন বিভক্তহন নাই, যখন পারসীক ও প্রাচীন হিন্দুগণের পূর্ব্বপুরুষেরা একত্রে মধ্য এসিয়ায় অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহাদের সাধারণ ভাষায় কৃষ্ণার্থবোধক একটি শব্দ ছিল, যাহা হইতে হিন্দু ও সিন্ধু দুইই উৎপন্ন এবং দুয়েরই মৌলিক অর্থ কৃষ্ণ। বহু পরন্তন বৈয়াকরণিকেরা এই মূল অর্থ অব্যবহারে বিস্মৃত হইয়া, স্যন্দ্ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক উ প্রত্যয় করিয়া, কোনরূপে জোড়াতাড়া দিয়া সমুদ্রার্থবোধক সিন্ধুশব্দ যে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের একটি কারিগরিমাত্র। অধুনা সমুদ্র যেমন ভাষায় "কালাপাণি" সে দিনও উহা তদ্রূপ "ভাষায়" 'সিন্ধু' অথবা কাল অথবা কালাপাণি ছিল।"

সিন্ধুনদীকে পারসীকেরা উচ্চারণ দোষে হিন্দু বলিত এবং ক্রমে ঐ নদীতীরবাসীর নাম হইল হিন্দু। এ কথা স্বীকার করিলে আর এত কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। বৈদিক "সপ্ত সিন্ধবঃ" এবং অহুরজমূদের "হপ্ত হিন্দর' সমার্থক, লেখিকা ইহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমাদের পূর্ব্ব কথিত ধারণার অনেকটা অনুকূল।

এই সকল তথ্য পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য যে, তদীয় "হিন্দু ও নিগর' প্রবন্ধে কবি-কল্পনার যত সমাবেশ, ঐতিহাসিক সত্যের তত নহে।

(২) হিন্দুগণের, বিশ্বাস বেদ অপৌরুষেয়, ঋষিগণ মন্ত্র দ্রষ্টা মাত্র, মন্ত্রস্রষ্টা নহেন। ঋগ্বেদসংহিতা, ৫ম, ৭৩, ১০; ৭ম ৬১, ২; ৭ম ৬১, ৬; ৭ম, ৯৪,১ প্রভৃতি ঋক্‌গুলি পাঠ করিলে এ ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরীভূত হইবে।

এই পবিত্র মহাকথাটি যাঁহার মুখনিঃসৃত, তাঁহারই মুখ হইতে, বৈদিক কালের বহু সহস্র বৎসর পরে, "Ask and it shall be given" এই উপদেশ উচ্চারিত ও উদ্ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাই এই বৈদিক ঋষি জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

ঋগ্বেদের সংহিতাংশ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। লৌকিক প্রসিদ্ধি এই, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ নামধেয় গ্রন্থকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন, প্রত্যেকের নাম ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ। এই জন্য ইনি বেদব্যাস নামে বিখ্যাত। কিন্তু এরূপ কল্পনা করিবার যথেষ্ট হেতু আছে যে, সমগ্র বেদ শ্রুতিগোচর করিয়া মস্তিষ্ক মধ্যে ধারণা জনসাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য কার্য্য বলিয়া ইহা প্রথমতঃ ঋক্, যজুঃ, সামাখ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, এজন্য বেদের নামান্তর ত্রয়ী। পরে অথর্ব্ববেদের মন্ত্রাদি সংগ্রহণ ও প্রণয়ন করিয়া ইহাতে সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয়। বেদের ন্যায় জাতীয় বিপুল গ্রন্থাবলীর এতাদৃশ বিভাগ ও সংযোগ, এক জনের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এই সুমহান্ ব্যাপার মহর্ষিসঙ্ঘের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকিবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পুনশ্চ প্রত্যেক বেদ সামান্যতঃ দুই অংশে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রাংশ বৈদিক দেবদেবীর উদ্দেশে বিরচিত; সুন্দর সরল কবিতারাজি সুশোভিত। ইহাকে সংহিতাভাগও বলে। বহু জাতির সমবেত অনুসন্ধানে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সমগ্র পৃথিবীমধ্যে ঋগ্বেদ সংহিতাই অতি প্রাচীনতম পুস্তক। প্রতীচ্য প্রত্নতত্ত্ববেত্তৃগণ তিন সহস্র খ্রীঃ পূঃ ইহার রচনাকাল নির্দ্দেশ করেন। প্রফেসর বি, জি, তিলক এ বিষয়ে কঠোর পরিশ্রমের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঋগ্বেদসংহিতা রচনার প্রধানতঃ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কাল আছে, তন্মধ্যে প্রথমটির সময় খ্রীঃ পূঃ ছয় সহস্র বৎসর। সম্প্রতি বেদাধ্যায়িগণের মধ্যে এই মত Kielhorn, MaxMuller, Muir, Colebrooke, Peterson, Weber এবং Wilson প্রভৃতি বেদবেত্তা মহাত্মাগণের মত অপেক্ষা অধিকতর গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইতেছে। সংহিতার বিমল স্তোত্র রচনার সঙ্গে সঙ্গেই যজ্ঞের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। বেদের "ব্রাহ্মণ' ভাগে বৈদিক যজ্ঞ সমূহের বিধি প্রতিষেধ পূর্ণাঙ্গরূপে লিপিবদ্ধ আছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে বহুকাল ব্যবধান। কোন্ যজ্ঞে কি প্রকারে ইন্ধন স্থাপন করিতে হইবে, কি মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে, কোন্ কোন্ পশু হত্যা করিতে হইবে, কোন্ মুখে উপবেশন করিলে হবিঃ দেবগ্রাহ্য হইবে, ইত্যাদি বহুবিধ খুটিনাটিতে ব্রাহ্মণ সকল পরিপূর্ণ। যজ্ঞীয় মন্ত্রের অধিকাংশ সংহিতা হইতে সংগৃহীত। ঐতরেয় ও কৌশীতকী ঋগ্বেদের, তৈত্তিরীয় কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের, শতপথ শুক্ল যজুর্ব্বেদের, ষড়বিংশ ও অদ্ভুত সামবেদের ব্রাহ্মণ। ঋক্, যজুস্ ও সামবেদের পুরোহিতগণ যথাক্রমে হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যু শব্দে অভিহিত। সূত্র ও প্রাতিশাখ্য গুলিও বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত। আরণ্যক ও উপনিষৎগুলি ব্রাহ্মণের শেষ

সময়ে বিরচিত এবং ব্রাহ্মণেরই অন্তর্ভূত। এ বিষয় পরে বিবৃত করা যাইবে।

ভারতে আগমনের পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্ম কীদৃশ ছিল, তাহা জানিতে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বহু অনুসন্ধানের পর এই যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রাগিতিহাস কালে কাস্পীয়ান্ (কাশ্যপীয়) হ্রদের সমীপবর্ত্তী মধ্য এসিয়ায় আর্য্যগণ বাস করিতেন। দেশ জয় ও উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে করিতে তাঁহাদের একশাখা পশ্চিম দিকে গমন করিয়া গ্রীক্, রোমান্ প্রভৃতি প্রাচীন জাতির জীবন প্রতিষ্ঠা করেন, অপর শাখা পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সপ্তসিন্ধু-দেশের অনার্য্য দস্যুগণকে পরাজিত করিয়া, প্রাচীনভারত-গৌরবের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কেবল আর্য্য, তুরেণীয় ও সেমেটিক ভাষার সৌদাদৃশ্যে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য প্রদেশের এই নিকটতর সম্বন্ধ ধরা পড়ে, এমন নহে। উভয় বিভাগের প্রাচীন শাস্ত্র সমুদয় অন্বেষণ করিলে, যাগবিধি, বলিদান ও দেবগণের ঐক্য, এই সম্বন্ধ আরও নিকটতর করিয়া তুলে। বৈদিক দ্যৌস্ গ্রীক, জিউস্ [Zeus] জর্ম্মানি জিও [Zeo] বৈদিক দ্যৌস্পিতরৌ ইতালীয় জুপিটার (Jupiter), বৈদিক অগ্নিঃ (অগ্নিস্) পারিসিক ইগ্নিস্ (Ignis) এ সকল দেবতা একই জিনিষ। বৈদিক ঋষিগণ তাঁহাদের দেবগণকে অসুর বলিতেন। 'অসুর' দিবাদিগণীয় অস্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। জেন্দ্ ভাষার দেবগণের নাম অহুর। উপনিষদে অসুর শব্দার্থ সুরবিরোধী দৈত্যদানবগণ [ছান্দোগ্য উপনিষৎ] পুরাণরচয়িতৃগণ উপনিষৎ হইতে সুর ও শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। অশেষ শাস্ত্র পারদর্শী ম্যাক্স মূলার তদীয় হিবার্ট বক্তৃতার একস্থলে লিখিয়াছেন, "মূল আর্য্যজাতির শাখা সকল নানাভাগে বিভক্ত ও পৃথক হইয়া পড়িবার পরেও ভাষা ধর্ম্ম ও কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে বহুদিন পর্য্যন্ত এক প্রকার ছিল।" তিনি সংস্কৃত, জেন্দ, হিব্রু, জার্ম্মান্ ও লাটীন, এই কয়টী ভাষার বৈদিক "ঋত" পদের শব্দ ও অর্থগত সৌসাদৃশ্য তুলনা করিয়া উদ্ধৃত মত দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের ভারতীয় ধর্ম্মের ক্রম বিকাশ আলোচনার পথ অপেক্ষাকৃত সহজ ও পরিষ্কৃত হইয়া আসিল। ঋগ্বেদের সর্ব্বপ্রথমেই

অগ্নি

স্তুতি। যে দিন দাবানল পরিদর্শন করিয়া কোনও ঋষি কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নির আবির্ভাব করিয়াছিলেন, সে দিন ঋষিসমাজ মধ্যে মহান্ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। সেই দিন কত কৌতূহল-প্রদীপ্তলোচনা ঋষীপত্নী সেই অদৃষ্টচর ব্যাপার দেখিতে দ্রুত পদবিক্ষেপ করিয়াছিল; কত ঋষিকুমার কুমারী সকৌতুকনয়নে এই ব্যাপার দেখিতে অগ্নির চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়াছিল। ঋষিগণ ভাবিলেন, যাঁহার আলোকে দশদিক্-উজ্জ্বল ও যাঁহার স্পর্শে শরীর দগ্ধ হয়, এ সর্ব্ব-বিনাশক অসহ্য-তেজাঃ দেবতা কে? জল বিক্ষেপে ইনি কোথায় তিরোভূত হন, তাহা কে জানে? ইন্ধনাদি যাহা কিছু অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করা যায়, তাহাও পরমুহূর্ত্তে কোথায় লুক্কায়িত হয়, তাহাই বা কে জানে? অগ্নিশিখা সর্ব্বদা ঊর্দ্ধগামিনী। নিশ্চয়ই অগ্নি সকল পদার্থই

অদৃশ্যভাবে ঊর্দ্ধবিহারী ইন্দ্রাদি দেবগণ সমীপে লইয়া যাইতে পারেন। এইরূপে অগ্নির হুতবহত্ব কল্পনা ঋষিগণের মধ্যে উদিত হইয়াছিল। অগ্নি দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করিয়া থাকেন। অগ্নিও এক মহতী দেবতা। আমার বোধ হয়, রোম্যান্ ক্যাথলিক এবং ট্রিনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টিয়ান্গণ যেমন ঈশ্বর ও মনুষ্যগণের মধ্যস্থ বোধে যীশু খ্রীষ্টের পূজা করিয়া থাকেন, সেইরূপ, মহর্ষিগণ অগ্নিকে দেবগণ ও তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানে পূজা করিতেন। কয়েকটি অগ্নি সম্বন্ধীয় ঋক্ দেখুন।

"আমি যজ্ঞের পুরোহিত, ঋত্বিক্, হোতা, বহুরত্নধারক অগ্নিদেবকে স্তুতি করিতেছি। অগ্নি পুরাতন ও নব্য ঋষিগণের স্তুত্য। তিনি এই যজ্ঞে দেবতাগণকে আনয়ন করুন। অগ্নির প্রসাদেই যজমান প্রতিদিন বর্দ্ধমান যশঃ ও পুত্রযুক্ত ধন লাভ করেন।" [১ম ১ সূ ১-৩ ঋক] (১)

"হে বৈশ্বানর অর্থাৎ বিশ্বনরহিত, হে অগ্নে, হবির্দাতা আমাদিগকে তুমি বহু ও অন্ন বল প্রদান কর। রুদ্র ও বসু দেবগণের সহিত আসিয়া আমাদিগকে মহৎ সুখ প্রদান করুন।" [৭-৫-৯]

অগ্নি সর্ব্বজ্ঞ [৭-৭-১]। ইন্দ্রের ন্যায় অগ্নি জগতের সম্রাট [৭-৬-১]। অগ্নিই ঋষিগণের গৃহপতি ছিলেন [৭-১-১]। অগ্নি পাপ ও নিন্দিত কর্ম্ম হইতে রক্ষাকারক [৭-১২-২]। বৈজ্ঞানিকের কথা ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইলে, এই জ্যোতির্ম্ময়

সূর্য্য

কেন পৃথিবীর তাবৎ সভ্য ও অসভ্য প্রাচীন জাতি সমীপে জগদীশ্বররূপে প্রতিভাত হইয়াছেন, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। অগ্নির দেবত্বজ্ঞান সময় সাপেক্ষ। ঋষিগণ ক্বচিৎ দাব বা বড়বানল পরিদর্শন করিয়াছিলেন [ঋগ্বেদ সংহিতা ৭মং ৩ সূ ২ ঋক্]। বৈদ্যুতাগ্নিও সকল দিন অনুভূত হয় নাই। আম দ্রব্য ভক্ষণের অতীত না হইলে আর ইন্ধনাগ্নির নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু ঋষিগণ প্রত্যহই দেখিতেছেন, একই সময়ে পূর্ব্বগগনে সূর্য্য স্বীয় শুভ্রোজ্জ্বল তেজো রাশি দ্বারা দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ ও ভূলোক আপূরিত করিয়া উদিত হইতেছেন। ইঁহার অনুপস্থিতিতে পৃথিবী অন্ধকার ও দস্যুভয়ে ভীতা ছিল। ইঁহার অভ্যুদয়ে তাহার সে ভয় দূরীভূত হইল। এ দেবতা কে? ইতি কেমন সমদর্শী, ধনী ও দরিদ্র, জ্ঞানী ও মূর্খ, সুশ্রী ও কুশ্রী, সকলকেই ইনি প্রেম কিরণের আলিঙ্গন প্রদান করিতেছেন। আমরা ইঁহাকে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু স্পর্শ করিতে পারি না। এ দেবতা কে? পরিশেষে ঋষিগণ মহাদ্যুতিকে সবিতা বলিয়া স্থির করিলেন। সেই বর্ষীয়ান্ আর্য্যশিশুগণ এই পরিদৃশ্যমান অলোকসাধারণ পরিশ্রমী সূর্য্যকে যে বিশ্বেশ্বর বলিয়া ধারণা করিলেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। প্রাচীন কালের ন্যায় না হউক, সূর্য্য এখনও ভারত হইতে যথেষ্ট পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। বর্ত্তমান প্রধান পঞ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইঁহার উপাসক সৌর নামে বিখ্যাত। প্রত্যেক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যা বন্দনাতে সূর্য্যোপস্থান করিয়া থাকেন। হিন্দু দেবদেবীর প্রাত্যহিক পূজা মধ্যে কাশ্যপেয় মহাদ্যুতি ধ্বান্তারি ও সর্ব্বপাপঘ্ন সূর্য্যের অর্ঘ অতি প্রসিদ্ধ। হিমালয় হইতে কন্যা কুমারী ও সিন্ধু হইতে ইরাবতী পর্য্যন্ত ভারতীয় সকল ব্রাহ্মণের দৃঢ় ঐক্য বন্ধন স্বরূপ সকল শাস্ত্র প্রশংসিত গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা সূর্য্য। (২) এজন্য সাবিত্রী গায়ত্রীরই নামান্তর।

প্রাতঃস্মরণীয় মোগলসম্রাট মহাত্মা আকবর প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যবন্দনা করিতেন। অসভ্য সাঁওতালেরা এখনও সূর্য্যের পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের ভাষায় সূর্য্যর নাম চণ্ডু। এই ভারত বক্ষে কতই ধর্ম্ম ও রাজপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তথাপি, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, ভারতভূমিতে হব্যসমর্দ্বিবপুঃ অগ্নির অভ্যর্থনা চিরদিনই চলিতেছে এবং ভারতাকাশে সূর্য্য চিরদিনই ভারতবাসীর অর্ঘ গ্রহণ করিতেছেন।

ঋগ্বেদ সংহিতার সূর্য্য স্তুতি দেখুন।

"হে মিত্রাবরুণ! সর্ব্বস্তুত্য এই সূর্য্যদেব অন্তরীক্ষে উঠিতেছেন। ইনি স্থাবর ও জঙ্গম বিশ্বের রক্ষক। ইনি মনুষ্যদিগের পাপ পুণ্য সকলই জানেন।" [৭-৬০-২]

"হে সূর্য্য! তুমি যে আলোক দ্বারা অন্ধকার পরাজিত ও জগৎ জাগরিত কর, সেই আলোক দ্বারা আমাদের সমুদয় দুর্ব্বলতা, ঔদাসীন্য, রোগ ও নিদ্রাভাব দূরীভূত করিয়া দেও।" [১০-৩৭-৪]

"বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, অর্য্যমা, রুদ্র ও অরাতিগণ যে সূর্য্যের হিংসা করে না, আমরা মঙ্গললাভার্থ সেই সূর্য্যকে নমস্কার ও আহ্বান করিতেছি।" [২-৩৮-৯]

"হে সবিতঃ! স্তোতা আমাদিগকে কাম্য ধন ও সুখ দান কর।" [২-৩৮-১১]

আমার বোধ হয়, সূর্য্যই ঋষিগণের আদি দেবতা। ইহার পর ঋষিগণ

ঊষা-

কে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকে এই যে শুক্লবসনা জ্যোতির্ম্ময়ী সুন্দরীকে দেখা যায়, এ দেবী কে? এ হেন শান্ত মধুর মূর্ত্তি বিরল দর্শন। গত তামসী রজনীতে যখন আমরা সুষুপ্তির সুকোমল অঙ্কে সুখ-শায়িত ছিলাম, তখন ইনিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। ইনি আমাদিগকে অগ্নিহোত্রের সময় উদ্বোধিত করিয়া দিতেছেন।

ভগিনীর ন্যায় স্নেহময়ী এ দেবী কে? তাঁহারা ঊষাকে দ্যৌস্ [আকাশ] দেবতার কন্যা ও সূর্য্যের গৃহিণী বলিয়া স্থির করিলেন [৭-৭৫-৫]।

ঊষা পূর্ব্বদিকের দ্বার খুলিয়াছে। তাঁহার বিবিধ বর্ণরঞ্জিত বেশভূষার আভা লইয়া মেঘশিশু গুলি খেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বায়ু-দেবতা এ আনন্দের কথা প্রত্যেক গৃহীকে জানাইবার জন্য অন্তরীক্ষে মৃদুমন্দমন্তরণ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধরণী-দেবীর ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য পাখী সকল গাছ ছাড়িয়া আকাশে আসিয়া সুমধুর তানে গান ধরিয়াছে। সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে লাল চোখে (সারা রাত কি জাগিয়াছেন?) যখনই ঊষার নির্ম্মল রজতশুভ্র অঞ্চল ধরিতে যাইবেন, তখনই ঊষা সে দিনের মত পলায়ন করিল। ছি! ঊষা ভারি লাজুক মেয়ে!

ঊষা সম্বন্ধে ঋষিদের ইহাই প্রধানকল্পনা। কোনও কোনও ঋষি ঊষাকে সূর্য্যের ভগিনী কল্পনা করিয়াছেন। [২-১২-৭ ও ৫-৭৯-৮] কোনও ঋষি ঊষাকে সূর্য্যের কন্যা বলিয়াছেন [৪-৪৩-২]। কবিগণ নিরঙ্কুশ। Max Muller বলেন, "এইগুলি পুরাণ গঠনের যথেষ্ট উপাদান।"

ঊষার নিকট ঋষিগণের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

"হে দ্যৌঃ দেবতার দুহিতা ঊষা, তুমি সকলের আহ্লাদক হইয়া প্রকাশিত হও। তুমি তমোরাশি

(১) এই বঙ্গানুবাদ গুলি মৎকর্ত্তৃক মহাত্মা সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে কৃত। লেখক।

(১) ঋগ্বেদ ৩-৬২-১০।

বিনাশ কর এবং প্রতিদিন আমাদিগকে সৌভাগ্য প্রদান কর।" [১-৪৮-৯]

"হে ঊষা, তুমি আমাদিগকে প্রভূত বহুরূপ ধন ও গো প্রদান কর। আমরা যেন শত্রুহিংসা করিয়া যশোলাভ করিতে পারি। হে অন্নবতি, তুমি আমাদিগকে অন্নের সহিত সংযুক্ত কর।" [১-৪৮-১৬]

"হে শুভ্রবর্ণা ঊষা, তোমার আগমনে দ্বিপৎ ও চতুষ্পৎ প্রাণী সকল চেষ্টাবন্ত হইয়াছে এবং পতত্রিগণ আকাশপ্রান্তে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তুমি সকল ভূতজাত তোমার আলোক প্রকাশিত করিয়াছ; ধন কামনা করিয়া কণ্বগোত্রজাত (অথবা মেধাবী) ঋষিগণ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন।" [১-৪৯-৩ ও ৪]

ঋষিগণ প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে দৃঢ়মূল মহীরুহ উৎপাটিত ও সমুদ্র সলিলে (১) পোত সকল নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হৃদয়ে

বায়ু

দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বায়ুই ঈশ্বর [৭-৯০-৩]। বায়ু বিশ্ববরণীয় [৭-৯১-১]। ধনদাতা [৭-৯০-৩] ধনী লোকেরা এক মনে বায়ুর সেবা ও যজ্ঞ করিয়া থাকেন [৭-৯১-৩] ঋষিগণ বলিতেছেন, আমরা বায়ু স্তুতি প্রভাবে শত্রুনিসূদন করিয়া থাকি। [৭-৯২-৪] "বায়ু জগৎপ্রভু, আদিভব, দেবনিশ্বাস এবং জগতের অঙ্কুর বলিয়া স্তুত হইয়াছে, আমরা উহার স্বর শুনিতে পাই, কিন্তু উহাকে দেখিতে পাই না।" [১০ মণ্ডল ১৬৮ সূক্ত]

মহর্ষিগণ বায়ু সমীপে কি যাচ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে অবধান করুন।

"সর্ব্বগামী বায়ু দেবতা আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন।" [৭-৪০-৬]।

"হে বায়ু! তোমার শত সহস্র অশ্ব আছে, তাহাতে আরোহণ করিয়া এই যজ্ঞ-গৃহে আইস। আমাদিগকে গো, অশ্ব ও পুত্র প্রদান কর।" [৭-৯২-৩]।

দশ দিক পরিষ্কৃত। সহসা কোথা হইতে ঋষিবিজেয় দস্যুগণের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণ মেঘমণ্ডল আকাশ মধ্যে আসিয়া অযুত হস্তিশুণ্ডের ন্যায় মূষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই বিপুল জলবর্ষকালে মেঘের কোলে ললিত বিদ্যুল্লতার আবির্ভাব, বনস্পতিশিরে বজ্রপাত ও তাহার কঠোর ভীষণ নিনাদে ঋষিগণের "বিজ্ঞান" রহিত চমকিত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ ইহাদের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, তাঁহারা বজ্রায়ুধ

ইন্দ্র

দেবতার আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। যতদূর আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ অনুমান করা গিয়াছিল যে, বোধ হয়, সূর্য্যই ঋষিবৃন্দপূজিত দেবসমূহের রাজা হইবেন। কিন্তু মহর্ষিগণ ইন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ ইন্দ্র মেঘ, বজ্র ও বৃষ্টির অধিপতি দেব বলিয়া কল্পিত হন, পরে ইনি স্থাবর ও জঙ্গম বিশ্বের অধিপতি বলিয়া বরিত হইয়ছেন। ইন্দ্র সর্ব্বশক্তিমান্, মনুষ্যের অটল আশ্রয়ভূত ও সর্ব্ব জীবের রাজা। [ঋগ্বেদ ৪-১৭-২০] ঋষিগণ ইন্দ্রের নিকট অনেক মনের কথা নিবেদন করিয়াছেন।

"হে ইন্দ্র, যুদ্ধকালে যে সকল মর্ত্ত্য আমাদের বিনাশ করিতে সম্মুখে আইসে, তাহাদিগকে হত্যা কর। নিন্দাকারী লোকগণকে আমাদিগ হইতে দূরে নিক্ষেপ কর। আর আমাদিগকে ধন প্রদান কর।" [৭-২৫-২]

"সকল দেবতাই ইন্দ্রসৃষ্ট জগৎ তাঁহার নিয়মের সমাদর করিয়া থাকেন। যিনি পৃথিবী ও দ্যুলোক ধারণ করিয়াছেন, সেই শোভনকর্ম্মা ইন্দ্রই সূর্য্য ও উষাকে উৎপাদন করিয়াছেন।" [৩-৩২-৮]

(১) বৈদিক কালে সমুদ্র-যাত্রা প্রচলিত ছিল। [ঋগ্বেদ ৭ম ৮৮ সূ ৩ঋ]

"হে ইন্দ্র, আমরা যেন তোমার ন্যায় কর্ম্মশীল ও বলশালী হই। হে অশ্ববিশিষ্ট শূর, চিরদিন (তোমার আশ্রয়ে) আমাদিগকে স্থান দেও, আমাদিগকে হিংসা করিও না।" [৭-২৫-৪]

"হে হর্য্যশ্ব, তোমার গান করিয়া আমরা সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হই।" [৭-৩২-১৫]

"ইন্দ্রের কর্ণ সর্ব্বদা আমাদের যাচ্ঞা শ্রবণ করিয়া থাকে। ইন্দ্র আমাদিগকে শত সহস্র ধন দান করুন।" [৭-৩২-৫]

"হে ইন্দ্র, তুমি স্তোতৃগণের রক্ষক ও বর্দ্ধক হও।" [৮-১২-২৫]

"হে বৃত্রহন্ অর্থাৎ মেঘঘাতক ইন্দ্র, তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেহ নাই, জ্যায়ান্ কেহ নাই। এমন কি, তোমার সদৃশও কেহ নাই।" [৪-৩০-১]

এইবার আমরা যে বৈদিক দেবতা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। স্থান বিশেষে সমুদ্রাধিপতি বলিয়া কথিত হইলেও,

বরুণ

কি স্বর্গ, কি পৃথিবী সকলের প্রভু। (ঋগ্বেদ ১-২৫-২০) বরুণ মনুষ্য ও দেবতা সকলেরই রাজা (২-২৭-১০)। ইনি জগতের সকল নিয়মের ধারণকর্ত্তা, এজন্য ইঁহার নাম ধৃতব্রত (১-২৮-৮)। মহর্ষিগণ বরুণকে বহু মর্ম্মস্পৃক স্তোত্র উপহার দিয়াছেন।

"বরুণ দেবতা মিথ্যাবাদিগণকে হিংসা করেন।" (৭-৮৪-৪)

"হে বরুণ, আমার এমন কি ভয়ানক পাপ আছে, যে হেতু তোমার সখাভূত আমার হিংসা করিতেছ। হে তেজস্বিন্, হে দুর্দ্ধর্ষ, আমাকে সেই পাপ বলিয়া দেও। তাহা হইলে আমি নিস্পাপ হইয়া তোমাকে অবগত হইতে পারি।" (৭-৮৬-৬)

"বরুণের সৃষ্ট এ ভূলোক ও দ্যুলোক অতীব সুন্দর (৭-৮৭-৩)

'যে বরুণ পাপ ক্ষমা করিয়া স্তোতৃগণকে দয়া করেন, আমরা নিষ্পাপ হইয়া যেন সেই অদীনাত্মা বরুণের ব্রত (কর্ম্ম) সকল আনুপূর্ব্বিক অনুষ্ঠান করি, হে বরুণ দেব, তুমি আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" (৭-৮৭-৭)

"বরুণ রাজাদিগেরও রাজা। ইঁহা হইতে নদী সকল রূপ প্রাপ্ত হয়। ইঁহার বলকে কেহ বাধা দিতে পারে না।" (৭-৩৪-১১)

একটী বরুণদেবের গীতি শ্রবণ করুন।

মোষু বরুণ মৃণ্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমম্।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।১।
যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দতির্ন্ধ্মাতো অদ্রিবঃ।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।২।
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।৩।
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।৪।
যৎকিংচেদংবরুণ দৈব্যে জনে-
ঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি
অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মা যুযোপিম
মানস্তস্মাদেন সো দেবরীরিষঃ।৫।

এই গানটি ঋগ্বেদসংহিতার ৭ম মণ্ডল ৮৯ সূক্ত। ইহার বঙ্গানুবাদঃ—

হে বরুণ, হে রাজন্, আমি যেন তোমার মৃণ্ময়গৃহে বাস না করি, কিন্তু ত্বদীয় সুবর্ণ গৃহ প্রাপ্ত হই। হে মহাধন, আমাকে ধন ও সুখ দেও।১।

হে শস্ত্রধারিন্, যখন আমি বায়ুপূরিত চর্ম্মপাত্রের ন্যায় কম্পমান হইয়া তোমার সমীপবর্ত্তী হই, তখন, হে মহাধন, তুমি আমাকে ধন ও সুখ দেও।২।

হে ধনবান নির্ম্মল বরুণ, দীনতাবশতঃ তোমার অনুজ্ঞাত কর্ম্মের প্রতিকূল গমন করিয়াছি, হে মহাধন, তুমি আমাদিগকে ধন ও সুখ দান কর।৩।

জলরাশির মধ্যে থাকিয়াও, তোমার স্তোতা তৃষ্ণাতুর হইয়াছে। হে মহাধন, তুমি আমাদিগকে ধন ও সুখদান কর।৪।

হে বরুণ, মনুষ্য আমরা যে দৈব্য অভি

দ্রোহ আচরণ করিয়াছি ও অজ্ঞান বশতঃ তোমার ধর্ম্মে অবহেলা করিয়াছি, হে দেব, সেই পাপ জন্য আমাদিগকে হিংসা করিও না।৫।

ইঁহারাই বৈদিক সংহিতার প্রধান দেবতা। এতদ্ব্যতীত অশ্বিদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, প্রজাপতি, রুদ্র, বিশ্বকর্ম্মা, বসুগণ, সোম ও সরস্বতীনদী প্রভৃতি কতিপয় দেবস্তুতি সংহিতায় দৃষ্ট হয়। সর্ব্বদা না হউক, মধ্যে মধ্যে তাঁহারাও যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাইবেলের ন্যায় বেদেও অনেক অতি-প্রাকৃতিক ঘটনার (Miracle) বর্ণনা দেখা যায়। (১ম ১১৬ সূক্ত) তন্মধ্যে একটীর কথা শুনুন। কোনও সময়ে গৌতম ঋষি মরুভূমি মধ্যে অত্যন্ত পিপাসিত হইয়া অশ্বিনৌ দেবযুগল সমীপে জল প্রার্থনা করায়,তাঁহারা সেখানে একটি বিপরীতগঠন কূপ খনন করিয়া দিয়াছিলেন। বিপরীত-গঠন, কেননা তাহার জল পূর্ণ তলদেশ পৃথিবী পৃষ্ঠে আসিয়াছিল ও শূন্য ঊর্দ্ধদেশ নিম্নে গমন করিয়াছিল। [১-১১৬-১০]। তৃষাতুর ঋষির স্নানদানাদি সৌকর্য্যার্থ এই রূপ কূপ নির্ম্মাণ [উহার সায়ণ ভাষ্য] প্রথম পাঠকালে কূপের এতাদৃশী কল্পনা আমার নিকট প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিল।

আমি অনেক সময় ইয়ুরোপের বীর্য্য ও সমৃদ্ধি এবং নব্যভারতের দৌর্ব্বল্য ও দারিদ্র্যের বিষয় ভাবিয়া থাকি এবং এই মহৎ শোকোদ্দীপক পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখি যে,ইউরোপ ও ভারতের ধর্ম্ম-প্রকৃতিমূলক প্রভেদই এই পার্থক্য হেতু। পাশ্চাত্য জগতের পক্ষে ইহা নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, তাহার ধর্ম্মের মধ্যে পুনর্জ্জন্মবাদ প্রবেশ করে নাই। ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, অতি প্রাচীন ইহুদিগণের মধ্যে ইহজন্মের পুণ্য ও পাপ কার্য্যের ফলভোগার্থ জন্মান্তরে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল; বহু প্রবলতর কারণে ইহা লোপ পাইয়াছে এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রত্যয় সমগ্র ইউরোপ আবৃত করিয়াছে। খ্রীষ্টীয়ান্ মত এই—আমরা একবার মাত্র মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছি, পূর্ব্বে আমরা একেবারে ছিলাম না, ঈশ্বর আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৃষ্ট করিয়াছেন, মৃত্যুর পরে শেষ বিচার দিন (Last day of judgment) পর্য্যন্ত আমাদিগকে সুষুপ্ত অবস্থায় থাকিতে হইবে। পরে, সেই দিন ঈশ্বরের নিকট আমাদের বিচার হইবে, তাহাতে, যাঁহারা যীশু খ্রীষ্টকে মনুষ্য ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের একজাত তনয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহারা অনন্ত স্বর্গে ও তদিতর জনগণ অনন্ত নরকে বাস করিবে। বর্ত্তমান কালে ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টীয়ানগণ অনন্ত নরকের প্রতিকূলে ঘোরতর প্রতিবাদ আনয়ন করিয়াছেন। স্বাধীন চিন্তার যতই স্ফূর্ত্তি হইবে, ততই প্রাচীন ধর্ম্ম পরিশোধিত হইবে, আশা করা যায়। সে যাহা হউক, কেহ বিদ্বান্, কেহ মূর্খ, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত প্রভৃতি সংসার বৈচিত্র্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধগণ পুনর্জ্জন্মবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ানেরা এই সকল প্রভেদ প্রাক্-পরীক্ষা বিধি (probation-theory)র উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সংসার আমাদের পরীক্ষাস্থল, ঈশ্বর আমাদিগকে যে রূপ অবস্থায় ফেলিয়াছেন, সেই অবস্থোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সানন্দ-চিত্তে

সম্পাদন করাই আমাদের উচিত। ইহাতেই আমাদের পরত্র শুভ নিশ্চিত। উহারা জানে, এই পার্থিব জীবন আমাদিগকে একবার বৈ দুইবার দেওয়া হইবে না। নিদ্রা ও বিশ্রামের যথেষ্ট সময় সমাধির অভ্যন্তরে আছে। এখন আমাদিগকে এই কর্ম্মক্ষেত্রে অক্লান্ত হৃদয়ে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে হইবে। এই সকল ধারণা বশতঃ ইউরোপীয়েরা যেমন উৎসাহময় কর্ম্মের উপাসক, হিন্দু ও বৌদ্ধগণ তেমন নহে। যে পুনর্জন্ম যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধগণের প্রত্যেক সাধনা, তাহারা সেই পুনর্জ্জন্মবাদে প্রত্যয় না করিয়া অনেকটা অবোধ্য অনাবশ্যক যাতনা হইতে মুক্তি পাইয়াছে। আমাদের প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণেরও ধারণায় কোনও প্রকার পুনর্জন্মভীতি ছিল না। সংসার হইতে মুক্তিলাভ করা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য,ইহা কখনই তাঁহাদের মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। গর্ভযন্ত্রণা পরিহার, পুনর্জন্ম নিবৃত্তি, এ সকল কথা তাঁহারা জানিতেন না; এজন্য তাঁহারা প্রভূত উৎসাহ ও কর্ম্মময়, আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল ও ঐহিক সুখভোগরত এবং স্পার্টান প্রভৃতি প্রাচীন জাতির ন্যায় বীরত্বের উপাসক ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুগণ তাঁহাদেরই সন্তানগণ জীবনভার ক্লান্ত হইয়া যেন এই বলিয়া রোদন করিতেছে "তারা, কোন্ অপরাধে, এ সংসার গারদে" আমাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়াছ? আমরা জীবন চাহি না, আমাদিগকে মুক্তি দেও। (১) যদিও ভক্তিমার্গানুসারী দ্বৈতবাদিগণ মুক্তি প্রার্থনা করেন না, তথাপি ভক্তির অনুকূল হইবে বলিয়া জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন। তাঁহারা সংসারের প্রতি বীততৃষ্ণ। সর্প ও ব্যাঘ্র অপেক্ষাও সংসার ও স্ত্রীজাতিকে ভয় করেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ইঁহারাও জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ধারণা হইতে বহুদূরে আনীত হইয়াছেন। "পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরঃ হরিঃ॥" ইহাই বর্ত্তমান হিন্দুপ্রার্থনা। এই পাপ-সম্ভব-বোধ সকল হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এই হেতু, তুমি তাহাদিগকে পুনর্জন্ম বিনাশের অর্থাৎ মুক্তির জন্য যে উপায় প্রদর্শন করিয়া দেওনা কেন, তাঁহারা প্রাণপণে তাহার অনুসরণে যত্ন করিবে। যদি তুমি তাহাকে বল যে, মধু পান করিয়া,অনাঘ্রাত-পূর্ব্বা সুন্দরীর রস সম্ভোগানন্তর লোলজিহ্বা কালিকা ঠাকুরাণী সমীপে তাহাকে বলি দিলে (তন্ত্র শাস্ত্রের মত) তোমাকে আর জননী জঠরের জ্বালায় জ্বলিতে হইবে না, ইতিহাস অনুসন্ধান কর, তুমি দেখিতে পাইবে যে, সে ইহাতেও পশ্চাৎপদ নহে। হিন্দু অতি সরল বিশ্বাসী বলিয়াই ঈদৃশ বীভৎস ও নিকৃষ্ট পাপকর্ম্মে ধর্ম্ম জ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়। এখন তুমি ইহার Dark side গ্রহণ করিও না। ইহার উৎকৃষ্ট অংশ তুমি সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করিলে, তুমি ইহাতে সাধ-

(১) "নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা॥"

মৃত্যু কামনা করা উচিত নহে. বাঁচিবারও ইচ্ছা করা উচিত নহে। বেতনভুক্ ভৃত্য যেমন ভৃতির অপেক্ষায় থাকে, সেইরূপ নিয়মিত সময়ের অপেক্ষায় থাকিবে। [মনুসংহিতা, ৬ অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক]

মহর্ষি মনুর এই অমূল্য অনুশাসন হিন্দুসাধারণের মনে স্থান পায় নাই।

কের আত্মা সম্বন্ধীয় মঙ্গলের শুভ্র জ্যোতিঃ বই কোনও পাপ উদ্দেশ্যের কৃষ্ণরেখা দেখিতে পাইবে না। তুমি দেখিবে যে, ইহার উদ্দেশ্য সাধু ও স্বাভাবিক হইলেও, সাধকের ভ্রম ও কুশিক্ষা বশতঃ তদবলম্বিত উপায় অতীব জঘন্য ও হেয় হইয়া পড়িয়াছে।

এই অধোনীত ধর্ম্মের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, বৈদিক মহর্ষিগণের অনুগমন ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। আমার এ কথা শুনিয়া কেহ যেন বোধ না করেন যে, আমি পুনরায় ইন্দ্রাদি প্রাকৃতিক দেবতাবৃন্দ পূজার পুনরুত্থান আকাঙ্ক্ষা করি। পুনরায় "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ হোতারম্ রত্নধাতমম" ইত্যাদি অগ্নিসঙ্গীতে মনঃসংযম করিতে বলি, অথবা "ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ ইত্যাদি আপোদেবীগীতি ত্রিসন্ধ্যা কণ্ঠভূষা করিতে উপদেশ দেই। আমি চাই, এই সুন্দর সুখদুঃখ মিশ্রিত মনুষ্যজীবনকে, বৈদিক মহর্ষিগণ যে ভাবে অবলোকন করিতেন, আমরাও যেন সেইরূপ শিক্ষা পাই। আমরা জীবনকে দুর্ব্বহভার বোধ ও ভয় না করিয়া, সেই এক বিশ্বধুরন্ধরের প্রসাদে, সমীরণ যেমন সহজে চতুর্দ্দিকে পুষ্পগন্ধ বহন করে, সেইরূপ ইহাকে সহজ-বাহ্য করিয়া তুলি। সেই মহর্ষিগণ কখনই তাঁহাদের জীবনকে North worth living মনে করেন নাই। অনার্য্য দাসগণের সহিত সমরে, বহু সময়, তাঁহাদের বাহু শ্রান্ত ও ক্লিষ্ট হইয়াছিল। সেই নবাগত ভারত অতিথিগণকে বহু মানসিক জ্বালায় দগ্ধ হইতে হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাদের সমগ্র ইতিহাসে আত্মহত্যা কামনার বিন্দু বিসর্গও দেখা যায় না। সেই বিপুল-বীর্য্য ঋষিগণের কি অনন্ত ধৈর্য্য। আমি তাঁহাদের ন্যায় pastoral অথবা nomadic জীবন যাপন করিতে বলি না, কিন্তু প্রভূত প্রাণনী শক্তি যুক্ত, হরিণ শিশুবৎ উৎফুল্ল, মত্ত মাতঙ্গবৎ মহাবীর, মহর্ষিগণ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়াছিলেন, আমরাও তাঁহাকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া চলিতে চাই।

আমরা (তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
আর কভু হবনাক এসংসারে পথহারা)।

মহর্ষিগণের জীবনের সহিত এ সঙ্গীত-সংযোগ বিচ্ছিন্ন দেখিতে চাহি না। আমাদের বালকগণ তৎকালীন ঋষিতনয়গণের ন্যায় কুশসমিধ আহরণে জীবনের বহুমূল্য প্রভাত ব্যয়িত করুক, ইহা আমরা দেখিতে চাই না, কিন্তু তাহাদের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু ও আচার্য্যপরায়ণ দেখিতে চাই। আমরা বৈদিক কালের ন্যায় গো অশ্ব ছাগ মহিষাদি নির্ব্বাক্ পশুর সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হত্যা শোণিতে বেদিস্থান পূর্ণ দেখিতে চাহি না কিন্তু আর্য্য ঋষির মহান্ কলঙ্ক, ভারতের সে দুর্যশঃ প্রথার শেষ স্মৃতিচিহ্ন বলিপ্রথাকে একেবারে উৎসাদিত দেখিতে চাই।

যখন গৌরব-রবি ভারতের মধ্যাহ্ন আকাশে বিরাজিত, তখন একবার আমার এই কল্পনা কার্য্যপ্রসব করিয়াছিল। পূর্ব্বতন বৈদিক ঋষিগণের সরল প্রাণের মধুবর্ষী গান সকল ব্রাহ্মণ ও আরণ্যককালে, যাদৃশ বিশ্বাসের সহিত অনেকধানিষ্পাদিত যজ্ঞপটলে ব্যবহৃত হইত, তাহা নিশ্চয়ই অজ্ঞেয়তা ও সংশয়বাদ হইতে গরিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যখন যজ্ঞ সকল প্রাণহীন দেশাচারে পরিণত হইল এবং বাহাড়ম্বরের বাহুল্য ধর্ম্মের উন্নতিমুখীন গতি প্রতিরোধ করিতে

প্রয়াস পাইল, তখনই কতিপয় স্বাধীন চেতাঃ মহর্ষি সত্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। এস্থলেও "Ask and it shall be given" এই মন্ত্র—যাহা সংহিতাযুগের প্রাণ ছিল, তাহাই এখানে কার্য্যকর হইল। এক্ষণে তাঁহারা এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিলেন, যাঁহার মুখ চাহিয়া তাঁহারা অকুতোভয়ে তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন :—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"
[কঠোপনিষৎ, ২য় অধ্যায়, ষষ্ঠবল্লী, ৩ শ্রুতি।]

"ইহারই ভয়ে অগ্নি উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, ইহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছেন, ইহারই ভয়ে ইন্দ্র বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, ইহারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন এবং পঞ্চম যে মৃত্যু, তিনিও ইহার ভয়ে ধাবিত হইতেছেন।"

যে সময়ে সমুদয় দেশ অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র ও বায়ু প্রভৃতি দেবগণ উদ্দেশে যজ্ঞাবলী পরিপূরিত ও সমুদয় দিক্ ইহাদেরই স্তুতিগীতি মুখরিত, সেই সময়ে, ভাব দেখি, এই ভয়ানক কথার অভ্যন্তরে কত শাক্য সিংহ ও আচার্য্য শঙ্কর, কত মার্টিন লুথর ও রামমোহন, কত জেম্‌স্ মার্টিনো ও নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট লুক্কায়িত রহিয়াছে। যে দিন মহর্ষিবৃন্দ বহুদেববাদের মধ্যদিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং মানবহিতার্থ প্রথম উপনিষৎ রচনায় উপবেশন করিয়াছিলেন, সে দিন কেমন মহান্ পবিত্র ও সুন্দর! সেই দিনই, ভারতীয় সমাজে আভ্যন্তরিক প্রলয় হইয়া যথার্থতঃ সত্যযুগের আরম্ভ হইয়াছিল। সেই দিন সূর্য্য কি অধিকতর উজ্জ্বল হন নাই এবং চন্দ্র আরও অধিক করিয়া তাঁহার সুধা বর্ষণ করেন নাই? সেই নবযুগের প্রথম বাসরে সমুদয় জগৎ কি আরও মধুরতর রূপে প্রকাশিত হয় নাই?

বৈদিক অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ সম্বন্ধে উপনিষদের একটি অভিমতি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই সঙ্গে তলবকার উপনিষদের দেবাখ্যায়িকা পাঠ করুন। তাহা হইলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবেন। উপনিষৎ হস্তামলকবৎ ব্রহ্ম লাভ করিয়া একস্থলে বলিতেছেন :—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥
[মুণ্ডকোপনিষৎ, ২-২-১০]

"সূর্য্য সেই ব্রহ্মের প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না; চন্দ্র, তারা ও এই সকল বিদ্যুৎও তাঁহার প্রকাশক নহে, সুতরাং এই (সামান্য, ক্ষুদ্র) অগ্নি কি প্রকারে তাঁহার প্রকাশক হইবেন? পক্ষান্তরে, এই সকল সূর্য্যাদি স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্মের পশ্চাৎ প্রকাশিত। তাঁহারই প্রভায় ইহারা জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে।"

"পূর্ব্ব ও নূতন ঋষিগণের ঈড্য" [ঋগ্বেদ ১-১-২] অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণ সম্বন্ধে উপনিষৎ-রচয়িতা মহর্ষিগণ ইহা বলিলেন, তাঁহাদের আদরণীয় যজ্ঞ কর্ম্ম সম্বন্ধে কি কথিত হইয়াছে, দেখুন :—

"অষ্টাদশাঙ্গ যজ্ঞরূপ কর্ম্ম অদৃঢ় ও বিনাশী, যে সকল লোক ইহাকে শ্রেয়স্কর ভাবে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুগ্রস্ত হয়।৭।

"যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অন্ধ সকল গমন করিলে তাহারা অত্যন্ত ক্লেশ পায়, সেইরূপ যাহারা যজ্ঞকর্ম্মরত হইয়া চিন্তা করে যে 'আমরা জ্ঞানী ও পণ্ডিত' সেই মূঢ়েরা পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা মরণাদি দুঃখ প্রাপ্ত হয়।" ৮।

[ইহার সহিত যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ মিলন করুন, "যদি একজন অন্ধ অপর অন্ধের

পথপ্রদর্শক হয়, তাহারা দুইজনে কি গর্ত্তে পতিত হয় ন ?"]

(মুণ্ডকোপনিষৎ ১ম মুণ্ডক, ২য় খণ্ড)

উপনিষদে এইরূপ শ্রুতির অভাব নাই।

এক্ষণে উপ নিষদের উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে শুনুন।

"যোহয়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽ মৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।

তমেব বিদিত্বা মৃত্যুমেতি নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

[সাধারণ ব্রহ্মসমাজের "উপদেশ ও ব্যাখ্যা "ধৃত উপনিষদের বাক্য।]

"এই যে আত্মাতে তেজোময়, অমৃতময় সর্ব্বানুভূ পুরুষ রহিয়াছেন এবং এই যে আকাশে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বানুভূ পুরুষ রহিয়াছেন, ইহাঁকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়। আশ্রয়ের অন্য পন্থা নাই।"

নিম্নে উদ্ধৃত শ্রুতিতে এই ভাবই সুস্পষ্ট পরিত্যক্ত হইয়াছে।

"যিনি সূর্য্যে থাকিয়া, সূর্য্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া, সূর্য্যকে নিয়মিত করিতেছেন, সূর্য্য যাঁহাকে জানে না, সূর্য্য যাঁহার শরীর, তিনিই তোমার হৃদয় মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা।"

"যিনি চন্দ্রে থাকিয়া, চন্দ্রের অভ্যন্তরে থাকিয়া, চন্দ্রকে নিয়মিত করিতেছেন, চন্দ্র যাঁহাকে জানে না, চন্দ্র যাঁহার শরীর, তিনিই তোমার হৃদয়মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা।" * * * *

"যিনি আকাশে থাকিয়া,আকাশের মধ্যে থাকিয়া আকাশকে নিয়মিত করিতেছেন, আকাশ যাঁহাকে জানে না, আকাশ যাঁহার শরীর, তিনিই তোমার হৃদয় মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা।' (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

ইহা অপেক্ষা ঈশ্বরের সুস্পষ্টতর ও মহত্তর ধারণা এ পৃথিবীতে কোনও দেশের কোনও জাতির, কোনও ভাষার কোনও গ্রন্থে নাই।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" পরমাত্মাকে প্রিয় জ্ঞানে উপাসনা করিবে।

আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"

(মুণ্ডকোপনিষৎ ৩—১—৪)

ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি (বিষয়সুখে সুখী না হইয়) পরমাত্মায় ক্রীড়া ও সুখ-বোধ করেন, সর্ব্বদা পরোপকারাদি সৎকর্ম্মনিরত হন। ইনিই ব্রহ্মবিৎগণের শ্রেষ্ঠ।

বৈদিক কালে মহর্ষিগণকে কর্ম্মযোগে যোগী দেখিয়াছি, এই বার উপনিষৎ কালে তাহাতে জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ সম্মিলিত হইয়া, তাঁহাদের জীবন আমাদের পূর্ণ আদর্শ করিয়া তুলিয়াছে।

বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, মীমাংসা ও বৈশেষিক এই ষড়দর্শন ভারতের গৌরব। ইহাদের মূল উপনিষদে নিবদ্ধ। রামোপনিষৎ, শিবোপনিষৎ, আল্লোপনিষৎ প্রভৃতি জাতীয় ও বিজাতীয় অনুকরণগুলির কথা বলিতেছি না। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য যে গুলির ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহারাই প্রকৃত আদি উপনিষৎ, তাহাদের নাম, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডক, মাণ্ডক্য, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক। এই সকল উপনিষদে, আমাদের পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ,ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্ম সম্ভোগের সুন্দর সরল বিবৃতি আছে। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, জগৎ কি,ইহার স্রষ্টাই বা কিরূপ, আমার সহিত উভয়ের কি সম্বন্ধ? এই সকল অতীব প্রয়োজনীয় দার্শনিক নিগূঢ় বিষয়গুলি উপনিষদে অতি সহজ ভাষায় বর্ণিত আছে। এই সকল উপনিষৎ আধ্যাত্মিক ভারতের চরমানুভূতি সত্য, বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সকল হইতে

বিচ্ছিন্ন করিয়া অসংলগ্ন ভাবে এই উপনিষৎ সকল পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাতে এমন সকল বিষয় পরিদৃষ্ট হইবে, যাহার কোনও অর্থ বা উদ্দেশ্য নির্ণয় করা সম্পূর্ণ সম্ভাবনাতীত। কিন্তু আমরা যদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মচিন্তার মূলসূত্র ধরিয়া একটী গ্রন্থির পর অপর গ্রন্থি অতিক্রম করিয়া উপনিষদে উপনীত হই, তাহা হইলে উপনিষদ্-বিবৃত অর্থ পরিগ্রহ করিতে আর কোনও ক্লেশ পাইতে হয় না। তখন এই পবিত্র ও মহান্ গ্রন্থাবলীর উদ্দেশ্য সুনির্ম্মল আকাশের ন্যায় পরিস্ফুত হইয়া উঠে। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞানের দাত্র-কুম্মাণ্ড সম্বন্ধের আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। শ্রীমদ্ভবদ্গীতাতে যাহা উপনিষৎ ও স্মৃতি উভয় নামে অভিহিত হয়, তাহাতে সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের প্রশংসনীয় চেষ্টা করা হইয়াছে। আধুনা এ চেষ্টা অনেকটা ফলবতী দেখিতে পাইয়াছি। "যজ্ঞৈর্দেবান্ ভাবয়ধ্বম্" এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই উভয়ই গীতাতে লিখিত। টোলের পণ্ডিতগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ শাস্ত্র কল্পনা করিয়া বৈদিক কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান দুইই বজায় রাখিতে চান। আমার মতে এই সকল মহাসুধীগণ দেশাচার ও সত্য, দুই নৌকায় পদস্থাপনা করিয়া আপনার মৃত্যু আপনারাই শীঘ্র আনয়ন করিতেছেন। যাহা সত্য, তাহা চিরকাল্ থাকিবে, যাহা অসত্য তাহা ক্ষণস্থায়ী। অসত্যকে লৌহস্তম্ভ দ্বারা উত্তোলিত করিয়া রাখিলেও, তাহা, এক দিন না একদিন, পৃথিবীতে পতিত, চূর্ণিত ও ধূলিসাৎ হইবে। এবং সত্যকে আজ পদ-দলিত করিয়া রাখিলেও, কোনও সময়ে না কোনও সময়ে, শির উত্তোলন করিবে। বর্ত্তমান সময় ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আমি মনশ্চক্ষে দেখিতেছি, উপনিষৎ ভারতের অপহৃত গৌরব প্রত্যানয়ন করিবার উপক্রম করিতেছে। উপনিষদের মধ্য দিয়া ভারত পুনরায় মহীয়ান্ হইবে। কে জানে কবেকার কথা, আমরা উপনিষৎ পাঠ করিয়া দেখিতে পাই যে, এক সময়ে ভারতে ব্রহ্মবাদ আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহার পর কত বিপ্লবের মহান্ তরঙ্গ ভারতবক্ষে বহিয়া গিয়াছে, এখন সেই অতিপ্রাচীন, বিস্মৃত বা অনাদৃত সত্য নূতন বেশে ও নূতন জ্যোতিতে অগ্রসর হইতেছে। বেদান্তজননী প্রাচ্য উপনিষৎ বাণী আজ প্রতীচ্য ধর্ম্মদর্শন মতের সহিত সম্মিলিত হইয়া অযুত হস্তীর বল ধারণ করিয়াছে। আজ, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, কঠ, মণ্ডুক প্রভৃতি মহর্ষিগণ, হিগেল, স্কোপেনহৌর, কার্লাইল, ইমার্সন, প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ করিতে করিতে আমাদের নিকট অগ্রসর হইতেছেন। এই অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মচিন্তা ও কার্য্যপ্রবাহকে বাধা দিও না। যদি বুদ্ধিমান হও, ইহাঁতে যোগদান কর, নতুবা সরিয়া দাঁড়াও। এ চিন্তা-স্রোতাস্বিনীকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলে, পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর প্রতিকূলে সুরগজ ঐরাবতের যে দশা ঘটিয়াছিল, সেই দশা ঘটিবে।

উপনিষদুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান উন্মুক্ত বায়ুর ন্যায় লোক-সমাজে পরিগৃহীত হয় নাই। উপনিষদের মধ্যে ঈশ্বরের সত্য স্বরূপের সুবিমল ভাব হৃদয়ে ধারণার্থ সংসারকে অনিত্য ও অনৃত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। "ন দানেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমাণশুঃ" না দানের দ্বারা, না সন্তানের দ্বারা, না কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ হয়,

কেবল ত্যাগের দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। [বাইবেলের সহিত তুলনা কর, যীশুখ্রীষ্ট বাক্য, মথি, ১৯, ১৬-২৩] উপনিষদের এই বৈরাগ্য-কুঠার বৈদিক সংহিতার ইহলোক সর্ব্বস্বতার মূলে আঘাত করিল। 'যামিমাং পুষ্পিতাং' প্রভৃতি গীতার শ্লোকে, শ্রীকৃষ্ণ, বেদের প্রতি যথেষ্ট কটাক্ষপাত করিয়াছেন। এই কারণে উপনিষৎ হিন্দুগণের শেষ শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইল না। আশ্বালায়ন, লাট্যায়ন, কাত্যায়ন, দ্রাহ্যায়ন ও গোভিলীয় গৃহ্য ও কল্পসূত্রের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া, মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, বশিষ্ঠ ও শাতাতপ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সাধারণের শুভ-উদ্দেশেই সুললিত সহজ-বোধ্য "স্মৃতি"শাস্ত্র সকল রচনা করিয়াছেন। তার পর, ব্যাস নামধারী ব্যক্তিগণ বেদ, উপনিষৎ ও স্মৃতির ভাবকেই অতিরঞ্জিত, অপরঞ্জিত, পরিবর্ত্তিত ও নানাবিধ লোকরঞ্জন রসযুক্ত করিয়া "পুরাণ" ও উপপুরাণ গুলি প্রণয়ণ করিয়াছেন। এই পৌরাণিক যুগেই শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়গুলির উদ্ভব। এই সময়েই, বৌদ্ধগণের অনুকরণে, দেবদেবীর মৃদাদিগঠিত মূর্ত্তিপূজা হিন্দুশাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিল। পুরাণ ও উপপুরাণ শাস্ত্র গুলি, হিন্দু-দেব-দেবী সমূহের এক একটীকে অবলম্বন করিয়া লিখিত। এই সকল শাস্ত্রে সাম্প্রদায়িক অন্যান্য বিদ্বেষ ও বিবাদের যথেষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার, স্থানবিশেষে বিভিন্ন মত সকলের এক তা-সংস্থাপনের চেষ্টাও দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নামে পরিচিত। আমি মহাভারতকে পুরাণ বলিয়া বিবেচনা করি এবং বাল্মীকীয় রামায়ণকে কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ মনে না করিয়া সংস্কৃত ভাষার একখানি সুন্দর মহাকাব্য বলিয়া মনে করি। শৈব ও বৈষ্ণবগণের মতৈক্য সংসাধনের জন্য কোনও কবি এমন একটী মূর্ত্তি পূজার আবিষ্কার করিলেন যে, তাঁহার অর্দ্ধাংশ শিব ও অপরার্দ্ধ বিষ্ণু। পুনশ্চ একজন সুরসিক কবি জগতের জনক ও জননী হর ও গৌরীর এক দেহ কল্পিত করিয়া ইঁহাদের ভক্তগণের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছেন। ইঁহারা বৈদিক অগ্নিসোমৌ, মিত্রাবরুণৌ, ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দ্বিদেবগণের অনুকরণে সৃষ্ট। পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক নিতান্ত অতিস্বাভাবিক হরহরি ও হরগৌরীর একদেহে মিলন কল্পনা হইতে একটী শুভ্রোজ্জ্বলাংশুরেখা নির্গত হইতেছে। অধুনা ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ যে সমগ্র-পৃথিবী-ব্যাপিনী একতার জন্য মহতী বেদনা অনুভব করিতেছে, তাহারই অঙ্কুর ইহাতে লক্ষিত হয়। এক সময়ে সমগ্র ভারতকে কেবল শাক্ত ধর্ম্মাক্রান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। গৃহীত উপায়টী এই:— দক্ষালয়ে শিবনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে, বিষ্ণু তদীয় সুদর্শন চক্রে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে নিক্ষেপ করেন। (১) এই সকল স্থান শক্তি দেবীর পীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক্ষণে অধিষ্ঠিত-পীঠ নগর গুলি তীর্থ রূপে পরিগণিত। সমগ্র ভারতকে শাক্ত ধর্ম্মরূপ ঐক্য বন্ধনে বদ্ধ ও অনুপ্রাণিত রাখাই এই কল্পনার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবতারগুলিও ভারতবর্ষকে বৈষ্ণব

(১) "সুদর্শন চক্রের প্রভাব অলৌকিক হইলেও, উমাদেবীর কোনও অঙ্গ আমেরিকা, ইংলণ্ড, রুশিয়া, চীন বা আফগানিস্থানে পতিত হয় নাই!" লেখক।

ধর্ম্মে একত্ব স্থাপানেরও প্রচুর সহায়তা করিয়াছে।

বৈদিককালে মুক্তি সম্বন্ধে ধারণা মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ। ইহা কোনও প্রকার দার্শনিক জটিলতায় দুরবগাহ নহে। বৈদিক মহর্ষিগণ কতকগুলি কর্ম্ম তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও কতকগুলি কর্ম্ম তাঁহাদের অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই সকল কর্ত্তব্যের অননুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানকে তাঁহারা পাপ বিবেচনা করিতেন। পাপ বশতঃ দেবগণের রোষভাজন হইতে হয়। [৭ম ৮৬-৪] পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, তাঁহারা দেবগণের সমীপে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেন। [৭ম ১০৪, ২৩ ও ৭ম ৮৬, ৩ ইত্যাদি]। পৌরাণিকগণ এই মুক্তিকে তাঁহাদের সামীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য প্রভৃতিতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। উপনিষদ্‌কারগণের মতে মায়া হইতে মোচনের নাম মুক্তি। আমি এই "মায়া" শব্দের ইতিহাসের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহিতেছি। কেননা, হিন্দুধর্ম্ম অধ্যেতৃগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত আবশ্যক। ঋগ্বেদসংহিতায় মায়া শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা ও শক্তি [৪-৩০-১২ ও ২১ ঋক্ সায়ন-ভাষ্য]। বেদান্ত বা উপনিষৎ মতে রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় জীবের অবিদ্যাবশাৎ ব্রহ্মে জগৎ ভান হইতেছে। বস্তুতঃ জগতের অস্তিত্ব নাই। অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া প্রভাবে আমরা প্রতারিত হইতেছি। [ছান্দোগ্য উপনিষৎ দেখ] পক্ষান্তরে বৈদিককালে জগতের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। [৪-৩০-৩] সমগ্র বেদ সংহিতা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে দেবগণ জগতের সৃষ্টি ও রক্ষা কর্ত্তা, অন্ন ও আয়ুদাতা রূপে বর্ণিত। কুত্রাপি তাঁহাদিগকে বিশ্বনাশক বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যখন মৃত্যু ও প্রলয়ের কথা মহর্ষিগণের মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল, তখন তাঁহাদের মধ্যে বৈরাগ্যবাদ আসিল এবং সংসারের অনিত্যতা বোধ তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ বৈদান্তিক মায়াবাদে উপনীত করিল।

এইরূপে বৈদিক বশিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ ও বর্ষিষ্ঠ মহর্ষিগণের আশাময়, উৎসাহময়, সারল্যময় পবিত্র স্বর্গীয় জীবন-সঙ্গীত আধুনিক হিন্দুত্বের মর্ম্মভেদী দুঃখসঙ্কুল রোদনের গানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এইরূপে বৈদিক সংহিতা যুগের

"মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ॥
মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ॥

এই মধুময় সংসারচ্ছবি হিন্দুর চক্ষে জ্বলন্ত অনল রাশি, ঘৃণ্য ভস্মস্তূপ ও পরিশেষে অস্তিত্বহীন মহাশূন্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

বৈদিক দেবগণ পৌরাণিকযুগে কীদৃশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, তাহা দেখুন।

বৈদিক কালের বিষ্ণু সূর্য্যেরই নামান্তর। পৌরাণিক কালে ইনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী ত্রিবিক্রম। [ঋ ৭-১০০-৩ ও ৪]। বৈদিক রুদ্র পৌরাণিক শিবঠাকুর। সর্ব্বঋষি পূজিত সর্ব্বজ্ঞ বরুণ রাজা পৌরাণিক যুগে সমুদ্রাধিপতি পাশাস্ত্রধারী সামান্য দেবমাত্র। এই সকল আলোচনা করিয়াও, তুমি কি বলিবে যে, হিন্দুধর্ম্ম, খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর সময়ে যাহা ছিল, এখনও সেইরূপ আছে?

বৈদিক ঋষিগণ ইন্দ্রকে এই জন্য স্তব করিতেছেন যে,তিনি বজ্র দ্বারা বৃত্র (মেঘ—সায়ন-ভাষ্য) কে বিচ্ছিন্ন করিয়া নদী সমূহকে জল প্রদান করিতেছেন। [১ম ৩২ সূ]। ইহার উপর, কল্পনাপ্রিয় পৌরাণিকগণ বৃত্রাসুরবধ উপাখ্যান রচনা করিলেন। বৈদিক নক্ষত্র চক্ষুঃ ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিয়া অহল্যা [যে ভূমি এত কঠিন যে, তদুপরি হল কর্ষণ নিতান্ত অসাধ্য] কে হল্যা (হলচালন যোগ্যা) করিয়া তুলিয়াছিলেন। পৌরাণিকেরা ইহার উপর এক কুৎসিৎ উপন্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। বৈদিক ইন্দ্র ব্রাহ্মণগণের উপাস্য, পৌরাণিক ইন্দ্র সময়ে সময়ে ব্রহ্মকোপানলে দহ্যমান। বৈদিক ইন্দ্র বীরের আদর্শ, অসুর বিজয়ী, অসামান্য প্রভাব, স্তোতার বরদাতা ইত্যাদি [৩ মং ৪৭ সূক্ত] আর পৌরাণিক ইন্দ্র (১) অসুর ভয়ে সদাভীত,বন হইতে বনান্তরে গুপ্তবেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, কুটিলচিত্ততা ও ছদ্মবেশ তাঁহার নিত্য সহচর,কোনও পার্থিব নবনবতি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেই, তাঁহার প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়ে আর কি ? তখন তিনি ন্যায়ান্যায় বোধশক্তি রহিত হন। সৎবা অসৎ যে কোনও উপায়ে স্বকার্য্য সিদ্ধি করিতে হইবে, এ বিষয়ে তিনি মোগল ভূপতি আরংজীবকেও পরাজিত করিয়াছেন। বৈদিক দেবতাগণকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকখানি পুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে, যথা, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ,সূর্য্য পুরাণ, ইত্যাদি। কিন্তু "ইন্দ্র পুরাণ" রচিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ ও পারিজাত হরণ প্রভৃতিতে ইন্দ্রের যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিয়াছেন। রাবণের এক পুত্রের নাম ইন্দ্রজিৎ। আত্মত্যাগের মহান্ আদর্শ মহর্ষি দধীচির অস্থিতে ইন্দ্র বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া বৃত্রাসুর বধ করেন। কিন্তু দধীচি মুনির আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে, বেদসংহিতায় ইন্দ্রকে বজ্রায়ুধ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কল্পনার মোহময়ী মদিরায়, পুরাণ-রচয়িতা ঋষিগণ ইহা লক্ষ্য করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। বৈদিক সংহিতাতে ইন্দ্রকে "শচীপতি" শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরাণ গৃহীত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যাস্ক, সায়ন প্রভৃতি বেদ-ব্যাখ্যাতা আচার্য্যগণ শচীপতি শব্দের অর্থে শচী অর্থাৎ কর্ম্ম সকলের পতি অর্থাৎ পালক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইন্দ্র অধ্যক্ষ থাকাতেই, বৈদিক যজ্ঞ প্রভৃতি আর্য কর্ম্ম সকল নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইত। কর্ম্ম অর্থে শচী শব্দ বেদের সর্ব্বত্র প্রযুক্ত। পুরাণ-বর্ণিতা শচী পরমা সুন্দরী চিরযৌবনা, হাবভাব-কেলিনিপুণা, ভরতমুনি-পরিচালিত গন্ধর্ব্ব-অপ্সরঃ সম্পাদিত রঙ্গমঞ্চের রসভঙ্গ উদ্ঘাটনের পারদৃশ্বরী। এ হেন শচী যাঁহার বাম-পার্শ্বশোভিনী,সেই ইন্দ্রও মধ্যে মধ্যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অবলা সরলা ঋষি বালাদের সর্ব্বনাশে সমুদ্যত ! বৈদিক ইন্দ্রের উপাসনা তো বহুদিন হইল লোপ পাইয়াছে। হিন্দুর পূজাগৃহেও পৌরাণিক ইন্দ্রের দর্শন পাইবে না। তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বহুদিন ধরিয়া শেষোক্ত ইন্দ্রের ধ্যান করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের সুকৃত ফলে নব্য বঙ্গ জীবনে এই ইন্দ্র আদর্শের সামান্য অশেষ লক্ষিত হয়, নতুবা হে বঙ্গীয় যুবক ! তুমি এই যামিনীতে তোমার শচীকল্পা তরুণীকে অরুন্তুদ বিরহবাণে বিদ্ধ করিয়া পরের দ্বারে মধু অনুসন্ধান করিতেছ কেন ?

যাহা হউক, "শচী" শব্দের মূর্ত্তি পরিগ্রহের ন্যায়, হবিঃ প্রক্ষেপক "স্বাহা" মন্ত্রটীও পৌরাণিক কালে নয়নগ্রাহ্যা সুন্দরী যুবতী সাজিয়া অগ্নি গৃহিণী হইয়াছেন। তুমি তথাপি, কি বলিবে যে, হিন্দুধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন ?

মহর্ষিগণ পুরাণ ও উপপুরাণ রচনা করিয়াও সুস্থির থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা এখন এমন একটী বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন, যাহাতে ভারতীয় ধর্ম্ম একেবারে নূতন আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্র রচনা ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। যুগভেদে ধর্ম্মভেদ স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে। এ জন্য তন্ত্রসৃষ্টি অত্যন্ত সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিল। তন্ত্র প্রণেতা বলেন, বেদ সত্যযুগের জন্য, কলিকালে আগম ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তন্ত্রের অপর নাম আগম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহানুভূতি প্রাপ্তি আশায়, জনৈক কবি আগম শব্দের এই অর্থ করেন।

'আ'গতং শিববক্ত্রেভ্যো 'গ'তঞ্চ গিরিজাশ্রুতৌ
'ম'তঞ্চ বাসুদেবস্য 'তস্মদাগমঃ উচ্যতে ॥

শিব স্বয়ং তন্ত্রবক্তা, গিরিজা শ্রোত্রী ও বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণ তন্ত্রের অনুমোদক। বেদ হইতে উপপুরাণ পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রই, তন্ত্ররচয়িতৃগণের জ্ঞাত ছিল। তাঁহারা প্রাক্-কালীন শাস্ত্র সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ও নূতন অনেক রচনা করিয়া, ফরাসী বিপ্লবের ন্যায়, ভারতীয় ধর্ম্মজগতে মহান্ বিপ্লব সংঘটন করিতে সমুদ্যত হইলেন। পৌরাণিক কালেই পতঞ্জলির যোগদর্শন ভারতের উপর খুব প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধির প্রলোভন রূপজ মোহের ন্যায় জন-সাধারণকে আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছিল। তন্ত্র শাস্ত্র এ সুযোগ অবহেলা করিবার পাত্র নহেন। তিনি এই যোগমার্গকে আরও অন্ধকারময় দূরতম প্রদেশে প্রসারণ করিলেন। ষট্ চক্র ভেদ ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অথর্ব্ববেদ বহুকাল পরে 'ত্রয়ী' তে সংযোজিত হইয়াছিল। এই অথর্ব্ববেদ অভিচার, বশীকার, ইন্দ্রজাল, প্রভৃতি বিষয়ক বহুবিধ মন্ত্রের ভাণ্ডার। তন্ত্র শাস্ত্র এই ভাণ্ডার আত্মসাৎ করিলেন। অতেক তান্ত্রিক দেব-দেবী আছে, ইহাদের কল্পনা নিতান্ত কষ্টসাধ্য। এই সকল দেব দেবীর বীজ ও শাখা মন্ত্রে তন্ত্র শাস্ত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তন্ত্র বৈদিক মন্ত্রের ন্যায় সুগুপ্ত শাস্ত্র। তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ না করিলে, ইহার প্রকৃত মর্ম্মস্থলে প্রবেশ নিতান্ত দুঃসাধ্য। এই জন্য ইহার সকল রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিলাম না। তন্ত্র শাস্ত্রও বামাচার, বীরাচার, কুলাচার, পশ্বাচার, কাপালিকতা প্রভৃতি নানা শাখায় বিভক্ত। তন্ত্র শাস্ত্র নিতান্ত আধুনিক। (১)

(১) কখনও তিলোত্তমা, উর্ব্বশী, রম্ভা, চিত্রলেখা প্রভৃতি সুরসুন্দরীর সহিত মন্দাকিনী-শীকরসিক্ত চির-বসন্ত-অনিল-আধুনিত-পারিজাত-সেবিত নন্দন-কাননে মদন বিলাসে অভিভূত কখনও অসুর ইত্যাদি।

(১) গত এপ্রিল মাসের একখণ্ড Bi-weekly Bengalee তে দেখিলাম যে, সম্প্রতি নেপাল হইতে "কুবলয় তন্ত্র' নামে একখানি তন্ত্রের পাণ্ডুলিপি এসিয়াটিক সোসায়েটিতে আনীত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপি অতি প্রাচীন; "খ্রীঃ পূঃ ছয়শত বৎসর ইহার কাল।" উক্ত বেঙ্গলির সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, "এই আবিষ্কার তন্ত্রশাস্ত্রের আধুনিকত্বের প্রবল বিরোধী।"

এক্ষণে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ইহার মীমাংসা করুন।

"শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা।"
বেদব্যাস।

এ শ্লোকে তন্ত্রের নাম নাই। তন্ত্রের অতি সহজ সংস্কৃত ভাষাও ইহার আধুনিকত্বের অন্যতম প্রমাণ। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য তদীয় ভাষ্যে স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ স্বরূপ বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তন্ত্রের একটী শ্লোকও দেখিতে পাওয়া যায় না। তন্ত্র শাস্ত্র যে প্রাচীন নহে, ইহাও তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমন কি, বিদ্যালয়ে পঠদ্দশায়, আমি একখানি তন্ত্র রচনার কথা শুনিয়াছি, তাহাতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বীজ মন্ত্র ও তদ্‌গ্রহণের আবশ্যকতা লিখিত আছে। তন্ত্র শাস্ত্রের আধুনিকত্ব তত দোষাবহ নহে। বঙ্গদেশের প্রথম সংস্কারক রামমোহন রায় তন্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদ্ধার ও প্রচারের অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। তিনি ইহাকে অবজ্ঞা করেন নাই। বস্তুতঃ কোনও ধর্ম্মগ্রন্থই অবজ্ঞেয় নহে। কেননা, ধর্ম্মগ্রন্থ মাত্রেরই উদ্দেশ্য, যাঁহা হইতে জগৎ ও আত্মার প্রকাশ, তাঁহার বিষয়ে জ্ঞান ও ভক্তি প্রদান। তন্ত্র শাস্ত্রের পঞ্চ-মকার (মৎস্য, মাংস, মুদ্রা, মৈথুন ও মদ্য) সমুদয় সুসভ্য ও সুশিক্ষিত সমাজে ঘৃণ্য—ইহা নিঃসন্দেহ। ধর্ম্মের উন্নততম শিখরে আরোহণ করিয়া, মনুষ্যের পদস্খলন ও বীভৎস দুর্গন্ধ খাতে পতন হয়—পঞ্চ-মকার জগতকে ইহাই সাক্ষ্য দিতেছে। যদিও তন্ত্রে ইহার সুন্দর আধ্যাত্মিক অর্থ বিদ্যমান, তথাপি ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, কালীঘাট প্রভৃতি তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের প্রধান প্রধান রঙ্গভূমিতে সে সূক্ষ্ম অর্থ পরিগৃহীত না হইয়া, ইহার স্থূল অর্থ অনুসারে কার্য্য হইয়া থাকে। পঞ্জাব, বোম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে তান্ত্রিকতার প্রাধান্য অধিক। মৃত শব মলমূত্র ভক্ষণকে ধর্ম্মাচরণ জ্ঞান করা ভূ ভারতে আর কোথাও নাই, ইহা অতিবাদ নহে। বাঙ্গলারই কৃষ্ণানন্দ "তন্ত্রসার" সংগ্রহ করিয়াছেন। "প্রাণতোষণী" তন্ত্রসংগ্রহেরও বঙ্গদেশে উৎপত্তি। তান্ত্রিকী দীক্ষারূপ সূচীর আকৃতিতে তন্ত্র হিন্দু সমাজে প্রবেশ করে। শূদ্র ও স্ত্রীগণের বেদে অধিকার নাই, সুতরাং তাহারা বৈদিক দীক্ষা-বিবর্জ্জিত। তাহারা প্রথমে তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করে, ইহা তাহাদের ধর্ম্মভাব সংপোষণের অনুকূল হইয়াছিল। ক্রমশঃ ব্রাহ্মণগণেরও এই ধারণা দৃঢ়মূল হইতে লাগিল যে, পরকালে সদ্গতি লাভের জন্য বৈদিক গায়ত্রী অপেক্ষাও তন্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। এ জন্য, পুরোহিত অপেক্ষা গুরুর অধিক সম্মান দেখা যায়। পূর্ব্বে তান্ত্রিকীদীক্ষা optional ছিল, এক্ষণে ইহা compulsory হইয়া দাঁড়াইতেছে। তথাপি আমি অনেক ব্রাহ্মণকে তন্ত্রদীক্ষা হইতে যাবজ্জীবন বিরত দেখিয়াছি। যেমন তান্ত্রিক যোগীর বিশ্বাস, শরীরস্থা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিতে না পারিলে সিদ্ধ হওয়া যায় না, সেইরূপ তান্ত্রিক উপাসকগণের বিশ্বাস, যে কোনও দেবমন্ত্র হউক না কেন, তাহার চৈতন্য সঞ্চার করিতে না পারিলে কোনও ফলোদয় হয় না। একটী উদাহরণ শুনুন, মনে করুন, কালীদেবীর একটি মন্ত্রগ্রহণ করিলেন, ন্যাসাদি ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা সেই মন্ত্র-চৈতন্য করিলে, কালীদেবী আপনাকে দর্শন দান ও আপনার সহিত কথা-

বার্ত্তা করিবেন। হাওড়া জেলার অন্তর্বর্ত্তী আমতা গ্রাম শক্তিদেবীর একটি পীঠ স্থান। সেখানে একটী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের সহিত আমার আলাপ হয়। তিনি তান্ত্রিক সন্ধ্যা গায়ত্রী ব্যবহার করেন। বৈদিক সন্ধ্যা ও গায়ত্রী একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। গোপনে, উপনয়ন প্রভৃতি দশসংস্কার তন্ত্র মতে সমাধা করেন। তাঁহার বিশ্বাস, "কলিযুগে তন্ত্র ব্যতীত অন্য সকল শাস্ত্রই অপ্রামাণিক ও অগ্রাহ্য" [মহানির্ব্বাণ তন্ত্র দেখ।] বর্ত্তমান কালের যোগী Theosophical Society তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া খুব নাড়াচাড়া করিতেছেন। আমি "জ্ঞান সঙ্কলনী" প্রভৃতি দুই এক খানি তন্ত্র দেখিয়াছি। তাহারা তান্ত্রিকতা দোষ রহিত।

যখন মুখুয্যেদের খিড়কির পুষ্করিণী হইতে বিলাতের পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত মতভেদ বিদ্যমান, তখন এই সকল হিন্দুশাস্ত্রে যে মতদ্বৈধ নাই, এরূপ আশা করা যায় না। অনুমান ৫।৬ বৎসর হইল, 'সাধনা'য় ধর্ম্ম জঙ্গল শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক মহাশয় ঘোর তমসাচ্ছন্ন হিন্দুধর্ম্ম-অরণ্যানীতে প্রবেশ করিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিকই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম এমনই কণ্টকাকীর্ণ "পাঁচফুলের সাজি" হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। এমন অন্যোন্যবিরোধী মতসমাকুল ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। তথাপি যাঁহারা সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস পক্ষপাতশূন্য হইয়া পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ আমার সহিত একবাক্যে বলিবেন যে, বেদসংহিতা হইতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বরবিরহে ক্রন্দন ও অতৃপ্ত অপূর্ণ ঈশ্বরসম্ভোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক কথায় সুবিস্তৃত হিন্দুধর্ম্মকে এই বেদান্ত সূত্রে বদ্ধ করা যায়,"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।" [বে-সূ-১-১] যদিও সময়ে সময়ে এই ব্রহ্মোন্মুখিতার ব্যভিচার হিন্দুর ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, তথাপি সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষিত হইয়াছে যে "Man is Man for a' that" (১)

এই সঙ্গে, আমার একথা বলা কর্ত্তব্য যে, মানব স্বভাবোচিত স্বাধীন চিন্তাই হিন্দু

(১) কিন্তু কঠোরশ্রমী স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত তদীয় "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের উপক্রমণিকাতে আমার এই কথার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি স্মৃত্যাদি হিন্দুশাস্ত্রকে এবং জগদ্বিখ্যাত ভারতীয় ছয় দর্শনকে নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ বলিয়াছেন। সুতরাং তত্তৎশাস্ত্র মর্য্যাদক সমগ্র হিন্দু জাতিকেই নাস্তিক বলিয়াছেন। তাঁহার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আমি পাঠকগণকে ঐ গ্রন্থখানি পাঠ করিতে ও স্বয়ং মীমাংসা করিতে অনুরোধ করি। দত্তমহাশয় বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনগুলিকে নিরীশ্বর বলিতে চাহেন। অথবা, যিনি কার্য্য+প্রার্থনা=ফলসিদ্ধি এবং কার্য্য−ফলসিদ্ধি ∴ প্রার্থনা ০, এই সমীকরণ দ্বারা প্রার্থনার মূল্য শূন্য নির্দ্ধারণ করিতে কিঞ্চিৎমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহার নিকট দর্শন-রচয়িতৃগণ যে নাস্তিকতা দোষে দুষ্ট হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। মহাত্মা অক্ষয় কুমারের নিকট বঙ্গভাষা খুব ঋণগ্রস্তা, কিন্তু এজন্য তদীয় শাস্ত্র-বিষয়ক মত যে সকল বঙ্গবাসিগ্রাহ্য হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই গ্রন্থ এফ, এ পরীক্ষার্থিনীদের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এই ব্যক্তিগত ভ্রান্তমত অধ্যয়নে বালাগণের কতদূর সুশিক্ষা হইতে পারে, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করুন। আমার বিবেচনায়, ঐ গ্রন্থের উপক্রমণিকাংশ পরিবর্জ্জন করিয়া কেবল মূলভাগ স্ত্রীপাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃকল্প।

ধর্ম্মের অস্থি মজ্জা। এ নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রে পরস্পর বিরুদ্ধ বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্ব নিকৃষ্ট সংস্কার, মলিনীকৃত দেশাচার ও কলুষীভূত সমাজের অবশীভূত এইরূপ স্বাধীন চিন্তাই যে, জাতীয় ধর্ম্মোন্নতির বিপুল সহায়ক, এ কথার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। হিন্দু শাস্ত্রে এই সাহসিক শ্লোক লিখিত আছে ঃ—

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অযুক্তং তৃণবত্ত্যাজ্যং যদুক্তং পদ্মজন্মনা ॥ যোগবাশিষ্ঠ।

"বালকেরও বাক্য যুক্তিযুক্ত হইলে উপাদেয়। পক্ষান্তরে, কমলযোনি ব্রহ্মা যদি অযুক্ত কথা বলেন, তাহাও তৃণবৎ পরিত্যাজ্য।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বৈদিক সংহিতার মহর্ষিগণের বহুদেববাদ [ম্যাক্সমূলর ইহাকে ইষ্টেশ্বরবাদ (Henotheism) বলেন, এই সংজ্ঞাই অধিকতর সঙ্গত।) ক্রমশঃ একেশ্বরবাদ অভিমুখে প্রধাবিত হয় এবং অবশেষে তাহা উপনিষদের ব্রহ্মবাদে পরিসমাপ্ত হয়। এমন কি, সংহিতা মধ্যেই শেষের দিকে এই একত্ব জ্ঞানের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ঋষিগণ এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, সকল দেবতা এক। অগ্নিকে ইন্দ্র, বিষ্ণু, সবিতা, পূষা ও অদিতি বলা হইয়াছে। এমন কি, অগ্নি সর্ব্বদেব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। (ঋগ্বেদ, ৫ম, ৩সূ) অথর্ব্ববেদের এক স্থানে দেখা যায়, "সন্ধ্যাকালে অগ্নি বরুণ হইয়া উঠেন, প্রাতরুত্থান কালে তিনি মিত্র হন, শেষে সবিতা হইয়া তিন আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করেন এবং মধ্যাহ্নকালে ইন্দ্র হইয়া স্বর্গ উত্তপ্ত করেন।" (১৩-৩-১৩)। পুনশ্চ

"সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ঃ বাচোভিঃ
এক সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।

মেধাবী কবিগণ একমাত্র পক্ষী (সূর্য্য) বা পরমাত্মকে বাক্য দ্বারা নানারূপে বর্ণনা করেন। (ঋগ্বেদ ১০ম, ১১৪, ৫)

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং অগ্নিমাহুঃ
অথো দিব্যঃ সঃ সুপর্ণঃ গরুত্মান্
একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥

জ্ঞানী ঋষিগণ একমাত্র সৎপদার্থকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, স্বর্গীয় গরুড়; পক্ষী, যম ও বায়ুশব্দে অভিহিত করিয়াছেন। (ঋগ্বেদ, ১-১৬৪-৪৬)

মনুসংহিতায় এই কথারই প্রতিধ্বনি শ্রবণ করুন।

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতম্।

কেহ ইহা (পরষপুরুষ)কে অগ্নি, কেহ প্রজাপতি মনু, কেহ ইন্দ্র (১), কেহ প্রাণ ও অপার শাশ্বত ব্রহ্ম বলেন। (মনুসংহিতা ১২শ অধ্যায়, ১২৩ শ্লোক।)

"যে অনন্ত শাশ্বত ব্রহ্ম ঋগ্বেদের সংহিতা-রচনা কালে পর্ব্বত, নদী, সূর্য্য, আকাশ, ঊষা, চন্দ্র, বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি প্রভৃতির অন্তরালে পরিলক্ষিত হইতেন, উপনিষদে সেই মহান্ দেব আপনার উচ্চতম ও পবিত্রতম মূর্ত্তিতে পরিদৃষ্ট। (ম্যাক্সমূলর হিবার্ট লেক্‌চর।"

এই অনন্ত উদ্দেশে ঋষিগণ যে সূক্ষ্ম ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম পথের পান্থ হইয়াছিলেন, উপনিষৎ সেই পথের শেষ সীমা। অদ্বৈতবাদই এই শুভ যাত্রার উন্নততম ও বিশুদ্ধতম ফল। কিন্তু পরবর্ত্তী অন্যান্য ঋষিগণ মানুষীকরণের (Anthropomorphism) পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে পৌরাণিক অবতারবাদে উপনীত হইয়াছিলেন। ক্রমভাবটি এইরূপ

(১) মহর্ষি মনুর সময়ে ইন্দ্রের পৌরাণিক দুর্দ্দশা ঘটে নাই।

বৈদিক ঋষিগণ কবিসুলভ ভাব-বশে ইন্দ্রের ধৃতবজ্রহস্ত, বরুণের সহস্রচক্ষুঃ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। যজ্ঞসম্ভারপূরিত ব্রাহ্মণ যুগে দেবগণের বহুমুখ হস্তযুক্ত মূর্ত্তি কল্পনা আরব্ধ হয়। পুরাণ-কালে, দেবগণ মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূমণ্ডলে, না, ভারতমণ্ডলে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করেন। এই হেতু, সুদূর বৃন্দাবনবিহারী নটবর শ্যামাঙ্গের জন্য নদীয়াবিহারী গৌরাঙ্গের পাষাণ-ভেদী বিরহ-রোদন এবং কাহারও মতে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গের অবতার।

আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম এই অদ্বৈতবাদ ও অবতারবাদের সঙ্করীকরণ মাত্র। ব্রহ্মসঙ্গীত এই উভয়বাদ পরিহার করিয়া কেবল একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রকে একটী মহান্ বৃক্ষ কল্পনা কর। ঋগ্বেদসংহিতা ইহার বীজ, ব্রাহ্মণ ইহার প্রকাণ্ড, উপনিষৎ ও পুরাণ ইহার দুইটী শাখা, ষড়্‌দর্শন উপনিষদের ও উপপুরাণগুলি পুরাণের প্রশাখা, তন্ত্রশাস্ত্র ইহার পরগাছা বা আলগ্ লতা, অসংখ্য সম্প্রদায়গ্রন্থগুলি ইহার পত্র ও ব্রহ্মসঙ্গীত ইহার চিরশোভিত সুগন্ধি পুষ্প। পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম্মবৃক্ষের ন্যায় ইহারও অতি মহৎ ফল ঈশ্বর-সম্মিলন।

বৈদিক প্রার্থনা আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রহ্মসঙ্গীতের একটি প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

"দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি শুদ্ধপ্রীতি,
তুমি মঙ্গল আলয়।
ধৈর্য্য দেহ বীর্য্যদেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদে আশ্রয়।"

ইহার একটী ঊষাসঙ্গীত দেখুন।

"অয়ি সুখময়ি ঊষে! কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু
আনন্দে ভাসিছে সবে
কে শিখাল এই হাসি, কেবা সে যে হাসাইল।"
ইত্যাদি।

রামমোহন কৃত গীতাবলী স্পষ্টতঃ উপনিষৎ হইতে গৃহীত। ঋক্‌সঙ্গীত ও অন্যান্য ব্রহ্ম সঙ্গীতের স্থানে স্থানে বেশ ঐক্য আছে। (১) ঈশ্বরের পিতৃত্ব।

যদীং সবাধঃ পিতরং ন পুত্রাঃ
সমান দক্ষা অবসে হবন্তে।"

পুত্রগণ যেমন পিতাকে আহ্বান করে, সেইরূপ সমোৎসাহ ঋত্বিক্ সকল স্তোত্র ও শস্ত্র দ্বারা রক্ষা পাইবার জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন। [৭-২৬-২]

"নহি ত্বদন্যন্মঘবন্ন আপ্যং
বস্যো অস্তি পিতা চন ॥"

হে মঘবন্! তোমা ভিন্ন আমাদের অন্য কোনও ধন নাই এবং তোমা ভিন্ন আর আমাদের স্তবনীয় পিতা নাই। [৭-৩২-১৯] ইত্যাদি।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

"তুমি কি গো পিতা আমাদের?
ওই নেহারি মুখ অতুল স্নেহের।
"পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে
ভুলে যাও সব অভিমান ॥ ইত্যাদি।

(২) ঈশ্বরের মাতৃত্ব।

"ঊশতীরিব মাতরঃ।" [সন্ধ্যাবিধি]

মাতার ন্যায় জল আমাদের মঙ্গলকামনা করেন।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

"জননী সমান, করেন পালন,
সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।
* * * *
কেবা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা,
লয়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে।"

(৩) ঈশ্বরের বন্ধুত্ব।

"য ইন্দ্র শুষ্মো মঘবন্তে অস্তি
শিক্ষা সখিভ্যঃ পুরুহূত নৃভ্যঃ।

হে পুরুহূত (ইন্দ্রকে অনেকে আহ্বান করে, এজন্য ইন্দ্রের নাম পুরুহূত) মঘবন্ ইন্দ্র! তোমার যে বল আছে, তোমার সখা মনুষ্যগণ (স্তোতা ঋষিগণ) কে সেই বল প্রদান কর। [৭-২৭-২] ইত্যাদি।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

"প্রেমমুখ দেখহে তাঁহার।
* * * *
সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।ইত্যাদি।'

"তুমি একজন হৃদয়ের ধন।
* * * *
কারু পিতা, কারু মাতা, কারু সুহৃৎ সখা হও।"
ইত্যাদি।

(৪) ঈশ্বরের প্রিয়তমত্ব।

"মা হেড়ে ভূম বরুণস্য বায়ো
র্মা মিত্রস্য প্রিয়তমস্য নৃণাম্।"

আমরা যেন মনুষ্যগণের প্রিয়তম বরুণ, বায়ু, ও মিত্রের ক্রোধভাজন না হই। [৭-৬২-৪]

ব্রহ্মসঙ্গীত।

"ডেকেছেন প্রিয়তম,
কে রহিবে ঘরে।
ডাকিতে এসেছি তাই
এস ত্বরা করে॥" ইত্যাদি।

(৫) ঈশ্বরের রাজভাব।

"হব্যং নো মিত্রো অর্য্যমা সুজাতো
রাজা সুক্ষত্রো বরুণো জুষন্ত।

"মিত্র, শোভন জাত অর্য্যমা ও বলশালী রাজা বরুণ আমাদের হব্য গ্রহণ করুন।" [৭-৬৪-৪]

ব্রহ্মসঙ্গীত।

"কি ভয়, অভয়ধামে, তুমি মহারাজা
ভয় যায় তব নামে।" ইত্যাদি।"

(৬) সুমতি প্রার্থনা।

"ত্বং বিষ্ণো সুমতিং বিশ্বজন্যা—
মপ্রযুতা মেবযাবো মতিং দাঃ।"

হে কামপ্রদাতঃ বিষ্ণো, তুমি আমাদিগকে দোষরহিত বুদ্ধি ও বিশ্বজনীন সুমতি দান কর। [৭-১০০-২]

ব্রহ্মসঙ্গীত।

জয় দেব, জয়দেব।
* * * *
ইহলোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি॥

(৭) ধনপ্রার্থনা।

"আধ্রশ্চিদ্যং মন্যমানস্তুরশ্চি
দ্রাজা চিদ্যং ভগং ভক্ষীত্যাহ।"

যে ভগদেবের নিকট দরিদ্র ও রাজা উভয়েই "আমাদিগকে ধন দেও" বলিয়া প্রার্থনা করে। [৭-৪১-২]

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

"কর গভীর দারিদ্র্য হরণ।" ইত্যাদি।

কে জানে কোন্ অতীত কালে, পঞ্জাবের প্রবলবেগা সিন্ধুতটে বসিয়া, ভারতের নবাতিথি আর্য্যগণ "কস্মৈদেবায়হবিষা বিধেম?" (কোন্ দেবতাকে হবিঃ দ্বারা পূজা করিব?) বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন, আর আজ পূতনীরা ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম সন্নিকটে, আমরা গাহিতেছি।

"সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।'

সকল ভাষাই যে ভাবগ্রাহীর ভৃত্য, তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই ঋক্‌সঙ্গীতের সংস্কৃত ও ব্রহ্মসঙ্গীতের বঙ্গভাষা উভয়ই তুল্য গ্রাহ্য। হে স্বর্গীয় সঙ্গীত! আমি কত সময় শোক তাপে জর্জ্জরিত হইয়া তোমার নিকট সান্ত্বনা পাইয়াছি। সংসার-চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া, কত সময় তোমার নিকট আশ্রয় পাইয়াছি। তুমি আমার হৃদয়নাথের জ্যোতিঃ আনয়ন করিয়া দিয়াছ। আমার রোগশয্যায় তোমারই করুণা রোগ-যন্ত্রণা বিস্মৃত করিয়া দিয়াছে। সংসারাসক্তির বিষম বিষবিকারে তুমিই ভিষকের কার্য্য করিয়াছ। পাপ ও অনুতাপের যন্ত্রণা হইতে তুমিই আমাকে মুক্তিদান করিয়াছ। আবার, হে প্রিয়, সুখের সময় তোমার আলিঙ্গনে রোমাঞ্চিতকায় হইয়াছি। হে সুন্দর, তোমার সৌন্দর্য্যে অমার তারা, পূর্ণিমার শশী, বর্ষার মেঘ, বসন্তের বায়ু আরও সুন্দর বোধ হয়। হে সুমিষ্ট, তুমি এই মধুময় জগতকে কাননে বা ভবনে, পথে বা নদীতীরে, ঊষা বা সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে বা নিশীথে, আরও মধুময় করিয়া থাক। হে বাঞ্ছিত, তুমি চিরদিন আমার সঙ্গে থাক।

শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য।

বর্ষার গাথা।

অতুল সুষম, কেতকী কুসুম,
সুবাসে ছেয়েছে দিক্;
মেদুর পবন, মূরছি পড়িছে,
কুহরে ক্বচিৎ পিক;
মেঘে ঢাকা মুখ, সুনীল আকাশ
চপলা চমকি চায়।
কারে যেন প্রাণ, বুকের ভিতরে
যতনে ডাকিছে আয়!
কে যেন আছিল, গিয়াছে চলিয়া,
স্মৃতি টুকু মনে জাগে,
আন্ কথা মনে ভাবিতে যাইয়া
তার কথা আসে আগে।
তনুময় ভাবে, উঠেনি ফুটিয়া
এখনো আমার প্রিয়া,
নয়ন এখনো, লখেনি তাঁহারে
লোলুপ চাহনি দিয়া—;
তবু যেন তার, সুরভি গঠিত,
অশরীরি মুখখানি,
বাসনা নদীর উজান প্রবাহে
কল্পনা দেখায় আনি।
মধু ক্লান্তিভরা সুষুপ্তি আকর,
প্রেমে উলসিত আঁখি।
পদ্মরাগ গড়া শীতল হাসিটী
স্নেহে প্রাণে দেয় ঢাকি।

পুলক গঠিত, সরস পরশ
সুখ মূরছার খনি,
করিতে তাহারে, নূগন পরাণ,
চায় হৃদয়ের মণি।
সে যে কোথা আছে, জানিনা বুঝিনা,
প্রাণ তবু তারে চায়,
মেঘ'রথে চড়ি, সাধের কল্পনা
তারে অন্বেষিতে ধায়।
কড় কড় করি, ডাকে জলধর
বিজলী বিকট হাসে,
চলিত পরাণ নিরাশ হইয়ে
নিজ ঘরে ফিরে আসে।
মুদিরের ছায়া পড়েছে তমালে
বকুলে আঁধার মাখা,
বিজনের মুখে নিরাশার ছবি,
রয়েছে সতত আঁকা!
করুণ রাগিণী, করি আলাপন
নিভৃত মনের কথা,
ঝাউ তরুগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
গাথায় প্রকাশে ব্যথা।
কাকুলি জড়িত অস্ফুট কাঁদুনি,
তরুর মরম টুটি।
হয়ত পরশি কোন্ উপাদান
ভাষায় উঠিবে ফুটি

এমনি করিয়া উঠিবে ফুটিয়া
আমার সুখদা প্রিয়া,
সুরভি মাখান জোছনা মথিয়া,
আসিবে মাধুরী নিয়া।
(তার) অপার মাধুরী, অসীম সুষমা
হৃদয়ের মাঝে জাগে,
কে যেন তাহারে, রেখেছে ডুবায়ে,
সুগভীর অনুরাগে।
সে এলনা বলি, তাই এ যাতনা
ফুকারি কাঁদিছে মন,
মেঘে ভরা নভ বিষাদে হৃদয়
বিমলিন উপবন।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

ব্রাহ্মণ ও জাতিভেদ।

বিগত বারে "বর্ণভেদ ও জাত্যন্তর পরিণাম" নামক প্রস্তাবে আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-প্রকরণে বর্ণভেদের পূর্ব্বে যে জাতিভেদ হয়, তাহা যেমন নৈসর্গিক ব্যাপার, বর্ণভেদের পর প্রতি সমাজে যে জাতিভেদ ঘটে, তাহাও তদ্রূপ নৈসর্গিক ব্যাপার। প্রতি সমাজে বলিবার কারণ এই, জাতিভেদ সর্ব্ব মনুষ্য-সমাজেই লক্ষিত বা অলক্ষিতভাবে বিদ্যমান আছে। নৈসর্গিক ব্যাপারকে বিপর্য্যস্ত না করিয়া হিন্দু সমাজ যাহা শাস্ত্রানুযায়ী, তাহারই অনুসরণ করিয়াছে।

যাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ, তাহাদিগের নিকট অবশ্য সাত্ত্বিক ভাবেরই সমাদর অধিক। বর্ণভেদের নিয়ম-অনুসারে সমাজের যে ভাগে সেই সাত্ত্বিকভাব সমূহ প্রবল, আর্য্য-জাতি যে সেই সাত্ত্বিক ভাগেরই অধিক সমাদর করিবে, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। এজন্য প্রাচীন আর্য্য-সমাজে ব্রাহ্মণ-বর্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ গ্রহণ করিয়াছিল। কিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি। সেই প্রস্তাবের প্রসঙ্গ ক্রমেই আর্য্য সমাজে কিরূপে জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, এ কল্পের প্রারম্ভে প্রথমে কতিপয় জীবন্মুক্ত পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। সুধু এ কল্পে কেন, প্রতি কল্পের প্রারম্ভে তাঁহাদের আবির্ভাব হয়। প্রতি কল্পের আদিতে জগতে বেদ প্রকাশ * করিবার জন্য কল্প হইতে কল্পান্তরে তাঁহারা আবির্ভূত হন। বেদ প্রকাশ করিয়া পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হন। বেদ কল্পে কল্পে এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিকল্পের যুগ-ধর্ম্মানুসারে এই বেদের ক্রমশঃ বিলোপ হইতে থাকে সত্য, কিন্তু সৃষ্টিকালে আবার পুনরাবির্ভাবে তাহার সম্পূর্ণতা সাধিত হয়। একবার বেদ আবির্ভূত হইলে, ক্রমশঃ নানা কারণে তাহা জগন্ময় প্রচারিত হইতে থাকে। এ কল্পেও তাহা জগন্ময় নানা আকারে প্রচারিত হইয়াছে। কিরূপে হইয়াছে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। সে যাহা হউক, এই বেদ-প্রকাশক বৈদিক ঋষিগণ হইতে নানা মনুর আবির্ভাব হয়। এই মনুগণ হইতে মনুজ মনুষ্যলোকের সৃষ্টি।

* বেদ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা। এই ব্রহ্মজ্ঞান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিত্য নিয়মাদি ও ধর্ম্মজ্ঞান হইতে উৎপন্ন নিত্য বস্তুজ্ঞান। সেই নিত্যবস্তুর যোগমূলক প্রত্যক্ষই ব্রহ্মজ্ঞান।

একই মনুষ্যলোক কর্ম্মানুসারে কিরূপ নানা বর্ণে ক্রমশঃ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, শাস্ত্রে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। আমরা "বর্ণভেদ ও যুগান্তর-পরিণাম" নামক প্রস্তাবে তাহার আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং সে কথার পুনরুল্লেখ এখানে আবশ্যক নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন, যাঁহারা সত্ত্বগুণ প্রধান, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। সুতরাং কর্ম্মানুসারে যাঁহারা সত্ত্বগুণ-প্রধান ছিলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ জাতির আদি পুরুষ ছিলেন। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও কর্ম্মানুসারে প্রাচীনকালে যখন লোক চণ্ডালত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তখন আর ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্বের কথা কি? তাই মহাভারত বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কার্য্য দ্বারাই পৃথক পৃথক বর্ণলাভ করিয়াছেন।"

যাঁহারা কেবল সত্ত্বগুণে প্রধান ছিলেন, তাহারাই তবে ব্রাহ্মণ জাতির জন্মদাতা। সাত্ত্বিক-গুণ সম্পন্ন এই ব্রাহ্মণ্য সংরক্ষণ করিবার জন্য বেদ বর্ণাশ্রম-নিয়ম নিয়োজিত করিয়াছেন। এই বর্ণাশ্রম নিয়মই প্রাচীন কালের প্রধান শিক্ষা-প্রণালীরূপে আর্য্য-সমাজে প্রবর্ত্তিত ছিল। এই শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য ধনোপার্জ্জন নহে, কিন্তু দেবত্বার্জ্জনই তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই বর্ণাশ্রম-নিয়ম কেবল ব্রাহ্মণ-বর্ণের নিমিত্ত নিয়োজিত হইলেও অপরাপর বর্ণ অধিকারানুসারে তাহা গ্রহণ করিতে পারিত। সে কথা পরে বিবেচ্য। এক্ষণে ব্রাহ্মণের নিমিত্ত যে আশ্রম-নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

"বর্ণভেদ ও জাত্যন্তর পরিণাম"-নামক প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তির সূক্ষ্ম শরীর বা চিত্তপুরুষ ইহজন্মে যেরূপ গুণার্জ্জন করিয়াছে, পরজন্মে তাহার তদনুসারে জন্মলাভ হয়। সেই নিয়ম-অনুসারে যাঁহার জন্ম ব্রাহ্মণকুলে হইয়াছে, ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাঁহার সাত্ত্বিকগুণ অধিকতর প্রবল। কোন্ কুল বা জাতিতে কাহার জন্ম হইবে, এ কথা তোমার আমার কাছে ঘোর প্রহেলিকা, কিন্তু ঐশ্বরিক সৃষ্টির নিয়মানুসারে তাহার অবশ্য নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। সেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাহার যেমন কুলে জন্ম, তাহার গুণাংশ তদ্রূপ। নহিলে জন্মের ইতর বিশেষ হইবে কেন? বিভিন্ন কুলে বিভিন্ন লোকের জন্ম হইবে কেন? অধিকতর সাত্ত্বিক গুণ থাকাতে যাঁহার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়, তাঁহার সেই বীজগত শ্রেষ্ঠত্বের উন্মেষ-সাধন করিবার জন্য উপনয়ন-সংস্কার ও চারি আশ্রম-নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

যিনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি সেই কুলধর্ম্মানুসারে আশৈশব শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকেন। একজন ব্রাহ্মণের ঘরে যেরূপ আচার ব্যবহার, যেরূপ রীতিনীতি প্রচলিত, অন্য বর্ণভুক্ত লোকের ঘরে ঠিক তদ্রূপ আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি কখনই প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়া যে ব্যক্তি সেই কুলানুগত শিক্ষা মাতৃ-অঙ্ক হইতে প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে শৈশব কাল হইতেই তদ্রূপ শিক্ষায় প্রবর্ত্তিত রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণের উপনয়ন-সংস্কার, বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাত্ত্বিক বীজোৎপন্ন হইলে কি হইবে, যতদিন ব্রাহ্মণ

উপনীত না হন, ততদিন তিনি শূদ্র। এই উপনয়ন-সংস্কারই ব্রাহ্মণকে দ্বিজত্ব দিবার প্রধান উপায়।

এই উপনয়ন-সংস্কার পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয়, তাহাতে উপনীত ব্যক্তি এই ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েন।

(১) ব্রতঞ্চরিষ্যামি তচ্ছেকেয়ং প্রব্রবীমি।

আমি বলিতেছি—প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন করিব।

(২) তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ।

সেই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে শক্যতা লাভ করিয়া এবং তাহাতে ধর্ম্ম-ঋদ্ধিসম্পন্ন হইয়া আমি অনৃত বা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইব।

(৩) সত্যমুপৈমি স্বাহা।

আমি সত্যলাভ করিব।

এই প্রতিজ্ঞাত্রয় অত্যন্ত কঠিন বিষয়। প্রথমে দেখুন, ব্রাহ্মণপুত্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছেন, আমি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিব। এই ব্রহ্মচর্য্য নিতান্ত নিগ্রহ ব্যাপার। ব্রহ্মে নিয়ত বিচরণ করার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মে নিয়ত বিচরণ করিতে হইলে শয়নে, ভোজনে, ও স্বপনে ব্রহ্ম-ধ্যান ও ব্রহ্ম-জ্ঞান করা চাই। ব্রহ্মচারী কখন ব্রহ্মহারা হইতে পারিবেন না। আহারে তিনি ব্রহ্মকে দেখিবেন, সুতরাং তাঁহার আহার পর্য্যন্ত সাত্ত্বিক নিয়মে পরিচালিত হওয়া উচিত। এইজন্য ব্রহ্মচারীর পক্ষে যে আহার বিহিত হইয়াছে, তাহা সাত্ত্বিক ভাবেরই পরিবর্দ্ধন সাধন করে। আচার ব্যবহারেও ব্রহ্মচারীর সাত্ত্বিকপথ নিয়োজিত। বেদ ও ব্রহ্মলাভার্থ ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে থাকিবেন। এই গুরুগৃহে তাঁহার পক্ষে যে নিয়ম নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কেবল ভক্তিসাধক পথ। এই ভক্তি-সাধক পথে তিনি অতি কঠিন শাসনে শাসিত থাকেন। এত কঠিন নিয়মে থাকিবার প্রয়োজন পার্থিব ধন সম্পত্তি নহে। যে ধন লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মচারী অতি কঠিন নিয়মে থাকেন, সে ধন ধর্ম্মসম্পত্তি। এই ধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য তিনি অতি কঠিন সংযম শিক্ষা করেন। এই সংযমই ইন্দ্রিয় ও রিপুবশ করিবার প্রশস্ত পন্থা। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত না করিতে পারেন, তিনি কখন কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে শাসন করিতে পারেন না। এই রিপুগণের উপর জয়লাভ না করিতে পারিলে কখন ভক্তিপথের পথিক হওয়া যায় না। ভক্তিপথের পথিক না হইতে পারিলে কখন ধর্ম্মলাভ করা যায় না। এই ভক্তি সুধু দেবভক্তি নহে, যিনি গুরুজনকে ভক্তি করিতে পারেন, তিনিই দেবভক্তিতে উপনীত হইতে পারেন। সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ পিতা, মাতা, দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুকে যিনি ভক্তি করিতে না পারেন, তিনি কি কখন অসাক্ষাৎ সূক্ষ্ম দেবতাকে ভক্তি করিতে পারেন? এজন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে প্রথমে গুরুভক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। এই গুরুভক্তি লাভ করিতে হইলে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করা আবশ্যক; গুরুর আদেশ ক্রমে কঠিন সংযম শিক্ষা চাই, ইন্দ্রিয় ও ক্রোধাদি রিপুগণকে বশ করা চাই। এইরূপ ভক্তি পথের পথিক হইতে পারিলে মানুষ দেবভক্তিতে আসিতে পারেন। দেবভক্তিতে না আসিতে পারিলে ব্রহ্মকে লাভ করা দুঃসাধ্য। ব্রহ্মকে লাভ না করিতে পারিলে ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করা মিথ্যা।

তবেই দেখা যাইতেছে, যিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিবেন, তিনিই কেবল ধর্ম্মধনে ধনী হইতে পারিবেন। যিনি ধর্ম্মঋদ্ধিতে

সম্পন্ন হইতে পারেন, তাহার পক্ষেই মায়া মোহ জয় করা সম্ভব। মায়া মোহ জয় করিতে হইলে মায়া কি, সে জ্ঞান হওয়া অগ্রে আবশ্যক। সে জ্ঞান কেবল বেদার্থ জ্ঞানেই লাভ করা যায়। মায়াই মিথ্যাদৃষ্টি। সেই মিথ্যা দৃষ্টি জ্ঞানচক্ষু না ফুটিলে অপসারিত হয় না। মিথ্যাদৃষ্টি অপসারিত না হইলে প্রকৃত সত্য ও নিত্যবস্তু কি, তাহা জানা যায় না। সেই প্রকৃত ও সত্য বস্তুই ব্রহ্ম। সুতরাং সত্যলাভের অর্থই ব্রহ্মলাভ। ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন এই—সত্য বা ব্রহ্ম লাভ। ব্রহ্মলাভই ব্রাহ্মণের মহাব্রত ফল। এই ব্রহ্মলাভেই ব্রাহ্মণ্য লাভ হয়। তাই উপনয়নকালে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, আমি মায়ামুক্ত হইয়া সত্য লাভ করিব।

উপনয়নকালে ব্রাহ্মণ যে ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েন, তাহার অর্থ কি, আমরা দেখিলাম। এই পরমার্থ লাভ কিরূপে হইবে, তজ্জন্য ব্রাহ্মণ উপনয়ন-কালে আর তিনটী গুরু-আদেশ গ্রহণ করেন। সেই আদেশত্রয় এই ঃ—

(১) "সমিধমাধেহি।"

তুমি অগ্নি কার্য্য বা যজ্ঞকার্য্য করিবে।

(২) "আপোঽশানং কর্ম্ম কুরু।"

যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আপকার্য্য করিয়া আহারাদি করিবে।

(৩) "মা দিবাস্বাপ্সীঃ।"

দিবাভাগে ঘুমাইবে না।

এইরূপ আদিষ্ট হইলে ব্রাহ্মণকুমার প্রতিজ্ঞা করেন—"করিব।"

সুতরাং তিনি উপনয়নকালে আরও এই ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞাত্রয় লইয়াছেন, এই তিন প্রতিজ্ঞা তাহাদের সাধক ও উপায়। যে সত্য লাভ করা ব্রহ্মচারীর প্রয়োজন, তাহারই উপায় এই তিন প্রতিজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি যজ্ঞকার্য্য করিব। ব্রহ্মলাভ উদ্দেশেই সমস্ত যজ্ঞকার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল যজ্ঞের শেষ, ব্রহ্মযজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞান। এই ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিতে যোগী কিরূপ সর্ব্ব যজ্ঞাদির সমস্ত কর্ম্ম আহুতি দিয়া থাকেন, তাহা গীতার চতুর্থাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সেই যজ্ঞাদির সমস্ত কর্ম্মের উল্লেখ করা এস্থলে আবশ্যক হইতেছে না। যে যজ্ঞাদির শেষ—ব্রহ্মযজ্ঞ, সেই যজ্ঞাদির মধ্যে সংসারাশ্রমের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডই নিবিষ্ট আছে। এজন্য দেখা যাইতেছে, সংসারীর সর্ব্বযজ্ঞের শেষ এই ব্রহ্মযজ্ঞে উপনীত হওয়া। যতদিন না এই ব্রহ্মযজ্ঞে উপনীত হইতে পারেন, ততদিন ব্রাহ্মণকে সমস্ত সাংসারিক কার্য্যে এক ব্রহ্মকেই স্মরণ করিয়া সমুদায় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। তাই দেখা যায়, ব্রাহ্মণকে সর্ব্বকার্য্যের পূর্ব্বে আপকার্য্য বা জলকার্য্য করিয়া ব্রহ্মকে স্মরণ করিতে হয়। তিনি আহার করিতে যাইতেছেন, তৎপূর্ব্বে সাবিত্রী-মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জলকার্য্য আছে। এইজন্য, পাছে আহারেও তিনি ব্রহ্মকে ভুলিয়া যান। যদি আহারে তিনি ব্রহ্মকে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তিনি এমত আহার করিতে পারেন, যদ্দ্বারা তাহার রোগোৎপত্তি হইতে পারে। রোগোৎপত্তি হইলে তাহার প্রয়োজনসিদ্ধির ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। তিনি যেন শরীর-ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য জানিয়া আহারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন, সুধু আহারের জন্য পান-ভোজন নহে। সুধু যে আহারের সময় গায়ত্রী জপ করিয়া তাঁহাকে

জলকার্য্য করিতে হইবে এমত নহে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, ক্রীড়ায়, আচমনে, আচারে, ব্যবহারে, সর্ব্ব সময়ে ও সর্ব্ব অনুষ্ঠানেই তাহাকে জলকার্য্য করিতে হইবে। এমন কি, মূত্রত্যাগেও তাহাকে জল দ্বারা দেহ-শুদ্ধ করিতে হইবে। কারণ, যিনি বাহ্য শুচি অভ্যাস করেন, অন্তর্শুচি তাহারই লাভ হয়। যিনি এক বিষয়ে শুচি অভ্যাস করেন, সর্ব্ব বিষয়ে ক্রমে ক্রমে তাঁহার শুচি অভ্যস্ত হইতে থাকে। সুতরাং যিনি শুদ্ধ হইতে না অভ্যাস করেন, তাঁহার পাপাশুদ্ধি অপনীত হয় না। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-আহ্নিকেও জল-কার্য্য। সুতরাং এই জলকার্য্যই ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রধান ব্রত স্মরণ করাইয়া দেয়। এই জলকার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণ সতত ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া সর্ব্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। ব্রহ্মকে সমক্ষে রাখিয়া সর্ব্বকার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

যে সাত্ত্বিক পথাবলম্বী ব্রাহ্মণ নিজ ব্রহ্ম-চর্য্য ব্রত-পরায়ণ হইয়া সংসার-ধর্ম্ম করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যাদি এত অধিক যে, তিনি দিবসে ঘুমাইবার সময় পান না। প্রতিদিন সংসার-যজ্ঞ সমাপন করিতেই তাহার দিন অতিবাহিত হয়, তবে আর তিনি কখন দিবসে নিদ্রা যাইবার সময় পাইবেন? এই জন্য ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন যে, এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া আমি কখন দিবাভাগে নিদ্রা যাইব না।

ব্রাহ্মণ উপনয়নকালে এই ছয় প্রতিজ্ঞায় প্রতিশ্রুত হইয়া সর্ব্বশেষে সেই সমস্ত প্রতি-জ্ঞার বন্ধন-স্বরূপ আরও গুরুতর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েন। এই উপনয়ন-যজ্ঞ সাধন কালে তাহার সাক্ষী স্বরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। সংসারে ব্রাহ্মণের মহাযজ্ঞ কি, এই যজ্ঞোপবীতই তাহা বলিয়া দিতেছে। তিনি সেই যজ্ঞোপবীত ধারণ কালে কি বলেন?—

"যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্যত্বোপবীতেনোপনেহ্যামি।"

"এই যজ্ঞের সাক্ষী স্বরূপ তুমি যজ্ঞোপ-বীত, এই যজ্ঞের বন্ধন-স্বরূপ তোমায় গ্রহণ করিলাম। সুতরাং তোমায় ত্যাগ করিব না।"

এবড় শক্ত প্রতিজ্ঞা। গুরুর নিকট সাবিত্রী-গ্রহণ কালে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণ সাবিত্রী সূত্র ধারণ করেন। পূর্ব্বকৃত ছয় প্রতিজ্ঞার বন্ধন-স্বরূপ তিনি যজ্ঞোপ-বীত ধারণ করিয়া বলিতেছেন, হে যজ্ঞোপ-বীত, আমি যদবধি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাচরণে নিযুক্ত থাকিব, যত দিন না সত্যলাভ হইবে, তত-দিন তোমায় এই প্রতিজ্ঞা কতিপয়ের সাক্ষী ও বন্ধনস্বরূপ ধারণ করিব। প্রত্যুতঃ এই ব্রতে আমি নিযুক্ত থাকিব কি না, তুমি দেহে থাকিয়া তাহা দিবা রাত্রি স্মরণ করাইয়া দিবে। আর এই সমস্ত প্রতিজ্ঞা পালন কালেও তুমি সাক্ষী থাকিবে। আমি যে কার্য্য করিব, তোমায় সাক্ষী রাখিয়া করিব। সাক্ষী না হইলে তুমি বন্ধন-স্বরূপ হইবে কিরূপে? তুমি দেখিতে পাইবে যে, আমি সে সমস্ত কার্য্য করিতেছি কি না। ব্রাহ্মণকে এই জন্য সেই উপবীত ধরিয়া সকল কার্য্য করিতে হয়। সেই উপবীতই তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়াছে। নহিলে তিনি কি? সেই উপবীত-ধারণের পূর্ব্বে তিনি ত শূদ্র ছিলেন। কেবল সেই উপবীতই তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়াছে। ব্রাহ্মণ যে আশীর্ব্বাদ করেন, তাহাও সেই উপবীত ধরিয়া। সেই উপবীত ধরিয়া তিনি যেন বলেন, আমি

এই উপবীতধারী বলিয়াই ব্রাহ্মণ এবং সেই ব্রাহ্মণ্যের চিহ্ন স্বরূপ দিয়া আশীর্ব্বাদ করি-তেছি। আমি আশীর্ব্বাদ করি নাই, আমার ব্রাহ্মণ্যই যেন আশীর্ব্বাদ করিতেছে। স্নান, আহ্নিক, জপ, পূজা, প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই সেই উপবীত হাতে করিয়া করিতে হয়। তাহাকে সাক্ষ্য রাখিয়া তবে ব্রাহ্মণকে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। এই যজ্ঞ-সূত্র বড় সামান্য সূত্র নহে। তাহার ত্রিদণ্ডী ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞার বন্ধনী। সেই বন্ধনী ও সাক্ষী স্বরূপ দেহে দিবা রাত্রি অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণকে যে রাত্রি দিন শাসন করিতেছে, তাহাই ত্রিদণ্ডী। সেই শাসন রজ্জু বিরহিত হইলে কাজেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। যাঁহার ব্রহ্মপদলাভ হইয়াছে, যাঁহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্যাপন হইয়াছে, তিনিই কেবল সেই উপবীত পরিত্যাগ করিতে পারেন। নহিলে ব্রাহ্মণ যতদিন প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকিবেন, যত দিন তিনি ব্রহ্মলাভে কৃতকার্য্য হইতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহাকে সেই যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেই হইবে। অন্যথা তিনি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের মহাপাতকে পতিত হইবেন।

এইরূপ ঘোর প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া ব্রাহ্মণ জীবন-পথে পদার্পণ করেন। কিরূপে তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন করেন? এই প্রতিজ্ঞা পালন জন্য তাঁহাকে চারি আশ্রম-নিয়ম পালন করিতে হয়। ব্রাহ্মণের চারি অবস্থা —উপনীত হইবার পূর্ব্বে তিনি শূদ্র, উপ-নয়ন কালে তিনি দ্বিজ, গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী হইয়া যখন তিনি বেদ পাঠ করেন, তখন এবং সংসারধামে তিনি বিপ্র। প্রাচীন কালে বানপ্রস্থে যখন তিনি মুনি ঋষি-গণের আরণ্য আশ্রমে তাঁহাদিগের নিকট আরণ্যকের এবং ব্রাহ্মণভাগের নিগূঢ় তত্ত্ব উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ্য লাভের উপ-যোগী হইতেন, তখন হইতে তিনি ব্রাহ্মণ এবং যখন সন্ন্যাসাবলম্বন করিয়া তিনি জীবন্মুক্ত হইতেন, তখন দেবতা। এইরূপ দেবত্ব লাভ করিয়া তিনি ব্রহ্মপদ পাইতেন। ব্রহ্মপদ লাভ করিবার জন্য যে ব্রাহ্মণ সৃষ্ট, সেই ব্রহ্মপদ লাভ করিলেই তিনি মুক্ত।

এই ব্রহ্মপদ লাভ করিবার জন্যই ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করি-তেন। ব্রহ্মপদ লাভ করাই যাঁহার জীব-নের উদ্দেশ্য ও মহাব্রত, তিনিই ব্রাহ্মণ। গুরুগৃহে সমগ্র বেদ পাঠ করিয়া তিনি সংসারাশ্রমের জন্য প্রস্তুত হইতেন। এই সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া তিনি বেদের ক্রিয়া-কাণ্ড সমুদায় প্রতিপালন করিতেন এবং যখন তাহাদের প্রকৃত মর্ম্মাবগত হই-তেন, তখন তাঁহার সংসারে বৈরাগ্যোদয় হইত। এই বৈরাগ্যোদয় তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন, এ সংসার মায়াময়। তখন তাঁহার নিকট সমুদায় ক্রিয়া-কাণ্ডের অসা-রতা প্রতিপাদিত হইত। বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের অসারতা জ্ঞান হইলে, তখন তিনি বানপ্রস্থে বেদের ব্রাহ্মণভাগ ও আরণ্যকের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে অধিকারী হইতেন। ব্রহ্মচর্য্যে তাঁহার যে বেদ পাঠ হইয়াছিল, তাহা কেবল পাঠ মাত্র। তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে সেই বেদানুযায়ী আচরণ করিতে হয়। এই আচরণে বেদের তাৎপর্য্যাবগত হওয়া যায়। সংসারাশ্রমের ক্রিয়াকাণ্ড করিয়া যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান ব্রাহ্মণকে আরণ্যক ও ব্রাহ্মণভাগ পাঠের জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয়। বানপ্রস্থে তিনি সেই আরণ্যক ও ব্রাহ্মণের যে তাৎপর্য্য

গ্রহণ করিতে থাকেন, তাহাতে তাঁহার বেদের উপর এক নূতন আলোকপাত হয়। সেই নূতন আলোকে তাঁহার বৈরাগ্য ও ক্রিয়া-কাণ্ডের অসারতা জ্ঞান আরও সুদৃঢ় হইয়া যায়। তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হয়। যখন তাঁহার এইরূপ চৈতন্যোদয় হয়, তখন তিনি উপনিষদ্‌ভাগ এবং বেদান্তদর্শন পাঠের জন্য অধিকারী হয়েন। এরূপ বৈরাগ্য এবং চৈতন্যোদয় না হইলে কেহ বেদান্ত ও বেদান্তদর্শন পাঠের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারেন না। এই বেদান্ত পাঠে যখন তাহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখনই তাহার মায়াজাল কাটিয়া যায়। তখন তিনি প্রকৃত নিত্যবস্তু কি,মায়া কি, ব্রহ্ম কি,—এসমস্ত তত্ত্বজ্ঞানে সম্পন্ন হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয়েন। নহিলে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে প্রতিপালন করা যায় না। নহিলে বেদান্ত ও বেদান্তদর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হওয়া যায় না। এই সন্ন্যাস ধর্ম্মাচারে ব্রাহ্মণ জ্ঞানযোগী। এই জ্ঞান-যোগ সাধন করিয়া তাঁহার সত্য ও ব্রহ্ম লাভ হয়। এই সত্য ও ব্রহ্ম লাভ হয়। এই সত্য ও ব্রহ্ম লাভে তিনি মুক্তি লাভ করেন। এই মুক্তি লাভে তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

তবেই দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মচর্য্যে ব্রাহ্মণের যে বেদশিক্ষা হয়, তদ্‌পরবর্ত্তী আশ্রম-ত্রয়ের সদাচারে তাঁহার প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয়। গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করেন ব্রাহ্মণ কিসের জন্য? সেই বেদকে কার্য্যে প্রতিপন্ন করিবার জন্য। বেদাচার না করিলে, অনুষ্ঠান না করিলে, বেদের প্রকৃত মর্ম্মাবগত হওয়া যায় না।

বৈদিক জ্ঞান কেবল বেদানুষ্ঠান দ্বারাই লাভ করা যায়। এই অনুষ্ঠান দ্বারাই এক এক বেদভাগের প্রকৃত অধিকার জন্মে। ব্রহ্মচর্য্যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানানুশীলন করেন, সংসারাশ্রমে তিনি হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তির অনুশীলন করেন। চিত্ত ও হৃদয়—এতদুভয়ের অনুশীলন না হইলে মানবের পূর্ণতা হয় না। তাই ব্রহ্মচর্য্য ও সংসারাশ্রমের শিক্ষাপ্রণালীই মানবের সম্পূর্ণতা সাধন করে। ব্রহ্মচর্য্যে জ্ঞানের পরিতৃপ্তি এবং সংসারাশ্রমে প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন হয়। কিন্তু উভয় আশ্রমেই সঙ্গে সঙ্গে সংযম শিক্ষা করিতে হয়। এই সংযমের ফল কি? ফল সমস্ত জ্ঞানবৃত্তি ও প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পর নিবৃত্তি ও বৈরাগ্য। বৈরাগ্যোদয় না হইলে, বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রকৃত তত্ত্বগ্রহণ করা যায় না। এই ক্রিয়া-কাণ্ড যে কেবল বৈরাগ্যোৎপাদনের নিমিত্ত, তখন তাহা বুঝা যায়। এই ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা যে বৈরাগ্যোদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। এই রূপ বৈরাগ্যেই চিত্ত হইতে বাসনা সমুদায়ের অবসান হইতে পারে। বাসনার অবসান না হইলে, প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয় না। প্রকৃত বৈরাগ্য না জন্মিলে, প্রকৃত জ্ঞানোদয় না হইলে, কেহ উপনিষদ্-পাঠের জন্য অধিকারী হইতে পারেন না। বেদান্তের অধিকার এইখানে আসিয়া জন্মে। সেই অধিকার বেদান্ত দর্শনের প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে। যিনি অনধিকারী, তিনি বেদান্তদর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে কখনই সক্ষম নহেন।

ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকতা এই চারি আশ্রমের নিয়ম প্রতিপালনে পরিপুষ্টিলাভ করে। ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক পথ এত বিস্তৃত। এই সাত্ত্বিক পথে চিরজীবন বিচরণ করিলে তবে

প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য লাভে সমর্থ হইতে পারা যায়। সাত্ত্বিক পথে থাকিয়া ব্রহ্মণ্য লাভের জন্য ব্রাহ্মণ সৃষ্ট, উপনীত ও ব্রাহ্মচর্য্য ব্রতধারী। এই সাত্ত্বিক পথে বিচরণ করিয়া তিনি কি গুণ সমুদায়ের অধিকারী হন, গীতায় তাহা উক্ত হইয়াছে :—

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়াভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমাধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥"

১৬অ। ১-৩।

"ভগবান্ কহিলেন—হে ভরত; যাঁহারা দেবযোগ্যা সাত্ত্বিকী সম্পৎ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদেরই এই বিংশতিটি দৈবীসম্পৎ জন্মিয়া থাকে।

ভয়রাহিত্য, চিত্তসংশুদ্ধি (সুপ্রসন্নতা) আত্মজ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা, দান (আত্ম) ভোজ্য অন্নাদির যথোচিত সম্বিভাগ) দম, (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম) যজ্ঞ, (অগ্নিহোত্রাদি দেব যজ্ঞাদি) স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন ব্রহ্ম যজ্ঞাদি) তপ, অবক্রতা, অহিংসা (পরপীড়াবর্জ্জন) সত্য, (যথাদৃষ্টার্থ ভাষণ) অক্রোধ, ত্যাগ, (ঔদাস্য) শান্তি, অপৈশুন (অসাক্ষাতে পরদোষ প্রকাশ না করা) সর্ব্বজীবে দয়া, লোভ রাহিত্য, মৃদুতা, কুকার্য্য-প্রবর্ত্তনে লোক লজ্জা, অচপলতা (ব্যর্থ ক্রিয়ারাহিত্য) তেজঃ (প্রগল্‌ভতা)ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, (বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি) অদ্রোহ (জিঘাংসারাহিত্য) ও অনভিমানিতা।"

এই সমস্ত গুণই মোক্ষের হেতু। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণকে এই সমস্ত গুণের অধিকারী হইয়া মোক্ষ-লাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইত। যে ব্রাহ্মণ দৈবীসম্পৎ লাভের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে এত গুণের অধিকারী হইতে হইলে যে সংযমের সহিত জ্ঞানানুশীলনের এবং হৃদয়ের প্রবৃত্তির অনুশীলনের আবশ্যকতা, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। ব্রহ্মচর্য্যের জ্ঞানানুশীলন ব্রতে এবং সংসারাশ্রমের প্রবৃত্তি-অনুশীন কার্য্য মানবের সম্পূর্ণতা সিদ্ধ না হইলে, কখনই এ সমস্ত গুণের অধিকারী হওয়া যায় না। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা এই গুণ সমুদায়ের প্রকৃতপক্ষে অধিকারী হইয়া গিয়াছিলেন। তাই, আমাদের শাস্ত্রে এত মুনি-ঋষি-চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। এক আধ জন নয়, সহস্র সহস্র মুনি ঋষিগণের পবিত্র চরিত্র আমাদিগের পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাস, বাল্মীকির জীবন-চরিত উচ্চৈঃস্বরে ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক জীবনের উপদেশ দিতেছে। এই দৈবী সম্পৎলাভ কেবল মুখের কথা নহে, কেবল শাস্ত্রবচন নহে, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে অর্জ্জনীয় এবং তাহা যে ব্রাহ্মণেরা প্রকৃতপক্ষে লাভ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদিগের জীবন-চরিত পাঠে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হয়।

ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত গুণসম্পন্ন হইয়া তবে প্রকৃত জ্ঞান-লাভের উপায়াবলম্বী হইতে পারিতেন। প্রকৃত জ্ঞান-লাভের উপায় কি কি, গীতা তাহা বলিতেছেন ;—

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এবচ।
জন্মমৃত্যু জরাব্যাধিদুঃখ দোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥"

১৩অ। ৭-১১।

"আত্মশ্লাঘা-রাহিত্য,অদাম্ভিকতা,অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, সদ্‌গুরুসেবা, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, স্থৈর্য্য, শারীর-সংযম, ইন্দ্রিয় বিষয়ে (রূপরসাদিতে) বৈরাগ্য, অহঙ্কারত্যাগ, জন্ম মৃত্যু-জরা-ব্যাধিতে দুঃখ-দোষ-অনুদর্শন (জন্মাদি যে সকল দুঃখের কারণ, ইহাই পুনঃ পুনঃ আলোচনা) স্ত্রী পুত্রাদিতে অনাসক্তি এবং তাহাদের সুখ দুঃখে আপনাকে সুখী ও দুঃখী মনে না করা, ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সমচিত্ততা, আমাতে (অর্থাৎ ঈশ্বরে) অনন্যযোগে (কায়মনোবাক্যে এবং সর্ব্বাত্মদৃষ্টিতে) একান্ত ভক্তি, চিত্ত-প্রসাদ-জনক স্থানে বাস,জন-সমাজে অপ্রীতি আত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠা, এবঞ্চ মোক্ষদর্শন অর্থাৎ মোক্ষই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহারই আলোচনা, এই বিংশতি সংখ্যক জ্ঞান-সাধন বিষয়কে বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ জ্ঞান বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন।„

জ্ঞানলাভের পক্ষে এই সমস্তই যে প্রকৃত পন্থা, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন-ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ একদা ধর্ম্মের উচ্চশিখরে উঠিয়া যে পরম জ্ঞানের অধিকারী হইতেন,তাহা এই বশিষ্ঠাদির উপদেশে প্রতীত হয়। তাহা শাস্ত্রের অলীক কথা নহে, কাব্যের আদর্শ নহে,সেই মহাদর্শ ঋষিগণ প্রকৃত-পক্ষে উঠিয়া তবে উচ্চৈঃস্বরে তাহা জগন্ময় ঘোষিত করিয়া গিয়াছেন। এ ঘোষণা কিসের জন্য ? অন্যকে পথ দেখাইবার জন্য। সেই পথে বিচরণ করিয়া তৎপরে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ মুক্তিলাভের যোগ্য হইয়া গিয়াছেন। আজিও যে নির্জন দেশে কত যোগী ঋষি এই উপায় অবলম্বন করিয়া জ্ঞানযোগ সাধন করিতেছেন,তাহা কে বলিতে পারে ?

একেই বলে ব্রাহ্মণ্য-লাভ। এই ব্রাহ্মণ্য লাভ কেবল মুখের কথা নয়। এ যোগসাধনা এতগুণের আধার হওয়া বড় কম কথা নয়। যোগসাধনা কি ? মহাভারত বলিয়াছেন—

"রজ ও তমোগুণ নাশক অনুষ্ঠানই যোগ। এই রূপ যোগসাধনা দ্বারা ব্রাহ্মণ রজ ও তমোগুণ নাশে সিদ্ধ হইয়া সত্ত্বগুণের প্রাবল্য সাধন করিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। মুনিঋষিগণ প্রকৃতপক্ষে অনেক সাধনা দ্বারাএই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া গিয়াছিলেন।"

কোথায় আমরা ঘোর পাপ সংসারের পঙ্কে নিমজ্জিত রহিয়াছি, কোথায় ব্রাহ্মণের স্বর্গীয় দেবোপম,পবিত্র ব্রাহ্মণ্য। এই ব্রাহ্মণ্য লাভার্থ ব্রাহ্মণের উপনয়ন এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রত-ধারণ।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি, সর্ব্বসমাজেই সাত্ত্বিক গুণ-বিশিষ্ট লোক ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইবার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু উপযুক্ত পাত্র হইলে কি হইবে ? আর্য্যকুলে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া উপনীত হইলে যে সাত্ত্বিকতার পরিপুষ্টি সাধন করিতেন, অপর সমাজের সাত্ত্বিকলোক সে উপায়-বিরহিত। এই স্থলে আর্য্যকুলের ব্রাহ্মণ হইতে অপর সমাজের ব্রাহ্মণসমুচিত গুণসম্পন্ন-ব্যক্তির বিভিন্নতা। আর্য্যকুলের ব্রাহ্মণ সাত্ত্বিক সংস্কার সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী, অপর সমাজে লোক ব্রাহ্মণ-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির গর্ভে বা ঔরসে জন্মলাভ করিলেও এরূপ ব্রত-ধারণ-বিরহে তাঁহার ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবার কোন উপায় নাই। এই রূপ সংযম ব্রত ধারণ করিয়া আর্য্যকুলে ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন। সেই যজ্ঞোপবীত তাঁহার প্রধান চিহ্ন। এই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বজাতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। সুতরাং তাহা

হইতেই জাতিভেদের উৎপত্তি হয়। কারণ তিনি আর সকল লোক হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এক ভিন্ন জাতীয় হইয়া দাঁড়াইলেন। এক শ্রেণীর বিভাগ ও বিভিন্নতা ঘটিলে, সমাজে অপরাপর শ্রেণীর বিভাগ আপনা-আপনিই ঘটিয়া আইসে। বেহেতু এই ব্রাহ্মণ বর্ণের অধঃপতনে অপর বর্ণের উৎপত্তি হয়। মহাভারতও সেই কথা বলিয়াছেন ঃ—

"মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগ-প্রিয়,ক্রোধ-পরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব, যাঁহারা রজ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমোগুণ-প্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ "কার্য্য" দ্বারাই পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন।' শান্তিপর্ব্ব। ১৮৮ অধ্যায়।

যেরূপে এক বর্ণ হইতে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপে আবার প্রতি বর্ণ মধ্যে নানা উপবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। যখন এই সমস্ত উপবিভাগ হইয়াছে, তখনই সমাজ মধ্যে জাতিভেদ হইয়া গিয়াছে। এই উপবিভাগ যখন প্রতি বর্ণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে,তখন সমস্ত উপবিভাগ জাতি নামে বাচ্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণজাতি মধ্যেও নানা উপবিভাগের উৎপত্তি হইয়া এক এক শ্রেণী বিভাগ হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষত্রিয়বর্ণ অসিজীবী এবং মসিজীবী-রূপে দুই উপবিভাগে পরিণত হইয়া Mliltary এবং Civil শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা বরাবর অসিজীবী ছিলেন, তাহারাই প্রকৃত ক্ষত্রিয় নামের উপযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারাই ক্ষত্রিয় নামে প্রথিত হইয়া পড়িলেন। মসিজীবিগণ ক্রমে মৃদুস্বভাব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। তখন ক্ষত্রিয়গণও আর তাহাদিগকে নিজ জাতিমধ্যে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। যাহারা তত নিস্তেজ ও মৃদুস্বভাব হইয়া পড়িলেন, তাহাদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ সুতরাং এক স্বতন্ত্র জাতি হইয়া পড়িলেন। অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ নিজ স্বভাব দোষে ক্ষত্রিয় জাতি হইতে কাজেই পতিত হইয়া এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইলে সম্ভবতঃ এই জাতিই কায়স্থ নামে প্রথিত হইলেন। তাহাদের করণ-কারণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। অনেকে অনুমান করেন, এই ধর্ম্মভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়গণই শাস্ত্রোক্ত করণ জাতি।

যে কর্ম্মবিভাগ এক ব্রাহ্মণ বর্ণকে চারি বর্ণে পরিণত করিয়াছে, সেই কর্ম্মবিভাগই প্রতি বর্ণ মধ্যে নানা জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। তাই বৈশ্যগণ নানা জাতিতে ক্রমে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কর্ম্ম ও ব্যবসায়ই এই সমস্ত উপবিভাগের কারণ। সেই কর্ম্ম ও ব্যবসায় শূদ্রবর্ণকে শেষে অসংখ্য জাতিতে পরিণত করিয়াছে। এই জাতি সমস্ত ক্রমে বংশ পরম্পরাগত হইয়া পড়িয়াছে। কেন হইয়াছে, একজন সুবিজ্ঞ ইংরাজী ঐতিহাসিক তাহার কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন—

"The regulations of Indian policy, with respect to the different orders of men, must necessarily, at sometimes, check genius in its career, and confine to the functions of an inferior caste talents fitted to shine in a higher sphere. But the arrangements of civil government are made, not for what is extraordinary, but for what is common; not for the few, but for the many. The object of the first Indian legislators was to employ the most effectual means of providing for the subsistence, the security, and happi-

nes of all the members of the community over which they presided. With this view they set apart certain races of men for each of the various peofessions and arts necessary in a well-ordered society, and appointed the exercise of them to be transmitted from father to son in succession. This system, though extremely repugnant to the ideas which we, by being placed in a very different state of society, have formed, will be found, upon attentive inspection, better adapted to attain the end in view, than a careless observer at first-sight is apt to imagine. The human mind bends to the law of necessity, and is accustomed not only to accommodate itself to the restraints which the condition of its nature or the institutions of its country impose, but to acquiese in them. From his entrance into life, an Indian knows the station allotted to him, and the functions to which he is distined by his birth. The objects which relate to these are the first that present themselves to his view. They occupy his thoughts or emply his his hand; and from his earliest years, he is trained to the habit of doing with ease and pleasure that which he must continue through life to do. To this may be ascribed that high degree of perfection conspicuous in many of the Indian manufactures; and though veneration for the practices of their ancestors may check the spirit of invention, yet, by adhering to these, they acquire such an expertness and delicacy of hand, that Europeans, with all the advatages of superior science, and the aid of more complete instruments, have never been able to equal the exquisite execution of their workmanship. While this high improvement of their more curious manufactures excited the admiration and attracted the commerce of other nations, the seperation of professions in India, and the early distribution of the people into classes, attached to particular kinds of labour, secured such abundance of of the more common and useful commodities, as not only supplied their own wants, but ministered to those of the countries around them."

Appendx to an Historical Disquisition concerning the Knowledge which the Ancients had of India—by

W. Robertson. D. D.

হিন্দুজাতিভেদের উপকারিতা সম্বন্ধে একজন বিলাতী প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা কি বলিলেন দেখুন। তিনি বলিলেন:—

"ভারতবর্ষীয় সামাজিক জাতিভেদের ব্যবস্থা-নিবন্ধন কখন কখন কোন প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারিত না বটে, কখন কখন নীচকুলে এমত লোকও জন্মগ্রহণ করিত, যিনি হয় ত কোন উচ্চকুলের গৌরব সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারিতেন বটে। কিন্তু দেশের সমাজিক রাজব্যবস্থা লোক বিশেষের ক্ষতি-বৃদ্ধির নিমিত্ত নহে। রাজনীতি-জ্ঞেরা যে ব্যবস্থা স্থাপন করেন, তাহা সাধারণ হিতের নিমিত্ত, এক আধ জন অসাধারণ ব্যক্তি বিশেষের নিমিত্ত নহে। ভারতবর্ষীয় রাজব্যবস্থারও এই রূপ উদ্দেশ্য ছিল। সমাজস্থ সর্ব্ব-সাধারণের যাহাতে ভরণ পোষণ, জীবিকা নির্ব্বাহ, জাতিকুল ও ধনমান রক্ষা এবং সর্ব্ববিধায়ে সুখ-বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বিধান করাই সেই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল। তাই, তত্রস্থ সমাজ, শিল্প, ব্যবসা ও কর্ম্ম-বিভাগানুসারে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল এবং সেই জাতিবিভাগ পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে বংশপরম্পরাগত হইয়াছিল। বিলাতী সমাজের বিভিন্ন ব্যবস্থা-নিবন্ধন, সেই ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মতামত তদনুকূল না হইতে পারে, কিন্তু বিদেশীর চক্ষে সহসা সে ব্যবস্থা ভাল না লাগিলেও বিচার করিয়া তাহার গুণাগুণ পর্য্যালোচনা করিলে তাহাতে তত দোষ দৃষ্ট হইবে না। মানুষ দুরতিক্রমণীয় ভবিতব্যতার দাস, কালক্রমে অভ্যাস বশতঃ সেই দাসত্ব সে অক্লেশে বহন করিয়া আইসে। ভারতে সকলেই নিজ নিজ জাতীয় ধর্ম্ম ও কর্ম্ম আশৈশব জানিয়া থাকে। সকলেই জানে, তাহাকে কি কাজ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। সুতরাং যাহাকে যাহা করিতেই হইবে, তাহা সে আশৈশব শিক্ষা করে এবং অভ্যাসবশতঃ অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া যায়। স্বধর্ম্ম এবং স্বজাতীয় ব্যবসা ও কার্য্য সবাই আনন্দ সহকারে সুসম্পন্ন করিয়া থাকে। এই জন্য, ভারতীয় দ্রব্যাদির শিল্প নৈপুণ্য একেবারে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পিতৃ পিতামহ যে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সে কার্য্যের সম্মান রক্ষার্থ হয়ত ভারতীয় শিল্পী নিজ কার্য্যের উন্নতি সাধনে তত তৎপর না হইতে পারে, কিন্তু চিরদিন এক কাজ করিয়া আসিতেছে বলিয়া সেই কার্য্য তাহার এত সহজ হইয়া আইসে, তাহার সূক্ষ্ম কারু কর্ম্মে অভ্যাস বশতঃ তাহার এত দক্ষতা হয়, হাত চলে যে, সে সূক্ষ্ম শিল্প নৈপুণ্যের কাছে আজি বৈজ্ঞানিক ইউরোপীয় শিল্পী তাহার বিজ্ঞানের সহায়তা এবং সম্পূর্ণ কল কাটরা লইয়াও পরাভব স্বীকার করিতেছেন। আজি ইউরোপীয় কল-কৌশলে মোটা কাজের সামান্য সামান্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম শিল্প কার্য্যে ভারত-গৌরব আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এককালে ভারতবর্ষের শিল্পিগণের হস্তজাত দ্রব্যাদি সহজে এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত যে, তদ্দ্বারা সুধু যে ভারতীয় শিল্পিগণ স্বদেশের অভাব মোচন করিত, এমত নহে, তাহাতে চারি পার্শ্বস্থ দেশ সমূহেরও অভাব উন্মোচিত হইয়াছিল।"

ডাক্তার রবার্টসন যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমুদায় কথাই অতীব যুক্তিযুক্ত। তিনি একজন বিদেশী হইয়া আমাদের জাতিভেদের উপকারিতা এত বিশদরূপে বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার সদুপদেশ লাভ করিয়া অনেক স্বদেশীয় ইংরাজীশিক্ষিত লোকের কুসংস্কার দূরীভূত হইবে। আমাদের সমাজস্থ জাতিভেদ-প্রথা সম্বন্ধে এক জন উদারচেতা, বিচক্ষণ সুবিজ্ঞ ইংরাজী লেখকের কথার ফল অধিকতর বলিয়াই আমরা ডাক্তার রবার্টসনের উপর আর কোন কথা বলিতে চাহি না।

সৃষ্টির আদিকালে একই ব্রাহ্মণজাতি হইতে কেমন নানা জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। গুণ ও কর্ম্মবিভাগ দ্বারাই এই জাতি সমূহ সহজেই সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

খ্রীষ্টীয়ান ও চীনবিভ্রাট।

যীশুখ্রীষ্টকে ত্রাতা বলিয়া গ্রহণ না করিলে মানবের মুক্তি নাই, খ্রীষ্টিয়ানদের এইরূপ বিশ্বাস। এবং তাঁহাদের আরও বিশ্বাস যে, সর্ব্বত্র মুক্তি-মন্ত্র প্রচার করাই পরম ধর্ম্ম। যাঁহারা যথার্থ খ্রীষ্টভক্ত, তাঁহারা যদি এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দেশে বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তত্তৎদেশে ধর্ম্মপ্রচারের ফলে যতই অনিষ্টপাত হউক না কেন, প্রচারকদিগকে দোষ দিতে পারা যায় না।

খ্রীষ্টিয়ানদিগের মুক্তি জিনিসটা কি, তাহা কখনও বুঝিতে পারি নাই; অথবা যতটা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, কখনও সেই অপরিজ্ঞাত বস্তু কি, তাহা বুঝিতে পারিব না। ধন, মান বা স্বাস্থ্য লাভে মুক্তি নাই; জ্ঞানলাভে বা সৌন্দর্য্য অনুভূতিতেও মুক্তি নাই; আর্জ্জব, সত্যবাদীত্ব, ইন্দ্রিয় সংযম, লোকহিতৈষণা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতির বিকাশে মুক্তি নাই; এক হউন বা একাধিক হউন, জগৎকর্ত্তাতে বিশ্বাস এবং ভক্তিতেও এই অপরিজ্ঞাত পদার্থ লাভ হয় না; বাসনা পরিশূন্য অজ্ঞেয় আত্মা নামক পদার্থের অস্তিত্ব এবং অমরত্বে বিশ্বাস থাকিলেও এই রহস্যময় মুক্তিলাভের পথ পরিষ্কার হয় না। কি জানি সেই "নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ" কি, যাহা একমাত্র যীশুর নামে মস্তক অবনত করিলেই লাভ হয়! সে জিনিস যাহাই হউক, তাহা দান করাই যখন পরম ধর্ম্ম, তখন পাদরীদিগের কর্ম্মক্ষেত্র জগৎব্যাপী।

যতদেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং যেখানে

যেখানে ইউরোপীয় বাণিজ্য প্রসারিত হইতেছে, সে সর্ব্বত্রই পাদরীগণ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য উপস্থিত হইতেছেন। ইহার পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক ফল যাহাই থাকুক, সাংসারিক ফল তেমন সুখপ্রদ বা মঙ্গলজনক হইতেছে না। প্রথমে, বাণিজ্য আরম্ভ; দ্বিতীয়ে মিসনরির আবির্ভাব; তৃতীয়ে ধর্ম্ম প্রচার জনিত বিদ্বেষের ফলে বিবাদ বিসম্বাদ; চতুর্থ অবস্থায় বিবাদ প্রসমনের নামে দেশ জয়। আমাদের মুখে এই কারণ নির্দ্দেশগুলি বড় শোভা পায় না, বিশেষতঃ এ বিষয়ে আমরা বহুজ্ঞ নহি বলিয়া মিসনরিগণ আপত্তি তুলিতে পারেন। কিন্তু কথাগুলি যে সত্য, তাহা ইউরোপীয় লেখকদিগের দ্বারাই প্রমাণিত করা যাইতে পারে। চীন দেশের যুদ্ধে, একথা পার্লামেণ্টে পর্য্যন্ত অংশতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। এবং চীনদেশের উপদ্রবের বহু পূর্ব্বে ইংরাজ দার্শনিক হর্বর্ট স্পেন্সার তাঁহার সমাজ-বিকাশ তত্ত্বগ্রন্থের ২য় ভাগে এ সকল কথা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যেখানে ধর্ম্মপ্রচারের ফলে এই প্রকার শোচনীয় ফল; আধ্যাত্মিক শান্তি স্থাপনার নামে এই প্রকার জীবনব্যাপী অশান্তির সৃষ্টি; অনন্ত জীবন লাভের নামে অনন্ত দাসত্ব; সেখানে যে সাধারণ শ্রেণীর লোক এই ধর্ম্মপ্রচারকে ছলনা ও ভাণ মাত্র বুঝিয়া ভীত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? মিসনরীগণ যে পবিত্রতায় "ঘুঘু" এবং সরলতায় "মেড়া" একথা "আমরা না হয় বুঝ্‌তে পারি, খোট্টা-লোকে তা বোঝে না।" তাহারা ভাবে, যে, এ যে "প্রতাপাগ্রে ততঃ শব্দঃ, পরাগস্তদনন্তরং" ইত্যাদি।

সম্প্রতি মিসনরিদিগের পক্ষপাতী এক জন পার্লেমেণ্টের সভ্য, চীনদেশের উপদ্রব উপলক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ঃ—

"অখ্রীষ্টিয়ান এবং বর্ব্বর দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের আমি পক্ষপাতী; ইহা দ্বারা ইউরোপীয় সমুন্নত সভ্যতা, বিদেশ মধ্যে বিস্তৃত হইয়া লোকের অশেষ হিত সাধিত হয়। যদি ও এই প্রচার দ্বারা প্রথমতঃ অশান্তি উৎপাদিত হয়, তথাপি ভবিষ্যৎ ফলের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ অশান্তিকে অমঙ্গলকর বলা যায় না। চীনদেশের উপস্থিত যুদ্ধ-বিগ্রহাদির মূলে যে মিসনরিদিগের ধর্ম্মপ্রচার, তাহা নিঃসন্দেহ। চীনদেশীয় লোকেরা অখ্রীষ্টিয়ান বলিয়া কৃপাপাত্র; কিন্তু ইহারা বর্ব্বর নহে। চীনদেশীয় সভ্যতা এবং ইউরোপীয় সভ্যতায় এতটা মৌলিক প্রভেদ, যে একের উচ্ছেদ সাধন ব্যতিরেকে অন্যটী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। সভ্যতা বলিতে গেলে দেশের সমগ্র আচার ব্যবহার, পারিবারিক ও সামাজিক রীতি, শাসন এবং ব্যবস্থা প্রণালী বুঝিতে হয়। কাজেই চীনদেশে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে সম্পূর্ণরূপ চীনদেশীয় জাতীয় জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হয়। যেখানে যেখানে লোকে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেখানেই আর জাতীয়ত্ব নাই। ইহা দেখিলে দেশের লোক অবশ্যই ভীত হইবে এবং বিদেশীয় সংস্পর্শ বিষবৎ প্রত্যাখ্যান করিবে। এই কারণেই চীনদেশের লোক ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে এতটা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আমি অখ্রীষ্টিয়ানদিগের পক্ষপাতী হইলেও এই বিষময় ফল দেখিয়া চীনদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের অনুকূলতায় কোন কথা কহিতে পারি না।"

উল্লিখিত কথাগুলি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। প্রথম কথা, যেখানে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, সেইখানে ইউরোপীয় সভ্যতা জাঁকিয়া বসে; এবং নবদীক্ষিতেরা জাতীয়ত্ব হারাইয়া স্বদেশদ্রোহী হয়। প্রাচীন ইতিহাসে এবং একালের ঘটনায় ইহার ভূর ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম যখন যীশুর মরণান্তে প্রথম প্রচারিত হয়, তখন ধর্ম্মটা

য়াহুদী ভাবময় ছিল। কিন্তু পরে যখন এই ধর্ম্ম মিসর এবং রোমদেশে লালিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইল, তখন য়ীহুদীয় ভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছিল বলিয়াই তত্তৎদেশে ইহার পরিবর্দ্ধন সম্ভবপর হইয়াছিল। কেবল য়ীহুদীভাব পরিহার করিয়াছিল তাহাই নয়, মিসরীয়, গ্রীসীয় এবং রোমক প্রাচীন ধর্ম্মই খ্রীষ্টিয়ানির নামে খাড়া করা হইয়াছিল। শিশু হোরস্ (Horas) ক্রোড়ে আইসিস্ দেবী (Isis)। বালক যীশু ক্রোড়ে মাদোনারূপে আবির্ভূতা হইলেন; ঈশ্বরের একটা "মা" পাইয়া দেশের লোকের ডায়েনা পূজা করিবার সাধ মিটিল। মিসরীয় ত্রিত্ববাদ, নব ট্রিনিটিরূপে আবির্ভূত হইল। প্রাচীন গ্রীকদিগের ওলিম্পস্ Olympus বজায় রহিয়া গেল, কেবল দেবতাগুলির নাম পরিবর্ত্তিত হইল মাত্র। যে কারণে রোম ও গ্রীস্ প্রভৃতি দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইল, সেই কারণে য়ীহুদা দেশে ইহার বিস্তার লাভ সম্ভবপর হইল না। আরবাদি দেশে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া যখন জাতীয়ত্ব ধ্বংস করিতে বসিল, তখন মহম্মদের আবির্ভাবে খ্রীষ্টিয়ানী পরিহার এবং জাতীয়ত্ব রক্ষা সাধিত হইল। ইউরোপের উত্তরাংশের বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে না ছিল সমাজ, না ছিল ধর্ম্ম এবং না ছিল ঐতিহাসিক স্মৃতি; কাজেই সেই সেই দেশে বিনা বাক্য ব্যয়ে ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল; এবং পরে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মিসরীয়, রোমক এবং গ্রীসীয় দেবতাবাদ, পরিত্যক্ত হইয়া,সেই সেই দেশেই প্রোটেষ্টাণ্ট ভাব বর্দ্ধিত হইতে পারিয়াছিল। লাটিনীয় জাতির অধীনতা পাশে ইংলণ্ড যাহাতে বাঁধা না পড়ে, সেই ভয়ে ইংরাজ ব্যস্ত ছিল; এবং সেই জন্যই পোপ পরিহার করিয়া দেশের লোক প্রোটেষ্টাণ্ট হইল। এ সকল স্থলেই ধর্ম্ম রক্ষার অর্থ জাতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতা রক্ষা। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে যে কেবল একটা মত পরিবর্ত্তন মাত্র হয়, তাহা নয়; যে দেশ হইতে আসিয়া জিনিসটা প্রচারিত হয়, সেই দেশীয় ভাবও তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ দেশে ইহার দৃষ্টান্ত এত অধিক যে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজনীয়। যে কারণে আরবে মহম্মদের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই কারণেই এ দেশের রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। অবশ্য তাঁহার পরবর্ত্তীয়েরা খ্রীষ্টিয়ানীয় ছাঁচে ধর্ম্ম গড়িয়া লইয়া এখন আপনারা খ্রীষ্টিয়ান কি না, বুঝিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার ধর্ম্মে ইহার কিছুই ছিল না; অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই প্রচারিত হইয়াছিল। জাতীয়ত্বের বিনাশ যখন দেশের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ, তখন সূক্ষ্ম পরকাল ভাবিয়া, এত বড় ইহকালটা কোন্ মূর্খ জলাঞ্জলি দিতে পারে? এই জন্যই স্বতঃই সাধারণ লোকেরা বিদেশীয় ধর্ম্মের নাম শুনিলেও চমকিয়া উঠে। ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে জাতিকুল বজায় রাখিয়া রোমাণ কাথলিকগণ দেশীয় লোকের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা জানি; কিন্তু তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই জাতীয়ত্ব সংহার করিয়া খ্রীষ্টিয়ানেরা স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, খ্রীষ্টিয়ানীর সঙ্গে যে প্রকারের ইউরোপীয় সভ্যতা উদয় হয়, সে জিনিসটা কি? খ্রীষ্টিয়ানীর জ্ঞান কাণ্ডভাগ সম্পূর্ণরূপে গ্রীসদেশীয় দর্শন শাস্ত্র হইতে সমুদ্ভূত। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন

যে, ভারতীয় বেদান্ত হইতে এই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি। সে কথা না মানিলেও, এই উভয় দেশের দার্শনিক তত্ত্বে যে কিছু বিরোধ নাই, তাহা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। অপিচ, বৌদ্ধ ধর্ম্ম,বেদান্তেরই ব্যাখ্যা এবং চীন দেশের ধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্তেরই ছায়া। এরূপ স্থলে চীনদেশে যদি খ্রীষ্টিয়ানীয় জ্ঞানকাণ্ডটার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র আবির্ভূত হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? এ কালের দর্শন বিজ্ঞানত সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের বিরোধী। কোথাও সভ্যতা বিস্তারের নামে খ্রীষ্টিয়ানগণ তাহার প্রচার করেন, তাহা দেখা যায় না। বরং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রথম আবির্ভাব কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ইহাই দেখিয়া আসিয়াছি যে, এই ধর্ম্মবিজ্ঞান বিস্তারের চিরবিরোধী। আজ কাল ইউরোপে যে জ্ঞান মাহাত্ম্য দেখিতেছি, তাহা খ্রীষ্টিয়ানী ধর্ম্ম সমুদ্ভূত নহে। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের উৎপত্তির বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে, ভারতে, মিসরে, গ্রীসে, রোমে এবং সারাসানদিগের মধ্যে যাহা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইতেছিল, তাহাই একালের ইউরোপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ানের দল, এই জ্ঞানচর্চ্চা তিরোহিত করিবার জন্য কত প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কত লোক হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইতে পারেন নাই। কাজেই সভ্যতার নামে ইউরোপীয় জ্ঞান দেখিয়া যে ভারতীয় বা চীনদেশীয় লোক ভীত, ইহা ত বুঝিতে পারি না। বরং যে দেশে জ্ঞানই মুক্তি বলিয়া আদৃত এবং মুক্তির নামে যে দেশে অপরিজ্ঞাত অবস্থা স্বীকার করে না, সে দেশে ত জ্ঞানের কথা উপেক্ষিত হইবার নহে।

যদি জ্ঞান প্রচারে নহে, তবে ইউরোপীয় সভ্যতা কি ভাবে আসিয়া দেখা দেয়? বাইবেল প্রচারের প্রথম শিক্ষা এই যে,ভারত বা চীন দেশে যাহা কিছু প্রাচীন, সকলই মন্দ; যাহা কিছু আচার ব্যবহার সকলই দোষযুক্ত। কারণ, এই সকল দেশ যীহোবা বা গড্ নামক ঈশ্বরের পদার্পণ বঞ্চিত, এবং শয়তান শাসিত। জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদিগের ধূতি চাদর হইতে ব্রহ্মবিদ্যা পর্য্যন্ত এমন কি আছে, খ্রীষ্টিয়ানেরা যাহার পক্ষপাতী? ধূতি এমনই অপবিত্র যে, ইহা পরিয়া মেম দর্শন করিলে কোন এক পক্ষকে নিরয়গামী হইতে হয়; ব্রহ্মবিদ্যার নাম করিলেও খ্রীষ্টিয়ানের নরক মুখব্যাদান করে। আমরা মদ্য স্পর্শ করি না, সেটা কুসংস্কারের ফলে। কাজেই মদ্যপানের নিষেধ আজ্ঞা আজ কাল কেহ কেহ প্রচার করিলেও, এতৎ সম্পর্কীয় কুসংস্কারটুকু ভাঙ্গিতে কেহ ছাড়েন না। ইহাতে ইউরোপীয় সভ্যতা যে আকারে বর্দ্ধিত হয়, আমি তাহার ভৌতিক চিত্র অঙ্কিত করিতে অসমর্থ। এই প্রকার কুসংস্কার ধ্বংশে, যে সভ্যতা বিকশিত হয়, তাহা অনুপযোগী পরিচ্ছদে অস্বাস্থকর আহার পানে, এবং অসংযমতাময় "বল্ নৃত্যে" পরিসমাপ্ত হয়। এই সভ্যতায় স্বদেশীয় সকল অবস্থার প্রতি বিদ্বেষ ঘৃণা জন্মে।

খ্রীষ্টিয়ান না হইয়াও যাহারা বিলাতি আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান, তাঁহারা সর্ব্বদা স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশের কুকুর লইয়া যত্ন করিতেছেন। শরীরের রং বদলান সম্ভবপর হয় না; কিন্তু পোষাক পরিবর্ত্তন অতি সহজ। ইহাতে ফল এই হয় যে, ভাল দেশীয় পরিচ্ছদ পরিবৃত দেখিলে

লোকে মনে করিত যে, ইনি দেশীয় ভদ্র লোক; আর কৃষ্ণ দেহে বিলাতি পরিচ্ছদ দেখিলে লোকে ভাবে, ইনি ট্যাঁস ফিরিঙ্গি। সেই ট্যাঁসফিরিঙ্গি হইতে পারিলেও বিলাতি আদর্শপ্রিয় ভদ্রলোকগণ সন্তুষ্ট। বড় অথবা সভ্য সাহেবেরা কিছু দেশীয় লোকদিগের সহিত মিলিতে মিশিতে চায় না; অথবা কবির বচনই সত্য যে:—

যতই বলুন, যতই শিখুন, তাদের চলন চাল,
ইংরাজেরা ভোলেনা তায় হায়রে কলিকাল।

এরূপ অবস্থায় ইংরাজের সহিত মিশিবার সুখটা নীচ জাতীয় ফিরিঙ্গির সহিত মিশিয়া মিটাইতে হয়। মধু অভাবে গুড় না চালাইলে চলে কই? এটিকেট এবং ইংরাজী চাল দেখাইবার জন্য অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত, এবং নীচ চরিত্র ফিরিঙ্গির দল নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আনিয়া গৃহ পবিত্র করিতে হয়। তথাপি ধূতি পরা সচ্চরিত্র দেশীয় লোকের সহিত সংশ্রব রাখা অন্যায় বলিয়া ভাবা হয়। এই সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গুপ্ত কবি বলিয়াছেন যে, "কোনরূপে পিত্তি রক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে।" এ সকল দেখিয়া শুনিয়া দেশের লোকে কেনই না মনে করিবে যে, ফিরিঙ্গিয়ানায় দেশের অধোগতি উপস্থিত হয়?

এই জন্যই বিদেশীয় সম্পর্কে দেশের লোক শিহরিয়া উঠে। একদিকে যেমন খ্রীষ্টিয়ানের গোঁড়ামির দিকে চাহিয়া দেখিলে মানিতে হয় যে, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহারা যাহা করেন, তাহাতে তাঁহাদের দোষ নাই। অন্যদিকে দেশীয় লোকও যে তাঁহাদের বিদ্রোহী হইয়া উপদ্রব উপস্থিত করে, তাহাও তাহাদের মূর্খতাময় ক্ষুদ্রবুদ্ধির হিসাবে ন্যায্য বলিয়া প্রতীত হয়। এরূপ স্থলে চীন দেশ হইতে পাদরী বিদায় করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বথা মঙ্গলকর বলিয়া মনে হইতেছে। চীন দেশীয়েরা পরলোকে নরকভোগ করিবে কি না, ইহা অপেক্ষা ইহলোকে তাহাদের সুখ শান্তি কিসে বর্দ্ধিত হয়, সে বিষয়ের চিন্তা ও চেষ্টাই অধিক প্রার্থনীয়। চীনদেশের ভিটায় পবিত্র আত্মার "ঘুঘু" চরাইবার জন্য মহম্মদের তরোয়ালের উপর কামান ও অগ্নি যোগ না করিয়া, যাহাতে ইংরাজের বাণিজ্য ও ক্ষমতা সে দেশে সদ্ভাবের সহিত পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহারই চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। রাজনীতি যখন ইহলোক লইয়া, তখন পারলৌকিক তত্ত্বের একটু অবমাননা হইলে ক্ষতি কি? ইংরাজ জাতি যে প্রকার রাজনীতি কুশলী,তাহাতে মনে হয় না যে, এই বিদ্রোহ থামিয়া গেলে জর্ম্মান বা রুষিয়ার মত ইংরাজ এ দেশের উপর দাদ্ তুলিতে চেষ্টা করিবেন, অথবা পাদরী-হুজুগ বজায় রাখিয়া আপনার সৌভাগ্য বিস্মৃত হইবেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (১৯)

এই প্রবন্ধের বিগত তিন সংখ্যায় আমরা যাহা দেখাইয়া আসিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠক বেদান্তের মায়াবাদের প্রকৃত মর্ম্ম ও তাহার সহিত সাংখ্যমতের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছেন। তথাপি আমরা তৎসম্বন্ধে আরো কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া শ্রুত্যুক্ত "অধ্যাত্মযোগের" কথা বলিব। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম বাস্তবিক পক্ষে নির্গুণ,

নিষ্ক্রিয়, অচিন্ত্য ও কার্য্যকারণাতীত। এরূপ অবস্থায় ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় ব্রহ্ম কেবলমাত্র, সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ। অথবা সৎচিৎ-আনন্দ স্বরূপ। কিন্তু ব্রহ্মের এই জ্ঞান আমাদের মত দ্বৈত গ্রাহী নহে। এই জ্ঞান বিশুদ্ধজ্ঞান (mass of cognition)। শঙ্করাচার্য্য বলেন, বিশেষ বিশেষ জ্ঞানমাত্রেই অন্তঃকরণের বৃত্তি। অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি,—ইচ্ছা, দ্বেষ, কামনা, ভয়, ক্রোধ ও সুখদুঃখাদিরূপে দেখা দেয়। মানবীয় জ্ঞানের অবস্থাই এইরূপ; ইহা দ্বৈতালিঙ্গিত এবং নানাবিধ বৃত্তি (modification) বিশিষ্ট। ব্রহ্মের জ্ঞান এরূপ নহে। ব্রহ্মের জ্ঞানের একমাত্র অবস্থা; এ জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন আকার নাই। ইচ্ছাদ্বেষাদি বিশেষ বিশেষ জ্ঞানগুলি,—সেই একমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বুদ্ধির ইচ্ছাদ্বেষাদি বৃত্তিগুলি বাস্তবিক পক্ষে অচেতন। ইহারা ব্রহ্মের সেই চিৎসত্ত্ব বা নির্ম্মল একরসাত্মক জ্ঞানালোক দ্বারা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় বলিয়া উহাদিগকে আমরা ইচ্ছা দ্বেষাদি রূপে বুঝিতে পারি মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান এইরূপ। তাঁহার দৃক্‌শক্তি আমাদের ন্যায় নহে যে, প্রতিক্ষণে নানাবিষয় অবগাহন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান লাভ করিবে। তাঁহার দৃক্‌শক্তি বা জ্ঞানক্রিয়া সদা প্রকাশিত, ইহার বাধা নাই; ইহা ধারাবাহিকরূপে কেবল সদা প্রকাশাত্মক; এ জ্ঞানের প্রকাশ্য এ বস্তু, ও বস্তু—এইরূপ দ্বৈতভাব নাই। এই জন্য এ জ্ঞান অনন্ত বা সীমা (limitation)বর্জ্জিত। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। কিন্তু এ আনন্দ আমাদের ন্যায় দ্বৈতবিষয়ালিঙ্গনকারী আনন্দ নহে। আমাদের নানাবিধ আনন্দ সমূহের মূল কারণ এই আনন্দ। এই আনন্দের জ্ঞাতা (rejoicer) এবং পাত্র (the thing rejoiced at) নাই। ইহা সদা একরূপ এবং অনন্ত। ব্রহ্মের এই জ্ঞান ও আনন্দ তবে, বিষয় বিষয়ী সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত। এই ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় কিছুই নহেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বেদান্তের এই ব্রহ্মের কোন রূপ জ্ঞান বা আনন্দ নাই; ব্রহ্মই জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ। মনুষ্য গাঢ় নিদ্রার পরে গাত্রোত্থান করিয়া যেরূপ মনে করে যে, "আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম"—ব্রহ্ম-জ্ঞান কতকটা সেইরূপ। উহাতে কেবল অস্তিত্ব জ্ঞান মাত্র থাকে। ইহা বৃত্তি রহিত জ্ঞান। এই নির্ম্মল জ্ঞানালোক, আমাদের বুদ্ধির হিংসা দ্বেষাদি সমুদায় বৃত্তিকে আলোক প্রদান করিয়া থাকে। এই জ্ঞানালোক না থাকিলে,সমস্ত বৃত্তি অন্ধকারময় ও জড়ভাবে থাকিত। তখন আর সে বৃত্তিগুলি মনুষ্যের বোধের সীমায় আসিত না। এই আলোকে প্রকাশিত হয় বলিয়াই আমরা সুখ দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি অচেতন বৃত্তিগুলির বোধ বা অনুভূতি লাভ করিতে সক্ষম হই। এই জন্যই উপনিষদ্ বলেন যে "কঃ কেন কং পশ্যেৎ; কঃ কেন কং কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি। বেদান্তের ব্রহ্ম এইরূপ। ইহা দেশ, কালের অতীত। কেন না, ইহাকে সীমা দিতে পারে, এরূপ দ্বিতীয় বস্তু নাই। ইহা অন্তঃকরণের বিবিধ জ্ঞানের(all modes of consciousness) সীমার বাহিরে বর্ত্তমান। এ জ্ঞানের জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় কেহই নাই। ইহা কার্য্যও কারণও নহে। বেদান্তমতে এরূপ ব্রহ্ম "ঈশ্বর" নহেন।

এই ব্রহ্ম যখন কার্য্যের কারণরূপে প্রকাশিত হন, সেই অবস্থায় ইনি ঈশ্বর পদবাচ্য।

অনাদিকাল হইতে একটী সৎ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে একটী অসৎ—পদার্থ আছে। এই অসৎ সেই সতেরই শক্তিমাত্র। এই অসৎ যখন সতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ সৎ পদার্থ যখন তাঁহার মধ্যস্থ শক্তি বিকাশ করিবার ইচ্ছা করেন,তখন এই সৎই কারণ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সেই শক্তিই "অব্যক্ত-কার্য্য"রূপে অবস্থিত থাকে। ব্রহ্মের এই শক্তি বা পরে প্রকাশিত কার্য্যের এই অব্যক্তাবস্থাই 'অব্যক্তমায়া' নামে অভিহিত। বাস্তবিক পক্ষে মায়া বা ব্রহ্মশক্তি, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বা সুখ-দুঃখ-মোহ এ ত্রিবিধ উপাদানের সমপরিমাণ-মিশ্রণাত্মক পদার্থ। এ পদার্থত্রয় স্থূল জড় পদার্থ নহে; ইহা শক্ত্যাত্মক। জড় যেরূপ আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তির সমবেত মিলন ভিন্ন আর কিছুই নহে (ইংরেজী Psichology দেখ), তদ্রূপ এই শক্তিত্রয়ও ভবিষ্যৎ কার্য্যের শক্তিময় রূপ। এ অবস্থায় ইহা কার্য্যশীল নহে। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম যখন সিসৃক্ষু হন অর্থাৎ তাঁহার শক্তিবিকাশ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন ব্রহ্ম কারণ স্বরূপ বা সগুণ ঈশ্বর এবং তাঁহার শক্তিও তখন কেবল সত্ত্বময় অবস্থা ধারণ করে। শক্তির এই প্রথম বিকাশ বা সত্ত্ব প্রধান অবস্থাই ভবিষ্যৎ জগতের বীজশক্তি। এই অব্যক্তাবস্থা ব্রহ্মের "কারণ-শরীর" বলিয়া অভিহিত। ব্রহ্মচৈতন্য মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইলেই, অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তন্নিহিত শক্তির সত্ত্বময় প্রথম বিকাশ হয়। এই সত্ত্ব অবশ্য তখনও (unconscious)অব্যক্ত মাত্র। সমুদ্রের জলরূপ উপাদান কারণে যেরূপ পরে প্রকাশিত ফেন, তরঙ্গ, বুদ্বুদ্ প্রভৃতি অব্যক্তাবস্থায় লীন থাকে,ব্রহ্মেও তদ্রূপ পরে প্রকাশিত বুদ্ধি, মন প্রভৃতি অব্যক্তাবস্থায় লীন থাকে। এ অবস্থায় অব্যক্তমায়া নিতান্ত অসৎ বা অভাবাত্মক হইতে পারে না। কেন না, সায়নাচার্য্য বলেন যে, 'জগৎ-সৃষ্টির আদি নাই। এক প্রলয় সময়ে, যাহা যাহা অব্যক্ত ভাবে লীন ছিল, পর সৃষ্টির আরম্ভে সেইগুলিরই ক্রমে বিকাশ হয়। সুতরাং এই "অব্যক্ত মায়াতে" পূর্ব্বসৃষ্ট সমুদয় পদার্থই অতি সূক্ষ্ম ভাবে বিলীন অবস্থায় নিহিত ছিল। সেই গুলিরই সৃষ্টি সময়ে পুনরায় সূক্ষ্ম ও স্থূলভাবে বিকাশের নামই "সৃষ্টি"। অতএব এই অব্যক্ত বা ঈশ্বরের সৃষ্ট্যুন্মুখ শক্তি একেবারে অভাবাত্মক পদার্থ নহে।

ব্রহ্মের এই সৃষ্ট্যুন্মুখ শক্তিই (অব্যক্তাবস্থায় স্থিত) "কারণ শরীর" বা "আনন্দময়" কোষ নামে বেদান্তে অভিহিত হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ ইহাকেই সত্ত্বগুণ প্রধান "মহত্তত্ত্ব" বা বৃত্তিরহিত বুদ্ধিতত্ত্ব (mind without any modifications) বলেন। ইহা ব্রহ্মশক্তিরই প্রথম বিকাশাবস্থা। ইহা বীজ স্বরূপ। পরে প্রকাশিত সমস্ত শক্তি ইহাতে নিহিত আছে; কেবল বাহ্যবিকাশ নাই মাত্র। এই শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্য ঈশ্বর নামে অভিহিত। ইনিই কারণাত্মক। এখনও এই জ্ঞানময় চৈতন্যে,জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই দ্বৈতভাব প্রকাশ পায় নাই। ইহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবে প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বতম অবস্থা। মায়ার এই অব্যক্তাবস্থাকে সত্ত্বপ্রধান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলী সমস্তই ইহাতে সত্তামাত্রে অবস্থিত আছে। সকলেরই অব্যক্ত ভাবে "অস্তিত্ব" আছে বলিয়াই ইহা সত্ত্ব-প্রধান। ইহা ঈশ্বরেরই শক্তি। এখনও বুদ্ধি, মন, ও ইন্দ্রিয়াদির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলি, সেই সেই

রূপে প্রকাশিত হয় নাই। ইহারা সুপ্ত-ভাবে ইহাতে বিলীন আছে। ইহারা পরে সূক্ষ্মরূপে এবং স্থূলরূপে দেখা দিবে। অতএব এই অব্যক্তশক্তিই জগতের উপাদান কারণ। ইহা ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া, ব্রহ্মও নিমিত্ত কারণ হইলেও, ব্রহ্মই বাস্তবিক পক্ষে জগতের উপাদান কারণ। কেন না, শক্তি ও শক্তিমান একই পদার্থ। জগতের এই পূর্ব্বাবস্থা বা Potertial or pre-existent state অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; নতুবা ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তির ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা, ঈশ্বর যদি শক্তিশূন্য হন, তবে তিনি সৃষ্টি করিবেন কিরূপে? তাহা হইলে, অভাব হইতে ভাবপদার্থ জন্মিল, একথাও স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্মশক্তিতে যদি ভবিষ্যৎ কার্য্য সকলের বীজ নিহিত না থাকিত, তবে তাহা অকস্মাৎ কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল? এই জন্যই উপনিষদ্ বলেন যে, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ঈশ্বরকে "তপস্যা" বা "সংকল্প" করিতে হইয়াছিল। ইহার অর্থ prevision of the world that is to be. অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে জগৎ তাঁহার শক্তিতে লীন হইয়াছিল, ঠিক্ তদ্রূপ ভাবে সৃষ্টির ইচ্ছা। শক্তির ধ্বংশ অসম্ভব। শক্তি নিত্যবর্ত্তমান না থাকিয়া পারে না, কেবল তাহার বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র (আমাদের প্রকাশিত "হার্ব্বার্ট স্পেনসার ও তাঁহার মত" নামক প্রবন্ধ দেখ)। সুতরাং যাহা শক্তিরূপে সূক্ষ্মভাবে লীন হইয়াছিল, তাহার যখন ধ্বংশ অসম্ভব, তখন, তাহার পুনরায় অব্যক্তাবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া, ক্রমশঃ ব্যক্ত-সূক্ষ্ম এবং তৎপর ব্যক্তস্থূল অবস্থায় পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে। নতুবা বলিতে হয় যে, শক্তি ধ্বংশ হইয়া গেল। এইরূপে বারম্বার সৃষ্টি ও লয় হইতেছে। শঙ্কর এই জন্যই বলিয়াছেন যে, এই অব্যক্ত-মায়া বা সৃষ্ট্যুন্মুখ ব্রহ্ম-শক্তি, ভবিষ্যৎ ইন্দ্রিয় ও শরীরাদির সূক্ষ্ম, সমষ্টি-ভূত শক্তির মিলনাত্মক শক্তিমাত্র। ইহাতে যাহা যাহা ছিল, (বীজভাবে ছিল) তাহাই যথাযথ প্রকাশিত হইয়া, এই জগৎরূপে বিকাশ পাইয়াছে। মায়া বা ব্রহ্মশক্তি এই বীজাবস্থায় পরিণত হইবার পরেই, সূক্ষ্মাবস্থায় প্রকাশ পায়। এই সূক্ষ্মাবস্থায়, বুদ্ধির বৃত্তিগুলি, ইন্দ্রিয়ের শক্তিগুলি এবং সূক্ষ্ম রূপরসাদি প্রকাশ পায়। যাহা বীজাবস্থায়, নির্ব্বিশেষভাবে ছিল; তাহাই সূক্ষ্মরূপে বিশেষ বিশেষ শক্তি ও বৃত্তি (Modifications) রূপে দেখা দিল। নূতন কিছুই হইল না। তারপর পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া এইগুলিই আবার ব্যক্তস্থূলরূপে দেখা দেয়। তখন মায়ার স্থূলাবস্থা। তখন ব্রহ্মশক্তি "অন্নময় কোষ" নামে অভিহিত; কেননা, মায়ার তখন একটা স্থূল আবরণ জন্মিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি, ব্রহ্ম নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান-স্বরূপ। তাঁহার শক্তি, জ্ঞানেরই ক্রিয়ামাত্র। নির্ম্মলজ্ঞানের এই ক্রিয়ার সুতরাং তিনটী অবস্থা। ক্রিয়োন্মুখ বা অব্যক্তাবস্থা, ক্রিয়ার সূক্ষ্মাবস্থা এবং ক্রিয়ার স্থূল বা ঘনীভূত অবস্থা। প্রথম অবস্থায় ক্রিয়া সত্ত্ব-প্রধান, দ্বিতীয়াবস্থায় রজঃ প্রধান এবং তৃতীয়াবস্থায় তমঃ প্রধান। জ্ঞানের ক্রিয়ার এই তিন প্রকার অবস্থায়, জ্ঞানেরও তিনরূপ অবস্থা প্রকাশ পায়। একই জ্ঞান, ক্রিয়াভেদে ত্রিবিধাবস্থা ধারণ করে। ক্রিয়ার এই তিন অবস্থা বা উপাধি যোগে জ্ঞানও উপাধিগ্রস্ত বলিয়া ভ্রম হয়। ক্রিয়োন্মুখাবস্থায় জ্ঞান নির্ব্বিশেষ; বিশেষ ভাবে ক্রিয়া প্রকাশ

পায় না বলিয়া, জ্ঞানও এ অবস্থায় নির্ব্বিশেষ, বা অতি-সাধারণ ভাবে সমস্তের জ্ঞান থাকে। গাঢ় সুষুপ্তি অবস্থায় মনুষ্যের জ্ঞান যেরূপ সত্ত্বামাত্র অনুভব করে; এ অবস্থায়ও তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ সত্ত্বাত্মক জ্ঞানমাত্র। ঈশ্বর এ অবস্থায়, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। যেহেতু তিনি এ অবস্থায় নির্ব্বিশেষ ভাবে ভবিষ্যৎ-কালে প্রকাশিত সমস্ত শক্তি ও ক্রিয়ার বিষয় অবগত আছেন। তিনি এ অবস্থায় সর্ব্বনিয়ন্তা (Actuator)। যেহেতু যে যে প্রাণী ও বস্তু যে যে শক্তি লইয়া তাঁহার শক্তিতে লীন হইয়াছিল, তিনি এই ক্রিয়োন্মুখ অবস্থায়, সেই সেই প্রাণী ও বস্তু প্রভৃতির সেই শক্তি ও ক্রিয়াদির বিকাশ করেন। অর্থাৎ তিনি বিলীন বুদ্ধির বৃত্তি সকল (ইচ্ছা দ্বেষাদি) এবং তাহা হইতে ইন্দ্রিয় শক্তি-গুলিও রূপরসাদির আবির্ভাব করাইয়া দেন। এই জন্যই মহাত্মা শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বর প্রাণীর কর্ম্ম বা অদৃষ্টানুসারেই নিয়োগ করেন বা ফল প্রদান করিয়া থাকেন"। এই ঈশ্বর যেমন সৃষ্টিকালে পূর্ব্বনিহিত শক্তি ও ক্রিয়াদির বিকাশ করাইয়া দেন, তেম্‌নি তিনি সর্ব্বাবস্থায় সমস্ত শক্ত্যাদিকে নিজের আলোকে আলোকিত করিয়া থাকেন। নতুবা কোন শক্তি বা ক্রিয়া প্রকাশই পাইত না। এই জন্যই তিনি "নিয়ন্তা" নামেও অভিহিত। এই জন্যই তিনি জগতের মূল কারণ। অতএব ব্রহ্ম এই জগতের বীজস্বরূপ এবং মায়া এই জগদ্বৃক্ষের উৎপত্তি-শক্তি। বীজে যেরূপ ভবিষ্যৎ বৃক্ষের সত্ত্বা অন্তর্নিহিত থাকে, অব্যক্ত-মায়াতেও তদ্রূপ ভবিষ্যৎ সত্ত্বা সমূহের অস্তিত্ব অন্তর্নিহিত থাকে। ঈশ্বর উহাদিগের অন্তর্লীন শক্ত্যনুসারে উহাদের বিকাশ করাইয়া থাকেন। "প্রাগুৎপত্তেঃ স্তিমিতং অনিস্পন্দং সৎকার্য্যাভিমুখং ঈষদুপজাত প্রবৃত্তি তৎসৎ সমভবৎ (ঈশ্বর)। ততোপি লব্ধ-পরিস্পন্দং অন্তরনামরূপ ব্যাকরণেন অঙ্কুরীভূতমিব বীজমভূৎ (হিরণ্য গর্ভ)। ততোঽপি ক্রমাৎ স্থূলীভবৎ সমবর্ত্তত (বিরাট)। সর্ব্বেষাং ঈশ্বরাধিষ্ঠিতানা মেব নিয়মেন প্রবৃত্তিঃ" (শঙ্করভাষ্য; ছাঃ উপনিষৎ। ন সতঃ সদন্তরং উৎপদ্যতে, সদেব সংস্থানান্তরেণাবতিষ্ঠতে; যথা সর্পঃ কুণ্ডলী ভবতি" (Ibid)। এই ঈশ্বর গীতায় "পরমপুরুষ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

নিজ অব্যক্তশক্তি হইতে এইরূপে জগদ্বিকাশ, বেদান্তমতে, ঈশ্বরসাপেক্ষ। তাঁহার সংকল্প নিত্য-সত্য। কাজেই তাঁহার সংকল্পবশতঃই সেই সেই রূপে ও আকারে পদার্থ সমূহ সৃষ্ট হইয়াছে। সাংখ্য বলেন, প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি হইলেও, ইহা ঈশ্বর হইতে একটী পৃথক্ পদার্থ। কার্য্য উৎপন্ন হইতে, এই প্রধানের সহিত ঈশ্বরের সংযোগ বা ইচ্ছা আবশ্যক করে না। অন্তর্নিহিত শক্তিবলে, প্রধান আপনা আপনিই নিয়মিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া জগৎরূপে দেখা দেয়। এই স্থলেই বেদান্তের সহিত সাংখ্যের প্রধান পার্থক্য। কার্য্যমাত্রেই, ব্রহ্মশক্তির অবস্থার বিকাশ বলিয়া, বেদান্তমতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থের পৃথক্ সত্ত্বা নাই। সূক্ষ্মাদিরূপে প্রত্যেক শক্তি বা কার্য্যের প্রত্যেক বিকাশই বেদান্তের বিকটে এক মাত্র চৈতন্যেরই বিকাশ। এইরূপ ভাবে বিকাশের হেতুই ঈশ্বরেচ্ছা। তিনি এইরূপেই নিজশক্তিকে বিকাশ করিয়া থাকেন, শক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া, তিনি নিজশক্তি দ্বারা আবৃত হইয়া পড়েন। শক্তির নানাবিধ

নিজেই অবস্থাত্মক উপাধি যোগে, ব্রহ্মও নানারূপ উপাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ইহাই বেদান্তের মায়াবাদ।

এখন আমরা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত "অধ্যাত্ম-যোগ" প্রভৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মানুষ ও সমাজ।

সমাজ, মানব জীবনের দুশ্ছেদ্য, অখণ্ডনীয়, অপরিহার্য্য, অবশ্য কর্ত্তব্য নিয়ম-পত্র। কেহ কেহ ব্যক্তিগত নির্ব্বিবাদ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কোন কোন দার্শনিক বলেন "মানুষ জন্মাবধিই স্বাধীন"—অর্থাৎ জন্মাবধিই সমাজের রীতি নীতি, বিধিব্যবস্থা, ব্যবহার ও শাসনের অন্তর্ভূত নহে। একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা প্রকৃত সত্য নহে—কেবল তাঁহাদিগের উষ্ণ মস্তিকের স্বেচ্ছাকৃত কল্পিত সত্য মাত্র। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, কোন্ স্থান হইতে, কাহার আজ্ঞায়, কি প্রকারে মানুষের এই কল্পিত স্বাধীনতার উৎপত্তি—যদি কেহ জানিতে চাহে যে, কে মানুষকে সমাজ-শাসনের বাহিরে লইয়া গিয়াছে, কে তাহাকে এই নির্ব্বিবাদ-স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত দার্শনিকগণ নিরুত্তর। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ এই বিশেষ অধিকারে অধিকারী। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জন্মের পর হইতেই যদি আমরা একটী শিশুর চরিত্র আলোচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, চরিত্রের প্রত্যেক অঙ্ক, প্রত্যেক চিত্র, এমন কি, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু পর্য্যন্ত, কোন না কোন জাতীয়, স্থানীয় এবং পারিবারিক ঘটনাবলীর অমানুষী ক্ষমতার ছায়া মাত্র। মানুষ, সমাজের অনুলিপি—প্রতিবিম্ব—নিখুঁৎ অবিকৃত চিত্র।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, সদ্যপ্রসূত শিশুর হৃদয় যেন মসিরেখা-বিহীন একখানি সাদা কাগজ। সেই কাগজে, শিক্ষার দ্বারা তোমার যাহা অভিরুচি, তুমি তাহাই অঙ্কিত করিতে পার। নবজাত শিশু যেন কুম্ভকারের হস্তে মৃত্তিকা। তাহাকে যে ছাঁচে ইচ্ছা সেই ছাঁচেই ঢালিতে পার—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যেমন ইচ্ছা, তাহাকে তেমনি করিয়া গড়িয়া লইতে পার। কিন্তু যে ছাঁচে তুমি তাহাকে ঢালিতে চাহিতেছ, তোমাকে তাহা কে দিয়াছে? অতীত ঘটনাবলীর অবিনশ্বর চিত্র যেন জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই মনুষ্য হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে—মনুষ্যের আত্মাতে মুদ্রিত হয়। অতীত রীতি-নীতি প্রভৃতির সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ জন্মিবার পর কেবল তাহাতে একটী রং ফলান হয় মাত্র। তাহারা মূলে ঠিক একই থাকে, কেবল তাহাদিগের বর্ণনা নূতন—ভাষা নূতন—অভিব্যক্তি নূতন।

পাঁচ জনে মিলিয়া একটী ব্যবসা আরম্ভ করিলে, সেই ব্যবসায়ে তাহাদের প্রত্যেকেরই যেমন এক একটী অংশ থাকে—তাহাদিগের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যমে যেমন সেই আরব্ধ-কার্য্য দিন দিন উন্নতি লাভ করে—মনুষ্য বিশেষ বা জাতি বিশেষের স্বেচ্ছাকৃত সমাজ-বন্ধনেও তাহাদিগের তেমনি এক একটী অংশ আছে। সেই সমাজের শিক্ষা দীক্ষা, উন্নতি অবনতি, ধর্ম্ম কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সকল

বিষয়েই তাহাদিগের অংশ লক্ষিত হয়। এই অংশিত্ব যে শুধু জীবিত মনুষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিভক্ত, তাহা নহে। ভূত, ভবিষ্যৎ; বর্ত্তমান এই তিন কালকে সমাজ এক সূতায় গাথিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের এক একটী নিয়ম মানব-সাধারণের সেই অখণ্ডনীয় আদিম বন্ধনের অনুবর্ত্তী। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জগৎ, বর্ত্তমান মানব মণ্ডলী ও যাহারা এখনও ভবিষ্যতের অন্ধকার যবনিকার অন্তরালয়ে লুক্কাইত রহিয়াছে, তাহাদিগের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাসের সংযোগ সূত্র। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন সূত্র-সমষ্টিই তাহাদিগের নৈতিক ও প্রাকৃতিক বন্ধনের দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল। সমাজ, অতীতের জীবন্ত স্মরণ-চিহ্ন—বর্ত্তমানের সুদৃঢ় শৃঙ্খল—ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক ধ্রুবতারা। যতদিন মানুষ—ততদিন সমাজ—যত দিন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, ততদিন সমাজের আয়ু এবং বিস্তৃতি।

শিক্ষাই আমাদিগের চরিত্র গঠন করে। জ্ঞান, পার্থক্য, স্বাতন্ত্র, স্বাধীনতা, শিক্ষা হইতেই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষার এই সমস্ত সুফল যে মানুষকে সমাজ শাসনের বাহিরে কোন অবাধ-স্বাধীনতার একটী কল্পনাময় রাজ্যে লইয়া যাইয়া থাকে, তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শিক্ষা মানুষকে সমাজের অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়—বাহিরে লইয়া যায় না। শিক্ষা কি? পিতা মাতা বা শিক্ষক কেবল শিক্ষার উপায় এবং পথগুলির ব্যাখ্যা করেন মাত্র, শিখাইতে পারেন না। মানবজীবনের যে সময়ে কেহ শিক্ষার কথা কল্পনাতেও আনিতে পারে না, তাহার শিক্ষা সেই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। এবং মানুষ যখন মনে করে যে, তাহার শিক্ষা শেষ হইয়াছে, শিক্ষার রাজ্যে তখনও সে শিশু। সমাজের ভাষা এবং সাহিত্যেই সেই সমাজের অন্তর্নিহিত মানবের শিক্ষার সোপান প্রোথিত থাকে। সেই ভাষা এবং সাহিত্যই যে আবার কত যুগযুগান্তরের বিভিন্ন গবেষণার ফল, তাহা কে বলিতে পারে? জন্মগ্রহণের পর শিশু আপনার সুবিধামত সংসার-চিত্র অঙ্কিত করে না। কোম্‌তে (Comte) বলেন যে, যে মানব নিজকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন বিবেচনা করে, সে তাহার সেই অসৎ, ধৃষ্টতা পূর্ণ, কল্পিত সত্যটী ভাষায় প্রকাশ করিলেই তাহা তাহার আত্ম-প্রতিবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কথাটী অতিশয় প্রবীণ এবং সত্য। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ভাষা মানুষের নিজের নহে—সমাজের সম্পত্তি। সে কেবল সেই সাধারণ সম্পত্তির একজন অংশীদার মাত্র। ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় ভাষার সৃষ্টি হয় না। যুগান্তর ধরিয়া সমাজের প্রভূত যত্নে তাহার সৃষ্টি, পরিবর্ত্তন; উন্নতি ও পরিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। শুধু ইহাই নহে। আমরা সাধারণ কথায় বলিয়া থাকি, অমুক ব্যক্তি অমুক পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তক প্রণয়ন কেবল পূর্ব্বগামী শত শত নরনারী পরিত্যক্ত নানা বিষয়ক উপাদানের পুনরোক্তি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই স্থানে মনে রাখিতে হইবে যে, সেই পূর্ব্বগামী নরনারীও কোন সমাজ বিশেষের অঙ্গ, অন্ততঃ মানব সাধারণের ভিতর অবস্থিত। তাই ইমারসনের (Emerson) মতে সকলেই 'রচনা-চোর' (plagiarist)। মৌলিকতা কাহার ও নাই।

কথাটা শুনিতে যেমনই বোধ হউক, কিন্তু অমূলক নহে। নৈতিক শিক্ষাও ঠিক এই প্রকার। আমরা কাহাকেও নীতি শিখাইতে পারি না। যে সমাজ যত পুরাতন, যত উন্নত, সেই সমাজে শিক্ষার উপাদান তত অধিক এবং সুন্দর প্রণালীবদ্ধ।

অমানুষী ক্ষমতা এবং অভূতপূর্ব্ব শক্তি সম্পন্ন যে সকল ব্যক্তি আমাদের সমাজে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাও সমাজবহির্ভূত নহেন। তাঁহারা ও সমাজ নির্ম্মাতা নহেন—সমাজই তাঁহাদিগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। বুদ্ধ বল, চৈতন্য বল—যাহার ইচ্ছা তাহারই নাম কর, সকলেই সমাজের দাস। তবে তাঁহারা এত বড় হইলেন কিসে? কিসে তাঁহাদিগের এত গৌরব, এত শক্তি হইল? তবে কেমন করিয়া তাঁহারা সমাজে এত ভয়ানক ভয়ানক বিপ্লব ঘটাইতে সমর্থ হইলেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল তাঁহাদিগের সময়োপযোগী অভাব বোধ—সেই অভাব নিরাকরণে সমাজ-হৃদয়ে তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি এবং সমাজের অন্ধ, উন্মত্ত, উচ্ছাশা সমূহে তাঁহাদিগের প্রাণপন সহানুভূতি। সমাজের বিক্ষিপ্ত, অসংযুক্ত, অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সমষ্টি করণই মহাত্মাদিগের এক মাত্র কার্য্য। তাঁহারা যে সকল নূতন নূতন, অশ্রুতপূর্ব্ব, ঐশ্বরিক সত্য সকল আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত আবিষ্কার নহে। সে কেবল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিহিত অথচ পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সত্য সমূহের নির্দ্দেশ মাত্র। সমাজাকাশে যাহা আবছায়াময় থাকে—সমাজের চিত্রপটে যাহা ক্ষীণ, লোকলোচন-বহির্ভূত, তাঁহাদিগের মন্ত্রময় তুলিকা কেবল তাহাতে নানা রকমের বর্ণ অর্পণ করে মাত্র। বাতাসেই শব্দের উৎপত্তি হয়। তবে নর-কর্ণগোচর করিবার নিমিত্ত একটী যন্ত্রের আবশ্যক। মহাত্মাগণ সমাজের সেই যন্ত্র-স্বরূপ।

মানুষ প্রত্যেক কার্য্যে—প্রত্যেক কথায়, এমন কি প্রতি পাদবিক্ষেপে সমাজের অধীন—সমাজের বিনামূল্যে ক্রীতদাস। সমাজই মনুষ্য—মনুষ্যচরিত্র এবং তাহার ইতিহাসই সমাজ। যাঁহারা সমাজবন্ধন ছিড়িয়া ফেলিতে চাহেন, তাঁহারা বাতুল। আরিষ্টটল বলিতেন যে, যাহারা আপনাকে সমাজের বহির্ভূত মনে করে, তাহারা হয় পরমেশ্বর, না হয় সামান্য পশু। ইহা একটী সরল সত্য। ব্যক্তি বিশেষের চরমোৎকর্ষ এবং সে যে সমাজভুক্ত, সেই সমাজের চরমোৎকর্ষ এতদুভয় পরস্পর পরস্পরের মধ্যে নিহিত। মনের ক্রমাভিব্যক্তি এবং উৎকর্ষ সমাজের অনুবর্ত্তী।

মানুষের কার্য্য বিশেষ আলোচনা করিতে বসিলে, আমরা হয় তাহাকে ভাল বলি, না হয় মন্দ বলি। কিন্তু বিচার করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের মনোমধ্যে 'ভাল' এবং মন্দ এই দুইটীর পার্থক্য স্পষ্ট পরিস্ফুট থাকে। কোন একটী কার্য্য সৎ অথবা অসৎ ইহা বলিবা মাত্রই আমরা স্বীকার করিয়া লই যে, আমাদিগের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ, আমাদের বিচার-বুদ্ধি, এমন কি আমাদিগের জীবন পর্য্যন্ত কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত বিধি এবং রীতি নীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাহাদিগের সহিত তুলনা করিয়া মতামত প্রকাশ করার নামই ভালমন্দ, সদসৎ বিচার। সদসৎ বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই আবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই রীতি-নীতি, বিধি-নিয়ম প্রভৃতি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে

পারে—অন্তর্নিদ্দিষ্ট ও বহির্নিদ্দিষ্ট। সামাজিক এবং রাজকীয় বিধিই বহির্নিদ্দিষ্ট। আমরা সকলেই এই বিধিবদ্ধ। যদি কেহ এই বিধি অতিক্রম করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে উন্মাদ ভিন্ন আর কি বলিব?

অনেকে বলেন, আমাদের সমাজ কুসংস্কার ও যুক্তিবিহীন অন্ধবিশ্বাসে পরিপূর্ণ—আমাদের সমাজ ভ্রমান্ধ! তাঁহাদিগের কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। কুসংস্কার বা বিষয় বিশেষে অন্ধবিশ্বাস কিছু কিছু থাকিতে পারে। সকল দেশের—সকল সমাজেই তাহা আছে। কিন্তু সেই জন্য সমাজকে পদদলিত করা—অতলজলে নিক্ষেপ করা—আপনাকে সেই সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত, সুদৃঢ়, শৃঙ্খলবন্ধনের বহির্ভূত মনে করা জ্ঞানীর কার্য্য নহে—মূর্খের কার্য্য। আর সেই জন্য বর্ত্তমান সমাজশাসন না মানিয়া, বর্ত্তমান সমাজকে বালকের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকার মত, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটী সম্পূর্ণ নবসমাজের সৃষ্টির কল্পনা করা ততোধিক মূর্খের কার্য্য। অন্ধবিশ্বাস দুর্ব্বল হৃদয়ের ধর্ম্ম। কুসংস্কার যদি কিছু থাকে, তবে তাহা থাকিতে দাও। যদি সম্ভব হয়, ধীরে ধীরে তাহা দূর কর। তাই বলিয়া একেবারে গোড়া কাটিয়া ফেলিও না। অংশবিশেষ যদি দূষিত হইয়া থাকে, তবে তাহারই নিরাকরণের চেষ্টা দেখ, সম্পূর্ণ ধ্বংশ করিও না। তাহা করিতে গেলে, মহাবিপ্লব উপস্থিত হইবে। ভগ্ন-প্রাসাদ সংস্করণের মত, ভালটুকু যেমন আছে, তেমনি রাখিয়া তাহারই সহিত বেশ মিলাইয়া খারাপের স্থানে ভাল আনিয়া বসাও। তোমার ভগ্ন-প্রাসাদ সম্পূর্ণ হইবে—সুশ্রী হইবে—সুদৃঢ় হইবে। আমাদের সমাজ কত পুরাতন। কত ঝড় তুফান ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। যাহা পুরাতন—যাহা কালের তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাত সহিয়াও টিকিয়া আছে, সময়ের কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় আজ পর্য্যন্তও কৃতকার্য্য হইয়াছে—তাহার ভিতর কিছু না কিছু সত্য অবশ্যই আছে। তুমি নাই বলিলে তাহা শুনিব কেন? কত অতীত বংশ—কত অতীত সম্প্রদায়ের বিচক্ষণতার ফল বর্ত্তমান সমাজ। যদি তাহাদিগের উপর ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে, তবে সমাজকে ভক্তি শ্রদ্ধা কর—নষ্ট করিওনা। উন্নত কর—সে তোমাদেরই উন্নতি। যদি তোমরা এখন পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত বিধি নিয়মগুলি অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগকে অপমান করিতে কুণ্ঠিত না হও, তবে তোমাদের পরে যাহারা আসিবে, তাহারও যে আবার তোমাদের মস্তকে দারুণ পদাঘাত করিবে। তাই বলিতেছিলাম, সমাজকে সম্মান করিয়া অতীত পুরুষকে সম্মান কর।

সমাজবন্ধনই জাতীয়-বন্ধনের মূল ভিত্তি। মানুষ সর্ব্বপ্রথমে আপন আপন পরিবারস্থিত আত্মীয়দিগকে ভালবাসিয়াই ভালবাসিতে শিক্ষা করে। স্নেহ সর্ব্বপ্রথমে আপন গৃহে আরম্ভ হয়। তারপর তাহার বিস্তৃতি। জলাশয়ের মধ্যে একখানি ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া কখনও দেখিয়াছ কি? প্রথমে একটী ক্ষুদ্র বৃত্ত, তার পর তা অপেক্ষা একটী বড় বৃত্ত, তারপর আরও বড় আর একটী; এমনি করিয়া বৃত্তের পর বৃত্ত ক্রমশঃ আকারে বড় হইয়া অবশেষে তটভূমি আঘাত করে। স্নেহধর্ম্মের গতিও সেই রূপ। সর্ব্বপ্রথমে আপনার জন—তারপর

আপন সমাজ—তারপর জাতি—তাহার পর মানবসাধারণ। অবশেষে এই নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেম হইতেই ঈশ্বর-প্রেমের অভ্যুত্থান হয়। তুমি যদি সমাজ-শাসন না মানিলে, সমাজবন্ধন ছিড়িয়া ফেলিতে চাহিলে—তোমার সমাজকে অন্ধসংস্কারাপন্ন বাতুলের লীলাক্ষেত্র বলিয়া মনে করিলে, তাহা হইলে তোমার নিকট হইতে জাতীয় ভালবাসার আশা কোথায়? তাহা হইলে মানবমণ্ডলীর সহিত তোমার প্রাণপণ সহানুভূতির পরিচয় কোথায়? যদি জাতির সহিত তোমার স্নেহই না থাকিল—যদি আপন জাতিকে আপনার পরিবারের মতই না ভাবিতে পারিলে—যদি তাহার দুঃখে তোমার কঠিন প্রাণ কোমলই না হইল, তবে সে জাতির উন্নতির আশা আকাশকুসুম, জাগ্রতস্বপ্ন—মরুভূমে মরীচিকা।

আজ একটী ভাল কাজ করিয়া তুমি আত্মশ্লাঘা কর—বুঝি সেই কাজটী করিয়া তোমার সমাজকে তুমি চিরকৃতজ্ঞ করিলে—সমাজের কতই না জানি উপকার করিলে। সমাজের উপকার দূরে থাকুক, তোমারি আপনার উপকার হইল। তুমি ভিন্ন সমাজ কে? সমাজ ছাড়া তুমি কে—তুমি কোথায়—তোমার অস্তিত্ব কোথায়? তুমিই সমাজ—সমাজই তুমি।

সমাজের সহিত আমাদের এতদূর দৃঢ় বন্ধন। কিন্তু সমাজের শিরে বসিয়া আমাদিগের নেতারা কেবল নিদ্রা যাইতেছেন। নিদ্রায় বিগতচেতন নহে—যেখানেই তাঁহাদিগের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে, সেইখানেই, শুধু সেই খানেই সচেতন। সমাজ তাঁহাদিগকে চালাইবে কি, তাঁহারাই সমাজকে তাড়না করিতেছেন। এ যে কি বিষম ধৃষ্টতা, তাহা অননুমেয়! আমাদের সমাজ অর্থের দাস—পদগৌরবের গোলাম! কেন এমন হইল? কে এমন করিল? কে আমাদের সমাজকে ভাসাইল? তোমার অর্থ আছে, সমাজ তোমাকে মাথায় রাখিবে। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কেহ তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না। কিন্তু হায়, আমি অন্নের কাঙ্গাল! তাই সমাজ আমার শত্রু! আমারই বুক চিরিয়া সমাজ,—আর সেই সমাজ আমারই শত্রু! আমি কাঁদিব, সমাজ হাসিবে। আমি মরিব—অত্যাচার পীড়িত, বেদনামথিত, বিনাকারণে পদদলিত হইয়া আমি মরিব—সমাজ তাহা সহিবে। অটল, অচল হিমাচলের মত স্থির, নিষ্কম্প হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিবে যে, তাহারই পদতলে মাথা রাখিয়া, মরিতে মরিতেও আমি তাহারই শরণাগত হইয়াছি। সমাজ বিচলিত হইবে না—আমি যে অন্নের কাঙ্গাল—আমি যে দুর্ব্বল—আমি যে নিঃসম্বল। তুমি অর্থোন্নত, তাই তোমার ঘৃণাজড়িত পদাঘাত সমাজের শিরোভূষণ—গৌরবের ধন। তুমি যাহা খুসি তাহাই কর। তুমি যে অর্থপিশাচ—সমাজ তাহা দেখিবে না। তুমি যে অর্থের জন্য একজনের জাতিকুল খাইতে বসিয়াছ—একজনের করুণ ক্রন্দন, শত অনুরোধ, সহস্র প্রার্থনা চরণে ঠেলিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে যাইতেছ—একটী কণ্টকবিদ্ধ প্রভাত—শিশিরনিষিক্ত, পরিত্যক্ত, অনাঘ্রাত, স্ফুটনোন্মুখী পবিত্র কুসুম তোমার অর্থকলুষ, ঘৃণালাঞ্ছিত হস্তে শতখণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছ—মসি মলিন করিতেছ, শেষে সমাজের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এক ফুৎকারে সেই ছিন্নদল কুসুম লোকলোচন-বিরহিত অন্ধকারে, সংসার-কারাবাসের একটী চিরতিমিরময় নির্জ্জন কক্ষে, তামসময়ী রজনীর সুপ্ত বক্ষে নিক্ষেপ করিতেছ—সমাজ তাহা সহিবে! আর আমি যদি দুর্ব্বল হইয়া তোমার কার্য্যে বাধা দিতে চাই—যদি তোমার বিপক্ষতাচরণ করি, তবে আমিই ঘৃণ্য হইব—অপরাধের পসরা মাথায় করিয়া তোমার ও তোমার সমাজের ভ্রূকুটি-কুটিল নয়নের ভয়ে মস্তক হেট করিয়া জীবনের ভার বহিব—মরমে মরিয়া থাকিব! আর যদি আমার তেমন সৎসাহস (!!) থাকে, তবে চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া, অনুগ্রহ পাইবার আশায়—ভিক্ষা পাইবার আশায়—তোমারই পদলেহন করিব! এ-ই সমাজ—এ-ই বন্ধন—এ-ই শাসন!

সমাজে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। তুমি নেতা, কিন্তু কেহ তোমাকে মানে না, কেহ তোমার কথা শুনে না। তবে তুমি নেতা কেন? সমাজের যাহারা অঙ্গ, তাহাদিগের স্বার্থসিদ্ধির সুবিধা হয় বলিয়া তুমি নেতা। তোমার দোহাই দিয়া—তোমার নামের দোহাই দিয়া—তাহারা যাহা খুসি তাহাই করিতে পারে বলিয়া তুমি নেতা। তুমি পলায়ন করিতে চাও—পারিবে না। তোমার ইচ্ছা থাকিলে কি হয়—সমাজ তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, পরিত্যাগ করিবে না। সাধ করিয়া আপন পায়ে আপনি কে কুঠারাঘাত করিতে ইচ্ছা করে? কিন্তু প্রকৃতই—

"সমাজের শুভ চাহে যারা,
সমাজ না তাহাদের চায়;
পর হেতু সরবস্ব দিয়া
উপেক্ষা লাঞ্ছনা তারা পায়।"

ব্যক্তিগত অত্যাচারের বিচার আছে। কিন্তু সামাজিক অত্যাচারের বিচার এখানে হয় না। সকলেই দানব—সকলেই পিশাচ—কে কাহার বিচার করে? তবে কি আর বিচার নাই? আছে—অবশ্যই আছে। যে দেশে সমাজ নাই, সমাজ-শাসন নাই, অর্থলোলুপ প্রবঞ্চক নেতৃত্বের কলুষিত মিথ্যা ধর্ম্মভাব নাই—যেখানে সকলেই সমান, সেইখানে বিচার আছে। কিন্তু তাহা থাকিলে কি হইবে? মানুষের সহিষ্ণুতার একটী সীমা আছে। ব্যক্তিগত অত্যাচার সসীম, কিন্তু সামাজিক অত্যাচার অসীম—অনন্তমেয়। তাই সহ্য করিতে করিতে মানুষ পাগল হইয়া উঠে। তাহার মনে হয়, এ অত্যাচার বুঝি আর শেষ হইবে না। ইহার বুঝি আর বিচার নাই। তাই তাহার মনে হয়, বুঝি ধর্ম্ম নাই—বুঝি ঈশ্বর সকলের নহেন, বুঝি পরমেশ্বর বলিয়া কেহ নাই। তাহা থাকিলে এতদিন বিচার হইত—ইন্দ্রের বজ্র আসিয়া এতদিন সমাজকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিত। এমনি করিয়া ক্রমশঃ তাহার বিবেচনা শক্তি রহিত হইয়া আইসে। অবশেষে তাহার উদ্বেলিত হৃদয়ে একটী ফরাসী-রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়া রাজকীয় বিধি, ধর্ম্মের বিধি, সকল বিধিব্যবস্থার সহিত মহা গোলযোগ বাধায়। তাই বলিতেছিলাম, সামাজিক অত্যাচারের ফল—ঈশ্বরে অবিশ্বাস, ধর্ম্মে অনাস্থা, জীবনে মরণে অশান্তি।

চিরদিনই কি এমনি ছিল? চিরদিনই কি সমাজ নিদ্রিত? কে বলিল নিদ্রিত? সমাজের শাসনদণ্ডের চালনায় মানুষ কাঁপিয়াছে—দেশ কাঁপিয়াছে—রাজা ভীত হইয়াছেন। সমাজের ভয়ে চোর সাধু হইয়াছে—লম্পট সন্ন্যাসী হইয়াছে—ভণ্ড সংসার ছাড়িয়া কাননের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

আজি সমাজের এ শিথিলশাসন কেন? হিংসা, দ্বেষ, গৃহ বিবাদ এ সকলেরই মূল শিথিলশাসন। আগে কি কথায় কথায় রাজদ্বারে অভিযোগ হইত? অভিযোগ অনুযোগের সংখ্যা এখন এতই বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, কে তাহার গননা করে? কেন এমন হইল? কে এমন করিল? আমি বলিব, শিথিলসমাজশাসন আর সমাজের সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নির্দ্ধারণে অপারদর্শীতা।

অনেক সময় লোকনিন্দা আমাদিগকে পাপ হইতে বিরত করে—লজ্জা সৎপথ প্রদর্শন করে। কোন ব্যক্তিবিশেষ একটী কার্য্য করিতে বসিলে, তাহাকে নানা রকম বিবেচনা করিতে হয়। লোকনিন্দা, ভয়, লজ্জা প্রভৃতি তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। কিন্তু সমাজকে আবার কে নিন্দা করিবে? সকলে মিলিয়াই যে সমাজ। তাই সমাজের কার্য্যে বাধা দিবার কেহ নাই, সমালোচনা করিবার কেহ নাই, নিন্দা করিবার কেহ নাই। তাই সমাজ স্বেচ্ছাচারী। তাই সমাজ, অত্যাচারের অবাধ বাণিজ্যের "ফর্ম্মাণ" পাইয়া উল্লাসিত পিশাচের আনন্দে আনন্দিত। যাহারা শাসক, তাহারাই যদি পাষণ্ড হয়, তবে শাসিতের আর আশা কোথায়?

যে সমাজ এত শিথিল—এত ঘৃণিত—এত নীচ—সে সমাজ অধঃপাতে যাউক। যাহারা সেই সমাজের নেতা, তাহাদিগের মস্তকে শত সহস্র বজ্র পতিত হউক। অনন্ত নরক তাহাদিগকে গ্রাস করিবে। যদি ধর্ম্ম থাকে, তবে একদিন না একদিন সেই সমাজের বিচার অবশ্যই হইবে। সে দিন সমাজের বুকে এমন অনল জ্বলিবে যে, সমস্ত পৃথিবীর বারি একত্র করিলেও তাহার নির্ব্বাণ হইবে না।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

সংশয় ও বিশ্বাস।

সংশয় ভাল, না, মন্দ? সংশয় ভাল ও মন্দ দুই। সংশয় ভাল কেন? সংশয় দ্বারা মানবহৃদয় হইতে কুসংস্কার ও ভ্রান্তি দূর হয়। জ্ঞানোন্নতির একটি কারণ, সংশয়। পৃথিবী এক স্থানে স্থির হইয়া আছে, সূর্য্য তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, প্রাচীন কালে এই মত প্রচলিত ছিল। যদি এই মতে গ্যালিলিওর সংশয় না হইত, তাহা হইলে, তিনি ইহার সত্যাসত্য অনুসন্ধানে কখনই প্রবৃত্ত হইতেন না, এবং ইহার সত্যাসত্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইলে, প্রকৃত তত্ত্বের কখন আবিষ্ক্রিয়া হইত না।

সংশয় ও তন্নিবন্ধন সত্যানুসন্ধানদ্বারা বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে ইয়োরোপীয় সমাজে, নানা বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে, সভ্য জগতে যে, জ্ঞানোন্নতি হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, সংশয়।

লোকে সংশয়প্রণোদিত হইয়া স্বাধীনভাবে আলোচনা করাতে, ইয়োরোপীয় সমাজে, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম এই তিন বিষয়েই বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সংশয় ও অবিশ্বাসদ্বারা বহুল পরিমাণে রাজনৈতিক উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন লোকে, রাজা ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় বিশ্বাস করিত, এখন সেরূপ করে না। এখন লোকের আত্মনির্ভর ও স্বাধীনচিন্তা বৃদ্ধি হইয়াছে। ইয়োরোপের বড় লোকেরা সাধারণ লোককে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া, আপনারা যে সকল অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিল যে, তাহা অন্যায়। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, বড় লোকের অধিকার ও প্রভুত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা যে ক্রমশঃ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহার মূল কারণ সংশয় ও প্রচলিত প্রথায় অবিশ্বাস। সংশয়প্রণোদিত অনুসন্ধান ও তজ্জনিত স্বাধীনভাবদ্বারা ইয়োরোপে রাজাদিগের স্বেচ্ছারিতা অনেক পরিমাণে কমন হইয়াছে। এই সংশয়জনিত অনুসন্ধান দ্বারা ধর্ম্মযাজকদিগের কুসংস্কার হ্রাস হইয়াছে।

পূর্ব্বে লোকে বিজ্ঞান বিষয়ে, বিনা প্রমাণে, যাহা তাহা বিশ্বাস করিত। এখন অখণ্ডনীয় প্রমাণ ব্যতীত কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে, লোকে পূর্ব্বে, মতামত বিষয়ে, স্বাধীনতা দিত না। যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তাহা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিবার অধিকার ছিল না। বিশ্বাসের জন্য সামাজিক শাস্তি ও রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইত। বিশ্বাসের জন্য শত শত লোকের প্রাণ গিয়াছে। এখন, আর সে অবস্থা নাই। এখন ধর্ম্মযাজকদিগের কুসংস্কার ও গোড়ামি পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের মূল কারণ সংশয় ও তজ্জনিত স্বাধীন অনুসন্ধান।

স্পেন দেশের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, এ বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা সেখানে একেবারেই নাই। সাধারণ মতের বিরুদ্ধে কেহ কিছু লিখিয়া প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়। এইরূপে সেখানে সংশয় ও স্বাধীন চিন্তা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, স্পেন দেশে জ্ঞানোন্নতি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ইংলণ্ড ও ফরাসি দেশের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন। এই দুই দেশে সংশয় ও তজ্জনিত স্বাধীন চিন্তা সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ হয়, ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতররূপে বিস্তারিত হয়। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, লোকে স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান করিতেছে, এবং জ্ঞানের আশ্চর্য্য উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। *

যে সন্দেহবাদদ্বারা সত্যানুসন্ধান বর্দ্ধিত হয়, কুসংস্কার বিদূরিত হয়, দর্শন ও বিজ্ঞান উন্নতিপথে অগ্রসর হয়, সে সন্দেহবাদকে শ্রদ্ধা করি। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, সুসভ্য জগতে, বর্ত্তমান সময়ে, দর্শনশাস্ত্রের যে উন্নতি হইয়াছে, হিউমের সন্দেহবাদ তাহার প্রধান কারণ।

হিউমের সংশয়বাদদ্বারা দর্শন শাস্ত্রের যে, কত দূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হ্যামিল্টন্ তাঁহার দার্শনিক বক্তৃতা গ্রন্থে শত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। হিউমের সময়ে দর্শন শাস্ত্রের যেরূপ অবস্থা ছিল, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। হিউম তাঁহার সুতীক্ষ্ণ তর্কাস্ত্রে সে সময়ের দর্শন শাস্ত্রকে শত খণ্ডে খণ্ডিত করিলেন। যে সকল যুক্তির উপরে, সে সময়ের দার্শনিক মত দণ্ডায়মান ছিল, তাহার অসারতা প্রদ-

* Vide Bucklie's History of civilization in England. Vol. I. pp. 308-309.

শর্ন করিলেন। যে সকল সত্য,সকল জ্ঞানের মূল তাহাও এক ফুৎকারে শূন্যে উড়াইয়া দিলেন। কাহার সাধ্য তর্কযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হয়! সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাঁহার যুক্তি সকল খণ্ডন করিবার জন্য অনেক বৃথা চেষ্টা হইল। রীড প্রভৃতি দার্শনিকগণ তাঁহার মতের বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখিলেন।

কিন্তু হিউমের সংশয়বাদের সুমহৎ ফল, ক্যাণ্টের দর্শনশাস্ত্র। ক্যাণ্ট নিজে বলিয়াছেন যে, হিউমের সংশয়বাদই তাঁহাকে দার্শনিক বিষয়ে চিন্তা করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল।* এইরূপে ইয়োরোপীয় দর্শন শাস্ত্র উন্নতি পথে অগ্রসর হইল। সংশয়বাদই এই উন্নতির মূল কারণ।

বিশ্বাস ও সন্দেহের তিন অবস্থা। প্রথম অবস্থা বিশ্বাস। দ্বিতীয় অবস্থা সংশয়, এবং তৃতীয় অবস্থা আবার বিশ্বাস। বিশ্বাসে আরম্ভ, বিশ্বাসে শেষ। প্রথম অবস্থায় মানুষ সন্দেহ করিতে জানে না। যাহা দেখে, যাহা শুনে, সহজে বিশ্বাস করে। বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ হইলে, মানুষ আলোচনা করে, বিচার করে, সন্দেহ করে। এই যে সন্দেহ, ইহা বিচারশক্তির বিকাশের চিহ্ন। ইহা উন্নতির অবস্থা। উন্নতির অবস্থা হইলেও ইহা মধ্য অবস্থা মাত্র। ঐ স্থানেই শেষ নহে। সংশয় প্রণোদিত আলোচনা দ্বারা মানুষ যখন সত্যলাভ করে, তখন আবার বিশ্বাসে উপনীত হয়।

বলিয়াছি, সংশয় ভাল, কিন্তু উহা অভাব পক্ষে ভাল। চিরস্থায়ী সংশয়, রোগ বিশেষ।

অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল পূর্ব্বে এদেশে সংশয়বাদ অতি অল্পই ছিল। সাধারণতঃ লোকে চিরাগত সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিত। ক্রমে সংশয়বাদ আসিল।

এই সংশয়বাদ এদেশের পক্ষে উপকারী। এই সংশয়ের প্রথম ও প্রধান কারণ কি? পাশ্চাত্য জ্ঞান। এই পাশ্চাত্য জ্ঞান, যুবকদিগের মধ্যে, যত প্রচারিত হইতে লাগিল, তত তাঁহারা এ দেশের সকল বিষয়ের বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কি সামাজিক, কি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, সকল বিষয়ে, কি ভাল, কি মন্দ, তাহার আলোচনা চলিতে লাগিল। চিরাগত প্রথা ও বিশ্বাস সম্বন্ধে, সংশয় ও তজ্জনিত বিচার ও প্রতিবাদ, নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইতে লাগিল। বলিয়াছি যে, সংশয়ের ফল ভাল হইয়াছে। কিন্তু কেবলই যেভাল হইয়াছে, এমন নহে। ভাল, ও মন্দ দুই হইয়াছে। ভাল অনেক হইয়াছে, মন্দও হইয়াছে।

অনেক স্থলে সংশয় প্রথমে উপযুক্ত সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে। উহা কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। কিন্তু ক্রমে আপনার উপযুক্ত সীমা উল্লঙ্ঘন করে। সংশয়বাদ একটা ঝোঁক হইয়া দাঁড়ায়। ভাল, মন্দ সকল বিষয়েই লোকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিতে থাকে। ক্রমে ধর্ম্মের ও সমাজ-তত্ত্বের যাহা মূল সূত্র, তাহা লইয়া টানাটানি হইতে থাকে। এমন বিষয় থাকে না, যাহাকে সংশয়বাদী ও অবিশ্বাসী আক্রমণ করেন না। ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই সংশয় ও অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়। সংশয়ী ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে, বিশ্বজনীন সংশয়ে উপনীত হয়।

"ছিল ঢেঁকি, হ'ল তুল।
কাটতে কাটতে নির্ম্মূল॥

* "Hume roused me from my dogmatic slumber."

যাহা সকল জ্ঞানের মূল, তাহাতেও লোকে সংশয় প্রকাশ করিতে থাকে। এই পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সংশয় প্রকাশ করে। "এজগৎ কি আছে? না এ সকল স্বপ্ন দেখিতেছি?" মনের বিকৃত অবস্থায় এরূপ সংশয়ও হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষাও নিকটতর ও স্থিরতর বিষয়েও সংশয় হয়। এতদূর অস্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ উপস্থিত হয় যে, আপনার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত আপনি সন্দেহ প্রকাশ করিতে থাকে। "আমি কি আছি? আমার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? এইরূপ অদ্ভুত সংশয়ও মানুষ প্রকাশ করে।"

বাস্তবিক আপনার অস্তিত্বে আপনি সন্দেহ করার ন্যায় নির্ব্বোধের কার্য্য আর কি আছে? কেহ যদি বলে, "আমি কি আছি? আমার অস্তিত্বের প্রমাণ কি?" এই সন্দেহের উত্তরে বলি, "তুমি যদি নাই, তবে সন্দেহ করে কে? তুমি যদি নাই, তবে তোমার সন্দেহও নাই।" সন্দেহ আত্মহত্যা করিল!

সকল বিষয়েই তর্ক চলেনা। এক জন দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, আমি যে আছি তাহার প্রমাণ এই যে, আমি চিন্তা করিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক কি, এই যুক্তিতে আমর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইল? আমার অস্তিত্বের প্রমাণ হইল, আমার চিন্তা। কিন্তু আমার চিন্তার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? সে প্রমাণের আবার প্রমাণ কি? আবার তাহার প্রমাণ কি? এই রূপে অনন্ত শ্রেণী চলিয়া যাইবে, কিছুই প্রমাণ হইবে না। এক স্থানে থামিতেই হইবে। মূল সত্যে বিশ্বাস করিতেই হইবে। সকল তর্কের সীমা আছে। সকল তর্কের ভিত্তি, মূল সত্য। নতুবা কোন তর্ক সম্ভব হয় না।

এমন এক সময় ছিল, যখন এ দেশে সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, অবিশ্বাস অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। অনেক বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোক এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মবিশ্বাসীদিগকে নির্ব্বোধ মনে করিতেন। ধর্ম্মবিশ্বাসী হইলেই নির্ব্বোধ হয়, এমন নহে, এবং সন্দেহবাদী হইলেই যে, বুদ্ধিমান হয়, সকল স্থলে তাহাও নহে। বরং কোন কোন স্থলে সন্দেহে বুদ্ধির অভাব প্রকাশ পায়। বুঝিবার শক্তির অভাবে সংশয় আসে, এমন কি হয় না?

বুদ্ধিশক্তির প্রতি, তর্কশক্তির প্রতি, অতিরিক্ত শ্রদ্ধা এবং হৃদয়ের কোমল ভাব নিচয়ের প্রতি অবজ্ঞা, অনেক স্থলে সংশয়বাদ ও অবিশ্বাসের পূর্ব্ব চিহ্ন। অনেকের নিকট বুদ্ধিই 'সর্ব্বেসর্ব্বা।' হৃদয়বান সংশয়বাদী দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাও সত্য যে, অনেক স্থলে তর্কের প্রাবল্য ও হৃদয়ের শুষ্কতা, সংশয়বাদ ও অবিশাসের পূর্ব্বাবস্থা। ওজন ঠিক্ থাকে না বলিয়া অনেক স্থলে সংশয়বাদ আসে। সত্যলাভ করিতে হইলে আন্তরিক প্রকৃতির সামঞ্জস্য আবশ্যক। এস্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সুপ্রসিদ্ধ মিল সাহেবের চরিত্রে কি সামঞ্জস্য ছিল না? তাঁহার হৃদয় ও বিচারশক্তি কি সমভাবে উন্নত হয় নাই? তবে তিনি সংশয়বাদী হইলেন কেন?

মিল সাহেব সম্বন্ধে কথা এই যে, তাঁহাকে মাতৃদুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গে সংশয়বাদ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। জন ষ্টুয়ার্ট মিল যখন শিশু, তখন জেম্‌স্ মিল তাঁহাকে

শিক্ষা দিতেন, "পরমেশ্বর যদি জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে সৃষ্টি করিল কে?" এই প্রকার ভাব তাঁহার হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইত। মিল যে সম্পূর্ণ নাস্তিক না হইয়া, তাঁহার শেষ গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হয় যে, ইহার এক জন কর্ত্তা আছেন, ইহাই তাঁহার অনেক প্রশংসার কথা।

চরিত্রের অবনতি, অনেক স্থলে সংশয়বাদ ও অবিশ্বাসের কারণ। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, "The wish is father to the thought." এ কথার মর্ম্ম এই যে, যাহার যেরূপ ইচ্ছা তাহার মনের ভাব বা বিশ্বাস তদনুরূপ হইয়া থাকে। অনেক লোক, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, কেননা, ধর্ম্ম তাহাদের বিরুদ্ধে। তাহাদের যেরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ চরিত্র, তাহাতে তাহারা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে, আশ্চর্য্য কি?

ঈশ্বর পাপের শাস্তা। অতএব কোন দুষ্কার্য্যকারীর সহজেই মনে হইতে পারে যে, ঈশ্বর না থাকিলেই ভাল। এখানে যদি পাপের শাস্তি না হয়, পরকালে পাপের শাস্তি পাইতে হইবে। অতএব পরকাল না থাকিলেই ভাল। এইরূপ ইচ্ছা হইতে ক্রমে, মনে মনে, তদনুরূপ চিন্তার উদয় হয়। "কে বলিল ঈশ্বর আছেন? তাহার প্রমাণ কি? কত বড় বড় লোক নাস্তিক ছিলেন? ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ থাকিলে তাঁহারা কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না? পরকাল আছে কে বলিল? পরকাল কল্পনামাত্র। স্বর্গ, নরক সকলই কল্পনা। লোককে ভয় দেখাইবার জন্য ঈশ্বর, ও পরকাল কল্পিত হইয়াছে।"

শিশুরা কোন ভয়ের বিষয় দেখিলে অনেক সময় চক্ষু মুদ্রিত করে। দুষ্কর্ম্মীদিগের পক্ষে ঈশ্বর ও পরকাল অস্বীকার করাও সেই রূপ। ব্যাধ যখন মৃগশিশুকে আক্রমণ করে, মৃগশিশু বেগে পলাইতে থাকে। যখন দেখে, ব্যাধ একান্ত নিকটে আসিয়াছে, আর পলাইবার উপায় নাই, তখন সে একটা ঝোঁপের মধ্যে তাহার মুখ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকে। কিন্তু চক্ষু মুদিয়া থাকিলে কি ব্যাধের হস্তে নিস্তার আছে? ব্যাধ আসিয়া তাহাকে অক্লেশে ধরিয়া ফেলে। পারলৌকিক শাস্তিভয়ে যে দুষ্কর্ম্মী, পরকাল ও ঈশ্বর অস্বীকার করে, তাহারও অবস্থা অবিকল সেইরূপ।

হৃদয়ের বিকৃতি যে, অবিশ্বাস ও সংশয়ের একটি কারণ, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। স্বার্থপরতা যাহার মজ্জাগত হইয়াছে, সে নিষ্কামধর্ম্মের কি বুঝিবে? যকৃতের দোষ প্রযুক্ত যাহার ন্যাবা হইয়াছে, সে সকল বস্তুকে হরিদ্রা বর্ণ দেখিবে; কিন্তু যাহার শরীর সুস্থ, সে সেরূপ দেখিবে কেন? যাহার অরুচি রোগ হইয়াছে, শর্করার আস্বাদ তাহার নিকট তিক্ত; কিন্তু নীরোগ ব্যক্তির সেরূপ হইবে কেন? সেইরূপ, পাপবিকারে যাহার হৃদয় বিকৃত হইয়াছে, সে যদি উচ্চতর সত্য অনুভব করিতে না পারে, আধ্যাত্মিক রোগে যাহার অধ্যাত্মচক্ষু রুগ্ন হইয়াছে, সে যদি সত্য দেখিতে না পায়, তাহা কাহার দোষ? সে রূপ লোকের সহিত তর্ক করিয়াই বা কি হইবে? তাহার চিকিৎসা আবশ্যক। ন্যাবা রোগগ্রস্ত, যদি বলে, সকলই হরিদ্রা বর্ণ হইয়া গিয়াছে, সে কথা লইয়া তাহার সহিত তর্ক করিলে কি হইবে? তাহাকে চিকিৎসকের হস্তে দেও। রোগ

ভাল হইলে, সে আপনিই বুঝিবে যে, জগতের পদার্থ সকল হরিদ্রা বর্ণ হইয়া যায় নাই, তাহার রোগের জন্য ঐরূপ দেখাইতেছিল।

স্বাভাবিক জ্ঞান মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি। সকল ধর্ম্মের সাধারণ অংশ। মূল সত্য মানিতেই হইবে। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, "তবে তুমি তর্ককে ভয় কর? আপনার বিশ্বাসকে রক্ষা করিবার জন্য জ্ঞানালোককে দূরে রাখিতে চাও?" তর্ককে ভয় করি না। জ্ঞানালোককে দূরে রাখিতে চাহি না। তবে এ কথা বলি যে, কুতর্কদ্বারা অনেক অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। কিন্তু সুতর্ক বা সুযুক্তি মঙ্গলফল প্রসব করে।

জ্ঞান ও বিশ্বাসের সামঞ্জস্য চাই। জ্ঞানকে ছাড়িয়া যে বিশ্বাস, তাহা কুসংস্কার মাত্র। আবার কুতর্কের প্রাবল্যে নাস্তিকতা। কুতর্কের প্রভাবে কত লোক নাস্তিক হইয়া যায়। আবার অতীতসাক্ষী ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, জ্ঞানচর্চ্চার অভাবে জগতে চিরদিন কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে।

যুক্তিকে ভয় করি না। বিশ্বাসের ভিত্তি দেখাইয়া দেয় কে? যুক্তি। যুক্তি বলিয়া দেয় যে, সকল তর্কের মূলে, তর্কের অতীত মূল সত্য আছে। নতুবা তর্ক বা যুক্তি সম্ভব হইত না। জ্যামিতি বিদ্যার মূলে স্বতঃসিদ্ধ সত্য না থাকিলে, আদৌ স্বতঃসিদ্ধ সত্য মানিয়া না লইলে, জ্যামিতির একটী প্রতিজ্ঞাও প্রমাণ হইত না। পাটিগণিতের মূলে স্বাভাবিক সংখ্যাজ্ঞান না থাকিলে পাটীগণিত সম্ভব হইত না। সকল বিদ্যার মূলে, তর্কের অতীত মূল সত্য আছে, নতুবা কোন বিদ্যা, কোন জ্ঞান, সম্ভব হইত না। কিন্তু যে গুলিকে মূল সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, সে গুলি যে বাস্তবিক মূল সত্য, তাহা প্রতিপন্ন হওয়া চাই।

কেহ কেহ বলেন, শিক্ষাদ্বারা সকল জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু মানুষকে যে শিক্ষা দেওয়া যায়, শিক্ষা দেওয়া যে সম্ভব, ইহা দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, মূল সত্য বা সহজজ্ঞান আছে। জন্মান্ধকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা এবং বধীরকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া কি সম্ভব? যে সময়ে গায়ক তাঁহার তম্বুরায় তাল দিতেছেন, ঠিক্ সেই সময়ে বাদক তাঁহার মৃদঙ্গে আঘাৎ করিতেছেন, আবার সমজ্‌দার শ্রোতৃবর্গ ঠিক্ সেই সময়ে মস্তক নাড়িয়া 'হাঃ' বলিতেছেন। এক মুহূর্ত্তে, এক সঙ্গে, এই সমস্তগুলি কেমন করিয়া হয়? এক নিমেষ এদিক্ ওদিক্ হয় না। সোমের ঘরে যখন তাল পড়ে, কেমন এক সঙ্গে সকল গুলি হইয়া যায়! তাহাতে কত আনন্দ! কলিকাতার এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাবু ইহা কিছুতেই বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, উহা সাজোস! সকলে পরামর্শ করিয়া ঠিক্ এক মুহূর্ত্তে ঐরূপ করে! সঙ্গীতের স্বাভাবিকত্ব অনুভব করিবার শক্তি যাঁহার বিকশিত হয় নাই, তিনি ঐ প্রকার বলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

স্বাভাবিক জ্ঞান অস্বীকার করিলে, তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। জন্মান্ধ যদি বলে যে, আকাশে সূর্য্য নাই, তাহাতে সূর্য্যের সত্তা অপ্রমাণ হয় না।

প্রকৃত ধর্ম্মজীবনে কিরূপ হয়? প্রথম, স্বাভাবিক বিশ্বাস। দ্বিতীয়, জ্ঞান। তৃতীয় দর্শন। পরমেশ্বরপ্রদত্ত স্বাভাবিক বিশ্বাস

লইয়া মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে। ক্রমে স্বাভাবিক বিশ্বাস বিকশিত হয়, এবং অভিজ্ঞতা, আলোচনা ও শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানের উচ্চতম অবস্থায় সত্য প্রত্যক্ষ হয়। ধর্ম্মজীবনে সত্য প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। নতুবা কিছুই হইল না। একটী চলিত কথা আছে, "পরের মুখে ঝাল খাইওনা।" ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ সত্য। প্রত্যক্ষ ভিন্ন, দর্শন ভিন্ন, সত্য সম্ভোগ ভিন্ন, যথার্থ জ্ঞান হয় না"

"যা না দেখ নিজ নয়নে,
তা শুননা গুরুর বচনে।"

আমাদের দেশের সম্প্রদায় বিশেষে এই বচনটী প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, গুরুবাক্য অগ্রাহ্য করিবে। একথার তাৎপর্য্য এই যে, 'গুরু যাহা উপদেশ দিবেন, তাহার আলোচনা করিবে, সাধন করিবে। যতক্ষণ না সেই উপদেশ তোমার জীবনে পরিণত হয়, যতক্ষণ না উহা আত্মার আয়ত্ব হয়, ততক্ষণ কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। গুরু যে উপদেশ দিবেন, যতক্ষণ না উহা তোমার আয়ত্বীকৃত, প্রত্যক্ষীভূত হয়, ততক্ষণ তুমি নিশ্চিন্ত হইতে পার না। গুরুমুখে যে সত্য রহিয়াছে, তাহাতে কি তোমার পরিত্রাণ হইবে? সত্যকে নিজস্ব করিয়া লও।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণদত্ত এবং দ্বারবঙ্গের রাজবংশ।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে সুকবি কৃষ্ণদত্ত মিথিলায় আবির্ভূত হইয়া, 'পুরঞ্জন চরিত' ও 'কুবলয়াশ্বীয়' নামে দুই খানি নাটক প্রণয়ন করেন। এই দুই খানি নাটক ভিন্ন, কৃষ্ণদত্তের রচিত 'শাস্ত্র সংগ্রহ' নামে স্মৃতি এবং 'চণ্ডিকাচরিতচন্দ্রিকা' নামে কাব্য-গ্রন্থ মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণদত্ত দারভাঙ্গার রাজা পুরুষোত্তম ঠাকুরের সভাসদ ছিলেন। তাঁহার রচিত 'পুরঞ্জন চরিত' নাটক রাজা পুরুষোত্তমের সভায় অভিনীত হয়। তিনি দারভাঙ্গার রাজা পুরুষোত্তম ঠাকুর বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। দারভাঙ্গার বর্ত্তমান রাজবংশেরপ্রতিষ্ঠাতা মহেশ ঠক্কুর, কৃষ্ণদত্তের উল্লিখিত পুরুষোত্তমের পিতামহ। পুরুষোত্তমের পিতার নাম শোভাকর ঠাকুর। ১৫৯৫ হইতে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শোভাকর পৈতৃক জমিদারী শাসন করিয়া পরলোক গমন করেন। শোভাকরের ছয় পুত্রের মধ্যে পুরষোত্তম জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ১৬০৭-৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম পৈতৃক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দারভাঙ্গার বিস্তীর্ণ জমিদারী শাসন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুরুষোত্তমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দর ঠাকুর দারভাঙ্গায় রাজত্ব করেন। দ্বারবঙ্গের রাজা পুরুষোত্তম ঠাকুরের বিষয় অবগত থাকাতেই, বোধ হয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃষ্ণদত্তের নাটকোক্ত পুরুষোত্তমকে উড়িষ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজা পুরুষোত্তম দেব বলিয়া অনুমান করিয়াছেন *। তাঁহার এই অনুমান ভ্রান্ত ও অমূলক বলিয়া, আমাদের নিকট বোধ হইতেছে। মৈথিল কবি কৃষ্ণদত্তের পক্ষে স্বদেশ ছাড়িয়া উড়িষ্যা গমনের কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। সূর্য্য বংশীয় কপিলেন্দ্রদেবের পুত্র পুরুষোত্তম দেব ১৪৭৮-১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। পুরুষোত্তম দেবের পুত্র সুবিখ্যাত প্রতাপরুদ্র দেব (১৫০৩-৩২ খ্রীঃ) প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। কৃষ্ণদত্ত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মিথিলায় আবির্ভূত না হইলে, মিথিলা পরিত্যোগ করিয়া উড়িষ্যা দেশে রাজা পুরুষোত্তম দেবের সভায় গমন করা কৃষ্ণদত্তের পক্ষে সম্ভবপর বোধ হয় না। কৃষ্ণদত্ত খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রন্থকার বলিয়া আমাদের অনুমান হইতেছে। জন্মভূমি মিথিলার রাজসভা ত্যাগ করিয়া, আশ্রয়লাভের জন্য উড়িষ্যার রাজসমীপে গমন করা, কৃষ্ণদত্তের পক্ষে সম্ভবপর বোধ হয় না। উড়িষ্যার রাজসভায় কৃষ্ণদত্তের গ্রন্থ নীত ও অভিনীত হইলে, উড়িষ্যা দেশ হইতে 'পুরঞ্জন চরিতের অস্তিত্ব একবারে বিলুপ্ত হইত না।

দারভাঙ্গার রাজবংশের সহিত কবি কৃষ্ণদত্তের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে বিধায়, এস্থলে রাজবংশের বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করিয়া, কৃষ্ণদত্তের প্রণীত পুস্তকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভে মহেশ ঠক্কুর নামে এক জন সুপণ্ডিত ও নানা শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ, মধ্যভারতের অন্তর্গত জব্বলপুরের সন্নিহিত নর্ম্মদার তীরবর্ত্তী খণ্ডলা হইতে সপরিবারে মিথিলায় আগমন করিয়া উপনিবিষ্ট হন *। ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজা ভৈরব সিংহ হরিনারায়ণ সেই সময়ে মিথিলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই ভৈরব সিংহ সুবিখ্যাত রাজা শিব-

* Dr. R. L. Mitras "Notices of Sanskrit Mss., VI. 20.

* Sir W. Hunter's "Imperial Gazeteer of India" (1885), IV. 127.

সিংহের পিতৃব্য হরিসিংহের পৌত্র। পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় রাজপণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুরের বংশধর রাজা ভৈরব সিংহ বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এই হরিনারায়ণ ভৈরব সিংহ ও তাঁহার পুত্র রামভদ্র সিংহ রূপনারায়ণের সভায় অবস্থিতি করিয়া, বাচপতি মিশ্র বিবিধ স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

অতি অল্পকালের মধ্যেই নবাগত মহেশ ঠাকুর আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় দিয়া মিথিলার রাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করেন। মহেশ ঠক্কুর সুবিখ্যাত স্মার্ত্তপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম চন্দ্রপতি ও মাতার নাম ধীরা দেবী। ভগীরথ নামে মহেশের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে উভয় ভ্রাতায় বহুতর গ্রন্থ রচনা করেন। রত্নপাণি মিশ্র স্বপ্রণীত 'ক্ষয়মাসাদিবিবেক' গ্রন্থে মহেশ ঠক্কুরের রচিত 'তিথিতত্ত্বচিন্তামণি' ও 'মলমাস সারিণী' নামে দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। মহেশ ঠক্কুরের কৃত 'স্মৃতিসংগ্রহসার' ও 'মন্যালোকদর্পণ' পাওয়া গিয়াছে। গঙ্গেশ্বর উপাধ্যায়ের প্রণীত 'তত্ত্বচিন্তামণির' ভাষ্যরূপে জয়দেব (পক্ষধর) মিশ্রের 'মন্যালোক' রচিত হয়। এই 'মন্যালোক' অবলম্বনে, মহেশ ঠক্কুর 'মন্যালোকদর্পণ' প্রণয়ন করেন। ১৬৬৯ সংবতের (১৬১২খ্রীঃ) শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে ও রবিবারে লিখিত 'মন্যালোকদর্পণ' পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তকের আরম্ভে মহেশ ঠক্কুর আপনার পিতামাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

"গৌর্য্যা গিরীশাদিব কার্ত্তিকেয়ো }
যো ধীরয়া চন্দ্রপতেরলম্ভি।

আলোকমুদ্দীপয়িতুং নবীনং
স দর্পণং ব্যাতনুতে মহেশঃ॥" (মন্ত্রালোকদর্পণ)

উদয়নাচার্য্যের 'কুসুমাঞ্জলি' অবলম্বনে বর্দ্ধমান উপাধ্যায় 'কুসুমাঞ্জলি প্রকাশ'রচনা করেন। বর্দ্ধমানের ভাষ্য অবলম্বনে, মহেশ ঠক্কুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগীরথ "কুসুমাঞ্জলি প্রকাশ প্রকাশিকা" প্রণয়ন করেন। ভগীরথ স্বরচিত গ্রন্থের প্রথম ও শেষভাগে 'মহাদেব নামে মহেশ ঠক্কুরের উল্লেখ করিয়াছেন।

ধীরা ধরণিভবানী যমজনি চন্দ্রাদ্ ভগীরথং তনয়ং।
তস্য কৃতাবেতস্যাং সন্তঃ সন্তোষমাচরত॥
আসীদনুপমঃ পৃথ্যোং মহাদেবঃ কুলাগ্রণীঃ।
অনুজ স্তস্য কৃতবান্ ইমাং ব্যাখ্যাং ভগীরথঃ॥"
(কুসুমাঞ্জলি প্রকাশ প্রকাশিকা)

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক দুইটী ভগীরথ ঠক্কুরের প্রণীত "কিরণাবলী প্রকাশ প্রকাশিকা" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। উদয়নাচার্য্যের 'গুণকিরণাবলী অবলম্বনে, বর্দ্ধমান উপাধ্যায় যে ভাষ্য প্রণয়ণ করেন, ভগীরথ ঠক্কুর সেই ভাষ্যের টীকা রচনা করেন। কালক্রমে চন্দ্রপতির পুত্র মহেশ ঠক্কুর প্রাচীন রাজবংশের প্রধান পুরোহিতের পদে নিযুক্ত হন। শিবসিংহের পিতৃব্যের বংশধর রাজা প্রতাপরুদ্র দেব অনুমান ১৫৪৭-৫৭খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্বের পর নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের মৃত্যুর পর, প্রাচীন ব্রাহ্মণ রাজবংশ বিলুপ্ত হয়।

এক জনপ্রবাদ মতে রাজপুরোহিত মহেশ ঠাকুর দিল্লীতে গমন করিয়া আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, ও শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় প্রদানে সম্রাট আকবরকে প্রীত করেন। দিল্লীশ্বরের সামন্তরাজরূপে মহেশ ঠাকুর সম্রাটের অনুগ্রহে মিথিলার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন, এই প্রতিভাশালী মহেশ ঠাকুরই দারভাঙ্গার রাজবংশের আদি পুরুষ। অন্য জনশ্রুতি অনুসারে মহেশের শিষ্য রঘুনন্দন ঠাকুর দিল্লীশ্বর হইতে মিথিলার অন্তর্গত হাতীপরগণার শাসনকর্ত্তার ভার প্রাপ্ত হন। হাতীপরগণা বর্ত্তমান দারভাঙ্গা জিলায় অবস্থিত রহিয়াছে। স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, রঘুনন্দন স্বোপার্জ্জিত হাতী পরগণার আধিপত্য স্বীয় গুরু মহেশ ঠাকুরের হস্তে অর্পণ করেন। এই শেষোক্ত জনপ্রবাদই আমাদের নিকট অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রতীত হয়। মহেশ ঠক্কুরের পিতা চন্দ্রপতি ঠাকুর সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মিথিলায় সপরিবারে উপনিবিষ্ট হন।

হাতী পরগণার আধিপত্য লাভের পর, মহেশ ঠক্কুর ভওয়ারা গ্রামে আপনার আবাসস্থল মনোনীত করেন। ভওয়ারা গ্রাম মধুবনীর পোয়া ক্রোশ দক্ষিণে হাতী পরগণায় অবস্থিত রহিয়াছে। মহেশ ঠক্কুরের অধস্তন পঞ্চম বংশধর রাজা রঘুসিংহ (১৭০০-৩৬খ্রীঃ), ভওয়ারা গ্রামে ইষ্টকময় প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভওয়ারার বর্ত্তমান বাজারের দক্ষিণে,সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শতাধিক বৎসরেরও অধিককাল ভওয়ারা গ্রামে দ্বারবঙ্গের রাজবংশের বাসস্থল প্রতিষ্ঠিত থাকে। ১৭৬২ খ্রীঃ রাজা প্রতাপসিংহ দারভাঙ্গা নগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপিত করেন। তদবধি দ্বারবঙ্গ জনাকীর্ণ নগরীতে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। এই নগর সমগ্র ত্রিহুতের মতে সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জনসংখ্যায় দ্বারভাঙ্গার অধিবাসীর পরিমাণ ৪৭৪৫০ জন নিরূপিত হয়। ১৮৮১

খ্রীঃ ৬৭৯৫৫ জন এবং ১৮৯১খৃঃ ইহার অধিবাসী ৭৩৫৬১ জন নির্ণীত হইয়াছে।

পূর্ব্বে দ্বারবঙ্গ মুসলমান-প্রধান নগর ছিল। কাহারও মতে দরভাঙ্গি খাঁ নামে মুসলমান সেনাপতির দ্বারা এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। কাহারও মতে মুসলমান অধিকারে ইহা বঙ্গদেশের প্রবেশ দ্বার বলিয়া পরিগণিত ছিল। সেই সময়ে এক ফৌজদারের অধীনে দ্বারবঙ্গ নগরে মুসলমান সেনানিবাস সংস্থাপিত ছিল। ১৬৬১ খ্রীঃ দ্বারবঙ্গের ফৌজদার মির্জ্জা খাঁ সসৈন্যে পালামৌর রাজা অনন্ত রায়ের দমনে বিহার প্রদেশের সুবাদার ও মোগল সেনাপতি দাউদখাঁর বিশেষ সাহায্য করেন। এক্ষণে নগরের মুসলমান অধিবাসী সংখ্যা হিন্দুর এক চতুর্থ অংশ মাত্র। দ্বারবঙ্গনগর ছোট বাগমতী নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। নগরের নিম্ন দিয়া এই নদী উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইতেছে। নগরে যে সকল জলাশয় আছে, তন্মধ্যে গঙ্গাসাগর ও লক্ষ্মীসাগর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ১৮৬১ খ্রীঃ দ্বারবঙ্গ নগরে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বহেরা নামক স্থানে ইংরেজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত উপবিভাগ বর্ত্তমান থাকে। এই বর্ষে উপবিভাগীয় রাজকার্য্যালয় দ্বারবঙ্গে আনীত হয়। ১৮৭৫ খ্রী দ্বারবঙ্গ স্বতন্ত্র জিলায় প্রধান নগরে পরিণত হয়।

হাতী পরগণা হইতে রাজবংশের আধিপত্য ও ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে মিথিলায় বিস্তারিত হয়। সমগ্র মিথিলা কস্মিন্ কালেও তাহাদের পদানত হয় নাই। দ্বারবঙ্গের মোগল ফৌজদারের অধীন তাঁহার করদ সামন্তগণের মধ্যে মহেশ ঠাকুর ও তাঁহার বংশধরেরা পরিগণিত ছিলেন। দারভাঙ্গার রাজবংশ কখনও স্বাধীনতা অবলম্বনে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা যথা নিয়মে মুসলমান ফৌজদারকে করদানে সন্তুষ্ট রাখিতেন এবং অবনত মস্তকে তাহার আদেশ পালন করিতেন। তাঁহারা যত্নের সহিত ফৌজদারের সহিত সর্ব্ববিধ সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বীতা পরিত্যাগ করিয়া, জমিদারী শাসন করিতেন। এই ব্রাহ্মণ জাতীয় জমিদার বংশ দক্ষিণ বিহারের ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ন্যায় ভুজবীর্য্য ও পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক কস্মিন্ কালেও প্রাদেশিক মুসলমান শাসনকর্ত্তার প্রতিকূলতা প্রদর্শন করে নাই। এই নিমিত্ত দারভাঙ্গার প্রতি বিহারের শাসনকর্ত্তার দৃষ্টি কখনও আকৃষ্ট হয় নাই। ক্ষুদ্রতা, অক্ষমতা ও প্রভুভক্তির নিমিত্ত বাঙ্গলার ইতিহাসে দারভাঙ্গার রাজবংশের উল্লেখ মাত্র দেখা যায় না। মহেশ ঠাকুরের সময় হইতে তাঁহার প্রপৌত্র নিরপৎ ঠাকুরের শাসনকাল পর্য্যন্ত, দারভাঙ্গার রাজবংশের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই দেড় শত বর্ষের মধ্যে রাজবংশের নামমালা ভিন্ন, সাময়িক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কোনও প্রসিদ্ধ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় না। মহেশ ঠাকুরের বংশধরগণের মধ্যে নিরপৎ ঠাকুরের পুত্র রঘুসিংহ সর্ব্ব প্রথম 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিয়া, ভওয়ারা গ্রামে প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। হাতী পরগণার অধিকার প্রাপ্তির অল্পকাল পরে ১৫৫৮ খ্রীঃ মহেশ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। মহেশ ঠাকুরের পাঁচ পুত্রের মধ্যে, রামচন্দ্র ও অচ্যুতানন্দ পিতার জীবিত কালেই কালগ্রাসে পতিত হন। মহেশের দ্বিতীয় পুত্র

গোপাল ঠাকুর পৈতৃক পদ প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর পরে ধর্ম্মাত্মা গোপাল ভওয়ারা পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী নগরে গমন করেন। তথায় ১৫৮৫ খ্রীঃ গোপালের মৃত্যু হয়। গোপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দ (১৫৮৫-৯৫ খ্রীঃ) ও শোভাকর ঠাকুর (১৫৯৫-১৬০৭ খ্রীঃ) তাঁহার পর জমিদারী শাসন করিতে থাকেন। ১৬০৭ খ্রীঃ শোভাকরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তম পৈতৃক পদে অধিষ্ঠিত হন। সুকবি কৃষ্ণদত্ত ও লক্ষ্মীনারায়ণ পুরুষোত্তম ঠাকুরের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

পুরুষোত্তমের ভ্রাতা নারায়ণ ঠাকুরের বংশধরেরা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দারভাঙ্গায় রাজত্ব করিতেছেন। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষোত্তম ঠাকুরের মৃত্যু ঘটে। অনন্তর তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দর ঠাকুর ভ্রাতার পদে আসীন হন। ১৬৪২-১৭৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সুন্দর ঠাকুর ও তাঁহার অধস্তন বংশধরেরা জমিদারী শাসন করিতে থাকেন। সরসরাম নামে বৈষ্ণব কবি সুন্দর সিংহের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন*। রাজা সুন্দর ঠাকুরের মৃত্যুর পূর্ব্বে ১৬৬১খ্রীঃ দারভাঙ্গার ফৌজদার মির্জ্জা খাঁ চৈনপুরের জাইগীরদার তহব্বর খাঁ এবং খরজপুরের রাজা বিরুজের সহিত পালামৌর রাজা অনন্ত রায়ের দমন এবং পালামৌ অধিকারে, বিহারের সুবাদার দাউদ খাঁর বিশেষ সহায়তা করেন। এই মির্জ্জা খাঁ গোরখপুরের ফৌজদার ইলাবর্দ্দি খাঁর সহিত সম্মিলিত হইয়া, ১৬৬৪খ্রীঃ দারভাঙ্গার উত্তরস্থ পার্ব্বত্য মোরঙ্গ প্রদেশ আক্রমণ করেন। সমগ্র প্রাচীন মিথিলা এই সময়ে মির্জ্জা খাঁর শাসনাধীনে ছিল। সারণ, চম্পারণ, ত্রিহুত ও হাজিপুর এই চারি সরকারে উত্তর-বিহার বিভক্ত ছিল। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দর ঠাকুরের মৃত্যু ঘটে।

*"কবি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবি," ১৩২পৃষ্ঠা।

সুন্দর ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র মহীনাথ (১৬৬২-৮৪ খ্রীঃ) এবং নিরপৎ ঠাকুর (১৬৮৪-১৭০০ খ্রীঃ) পৈতৃক জমিদারী শাসন করিতে থাকেন। নন্দীপতি, রমাপতি, মহীপতি, চতুর্ভুজ, চক্রপাণি, জয়ানন্দ ও কবিশেখর ভঞ্জন নামে বৈষ্ণব কবি, তাঁহাদের শাসনকালে ত্রিহুতে আবির্ভূত হন। ১৭০০ খ্রীঃ নিরপৎ ঠাকুরের মৃত্যুর পর, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রঘুসিংহ পৈতৃক পদে উপবিষ্ট হন। এই রঘুসিংহ ভওয়ারার আবাসবাটী মৃণ্ময় প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়া, তথায় এক মৃন্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভওয়ারায় অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। এই রঘুসিংহই দারভাঙ্গা রাজবংশের আধিপত্য প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহই তাঁহার ন্যায় পরাক্রান্ত হইতে পারেন নাই।

সুলতান আজিম উস্‌মানের অধীনে নবাব মহাবৎ জঙ্গ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিহারের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। পাটনা নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। নবাব মহাবৎজঙ্গকে প্রভূত পরিমাণে নজর দিয়া, রঘুসিংহ 'রাজা' উপাধি প্রথমত গ্রহণ করেন। এক লক্ষ টাকা বার্ষিক জমায় রাজা রঘুসিংহ সরকার ত্রিহুতের ইজারাদারী পদে অধিষ্ঠিত হন। নবাবের দেওয়ানের পদে রাজা ধরণীধর নামে একজন বিচক্ষণ হিন্দু কর্ম্মচারী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা রঘুসিংহ এই পরাক্রান্ত দেওয়ান ধরণীধরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা

বার্ষিক প্রদানের অঙ্গীকার দ্বারা আপনার বশে আনয়ন করেন। রাজা ধরণীধরের সাহায্যে নির্ব্বিবাদে রাজা রঘুসিংহ ত্রিহুত শাসন করিতে থাকেন।

আমরা এইস্থলে দারভাঙ্গার রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বংশাবলী প্রদান করিয়া, ভ্রাতষ্পুত্র একনাথ ঠাকুরের সহিত রাজা রঘুসিংহের গৃহবিবাদের বিষয় বর্ণন করিব।

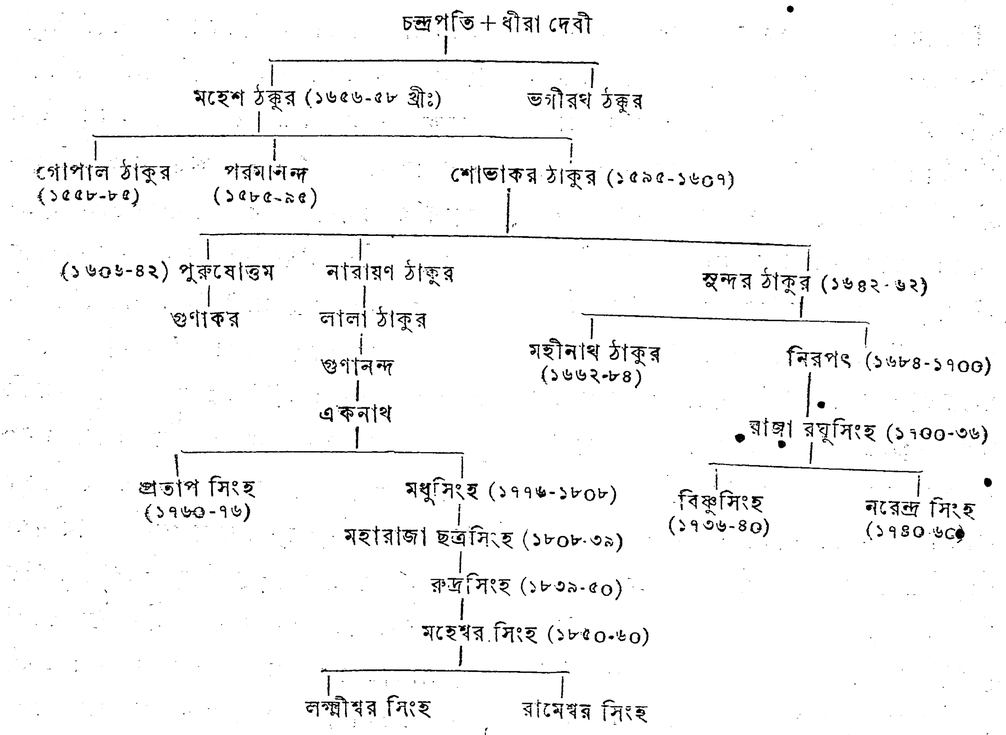

সুন্দর ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণের প্রপৌত্র একনাথ ঠাকুর আপনার পিতৃব্য রাজা রঘুসিংহের জমিদারীর অংশলাভের জন্য বিবাদ আরম্ভ করিলেন। পিতৃব্যের সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, একনাথ ঠাকুর পাটনার নবাব সমীপে গমন করিলেন। ত্রিহুতের ইজারাদারী হইতে রাজা রঘুসিংহ প্রজাবর্গের প্রতি অত্যন্ত দৌরাত্ম দ্বারা প্রভূত লাভ করিতেছেন, এই কথা একনাথ ঠাকুর নবাব মহাবৎ জঙ্গকে জ্ঞাপন করিলেন। ১৬৮৫ খ্রীঃ সরকার ত্রিহুতের বার্ষিক রাজস্ব ৭৬৯২৮৭ সিক্কা টাকা নির্দ্ধারিত ছিল বলিয়া একনাথ নবাবকে জানাইলেন। এই সংবাদে নবাব মহাবৎ জঙ্গ রাজা রঘুসিংহের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বয়ং ত্রিহুতে উপনীত হইলেন। নবাব রাজার যাবতীয় সম্পত্তি অধিকার করার ঘোষণা করিলে, রঘুসিংহ ভওয়ারার মৃণ্ময় দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। নবাব রঘুসিংহের নিরাশ্রয় পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া, পাটনায় লইয়া আসিলেন। এইরূপে একনাথ ঠাকুরের সহিত বিরোধে রাজা রঘুসিংহের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। রঘুসিংহকে পদচ্যুত ও হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া, একনাথ ঠাকুরের ভাগ্যে ত্রিহুতের আধিপত্য লাভ ঘটিয়া উঠে নাই।

নবাব মহাবৎ জঙ্গের ক্রোধ কিছুকাল পরে প্রশমিত হইল। নবাব রাজা রঘুসিংহকে অভয়দান করিয়া পাঠাইলেন।

নবাবের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, রঘুসিংহ আত্মসমর্পণ করিলেন। অনন্তর নবাব তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া, রাজা রঘুসিংহের হস্তে ত্রিহুতের শাসনভার পুনরায় অর্পণ করিলেন। রঘুসিংহ সরকার ত্রিহুতের রাজস্ব-সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কয়েক খানি গ্রাম নিষ্কর উপভোগের জন্য প্রাপ্ত হইলেন। 'সায়ের' করের কিয়দংশ স্বয়ং গ্রহণ করিতে রাজা রঘুসিংহ আদিষ্ট হইলেন। রাজস্ব-সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইয়া, রাজা রঘুসিংহ যথারীতি ত্রিহুত শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক যথাসাধ্য তাহাদের কষ্ট দূরীভূত করিয়া, প্রজাপুঞ্জের আশীর্ব্বাদ সহ পাটনার নবাবের অনুগ্রহ লাভ করিলেন। আমরণ রাজা রঘুসিংহ ত্রিহুতের শাসনকার্য্য দক্ষতা ও কৌশলের সহিত নির্ব্বাহ করেন। নবাব মুরসিদ কুলি খাঁর সময়ে (১৭০৭-২৫খ্রীঃ) রাজা রঘুসিংহ ত্রিহুতের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ১৭৩৬ খ্রীঃ রাজা রঘুসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুসিংহ পৈতৃক পদে নিযুক্ত হন। ১৭৪০ খ্রীঃ অপুত্রক অবস্থায় বিষ্ণুসিংহের মৃত্যু হয়। বিষ্ণুসিংহের শাসনকালে, বরারের শাসনকর্ত্তা নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ নামে মুরসিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিয়া ১৭৩৯-৫৬ খ্রী পর্য্যন্ত অতি দক্ষতার সহিত বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন।

রাজা বিষ্ণু সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্র সিংহ ত্রিহুতের শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। নরেন্দ্র সিংহের বিশ্বস্ততা ও কার্য্যদক্ষতায় নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বিশেষরূপে প্রীত হন। নবাবের আদেশ ক্রমে তিনি নিম্নোলিখিত মতে দস্তরাত (সায়ের জমা) গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহাতে জমিদারীর রাজস্বের উপর দশ টাকা শতকরা হারে মালিকানা, এবং প্রজার প্রদত্ত প্রতি কবুলীয়তের টাকায় শতকরা দুই টাকা হিসাবে সুদ এবং প্রতি টাকায় দুই আনা হারে দস্তুরী গ্রহণ করিতে নরেন্দ্র সিংহ অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহা ভিন্ন সরকার ত্রিহুতের অন্তর্গত ১০২ পরগণার প্রতি মৌজায় বার্ষিক দেড় টাকা হারে জমা লওয়ার অধিকারী হন। এই নরেন্দ্র সিংহের সময়ে চন্দ্র ঝা মৈথিল ভাষায় 'রামায়ণ' অনুবাদ করেন এবং মংগ্রৌণী গ্রামের লাল ঝা মৈথিল কবিতা রচনা করিয়া কনৈল গ্রাম নিষ্কর উপভোগের জন্য প্রাপ্ত হন। অদ্যাপি সেই গ্রাম লাল ঝার বৃদ্ধপ্রপৌত্রের অধিকারে রহিয়াছে। বক্সী গোকুলনাথ ঝার ভুজবীর্য্যে রাজা নরেন্দ্র সিংহ কনরপী ঘাটের যুদ্ধে বিহারের বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধ-কাহিনী মৈথিল ভাষায় কবি লাল ঝার দ্বারা 'কনড়পী ঘাট লড়াই' নামে বর্ণিত হইয়াছে। দারভাঙ্গা জিলার সর্ব্বত্র এই গীত শুনা যায়*। রাজা নরেন্দ্র সিংহের সময়ে পলাসীর যুদ্ধের পর ইংরেজ অধিকার বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হয়।

রাজা নরেন্দ্র সিংহের কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। এই নিমিত্ত তিনি একনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিংহকে দত্তক রূপে গ্রহণ করেন। ১৭৬০ খ্রীঃ নরেন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর রাজা প্রতাপ সিংহ ত্রিহুতের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৭৬২ খ্রীঃ প্রতাপ সিংহ পৈতৃক আবাসস্থল

* Journal of Asiatic society of Bengal for 1885. part I. p. 16.

ভওয়ারা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, দারভাঙ্গা নগরে আপনার বাসস্থল নির্ম্মাণ করেন। সেই সময়ে বর্ত্তমান প্রকাণ্ড ও সুন্দর রাজবাটীর সূত্রপাত হয়। বর্ত্তমান রাজবাটী প্রায় ৯০ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত। ১৬৭৩ খ্রীঃ নবাব কাশিম আলি খাঁ রাজা প্রতাপ সিংহের বাজে (দস্তরাত) গ্রহণের অধিকার দৃঢ়ীভূত করেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ; ১২ আগষ্ট তারিখে ইংরেজরাজ বাঙ্গালা ও বিহারের দেওয়ানী পদ লাভ করিয়া বঙ্গদেশে আপনাদের অব্যাহত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৬৬ খ্রীঃ ত্রিহুতের অন্তর্গত ৩টী পরগণা মহম্মদ রেজা খাঁর সহিত ১৪২০৭০ টাকায়, মহেন্দ্র নারায়ণের সহিত এক পরগণা ৬৫১১২ এবং দমন সিংহের সহিত অন্য এক পরগণা ৪৪৯৮৩ টাকায় বন্দোবস্ত হয়। ১৭৭১ খ্রীঃ কলিকাতার ইংরেজ গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেব দ্বারা রাজা প্রতাপ সিংহ পদচ্যুত হইয়া, স্বীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হন। রাজা প্রতাপ সিংহ এক হাজার টাকা মাসিক বৃত্তি পাইতে থাকেন। রাজার যাবতীয় ভূসম্পত্তি, নানাকর, মালিকানা ও দস্তরাৎ গ্রহণের কার্য্য ইংরেজরাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া রাজা নরেন্দ্র সিংহের বিধবা পত্নীকে ভরণ পোষণের জন্য দশ খানি গ্রাম নিষ্কর প্রদান করেন। সেই সময়ে প্রতাপ সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসিংহ দুইখানি নিষ্কর উপভোগের জন্য প্রাপ্ত হন। ১৭৭৬ খ্রীঃ সম্রাট সাহ আলম হইতে রাজা প্রতাপ সিংহ পূর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত ধরমপুর পরগণার আধিপত্য লাভ করেন। ১৭৭৬ খ্রীঃ রাজা প্রতাপ সিংহের মৃত্যু ঘটে। রাজা প্রতাপ সিংহের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর, মধু সিংহ ভ্রাতার পদে অধিষ্ঠিত হন। মধুসিংহের সময়ে (১৭৭৬-১৮০৮ খ্রীঃ) ইংরেজরাজের সহিত নানা বিষয়ে বিবাদ, বিসংও মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। মধুসিংহের তেজস্বিতা ইংরেজরাজের বিরাগ উৎপাদন করে। বিগত আট বৎসরের দস্তরাৎ পাওয়ার দাবীতে রাজা মধুসিংহ ১৭৭৮ খ্রীঃ কলিকাতায় ইংরেজ গবর্ণর জেলারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবর নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। গবর্ণর জেনারেলের আদেশে পাটনার কোষাগার হইতে, রাজা মধুসিংহের প্রার্থিত ১৯৩০০০ টাকা প্রদত্ত হয়। ইহাতে স্থানীয় রাজপুরুষেরা মধুসিংহের প্রতি একান্ত বিরক্ত হয়। ১৭৮২ খ্রীঃ সরকার ত্রিহুতের অন্তর্গত ১০২ পরগণার মধ্যে ৮৪ পরগণা ২০০২২৯ সিক্কা টাকা বার্ষিক জমায় রাজা মধুসিংহের সহিত বন্দোবস্ত হয়। পাটনার কালেক্টর বেথারষ্ট সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে লিখিয়া পাঠান যে, রাজা মধুসিংহ জমিদারীর শাসনকার্য্যে একান্ত অক্ষম। ১৭৮৮ খ্রীঃ বার্ষিক রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়াতে, মধুসিংহ পাটনায় আনীত হইয়া, কারারুদ্ধ হন। এই বৎসর মে মাসে পাটনার ইংরেজ কালেক্টর মধুসিংহের বিরুদ্ধে অনেক কথা কলিকাতায় লিখিয়া পাঠান, মধুসিংহের উপদ্রব, উৎপীড়ন, ও অত্যাচারে ত্রিহুত জনশূন্য হইয়া উঠিয়াছে। রাজা মধুসিংহ জমিদারী শাসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাঁহার দস্তরাৎ গ্রহণের অধিকার রহিত করিয়া, রাজাকে পূর্ব্ববৎ মাসিক হাজার টাকা বৃত্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। ১৭৮৯ খ্রীঃ রাজা মধুসিংহ ২৯৫১৮১ টাকা বার্ষিক কর আদায়ের অঙ্গীকারে আপনার পৈতৃক

জমিদারীর বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। অঙ্গীকার অনুসারে এই রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইলে, ১৭৬৯ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে রাজা মধুসিংহের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া অন্যত্র বন্দোবস্তের উদ্যোগ হয়। জমিদারগণের সহিত দশশালা বন্দোবস্ত প্রদানের আদেশ প্রচারিত হইলে, কালেক্টরের প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকারে, রাজা মধুসিংহ ত্রিহুতের জমিদারীর বন্দোবস্ত লইতে অসম্মত হন। মালিকানা ও দস্তরাৎ গ্রহণের অধিকার না পাইলে, প্রস্তাবিত রাজস্ব আদায়ে আপনার অসমর্থতা জ্ঞাপন করেন। এই নিমিত্ত ১৭৯০ খ্রীঃ দুই জন মুসলমান ঠিকাদারের সহিত রাজ মধুসিংহের জমীদারী ইজারার বন্দোবস্ত হয়। ফৈজ উদ্দিন ও বরকত উল্লা খাঁ নামে পাটনার দুই জন ধনী ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান এই জমিদারীর ইজারা গ্রহণ করেন।

রাজা মধুসিংহের ষড়যন্ত্রে প্রজাগণ স্ব স্ব দেয় কর প্রদানে বিলম্ব করিতে লাগিল। ইহাতে ইজারাদারগণের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল। ১৭৯১ খ্রীঃ নবেম্বর মাসে ফৈজ উদ্দিন খাঁ আপনার অংশের ইজারাদারী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অশ্ব হইতে পতিত হওয়াতে, পাটনায় বরকত উল্লা খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ত্রিহুতের ইজারাদারী গ্রহণে অসম্মত হয়। রাজা মধুসিংহ নিরূপিত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস না হইলে, জমিদারী শাসনের ভার গ্রহণে অসম্মত হয়েন। অনন্তর ১৭৯৩-১৮০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ইজারাদারের সহিত রাজার জমিদারী বন্দোবস্ত প্রদত্ত হয়। ১৮০০ খ্রীঃ ইজারার মিয়াদ অতীত হয়। কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডের আদেশে, মালিকানা ও দস্তরাৎ বাদে ১৩৮৫০৬ টাকায় রাজার সহিত বন্দোবস্ত করিতে পাটনার কালেক্টর অপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। রাজা মধুসিংহ ১৪৮২২৭ টাকায় বন্দোবস্ত লইতে সম্মত হন। কালেক্টর ইহাতে অসম্মত হইয়া, পুনরায় বিভিন্ন ইজারাদারের নিকট জমিদারীর শাসনভার অর্পণ করেন। কিছু কাল পরে রাজা মধুসিংহ পূর্ব্ব প্রস্তাবিত বার্ষিক রাজস্বের অপেক্ষা দশ হাজার টাকা অধিক দিতে সম্মত হইলে, বোর্ডের আদেশে তাঁহার সহিত জমিদারীর বন্দোবস্ত হয়। দারভাঙ্গা রাজের জমিদারী দারভাঙ্গা, মজফরপুর, ভাগলপুর, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া জিলায় বিস্তারিত রহিয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর বার্ষিক আয় ২৩৮০০০০ টাকা এবং রাজস্ব ৪২৮২১০ টাকা বলিয়া ১৮৮৫ খ্রীঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১৮০৮ খ্রীঃ দারভাঙ্গার রাজা মধুসিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ছত্র সিংহ জমিদারীর শাসনভার প্রাপ্ত হন। পিতার জীবদ্দশাতেই ছত্রসিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিষণ সিংহের মৃত্যু হয়। ছত্রসিংহের পৈতৃক পদ প্রাপ্তির সময়ে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা বিভিন্ন পরগণার আধিপত্য প্রাপ্ত হন। এইরূপে জবদী পরগণা কিরাত সিংহের, পাহারপুর গোবিন্দ সিংহের এবং পচ্ছী পরগণা রঘুসিংহ ও সমাপৎ সিংহের হস্তগত হয়। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ছত্রসিংহ 'মহারাজা' উপাধি প্রথমতঃ প্রাপ্ত হন। বিখ্যাত পণ্ডিত রত্নপাণি মিশ্র এই ছত্রসিংহের সভায় থাকিয়া, বিবিধ গ্রন্থ সংস্কৃতে রচনা করেন। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৮৩৯ খ্রীঃ

বার্দ্ধক্য ও অক্ষমতা প্রযুক্ত ছত্রসিংহ সাংশরিক ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রসিংহের প্রতি সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসনভার অর্পণ করেন। পারিবারিক প্রথা ও চিরন্তন আচার অনুসারে রুদ্রসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাসুদেব সিংহ জরৈল পরগণা পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে উপভোগের জন্য প্রাপ্ত হন। নিঃসন্তান অবস্থায় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের মৃত্যু হইলে, তাঁহাদের অধিকারস্থ ভূসম্পত্তি জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকে।

ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর বাসুদেব ভ্রাতার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, হিন্দু দায়াধিকার ব্যবস্থা অনুসারে তিনি পৈতৃক জমিদারীর অর্দ্ধভাগের অধিকারী, এই হেতুবাদে বাসুদেব সিংহ ২৪৪৬৯৫৮ টাকার দাবীতে মহারাজ রুদ্র সিংহের নামে ত্রিহুত জিলার জজ আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। পারিবারিক প্রথামতে জ্যেষ্ঠানুক্রমে মহারাজ রুদ্রসিংহই জমিদারীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আপনার ভরণপোষণের উপযোগী ভূসম্পত্তি ভিন্ন আর কিছুই পাওয়ার অধিকারী নহেন। এই হেতুবাদে জিলার জজ রাট্রে সাহেব বাসুদেব সিংহের দাবী আগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে নিম্নতন বিচারালয়ের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। এই মোকদ্দমা উপলক্ষে মহারাজ রুদ্রসিংহ অনেক ক্ষতি ও ঋণগ্রস্ত হন।

১৮৫০ খ্রীঃ মহারাজ রুদ্রসিংহের মৃত্যু হয়। মহেশ্বর, গণেশ্বর, নেত্রেশ্বর ও গোপেশ্বর নামে চারি পুত্র রাখিয়া, রুদ্রসিংহ কালগ্রাসে পতিত হন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহেশ্বর সিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হন। দশ বৎসর কাল নির্ব্বিবাদে জমিদারী শাসন করিয়া, ১৮৬০ খ্রীঃ ২০শে অক্টোবর তারিখে ঝঞ্ঝারপুরে মহারাজ মহেশ্বর সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার জমিদারীর বার্ষিক আয় ষোল লক্ষ টাকা ছিল। ৭০ লক্ষ টাকা দেনা রাখিয়া,মহেশ্বর সিংহ পরলোক গমন করেন। লক্ষ্মীশ্বর ও রামেশ্বর নামে তাঁহার দুইটী শিশু সন্তান ছিল।

পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীশ্বর পৈতৃক পদে অভিষিক্ত হন। বালক মহারাজা ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর শিক্ষা লাভের জন্য বারাণসী নগরে প্রেরিত হন। সেখানে কর্ণেল ম্যাকনেটন্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে উভয় ভ্রাতা সযত্নে শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। ইংরেজরাজ স্বহস্তে রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে রাজ্যের দেনা সত্তর লক্ষ টাকা পরিশোধ হয় এবং বার্ষিক আয় চারি লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৩ খ্রীঃ রাজকোষে ৫৪৭৬০০০ টাকা সঞ্চিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় এই সঞ্চিত অর্থের ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রজাবর্গের প্রাণরক্ষণে ও দাতব্য কার্য্যে ব্যয়িত হয়। ১৮৭৯ খ্রীঃ মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া, স্বহস্তে রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে বঙ্গদেশীয় জমিদারবর্গের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহের অকালমৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। মৃত মহারাজের প্রেতাত্মার তৃপ্তিসাধন উপলক্ষে দরিদ্র লোকের অভাব ও দুর্দ্দশা মোচনের জন্য

বর্ত্তমান মহারাজা রামেশ্বর সিংহ অকাতরে লক্ষাধিক মুদ্রা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ব্যয় করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদানুসরণ করিয়া, বর্ত্তমান মহারাজ স্বদেশের সেবায় আপনার জীবন উৎসর্গীকৃত করিলে সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার যশের সৌরভে পূর্ণ হইবে। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া, স্বদেশের সেবায় নিযুক্ত রাখুন।

দারভাঙ্গা রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। এক্ষণে পুরুষোত্তম ঠাকুরের সভাসদ সুকবি কৃষ্ণদত্তের রচিত গ্রন্থের সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া, প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ভাগবত পুরাণের অন্তর্গত বিষ্ণুভক্ত পুরঞ্জনের উপাখ্যান অবলম্বনে, সুকবি কৃষ্ণদত্ত পাঁচ অঙ্কে 'পুরঞ্জনচরিত নাটক' প্রণয়ন করেন। নাটকের আরম্ভে দুইটী শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া, কৃষ্ণদত্ত স্বরচিত নাটকের বিষয় অবতারণা করিয়াছেন।

"সূত্রধারঃ। ... ... নিরুপাধি-পরোপকার জাগরূক-যশোভার- ঘনসার প্রসার- সুরভীকৃত সংসারস্য পরমরমণীয়াকারস্য শ্রীদিবাকর-পুরুষোত্তমস্য সভায়াং...সুখোপবিষ্টানাং-শিষ্টানাং দেশবিদেশ বাস্তব্যানাং শাস্ত্রিণাং ব্রাহ্মণানাং রাজকার্য্যভারিণাং ব্যাপারিণাচ্চ মণ্ডলী সমুল্লসতি। তদত্র নবীনং কিমপি নাটকমভিনেতব্যমিতি। ... ... যৎ কিল মৈথিল-কৃষ্ণদত্তকবিনা পুরঞ্জনচরিতং নাম নাটকং নির্ম্মায় অস্মাসু সমর্পিতং, তদভিনয়েনারাৎনমস্য সংভবিষ্যতি।"

এই 'পুরুষোত্তম' পদদ্বারা উড়িষ্যার মহারাজ পুরুষোত্তম দেব বর্ণিত হইলে, 'গজপতি' 'নরপতি' প্রভৃতি বিশেষণ নামের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই প্রযুক্ত হইত। পুরঞ্জন চরিত নাটকের যে প্রতিলিপি দারভাঙ্গার অন্তর্গত সারদাপুরে পণ্ডিত হর্ষনাথ ঝার গৃহে বিদ্যমান আছে, তাহা মৈথিল অক্ষরে ১৭০১ শকাব্দে দ্বিজ হেমনাথের দ্বারা লিখিত হয়।

"শাকেঽব্দে ধরণী-বিয়ন্মুনিধরা-সম্ভাষমানে শুভে
মাঘে মাসি দিবামানৌ মকরগে বিষ্ণে স্তিথৌ সাদরং।
শ্রীমন্মৈথিল কৃষ্ণদত্তকৃতিনা যন্নির্ম্মিতং নাটকং
প্রালেখীত্তদিদং মুদ্রা দ্রুততরং শ্রীহেমনাথ দ্বিজঃ॥"
(পুরঞ্জনচরিত)

কৃষ্ণদত্ত শত অঙ্কে "কুবলয়াশ্বীয়"নাটকে কুবলয়াশ্ব নামে ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত মদালসা নাম্নী যুবতীর প্রেম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

"কৃষ্ণদত্ত ইতি মৈথিল কবিঃ
বালতাবকুলভাৎ কুতূহলাৎ।
নাটকং যদভিনব্যমাতনেৎ॥"
কোঽত্রে সম্প্রতি গুণাগুণগ্রহং॥" (কুবলয়াশ্বীয়)

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত বিখ্যাত 'চণ্ডী মাহাত্ম্য' অবলম্বনে, কৃষ্ণদত্ত একাদশ সর্গে "চণ্ডীচরিত চন্দ্রিকা" নামে কাব্য রচনা করেন। 'শাস্ত্রসংগ্রহে' কৃষ্ণদত্ত বিবিধ দর্শনের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া ভগবানের প্রতি ভক্তিই মুক্তিলাভের উপায়—এই মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

"আধায় হৃদি বিশ্বেশং বিশ্বেষাং হিতসাধকং।
ক্রিয়তে কৃষ্ণদত্তেন সর্ব্বশাস্ত্রস্য সংগ্রহঃ॥"(শাস্ত্রসংগ্রহ)

কৃষ্ণদত্তের পিতামাতার নাম বা বাসস্থলের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তিনি দারভাঙ্গার রাজা পুরুষোত্তম ঠাকুরের সভায় বিদ্যমান থাকিয়া, যে চারি খানি পুস্তক রচনা করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। প্রসঙ্গক্রমে দ্বারবঙ্গের বিখ্যাত রাজবংশের বিবরণ এই প্রবন্ধে সংগৃহীত হইয়াছে।

কৃষ্ণদত্তের সমসাময়িক রাজপণ্ডিত লক্ষ্মী নারায়ণ। লক্ষ্মী নারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীদত্ত একবিংশতি সর্গে 'পাণ্ডবচরিত" নামে মহাকাব্য রচনা করেন। চন্দ্রদত্ত নামে অপর এক বৈষ্ণব মৈথিল কবি সুপ্রসিদ্ধ জয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ কাব্যের অনুকরণে "শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী" ও "কাশীগীতা' রচনা করেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।*

শ্রীম—কথিত।

[শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীগিরীশ ঘোষ ইত্যাদির সহিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে কথা ও তাঁহার নানাবিধ ভাবাবেশ।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[রাজপথে।]

গিরীশের নিমন্ত্রণ। রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত ৯টা হবে। বলরামও, ঠাকুর খাবেন বলে, রাত্রে খাবার প্রস্তুত করেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট করেন, ঠাকুর গিরীশের বাড়ী যাইবার সময় তাই বুঝি বলিলেন—বলরাম, তুমিও খাবার পাঠিয়ে দিও।

হুতালা হইতে নীচে নামিতে নামিতেই ভগবদ্ভাবে বিভোর। যেন মাতাল। সঙ্গে—নারাণ, মাষ্টার। পশ্চাতে রাম, চুনী ইত্যাদি অনেক। একজন ভক্ত বলিলেন, সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন, একজন হলেই হলো।

নামিতে নামিতেই বিভোর। নারাণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারাণকে বলিলেন, হাত ধরলে লোকে মাতাল মনে করবে, আমি অমনি চলে যাব।

বোস পাড়ার তেমাতা পার হলেন—কিছুদূরেই শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষের বাড়ী। এত শীঘ্র চলছেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে পড়ে থাকছে। না জানি হৃদয় মধ্যে কি অদ্ভুত দেব-ভাব হইয়াছে। বেদে যাহাকে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি পাগলের মত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন? এইমাত্র যে বলরামের বাড়ীতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্যমনের অতীত নহেন; তিনি শুদ্ধমনের, শুদ্ধবুদ্ধির, শুদ্ধআত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার করছেন। এই কি দেখছেন—"যো কুচ্ হায় সো তুঁহিহায়?"

এই যে নরেন্দ্র আসিতেছেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া পাগল; কৈ নরেন্দ্র ত সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর ত কথা কহিলেন না। লোকে বলে, এর নাম ভাব, এইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের হইত। কে এ ভাব বুঝিবে?

গিরীশের বাড়ী প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্তগণ। এইবার—নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিলেন।

নরেন্দ্রকে বললেন, "ভাল আছ, বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।"—কথার প্রতিঅক্ষর করুণামাখা। তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই; হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

* শ্রীযুক্ত মঃ প্রতিবারই দয়া করিয়া অন্য কাগজে প্রকাশের পূর্ব্বে কথামৃত নব্যভারতে দিয়া থাকেন। এই অংশ অন্য কাগজে অগ্রে প্রকাশিত হইয়াছে। নব্যভারতের পাঠকগণের নিকট ইহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রকাশ করিতে দিয়াছেন। ন, স।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, একটা কথা—এই একটী (দেহী?) ও একটী জগৎ!

'জীব জগৎ' এসব কি ভাবে দেখিতেছিলেন, তিনিই জানেন। অবাক্ হয়ে দেখছিলেন। দু একটী কথা উচ্চারিত হইল, যেন বেদবাক্য—যেন দৈববাণী—অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়েছি, আর যেন অনন্ত-তরঙ্গমালোত্থিত অনাহত শব্দের একটী দুটী ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত মন্দিরে]

দ্বারদেশে গিরীশ; ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গৃহ মধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরীশ দণ্ডের ন্যায়সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলা গ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া দুতালায় বৈঠকখানার ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা সসব্যস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করিলেন—সকলের ইচ্ছা তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান করেন।

[সংবাদপত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা, বিষয়কথা, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা তাই অপবিত্র—তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা যাহাতে স্থানান্তরিত করা হয়। কাগজখানা সরানো হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন।

(নিত্যগোপাল)

নিত্যগোপাল প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিত্যগোপালের প্রতি) ওখানে——?

নিত্য। আজ্ঞা হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাইনি, শরীর খারাপ, ব্যথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন আছিস্?

নিত্য। ভাল নয়—

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই এক গাম নীচে থাকিস্।

নিত্য। লোক ভাল লাগে না। কত কি বলে—ভয় হয়।—এক এক বার খুব সাহস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাহবে বৈ কি? তোর সঙ্গে কে থাকে?

নিত্য। তারক। * ও সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকে; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ন্যাঙ্‌টা বল্‌তো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল।—সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেতো—গণেশগর্জ্জী—সঙ্গী যেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য্য হয়ে গিয়েছিল।

বলিতে বলিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। আবার কি ভাবে অবাক্ হয়ে রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, 'তুই এসেছিস্? আমিও এসেছি!' এ কথা কে বুঝিবে? এই কি দেব-ভাষা?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[পার্ষদ সঙ্গে।]

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), গিরীশ, রাম, হরিপদ, চুনী, বলরাম, মাষ্টার্ ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

[অবতার সম্বন্ধে বিচার]

নরেন্দ্র মানেন না যে, মানুষে ঈশ্বর অবতার হন্। এদিকে গিরীশের জলন্ত বিশ্বাস যে, তিনি যুগে যুগে অবতার হন, আর মানব-দেহ ধারণ করে মর্ত্তলোকে আসেন। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা যে, এসম্বন্ধে দুজনে বিচার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (গিরীশের প্রতি) একটু ইংরাজিতে দুজনে বিচার করো—আমি দেখবো।

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজিতে হইল না—বাঙ্গালাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু একটা ইংরাজি কথা। নরেন্দ্র বলিলেন, ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয়।

[Doctrine of Equality]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। ওরও যা মত, আমারও তাই মত। তিনি সর্ব্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে—শক্তি বিশেষ। কোন খানে অবিদ্যা শক্তির প্রকাশ, কোন খানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

রামদত্ত। এ সব মিছে তর্কে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত ভাবে)। না, না; ওর একটা মানে আছে।

গিরীশ। (নরেন্দ্রের প্রতি)। তুমি কেমন করে জানলে, তিনি দেহ ধারণ করে আসেন না?

নরেন্দ্র। তিনি অবাঙ্মনসোগোচরং।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তিনি শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধআত্মা, একই। ঋষিরা এই শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধআত্মা দ্বারা সেই শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

গিরীশ (নরেন্দ্রের প্রতি)। মানুষে অবতার না হলে, কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞানভক্তি দিবার জন্য তিনি দেহ ধারণ করে আসেন। না হলে কে শিক্ষা দিবে?

নরেন্দ্র। কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। হাঁ, হা, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাবেন।

তারপর ঘোরতর তর্ক হ'তে লাগলো। Infinity তার কি অংশ হয়? Hamilton কি বলেন? Herbert Spencer কি বলেন? Tyndall, Huxley বা কি বলে গেছেন, এই সব কথা হ'তে লাগলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ ইগুণ * আমার ভাল লাগছে না। আমি তাই সব দেখছি! বিচার আর কি করবো? দেখছি—তিনিই সব হয়েছেন।

(রামানুজ ও বিশিষ্টদ্বৈতবাদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাও বটে; আবার তাও বটে। এক অবস্থায় অখণ্ডে—মনবুদ্ধি হারা হয়ে যায়। নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়—তার কি কল্লে বল দেখি?—

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে)। ঐটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কি না! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার দু' থাক না নাম্‌লে কথা কইতে পারি না।

"বেদান্ত, শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন, তাও আছে, আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

---

* তারক—শিবানন্দ।

* তাঁহার ব্যবহৃত সুমিষ্ট কথা—"ই গুণে" অর্থাৎ—এই গুলি।

নরেন্দ্র। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি)। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কি না, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটী।

"যেমন একটী বেল। এক জন খোলা আলাদা, বীজ আলাদা আর সাঁস আলাদা করেছিল। বেলটী কত ওজনে জানবার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু সাঁস ওজন কর্‌লে, কি বেলের ওজন পাওয়া যায়! খোলা, বীচি, সাঁস সব এক সঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, সাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তার পর বিচার ক'রে দেখে, যে বস্তুর সাঁস, সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি, আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়,—জীব নেতি, জগৎ নেতি, এইরূপ বিচার করতে হয়; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। তারপর, অনুভব হয়, যারই সাঁস তারই খোলা, বীচি,—যা থেকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বল্‌ছো, তাই থেকেই জীবজগৎ। যারই নিত্য (Absolute), তারই লীলা (Relative)। তাই রামানুজ বল্‌তেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

(ঈশ্বর দর্শন—God-vision.)

(মাষ্টারের প্রতি) "আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ—আর কি বিচার করবো? আমি দেখছি, তিনিই এই সব হয়েছেন—তিনিই জীব ও জগৎ হয়েছেন! তবে চৈতন্য না লাভ করিলে চৈতন্যকে জানা যায় না। শুধু মুখে বল্লে হবে না, 'এই আমি দেখছি তিনি সব হয়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ কর্‌লে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়, কামিনী কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বর-কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না, বিষয়-কথা শুন্‌লে কষ্ট হয়। চৈতন্য লাভ কর্‌লে তবে চৈতন্যকে জান্‌তে পারা যায়।

(অবতার ও প্রত্যক্ষ Revelation.)

বিচারান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিলেন,—

"দেখেছি, বিচার করে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার,—তিনি যদি তাঁর মানুষ-লীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার কর্‌তে হয় না, কারুর বুঝিয়েও দিতে হয় না। কি রকম জান? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘস্‌তে দপ্‌ করে আলো হয়। সেই রকম দপ্‌ করে আলো যদি তিনি দেন, তা হলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায়?

[কালী * ও ব্রহ্ম। †]

তখন ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল প্রশ্ন ও কত আদর করিলেন।

নরেন্দ্র। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। কৈ, কালীধ্যান তিন চার দিন করলুম, কিছুই তো হলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম বলে কই? যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন

* কালী—God in his relations to the conditioned.

† ব্রহ্ম—The unconditiond, the Absolute.

শক্তি বলে কই, কালী বলে কই? যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বল্‌চো, তাঁকেই কালী বল্‌ছি।

"ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর তাঁর দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাব্‌লেই দাহিকাশক্তি ভাব্‌তে হয়, দাহিকাশক্তি ভাবলেই অগ্নি ভাবতে হয়। কালী মান্‌লেই ব্রহ্ম মান্‌তে হয়, আবার ব্রহ্ম মান্‌লেই কালী মান্‌তে হয়।

"ব্রহ্ম ও শক্তি (কালী) অভেদ। ঐ শক্তি ঐ কালী আমি বলি।"

এদিকে রাত হয়ে গেছে। গিরীশের থিয়েটর যেতে হবে। তাই হরিপদকে বলিলেন, 'ভাই একখান গাড়ী যদি ডেকে দিস—থিয়েটর্‌ যেতে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। দেখিস্‌ যেন আনিস্‌। (সকলের হাস্য) হরিপদ (হাসিতে হাসিতে)। আমি আনতে যাচ্চি—আর আন্‌বো না?

(ঈশ্বর লাভ ও কর্ম্ম; 'রাম ও কাম')

গিরীশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটর এখন যেতে হবে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, ইদিক্‌ উদিক্‌ দুদিক রাখতে হবে; "জনক রাজা ইদিক্‌ উদিক্‌ দুদিক্‌ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী।"

[সকলের হাস্য।]

গিরীশ। থিয়েটর্‌ গুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে কর্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, না, ও বেশ আছে, অনেকের উপকার হচ্চে।

নরেন্দ্র। এইতো ঈশ্বর বল্‌ছে, অবতার বল্‌ছে। আবার থিয়েটরে টানে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[সমাধি মন্দির]

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সন্নিকটে আরো সরিয়া গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই—তায় কি এসে যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরো উথলিয়া পড়িল। গায়ে হাত দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রতি)। "মান্‌ কয়লি তো কয়লি, আমরা ও তোর মানে আছি (রাই)।"

(বিচার ও ঈশ্বর লাভ)

(নরেন্দ্রের প্রতি) "যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার কর্‌ছিলে; আমার ভাল লাগে নাই।

"নিমন্ত্রণ বাড়ীর শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়, যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি তরকারী পড়ে, অমনি বার আনা শব্দ কমে যায় (সকলের হাস্য)। আরো কম্‌তে থাকে। দই পাতে পড়্‌লে কেবল সুপ্‌ সাপ্‌। ক্রমে ক্রমে খাওয়া হয়ে গেলেই নিদ্রা।

"ঈশ্বরকে যতটুকু লাভ হবে, ততই বিচার কম্‌বে। তাঁকে লাভ হলে, আর শব্দ—বিচার থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি।

এই বলিয়া নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।"

কেন এরূপ করিতেছিলেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছিলেন? এরই নাম কি মানুষে ঈশ্বর দর্শন?

কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে। ঐ দেখ, বহির্জ্জগতের হুঁস চলিয়া যাইতেছে। এরি নাম বুঝি অর্দ্ধবাহ্যদশা—যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের হইত? এখনো নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত—যেন ছল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন—আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। এতো গা টেপা, পা টেপা কেন? একি নারায়ণের সেবা কর্‌ছেন, না শক্তি সঞ্চার কর্‌ছেন?

দেখিতে দেখিতে আরো ভাবান্তর হইল। এই আবার নরেন্দ্রের কাছে হাত জোড় করে কি বলছেন।

বলেছেন—"একটা গান (গা)—তাহলে ভাল হব—উঠ্‌তে পারবো কেমন করে—গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা (নিতাই আমার)—

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক্; চিত্রপুত্তলিকার মত চুপ করে রহিলেন। আবার ভাবে মাতোয়ারা হয়ে বলছেন।—

"দেখিস্ রাই যমুনায় যে পড়ে যাবি—কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী।"

আবার ভাবে বিভোর। বলিলেন,

"সখি সে বন কত দূর!
(যে বনে আমার শ্যাম সুন্দর)
(ঐ যে কৃষ্ণ গন্ধ পাওয়া যায়)
(আমি চলিতে যে নারি)"

এখন জগৎ ভুল হয়েছে—কাহাকেও মনে নাই—নরেন্দ্র সম্মুখে, কিন্তু নরেন্দ্রকে আর মনে নাই—কোথায় বসে আছেন, কিছুই হুঁস্ নাই। এখন মন প্রাণ ঈশ্বরে গত হয়েছে। 'মদ্গত অন্তরাত্মা'।

'গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা'—এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান। আবার বসিলেন; বসিয়া বলিতেছেন—

"ঐ একটী আলো আসচে—দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে আলোটা আস্‌চে এখনো বুঝতে পারছি না।"

এইবার নরেন্দ্র গান গাইলেন—

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।
মোহিলে প্রাণ॥
সপ্ত লোক ভুলে শোক, তোমারে পাইয়ে।
কোথায় আমি অতি দীন হীন॥

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবার বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতে লাগিল। আবার নিমীলিত নেত্র। স্পন্দহীন দেহ। সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে নিয়ে যাবে?" বালক যেমন সঙ্গী না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখে, সেইরূপ।

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন কৃষ্ণা-দশমী—অন্ধকার, রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সেই কালী বাড়ীতে যাইবেন—গাড়ীতে উঠিলেন। ভক্তেরা গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া। তিনি উঠিতেছেন—অনেক সন্তর্পণে তাঁকে উঠান হইল। এখনো 'গর্গর মাতোয়ারা।'

গাড়ী চলিয়া গেল। ভক্তেরা—যে যার আলয়াভিমুখে যাইতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত হৃদয়ে]

মস্তকের উপরে তারাকামণ্ডিত নৈশ-গগন—হৃদয়পটে অদ্ভুত রামকৃষ্ণছবি—স্মৃতি মধ্যে ভক্তের মজ্‌লিস্—সুখ-স্বপ্নের ন্যায় নয়নপথে সেই প্রেমের হাট—কলিকাতার রাজপথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন। কেহ সরস বসন্তানিল সেবন করিতে

করিতে সেই গানটী আবার গাইতে গাইতে যাচ্চেন,

"সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।
মোহিলে প্রাণ॥"

কেউ ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাচ্চেন, সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ করে আসেন? তবে অবতার কি সত্য? অনন্ত ঈশ্বর চৌদ্দ পোয়া মানুষ কেমন করে হবেন? অনন্ত কি সান্ত হয়? বিচার তো অনেক হ'ল। কি বুঝলাম? বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝ্‌লাম না। ঠাকুর রামকৃষ্ণতো বেশ বল্লেন 'যতক্ষণ বিচার—ততক্ষণ বস্তুলাভ হয় নাই, ততক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই।' তা ও বটে! এই তো এক ছটাক বুদ্ধি, এর দ্বারা আর কি বুঝবো! ঈশ্বরের কথা? এক সের বাটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে অবতারে বিশ্বাস কিরূপে হয়? ঠাকুর বল্লেন, ঈশ্বর যদি দেখিয়ে দেন দপ্ করে, তাহলে এক দণ্ডেই বুঝা যায়। Goethe মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, "Light! More Light!" তিনি যদি দপ্ করে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন! তবে—

ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ

যেমন Palestine এ মুর্খ ধীবরেরা jesus কে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন, অথবা যেমন শ্রীবাসাদি ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন।

"যদি দপ্ করে তিনি না দেখান্, তাহলে উপায় কি? কেন? যে কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বল্‌ছেন ও কথা, সে কালে অবতারে বিশ্বাস করবো। তিনিই শিখিয়েছেন,—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস।—গুরুবাক্যে বিশ্বাস!

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথ হারা॥"

"আমার তাঁর বাক্যে ঈশ্বরকৃপায় বিশ্বাস হয়েছে—আমি বিশ্বাস করবো। অন্যে যা করে করুক—আমি এই দেবদুর্লভ বিশ্বাস কেন ছাড়বো? বিচার থাক্। জ্ঞান চচ্চড়ি ক'রে কি আর একটী Faust হব? আবার কি, গভীর রজনী মধ্যে বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ আসিবে, আর আমি একাকী ঘরের মধ্যে "হায় কিছু জানিতে পারিলাম না, Science Philosophy বৃথা অধ্যয়ন করিলাম, এ জীবনে ধিক্" এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিব? না Alastor এর মত অজ্ঞানের বোঝা বইতে না পেরে শিলাখণ্ডের উপর মাথা রেখে মৃত্যুর অপেক্ষা করিব? না, আমার এ সব ভয়ানক পণ্ডিতদের মত এক ছটাক্ জ্ঞানের দ্বারা এ রহস্য ভেদ কর্‌তে যাবার প্রয়োজন নাই। আর এক সের বাটীতে চার সের দুধ ধরলো না বলে মরিতে যাবারও দরকার নাই। বেশ কথা,—গুরুবাক্যে বিশ্বাস! হে ভগবন্, আমায় ঐ বিশ্বাস দাও, আর মিছামিছি ঘুরাইও না। যা হবার নয়, তা খুঁজতে যাইও না। আর ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, 'যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়—অমলা অহেতুকী—ভক্তি; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। কৃপা করে এই আশীর্ব্বাদ কর।'

"আবার, কোন ভক্ত ঠাকুর-রামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, "কি ভালবাসা! গিরীশ থিয়েটরে চলে যাবেন, তবু তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে। শুধু তা নয়। এমনও বলছেন না যে, 'সব ত্যাগ কর—আমার জন্য গৃহ, পরিজন,

বিষয়কর্ম্ম সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।' বুঝেছি—এর মানে এই যে, সময় না হলে ছাড়লে কষ্ট হবে; ঠাকুর যেমন নিজে বলেন, ঘায়ের মামড়ী—ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়লে, রক্ত প'ড়ে—কষ্ট হয়; কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মামড়ী আপনি খসে পড়ে যায়। সামান্য লোকে, যাদের অন্তর্দ্দৃষ্টি নাই—তারা বলে, এক্ষুণি সংসার ত্যাগ কর। ইনি সদ্‌গুরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রেমের সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা নিশিদিন করিতেছেন।

আর গিরীশের কি বিশ্বাস! দুদিন দর্শনের পরই বলেছিলেন, প্রভু তুমিই ঈশ্বর—মানুষ দেহ ধারণ করে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্য। গিরীশ ঠিক তো বলেছেন, ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ না কর্‌লে ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে; কে জানিয়ে দেবে যে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু; কে ধরায় পতিত দুর্ব্বল সন্তানকে হাত ধরে তুলবে; কে কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত পাশব-স্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ব্ববৎ অমৃতের অধিকারী করিবে? আর তিনি মানুষ রূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে, যারা তদ্গতান্তরাত্মা, যাদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না—তাঁরা কি করে দিন কাটাবেন? তাই "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ সম্ভবামি যুগে যুগে।"

"কি ভালবাসা!—নরেন্দ্রের জন্য পাগল, নারাণের জন্য ক্রন্দন। বলেন, 'এরা ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন। এ প্রেম তো মানুষ-জ্ঞানে নয়; এ প্রেম দেখ্‌ছি—ঈশ্বর-প্রেম। ছেলেরা—শুদ্ধ-আত্মা, স্ত্রীলোক অন্যভাবে স্পর্শ করে নাই বিষয় কর্ম্ম ক'রে ক'রে এদের লোভ, অহঙ্কার, হিংসা ইত্যাদির স্ফূর্ত্তি হয় নাই—তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ। কিন্তু এ দৃষ্টি কার আছে? ঠাকুরের অন্তর্দ্দৃষ্টি; সমস্ত দেখিতেছেন—কে বিষয়াসক্ত—কে সরল, উদার, ঈশ্বর-ভক্ত। তাই এরূপ ভক্ত দেখলেই সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে সেবা করেন। তাদের নাওয়ান্, খাওয়ান্, শোয়ান্, তাদের দেখিবার জন্য কাঁদেন; কলিকাতায় ছুটিয়া ছুটিয়া যান্; লোকের খোসামোদ করে বেড়ান্—কলিকাতা থেকে তাদের গাড়ী ক'রে আন্‌তে; গৃহস্থ ভক্তদের সর্ব্বদা বলেন—ওদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াইও, তাহলে তোমাদের ভাল হবে। একি মায়িক স্নেহ? না, বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেম?—মাটীর প্রতিমাতে এ'তো * ষোড়শোপচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয়, আর—শুদ্ধনরদেহে হয় না?

"নরেন্দ্রকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাহ্যজগৎ ভুলে গেলেন; ক্রমে দেহী নরেন্দ্রকে ভুলে গেলেন; apparent manকে (বাহ্যিক মনুষ্যকে) ভুলে গেলেন—Real manকে (প্রকৃত মনুষ্যকে) দর্শন করিতে লাগলেন; অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মন লীন হইল—যাঁকে দর্শন ক'রে কখন অবাক্ স্পন্দহীন হয়ে চুপ করে থাক্‌তেন—কখন বা ওঁ ওঁ বলতেন; কখন বা মা মা করে বালকের মত ডাক্‌তেন। নরেন্দ্রের ভিতর—তাঁকে বেশী প্রকাশ দেখতেন, নরেন্দ্র নরেন্দ্র করে পাগল!

'নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই,—তার আর, কি হয়েছে? ঠাকুরের দিব্যচক্ষু; তিনি দেখিলেন যে, এ অভিমান হতে পারে। তিনি যে—বড় আপনার লোক, তিনি যে—আপনার মা, পাতানো মা ত নন্; তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন দপ্ করে আলো জেলে দেখিয়ে দেন না?—তাই বুঝি ঠাকুর বল্লেন,—

"মান কয়লি ত কয়লি, আমরা ও তোর মানে আছি।"

"আত্মীয় হতে যিনি পরমাত্মীয়; তাঁর উপর অভিমান করেন না ত কার উপর অভিমান করবেন? ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের এত ভালবাসা! তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন!'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, সেই গভীর রাত্রে, রামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে ভক্তেরা গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

* যেখানে এ'র মাথায় হসন্তর মত চিহ্ন থাকিবে (এ), সেখানে এ'র উচ্চারণ করিবেন, যেমন এক=য়্যাক=এক।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

কোজাগর নিশা।

এস দেবি, বিশ্বরমে, বঙ্গের ভবনে।
শত সৌন্দর্য্যের উৎস উথলিছে আজি
তব শুভ আগমনে, বাজে ঘরে ঘরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঝরির রব সুমধুর।
প্রণমে তোমারে দাস, এস দয়াময়ি!
মূঢ়জন বলে তোমা অর্থের কিঙ্করী;
কবির সর্ব্বস্ব তুমি, আনন্দ রূপিনী!
ঊষার তরুণরাগে উন্মীলিত হাসে
নীলাকাশ, সে ত তব চরণ-পরশে!
ফুটে ফল, দোলে লতা, শোভে বিহঙ্গম,
নগ, নদী, কান্তারের শোভা মনোরম,
রবি, শশী, তারা হাসে সুনীল আকাশে,
তোমারি প্রসাদে দেবি! তুমি শ্রীরূপিনী,
এ বিশ্বের সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

কবি ও বৈদান্তিক।

পিঠা পিঠি ভাই বোন্ করে মারামারি,
দাড়াইয়ে বড় ভগ্নী অদূরে তাহারি।
সে কহিছে—"রে অবোধ শিশু দুটী শোন্,
এক মার পেটে তোরা হ'লি ভাই বোন্।
তবে কেন অষ্টক্ষণ ছুতা-নাতা তরে
মারামারি কাটাকাটি এত পরস্পরে?
সহোদর ভাই বোন্ কি সম্পর্ক, মরি!
এমন কি হয় আর ত্রিভুবন ভরি।"
মা ছিল নিকটে ব'সে, সকলি শুনিল,
বড় মেয়েটীরে তার সম্বোধি কহিল,—
"তুইও ছেলে মানুষ, কি বুঝিস্ বল্,
কি জানিস্ সংসারের, এখনো সরল।
পিঠা পিঠি ভাই বোনে এ রীতি সতত;
তোর দাদা-সাথে তুই করেছিস্ কত।
যখন এরাও বড় হইবে সময়ে,
বুঝিবেক কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উভয়ে।
তোরা কি এখন আর দুটী বোন্, ভাই
ঝগড়া করিস্ নিয়ে মোর এক মাই?
জামাই বাচিয়া র'ন্, আশীর্ব্বাদ করি,
কোলে, কাখে ছেলে তোর দেখে যেন মরি।
তখন বুঝিবি কিবা ছেলের স্বভাব,
এই ঢুলাঢুলি—এই গলাগলি ভাব।"
"দেখ্, ভাল হবে না," বলিয়া লাজ পেয়ে
ঠোক্‌না মারিয়া মায় ঘরে গেল মেয়ে।
বৈদান্তিক পিতা ছিল বসি বারান্দায়,
চস্‌মা চোখে পুথী নিয়ে পাতা উল্‌টায়।
সে কহে গম্ভীর ভাবে উদ্দেশি জায়ারে,

অহো! কি আবদ্ধ সবে মায়ার আগারে।
সবাই তোমরা ভুল করেছ বিষম,
মায়ে ঝিয়ে ভ্রান্তি নিয়ে কে কাহার কম।
রজ্জু দেখি সর্প বলি ভ্রম সবাকার,
দুই চন্দ্র—দ্বাদশ আদিত্য যে প্রকার।
দেখিয়া উড্ডীন ধূলি 'বায়ু দেখি' বল,
মেঘ হেরি ভাব "দেখি আকাশ মণ্ডল।"
সূক্ষ্ম দৃষ্টি করি যদি দেখ এ সংসার,
দেখিবে এ কিছু নহে—দৃষ্টির বিকার।
তুমি আমি ছেলে মেয়ে দেখিছ যে সব,
কাহারো অস্তিত্ব নাই—মায়ার বিভব।
তবে কেন আত্মপর ভেদাভেদ জ্ঞান?
যাহা নাই, তাহে কেন উপাধি প্রদান?
কাহারো সম্পর্ক নাই কিছু কারো সহ,
জলের বুদ্বুদ জলে মিশে অহরহঃ।"
বেদান্তী ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক জন,
সুকবি সে সুরসিক—কাব্যেতে মগন।
গৃহ-অভ্যন্তরে বসি খুলি বাতায়ন,
দেখিল শুনিল সব, কহিল তখন,—
"শোন বৈদান্তিক ভায়া, কি দেখিলে ভুল;
মানিলাম এ সংসার ভ্রান্তির সঙ্কুল,
মানিলাম এ জগতে যা আছে, তা নাই;
মানিলাম সব মিথ্যা ভ্রান্তি সত্য ভাই,
মানিলাম মিছা একে অপরের তরে,
মমতার বন্ধনেতে জ্ব'লে পু'ড়ে মরে;—
কিন্তু ভাই বৈদান্তিক কর অবধান,
এই যে দেখিছ তুমি আত্ম-পর-জ্ঞান,
এই যে দেখিছ তুমি মমতা-বন্ধন,
এও হতে পারে তব ভ্রান্তির সৃজন।
আমি বলি এ সংসারে কেহ কারো লাগি,
মিছে ভ্রান্তি বশে নাহি হয় দুঃখ-ভাগী।
আমি বহি, সুখ দুঃখ, কর্ম্মাকর্ম্ম বোধ
ধর্ম্মাধর্ম্ম, শত্রু মিত্র, বিষাদ প্রমোদ,—
কেহ কিছু নাহি ভাবে, সবে জানে মায়া,
সবে জানে এ জগৎ ছায়া হ'তে ছায়া।
তুমি শুধু মায়া বশে একে দেখ আর,
দুই চোখে দুই চস্‌মা ভায়া হে তোমার;—
এক চোকে বৈদান্তিক—অপরে সংসারী,
একি নয় ভ্রান্তি তব বল না বিচারি!

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাকারেতে নিরাকার।

কোথা গেলে প্রেমময়
তোমারে দেখিতে পাব,
কি সাধনে জীবনের
এ পিপাসা মিটাইব?
ধূলা খেলা দিয়া প্রভু
নয়ন রেখেছ ঢেকে,
মরমের এ পিপাসা
জ্বলে উঠে থেকে থেকে!
পরম পদার্থ তুমি
মানব তোমার ছায়া,
তোমারি প্রেমের খেলা
নর নারী—পতি জায়া।
পৃথিবীর কীট আমি
তোমারে না দেখি চোকে,
কেবল যা কিছু দেখি
মানবের প্রেম-মুখে।
প্রেমিকের প্রেম-দৃষ্টি
তব প্রেম জ্যোতি স্ফূরে,
তোমারি লাবণ্য থাকে
প্রেমমাখা মুখ ফুড়ে;
তোমারি মধুর বাণী
প্রেমালাপ সম্ভাষণ,
অমৃত পরশ তব
পূত প্রেম আলিঙ্গন।
বড় ভালবাস তুমি
লুকাইতে আপনারে,
তাই ঢাক প্রেম-আঁখি
লজ্জা আর অশ্রুধারে;
কিন্তু একবার করি
নয়নে নয়ন দান,
রূপের সাগরে ডুবে
হাবু ডুবু করে প্রাণ!
বুদ্‌বুদের পাছে আছ
তুমি প্রেম-পারাবার,
বিমোহিত হয়ে হেরি
সাকারেতে নিরাকার,
অরূপ রূপের ছটা
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়;
এই কি তোমার রূপ,
বল বল প্রেমময়?
প্রেমময় তোমা লাগি
আকুল হয়েছে প্রাণ,
হৃদয় যে ভেঙ্গে চূরে
হয়ে গেল খান খান!
আশা আর নিরাশায়
দুর দুর করে বুক,
প্রেমময় প্রেমানন্দে
দেখাও হে প্রেমমুখ।

প্রেমানন্দ।

সত্য এবং সাহিত্য।

মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের স্বপ্ন—"আমি বড়", সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিন্তা—"আমি ভাল।" "আমি বড়" এবং "আমি ভাল" এই রব চতুর্দ্দিকে। কেবল আজই যে এই রব পৃথিবীতে শোনা যাইতেছে, তাহা নয়; চিরকাল এই রব সর্ব্বত্র নিনাদিত হইতেছে। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, রুসো, ভল্টেয়ার, ম্যাটসিনি এই রবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তবুও, আজও, চতুর্দ্দিকে কেবল এই রবই শুনিতেছি। আমি কুলে বড়, আমি ঐশ্বর্য্যে বড়, আমি পদে বড়—তোমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম কর, আমার পদলেহন কর, আমার ঐশ্বর্য্যে এবং পদে পুষ্পবর্ষণ কর। আমি ব্রাহ্মণ, আমার বিরুদ্ধে তুমি কথা বলিতে সাহস করিতেছ? তুমি সদ্‌গোপজাত ডাক্তার, তোমার এতবড় আস্পর্দ্ধা, তোমাকে হেয়, অবজ্ঞেয়, লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইতেই হইবে! আমি ঐশ্বর্য্যের,—মণিরত্ন-মালা-বিভূষিত তৃপ্তি-নিকেতনের একমাত্র রাজাধিরাজ, তুমি দীন দুঃখী সম্পাদক, তোমার এত সাহস যে, আমার বিরুদ্ধে কথা বল, তোমার ভিটা মাটী উচ্ছিন্ন করিয়া আমি কর্ম্মনাশার জলে তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়া তবে ছাড়িব। আর আমি মহামান্যা মহারাণী ভারতেশ্বরীর অন্যতম মন্ত্রী, তুমি সামান্য হইতেও অতি সামান্য টুথ পত্রের সম্পাদক, তোমার এত সাহস যে আমার বিরুদ্ধে লেখ, এবার লাঞ্ছনার মুকুট পরাইয়া কলঙ্কের বাজারে তোমাকে বিক্রয় করিব। আজ কাল চতুর্দ্দিকে কেবল এইরূপ দম্ভ, অহঙ্কার এবং তীব্র তেজের কথা শুনিতেছি। ইংলণ্ডে উদার নৈতিক সম্প্রদায় নিষ্প্রভ হইতেছেন, আভিজাত্যভাব-প্রধান সম্প্রদায় দিন দিন মস্তকোত্তোলন করিতেছেন; আমেরিকা—চির সাম্য এবং স্বাধীনতার পক্ষপাতী আমেরিকা ফিলিপাইন দ্বীপের গৌরবে আজ মাতোয়ারা, আজ প্রধানের প্রধান হওয়ার জন্য লালায়িত হইতেছেন, আর জর্ম্মণি এবং রুষিয়া তেজ এবং গর্ব্বের রত্নমুকুট মস্তকে তুলিয়া কি আস্ফালন করিতেছেন, কি তাণ্ডব নৃত্যে মাতিতেছেন, সকলেই জানেন। মনুষ্যের অহঙ্কারকে বিনাশ করিতে যে সত্যসেবী সাহিত্য বিদ্যমান, সে সাহিত্য আজ নিস্তেজ কেন? তুমি বল, দিন দিন পৃথিবীতে সাম্য এবং স্বাধীনতার রাজত্ব আসিতেছে; আমি দেখিতেছি, সাম্য এবং স্বাধীনতা দিন দিন সুদূরপরাহত হইতেছে। দরিদ্রের সন্তান আজ টাকায় ক্রীত হইয়া উচ্চ রাজ সিংহাসন পাইয়াছেন, তিনিও, পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া আজ দরিদ্র-পীড়নে বদ্ধপরিকর। চেম্বরলেন লর্ডের সন্তান না হইয়াও, আজ উচ্চ পদে বসিয়া তাঁহার এক সময়ের দলের লোককেই পীড়ন করিতে বদ্ধপরিকর। বঙ্গদেশের বড় বড় জমীদার, বড় বড় রাজ পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ কর—অনেক স্থলেই দেখিতে পাইবে, পোষ্যপুত্রের রাজত্ব।

দরিদ্র ভিন্ন কে আপন পুত্রকে বিক্রয় করে? দরিদ্রের সন্তানগণ আজ রাজা হইয়া কিরূপে দরিদ্র নিষ্পেষণে বদ্ধপরিকর হইতেছেন, একবার চিন্তা কর। কত দরিদ্রের কন্যা আজ দৈববলে রত্ন সিংহাসনে বসিয়া কিরূপ দরিদ্র-নিষ্পেষণ-মন্ত্রণায় যোগ দিতেছেন, চিন্তা কর এবং চিন্তা কর—পদগৌরবে মত্ত কত শত শত লোক কত প্রকারে দরিদ্র, অসহায়, নির্ধন এবং বিপন্নের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। ক্ষমতা পাইয়া তাহার অপব্যবহার করে না, লক্ষের মধ্যে একজন; আর অধিকার পাইয়া, তাহার মমতা পরিত্যাগ করে, সহস্রের মধ্যে একজন। রাজার অত্যাচার, জমীদারের অত্যাচার, মহাজনের অত্যাচার, পুলিসের অত্যাচার, হাকিমের অত্যাচার, ব্রাহ্মণের অত্যাচার,—অত্যাচারে অত্যাচারে এদেশ যায় যায় হইয়াছে। বীরত্ব, সাহস, সততা, ধর্ম্মচিন্তা, এই নিষ্পেষণের যুগে দরিদ্রের হৃদয়ে স্থান পাইবে, কখনও আশা করিতে পার না। যে সাহিত্য নীলকরের অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছিল, সে সাহিত্য আজ কোথায়? যে সাহিত্য আমেরিকার দাস প্রথার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল, সে সাহিত্য আজ কোথায়? জীবন সংগ্রাম, বড় বিষম সংগ্রাম। এ দেশের নিম্নশ্রেণীর আর উদ্ধারের পথ নাই। মহাত্মা বিদ্যাসাগর বহুদর্শিতার বলে সাহসের সহিত বলিয়াছিলেন, "এদেশের নিম্নশ্রেণীর গতি ফিরিবে না। তাহাদিগকে আমরা পশুর ন্যায় মনে করি। মানুষের দ্বারা মানুষের উপকার হওয়া সম্ভব, পশুর উপকার হইবে কিরূপে?" এ সকল অতি সত্য কথা। এদেশে নীলকরের অত্যাচার দমন হইয়াছে বটে, কিন্তু এদেশে জমীদারের অত্যাচার, পুলিস ও হাকিমের অত্যাচার, ধনী ও মহাজনের অত্যাচার কমিয়াছে কি? একজন সাধুলোক এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, এদেশে দরিদ্রের ঘরে টাকা ও সুন্দরী স্ত্রী নিরাপদ নয়। সুন্দরী স্ত্রী হরণের দুই চারিটী কাহিনী আজ কাল সংবাদ পত্রে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু শত শত কাহিনী অলিখিত এবং অঘোষিত রহিয়া যাইতেছে। দরিদ্র ব্যক্তি দরিদ্রের স্ত্রী বা কন্যা অপহরণ করিলে সে ঘটনা বিবৃত হইতে পারে, কিন্তু ধনী ব্যক্তি যদি পরস্ত্রী হরণ করে, সে কাহিনী লিখিতে পারে, এমন সম্পাদক এদেশে বিরল। দশ বা শত খানি পত্র পাইয়া ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে দেশের সম্পাদক লিখিতে পারেন, "হাজার হাজার পত্র পাইয়াছেন," টাকার লোভে নানা কলুষিত বিজ্ঞাপন পত্রিকাস্থ করিয়া যাঁহারা দেশকে ডুবাইবার পথ পরিষ্কার করিতে একটুও কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা ধনীর দোষ কীর্ত্তন করিবেন, কখনও আশা নাই। এখনকার কাগজের অধিকাংশ সম্পাদক ব্যবসাদারীতে ডুবিয়াছে—চিন্তা কেবল টাকা, টাকা, টাকা; লোকের হিত, দেশ রক্ষা, এ সকল কথা ভাবিবার সময় এ নহে! বিলাসিতার স্রোতে মজাইবার জন্য কত প্রকার তৈলের আবিষ্কার হইয়াছে, সে সকলের প্রচারক এ দেশের পত্রিকা সকল। গ্রাহক জুঠাইবার জন্য কত কলুষিত পুস্তক উপহার প্রদত্ত হইতেছে এবং কত জঘন্য গল্পের রচনা হইতেছে! সাপ্তাহিক কাগজেও গল্পের রাজত্ব বিস্তৃত হইতেছে। আর যাঁহারা নীতি ও ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী, পবিত্রতা যাঁহাদের মুখের অনাহত শব্দ, তাঁহারাও যে সে কাজে টাকার খাতিরে লিখিতেছেন, এবং জাতীয় সাহিত্য গেল গেল বলিয়া চিৎকার করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"জাতীয় সাহিত্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে।" বাস্তবিকই ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত। সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের আদর নাই। বাহ্যলাভগণনা পরিত্যাগ করিয়া সত্যের খাতিরে লেখনী চালনা করে অতি অল্প লোক। সত্য কথা লিখিবার, বলিবার রুচি নাই, ভাষা নাই, ভাষার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নাই। স্বার্থ এবং অর্থের গোলামগিরি করিয়া কখনও সাহিত্যসেবা চলে না। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য, সাহিত্য কেহ লেখে না। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির খাতিরে কেহ তাহা কেনেও না। লেখক লেখেন—কেবল টাকার জন্য; গ্রাহক তাহা গ্রহণ করেন, কেবল, লাভের জন্য। উপহার এবং ছবির প্রলোভন বড় শক্ত প্রলোভন। সাহিত্যের এইরূপ অরাজকতার দিনে অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদের আশা করা ঘোরতর মূর্খতা। শুনিতেছি, ইহার উপর আবার বড় বড় ঘরের পার্ব্বণীর বন্দোবস্ত আছে। ইহার উপর আবার লাইবেলের ভ্রুকুটী আছে। সুতরাং অত্যাচার কাহিনী এদেশে অবিবৃত, অলিখিত থাকিবেই থাকিবে। আর সত্য ঘোষিত না হইলে নিম্নশ্রেণীই বা কেমনে রক্ষা পাইবে?—এবং সাহিত্যেরই বা কিরূপে শ্রীবৃদ্ধি হইবে?

সম্প্রতি কাগজে পড়িতেছিলাম, বুয়র যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতের ল্যাবুসিয়র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ক্রুগার প্রভৃতির প্রতিনিধির সহিত যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা লইয়া পার্লিয়ামেণ্টের মহাসভায় চেম্বরলেন বিষম আন্দোলন তুলিয়াছেন। মনে করিয়াছিলাম, ল্যাবুসিয়র ভীত হইবেন; কিন্তু ভয় দূরে থাকুক, তিনি যেরূপ সাহসিকতার সহিত উত্তর দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি প্রথমে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে—"চেম্বরলেন মনে করেন যে, প্রত্যেক এম-পিই তাঁহার পত্রের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য।"* তিনি উত্তর দিবার সময়ে যে সব শক্ত কথা চেম্বরলেনকে শুনাইয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল এই মহাত্মারই যোগ্য।—যথা—

"For what I may have written or said to Mr. Montague White I am responsible to the house of commons, of which I am a member; to my constituents, who have done me the honour to send me there, and to the law. To you I owe no sort of explanation."

এইরূপে আরম্ভ করিয়া যে সকল তীব্র ভৎর্সনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, এরূপ একজন সাহসী লোক যদি এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিত, এদেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত। শান্তিস্থাপন উদ্দেশে পত্র সকল লিখিত হইয়াছিল, ইত্যাকার কথা লিখিয়া শেষে এই বীর লিখিতেছেন—

"If it is too much to hope that you will act on this suggestion, I would venture to urge that at least you should publish the correspondence between yourself & Mr. Hawksley in regard to your alleged knowledge of the contemplated Rhodes-Jameson conspiracy of 1894."

এরূপ ভাবে সত্যের ঘোষণা করিতে এ যুগে কেবল ল্যাবুসিয়রই সক্ষম। কিন্তু এদেশে এরূপ লোক নাই বলিলেই হয়। দুটী কথা এই উপলক্ষে আমাদের মনে জাগিতেছে। প্রথমতঃ চেম্বরলেন যে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পদ-গৌরবের উন্মত্ততা প্রকাশ পাইয়াছে; এবং ল্যাবুসিয়রের প্রত্যুত্তরে আভিজাত্য এবং পদগৌরবের মস্তকে পদাঘাত করা হইয়াছে। আমরা সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম। সে সাহিত্য সত্য, স্বাধীনতা ও সাহসিকতার পবিত্র বাতাসে সৃজিত হয়। এদেশে জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না কেন? তাহার উত্তর এই, সত্য, স্বাধীনতা ও সাহসিকতার অভাব। সত্য কথা লিখিতে যাহারা ভীত, কুণ্ঠিত, লজ্জিত, তাহাদের দ্বারা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে না। ভল্টেয়ার, রুসো, থিওডোর পার্কার বা ম্যাটসিনির লেখা পাঠ কর, দেখিবে, স্বাধীনতার কি তেজোময় স্ফুলিঙ্গ তাঁহাদের লেখা হইতে নির্গত হইতেছে। লিখিবার সময়, তাঁহারা ভাবেন নাই, কেহ তাঁহাদের লেখা পাঠ করিবে কি না; ভাবেন নাই, অর্থ সমাগম হইবে কি না,—ভাবেন নাই, কে কি বলিবে, বা কে কি করিবে? নির্ব্বাসন বা কারাদণ্ড, উপেক্ষা বা উপহাস, ঘৃণা বা নিন্দা, অত্যাচার বা নিষ্পেষণের ভয় থাকিলে তাঁহারা ঐরূপ পবিত্র সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে পারিতেন না। সহায় যায়, সম্পদ যায়, মান যায়, সম্ভ্রম যায়—জীবন যায় বা প্রাণ যায়—এ কিছুরই গণনা তাঁহাদের মনে স্থান পাইত না; যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহা লিখিবেনই লিখিবেন। টেষ্টবুক-কমিটীর মুখ চাহিয়া, বা দশজনের প্রশংসার আশা রাখিয়া, বা বিশ জন গ্রাহক চটিবেন, এইরূপ ভয়ে যাঁহারা লেখনী চালনা করেন, তাঁহাদের

* "Mr. Chamberlain really seems to have reached such a point of self-complacency that he considers that anything in the shape of disapproval of any folish policy, he may deem it to be to his personal interest to adopt, is high treason; and if this delusion increases we shall have him like the Roman Emperors, insisting upon being treated as a divinity.

"It is essentially a Chamberlain notion that the Colonial Secretary has a right to call upon M. P. 's to explain to him anything that they may have written."—*Truth.*

দ্বারা কখনও পবিত্র সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না। যেখানে সত্যের অবমাননা, সেখানে সাহিত্য নিস্তেজ, স্ফূর্ত্তিহীন; যেখানে ভীরুতা, সেখানে সাহিত্য মৃতবৎ; যেখানে কাপুরুষতা, সেখানে সাহিত্য মলিন ও নিষ্প্রভ। যে নিজে মৃত, সে অন্যকে জাগাইবে কিরূপে? যে নিজে রুগ্ন, সে অন্যকে বাঁচাইবে কিরূপে? মিথ্যা, ভীরুতা এবং কাপুরুষতার সম্মিলনে এদেশের সাহিত্য মলিন এবং নিষ্প্রভ, নিস্তেজ এবং মৃতবৎ। এ দেশকে জাগাইবে কে? তুমি বল, জাগিবে, জাগিবে, জাগিবে; আন্দোলনে জাগিবে। জাতীয় ভাষার উদ্দীপনা ভিন্ন কখনও কোন দেশ জাগিয়াছে কি? যে কোন শক্তিশালী দেশে যাও, দেখিবে, সে খানেই সাধারণকে মাতাইবার জন্য উদ্দীপনাময় জাতীয় সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। সে সঙ্গীত শ্রবণে আপামর সাধারণের শোণিত উষ্ণ হয়, মানুষ কারাবাস বা নির্ব্বাসন যন্ত্রণা এবং মৃত্যু ভয় পরিত্যাগ করে। ম্যাটসিনির লেখা পাঠ করিবার মায়ায়, সে দিনও, কত শত শত লোক জীবন-পাত করিয়াছিল, সে কথা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। আর আজ যে উদ্দীপনা-মন্ত্রে ট্রান্সভাল মাতোয়ারা, সে উদ্দীপনাও জাতীয় সাহিত্য হইতে। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির দিনে ভারত জাগিয়াছিল, ইতালি, গ্রীস জাগিয়াছিল, সে দিন ফ্রান্স জাগিয়াছিল, এবং আজ ইংলণ্ড জাগিয়াছে। পাশব বলে যদি দেশ জাগিত, তবে জর্ম্মণি ও রুষিয়া, আজ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইত। না—তাহা অসম্ভব। পৃথিবীর সকল অত্যাচার নিবারণের জন্য জাতীয় ভাষা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। মানুষকে পশুত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত করিতে, সাহিত্য ভিন্ন আর উপায় নাই। লেখনীর ক্ষমতা শত সহস্র ম্যাক্সিম্‌কে পরাস্ত করে, তাহা চিরকাল দুর্জ্জয় ক্ষমতা এজগতে বিস্তার করিয়াছে। ধর্ম্মোত্থানের ইতিহাস পাঠ কর—সেখানেও এই কথারই পরিচয় পাইবে। মানুষকে জাগাইতে হইলে—চাই জাতীয় ভাষা; চাই—জাতীয় সাহিত্য। জাতীয় সাহিত্যকে তুচ্ছ করিয়া, দূরে ফেলিয়া, অবহেলা এবং ঘৃণা করিয়া এদেশ যদি জাগিতে পারে, তবে চিরকালের পোষিত এই মহাসত্য—সাহিত্য ভিন্ন দেশের উত্থান অসম্ভব, অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সেই দিন, সাহিত্যের রাজ্য এই ধরা হইতে তিরোহিত হইবে এবং সেই স্থলে পাশব বলের গৌরব ঘোষিত হইবে। কিন্তু যাহা কখনও হয় নাই, তাহা কি কখনও হইবে? এইরূপ সত্যমূলক পবিত্র সাহিত্য সৃজনের পক্ষে সকলের বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক। ব্যবসাদারী বুদ্ধি পরিহার করিয়া, লাভ গণনার কুহক ভুলিয়া—সেই দুর্গে নির্ভয়ে কেবল সত্যের সাধনা করিতে হইবে। সত্য—সত্য—কেবল সত্য। সত্য চির সুন্দর, চির উজ্জ্বল, চির মহিমান্বিত। সত্যে ভূষিত, সত্যে উজ্জ্বল এবং সত্যে মহিমান্বিত হইয়া এই হতভাগ্য, পরপদ-লাঞ্ছিত দেশ যদি একবার পবিত্র সাহিত্যের সেবা করিতে পারে, যাহা হওয়ার হইবে, যাহা পাওয়ার, পাওয়া যাইবে। আর যদি, তাহা না হয়, এই নিমগ্ন দেশকে তুলিবার আর উপায় নাই।

রাজার দাসত্বে, ব্রাহ্মণের দাসত্বে, ধনীর দাসত্বে, আভিজাত্যের দাসত্বে এদেশের অনেক শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, এখন আর সঙ্কোচ বা ভয় করিলে চলিবে না। তরী অগাধ সলিলে যখন নিমগ্ন হয়, তখন জ্যাত্যাভিমান, পদাভিমান বা ধনাভিমান বজায় রাখিবার জন্য পরস্পরের সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকিলে যে দশা হয়, এই পতিত, এই নিমগ্ন দেশে এখন ঐ সকল অভিমান ধরিয়া বসিয়া থাকিলে তদ্রূপই হইবে। উচ্চ, নীচ, বড়, ছোট সকলে না মিলিলে কখনও দাবাগ্নি নির্ব্বাণ করা যায় না। পতিত এবং নিমগ্ন যাঁহারা, তাঁহাদের আবার অভিমান কিসের? বিপদ যাঁহাদের ঘরে দ্বারে, তাঁহাদের আবার ভয় কিসের? ম্লেচ্ছের পদানত যে, তাহার আবার ব্রাহ্মণত্ব কিসের? পরাধীন যে, তাহার আবার ধনগৌরব এবং পদ গৌরব কিসের? এক কথায় মৃত যে, শ্মশানের চুল্লীতে দাহ হইবার জন্য যে নীয়মান, তাহার পক্ষে এ সকল অভিমানের কথা শোভা পায় না। এখন, এই অবস্থায় সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া—সত্য, স্বাধীনতা এবং সাহসিকতার ভিত্তির উপর সাহিত্যের দুর্গ নির্ম্মাণে চেষ্টিত হও,—যাহার যে শক্তি থাকে, ঢালিয়া দেও। লেখক, লেখ; পাঠক, অর্থ দিয়া সাহায্য কর। যে দিন এইরূপ সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে পয়সা এবং রক্ত ব্যয় করাকে, এ দেশের লোক ধর্ম্ম করা হইল, মনে করিবে, সেই দিন উন্নতির সুপ্রভাত আসিবে। আমাদের মনে হয়, আর সকল আন্দোলন নির্ব্বাণ হউক, কঠোর সাধনার রাজ্যে লেখনী আর মসী অসিরূপে বাঁচিয়া থাক্—আর বাঁচিয়া থাক্ সত্য, স্বাধীনতা, এবং দুর্জ্জয় সাহস। লেখনী এবং মসী ঘর্ষণে সত্য-বিদ্যুতের ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত পাপ ও অত্যাচার, পরাধীনতা ও অন্ধকার তিরোহিত হইবে—সুপ্রভাত আসিবে।

সাবিত্রীতত্ত্ব-সমালোচনা।*

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥"

হিন্দুর ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশক কঠোপনিষদে উপরি উদ্ধৃত মহাবাক্যটী দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহাবাক্যে যে কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্ত্তী ভগবদ্গীতাদি হিন্দুর ধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ-সমূহে সেই বাক্যেরই সম্প্রসারণ বা ব্যাবৃতি করা হইয়াছে। এই একটী মাত্র মহাবাক্যেই ধর্ম্মের মূল সূত্র গ্রথিত হইয়াছে। মানবে দুইটী শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়;—একটী শারীরিক, অন্যটী মানসিক। এই দুই শক্তি লইয়াই মানব গঠিত। শব্দ স্পর্শরূপরসাদি বিষয় ও বিষয়গ্রাহক ইন্দ্রিয়, এবং তাহাদের চালক মন ও বুদ্ধি। উপনিষদের উপদেশ এই যে, বিষয় ও ইন্দ্রিয় নিকৃষ্টতর; তদপেক্ষা উচ্চতর বৃত্তি মন এবং বুদ্ধি। বিষয়-সেবা এবং ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন মানুষ যত করিবে, ততই মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সমধিক উচ্চতর শক্তিগুলি নিষ্প্রভ হইতে থাকিবে; এবং

* সাবিত্রী তত্ত্ব—শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

বুদ্ধিজ্ঞানাদি উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির যতই অনুশীলন হইতে থাকিবে, ততই বিষয়েন্দ্রিয়াদি নিম্নতর শক্তিগুলি মলিন হইতে থাকিবে। অতএব ইন্দ্রিয়াদির সংযম ও বিষয়-ভোগেচ্ছার দমন করিয়া যাহাতে মানবের অন্তর্নিহিত মানসিক এবং তদপেক্ষাও উচ্চতর বুদ্ধিবিষয়ক আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির অনুশীলন হইতে থাকে, ততই মানবাত্মার আধ্যাত্মিক যোগ্যতার বৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে থাকে। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্ম সাধনের দ্বার-দেশেই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের এবং সংযমানুশীলনের ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়-সেবা ও বাহ্যিক-বিষয়-ভোগ যত করা যায়, ততই মানবের চিত্ত তাহাতেই বেশী আসক্ত হইতে থাকে, তদ্দ্বারা চিত্ত ক্রমশই বিষয়াভিমুখী এবং মলিন ও নিষ্প্রভ হইতে থাকে। সংযম ব্যতীত চিত্ত-সংস্কারের দ্বিতীয় পন্থা নাই। ইন্দ্রিয়-সেবা যতই বাড়াইবে, ইন্দ্রিয়ের শক্তিও ততই অসম্মার্জ্জিত, মলিন ও নিষ্প্রভ হইতে থাকিবে। পেট পুরিয়া, 'গণ্ডেপিণ্ডে' আহার বাড়াইয়া দেও, দেখিবে, তোহার পাকস্থলী কুণ্ঠ হইয়াছে, অজীর্ণতা উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তি প্রভৃতি উচ্চতর মানসিক ও আধ্যাত্মিক-শক্তিগুলিও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও একথা ঠিক্ খাটে। হিন্দুশাস্ত্রের এই তত্ত্বটী অতীব হৃদয়-গ্রাহী ও প্রামাণ্য। হিন্দু-উপনিষদের সারভূত এই মহোপদেশটী হৃদয়ে লইয়া চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার "সাবিত্রী-তত্ত্ব" লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার সাবিত্রী-তত্ত্ব বিশেষ মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছি এবং অতীব আহ্লাদ সহকারে বলিতেছি যে, তিনি অতি পরিস্ফুটভাবে এই তত্ত্বটী সাবিত্রী চরিত্রে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্য সমগ্র হিন্দুজাতি চন্দ্রনাথ বাবুর নিকটে ঋণী। চন্দ্রনাথ বাবু মহাজ্ঞানী, উত্তম দার্শনিক এবং স্বজাতি-প্রেমে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। সাবিত্রীতত্ত্বে তিনি যে ভাবে হিন্দুশাস্ত্রের, হিন্দুকবির অন্তর্দৃষ্টির ও আধ্যাত্মিকতার ও ধর্ম্ম-প্রাণতার সূক্ষ্ম-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সমগ্র বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়। তিনি যে ভাবে পুরাকালের হিন্দুরমণীর চরিত্র-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন, যে অসীম সাহসের সহিত—উৎসাহের সহিত—জাতীয় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিতেছেন, তজ্জন্য সমগ্র হিন্দুসমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা তাঁহার "হিন্দুত্ব" ও "শকুন্তলাতত্ত্ব" পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম, তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও চিন্তাশীল। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি অতি সূক্ষ্ম ও চরিত্র বিশ্লেষণে তিনি সিদ্ধহস্ত। এরূপ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি অতি অল্পই এদেশে আছেন। কিন্তু এদেশের দুর্ভাগ্য যে, এহেন মনস্বী ব্যক্তিকেও কতিপয় অহম্মুখ, পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি দ্বারা নিগৃহীত হইতে হইতেছে!

সাবিত্রী তত্ত্বে অনেক বিষয়ের সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রায় সমস্ত সমালোচনাতেই চন্দ্রনাথ বাবুর সংযত লেখনী চমৎকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। আমরা এস্থলে কয়েকটী মাত্র সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া দেখাইব, চন্দ্রনাথবাবু কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার মত লোকের নিকটে আমরা যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, সাবিত্রীতত্ত্বে আমরা তাহাই পাইয়াছি। ইহাতেও তাঁহার প্রতিভা দীপ্যমান ভাস্করের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

এ পুস্তকে তিনি কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে সাবিত্রীর জন্ম, বিবাহ, বধূত্ব, পাতিব্রত্য, ঘনার অলৌকিকত্ব প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা করিয়া সকল গুলিতেই হিন্দুপ্রণালীর শ্রেষ্ঠতা সমর্থিত করিয়াছেন। কিরূপ যুক্তিতে ও কিরূপ সংযত সাহসিকতার সহিত এগুলি প্রমাণিত করিয়াছেন, পাঠক তাহা তাঁহার গ্রন্থেই পড়িয়া দেখিবেন, আমরা এস্থলে দুই একটী কথার আলোচনা করিব মাত্র।

সাবিত্রীর বিবাহ নামক প্রস্তাবে, চন্দ্রনাথ বাবু দেখাইয়াছেন যে, যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই হিন্দুগ্রন্থে কন্যা-বিবাহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে স্থলে কন্যার যৌবনোন্মেষ দেখা দিত, সেই সেই স্থলেই কন্যার পিতামাতা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য কিঞ্চিৎ ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। ঋগ্বেদের দুইটী ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াও তিনি দেখাইয়াছেন যে, কন্যার যৌবন-লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই যখন ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা লক্ষিত হইত, তখন অতি প্রাচীনকাল হইতেই যৌবনের পূর্ব্বেই প্রায়শঃ বিবাহ দেওয়াই নিয়ম ছিল। তাঁহার মতে, যৌবনোন্মেষের পরে কন্যার মনে পুরুষসম্ভোগেচ্ছা প্রভৃতি চিত্ত-বৈকল্য উপস্থিত হওয়া সম্ভব। পাপ মনে, কেবল অনুষ্ঠানে নহে। এই জন্যই হিন্দুগণ যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই বিবাহ দিতেন। হিন্দুরা শারীরিক শক্তিলাভকে বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন না। যাহাতে কন্যার মন ও চিত্ত মলিন না হয়, যাহাতে কন্যার আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি কলুষিত না হয়, হিন্দুর প্রধান দৃষ্টি সেই দিকেই ছিল। বাস্তবিক পক্ষে, প্রকৃতি গঠন করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কার্য্য। যাহাতে মানসিক-প্রকৃতি বিশুদ্ধ থাকে, যাহাতে প্রকৃতির স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে,—তাহা হইলেই শারীরিক সুস্থতাও অবিকৃত না থাকিয়া পারে না। কেননা, দৈহিক স্বাস্থ্য অন্তঃ-প্রকৃতির স্বাস্থ্যের উপরেই নির্ভর করে। অন্তঃ-প্রকৃতিতেই শারীরিক স্বাস্থ্যবলাদির মূলসূত্র নিহিত। অন্তঃ-প্রকৃতি বলীয়ান্ থাকিলে, দৈহিক বলাদিও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সেই সুস্থ, অবিকৃত, বলীয়ান্ অন্তঃপ্রকৃতি হইতে পিতামাতার যে সন্তান জন্মে, সে সন্তানও কাজেই অকলুষিত, সংযত ও বলীয়ান্ হইবেই। চন্দ্রনাথ বাবুর বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ মত।

অলৌকিকত্ব অধ্যায়ে, চন্দ্রনাথ বাবু আর একটী মহৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সেটী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমরা প্রস্তাব শেষ করিব। আমরা এ প্রস্তাবের শীর্ষভাগে যে তত্ত্বের কথা বলিয়াছি, চন্দ্রনাথ বাবুর সমগ্র গ্রন্থ সেই তত্ত্বেরই সম্প্রসারণ হইলেও, এই অধ্যায়ে তিনি দেখাইয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক শক্তি, জড়-শক্তির পরাক্রমকে পর্য্যুদস্ত, সুসংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে সমর্থ। জড়-শক্তি ও চৈতন্য-শক্তি উভয় লইয়াই মানুষ। চন্দ্রনাথ বাবু বলেন যে, জড়শক্তি চৈতন্য শক্তিরই রূপান্তর মাত্র, অথবা জড়শক্তি চৈতন্যশক্তি দ্বারাতেই চালিত;—সুতরাং উভয়ের মধ্যে একটা দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। জড়বিজ্ঞান কেবল মাত্র জড়শক্তির উপরের খোসা লইয়া ব্যস্ত আছে; কেবলমাত্র বাহ্যিক কয়েকটা নিয়মমাত্র আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু জড়ের অন্তর্নিহিত বা পরিচালক চৈতন্য-শক্তির ক্রিয়া অতীব নিগূঢ়; আধ্যাত্মিক শক্তির বল অতীব ভয়ানক; তদ্দ্বারা

জড়শক্তিকেও পরিবর্ত্তিত করান যাইতে পারে। জড়ের সাধারণ নিয়মানুসারে যাহা অসম্ভব বলিয়া গণ্য, অন্তর্নিহিত-আধ্যাত্মিক-শক্তির প্রভাবে তাহা সম্ভব হইতে পারে। এই যুক্তি দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন যে,সাবিত্রীর আধ্যাত্মিক-বলের আনুশীলনা-জনিত প্রাখর্য্য হেতু, জড়শক্তি পরাভূত হইয়াছিল, —সত্যবানের নিয়তি, অকালমৃত্যু ঘটিতে পারে নাই;—নিজেরও অকাল বৈধব্য ঘটিতে পারে নাই। প্রহ্লাদ, আধ্যাত্মিক শক্তির বলেই, অগ্নিজল প্রভৃতি জড়শক্তির পরাক্রম ব্যর্থ করিতে পারিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবুর মতে, ইহাই হিন্দু পৌরাণিকের দৃঢ়বিশ্বাস ও হিন্দু-পুরাণের মূল-পৌরাণিকত্ব। বাস্তবিক, হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এইরূপ। কর্ম্মফল অপরিত্যাজ্য হইলেও, তাহা কর্ম্মান্তর দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে। সে কর্ম্মান্তর, উচ্চতর মানসিক শক্তির অনুশীলনা-জনিত দৃঢ়তা। মানুষের কর্ম্মদ্বারাই স্ব স্ব প্রকৃতি গঠিত হয়, আবার কর্ম্মদ্বারাই সেই গঠিত প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। ইহা অতীব সত্য কথা। এ কথা মিথ্যা হইলে, হিন্দুশাস্ত্রের মুক্তিবাদও মিথ্যা হয়! যাহার অন্তর্দৃষ্টি যত প্রবল;—সংযম, ধর্ম্মশীলতা, ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তের সংস্কার প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তি গুলি যাহার যত পরিস্কৃত, উন্নত, সে ততই নিকৃষ্ট-জড় হইতে উন্নত-স্তরে অবস্থিত। যে যত ঐ বৃত্তি গুলির অনুশীলন করিতে পারিবে, তাহার আত্মা তত শক্তিশালী হইবে। শারীরিক বৃত্তি গুলির অনুশীলন বৃদ্ধি পাইলেই ঐ সমস্ত উচ্চতর বৃত্তি মলিন হইয়া গিয়া মানবাত্মার আধ্যাত্মিক হীনতা ও কলুষতা জন্মিবে। সমস্ত সাবিত্রী তত্ত্বে চন্দ্রনাথ বাবু এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। সাবিত্রীর আধ্যাত্মিকতা, এবং দৈহিক শক্তি আপেক্ষা তাঁহার আধ্যাত্মিক-শক্তিময়তা প্রদর্শনই যেন গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য। প্রতি অধ্যায়েই এই কথাটী বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আহার, বিহার ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম করিয়া, অর্থাৎ মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সকলের তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করতঃ, অশ্বপতি সাবিত্রীর ন্যায় কন্যারত্ন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন; সত্যবানের দারুণ নিয়তি জানিয়াও সাবিত্রী যে তাঁহাকে পতিত্বে মনে মনে বরণ করিয়াছিলেন এবং পিতার কথাতেও সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই—ইহাও সেই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাচুর্য্যেরই পরিচায়ক। এই শক্তির প্রাখর্য্যই সাবিত্রীর বধূধর্ম্মে প্রকটিত; এই শক্তি বলেই প্রেমে চাঞ্চল্যহীনতা ও ব্রতসম্পাদনে দৃঢ়সংকল্পতা। সেই সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে, অতি ভীষণ অরণ্যাণীমধ্যে, পতির মৃত্যুর পর সেই অমানব পুরুষের সহিত কথোপকথনাদিও সেই শক্তির বলেই হইয়াছিল। সেই শক্তির বলেই, মানুষের বিধাতৃ-বিহিত নিয়তি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। এই এইরূপ সাবিত্রীর প্রতি কার্য্যেই,অতি বিস্ময়কর মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাবাল্য গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকার সাবিত্রীর এই মনোময়তা, আধ্যাত্মিক শক্তিশীলতা ও জড় বা দৈহিক শক্তির প্রতি আস্থা-রাহিত্য,—অতি উত্তম রূপে দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। এবং অন্য সমস্ত বাদ্ দিয়া, কেবল এই একমাত্র গুণেই এই মহাগ্রন্থ একখানি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থরূপে বঙ্গের ঘরে ঘরে আদৃত হওয়া আবশ্যক।

সাবিত্রীতত্ত্বে আরো অনেক কথা আছে। আমরা হিন্দুমাত্রকেই এই পুস্তক পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। যাঁহারা এ দেশের কিছুই ভাল নহে বলেন, তাঁহাদিগকেও এ পুস্তক পড়িয়া দেখিতে বলি। আমরা চন্দ্রনাথ বাবুর চিন্তাশীলতায় ও অন্তর্দৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়াছি। বিধাতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন্।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব জন্ম।

এই ঘোর তমোবৃত সংসারে অসংখ্য যুগের পর এক এক জন বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শাক্যসিংহের পূর্ব্বেও এই পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ত্তমান নাই। অধুনা যে কাল অতিবাহিত হইতেছে,বৌদ্ধশাস্ত্রে উহাকে মহাভদ্র কল্প বলে। এই কল্পের অতীত কাল মধ্যে ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ ও শাক্যসিংহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ক্রকুচ্ছন্দ খ্রীঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে, কনকমুনি খ্রীঃ পূঃ ২০৯৯ অব্দে, কাশ্যপ খ্রীঃ পূঃ ১০১৪ অব্দে এবং শাক্যসিংহ খ্রীঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের পূর্ব্বে আর একশত বিশ (১২০) জন তথাগত প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহাদের পূর্ব্বে অশীতি কোটী বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই অনাদি সংসারে সর্ব্বশুদ্ধ কয়জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।

আমি এস্থলে অন্যান্য বুদ্ধগণের জীবন-চরিত পরিত্যাগ করিয়া গৌতম বুদ্ধ বা শাক্যসিংহের পূর্ব্ব জন্মের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন করিব।

একদা ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন, ব্রহ্মলোকের অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, পৃথিবীতে অসংখ্য কল্প মধ্যে কোন বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন নাই; ও সেখানে সকলই অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন। অনেক সংবৎসর মধ্যে পৃথিবীতে পুণ্যবান লোক সকল জন্মিতে না পারায় সেখান হইতে কেহই মরণানন্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন নাই। এই জন্য ব্রহ্মলোক প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

তখন ব্রহ্মা চতুর্দ্দিক্ বিলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, পৃথিবীতে এমন কি কেহ আছেন, যিনি কালক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারিবেন। তদনন্তর তিনি ধ্যানযোগে দেখিতে পাইলেন, পদ্ম যেমন বিকাশ লাভ করিবার আশয়ে সূর্য্যের উদয় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ ঘোরতমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতেও কয়েক জন জ্ঞানবান্ লোক বুদ্ধত্ব লাভের প্রত্যাশায় কালযাপন করিতেছেন। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন, বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যে সকল প্রার্থী পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন,তন্মধ্যে এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকেই মনোনীত করিলেন। তিনিই পরিশেষে গৌতম বুদ্ধ বা শাক্যসিংহ এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা যখন তাঁহাকে মনোনীত করেন, সেই সময়ে তিনি পৃথিবীতে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহার একমাত্র বৃদ্ধা ও বিধবা মাতা ছিলেন। গৌতম বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে নিজের ও বিধবা মাতার আহার সংস্থান করিতেন। এক সময়ে সৌভাগ্যবৃদ্ধির আশয়ে গৌতম সুবর্ণভূমি নামক দেশে গমন করিবার মানস করেন। তিনি নাবিকদিগকে কয়েকটী রজতখণ্ড পুরস্কার প্রদান করিয়া বলিলেন, "হে নাবিকগণ! তোমরা আমাকে ও আমার বৃদ্ধা মাতাকে জলযানে আরোপিত করিয়া

সুবর্ণ ভূমীতে লইয়া যাও। তোমাদের অনুকম্পা ব্যতীত আমরা পুরোবর্ত্তী সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।" নাবিকগণ তাঁহার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে অর্ণবযানে আরোপিত করিল কিন্তু কিয়ৎদূর যাইতে না যাইতেই ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে যান জলমগ্ন হইল। উত্তালতরঙ্গে গৌতম নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁহার মাতার জীবন কিসে রক্ষা পায়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হিংস্র জলজন্তুসমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি স্বীয় মাতাকে পৃষ্ঠে উপবেশিত করিয়া মহাসমুদ্র সন্তরণ করিবার প্রয়াস করিলেন।

গৌতমের এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মা ভাবিলেন, গৌতমই বুদ্ধত্বলাভের যথার্থ অধিকারী। গৌতম ও ব্রহ্মের সহায়তায় স্বীয় মাতার সহ সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন, বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে যে সকল গুণের আবশ্যক, গৌতমে তাহার সমস্তই বিদ্যমান আছে। গৌতমের মনও তখন বুদ্ধত্ব লাভের জন্য কৃতনিশ্চয় হইল। কিয়ৎকাল পরে গৌতমের মৃত্যু হয় ও তিনি ব্রহ্মলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত গৌতমের যে দিন মনঃপ্রণিধান জন্মিয়াছিল, সেই দিন হইতে অসংখ্য বৎসর অতীত হইয়াছিল ও সংসারে একলক্ষ পঁচিশ হাজার বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু গৌতম তখনও সদ্বুদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই।

সর্ব্বভদ্রকল্পে গৌতম ধন্যদেশীয় সম্রাটের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন এবং এই কল্পেই তাঁহার বাক্‌প্রণিধান জন্মে। এই কল্পে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি বুদ্ধ হইব, বুদ্ধত্বলাভ করা আমার অভীপ্সিত।"

সারমন্দকল্পে গৌতম পুষ্পবতী নগরীতে রাজা সুনন্দের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই কল্পে তিনি তৃষ্ণাঙ্কর বুদ্ধের নিকট হইতে অনিয়ত বিবরণ (অনিশ্চিত আশ্বাস) ও দীপঙ্কর বুদ্ধের সমীপে নিয়ত বিবরণ (নিশ্চিত আশ্বাস) লাভ করেন। তৃষ্ণাঙ্কর বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, গৌতম কালক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন এবং দীপঙ্কর বলিয়াছিলেন, গৌতম অবশ্যই বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।

গৌতম সারনন্দ কল্পে সুরুচি ব্রাহ্মণ, অতুলনাগরাজ, অতিদেব ব্রাহ্মণ ও সুজাত ব্রাহ্মণ নামে যথাক্রমে পরিচিত ছিলেন। বরকল্পে তিনি যক্ষ, সিংহ ও সন্ন্যাসীরূপে যথাক্রমে প্রাদুর্ভূত হন। মন্দকল্পে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হন। তদনন্তর অসংখ্য কল্প অতীত হয়, ও সংসার ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হয়।

এই সময়ে গৌতম দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানা যোনি পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। "পঞ্চসত পঞ্চাস-জাতক" নামক পালিগ্রন্থে গৌতমের ৫৫০ জন্মের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। ইহার মধ্যে তিনি ৮৩ বার সন্ন্যাসী, ৫৮ বার মহারাজ, ৪৩ বার বৃক্ষদেবতা, ২৬ বার ধর্ম্মোপদেশক, ২৪ বার রাজামাত্য, ২৪ বার পুরোহিত ব্রাহ্মণ, ২৪ বার যুবরাজ, ২৩ বার ভদ্রলোক, ২২ বার পণ্ডিত, ২০ বার ইন্দ্র, ১৮ বার মর্কট, ১৩ বার বণিক্, ১২ বার ধনী, ১০ বার, মৃগ, ১০ বার সিংহ, ৮ বার হংস, ৬ বার হস্তী, ৫ বার কুক্কুট, ৫ বার ভৃত্য, ৫ বার সুবর্ণ গরুড়, ৪ বার অশ্ব, ৪ বার বৃষ, ৩ বার কুম্ভকার, ৩ বার অন্ত্যজজাতি, ২ বার মৎস্য, ২ বার হস্তিপক, ২ বার ইন্দুর, ১ বার কুকুর, ১ বার সর্পচিকিৎসক, ১ বার সূত্রধার

১ বার কর্ম্মকার, ১ বার ভেক, ১ বার শশক, ইত্যাদিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, উহা সম্পূর্ণ তালিকা নহে। গৌতমবুদ্ধ অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সকলের আমূলবৃত্তান্ত সংগ্রহ করা নিতান্ত দুরূহ। তিনি এক এক জন্মে এক এক প্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কোন জন্মে দান, কখনও শীল, কোন সময়ে নৈষ্ক্রম, কখনও বা প্রজ্ঞা, এবং সময়ান্তরে বীর্য্য ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা এই সকল সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত দশটী গুণের নাম দশ পারমিতা। গৌতম কখনও সাধারণ ভাবে এই দশপারমিতার অনুষ্ঠান করিতেন। যখন তিনি সমধিক যত্নে এই সকলের অনুষ্ঠান করিতেন, তখন ঐ সকলের গুণ উপপারমিতা নামে অভিহিত হইত। আর যখন তিনি অতীব নৈপুণ্যের সহ ঐ সকল সম্পন্ন করিতেন, তখন উহাদিগকে পরমার্থ পারমিতা বলিত।

গৌতম বুদ্ধ খদিরাঙ্গার জন্মে নিজের চক্ষুঃ, মস্তক, মাংস, সন্তান, স্ত্রী ও সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দান পারমিতার (১) অনুষ্ঠান করেন। ভূষিদত্ত জন্মে তিনি ত্রিবিধ শীল পারমিতা (২) সম্পন্ন করেন। ছুল্য—সুপ্তসোম জন্মে তিনি কাঞ্চন, মণি, মাণিক্য, দাস ও দাসী ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং এই জন্মে তাঁহার নিষ্ক্রম পারমিতা (৩) অনুষ্ঠিত হয়। শক্তুভক্ত জন্মে তিনি প্রজ্ঞাপারমিতা (৪) সমাচরণ করেন। মহজনক জন্মে তিনি বীর্য্যপারমিতার (৫) পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ক্ষান্তিবাদজন্মে তিনি লোকের অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার অম্লান চিত্তে সহ্য করিয়া ক্ষান্তি পারমিতার (৬) উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। মহাসুপ্তসোম জন্মে তিনি সত্যপারমিতা (৭) নিষ্পন্ন করেন। তেমিজন্মে তিনি অবিচলিত প্রতিজ্ঞায় শ্রেয়োধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অধিষ্ঠান পারমিতা (৮) সম্পন্ন করেন। নিগ্রোধমৃগজন্মে তিনি লোকের দুঃখ দেখিয়া তাহাদের প্রতি পরমসহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক মৈত্রী পারমিতা (৯) সম্পন্ন করেন। তিনি শরজন্মে শত্রু ও মিত্র, উপকারী ও অপকারী, জ্ঞাতি ও অপরিচিত প্রভৃতি সকলের সমভাব প্রদর্শন করিয়া চিত্তের অবিষমভাব বা উপেক্ষা পারমিতা (১০) দর্শন করেন।

এক একটী পারমিতার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করিতে বুদ্ধ দশটী পারমিতা বিশেষ নৈপুণ্যের সহ নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম "দশভূমীশ্বর" হইয়াছিল।

কর্ম্মের বিচিত্র পরিণাম বশতঃ গৌতম বুদ্ধ নানা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। তির্য্যগ্ যোনিতে সমুদ্ভূত হইয়াও তিনি বুদ্ধোচিত কর্ম্মের সমাচরণ করিয়াছিলেন। নিম্নে বুদ্ধদেবের যে কয়েকটী জন্মের বিষয় বিবৃত হইল, উহা পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, গৌতম বুদ্ধ পশ্বাদি জাতিতে জন্মিয়াও সত্য, ক্ষান্তি ইত্যাদি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই।

মর্কট-জন্ম—এক সময়ে গৌতম মর্কটরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৮০,০০০ মর্কটের অধিপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে বনখণ্ড মধ্যে তাঁহার রাজ্য অবস্থিত ছিল। তাঁহার সাম্রাজ্যের সমীপে কোন ক্ষুদ্র গ্রামে একটা প্রকাণ্ড

তেঁতুলের গাছ ছিল। মর্কটগণ ঐ গাছের তেঁতুল খাইবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলে গৌতম তাহাদিগকে বলিলেন:—"হে মর্কট প্রজাগণ! তোমরা শিষ্টতা ত্যাগ করিও না। ঐ তেঁতুলের গাছটী গ্রামবাসীরা বহুযত্নে সংবর্দ্ধন করিয়াছে, এবং ঐ তেঁতুল যাহাতে শীঘ্র নষ্ট না হয়, তজ্জন্য উহারা সতর্ক রহিয়াছে। যদি ঐ তেঁতুল গাছের কোন স্বামী না থাকিত এবং উহা যদি বনমধ্যে সামান্যভাবে মনুষ্যের যত্নব্যতীতও জন্মিত, তাহা হইলে তোমরা অনায়াসে উহার ফল খাইতে পারিতে। কিন্তু এক্ষণে ঐ তেঁতুলে তোমাদের কোন স্বত্ব নাই, অতএব উহার প্রতি তোমরা লোভ করিও না। প্রজার দোষে রাজার সুনাম নষ্ট হয়। তোমরা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিলে লোকে আমাকেই অকর্মণ্য রাজা বলিয়া অবধারণ করিবে। অতএব তোমরা সাবধান হও।"

তখন মর্কটগণ তাঁহার কথায় কোন উত্তর করিল না। পরিশেষে রাত্রিকালে নিশীথ সময়ে প্রায় ৫০০ মর্কট একত্রিত হইয়া নিঃশব্দে ঐ তেঁতুল ভক্ষণের নিমিত্ত গমন করিল। তাহারা পরস্পর বলিল, "ভাই! আমরা নিঃশব্দে তেঁতুল গাছে চড়িয়া উহার ফল খাইব, রাত্রিকালে কেহই জানিতে পারিবে না।" কিন্তু উহারা বৃক্ষের উপর বসিয়া তেঁতুল খাইতে খাইতে এমন হর্ষান্বিত হইয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে নাই। উহারা হুপ্ হাপ্ করিয়া পরস্পরের মনের হর্ষ প্রকাশ করিতেছিল, তখন গ্রামবাসীরা মর্কটের শব্দ শুনিয়া প্রত্যেকে এক এক খানি লগুড়হস্তে করিয়া বৃক্ষতলে আগমন করিল। তাহারা বলিল "আমরা প্রভাতকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিব, মর্কটগণ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেই আমরা সকলে মিলিয়া উহাদের প্রাণনাশ করিব।" ক্রমে ঐ সংবাদ মর্কটরাজ গৌতমের কর্ণগোচর হইল। তিনি ভাবিলেন, আমার সদুপদেশ-সত্ত্বেও মর্কটগণ তেঁতুলের লোভ ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহাদের জীবন এক্ষণে ঘোর বিপদাপন্ন। যাহা হউক, প্রজাকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। অতএব কোন উপায় অবলম্বন করিয়া উহাদিগকে রক্ষা করি।"

তখন গৌতম গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক সকলেই সুষুপ্ত। আর গ্রামের বয়স্ক লোক সকল লগুড় হস্তে করিয়া তেঁতুল গাছের সমীপে গমন করিয়াছে, গ্রামের মধ্যে সমস্তই নিঃশব্দ; কেবল একটী গৃহে একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক খক্ খক্ করিয়া কাশিতেছে, তাহার নয়নে নিদ্রা নাই, সে কখনও উঠিতেছে, কখনও বসিতেছে এবং কখনও বা শয্যায় শয়িত হইতেছে। তখন গৌতম সেই বৃদ্ধার গৃহে অগ্নিসংযোগ করিলেন, গৃহ জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধা চীৎকার করিতে করিতে গৃহের বাহিরে আসিল। সে অগ্নিনির্ব্বাণের কোন উপায় চিন্তা না করিয়া কেবল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তেঁতুল গাছের তলায় যে সকল লোক দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা বৃদ্ধার রোদনধ্বনি শুনিয়া লগুড় ত্যাগ করিল ও বেগে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নিনির্ব্বাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। মর্কটগণ এই অবসরে নিরাপদে স্বীয় আলয়ে প্রতিগমন করিল। এই জন্মে গৌতম প্রজ্ঞাপারমিতা সম্পন্ন করেন।

কাঠ্‌বিড়াল-জন্ম—কোন সময়ে গৌতম কাঠ্‌বিড়াল রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন নদীর তীরস্থিত বৃক্ষের উপরে তাঁহার আবাস ছিল। তিনি তাঁহার শিশু শাবকদিগের প্রতি সাতিশয় যত্ন করিতেন। এক সময়ে ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে ঐ বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া নদী মধ্যে পতিত হয়। স্রোতোবেগে ঐ বৃক্ষ ও শাবক সমূহ সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন হয়। তখন গৌতম প্রতিজ্ঞা করিলেন, সমুদ্রশোষণ করিয়া শাবকদিগকে উদ্ধার করিবেন। তিনি স্বীয় পুচ্ছ সমুদ্রমধ্যে অভিষিক্ত করিয়া তীরভূমিতে উহা কম্পন করিতে লাগিলেন। সাত দিন ক্রমাগত এইরূপে লেজ ভিঁজাইয়া জল ছিটাইতেছেন, এমন সময়ে দেবরাজ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সাধু কাঠ্‌বিড়াল! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, এইরূপ ভাবে লেজ জলে ভিঁজাইয়া তীরে জলের ছিট্ দিয়া কতকালে তুমি সমুদ্র শোষণ করিবে? সমুদ্র ৮৪ হাজার যোজন গভীর। তোমার ন্যায় লক্ষ লোক এইরূপ চেষ্টা করিলেও সমুদ্র শোষণ করিতে পারিবে না।"

তখন কাঠ্‌বিড়ালরূপী গৌতম দেবরাজকে বলিলেন, "হে বীরপুরুষ! যদি সকল লোকই তোমার ন্যায় সাহস সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে তোমার বাক্য সার্থক হইত। তোমার কতদূর বিক্রম আছে, তাহা তোমার কথা দ্বারাই বুঝা গিয়াছে। যাহা হউক, তোমার ন্যায় ভীরু, কাপুরুষ ও নির্ব্বোধের সহ কথা বলিয়া আমার ফল নাই, তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও, আমার কার্য্যে বিঘ্ন করিও না! আমি যাহা আরব্ধ করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন না করিয়া বিরত হইবনা।"

তখন দেবরাজ ঐ কাঠ্‌বিড়ালের অদম্য সাহস দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং দেবগণের সাহায্যে শাবকদিগকে সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়া আনিলেন। গৌতম এই জন্মে বীর্য্য পারমিতা সম্পন্ন করেন।

সিংহ-জন্ম—এক সময়ে গৌতম সিংহজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন পর্ব্বতের উপরিভাগে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সন্নিকটে পঙ্কপরিবেষ্টিত এক হ্রদ বিদ্যমান ছিল। সেই পঙ্কাবৃত স্থানে হরণ প্রভৃতি জন্তু চরিয়া বেড়াইত। একদিন সিংহরূপী গৌতম ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একটী হরিণের অনুসরণ করিতে করিতে হ্রদের তীরস্থিত পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হন এবং তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার তাঁহার কোন উপায় থাকে না। অনন্তর একটী শৃগালকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "ভদ্র! আমি অতি কষ্টে অনাহারে কালযাপন করিতেছি। আমার পদদ্বয় এই পঙ্কমধ্যে এমন ভাবে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে যে, আর উহা তুলিবার আমার সাধ্য নাই। আমি সাতিশয় বিপদাপন্ন, অতএব ভাই তুমি অনুকম্পা করিয়া আমাকে পঙ্ক হইতে উত্তোলন কর।" শৃগাল বলিল, "আপনি বলবান্ ও বিক্রমশীল জন্তু। আপনি এক্ষণে যেরূপ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমি আপনার সমীপে গমন করিতে সাহস করি না। আপনাকে রক্ষা করিতে যাইয়া শেষে আমার জীবন হারাইব, এইরূপ আমার আশঙ্কা হইতেছে।" তখন সিংহ তাহাকে নানা প্রকারে অভয়দান করিল ও পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। তদনুসারে শৃগাল নিকটবর্ত্তী হ্রদ হইতে সিংহের পদদেশ পর্য্যন্ত একটী পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করিল। হ্রদের জল সেই প্রণালী দ্বারা সিংহের পাদদেশে প্রবলবেগে আগমন

করায় কর্দ্দম জলবৎ তরল হইল। সিংহ নির্ব্বিঘ্নে কর্দ্দম হইতে উত্থিত হইয়া শৃগালকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করিতে লাগিল। তদবধি সিংহ ও শৃগাল বহুকাল একত্র এক গহ্বরে সপরিবারে বাস করিয়াছিল। সিংহ কখনও উক্ত শৃগালকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে নাই। এই জন্মে গৌতম সত্য পারমিতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

বেশ্মান্তর-জাতক— জম্বুদ্বীপে জয়াতুরা নগরীতে সঞ্জনামক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার প্রধান মহিষীর নাম স্পৃশতী। তাঁহাদের বেশ্মান্তর নামক এক পুত্র জন্মে। বাল্যকাল হইতে উক্ত পুত্র দানশীলতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করে। চৈত্যরাজকন্যা মাদ্রিদেবীর সহ বেশ্মান্তরের বিবাহ হয়। এই সময়ে কলিঙ্গ দেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কলিঙ্গরাজ শুনিলেন, বেশ্মান্তরের যে শ্বেতহস্তী আছে, উহা বৃষ্টি ও জল উৎপাদন করিতে পারে। কথিত আছে,উক্ত হস্তীর একমাত্র আস্তরণের মূল্য ২৪ লক্ষ টাকা। কিয়ৎকাল পরে কলিঙ্গরাজ ৮ জন ব্রাহ্মণকে জয়াতুরা নগরীতে প্রেরণ করেন। উপোষধ দিবসে বেশ্মান্তর দরিদ্র ও ভিক্ষুদিগকে অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি দান করিতেছেন, এমন সময়ে উক্ত ৮ জন ব্রাহ্মণ যাইয়া বলিল "মহারাজকুমার! আপনার যে শ্বেতহস্তী আছে, উঁহাই আমরা ভিক্ষাস্বরূপে প্রাপ্ত হইবার আশয়ে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।" বেশ্মান্তর বলিলেন "হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এই শ্বেতহস্তী গ্রহণ করুন। আপনারা আমার চক্ষুঃ, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি আর যাহা যাচ্ঞা করিবেন,আমি তাহাও আহ্লাদ সহকারে প্রদান করিতেছি।" "আমাদের অপর কিছুই প্রার্থনীয় নাই" এই বলিয়া তাহারা উক্ত হস্তী লইয়া কলিঙ্গ দেশে প্রতিগমন করিল।

নগরবাসিগণ এই হস্তি দান ব্যাপার অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল ও রাজপ্রাসাদে যাইয়া নিবেদন করিল "মহারাজ! আমরা শ্বেতহস্তী হইতে অনেক উপকার লাভ করিয়াছি। আপনার পুত্র সেই অমূল্য হস্তিরত্ন ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিয়া আমাদের মহানিষ্ট সাধন করিয়াছেন।" মহারাজ তখন স্বীয় পুত্রকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিবার জন্য মানস করিলেন। তখন প্রজাগণ বলিল "মহারাজ! আপনার পুত্রের অপর কোন শাস্তি প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। উহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেই আমরা আহ্লাদিত হইব।" তদনুসারে বেশ্মান্তর বঙ্কগিরিতে নির্ব্বাসিত হইলেন। সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার স্ত্রী মাদ্রিদেবী তাঁহার অনুগমন করিলেন। এদিকে মহারাণী স্পৃশতী, স্বীয় পুত্রের নির্ব্বাসনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুর্মনায়মান হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,"আমি কিছুকালের পর তোমার পুত্রকে পুনরায় গৃহে আনয়ন করিব।"

যখন বেশ্মান্তর ও মাদ্রিদেবী গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের যে কোন সম্পত্তি বা বস্ত্রালঙ্কারাদি ছিল,সমস্তই দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। বেশ্মান্তর সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া কেবল স্বীয় স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সমভিব্যাহারে এক রথে আরোহণ করিয়া বঙ্কগিরির অভিমুখে ধাবমান হন। তাঁহার মাতা যে কিছু ধন তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই তিনি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন। পথমধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বেশ্মান্তরকে বলিল, "মহাশয় যে অশ্বদ্বয় আপনার রথ বহন করিতেছে উহা পাইলে আমরা পরম উপকৃত হই।" কিছু দূর যাইতে না যাইতে আর একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল "মহাশয়! আপনার রথ খানি পাইলে আমার দরিদ্রতার কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হয়।" উক্ত ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনানুসারে বেশ্মান্তর স্বীয় রথ ও অশ্বদ্বয় বিতরণ করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর বেশ্মান্তর পুত্রটীকে ও মাদ্রিদেবী কন্যাটীকে ক্রোড়ে হইয়া বহুকষ্টে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চৈত্যদেশের রাজা তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যে গমন করেন নাই।

অনন্তর তাঁহারা বঙ্কগিরিতে উপস্থিত হন। সেখানে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাদের নিমিত্ত দুই খানি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বেশ্মান্তর ও মাদ্রিদেবী যথাক্রমে ঐ দুই গৃহে সংযতভাবে বাস করিতেন। সন্তানগণ মাতার অনুপস্থিতিতে পিতার নিকট থাকিত। তাঁহাদের এইরূপ ভাবে ৭ মাস অতীত হইল, একদিন যূজক নামক একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ্মান্তরের নিকট আসিয়া বলিলেন "মহাশয়! আমি অনেক কষ্টে একশত মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া অমুক ব্রাহ্মণের নিকট ন্যস্ত রাখিয়াছিলাম, কিন্তু সে ব্যক্তি আমার সমস্ত টাকা ব্যয় করিয়া নিজের আহার্য্য সংস্থাপন করিয়াছে। সে অত্যন্ত দরিদ্র সুতরাং আমার মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে না পারিয়া অমিত্রতপা নাম্নী তাহার কন্যা আমাকে সম্প্রদান করিয়াছে। আমার উক্ত পত্নী (অমিত্রতপা) একাকিনী সমস্ত গৃহকার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না। আমার স্ত্রীর নিকট শুনিয়াছি, আপনার জালীর নামক একটী পুত্র ও কৃষ্ণাজিনা নাম্নী কন্যা আছে। আমি ঐ দুইটীকে লইতে ইচ্ছা করি। উহারা আমার পত্নীর দাস ও দাসী হইয়া সমস্ত গৃহকার্য্য করিবে। তাহা হইলে আমার পত্নী কিছু শান্তি অনুভব করিতে পারেন, আমি ও গৃহযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।" এই কথা শুনিয়া বেশ্মান্তর বলিলেন "মহাত্মন! আমার সন্তান দুইটী দ্বারা যদি আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাহা হইলে আমি সন্তোষ সহকারে উহাদিগকে আপনার হস্তে অর্পণ করিতেছি। এই সময়ে জালীয় ও কৃষ্ণাজিনা বনমধ্যে পলায়ন করিয়াছিল ও তাহাদের মাতা মাদ্রিদেবী তখন বনে ফলমূলাদি অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন। তখন বেশ্মান্তর সন্তান দুইটীকে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। জালীয় আসিয়া বেশ্মান্তরের পাদতলে নিপতিত হইয়া বলিল "পিতঃ আমাদের মাতা এক্ষণে বনমধ্যে ফল ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন, তিনি যতক্ষণ গৃহে প্রত্যাগমন না করেন, ততক্ষণ আপনি আমাদিগকে বনে বিসর্জ্জন দিবেন না।"

তখন ভিক্ষু ব্রাহ্মণ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, "এইরূপ মিথ্যাবাদী লোক কোথায়ও দেখি নাই। আপনি জগতে দয়াশীল বলিয়া খ্যাত, অথচ সন্তান দুইটী দান করিতে স্বীকার করিয়াও দিতেছেন না, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

ভিক্ষুর কথা শুনিয়া বেশ্মান্তর স্বীয় পত্নীর অনুপস্থিতিতেও অগত্যা সন্তান দুইটী দান করিলেন। উহারা পর্ব্বতের উপরিভাগে পথমধ্যে নানাবিধ কষ্ট অনুভব

করিতেছিলেন। বেশ্মান্তর স্বচক্ষে উহা দেখিতে লাগিলেন।

মাদ্রিদেবী অরণ্য হইতে প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত অবগত হইলেন ও আবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বেশ্মান্তর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বুদ্ধত্ব লাভ করা সহজ নহে, আমি স্বীয় পুত্র ও কন্যা দান করিয়া যদি দান পারমিতা সম্পাদন করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা আমার পরম লাভ বলিতে হইবে। এই অকিঞ্চিৎকর দান দেখিয়া তুমি বিস্মিত হইও না।"

অনন্তর দেবরাজ মনে করিলেন, বেশ্মান্তর যেরূপ দানশীল, তাহাতে তিনি স্বীয় পত্নীকেও বিতরণ করিয়া ফেলিতে পারেন, অতএব আমি হইার কোন প্রতিবিধান করি। অনন্তর তিনি এক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বেশ্মান্তরের নিকট গমন করিলেন ও বলিলেনঃ—মহাশয়, আমি বৃদ্ধ ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, সেবা শুশ্রূষা করিবার কেহই নাই। আপনার পত্নী যদি আমার দাসী হইয়া আমার সেবা করেন, তাহা হইলে আমি সুখী হইতে পারি।"

উক্ত বৃদ্ধব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বেশ্মান্তর মাদ্রিদেবীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রিদেবী স্বামীর অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, "যদি আমাকে বিতরণ করিয়া আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহা আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে।"

অতঃপর বেশ্মান্তর উক্তব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আপনি আমার পত্নীকে গ্রহণ করুন। এই সামান্য দান আমার বুদ্ধত্ব লাভের সহায় হউক।" তখন ব্রাহ্মণ রূপী দেবরাজ বলিলেন, বেশ্মান্তর আমি আহ্লাদ সহকারে মাদ্রিদেবীকে গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে উঁহাতে আপনার কোন স্বত্ব থাকিল না। আমি উঁহাকে আপনার নিকট কিছু কালের জন্য গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া ভিক্ষুরূপী দেবরাজ অন্তর্হিত হইলেন।

ওদিকে যূজক ব্রাহ্মণ জালীয় ও কৃষ্ণাজিনাকে লইয়া জয়াতুরা নগরীতে উপনীত হইল। সঞ্জ স্বীয় পৌত্র ও পৌত্রীর সন্ধান পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন ও যূজক ব্রাহ্মণকে প্রচুর পরিমাণে আহার প্রদান করিলেন। অতিভোজনে যূজগের প্রাণবিয়োগ ঘটে। সঞ্জ মহাসমৃদ্ধি সহকারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। সঞ্জ কিয়ৎকাল পরে বহুজন সমভিব্যাহারে বঙ্কগিরিতে গমন করিয়া বেশ্মান্তর ও মাদ্রিদেবীকে গৃহে প্রত্যানয়ন করেন। পূর্ব্বোক্ত শ্বেতহস্তীর প্রভাবে কলিঙ্গদেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত দেশবাসিগণ হস্তীটী সঞ্জকে প্রত্যর্পণ করেন। বেশ্মান্তর, মাদ্রিদেবী, মহারাজ সঞ্জ, মহারাণী শৃশতী, জালীয় ও কৃষ্ণাজিনা সকলেই পুনর্মিলিত হইলেন। বেশ্মান্তর দেহত্যাগানন্তর তুষিত নামক স্বর্গে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্মে গৌতম দান পারমিতা সম্পাদন করেন। শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

অযাচিতা।

একটী গজলের এক চরণ এই ;—
"কিনভারি পিচকারীরে ময়তো সারী ভিজগয়ী"
ইহার অর্থ এই,—কেগো আমাকে পিচকারী মারিলে, আমি যে একেবারেই (সমগ্র) ভিজিয়া গেলাম।

সুন্দরী, শুষ্ক শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া

এক মনে রাজপথের জনতার মধ্য দিয়া সংসারের কাজে চলিয়াছিল, হঠাৎ কোথা হইতে তাহার গায়ে আবীর-রঞ্জিত পিচকারীর চোট আসিয়া পড়িল, সে চকিত হইল, অপ্রতিভ হইল, থমকিয়া দাঁড়াইল। চাহিয়া দেখিল, তাহার শুষ্ক বস্ত্র সমগ্র ভিজিয়া গিয়াছে, সমস্তই লাল হইয়া গিয়াছে, ভিজিতে কিছুই বাকী নাই, বস্ত্রত ভিজিয়াইছে, সে নিজেও একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। আপনার দিকে চাহিয়া দেখিল, সে যাহা ছিল, তাহা নাই, সে যে কাজে যাইতেছিল, সে কাজ ভুলিয়া গেল। ভূত ভুলিল, ভবিষ্যত ভুলিল, সে যে অতর্কিতে সহসা একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে, ইহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে অন্তরে কেমন একটী উদাসভাবের সঞ্চার হইল, ঊর্দ্ধ দিকে চাহিল, আসে পাশে চাহিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না; তখন একটু বিস্ময় ও বিষাদ ভরে, একটু আবদার ও আদরের ভাবে, কাতর করুণ মাধুর্য্য-মাখা কণ্ঠে, আপনাপনি গাহিল ;—

"কিনভারি পিচকারীরে ময়তো সারী ভিজগয়ী,"

আহা, কেগো উহাকে ভিজাইয়া দিলে ? বেচারী যেন অনাথ হইয়াছে। সে যে ভাবে চাহিয়াছিল, তাহার আর সে ভাব নাই, ঐ দেখ আর চলিতে পারিতেছে না, ভিজা কাপড়ে অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে যাইবে, কি পশ্চাতে যাইবে, ভাবিয়া পাইতেছে না। তাহার মনে কোনও ভয় ছিল না, সন্দেহ ছিল না, আশঙ্কা ছিল না, সঙ্কোচ ছিল না, সে আত্মরক্ষার জন্য সময় পায় নাই, হঠাৎ অদৃশ্য হস্তের এক পিচকারীতে সে সমগ্র ভিজিয়া গেল।

গানটী সংসারের ভাবে রচিত নহে। রচনাকর্ত্তা একজন সাধক কবি। একটী পিচকারীতে একজন লোক ভিজিয়া গিয়াছে, ইহা বর্ণনা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কেন ? তিনি এই সঙ্গীতটীর মধ্যে যে মধুর রস ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা পার্থিব রস নহে, উহা স্বর্গীয় সুধা। উপরি উক্ত সঙ্গীতার্দ্ধের প্রত্যেক শব্দে সেই সুধা জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। সংসারে দেখিতে পাই, এক শ্রেণীর লোকেরা বহু তপস্যা করিয়া ধর্ম্ম সাধন করেন, এবং সেরূপ বহু সহস্র সাধকের মধ্যে কদাচিৎ দুই এক জন অভীষ্ট ফল লাভ করেন। সে ফল তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার অতীত নহে, সে ফল লাভ করিয়া তাঁহারা চমকিত হইয়া যান না, কারণ তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাই পাইয়াছেন। কিন্তু অন্য এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা সংসার লইয়াই ব্যস্ত, সংসারের কোলাহলেই মগ্ন, সংসারাতীত কোন বস্তুর প্রতি তাঁহাদের প্রলোভন নাই, সংসার-রাজপথে, বিষয়ের শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহারা আপন মনে চলিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে স্বর্গীয় সুগন্ধিপূর্ণ লাল রঙ্গের ভক্তিজলের পিচকারী আসিয়া তাহাদের উপর পড়িল, পলকে একবারে সমগ্র ভিজাইয়া দিল, আপনার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কি হইয়াছে, একেবারে যে ভিজিয়া গিয়াছে ; তাঁহার রং একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। সেতো এরূপ আশা করে নাই, এরূপ আকাঙ্ক্ষাও করে নাই, সে ত শুষ্কবস্ত্র পরিয়া বিষয় কার্য্যে চলিয়াছিল, হঠাৎ কে তাহাকে ভিজাইয়া দিল ? কে ভিজাইয়া দিল, চারিদিক চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। সে সাধনা করে নাই, ইন্দ্রিয় নিগ্রহের চেষ্টা করে নাই, বিষয়-বাসনা

পরিহার করিবার সংকল্প করে নাই, সংসারাতীত কোন বস্তুর কখনও প্রত্যাশা করে নাই, কিন্তু হঠাৎ ভিজিয়া গিয়া সে অপ্রস্তুত হইয়াছে। এমনই ভিজিয়াছে যে, তাহার সংসার-তাপ একেবারে নিভিয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর শীতল হইয়াছে, তাঁহার দৃঢ় সংকল্প,সংসারোদ্যম, আশা-ভরসা একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। তখন আপনাকে অনাথ ও অপ্রস্তুত ভাবিয়া কে তাহাকে ভিজাইল, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ গাহিল ;—

"কিনভারি পিচকারীরে মঁয়তো সারী ভিজগয়ী"

মানব জাতির ইতিহাসে এরূপ সঙ্গীত অনেকবার গীত হইয়াছে। যখন ধনমদে অন্ধ,দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ লালা বাবুর ঘোরবিষয় কোলাহলের মধ্যে "আর দিন নাই" এই সঙ্কেত বাক্যে এক মুহূর্ত্তে বাসনা পুড়িয়া ছাই হইল, তখন তাঁহার অন্তস্তল হইতে এই সঙ্গীতই গীত হইয়াছিল ;—

"কিনভারি পিচকারীরে মঁয়তো সারীভিজগয়ী"

যখন নবদ্বীপ-দস্যু জগাই মাধাই অবধৌত নিত্যানন্দকে হরিনামের বিনিময়ে দুরন্ত আঘাৎ প্রদান করিল এবং প্রেমদাতা নিতাই চাঁদের রক্তবিন্দু সেই দুরন্ত দস্যুদ্বয়কে সর্ব্বপ্রকার সংসার-জ্বালা হইতে উদ্ধার করিল,তখন সেই দুই ভাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া এই গানই গাহিয়াছিল ;—

"কিনভারি পিচকারীরে মঁয়তো সারী ভিজগয়ী"

খ্রীষ্টীয় অবতার যিশুদেবের ক্রুশারোহণে উল্লসিত হইয়া, নিরীহ সাধু ষ্টীফেনের রক্তপাতের সাহায্য করিয়া, ভীত,ব্যস্ত,পলায়িত খ্রীষ্টশিষ্যবর্গের নির্যাতন মানসে শল তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল, দুরন্ত প্রতিহিংসা, নিদারুণ রক্ত-পিপাসা তখন তাহার ধমনীতে বিদ্যুদ্বেগে বহিতেছিল, এই অবস্থায় যখন তাহার নিকট হঠাৎ অপূর্ব্ব আলোক প্রকাশিত হইল, যখন সে অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশে অন্ধ হইয়া নূতন জীবন লাভ করিল, যখন দুরন্ত শল সেণ্টপল হইল, তখন তাহার অন্তর হইতে হিব্রুভাষায় এই সঙ্গীতই গীত হইয়াছিল ;—

"কিনভারি পিচকারীরে মঁয়তো সারী ভিজগয়ী"

আবার আরব ক্ষেত্রে বীরবর ওসমান তীক্ষ্ণ-ধার তরবারী হস্তে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের মস্তক ছেদন জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া চলিয়াছেন,মধ্যপথে সহোদরার মুখে কোরাণের একটী বয়ান শ্রবণ করিয়া তাঁহার জীবন আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তখন তাঁহারও হৃদয় হইতে আরব্যভাষায় এই সঙ্গীতই গীত হইয়াছিল।

"কিনভারি পিচকারীরে মঁয়তো সারী ভিজগয়ী"

যাঁহারা এই সঙ্গীত গাহিয়াছেন, গাহিতেছেন—বর্ত্তমানেও তাঁহাদের সংখ্যা বিরল নহে। সংসারে কতকগুলি লোকের জীবননাটকে আশ্চর্য্যরূপে পট পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই ভীষণ নরকের দৃশ্য অভিনীত হইতেছিল, দেখিতে দেখিতে স্বর্গের পট পড়িয়া গেল। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিই বল, বা ইহজন্মের কর্ম্মফলই বল, যে কোনও ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া তর্কযুদ্ধকে পরিতৃপ্ত কর, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি বুঝি, জীবনে যাঁহারা এই সঙ্গীত গাহিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। যেদিন শুনিয়াছি, সেই দিন হইতে কাণে সেই সঙ্গীত বাজিয়া আছে, নিশিদিন কেমন এক অদৃশ্য মূর্ত্তি, কেমন এক নীরব ভাষায়, কেমন এক মধুমাখা কণ্ঠে, কেমন এক আধ আধ স্বরে আমার কাণের কাছে সদাই যেন গাহিতেছে ;—

"কিনভারি পিচকারীরে মঁয়তো সারী ভিজগয়ী"

এই ভাবে যে ভিজিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, এইরূপ কৃপার নাম "অযাচিতা"।

শ্রীসনোরঞ্জন গুহ।

ভারতের স্বাধীন রাজগণের স্বাধীনতা।

মেটিরীর রামদাস বাবুর যেমন প্রভূত বল ছিল, তেমনি সুবিশাল বপুখানি।* একদা রথের মেলাতে তিনি মাতঙ্গারোহণে কৃষ্ণনগরে আগমন করায় দেশ বিদেশ হইতে সমাগত দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত ভাবে হাঁ করিয়া তাঁহার প্রতি তাকাইতেছিল দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, —"ওরূপ একদৃষ্টে কি দেখিতেছ ? তোমরা কি কখন হাতী দেখ নাই ? তদুত্তরে সহাস্য বদনে তাহারা বলে, "বাবু হাতী আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু হাতীর উপর হাতী কখন দেখি নাই, তাই এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার অবাক্ হইয়া দেখিতেছি।" ঐরূপ অবাক্ হইয়া কি আমরা আজ বৃটীশ সাম্রাজ্যের দিকে তাকাইতেছি না ? কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরাও ঐ রথযাত্রীদের মত বলিব,—"বিস্ময় বিমুগ্ধভাবে অনিমেষনেত্রে আমরা আজ বৃটীশ সিংহের দিকে তাকাইয়া আছি। ইহার বিশেষ হেতু এই যে, সিংহ অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু সিংহের পৃষ্ঠে সিংহ কখন দেখি নাই। তাই আজ হতভম্ব হইয়া হাঁ করিয়া বৃটীশ পশুরাজের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে হইয়াছে। এরূপ অভি-

* অনেকেই জানেন, বর্দ্ধমান ও নদীয়া এই দুই জেলার সীমান্ত স্থানে ভাগীরথী তীরে মেটিরী নামে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে। এই গমনোন্মুখ শতাব্দীর মাঝামাঝি তথাকার জমীদার বংশের রামদাস বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। মেটিরীর রামদাস বাবুর নাম সে সময়ে জানিত না, এমন লোক বাঙ্গালায় কম ছিল। বিপুল ধন সম্পত্তি, প্রজারঞ্জনাদি সদ্‌গুণ, "রায় বাহাদুর" "রাজাবাহাদুর" ছিঃ এ ছাই ইত্যাদি খেতাব, এ সকল কোন কারণে তিনি যশস্বী ছিলেন না। ইদানীং যাহা নিতান্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছে, তাহারই জন্য রামদাস বাবুর প্রতিপত্তি—রামদাস বাবু সুবিখ্যাত বীর-পালোয়ান ছিলেন। রামদাস বাবু, আসানন্দ ঢেঁকি, যে কয় জন বীরপুরুষের সে সময়ে অভ্যুদয় হয়, তাঁহাদিগকে দেখিলে বিদেশীয়গণ অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন যে,দারুণ অধ্যাতিগ্রস্ত বাঙ্গালী জাতির মধ্যেও বীরের জন্ম অসম্ভব নয়। রামদাস বাবুর দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য, একটী মাত্র ঘটনার উল্লেখ দ্বারা তাঁহার পরিচয় দিব। এক বৎসর বর্ষাকালে ভাগীরথীকূলে ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়া তাঁহাদের গঙ্গাতীরস্থ রামসীতার মন্দির সঙ্কটাপন্ন হয়। এক দিন সন্ধ্যাকালে এরূপ অবস্থা যে বিলক্ষণ বুঝা গেল, নিশাবসানে দেবমন্দির বা তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানের চিহ্নমাত্রও কাহারও নয়নগোচর হইবে না। রামদাস গৃহে উপস্থিত নাই, স্থানান্তরে গিয়াছেন, তাঁহার দেব-ভক্ত পিতা বড়ই ব্যাকুল হইলেন, কি উপায়ে মন্দিরস্থ চারিটী বিপুল ধাতব বিগ্রহ রক্ষা পায়। সে সময়ে গ্রামে এমন কোন বন্দোবস্তের উপায় ছিল না, যাহাতে সত্বর ঐ দশবার মণ মাল তফাৎ করা যায়। আর এক আধঘণ্টার মধ্যেই বিগ্রহ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সহ মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইবে,এমন সময় রামদাস গৃহে উপনীত হইয়া বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র মন্দিরে গমন করত, দুই বগলে দুইটী করিয়া বিগ্রহ এবং ক্রমে অন্যান্য সামগ্রী চকিতের ন্যায় বাসভবনে আনিয়া ফেলিলেন।

নব দৃশ্য শুধু আমরা কেন সমগ্র সংসার কখন দেখে নাই। ইতিহাসে এবং বর্ত্তমানে বিস্তর সাম্রাজ্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছি, কিন্তু এক সাম্রাজ্যের উদরস্থ আর এক বিশাল সাম্রাজ্য, ইহা সংসারের জ্ঞানে নাই, কেহ কখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে সমর্থ হয় নাই। এরূপ অঘটন কেবলমাত্র দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত ইংরাজ বাহাদুর অধুনা ঘটাইয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে চমক্ লাগাইয়াছেন।" পাঠক ভাবিয়া দেখুন, এই বিদ্যুৎ, রেল, সভ্যতা, আলোকের সময়ে আয়তন, প্রকৃতি সংখ্যা, ধনসম্পত্তি, বলবুদ্ধি-কৌশল, রাজনীতি, অক্ষুণ্ণ প্রতাপ, নগরাদির সংখ্যা সমৃদ্ধি ও সৌষ্ঠব, ইত্যাদি বিষয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের যেরূপ প্রাধান্য, তাহার সহিত পুরাকালের সাম্রাজ্য সমূহের তুলনাই হয় না, আধুনিক গুলি ত ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। তবে এই পেটাও সাম্রাজ্য বাদ দিলে উপনিবেশাদি লইয়া শ্বেতদ্বীপ কোন্ পদবীতে দাঁড়াইতে পারেন, সেটা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। সুতরাং অন্যান্য অংশের কথা রাখিয়া এখন প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাউক।

ব্রহ্মার সৃষ্টি অবধি মুসলমান বাদশাহী পর্য্যন্ত কোন সময়ে এই সসাগরা সদ্বীপা ভারতক্ষেত্র একজন সম্রাটের ষোল আনা বশীভূত থাকিয়া এক আইনে এক নিয়মে সুশাসিত হয় নাই। অনেক মহামহাবীর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই সফলকাম হইতে পারেন নাই। পুরাণাদির প্রমাণে জানা যায় যে, কেবল মাত্র যুধিষ্ঠির যাহা কিছু করিতে পারিয়াছিলেন, নচেৎ তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে কেহই ভারতে একছত্র সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দেখা যায় যে, এ দিকে ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি এবং ওদিকে গান্ধারাদি বহুদেশ হইতে নৃপতিগণ আমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উহাকে অনায়াসে আমরা প্রেমের দরবার বলিতে পরি, ধর্ম্ম,প্রেম ও রাজনীতি এই তিনটী একত্রিত ভাবে উক্ত সভা আহ্বান করিয়াছিল। যে সকল নরপাল সমাহূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ভাবে আপন আপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের রাজধানীতে আসিয়া যে শ্রেণীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা মহতের নিকট ক্ষুদ্রের মস্তকাবনমন মাত্র। উহা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের লিটন দরবারের মত নয়। সাদৃশ্যের মধ্যে এইটুকু যে, উভয় দরবার একই স্থানে বসিয়াছিল। ভারতের করদ মিত্র রাজ্যগুলির উপর সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য সংস্থাপনই শেষদরবারের উদ্দেশ্য। এক স্থানে সকলকে সমবেত করিয়া উপযুক্ত মর্য্যাদা রবাবের সহিত ঘোষণাপত্র প্রচার দ্বারা সাম্রাজ্যের দৃঢ়ীকরণ জন্যই এই বিপুল আয়োজন করা হয়। অনেকে হয়ত সে সময় খেয়াল না করিয়া থাকিবেন যে, দরবারের প্রারম্ভে সমবেত আহূত ব্যক্তিগণকে "Princes and Noblemen" বলিয়া সম্বোধন করা হয়, কিন্তু শেষকালে তাঁহাদিকেই 'Nobles and Gentlemen' আখ্যা দ্বারা উপসংহার সম্পন্ন হয়। তৎপূর্ব্বে নিজাম প্রভৃতি কয়েকজন নরপতির কুইনের সঙ্গে সমান ২১ তোপ সেলামী ছিল। উক্ত দরবার হইতে এম্প্রেসের ১০১ তোপ এবং বড়লাট সাহেবের ৩১তোপ নির্দ্ধারিত হয়। ঐ সময় হইতে 'মহারাজা'

খেতাবটাও খুব সস্তা হইয়া পড়ে; তৎপূর্ব্বে ওরূপ ছিল না। তাহাতে বড়ই অসামঞ্জস্যের কারণ হইয়াছে, সন্দেহ নাই:—দুই লক্ষ টাকা মাত্র বার্ষিক আয়, এমন একজন সাধারণ জমীদার হয়ত বাবু পদবী হইতে ধীরে ধীরে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইলেন, অথচ সহস্র বৎসরের প্রাচীন সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রকৃত স্বাধীন নরপতির বংশধরকে 'রাজা' 'রাও' বা 'ঠাকুর' আখ্যাতে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। অবশ্য কালমাহাত্ম্যে দেশীয় ভূপতিগণ নিজেদের দোষেই অবনত হইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া হাজার সমৃদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ জমীদার শ্রেণীর বৃটীশ প্রজাপেক্ষা তাঁহারা সম্মানার্হ, সে বিষয়ে আপত্তি করিবার ত কোন কারণ দেখা যায় না।

এখন দেখা যাউক, আমাদের দেশীয় ভূপালগণের বর্ত্তমান অবস্থা কি? মুসলমান সম্রাটের পূর্ব্বে উহারা কিরূপ ভাবে রাজত্ব করিতেন, সে বিষয়ে আমরা বেশী কিছু জানি না। বাদশাহী আমলে উহারা দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহাদি এবং স্বরাজ্য আপন খেয়াল অনুযায়ী শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। দিল্লীতে মধ্যে মধ্যে কিছু কর পাঠান পর্য্যন্ত সম্পর্ক ছিল; তদ্ব্যতীত বাদশাহের পক্ষ হইতে তাঁহাদের উপর কোন প্রকারের দৃষ্টি ছিল না। রাজাদের ত ওরূপ উন্মুক্ত অবস্থা ছিলই, সম্রাটের নিযুক্ত সুবাদারগণও ঐ প্রকার স্বাধীন ভাবে শাসন করিতেন। ক্রমে উক্তরূপের দরাজ হাত-পা-ছড়ান পদ হইতে বর্ত্তমান সাম্রাজ্যের কিহাল হইয়াছে,আলোচনা করা যাউক। মুসলমান শাসন হইতেই তাঁহাদের সিংহাসনের নাম "গদী" হইয়াছে। গদী শব্দ সর্ব্বপ্রকার উচ্চাসনের প্রতিই ব্যবহার করা যায়; মঠের মহান্তদিগের আসনকেও গদী বলে,বড় বড় পুরাতন জমীদাদের পদকেও গদী বলে। তক্ত্ অর্থাৎ সিংহাসন শব্দ কেবল দিল্লীর প্রতিই প্রযুজ্য ছিল। সেই গদী শব্দ উহাদের রাজাসন সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ও বিষয়ে বাদশাহী ও ইংরাজী আমলে তাঁহাদের পক্ষে কোন তারতম্য ঘটে নাই। তারতম্য ঘটিয়াছে, আসল জায়গায়। প্রথম প্রথম কোম্পানির সময়ে এই নরপতিগণের প্রধান প্রধান গুলিকে মিত্র ভূপাল রূপে গণনা করা হইত, কারণ তখন উহাদের বিশেষ প্রতাপছিল, কোম্পানি বাহাদুরকে মধ্যে মধ্যে উহাদের সাহায্যে অনেক কার্য্য উদ্ধার করিতে হইত; সুতরাং এরূপ বাধ্যবাধকতা সত্ত্বে প্রয়োজন সাধন জন্য সর্ব্বদা উহাদের মুখাপেক্ষা না করিয়া উপায় ছিল না। দিল্লী টুটিবার পরেও সময়ে সময়ে বড় রাজারা অনেক স্থলে কোম্পানির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেও ছাড়েন নাই। যে এক স্বতন্ত্র অবস্থা ছিল। ক্রমে ক্রমে বৃটীশ কামানের প্রখর তেজ দেশ মধ্যে যত প্রচারিত হইতে লাগিল, উহারাও সেই পরিমাণে বৃটীশ সিংহের নিকট মস্তক অবনত করিতে থাকিলেন। ধীরে ধীরে এরূপ বাঁধা বাঁধি হইয়া উঠিল যে, অস্ত্রধারণের বীরোচিত কার্য্য হইতে উহাদিগকে অবসর লইতে হইল। তাহার পর যে সকল সৈন্য সামন্ত রহিল, তাহারা কেবল মাত্র শোভা সৌষ্ঠব সম্পাদনে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইংরাজের শীতল ছায়ায় রাজারা নিরাপদে নিশ্চিন্তভাবে কালাতিপাত করিতে পাওয়ায় ক্রমে বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইয়া বীর

বংশধরদিগকে কোমল শয্যাভোগী সুকুমার ননীর পুতুল করিয়া তুলিল। রাজ্য শাসনের বিশেষ গুরুতর ভারগুলি প্রকারান্তরে ইংরাজ রেসিডেণ্টগণের হস্তে ন্যস্ত হইল, মোটামুটি সাধারণ কার্য্য সমূহ দেওয়ান, মন্ত্রী, কৌন্সিল দ্বারা চলিতে লাগিল, রাজার বিশেষ আর কোন কাজ নাই। ভারতের একঘেয়ে ভোগবিলাসে ক্রমে অরুচি বোধ হইবারই কথা; তখন ইউরোপীয় ভোগ বিলাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে ঘন ঘন বিলাত গমন আরম্ভ হইল। টাকার দুঃখ নাই; ইচ্ছা করিলেই বড় বড় আরামের জাহাজ পাওয়া যায়, তবে আর ভাবনা কি? এ কথা খেয়ালে আসে নাই যে, তাঁহাদিগকে ইংরাজ বাহাদুর বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া আপনাপন পদে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছেন,কেবল সাম্রাজ্যের শোভা রক্ষার্থ। সম্রাট নাম রাখিতে গেলে, তাঁহার অধীনে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতি না রাখিলে ভাল দেখায় না। এটাও খেয়াল করেন নাই যে, নামে স্বাধীন রাজা হইলেও তাঁহারা "দৌলতে ইংলিশীয়া"—নিজ নিজ পৈতৃক রাজ্যের সুশাসন কার্য্য সম্পাদনার্থ ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত স্থায়ী লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্বরূপ। তবে বহুকাল হইতে যে সকল ভূপালোচিত সত্ত্ব সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন,তন্মধ্যে আভ্যন্তরিক কতকগুলি এখনও রক্ষিত হইয়াছে. ইহার জন্য উহাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সুবিচক্ষণ প্রজাবৎসল বড়লাট কর্জ্জন বাহাদুর এসম্বন্ধে অতি সমীচীন মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন।* বড় লাটের উক্ত শাসন বাক্য প্রচারের পরে বোধ হয় নরপতি মহোদয়গণের সংজ্ঞা হইয়া থাকিবে যে, তাঁহারা কোথায়। এ তাবৎ বোধ হয় তাঁহাদের জ্ঞান ছিল যে, রেসিডেণ্টের মন যোগাইতে কোন প্রকার ত্রুটি করিতেছেন না, সিমলা দার্জ্জিলিঙ্গ শৈলে বড় বড় সাহেব মেমদিগকে খানা, বল্, ভেট দিতেছেন, মধ্যে মধ্যে দেশ বিদেশে বৃটীশ সিংহের জয় ঘোষণাতে হুলুধ্বনি,আতস্ বাজী উড়াইতেছেন, সময়ে সময়ে রাজরাজেশ্বরীর সুখ দুঃখে যথা বাহিত হর্ষ বিষাদ প্রকাশ করিয়া মামুলী এক এক খান লম্বা লম্বা নিবেদন পত্র তাঁহার নিকট পেশ জন্য লাট সকাশে পাঠাইতেন; আর কি চাই? আবার সকল দোষ ত্রুটি হজম করিবার জন্য মোটা মোটা বেতনে শ্বেতাঙ্গ পুরুষগণকে কর্ম্মচারীও নিযুক্ত করিয়াছেন, তবে আর কিসের আশঙ্কা? নিজের সর্ব্বপ্রকার আলস্য, শিথিলতা, জড়তা, ঔদাসীন্য, অমনোযোগ, অনুপস্থিতি,সমস্ত নিশ্চয় উপেক্ষিত হইবে। তদতিরিক্ত যখন মধ্যে মধ্যে বিলাত গমন দ্বারা খোদ বড় কর্ত্তা ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয়কেও নানা প্রকারে খুশী করিয়া আসিতেছেন, স্বয়ং ভারতেশ্বরীর প্রাসাদে সম্মানিত হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন, তখন ত সাতখুন মাপ, আর কে পায়! এযাবত বড়লাটগণ কখন কেহ কিছু বলেন নাই,

* "The Government of India hold very strongly to the opinion that the first and paramount duty of a Native Prince or Chief lies towards his own State and people. By the *protection and authority* of the Supreme Government, he is guaranteed a security of *tenure* in his exalted station. In return for these advantages the Government are entitled to claim that the ruler shall devote his best energies, not to the pursuit of pleasure, nor to the cultivation of absentee interests or amusements, but to the welfare of his own subjects and administration:—India Govt. Resolution, Dated 20 July, 1900."

তাহাতেও প্রশ্রয় পাইবার কথা। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্জ্জন কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া, এক মাত্র ইংরাজ শাসনের উদার প্রজাবৎসল রাজনীতির বশবর্ত্তী হইয়া, বিনা মুখাপেক্ষায় সরল ভাষায় উহাদিগকে বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছেন যে, ব্যক্তিগত খুশী খোসামোদে আসল কাজে ত্রুটি উপেক্ষা করা বৃটিশ শাসন প্রণালীর নীতি বিরুদ্ধ।

কর্জ্জন বাহাদুর তাঁহার অনুশাসন পত্রে ঐ কয়টী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। উনি এ পর্য্যন্ত বলিতে ত্রুটি করেন নাই যে, সর্ব্বদা সখের জন্য ইউরোপ গমনাগমন করিলে দেশীয় রাজাদের মতিগতি খারাপ হইয়া থাকে—the result is a collection of questionable proclivities in the mind of the returned traveller—বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা আমাদের ভূপতিগণের পক্ষে অনিবার্য্য ফল বলিয়া বিশ্বাস করিতেই হইবে। আমাদের দেশে দশ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের কোন ব্যক্তির যদি একটী মাত্র পুত্র থাকে, তাহা হইলে সেই সবে-ধন-নীলমণির ভাগ্যে কিরূপ শিক্ষালাভ ঘটিতে পারে, অনায়াসেই বুঝা যায়। সে ক্ষেত্রে বিপুল ধনরত্ন বিশাল রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজগণের বিদ্যোপার্জ্জন সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য হইতে পারে। এই সকল ব্যক্তি আপনাদের পদমর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমক প্রদর্শন করিতে যখন ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি রাজ্যে উপনীত হন, তখন তাঁহাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব সহচর অনুচরের সংখ্যা, হাবভাব, পোষাক পরিচ্ছদ এবং তাঁহাদের নিজেদের বেশ ভূষা প্রভৃতির চাকচিক্য চমক্ দেখিয়া অন্যান্য অভিপ্রায় ব্যতীত শুধু কৌতুহল চরিতার্থ জন্য যে উচ্চনীচ কত শ্রেণীর কত প্রকার নরনারী তাঁহাদের সংসর্গে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। ওরূপ স্থলে মাথা ঠিক রাখা প্রবল মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে, উহাদের কথা আর কি বলিব। লাট সাহেব যে বলিয়াছেন "temptations of European society" দ্বারা তাঁহাদের অধিকাংশের চিত্তের অবস্থা মন্দের দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এখন একটা কথা উঠিয়াছে, এবং তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নয় যে, এ প্রকারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া দেশীয় রাজাদের ইউরোপগমনসম্বন্ধে অনুজ্ঞা প্রচার করা কতদূর সাধারণ নীতির অনুযায়ী হইতে পারে। একজন সামান্য প্রজা বা জমীদার শ্রেণীর লোকের উপর ত ওরূপ হুকুম প্রচার করা যাইতে পারে না; তবে কি ইঁহারা তাহাদের অপেক্ষাও পরাধীন? এখানে বিচার্য্য এই যে,পদমর্য্যাদাতে যত উচ্চে উঠিতে চাও, ততঃ আপনাকে পরাধীন করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। একজন নিম্ন শ্রেণীর লোক অনায়াসে একখান গামছা স্কন্ধে ফেলিয়া পথে বাহির হইতে পারে বলিয়া তুমি আমি তাহা পারিব না। আবার আমরা যে ভাবে পথে বেড়াইতে পারি, একজন রাজা মহারাজা তাহা পারেন না। ইহা ত গেল সাধারণের সমালোচনার মুখাপেক্ষা-জনিত পরাধীনতা। এক জন উকীল যে পোষাকে হাইকোর্টে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে পারেন, একজন বারিষ্টর সে পোষাকে পারে না, ইহা

রাজকীয় নিয়মের পরাধীনতা। এইরূপ পরাধীনতা কত প্রকার আছে। অধিক আর কি বলিব, অনেক বিষয়ে ভারতেশ্বরী আপন সাম্রাজ্যের নিয়মাদির পরাধীন। ইচ্ছা ও অর্থ বল থাকিলে তুমি আমি অনায়াসে কাহারও মতামত না গ্রহণ করিয়া ভূপ্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারি; কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী বৃটীশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া ভিক্টোরিয়ারও স্বাধীনতা টুকু নাই। পার্লামেণ্টের বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত উনি তাহা পারেন না, এবং পার্লামেণ্টও বিশেষ বিশেষ কারণে উক্ত বিষয়ে হয়ত কখনই মত দিবেন না। সুতরাং জানিতে হইবে যে, পরাধীনতা নানারূপে নানা শ্রেণীর লোকের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে। উহা জীবমাত্রের এক কঠিন প্রভু।

দেশীয় রাজগণের জানা উচিত যে, উহাদের প্রজাবর্গ বা মোসাহেবগণ * যত প্রকার চাটুবাক্য দ্বারা উঁহাদিগকে স্বর্গে তুলুন কেন, বাস্তবিক তাঁহারা ট্রষ্টী বই কিছু নন। দায়িত্ব উহাদের ভয়ানক; তাহা লাট বাহাদুর বিলক্ষণ স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "রাজার জন্য প্রজা" এ কথা বহুদিন অসার বাক্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে; এখনকার নীতি "প্রজার জন্যই রাজা।" সেকাল আর নাই, Divine right of kings"—"দিল্লীশ্বরে বা জগদীশ্বরোবা" এখন বাতুলাশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রজাহিতবিরোধী নরপতিগণের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা বিহিত, তাহা ব্রাজীলের সম্রাট ডম্ পিদ্রোর ক্ষেত্রে ব্রাজীলীয় প্রজাগণ দেখাইয়াছেন। তিনি ত সম্রাট ছিলেন। ব্রাজীল দূরের কথা; ভারতে দেশীয় রাজগণ সম্বন্ধে সর্ব্বদা কিরূপ বিচার ও আদেশ হইতেছে, তাহা ত আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না।

* বিশ বৎসরের অধিক হইল লেখক রাজপুতানা, মালব, গুজরাট, কাঠিয়াড়, কচ্ছ প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্য সমূহ পর্য্যটন কালে কোন স্থলে উক্ত মোসাহেব বা হজুরী মহাপুরুষগণের অত্যাচার সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ স্বতঃ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, এবং যে গুলি প্রত্যক্ষ দেখিতে পান, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে বিষম ব্যাপার। স্থান বিশেষে স্বয়ং নরপতির আদেশ বা অনুমোদনে উৎপীড়ন হইতে দেখা গিয়াছে। পদচ্যুত পুরবন্দরের বৃদ্ধ রাণা (এখন মৃত) একজন বিশেষ দৃষ্টান্ত। তিনি ধরা পড়িয়াছিলেন বলিয়া কেবল মাত্র তাঁহারই নাম করা হইল। পুলিস ও রাজস্ব বিভাগের জোর, জুলুম, পীড়ন ত নিত্য নৈমিত্তিক গা-সওয়া ব্যাপার। রেসিডেণ্ট প্রভৃতির নিকট সব নালিস পঁহুছাইতে পারে, এমন সাধ্য কাহার? উক্ত হুজুরীগণ রাজার চির-সঙ্গী রাজপ্রাসাদেই রাজভোগে অতি সুখে কালাতিপাত করেন। সকলেই বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করত সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন; কোন কোন রাজা উঁহাদের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রধান কার্য্য রাজ্যের ছোট বড় সমস্ত সংবাদ রাজার কর্ণগোচর করত তাঁহার হর্ষ বিষাদ জন্মাইয়া প্রীত বা ক্রুদ্ধ করা। এই শ্রেণীর মধ্যে একজন প্রধান থাকেন, তাঁহার নাম হুজুরীখাশ বা প্রাইবেট সেক্রেটারী। রাজ্য মধ্যে ভাল মন্দ ঘটাইতে তাঁহার ক্ষমতা প্রায় সর্ব্বশক্তিমানের কাছাকাছি। "এ রাজার প্রতি অবিচার হইল," "এরাজার প্রতি অন্যায় হইল," বলিয়া আমরা যে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করি, সেই কেবল মাত্র আমাদের একদেশদর্শিতার জন্য। এক বার স্বাধীন রাজ্য গুলির অভ্যন্তরের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া যাইলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, বৃটীশ প্রজা কত নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ।

উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, সমস্ত দিক বিচার করিয়া ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি স্বরূপে বড় লাট কর্জ্জন বাহাদুর যে অনুশাসন পত্র ঘোষণা দ্বারা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে দোষের কিছু নাই, তাঁহার যুক্তি গুলি সহজ ও সমীচীন, এবং তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ। সুতরাং উহা দ্বারা সমূহ ইষ্টেরই সম্ভাবনা। সাধারণ গেজেট ওরূপ শাসন বাক্য প্রচারিত হওয়ায় অনেকের মনে দুঃখ হইয়া থাকিবে। বড় ঝড় বড় বড় গাছেই অতি তীব্রভাবে লাগিয়া থাকে। যাহা হউক, এখন দেশীয় রাজগণকে লাট সাহেবের উপদেশানুযায়ী কাজ করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইব, এবং তাঁহাদের প্রজাবর্গ সুখ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে থাকিবে। শ্রীচন্দ্র শেখর সেন।

দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন।

এই দর্শন শাস্ত্র ভারতে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, দর্শন শাস্ত্রের প্রয়োজন ও উৎপত্তির কারণ কি, তাহা আমরা এক্ষণে আলোচনা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনুষ্য সমাজ উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে না পারিলে ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্র চর্চ্চার অধিকারী হয় না। প্রথমে ধর্ম্মের স্থাপনা হয়। ধর্ম্মের শেষ পরিণতি দর্শনশাস্ত্র। সুতরাং যে সমাজ স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি নিয়মবশে ক্রমে উন্নত হয়, ও যদি বাহিরের অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত সমাজের সম্পর্ক বিনা স্বতঃ বা স্বাভাবিক চেষ্টায় সে সমাজ উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে, তবে সে সমাজে দর্শন শাস্ত্র ধর্ম্ম ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয় (১)। আমাদের দেশে ধর্ম্ম বুঝাইতে, বেদ বুঝাইতেই দর্শনশাস্ত্রের প্রথম সৃষ্টি হয়। ইউরোপে মধ্যযুগের অধিকাংশ দর্শনশাস্ত্রই খ্রীষ্টধর্ম্মতত্ত্ব প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা প্রচার করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধদর্শনও বৌদ্ধ ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য সৃষ্ট হয়। গ্রীসদেশে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই। তাহার কারণ, গ্রীসদেশে দর্শন শাস্ত্রের স্বতঃ স্ফূর্ত্তি হয় নাই, ভারতের দর্শন আলোচনার অনুকরণে গ্রীক পণ্ডিতগণ দর্শন চর্চ্চা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তিতে এদেশে দর্শনশাস্ত্র কিরূপে ও কি প্রয়োজনে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এস্থলে মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। সেকথা বুঝিতে হইলে ধর্ম্মতত্ত্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে ও বেদ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জানিতে হইবে।

আমাদের অন্তঃকরণের তিন প্রকার বৃত্তি, তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন।

(১) ফরাশি দার্শনিক কুঁজে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"Religion is the foundation of every civilization. Religion is the cradle of Philosophy. ..... Religion contains Philosophy."

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,

"The whole of Indian Philosophy appears to be only an interpretation, more or less free of the religious books of India."

Cousin's History of Philosophy Vol I.p32

সেই তিন বৃত্তি—জ্ঞান, কর্ম্ম ও চিত্ত (২) সেই জন্য মানুষ জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা, কর্ত্তা ও ভোক্তা। মানুষের এই সকল শক্তির ক্রম বিকাশ হয়। বালকের বা অসভ্য সমাজের লোকের এই সকল শক্তি পরিমিত। মানুষ যতক্ষণ স্বার্থ বা বাসনা চালিত হয়, কেবল সুখজ বিষয় সংগ্রহ ও দুঃখজ বিষয় পরিহার হেতু প্রবৃত্ত হয়, ততক্ষণ তাহার জ্ঞান শক্তির প্রকৃত বিকাশ আরম্ভ হয় না। বাসনা সংযত করিয়া, আপনাকে ভুলিয়া মানুষ যখন বাহ্য বিষয় আলোচনা করিতে শিক্ষা করে, কর্ত্তা ও ভোক্তা অবস্থা ভুলিয়া জ্ঞাতা হইতে চেষ্টা করে, তখন তাহার জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। তখন যে দ্রষ্টা হইতে পারে। তাহার পর যখন জ্ঞানের অজ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হয়, তখন যে প্রকৃত দ্রষ্টা হয়। (৩)

এই দৃষ্টি দুই রূপ-স্বতঃস্ফূর্ত্ত আর যুক্তি ও প্রমাণ হইতে জাত। স্বতঃস্ফূর্ত্ত দৃষ্টি বাহ্য ও আন্তর প্রত্যক্ষজ। স্থূল বিষয় বাহ্য দৃষ্টির অন্তর্গত, আর বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম বিষয় আন্তর দৃষ্টির অন্তর্গত। মানুষের এই বাসনা-বিহীন স্বরূপ দৃষ্টিতে বাহ্যজগৎতত্ত্ব প্রথম প্রতিভাত হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশেষতঃ চক্ষু দ্বারা এই জগৎ-জ্ঞান লাভ হয়। ক্রমে এই জগৎ-দৃষ্টি হইতে দ্রষ্টার স্বরূপ জানিবার চেষ্টা হয়। ক্রমে দ্রষ্টা ও দৃষ্টের অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ীর একত্ব অনুভূত হয়।

এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত বাহ্য দৃষ্টি হইতে চিত্ত-রঞ্জিণী বিদ্যার সৃষ্টি হয়। আর স্বতঃস্ফূর্ত্ত সূক্ষ্ম বা আন্তর দৃষ্টি হইতে ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হয়। প্রমাণজ বাহ্যদৃষ্টি হইতে প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর প্রমাণজ আন্তর দৃষ্টি হইতে দর্শনের উৎপত্তি হয়। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্তর প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ অনুভূতি হইতে যে ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, প্রমাণজ আন্তর দৃষ্টি হইতে সেই তত্ত্ব লাভ করাই দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই আন্তর প্রত্যক্ষ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব বিনা যুক্তি ও প্রমাণে অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয়, তাহাই বেদ। (৪)

পণ্ডিতগণ জানেন, বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষিগণ সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সপেনহরের ন্যায় আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এই সকল ঋষিগণ মহাপুরুষ অতিমানবশক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

(২) কেহ কেহ জ্ঞানকে বৃত্তি বলেন না, কেননা জ্ঞান আত্মার স্বরূপ। তাঁহারা জ্ঞানের পরিবর্ত্তে বুদ্ধিকেই অন্তঃকরণ বৃত্তি বলেন। বেদান্ত মতে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটিই অন্তঃকরণ বৃত্তি। ইংরাজিতে যাহাকে understanding বা (intellect) বলে, তাহাই এই বুদ্ধি। জ্ঞান বলিলে transcendental Reason বুঝায়। কোন কোন বৈদান্তিকের মতে মন ও বুদ্ধি কেবল এই দুইটীই মূল অন্তঃকরণ বৃত্তি। বৈদান্তিকগণের মতে অন্তঃকরণ বৃত্তি প্রকৃতিজ বা অজ্ঞানজ, আর জ্ঞান আত্মারই স্বরূপ। এ সকল বিষয় যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

(৩) এই অজ্ঞানাবরণ কাহাকে বলে, তাহা যথা স্থানে বিবৃত হইবে।

(৪) বেদেই উল্লিখিত আছে, "যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞের দ্বারা বেদলাভে যোগ্য হইয়া ঋষিস্থিত সেই সেই বেদ লাভ করিয়াছেন।" এইরূপে বেদ ক্রমে প্রচারিত হইয়াছিল।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ঃ—

অতএব বিশ্বাস করা উচিত, প্রাচীনেরা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভাষণাদি

নির্ম্মল ছিল, সেই পরিমাণে তিনি সত্য লাভ করিয়াছিলেন। চিত্তপূর্ণরূপে নির্ম্মল না হইলে পূর্ণসত্য এরূপে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে চিত্তে স্ফূর্ত্ত হইতে পারে না। ভোক্তা কর্ত্তা ভাব একেবারে লোপ হইয়া পূর্ণজ্ঞাতা ভাবের বিকাশ না হইলে পূর্ণজ্ঞান চিত্তে প্রতিফলিত হয় না। এই কথা বুঝিতে হইলে এই সম্বন্ধে মনে করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা চিৎস্বরূপ। জীব চিৎজ্ঞান স্বরূপ। জ্ঞান এই চিতের ধর্ম্ম বা স্বভাব। কিন্তু জীবজ্ঞান অজ্ঞান আবরণে আবরিত। ইন্দ্রিয় বৃত্তি, প্রাণ বৃত্তি ও অন্তঃকরণ বৃত্তিতে মানুষের আত্মা অধ্যাসিত। আত্মা এই অজ্ঞানাবরণ দূর করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে না পারিলে আত্মাতে সত্য প্রতিভাত হয় না। দর্পণ মলাবৃত থাকিলে তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না। এই মলা দূর করিলে তবে তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়িবে। জ্ঞান-স্বরূপ আত্মার মলা যে পরিমাণে নষ্ট হয়, সেই পরিমাণে তাহাতে সত্য প্রতিভাত হয়। এই তত্ত্ব এস্থানে আর বিস্তারিত বুঝিবার আবশ্যক নাই।

যিনি এইরূপ নির্ম্মল-চিত্ত হইতে পারেন, তাঁহারই জ্ঞানে সত্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় (১)। আর যাঁহারা মানব সমাজের জ্ঞানোন্মেষের প্রথম সময়ে সকলের অগ্রণী হইয়া চিত্তের নির্ম্মলতা হেতু এই সত্য প্রথমে দর্শন করিয়া প্রচার করেন, যেই মহাপুরুষদের সংগৃহীত সত্য সকল অবলম্বন করিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া সে সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, সেই মহাপুরুষদের সংগৃহীত সেই মহাবাক্য সকলই বেদ। কিন্তু বেদ বলিতে মানব দৃষ্টির প্রথম বিকাশ অবস্থা হইতে পূর্ণ বিকাশ অবস্থা পর্য্যন্ত-আগমন করিতে যতগুলি বিভিন্ন স্তর দিয়া

করিতে সমর্থ ছিলেন। যোগস্মৃতিতেও আছে,—মন্ত্র যপের দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শন হয়। যাহার ফল প্রত্যক্ষ, যাহার দ্বারা অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, কেবল মাত্র সাহস অবলম্বন করিয়া তাহার প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। শ্রুতিও যোগের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। * * যে যোগী যোগজনিত তেজোময় শরীর প্রাপ্ত হন, তাঁহার জরা মৃত্যু থাকে না। আমাদের শক্তির সহিত ঋষির শক্তি তুলিত হইতে পারে না।

(বেদান্তদর্শন ভাষ্য ১।৩।৩৩সূত্র)

পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ সপেনহরের কথা এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইল ঃ—

"Yeti n the early ages, those who stood nearer to the beginning ofthe humanrace, had both greater energy of the intuitive faculty of knowledge, and a truer disposition of mind, so that they were capable of a purer, and a more direct comprehansion of the inner being of nature,.....Thus orginated in the primitive ancestors of the Brahmans—Rishis, the almost superhuman conceptions, which were afterwards set down in the upanishads of the Vedas." World as Will and Idea, Vol II, p 362.

"Those sublime authors of the upanishads of the Vedas, who can scarcely be thought of as mere men. Do, Vol III p. 265.

(১) ইউরোপীয় দার্শনিকপণ্ডিতগণের মধ্যে ফরাসি দার্শনিক কুঁজে এই তত্ত্ব ধারণা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"Inspiration is distinct from reflection. It is the perception of truth, without the intervention of the will, and without mixture of personality. It is revelation, and is characterised by enthusiasm. It comes directly from God—the Eternal Reason."

"Truth in itself is as independent of man, in whom it appears. Its true subject is universal and alsolute reason, that incorruptible intelligenee of which ours is a fragment. But fallen as it (reason) is in man, and thereby in relation with the senses, passions and imagination, it has become fallible."
Cousin's History of Philosophy Vol I.

ক্রমে ২ অগ্রসর হইতে হয়,সেই সকল স্তরে প্রকাশিত সমস্ত সত্য সংগ্রহকেই বুঝায়।

যখনই যে কোন দেশে যে কোন কালে যে কোন মানব সমাজ অসভ্য পশুতুল্য অবস্থা হইতে,স্বপ্নময় অবস্থা হইতে জাগরিত হইয়া উন্নতির স্তরে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে, ও ক্রমে ক্রমে উন্নতির শেষ সীমায় অগ্রসর হহতে থাকে, তখনই সেই সমাজে উন্নতির বিভিন্নস্তরে বিভিন্ন মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই সকল সত্য আবিষ্কার করিতে থাকেন। এবং সমাজ সেই সকল সত্য অবলম্বন করিয়া বা তাহার অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। সমাজ যত উন্নত হয়, সেই পরিমাণে এই সকল সত্য লাভ করিতে থাকে। সেই পরিমাণে সেই সমাজে বেদোক্ত তত্ত্ব প্রতিভাত হয়। উন্নতির শেষ সীমায় আসিলে তবে সমগ্র বেদ লাভ করিতে পারা যায়।

বেদান্তমতে ব্যবহারিক জগৎ ও দৃষ্টি। ইহার সৃষ্টিলয় অনাদি। [illegible] অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত। এ জগতে কোথাও সৃষ্টি কোথাও লয় ক্রিয়া অবিরত চলিতেছে; আবার কখন এক সৃষ্টি লয় হইতেছে,আবার নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইতেছে। এই সৃষ্টি লয় প্রবাহ বরাবর চলিয়া আসিতেছে। যে নিত্য অনন্ত জ্ঞানে অনন্ত কাল ও স্থান প্রতিভাসিত, সেই অনন্ত জ্ঞানে এই সৃষ্টি লয় প্রবাহও নিত্য পরিকল্পিত। এক সৃষ্টির পরে যখন নূতন সৃষ্টি হয়, তখন সেই নূতন সৃষ্টি অতীত সৃষ্টির অনুরূপ হয়। এই জন্য শাস্ত্রে আছে,

"সূর্য্য চন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।"

সুতরাং সেই নূতন সৃষ্টি প্রবাহ অতীত সৃষ্টি প্রবাহের বাসনা বীজ হইতে জাত বলিয়া তাহার অনুরূপ হয়। এই জন্য সেই নূতন সৃষ্টিতে মানবের অনুরূপ জাতির সৃষ্টি হয় এবং সেই জাতি ক্রমোন্নীত হইয়া আবার সেই অতীত সৃষ্টির ন্যায় বেদ লাভ করিতে পারে। এই জন্য বেদ নিত্য। এই জন্য বেদ সমষ্টি মানবের জ্ঞান বা বুদ্ধি শক্তি হিরণ্য গর্ভ হইতে প্রত্যেক সৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। ইহা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। এতত্ত্ব পরে উল্লিখিত হইবে।

যে সকল জাতি উন্নত হইয়া ক্রমে ক্রমে এই বেদ লাভ করিতে থাকে, সেই জাতির মধ্যে এই বেদ স্মরণ হেতু পরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া প্রচলিত থাকে। এই জন্য বেদের আর এক নাম শ্রুতি। কখন কখন কোন জাতি মধ্যে সেই সকল সত্য কোন মহাপুরুষ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে চিরস্থায়ী করিয়াছেন। কোন কোন জাতি মধ্যে স্মৃতি লোপ হেতু ঐ সকল শ্রুত সত্য লোপ হইয়া যায়। সমাজ উন্নতির উচ্চ স্তরে আসিলে তবে এই সকল সত্য সংগৃহীত হয়। যদি এত দূর উন্নতির স্তরে আসিবার পূর্ব্বে সমাজের অবনতি আরম্ভ হয়, তবেই সেই জাতির বেদ ক্রমশঃ লোপ হয়। আমাদের দেশে আর্য্যসমাজে সংগৃহীত এই বেদ শ্রুতিরূপে ধারাবাহিক চলিয়া আসিয়াছিল। শেষে বেদব্যাস তাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এরূপে বেদ সংগ্রহ না করিলে হয়ত এত দিনে তাহার লোপ হইত। অন্য কোন জাতির মধ্যে বেদের পূর্ণ সংগ্রহ নাই। সে সকল জাতির বেদ লুপ্ত হইয়াছে বা আংশিক ভাবে প্রববর্ত্তিত আছে মাত্র।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনুষ্য সমাজ উন্নতির বিভিন্ন স্তর দিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমে উন্নতির শেষ স্তরে আসিয়া উপনীত

হয়। সুতরাং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ব্যবহারিক সত্যের ক্রমে আবিষ্কার হয়। এই জন্য বেদের বিভিন্ন স্তর আছে। এই বিভিন্ন স্তরে সেই স্তর অনুযায়ী সত্যের আলোচনা থাকে। এই বেদ সমগ্র মানব জাতির জ্ঞানের ইতিহাস—মানব প্রকৃতির ইতিহাস। নিম্নতম সভ্য জাতির মধ্যে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই বেদে পাওয়া যায়,আর আধুনিক সভ্য সমাজ যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার মূল কথা গুলিও এই বেদে পাওয়া যায়। সকল প্রকার দার্শনিক মতের মূল এই বেদে দেখা যায়। সকল সমাজেই ও সকল কালেই মানবের জ্ঞানের ইতিহাস সমান। এক নিয়মেই মানব জ্ঞান বিভিন্নস্তর অতিক্রম করিয়া শেষ স্তরে উপনীত হয়। এই জন্য স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের ইতিহাস সর্ব্বত্র সমান। *

আমরা দেখিয়াছি যে,যখন মানব সমাজ প্রকৃতির দ্বারা পূর্ণ অভিভূত, "মানুষ শুধু জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত, যখন মানুষে ও পশুতে বিশেষ প্রভেদ থাকে না, তখন সে জাতির জ্ঞানে কোন তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি হয় না। সে জাতির জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানাবরিত থাকে। তত্ত্বের প্রথম স্ফূর্ত্তি হইবার জন্য চিত্তের যে পরিমাণে নির্ম্মলতা আবশ্যক, যতটুকু আন্তর দৃষ্টির প্রয়োজন,এরূপ অসভ্য সমাজে কোন লোকের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। যখন প্রকৃতি অনেক পরিমাণে আয়ত্ব হয়—সমাজ বিধিবদ্ধ হয়, মানুষ স্বার্থ চিন্তার কঠোর নিগড় কতক পরিমাণে ভঙ্গ করিয়া—কেবল ভোক্তা ও কর্ত্তার অবস্থা অতিক্রম করিয়া দ্রষ্টা হইতে শিক্ষা করে, তখন হইতে চিত্তে সত্য প্রতিভাত হইতে থাকে,—বেদ লাভ হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে বাহ্য জগতের দিকে প্রধানতঃ দৃষ্টি পতিত হয়। প্রকৃতিকে বহুত্ব পূর্ণ নানা শক্তির ক্রিয়াভূমি মনে হয়। সেই সকল শক্তির অনন্ত মহতী লীলা দেখিয়া মনে অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়। ক্ষুদ্র আমি সেই শক্তির অধীন—আমরা সীমাবদ্ধ, আর সেই সকল শক্তি অসীম—অনন্ত ক্ষমতাময়ী মনে হয়। এই জন্য এই সময় জ্ঞানে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অধিক স্ফূর্ত্তি হয়। যাঁহারা আদি দ্রষ্টা, তাঁহারাই আদি কবি। তাঁহারা জীবের সমীমত্বকে প্রকৃতির অসীমত্বের অন্তর্গত করিয়া লন। এই সমীমত্বকে অসীমত্বের অন্তর্গত করাই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি।

এই সকল বিশ্বব্যাপী প্রাকৃত শক্তির আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিয়া মন যে অদ্ভুত রসে আপ্লুত হয়, এই সকল শক্তির যে স্তুতি গান করিতে প্রবৃত্তি হয়, এই সকল শক্তিকে আমাদের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা বলিয়া যে প্রথম ধারণা হয়, এবং আমাদের সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ হ্রাস করিবার জন্য তাহাদের যে উপাসনা করিতে মতি হয়,তাহারই প্রথম ফল বেদ মন্ত্র। ইহাই বেদের প্রথম স্তর। ক্রমে মানবের অন্তর্দৃষ্টির আরও স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। মানষ মৃত্যুতে আপনার বা পূর্ব্ব পুরুষের অভাব কল্পনা করিতে পারে না—আর সেরূপ অভাব ধারণা করিতে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিও হয় না। কাজেই মানুষ তখন পরকালের অস্তিত্ব অনুভব করে। এ সংসারে সুখ লাভ ও দুঃখ দূর করিতে

* এই জন্য কোন কোন আর্য্যপণ্ডিতের মতে "অসংখ্য শাখাসমন্বিত, দেব তির্য্যক্ মনুষ্য বর্ণ ও বর্ণাশ্রম প্রভৃতি নানা প্রবিভাগের হেতু, সর্ব্বজ্ঞানের আকর সুতরাং সর্ব্বজ্ঞকল্প ঋদ্বেদাদি শাস্ত্র সমূহ...।" শাঙ্করভাষ্য (১।১।৩ সূত্র)

মানুষ যেমন স্বভাবতঃই ব্যস্ত থাকে, সেই রূপ পরকালের সুখ লাভের জন্যও চেষ্টা করে। এই চেষ্টা হইতে জাত ক্রিয়াই যজ্ঞ। এই ক্রিয়া কাণ্ডই বেদের দ্বিতীয় স্তর। সুতরাং বেদের প্রথম স্তরে স্তুতি ও উপাসনা এবং তাহার দ্বিতীয় স্তরে যজ্ঞেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

মানব কখন শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে পার্থক্য ধারণা করিতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কদাচ কোন প্রভেদ নাই। প্রথমে মানব দৃষ্টিতে যে প্রকৃতির নানা রূপ শক্তির ক্রিয়া প্রতিভাত হয়—সেই সকল শক্তিকে বিভিন্ন মনে হয়। এবং প্রত্যেক শক্তির অন্তরে শক্তিমান অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা ধারণা হয়। তখন এই শক্তিমানকে মানুষ আপনার তুলনায় জীব প্রকৃতি সম্পন্ন মনে করে। এই জন্য মানুষ প্রথম অবস্থায় প্রস্তরে, বৃক্ষে, পর্ব্বতে, নদীতে, সমুদ্রে—সর্ব্ব স্থলে এক এক পৃথক্ শক্তিমানের আবির্ভাব্ অধিষ্ঠান কল্পনা করে ও এই শক্তিমান বা শক্তির অধিষ্ঠাতাকেই দেবতা বলে।

(১) বেদের এই অংশকে কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বলে। ইহা বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা বেদান্ত হইতে, পারমার্থিক অর্থে নিকৃষ্ট। কেননা, ইহা জ্ঞানের নিম্ন স্তরের অন্তর্গত এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট অধিকারীর উপযুক্ত। এই জন্য গীতায় বলা হইয়াছে যে, ইহা জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সাধক ক্রিয়া বিশেষ বহুল, ইহা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে আসক্তি সম্পন্ন লোকের পক্ষে উপাদেয়। ভগবদ্গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় ৪১।৪৪ শ্লোক্, গীতায় আরও একস্থানে উল্লিখিত আছে, এই বেদ সংসার বিষয় প্রকাশ্য—

"ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।"

সুতরাং জ্ঞানের শেষ সীমায় বা বেদান্তে আরোহণ করিতে হইলে এই কর্ম্মাত্মক বেদের অধিকার অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। শঙ্করাচার্য্যও এই কথা বলিয়াছেন। তিনি বেদান্তদর্শন ভাষ্যের ১অধ্যায়ের ২ পাদের ২১ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,

"বিদ্যা দ্বিবিধ—পরা ও অপরা, তন্মধ্যে ঋগ্বেদ প্রভৃতি অপরা। .....যাহার ফল অভ্যুদয়, তাহাই অপরা। যাহার ফল মুক্তি (বা জ্ঞান) তাহাই পরা।"

শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যের অন্যত্র বলিয়াছেন,

"অদ্বৈত প্রবোধ প্রস্ফুটিত না হওয়া পর্য্যন্তই লৌকিক ও বৈদিক প্রমাণ প্রমেয়াদি ব্যবস্থার সত্য বলিয়া গণ্য থাকে।"

যদিও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে বুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মকারীরাই অর্থাৎ মনুষ্যেরাই অধিকারী, কেন না আপনার বা আত্মার পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞান ব্যতীত তদ্রূপ ব্যবহারে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তথাপি সেই সেই ব্যবহারে অধ্যাসিক জ্ঞান ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানের..... অপেক্ষা নাই।"

শঙ্করাচার্য্য অন্যত্র বলিয়াছেন,

"প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র সমুদায়ই অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয় বা সমস্তই জীবভাবের অন্তর্গত; অর্থাৎ সমস্তই জীবের পরিকল্পিত। "সমস্ত শাস্ত্রই অবিদ্যাপর।

ইহা শুধু গীতা বা শাঙ্কর ভাষ্যের কথা নহে। শ্রুতিতেও এই কথা আছে। ১অধ্যায়ের ২ পাদের ২২ সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন,—

"শ্রুতি প্রথমে কর্ম্ম বিদ্যার উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ তাহার নিন্দা করিয়াছেন। যথা এ সকল প্লব (নশ্বর) অদৃঢ় (অনিত্য ফলদাতা) যজ্ঞরূপ অষ্টাদশ সাধ্য। ... ... যে মূঢ় এ সকলকে শ্রেয়স্কর মনে করে, কেবল উহাতেই সন্তুষ্ট হয়, সে বার বার জরা মরণ প্রাপ্ত হয়। (মুণ্ডক উপনিষদ ১।২।৭)।

জৈমিনি মুনি পূর্ব্বমীমাংসায় বলিয়াছেন, এই বেদ ক্রিয়ার বা ধর্ম্মের বোধক ও সেই সম্বন্ধেই বেদের প্রামাণ্য।

এই শক্তির বহুত্ব জন্য শক্তিমান দেবতার বহুত্বও বেদে কল্পিত হইয়াছিল। এই জন্য চলিত কথায় তেত্রিশ কোটী দেবতার উল্লেখ আছে। যাহা হউক, এই সকল বিভিন্ন শক্তির মধ্যে একত্ব দর্শন হইতে লাগিল—অনেক শক্তিকে একরূপ শক্তির বিভিন্ন বিকাশ বলিয়া অনুভূত হইল। তখন এই দেবতার সংখ্যা পরিমিত হইল। তখন বজ্র, অগ্নি, বৃষ্টি, সূর্য্য প্রভৃতি শক্তিকেই মূল শক্তি ধারণা করিয়া সেই সকল শক্তির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বা শক্তিমান ইন্দ্র, বৈশ্বানর, বরুণ, আদিত্য প্রভৃতি নামে স্তুত হইতে লাগিলেন। তাহার পর এই বিভিন্ন শক্তি কোন একমাত্র শক্তির বিভিন্ন বিকাশ, ইহা ধারণা হইল। কিন্তু মূল শক্তি কোনটী, তাহার সম্বন্ধে তখনও স্থির ধারণা হইল না। কেহ বা অগ্নির প্রাধান্য, কেহ বা তেজের প্রাধান্য, কেহ বা বজ্রের প্রাধান্য অনুভব করিলেন, কেহ অগ্নিই একমাত্র শক্তি, অন্য শক্তি তাহা হইতে সৃষ্ট, ইহা প্রণিধান করিলেন—কেহ বা বজ্রই একমাত্র শক্তি, অন্য শক্তি তাহা হইতে উদ্ভূত, ইহা স্থির করিলেন। এই জন্য বেদে কোন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ইন্দ্রের প্রাধান্য, কোন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি অগ্নির প্রাধান্য ইত্যাদি কীর্ত্তন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের সপ্তবিংশতি শ্লোকের ব্যাখ্যা কালে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া এই কথা দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেবতার সংখ্যা কত? এই প্রশ্নের পর শ্রুতি বলিয়াছেন, তিন, তিন, তিনশত ও তিন সহস্র (৩৩০৬) এই উক্তির পর পুনর্ব্বার দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক, তদুত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন, দেবতা তেত্রিশ অর্থাৎ অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যৌ, চন্দ্রমা ও নক্ষত্র, এই অষ্ট বসু, মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ মাস অবয়ব যুক্ত দ্বাদশ আদিত্য ইন্দ্র ও প্রজাপতি—এই তেত্রিশ। পূর্ব্বোক্ত ৩৩০৬ দেবতা এই ৩৩ দেবতার মহিমা বা বিভূতি। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, "ঐ তেত্রিশ দেবতা ছয় দেবতার মহিমা—ছয় দেবতার অন্তর্গত। সেই ছয় দেবতা আবার তিনের অন্তর্গত। সেই তিন দেবতা এক দেবতার অন্তর্ভূত। সেই এক দেবতা প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ।" (পণ্ডিত শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত শাঙ্কর ভাষ্যানুবাদ)।

এই শক্তির একত্ব দ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে আবার কেহ আকাশকেই আদি শক্তি ও তাহা হইতে জগৎ সৃষ্ট, কেহ বায়ুকেই আদি শক্তিও তাহা হইতে জগৎ সৃষ্ট, কেহ অপ্ বা জলকে আদি তত্ত্ব ও তাহা হইতে জগৎ সৃষ্ট, এইরূপ নানা ভাবে এই এক সত্য ধারণা করিয়াছেন। ‡ এই সকল তত্ত্ব দ্রষ্টা মহর্ষিদিগের মধ্যে দীর্ঘতমা, প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা, ভরদ্বাজ, কবষ প্রভৃতির নাম এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

‡ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে অনেক সূক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা হইতে এই তত্ত্বের সহজেই উপলব্ধি হয়। এ বিষয়ে ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে আরও দুই একস্থান উদ্ধৃত হইল—

(১) দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বকালে বৃহস্পতি নামক দেব কর্ম্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্ম্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান্ হইতে বিদ্যমান্ উৎপন্ন হইল।" (১০।৭২)

(২) "পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাহাকে কল্পনা পূর্ব্বক অনেক প্রকার বর্ণনা করেন।" (১০।১১১)

অতএব দেখা গেল যে,মানবের স্বতঃসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি চিত্তের ক্রমবর্দ্ধিত নির্ম্মলতা হেতু, ক্রমে তীক্ষ্ণ হইয়া যখন তাহা পূর্ণ বিকশিত হয়। তখন এই জগতের বহুত্ব জ্ঞানের পরিবর্ত্তে একত্ব জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ রূপে আবির্ভূত হয়, জগতকে জ্ঞানের সীমা মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারিলে, জগতের সমীমত্ব উপলব্ধি হয়, এবং তাহা হইতে জগদাধার জ্ঞানের অতীত অসীমত্বের ধারণা হয়। আর সেই অসীমত্ব সেই একত্ব হইতে জগতের মহত্ত্বের একীকরণ হয়।

এইরূপে মানবের আদিকবি ঋষিগণ বাহ্য বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ দৃষ্টি বলে—অবশেষে ব্রহ্ম তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। আন্তর বিষয়ও সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ দৃষ্ট হেতু আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সত্য সকল উপলব্ধি হওয়ায়, এই ঋষিদিগের অন্তরে আত্মতত্ত্বের ক্রম বিকাশ হইয়াছিল। দেহাতিরিক্ত, মরণের অতীত—আত্মার সহিত এই ব্রহ্মের সারূপ্য জ্ঞান বা সোঽহং জ্ঞান ক্রমে ধারণা হইল। মানুষ প্রথমে আপনাকে অপূর্ণ, সসীম শক্তির অধীন—জরা মরণাদি দুঃখবদ্ধ মনে করে। মানুষ যাহার দ্বারা আপনাকে সীমাবদ্ধ মনে করে, তাহাকেই অনন্ত অসীম জ্ঞান করে, তাহারই স্তুতি উপাসনা করে। জ্ঞানের প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির সেই শক্তিকেই অসীম বলিয়া ধারণা ছিল। প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম ধারণার পর আপনাকে সে অসীম ব্রহ্মের অন্তর্ভূত-ব্রহ্মকেই আপনার বিশ্রাম স্থান, দুঃখ নিবৃত্তির স্থান মনে করিয়া তাঁহারই সহিত আপনার সম্বন্ধ ধারণায় রত হইল। ইহাই বেদের শেষ স্তর। ইহাই বেদান্ত। ইহাই মানব দৃষ্টির বা জ্ঞানের শেষ সীমা। এই স্থানে আসিয়া জ্ঞানের বিশ্রাম হয়—ইহার পর আর অগ্রসর হইতে পারে না।

কিন্তু চিত্তের পূর্ণ নির্ম্মলতা লাভ করিয়া স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বলে সকলেই জ্ঞানের এই শেষ স্তরে আসিতে পারে না। সকল মানবের শক্তি সমান নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানুষের অন্তঃকরণ বৃত্তি তিন রূপ। তাঁহার কর্ম্মবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি ও জ্ঞানবৃত্তি আছে। মানব উন্নতির স্তরে আসিয়া আপনার সাধ্য, প্রকৃতি ও অধিকার মত এই সকল বৃত্তির অনুশীলন করে। মানুষের এই তিন বৃত্তির সমান স্ফূর্ত্তি হয় না। কোন মনুষ্য চিত্তবৃত্তি প্রধান, কোন মানুষ কর্ম্মবৃত্তি প্রধান, অতি অল্প লোকেই জ্ঞানবৃত্তি প্রধান। জ্ঞানবৃত্তির উৎকর্ষ বিশেষ অনুশীলন সাপেক্ষ। যাহার যে বৃত্তির প্রাধান্য আছে, সে-ই সে বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে। কর্ম্মবৃত্তি-প্রধান লোক ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলে যজ্ঞ দান তপ প্রভৃতি ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে সহজেই নিরত হয়। চিত্ত বৃত্তি প্রধান লোক উপাসনা রত হয়, আর জ্ঞান বৃত্তি প্রধান লোক জ্ঞানালোচনায় স্বাভাবিক অনুরক্ত হয়।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বেদেরও এই অনুসারে তিন স্তর। বেদে ক্রিয়া, উপাসনা ও জ্ঞান এই তিনেরই বিষয় নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু মানুষ আপন অধিকার মত ইহার কোন না কোন বিষয় গ্রহণ করে। যে নিম্নাধিকারী, সে কর্ম্মে রত। যে মধ্যাধিকারী, যে উপাসনা-পরায়ণ। কেবল যিনি উচ্চাধিকারী, তিনিই জ্ঞান চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। সর্ব্ববৃত্তির পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য কদাচিৎ সম্ভব। এই অধিকারের পার্থক্য হইতেই আশ্রম ও ধর্ম্ম বিভাগ। সে তত্ত্বের এস্থলে আলোচনার আবশ্যক নাই।

আমরা দেখাইয়াছি যে, মানুষের জ্ঞান, চিত্ত ও কর্ম্ম বৃত্তির অনুশীলন কল্পে উন্নতির প্রথম স্তর হইতে শেষ স্তরে যাইতে হইলে যত বিভিন্ন প্রকার উপাসনা, কর্ম্ম ও তত্ত্ব জ্ঞানের বিকাশের সম্ভব, বেদে প্রায় তাহার সমুদায়ই বিধিবদ্ধ আছে। সুতরাং পরে একমাত্র বেদ অবলম্বন করিয়াও সমাজে বিভিন্ন অধিকার ও বিভিন্ন স্ফূর্ত্তি হেতু বিভিন্নরূপ ধর্ম্মাদি চর্চ্চার উৎপত্তি হয় এবং তদনুসারে সমাজও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ক্রমে এই সকল সম্প্রদায় মধ্যে সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। সকলে আপন আপন গন্তব্য পথের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করে।

অতি পূর্ব্বকালে ভারতে ঐরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছিল। আর্য্য সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। তখন নানারূপ যজ্ঞাদি কর্ম্ম, নানা প্রকার উপাসনা ও নানা প্রকার মত সমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তখনও আর্য্য সমাজ বেদানুশাসিত ছিল। তাহার পর এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া সমাজের কতক পরিমাণে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং ক্রমে ধর্ম্ম গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। বেদেও এইরূপ সামাজিক অবস্থার আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলা বেদব্যাসের সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। মহাভারতের অনুগীতায় তাহার উল্লেখ আছে। ‡

(৩) সেই বলই বা কি, সেই বৃক্ষই বা কি, যাহা হইতে উপাদান সংগ্রহ পূর্ব্বক এই দ্যুলোক ও ভূলোকও নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।” (১০।৩১)

(৪) “তিনি অনাদি স্বয়ম্ভূ এবং পবিত্র।” (১০।১৮)

(৫) সেই সুধীর পিতা উত্তমরূপ দৃষ্টি করিয়া, মনে মনে আলোচনা করিয়া জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এই দ্যাবা পৃথিবীকে সৃষ্টি করিলেন। (১০।৮১)

(৬) তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) কেবল সেই একমাত্র বস্তু, বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। * * * তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। সর্ব্ব প্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল। (১০।১২৯)

(৭) এই নানা সৃষ্টি কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুর স্বরূপ পরম ধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন। (১০।১২৯)

(৮) যিনি ইহা (ব্রহ্মাণ্ড) সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা বুঝিতে পার না, তোমাদিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই। কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে। (১০।৮২) শ্রীরমেশচন্দ্র কৃত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ।

‡ ঊর্দ্ধং দেহাদ্বদন্ত্যেকে নৈতদস্তীতি চাপরে।
কৈশ্চিৎ সংশয়িতং সর্ব্বং নিঃসংশয়মথাপরে॥
অনিত্যং নিত্যমিত্যেকে নাস্ত্যস্তীত্যপিচাপরে।
একরূপং দ্বিবেত্যেকে ব্যামিশ্রমিতিচাপরে॥
মন্যন্তে ব্রাহ্মণাদেবা ব্রহ্মজ্ঞাস্তত্ত্ববাদিনঃ।
একমেকে পৃথক্ চান্যে বহুত্ব মপি চাপরে॥
দেশকালাবুভৌ কেচিৎ নৈতদস্তীতি চাপরে।
* * *
কর্ম্মকেচিৎ প্রশংসন্তি প্রশান্তিং চাপরেজনাঃ।
কেচিন্মোক্ষং প্রশংসন্তি কেচিদ্ভোগান পৃথদ্বিধান্॥
* * *
যজ্ঞমিত্যপরে বিপ্রাঃ প্রদানমিতিচাপরে।
তপস্বন্যে প্রশংসন্তি স্বাধ্যায়মপরেজনাঃ॥

বড় সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, সেই সময়ে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া একা সেই সমাজের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়ে আর্য্যসমাজে কি এক অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত হইয়া মানবকে উন্নতির চরম সীমায় লইয়া গিয়াছিল, তাহা কল্পনা করাও অসাধ্য। এই মহাপুরুষের শক্তি বলে ভারতে ধর্ম্মসম্বন্ধে, জ্ঞান সম্বন্ধে মহা যুগান্তর উপস্থিত হয়। এই সময়েই বেদব্যাস সেই মহাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া বেদ সঙ্কলন করেন। সাধারণের শিক্ষার জন্য মহাভারত রূপ অদ্ভুত গ্রন্থ ও পুরাণাদির প্রণয়ন করেন। তাঁহার শিষ্য বৈশম্পায়ন, শুক, লোমহর্ষণ, জৈমিনি, পৈল, সুমন্ত প্রভৃতি ঐ সকল গ্রন্থ সাধারণে প্রচার করিবার সহায় হন। এইরূপে আপামর সাধারণকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার জন্য, বৈদিক ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ সাধারণে বুঝাইয়া দিবার জন্য, গল্প বা ইতিহাস ছলে চিত্তাকর্ষণকারী কাব্যের উপাদেয় আবারণে মহাভারত ও অনেক বর্ত্তমান পুরাণাদির এই সময় সৃষ্টি হইল। *

বেদব্যাস কেবল বেদ সংগ্রহ করিয়া তাহার স্থায়িত্ব সম্পাদন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বেদের উপনিষদ বা বেদান্ত অংশ সামঞ্জস্য করিয়া যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বেদান্তমত সংস্থাপন করিয়া বেদান্ত দর্শন রূপ অদ্বিতীয় দর্শন শাস্ত্র সৃষ্টি করিলেন। সেইরূপ তাঁহার শিষ্য জৈমিনি মুনি বেদের কর্ম্ম কাণ্ড সামঞ্জস্য করিয়া পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন প্রণয়ন করিলেন। তাহার অব্যবহিত পরে এই উভয় মীমাংসা দর্শনের অনুকরণে অন্যান্য তৎকাল-প্রচলিত দার্শনিক মত সকল পরিস্ফুট হইয়া ক্রমে বিধিবদ্ধ হইল। আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান কর্ম্ম উপাসনা সকলের সামঞ্জস্য করিয়া, সকলের পূর্ণ পরিণতির অবস্থা দেখাইয়া দিয়া, মানবের মুক্তির প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া, মানবের প্রকৃত গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিয়া, সকল অবস্থার, সকল মানবের, সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থের উপায়ভূত সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণ, সর্ব্ব ধর্ম্মের আকর—সকল আকাঙ্খার নিবৃত্তির স্থান, প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম প্রতিপাদক অমৃতময়ী গীতা তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই এক মহাপুরুষের প্রভাবে সমাজ মধ্যে কি অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, জ্ঞান ও ধর্ম্মের কি অদ্ভুতরূপে শেষ পরিণতি হইয়াছিল—তাহা এখন ধারণা করা সম্ভব নহে। এই জন্য সেই সময়ে ব্যাস প্রমুখ আর্য্য সমাজ এই মহাপুরুষের পূর্ণ ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (১) এস্থলে এ বিষয় আর বিস্তার করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

সে যাহা হউক, উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে এই বুঝা যায়, বৈদিক ঋষিগণ স্বতঃসিদ্ধ দৃষ্টি বা প্রতিভাবলে বাহ্য ও আন্তর বিষয় সম্বন্ধে যে সকল সত্য দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদোক্ত সত্য যুক্তি ও প্রমাণ বলে লাভ করিবার জন্যই প্রথমে প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বেদান্ত দর্শনের পূর্ব্বেই প্রায় সকল প্রকার দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল। বেদ হইতেই সে সকল মত সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে উপযুক্ত প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সেই সকল মত তখনও স্থাপিত হয় নাই। যখন রীতিমত প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সেই সকল মত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইল, তখনই দর্শন শাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি হইল। (২) প্রথমেই বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড বুঝাইবার জন্য—বৈদিক কর্ম্ম তত্ত্ব সকল সামঞ্জস্য করিয়া তাহার মীমাংসা করিবার জন্য, পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন এবং বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ড বুঝাইবার জন্য, তাহার মীমাংসা করিবার জন্য বেদান্তদর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই ভারতে প্রকৃত দার্শনিক যুগ আরম্ভ হয়। অতএব আমাদের দেশে ধর্ম্ম বুঝাইতে—বৈদিক তত্ত্ব বুঝাইতেই দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই দার্শনিক যুগে অনেক লোকই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই স্বতঃসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি থাকে না। যোগ ও সাধনা বলে এই স্বতঃসিদ্ধ দৃষ্টির স্ফূর্ত্তি করা যায় বটে, কিন্তু সাধারণ লোক সে পথ অবলম্বন করিতে সক্ষম হয় না। কাজেই সে সময় তত্ত্ব সকল

জ্ঞানং সন্ন্যাসিমিত্যেকে স্বভাবং ভূতচিন্তকাঃ।
সর্ব্বমেকে প্রশংসন্তি ন সর্ব্বমিতি চাপরে।
মহাভারত, অনুগীতা (অশ্বমেধপর্ব্ব) ৪৯।২-১২

অর্থাৎ ঐ সময়ে "কেহ বলিতেন, দেহান্তে অস্তিত্ব থাকে, কেহ বলিতেন থাকে না; কেহ সংশয় চিত্ত ছিলেন, কেহ বিশ্বাসী ছিলেন; কেহ (এজগতের) অনিত্যত্ব, কেহ নিত্যত্ব, কেহ বা অনস্তিত্ব মানিতেন। কেহ একরূপ (অদ্বৈত), কেহ দ্বিধা (দ্বৈত), কেহবা ব্যামিশ্র (দ্বৈতাদ্বৈত) স্বীকার করিতেন; কেহ ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মজ্ঞ ও তত্ত্ববাদীদের মান্য করিতেন (কেহ জগতের) একত্ব, কেহ পার্থক্য, কেহ বা বহুত্ব স্বীকার করিতেন; কেহ দেশকালের অস্তিত্ব মানিতেন, কেহ তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না।

কেহ কর্ম্ম প্রশংসা করিতেন, কেহ শান্তি প্রশংসা করিতেন; কেহ মোক্ষ প্রশংসা করিতেন, কেহ বা নানাবিধ ভোগের প্রশংসা করিতেন। কোন বিপ্র যজ্ঞ, কেহ দান, কেহ জপ, কেহ স্বাধ্যায়, কেহ জ্ঞান, কেহ সন্ন্যাস প্রশংসা করিতেন, কোন ভূতচিন্তাকারী স্বভাব মানিতেন। কেহ সকল (বিষয়ই) প্রশংসা করিতেন, কেহ কিছুই প্রশংসা করিতেন না।

দেশকালাবুভৌ কেচিৎ নৈত্যদন্তীতি চাপরে—

ইহা হইতে দেখা যায় যে দেশ (Space) কালের (time) অনস্তিত্ব ও জ্ঞাতার বিষয়ানুভবসহ তাহাদের নিত্য কল্পিতত্ব, আমাদের দেশে এ তত্ত্ব বহুকাল পূর্ব্ব হইতে প্রকাশিত ছিল। ইহা জর্ম্মাণ দার্শনিক ক্যাণ্টের (Kant) প্রথম আবিষ্কৃত নহে।

* এই সময়ে পানিনী, ভগবান পতঞ্জলি প্রভৃতিও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্বয়ং পতঞ্জলি এই পানিনী কৃত ব্যাকরণের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। আবার বেদব্যাসও পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য রচনা করেন। পতঞ্জলি, পানিনী, উপবর্ষ ও বেদব্যাস সকলে সমসাময়িক ছিলেন, ইহা না ধরিলে এই গোলযোগের মীমাংসা করা সহজ হয় না। একাধিক পানিনী, ব্যাস বা পতঞ্জলির কল্পনা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

(১) মহাপুরুষগণ তাঁহাদের সমসাময়িক লোকের দ্বারাই অবতার বা ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। পরবর্ত্তী মানবগণ সুদূরদৃষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাদের পূর্ণশক্তি, পূর্ণ মহত্ব ধারণা করিতে পারে না, তাঁহাদের মহাকর্ষণ, দূরত্ব হেতু ভালরূপ অনুভব করিতে পারে না। বুদ্ধ, চৈতন্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি এইরূপে তাঁহাদের সমকালিক লোকের দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞানে পূজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার সময়ের লোকের দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞানে পূজিত হন নাই, পরে এরূপে পূজিত হইয়াছিলেন, একথা ইতিহাস-বিরুদ্ধ। এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখের এস্থলে প্রয়োজন নাই।

(২) (বেদান্ত দর্শনে আছে যে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বলাভ করিতে হয়। তত্ত্ব কথা কেবল শ্রবণ করিলেই তাহার জ্ঞান লাভ হয় না। যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তদ্বিরোধী তত্ত্ব খণ্ডন ও সেই তত্ত্ব স্থাপন করিতে হয়, ইহাই মনন। ঐ মনন দর্শন শাস্ত্র সিদ্ধ।

যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করিবার প্রয়োজন হয়। যখন বেদের পরস্পর আপাত-বিরোধী ও বিসংবাদী মতের দ্বারা জ্ঞানার্থীর মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, যখন এই সকল মতের মধ্যে কোনটী ত্যাজ্য ও কোনটী গ্রহণীয়, তাহা কেবল বেদ হইতেই সিদ্ধান্ত করিবার উপায় না থাকে, যখন বিশ্বাসের স্থলে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন কোন প্রতিভাশালী পণ্ডিত ঐ সকল মতের মধ্যে মত বিশেষ অবলম্বন করিয়া অন্য প্রমাণ ও যুক্তি বলে সেই মতের সত্যতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। দর্শন শাস্ত্র এই চেষ্টার ফল হইতেই এদেশে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা তত্ত্ব সংস্থাপন জন্য এ দেশে দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। এদেশে ধর্ম্ম সংস্থাপনই দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন ছিল। দর্শনশাস্ত্রের অন্য প্রয়োজন আছে, তাহা পরে উল্লিখিত হইবে।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[সমাধি মন্দিরে।

আজ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। শুক্রবার ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই পূর্ব্ব পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও হরলালের সহিত কথাবার্ত্তা করিতেছেন। এমন সময়ে একজন আসিয়া বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে করিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। কিয়ৎক্ষণ পরে কেশবের শিষ্যেরা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মহাশয়, জাহাজ আসিয়াছে, আপনার যাইতে হইবে, চলুন একটু বেড়িয়া আসিবেন, কেশব বাবু জাহাজে আছেন, আমাদের পাঠালেন।

বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন—সঙ্গে বিজয়। নৌকায় উঠিয়াই বাহ্য জ্ঞানশূন্য। সমাধিস্থ।

মাষ্টার জাহাজে দাঁড়াইয়া এই সমাধিস্থ চিত্র দেখিতেছেন। তিনি বেলা ৩টা সময় কেশবের জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে আসিতেছেন। বড় সাধ দেখিবেন, ঠাকুর ও কেশবের মিলন, তাঁহাদের আনন্দ। বড় সাধ শুনিবেন, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা। কেশব তাঁহার সাধু চরিত্রে ও বক্তৃতা বলে মাষ্টারের ন্যায় অনেক বঙ্গীয় যুবকদিগের মন হরণ করিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে পরম আত্মীয় বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছেন, কেশব ইংরাজি পড়া লোক—ইংরাজি দর্শন, সাহিত্য পড়িয়াছেন। তিনি আবার দেব দেবী পূজাকে অনেক বার পৌত্তলিকতা বলিয়াছেন। এইরূপ লোক ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, আবার মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন; এটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। তাঁহাদের মনের মিল কোন খানে বা কেমন করিয়া হইল, এ রহস্য ভেদ করিতে মাষ্টারাদি

অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিরাকারবাদী বটেন, কিন্তু তিনি আবার সাকারবাদী—নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা করেন, আবার দেবদেবী প্রতিমার সম্মুখে ফুল, চন্দন দিয়া পূজাও করেন ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্যগীত করেন। আবার খাট বিছানায় বসেন, লালপেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতা পরেন; কিন্তু সংসার করেন না। ভাব সমস্তই সন্ন্যাসীর মত, তাই লোকে পরমহংস বলে। এদিকে কেশব নিরাকারবাদী; স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার করেন, ইংরাজিতে লেক্‌চার দেন, সংবাদ পত্র লেখেন ও বিষয় কর্ম্মও করেন।

জাহাজে সমবেত কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তগণ জাহাজ হইতে ঠাকুর বাড়ীর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। জাহাজের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বাঁধা ঘাট ও ঠাকুর বাটীর চাঁদনি। জাহাজের আরোহিদের বাম্‌পার্শ্বে চাঁদনির উত্তরে দ্বাদশ শিব মন্দিরের ক্রমান্বয়ে ছয় মন্দির। আরোহিদের দক্ষিণ পার্শ্বেও ছয় শিব মন্দির। শরতের নীল-আকাশ-চিত্রপটে ভবতারিণী মন্দিরের চূড়া ও উত্তর দিকে পঞ্চবটী ও ঝাউ গাছের মাথাগুলি দেখা যাইতেছে। বকুলতলার নিকট একটি নহবৎখানা ও কালী বাড়ীর দক্ষিণ প্রান্তভাগে আর একটি নহবৎখানা দেখিতেছেন ও দুই নহবৎখানার মধ্যবর্ত্তী উদ্যান পথও তাহার ধারে ধারে সারি সারি পুষ্প-বৃক্ষ। শরতের নীলাকাশের নীলিমা জাহ্নবী জলে প্রতিভাষিত হইতেছে। বহির্জগতে কোমল ভাব, ব্রাহ্মভক্তদের হৃদয়-মধ্যে কোমল ভাব। ঊর্দ্ধে সুন্দর সুনীল অনন্ত আকাশ, সম্মুখে সুন্দর ঠাকুর বাড়ী, নিম্নে পবিত্র সলিলা গঙ্গা যাঁহার তীরে আর্য্য ঋষিগণ ভগবানের চিন্তা করিয়াছেন; আবার আসিতেছেন একটি মহাপুরুষ, যিনি সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন! এইরূপ দর্শন মানুষের কপালে সর্ব্বদা ঘটে না। এরূপ স্থলে সমাধিস্থ মহাপুরুষে কাহার ভক্তির না উদ্রেক হয়, কোন্ পাষাণ হৃদয় না বিগলিত হয়?

কেশব! তুমি দাঁড়াইয়া নৌকার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছ। তুমি স্থিরনেত্র হইয়া না জানি কি ভাবিতেছ! তুমি কি ভাবিতেছ যে সংসারে বড় ভয়, 'নির্লিপ্ত গৃহস্থ' হওয়া বড় কঠিন? জীবনে তুমি অনেক পরীক্ষায় পড়িয়াছ, আত্মীয় বিচ্ছেদ, কন্যার বিবাহের পর শিষ্য বিচ্ছেদ, লোকনিন্দাদি নানা কষ্ট তুমি পাইয়াছ। তাহাই কি দাঁড়াইয়া ভাবিতেছ—"গৃহস্থাশ্রম বড় কঠিন? এই সাধু মহাত্মার ন্যায় জীবন যাপন করা কিরূপ হয়? আর দলে প্রয়োজন কি, অনেক হইল! ইনিত বলেন, 'গেড়ে ডোবায় দল হয়' আর 'গুরুগিরি করা ভাল নয়।' আহা এ মহাপুরুষের কি জীবন! যিশু পিতা ২ করিয়া পাগল হইয়াছিলেন, ইনিও মা মা করিয়া পাগল! সদা প্রেমে বিহ্বল! তাঁহারি ন্যায় শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ! তাঁহারি ন্যায় সর্ব্বত্যাগী, তাঁহারই ন্যায় সর্ব্বভূতহিতেরত, তাঁহারি ন্যায় জীবের মঙ্গলের জন্য ফিরিতেছেন, তাঁহারই ন্যায় সদা যোগী, ভাবস্থ হইয়া ঈশ্বরের সহিত কথা কন। শুনিয়াছিলাম, প্রত্যক্ষ দর্শন ও ভগবৎবাণী শ্রবণ কথা। এই মহাপুরুষের জীবনে তাহাই দেখিলাম। আর ইনি প্রার্থনা করেন, ভাষা কি সরল! যেন পাঁচ বৎসরের ছেলে মার সহিত কথা কহিতেছে। ঈশ্বরের প্রতি কি ভালবাসা! এঁকে

দেখিয়া গৌরাঙ্গের প্রেম, তাঁহার ভাব মহাভাব ইত্যাদি বিশ্বাস হইল।”

কেশব! এই মহাপুরুষের আর একটি কথা কি ভাবিতেছ? ‘গভীর বনে ফুল ফুটিলে মৌমাছি আপনি সন্ধান করিয়া যায়, ফুল কাহাকেও ডাকে না; মৌমাছিরা আপনি যায়’। একথা শ্রবণ করিয়া তাহাই বুঝি ভাবিতেছ, “সেজে গুজে লেক্‌চার দেওয়া আর কেন? যাহাতে দেবদুর্লভ ভক্তিমধু হৃদয়-কুসুম মধ্যে জন্মায়, তাই চেষ্টা করি। এই মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, ‘ঈশ্বরের আদেশ না পাইয়া লেক্‌চার বিড়ম্বনা মাত্র।’ হয়ত আবার ভাবিতেছিলে, ‘রামের ইচ্ছা’ সেই কথা; যে কথা একদিন শুনে তুমি বলেছিলে, মহাশয়, অতদূর নয়, তাহা হলে সত্য সত্যই আর দল্‌টল্‌ থাকেনা। কেন ঠাকুরকে এত শুদ্ধ ভাবিতেছিলে বুঝি ভাবিতেছ ইহারই কথা ‘মৌমাছি কেবল ফুলে বসে মধু পানের জন্য, এ সব মাছি মধুতেও বসে, সন্দেসেও বসে, ও পচা ঘায়েও বিষ্ঠায়ও বসে।’ এ মহাপুরুষ মৌমাছির থাক, গৃহস্থ ভক্তেরা সামান্য মাছির থাক্‌।

আবার কি ভাবিতেছ,—“এ পুরুষ সমাধিস্থ, আমাদের এইরূপ সমাধি হয় না কেন? বটে বটে নানা কর্ম্ম করিতে গেলে কেমন করে সমাধি হবে? ইনিই বলেন, নেউলের ল্যাজে ইঁট বাঁধা; পাঁচিলের গর্ত্তে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা হয় বটে; কিন্তু ল্যাজে ইঁট বাঁধা রয়েছে, ইটের ভারে গর্ত্ত থেকে নীচে নেমে আস্‌তে হয়। বিষয়ীর মন ভিজে দেশলাইয়ের মত। ইনি যা বলেন ঠিক। যত ঘসো কাটি গুলি কেবল লোকশান্‌ হয়, কখনও জ্বলিবে না।

কেশব! ইঁনি সাকার বিশ্বাস কর বলিয়া তোমার কি মনে খট্‌কা হই ছিল? এক কালে হইয়াছিল বটে। আজ তুমি সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় চিত্র পটে যে দেব মন্দির শ্রেণীর ছবি দে তেছ, তাহা অন্ত চক্ষে দর্শন করিতেছ। দেখিতেছ, মৃণ্ময় আঁধারে চিন্ময়ী দেব ‘আগে উপমা তারপর প্রতিমা,তারপর মা ধন্য তুমি! এই মহাপুরুষের বাক্যে বিশ্ব করিয়াছ! মানুষ কতটুকু আর তার বু ইবা কতটুকু। প্রাকৃত লোকের আর বুদ্ধি! আর সেই বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বর তত্ত্ব নি পণ! বামন উদ্বাহু হইয়া চন্দ্র ধরিবে! ধ তুমি! ঠাকুরের কথা গ্রহণ করিয়াছ—এ সের ঘটিতে চার সের দুগ্ধ ধরে না। ভ বানের পাদ পদ্মে সমাধি লাভ না করি তাঁহার তত্ত্বের আভাস কে দিতে পারে ‘হে Alcibiades * যদি মোকদ্দামার ক বুঝিতে চাও, তাহা হইলে উকিলের কা যেতে হয়, যদি রোগের কথা জানতে হয় তাহা হইলে ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞা করতে হয়; ঈশ্বর তত্ত্ব নিরূপণ করিবে, তবে মহাপুরুষের সঙ্গকর, গুরু বাক্যে বিশ্বাস কর। একথা Socrates শিষ্যদের বলেছিলেন। আজ ঠাকুর রামকৃষ্ণও এই কথা বলিতে ছেন।’ কেশব, তুমি আশ্চর্য্য গণিতে বিশ্বা করিয়াছ! দুই আর তিনে সাত হতে পারে বিশ্বাস করিয়াছ! যে পুরুষ নিরাকার, তিনি আবার সাকার, এই কথা বিশ্বাস করিয়াছ! যিনি অব্যক্ত তিনি আবার ব্যক্তিরূপে প্রত্যক্ষ হন, যিনি অথাঙমনসোগোচরং তিনিই আবার শুদ্ধ মনের গোচর, ‘আমি যা বুঝিতেছি তাই সত্য, অন্যে যা বুঝিতেছে

* Plato's Dialogues.

মিথ্যা’ এই মতুয়র বুদ্ধি তুমি ঠাকু- উপদেশে ত্যাগ করিয়াছ। ধন্য ! ঐ দেখ, যাঁকে দেখিতে আসিয়াছ নিজে তোমায় দর্শন দিতে আসিতে- ! যিনি তোমার অসুখের সময় রাত্রে যাইতেন না, আর কাতর হয়ে গভীর রাত্রে বলিতেন, মা কেশবকে ভাল করে দাও; কেশব না থাকলে আমি কলিকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব? ঐ দেখো সমাধিস্থ; তাঁহার নৌকা আসিতেছে। যাঁর রাতুল চরণ একদিন কমল কুটীরে উপাসনার ঘরে পুষ্প পাত্রস্থ বিবিধ কুসুম লইয়া ভক্তি ভরে পূজা করিয়াছিলে! সেই একদিন! যে শুভ দিনে মানুষে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলে! ‘নরহরি’ রূপ দেখে মোহিত হয়েছিলে! সেই একদিন! যেদিন সন্তান ভাব (Sonship) কাহাকে বলে প্রত্যক্ষ করেছিলে। ঐ নৌকা আসিয়া লাগিল, কেশব! তুমি ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য শশব্যস্ত হইয়াছ!

নৌকা আসিয়া লাগিল। সকলেই দেখিবার জন্য ব্যস্ত। ভীড় হইতেছে। ঠাকুরকে অনেক কষ্টে হুঁস করাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইল। এখনও ভাবস্থ, একজন ভক্তের উপর ভর দিয়া আসিতেছেন। পা নড়িতেছে মাত্র। জাহাজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কেশবাদি ভক্তেরা প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন হুঁস নাই। ঘরের মধ্যে একটি টেবিল, খানকত চেয়ার। একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে বসান হইল। কেশব এক খানিতে বসিলেন, বিজয়ও বসিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন, মেজেতে বসিলেন। অনেক লোকের স্থান হইল না। তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বসিয়া আবার সমাধিস্থ, সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন। সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। কেশব ঘরের, মধ্যে অনেক লোক হইয়াছে, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে দেখিলেন। বিজয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত হইয়াছেন ও তাঁহার কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্য্যের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন; তাই বিজয়কে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইলেন। কেশব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ঘরের জানালা খুলিয়া দিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[কেশবাদি ভক্ত সঙ্গে—হরিকথা প্রসঙ্গ ও ভজনানন্দ]

ব্রাহ্ম ভক্তেরা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও ভাব পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। ঠাকুর আপনা আপনি অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, মা আমায় এখানে আনিলে কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব?

ঠাকুর কি দেখিতেছেন যে সংসারী ব্যক্তিরা বেড়ার ভিতরে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, বাহিরের আলোকও দেখিতে পাইতেছে না, সকলের বিষয় কর্ম্মে হাত পা বাঁধা? তাঁহারা কেবল বাড়ীর ভিতরের জিনিসগুলি দেখিতে পাইতেছেন, আর মনে করিতেছেন যে,জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দেহসুখ ও বিষয় কর্ম্ম, ‘কামিনী ও কাঞ্চন’। তাই কি ঠাকুর এমন কথা বলিলেন, মা আমায় এখানে আনলে কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা কর্‌তে পারব?

সভা মধ্যে গাজিপুরের নীলমাধব বাবু আছেন। ঠাকুরের ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইতেছে দেখিয়া, তিনিও আর একজন ব্রাহ্মভক্ত পাউহারি বাবার কথা পাড়িলেন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, এঁরা সব পাউহারি বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজিপুরে থাকেন। আপনার মত আর একজন।

ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না। ঈষৎ হাস্য করিলেন।

ব্রাহ্ম ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয় পাউহারি বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—

"খোলটা।"

'বালিস ও তার খোলটা'—দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না। দেহের ভিতর যিনি দেহী, তিনিই অবিনাশী, অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস, এর আদর করে কি হবে? বরং যে ভগবান্ অন্তর্য্যামি রূপে মানুষের হৃদয় মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই পূজা করা উচিত।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন;—

"তবে একটি কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁহার আবাস স্থান। তিনি সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্ত হৃদয়ে তিনি বিশেষ রূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তাঁহার জমিদারির সকল স্থানে থাকতে পারেন। তবে অমুখ বৈঠকখানায় তিনি প্রায়ই থাকেন। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

[এক ঈশ্বর; তাঁহার ভিন্ন নাম জ্ঞানী ও ভক্ত]

"জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলেন, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলেন, আর ভক্তেরা তাঁকে ভগবান্ বলেন।

একই ব্রাহ্মণ। যখন সে পূজা করে, তাহার নাম পূজারী; যখন রাঁধে তখন নাম রাঁধুনি বামুন, যখন রুটি বিস্কুট ব্যাচে তখন নাম রুটি বিস্কুটওয়ালা। যিনি জ্ঞানি, জ্ঞানযোগ ধরে আছেন, তিনি নেতি নেতি এই বিচার করেন। ব্রহ্ম, এ নয় ও নয়, জীব নয় জগৎ নয়। এইরূপ বিচার করিতে করিতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয় আর সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানীর ধারণা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, নামরূপ এই সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম কি যে তা মুখে বলা যায় না; তিনি যে একজন ব্যক্তি (Person) তাও বলবার যো নাই।

"জ্ঞানীরা ঐরূপ বলেন, যেমন বেদান্তবাদী। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়, জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে লয়; জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা নামরূপ মানে। ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য্য, আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য্য, পর্ব্বত সমুদ্র, জীব, জন্তু, এ সব ঈশ্বর করেছেন। তাঁহারই ঐশ্বর্য্য। তিনি অন্তরে হৃদয় মধ্যে; আবার বাহিরে আছেন। উত্তম ভক্ত বলে তিনি নিজে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—জীব জগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি খায়। চিনি হতে ভালবাসে না। (সকলের হাস্য)।

"ভক্তের ভাব কিরূপ জান! হে ভগবান 'তুমি প্রভু আমি তোমার দাস,' 'তুমি মা আমি তোমার সন্তান', আবার 'তুমি আমার সন্তান আমি তোমার পিতা বা মাতা।' 'তুমি পূর্ণ আমি তোমার অংশ।'

"ভক্ত এমন কথা বল্‌তে ইচ্ছা করে না যে 'আমি ব্রহ্ম'।

"যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার, করতে চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জ্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হয়ে ধ্যান চিন্তা করে।

"কিন্তু একই বস্তু। নাম ভেদ মাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান্। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম; যোগীর পরম আত্মা; ভক্তের ভগবান্।"

এদিকে আগ্নেয় পোত কলিকাতার অভিমুখে চলিতে লাগিল, ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে যাঁহারা দর্শন করিতেছিলেন ও তাঁহার অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তাঁহারা, জাহাজ চলিতেছে কি না, এ কথা জানিতেও পারিলেন না। ভ্রমর পুষ্পে বসিলে আর কি ভন্ ভন্ করে? ক্রমে পোত দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইল। সুন্দর দেবালয়ের ছবি দৃশ্যপথের বহির্ভূত হইল। পোতচক্রবিক্ষুব্ধ নীলাভ গাঙ্গবারি তরঙ্গায়িত, ফেনিল, কল্লোলপূর্ণ হইতে লাগিল। ভক্তদের কর্ণে সে কল্লোল আর পৌঁছিল না। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, সহাস্য বদন, আনন্দময়, প্রেমানুরঞ্জিত নয়ন, প্রিয়দর্শন অদ্ভুত এক যোগী! তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, সর্ব্বত্যাগী একজন প্রেমিক বৈরাগী; ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না! কথা চলিতে লাগিল।

(ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, জীব জগৎ এ সব শক্তির খেলা। আর বলে যে বিচার করতে গেলে এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু।'

"কিন্তু হাজার বিচার কর সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান করছি' 'আমি চিন্তা করছি' এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে। শক্তির ঐশ্বর্য্যের মধ্যে।

"তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, এককে মানলেই আর একটীকে মান্‌তে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। অগ্নি মানলেই দাহিকা শক্তি মান্‌তে হয়, দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। সেইরূপ আবার সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না; আবার সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না। দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো; দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না; আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

"তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে ভাবা যায় না, আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না; নিত্য (Absolute) কে ছেড়ে লীলা (Relative) কে ভাবা যায় না; আবার লীলা (Relative) কে ছেড়ে নিত্য (Absolute) কে ভাবা যায় না।

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তাঁহারই আর একটি নাম কালী।

কেশব (সহাস্য বদনে)। কালী কত ভাবে লীলা করিতেছেন, সেই কথা গুলি আর একবার বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। তিনি নানা ভাবে লীলা করছেন। তিনি মহাকালী,

নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামা কালী। মহাকালী নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিলনা, নিবিড় আঁধার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করেছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমলভাব। বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁহারি পূজা হয়। যখন মহামারি, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টি হয়, তখন রক্ষাকালীর পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্ত্তি; শব, শিবা, ডাকিনী যোগিনী মধ্যে ও শ্মশানের উপর থাকেন; রুধির ধারা গলায় মুণ্ডমালা, কোটীতে নরহস্তের কোঁটী বন্ধন।

"যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নির কাছে যেমন একটা ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখেন (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। হাঁ গো! গিন্নিদের ঐ রকম একটা হাঁড়ি থাকে। তার ভিতর সমুদ্রের ফেনা নীলবড়ি, ছোট ছোট পুঁটুলি বাঁধা শশা বীচি, কুমড়ো বীচি, লাউ বীচি এই সব রাখে। দরকার হলে বারকরে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন।

(ঈশ্বর কি জগতের বাহিরে ?।)

"আবার সৃষ্টির পর সেই আদ্যাশক্তি এ জগতের ভিতরেই থাকেন। তিনি জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'ঊর্ণনাভীর' কথা। মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা নিজের ভিতর থেকে জাল বাহির করে, আবার সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর এই জগতের আধান আধেয় দুই।

"কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম রূপ ভেদ।

"যেমন জল, water, পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট আছে। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়; তারা বলে 'জল'। আর এক ঘাটে মুসলমানরা জল খায়; তারা বলে 'পানি'। আর একঘাটে ইংরেজেরা জল খায়, তারা বলে water.

"তিনি একই; কেবল নামে তফাত্। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা' কেউ বলছে, God, কেউ বলছে 'ব্রহ্ম',; কেউ বলছে 'কালী,' কেউ কেউ বলছে রাম, হরি, যিশু, দুর্গা।

"কালী কি কালো? যতক্ষণ দূরে ততক্ষণ কালো, তাঁকে জানতে পারলে আর কালো নয়।

"আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়, কাছে দ্যাখো কোন রং নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে করে তুলে দ্যাখো, কোন রং নাই।"

এই কথা বলিয়া প্রেমোন্মত্ত হয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ গান ধরিলেন—

মা কি আমার কালো রে।
কালরূপ দিগম্বরী, হৃৎপদ্ম কারে আলো রে॥

(ভববন্ধের বন্ধনহারিণী তারিণী)

"বন্ধন আর মুক্তি, এই দুইয়ের কর্ত্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব, কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ আবার তাঁর দয়া হইলেই ঐ সংসারী জীব মুক্ত হয়ে যায়, এই বলিয়া ঠাকুর গন্ধর্ব্ব বিনিন্দিত কণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাইতে লাগিলেন—

গান—মহামায়া—বন্ধনমুক্তিদায়িনী

শ্যামা মা উড়াচ্চো ঘুড়ি, সংসার রাজারের মাঝে।
(ঐযে) আশাবায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ী॥
কাক পক্ষী মক্ষী গাঁথা, (তাতে) পঞ্চরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ী স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ী।
ঘুড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত চাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে, ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভব সংসার বাজার মাঝে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি॥

"তিনি লীলাময়ী, এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী, লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।

একজন ব্রাহ্ম ভক্ত। মহাশয়, তিনি তো মনে করলে সকলকে মুক্ত করতে পারেন। কেন তবে আমাদের সকলকে সাংসারে বদ্ধ করে রেখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়িকে আগে থাকতে ছুলে আর দৌড়া দৌড়ি হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, তাহলে খেলা হয় কেমন করে? সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চল্‌লে বুড়ীর আহ্লাদ হয়।

"তাই, লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতপাপড়ি।

"তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ঈষারা করে বলে দিয়েছেন 'যা এখন সাংসার করগে যা'। মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে দেন, তা হলে বিষয় বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়। এই বলিয়া ঠাকুর আবার গান গাইতে লাগিলেন—

আমি ঐ খেদে খেদ করি।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগাঘরে চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি জেনেছি আশয় পেয়েছি, এসব তোমারি চাতুরি॥
কিছু দিলেনা পেলেনা, নিলেনা, খেলেনা সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে, খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি॥
যশঃ অপযশঃ, সুরস সুরস, সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেন রসেশ্বরি॥
প্রসাদ বলে মান দিয়েছ, মনেরি আঁকঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরি॥

তাঁরই মায়াতে ভুলে, মানুষ সংসারী হয়েছে। 'প্রসাদ বলে মন দিয়েছ মনেরি আঁকঠারি।'

(কর্ম্মযোগ। সংসার ও নিষ্কাম কর্ম্ম।)

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে বসে বেশ আছো। সারেমাতে (সকলের হাস্য)। তোমরা বেশ আছো। নক্স খেলা জান? আমি বেসি কাটিয়ে জলে গেছি। তোমরা খুব শেয়ানা। কেউ পাঁচে আছো; কেউ ছয়ে আছো; কেউ দশে আছো। বেসি কাটাও নাই; তাই আমার মত জলে যাও নাই। খেলা চলছে। এতো বেশ! (সকলের হাস্য।)

"সত্য বল্‌ছি, তোমরা যে সংসার করছো এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখ্‌তে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম্ম করো আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

"মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙ্গে ছোপাবে সেই রঙ্গে ছুপবে। যেমন ধোপা ঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙ্গে ছোপাও সবুজ। যে রঙ্গে ছোপাও সেই রঙ্গেই হবে। দেখনা, যদি একটু ইংরাজি পড় তো অমনি মুখে ইংরাজি কথা এসে পড়ে। ফুট ফাট, গড়েরমাঠ। (সকলের হাস্য।) আবার পায়ে বুট্‌জুতা; শিষ দিয়ে গান করা; এই সব এসে জুটবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, তাহলে অমনি শোলোক্ ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো তো সেই রকম কথা, বার্ত্তা, চিন্তা, হয়ে যাবে। যদি ভক্ত সঙ্গে রাখো তাহা হলে ঈশ্বর চিন্তা, হরি কথা এই সব হবে।

"মন নিয়েই সব। এক পাশে পরিবার আর এক পাশে সন্তান; একজনকে এক ভাবে আদর করে; আবার সন্তানকে আর এক ভাবে আদর করে। কিন্তু একই মন!

(ব্রাহ্মসমাজ ও পাপবাদ।)

"মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। 'আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার আবার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে?' যদি সাপে কামড়ায়, 'বিষ নাই' 'বিষ নাই' জোর করে বল্লে বিষ ছেড়ে যায়! তেমনি 'আমি বদ্ধ-নই' 'আমি বদ্ধ নই,' 'আমি মুক্ত' এই কথাটী রোক করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।

"খ্রীষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে বললাম। তাতে কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'! (কেশবের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজও কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ,' 'আমি বদ্ধ,' বার বার বলে সে শ্যালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে সে তাই হয়ে যায়।

"ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—'কি! আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার বন্ধন কি, পাপ কি!' কৃষ্ণ কিশোর পরম হিন্দু; সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গিছলো, একদিন ভ্রমণ করতে২ তার জল তৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কূয়ার কাছে গিয়ে দেখলো একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বল্লে, ওরে তুই এক ঘটি আমায় জল দিতে পারিস? তুই কি জাত? সে বল্লে, ঠাকুর মহাশয়, আমি হীন জাত মুচি, কৃষ্ণ কিশোর বল্লে, তুই বল শিব!

"ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

"কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এই সব কথা কেন? একবার বল যে অন্যায় কর্ম্ম যাহা করেছি, আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর। এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাম মাহাত্ম্য গান গাইতে লাগিলেন—

গান।

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশিগো ব্রাহ্মণ, হত্যাকরি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশিনারী।
এসব পাতক না ভাবি তিলেক (ওমা) ব্রহ্মপদ নিতে পরি।

"আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; আর বলেছিলাম 'মা এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।

(ব্রাহ্ম ভক্তদের প্রতি) একটি রামপ্রসাদের গান শোন।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয় ধৈর্য্য খোটা ধরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি।
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হবি॥

"সংসারে ঈশ্বর লাভ হবে না কেন? জনক রাজার হয়েছিল। এই সংসার 'ধোঁকার টাটি' রামপ্রসাদ বলেছিল। কিন্তু হরি পাদপদ্মে ভক্তি লাভ করলে এই সংসারই আবার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটী।"

"জনক রাজা মহাতেজা তার কিসে ছিল ত্রুটি। সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি। (সকলের হাস্য।

(ব্রাহ্মসমাজ ও জনকরাজা। গৃহস্থের সাধন।)

"কিন্তু ফস্‌করে জনকরাজা হওয়া যায় না। জনকরাজা নির্জ্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক এক বার নির্জ্জনে বাস করতে হয়। একলা সংসারের বাহিরে গিয়ে যদি ভগবানের জন্যে তিন দিনও কাঁদা যায়, সেও ভাল। এমন কি একদিনও অবসর পেয়ে নির্জ্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল। লোকের মাগ ছেলের জন্যে এক ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদছে বল? নির্জ্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্য সাধন করতে হয়। সংসারের ভিতর বিশেষ কর্ম্মের মধ্যে থেকে প্রথমাবস্থায় মনস্থির করতে অনেক ব্যাঘাত হয়। যেমন ফুটপাতের গাছ; যখন চারা গাছ থাকে, তখন বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয়; গুড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকেনা। তখন গুড়িতে হাতী বেধে দিলেও কিছু হয় না।

"রোগটী হচ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। যদি বিকারের রোগী আরাম করাতে চাও, তাহা হলে ওকে ওঘর থেকে ঠাঁই নাড়া করতে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী; বিষয় জলের জালা; বিষয়ভোগতৃষ্ণা জলতৃষ্ণা। আচার তেঁতুল মনে করলেই, ভাল মুখে জল সরে। কাছে আন্‌তে হয় না। এরূপ জিনিস ও ঘরে রয়েছে। যোষিৎসঙ্গ। তাই নির্জ্জনে চিকিৎসা দরকার।

"বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে তবে সংসার কত্তে হয়। সংসার সমুদ্রে কাম ক্রোধাদি অনেক কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নাম্‌লে আর কুমীরের ভয় থাকেনা। বিবেক বৈরাগ্য হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ

নিত্য বস্তু, আর সব অসৎ অনিত্য, দুই দিনের জন্য। এইটী বোধ।

"আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান্—ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপরে যেরূপ টান ছিল। একটা গান শোনো।

বংশীবাজিল ঐ বিপিনে।
(আমারতো না গেলে নয়)
(শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে)
তোরা যাবি কিনা যাবি বল গো ॥
তোদের শ্যাম কথার কথা।
আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা সই ॥

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই গান গাইতে গাইতে কেশবাদি ভক্তদের বল্লেন, রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টান টকু নাও; ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, তার জন্য চেষ্টা করো।

"ব্যাকুলতা হলেই তাঁকে লাভ করা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(সর্ব্বভূতহিতেরত।)

ভাঁটা পড়িয়াছে। আগ্নেয়পোত কলিকাতাভিমুখে দ্রুতগতি চলিতেছে। তাই কাপ্তেনকে হুকুম হইয়াছে, পোল পার হইয়া কোম্পানীর বাগানের দিকে আরো খানিকটা বেড়িয়া আসিতে। কতদূর পর্য্যন্ত জাহাজ গিয়াছিল, অনেকের তাহাই জ্ঞান নাই—তাঁহারা মগ্ন হইয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা শুনিতেছে। কোন্ দিক্ দিয়ে সময় যাইতেছে হুঁস নাই।

এইবার মুড়ি নারিকেল খাওয়া হইতে লাগিল। সকলেই কিছু কিছু কোঁছড়ে লইলেন ও খাইতে লাগিলেন। আনন্দের হাট। কেশব মুড়িনারিকেলের আয়োজন করে এনেছিলেন। এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন যে, বিজয় ও কেশব দুজনেই সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া আছেন। তখন ঠাকুর উভয়ের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন। যেন, দুজন অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়ে দিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া বিবাদ কেমন জানো যেমন শিবরামে যুদ্ধ। (সকলের হাস্য)। শিব রামের গুরু। যুদ্ধও হোলো আবার দুজনে ভাবও হোলো। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেত গুলো আর রামের বানর গুলো ওদের ঝগড়া কিচকিচী আর মেটে না (সকলের উচ্চ হাস্য)।

"আপনার লোক। তবে এরূপ হয়ে থাকে। লব কুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

"আবার জানো, মায়ে ঝীয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে; যেন মার মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটী সমাজ আছে আবার ওরও একটী দরকার। (সকলের হাস্য)।

"তবে এসব চাই। যদি বলো ভগবান লীলা করেছেন, তবে জটিলে কুটিলের কি দরকার। জটিলে কুটিলে না থাক্‌লে লীলা পোষ্টাই হয়না (সকলের হাস্য)। জটিলে কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না (উচ্চ হাস্য)।

"রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শেষে দুজনে অমিল। 'গুরু শিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন করতে লাগ্‌ল। এরূপ হয়েই থাকে। যাই হোক, তবু আপনার লোক।

(গুরুগিরি ও ব্রাহ্মসমাজ)

সকলে আনন্দ করিতেছেন। আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণ কেশবকে সম্বোধন করিয়া

বল্লেন, তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য করোনা, তাই এইরূপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়।

"মানুষগুলি দেখতে সব এক রকম। কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারুর ভিতর সত্ত্বগুণ বেশী, কারু রজোগুণ বেশী, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর, কারুর ভিতর নারিকেলের ছাই, কারুর ভিতর কলায়ের পোর। (সকলের হাস্য।)

"আমার কি ভাব জানো? আমি খাই দাই থাকি, আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে। গুরু, কর্ত্তা আর বাবা।

"গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তান ভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হতে চায়। শিষ্য কে হতে চায়?

(ব্রাহ্মসমাজ ও আদেশবাদ)

"লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। তবে যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন, আর আদেশ দেন, তাহলে হতে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে? কলকাতার হুজুগ্ তো জানো। যতক্ষণ কাঠে জাল ততক্ষণ দুধ ফোসকরে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে আর কেথাও কিছু নাই। কলকাতার লোক হুজুগে! এই এখানটা কুয়া খুঁড়চে। বলে জল চাই। সেখানে পাথর হলো তো ছেড়ে দিলে। আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলে। সেখানে বালি মিলে গেল; আবার ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গায় খুড়তে আরম্ভ হলো। এই রকম! আবার, মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন আর কথাকন্। তখন আদেশ হতে পারে। সে কথার জোর কত? পর্ব্বত টলে যায়! শুধু লেক্‌চার? ঐ দিনকতক লোকে শুন্‌বে, তার পর ভুলে যাবে। সে কথা অনুসারে কাজ করবে না।

"ও দেশে হালদার পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। পুকুরের পারে রোজ সকাল বেলা লোকে বাহ্যে করে রাখতো। যারা সকাল বেলা আসে, তারা খুব গালাগালি দেয়। কিন্তু আবার তার পরদিন সেইরূপ। বাহ্যে আর থামেনা (সকলের হাস্য)। তখন লোকে কোম্পানীকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, 'বাহ্যে করিও না।' তখন সব বন্দ হলো (হাস্য)।

"যে লোক শিক্ষা দেবে, তার চাপরাস থাকা চাই। তানা হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না আবার অন্য লোক! কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে লয়ে যাচ্ছে (হাস্য)। তাতে হিতে বিপরীত হয়। ভগবান্ লাভ হলে তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবেই কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।

"আদেশ না থাক্‌লে, 'আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি' এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয় আমি কর্ত্তা*। 'ঈশ্বর কর্ত্তা' 'ঈশ্বরই সব করছেন আমি কিছু করছিনা', এ বোধ যদি হয়, তাহলে তো সে জীবন্মুক্ত। 'আমি কর্ত্তা,' 'আমি কর্ত্তা' এই বোধ থেকেইতো যত দুঃখ অশান্তি।

* অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে।

(কর্ম্মযোগ ও ব্রাহ্মসমাজ)

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি)। তোমরা বলো জগতের উপকার করা। জগৎ কি এতটুকু! আর তুমি কে যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো'। তাঁকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিন তবে সকলের হিত করতে পারো। নচেৎ নয়।

একজন ভক্ত। যত দিন না ঈশ্বর লাভ হয়, ততদিন কি সব কর্ম্ম ত্যাগ করবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, কর্ম্ম ত্যাগ করবে কেন? তাঁর চিন্তা, তাঁর নাম গুণ গান, নিত্য কর্ম্ম এসব করতে হবে।

ব্রহ্মজ্ঞ। সংসারের কর্ম্ম? বিষয় কর্ম্ম?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ তাও করবে, সংসার যাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জ্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে ঐ কর্ম্মগুলি নিষ্কাম ভাবে করা যায়। আর বলবে, হে ঈশ্বর আমার বিষয় কর্ম্ম কমিয়ে দাও, কেন না ঠাকুর দেখছি যে বেশী কর্ম্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই, মনে করছি নিষ্কাম কর্ম্ম করছি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে। হয়তো দান সদাব্রত বেশী করতে গিয়ে লোকমান্য হতে ইচ্ছা হয়ে পড়ে।"

"শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করণীর কথা বলেছিল। আমি বল্লাম, সম্মুখে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেইটাই নিষ্কাম হয়ে করতে হয়। ইচ্ছা করে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়, ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে গিয়ে দানই কর্ত্তে লাগলো, কালী দর্শন আর হলো না। (সকলের হাস্য)। আগে জোসোকরে ধাক্কা ধুক্কি খেয়েও কালী দর্শন কর্ত্তে হয়, তার পর দান যত কর, আর না করো। ইচ্ছা হয় খুব কোরো। কেননা, ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম্ম। শম্ভুকে তাই বল্লুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি তুমি বলবে, আমার কতকগুলা হাঁসপাতাল, ডিস্পেনসারী করে দাও। (সকলের হাস্য) ভক্ত কখনও তা বলে না, বরং বলবে 'ঠাকুর আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্ব্বদা রাখো, পাদ পদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম্ম করতে বলেছে, তাও কলিকালে করা বড় কঠিন। এখন অন্নগত প্রাণ। বেশী কর্ম্ম চলে না। জ্বর হলে কবিরাজী চিকিৎসা করতে গেলে এদিকে রোগীর হয়ে যায়। বেশী দেরি সয় না। তাই এখন ডি, গুপ্ত। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম। "(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) তোমাদেরও ভক্তিযোগ। তোমরা হরি নাম কর, মায়ের নাম গুণ গান কর, তোমরা ধন্য। তোমাদের ভাবটী বেশ। বেদান্তবাদীদের মত তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বলো না। তোমরা ও রূপ ব্রহ্মজ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। আর তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলো, এও বেশ। তোমরা ভক্ত। ব্যাকুল-হয়ে তাঁকে ডাকলে তাঁকে অবশ্য পাবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ভক্তমন্দিরে—ভক্তসঙ্গে।]

জাহাজ কয়লাঘাটে এইবার ফিরিয়া আসিল। সকলে নামিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, কোজাগরের পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, ভাগীরথী বক্ষ কৌমুদীর লীলাভূমি হইয়াছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্য গাড়ী আনিতে দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মাষ্টার ও দু একটী ভক্তের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন। কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলালও গাড়ীতে উঠিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা যাবেন।

গাড়ীতে সকলে বসিলে পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কৈ তিনি কই?'—অর্থাৎ কেশব কৈ? দেখিতে দেখিতে কেশব একাকী আসিয়া উপস্থিত। মুখে হাসি। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কে এঁর সঙ্গে যাবে? সকলে প্রস্তুত হইলে পর, কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। ইংরাজটোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের দুই দিকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছেন। অট্টালিকা গুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্র কিরণে বিশ্রাম করিতেছে। তাহাদের দ্বার দেশে বাষ্পীয় দ্বীপ—কক্ষ মধ্যে দীপমালা—স্থানে স্থানে হারমোনিয়াম্, পিয়ানো সংযোগে ইংরাজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছেন। এমন সময়ে হঠাৎ বল্লেন, 'আমার জল তৃষ্ণা পাচ্ছে, কি হবে?' তখন কি করা যায়! নন্দলাল (India Club) ইণ্ডিয়া ক্লাবের নিকট গাড়ী থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন, কাঁচের গ্লাস করিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর সহাস্য, জিজ্ঞাসা করিলেন 'গ্লাসটী ধোয়াতো,' নন্দলাল বল্লেন হাঁ। তখন সেই গ্লাসেই জল খাইলেন।

বালকের স্বভাব। গাড়ী চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোকজন, গাড়ী ঘোড়া, চাঁদের আলো দেখিতে লাগিলেন। সকলতাতেই আনন্দ।

নন্দলাল কলুটোলায় নামিলেন। ঠাকুরের গাড়ী সিমুলিয়ায় শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে আসিয়া লাগিল। সুরেশ ঠাকুরের পরম ভক্ত।

কিন্তু সুরেশ বাড়ী ছিলেন না, নূতন বাগানে গিয়াছিলেন। বাড়ীর লোকেরা বসিতে নীচের ঘর খুলিয়া দিল।

গাড়ীর ভাড়া দিতে হবে। কে দিবে? সুরেশ থাকিলে সেই দিত। ঠাকুর বল্লেন একজন ভক্তকে, 'ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নেনা। ওরা কি জানেনা ওদের ভাতাররা যায় আসে?' (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র ঐ পাড়াতেই থাকেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডাকিতে একজন ভক্তকে পাঠালেন।

এদিকে বাড়ীর লোকেরা দুতালার ঘরে ঠাকুরকে লইয়া বসাইলেন। ঘরের মেজ্যাতে চাদর পাতা, দু চারটা তাকিয়া তার উপর রহিয়াছিল। কক্ষ প্রাচীরে সুরেশের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত Oil painting; যাহাতে কেশবকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেখাইয়া দিতেছেন, হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মের সমন্বয়, আর বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়।

ঠাকুর বসিয়া সহাস্যে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন ঠাকুরের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হইল। তিনি বল্লেন,

"আজ কেশব সেনের সঙ্গে কেমন জাহাজ করে বেড়াতে গিছলাম। বিজয় ছিল, এরা সব ছিল।" মাষ্টার কে নির্দ্দেশ করিয়া বল্লেন, "একে জিজ্ঞাসা কর কেমন বিজয় আর কেশবকে বল্লুম, মায় ঝীয়ে মঙ্গলবার, আর জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই

হয় না।" এই সব কথা। (মাষ্টারের প্রতি) কেমন গা?

মাষ্টার বল্লেন, আজ্ঞা হাঁ।

রাত্রি হইল, তবু সুরেশ ফিরিলেন না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে যাইবেন, আর দেরী করা যায় না, রাত সাড়ে দশ হইয়াছে।

রাস্তায় চাঁদের আলো। গাড়ী আসিল। ঠাকুর উঠিলেন, নরেন্দ্র ও মাষ্টার প্রণাম করিয়া কলিকাতাস্থিত স্ব স্ব বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[সেবকহৃদয়ে।]

লক্ষ্মী পূর্ণিমা—জগৎহাসিতেছে। কি সুন্দর রাত্রি! একজন ভক্ত ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথ দিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। আর ভাবিতেছেন—

"বড় হাসি পাচ্ছে—হাল্‌দার পুকুরের চাপরাসীর নোটিসের কথা মনে পড়ে। ঈশ্বরের কাছে আদেশ না পেয়ে লোক শিক্ষা দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র বটে। ঠাকুর কেশবকে উপদেশ দিলেন কেমন ভাবে! 'আমি খাই দাই থাকি, সব আমার মা জানেন'। অথচ গুরু গিরিকে নিন্দা করা হলো, বল্লেন 'গুরু, কর্ত্তা, আর বাবা, এই তিন কথাতে আমার গায়ে কাঁটা বিঁধে'। আবার কেউ যে মনে গড়ে বলবেন, আমার আদেশ হয়েছে, আমি এইবার উপদেশ দিতে আরম্ভ করি, তাও হবে না। সে কেবল আপনাকে ঠকানো। মনে মনে একটা ভাব কি বিশ্বাস জন্মালো—তাতে আদেশ হয় না! ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর যথার্থ সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন! তিনি দেখা দিয়া যদি বলেন, 'তুমি লোক শিক্ষা দেও, তার নাম আদেশ'। আর ঈশ্বরকে না জেনেই বা lecture দিতে যাওয়া কেন? সত্যই তো এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। অন্তর্দৃষ্টি নাই—যাদের lecture দিচ্ছি তাদের কি প্রকৃতি, কিরূপ রোগ জানি না। 'যদি ছিল রোগী বসে বদ্যিতে শোয়ালে এসে'। কাণা কাণাকে পথ দেখাবেন। না দেখিয়ে ছাড়বেন না! আর ১০ জনে যাই বাহবা দিয়েছে, অমনি lecturer মনে করেছেন, 'ঠিক বলেছি'। কি ভুল! ঠাকুর ঠিক বলেছেন, কলকাতার লোকগুলো হুজুগে, এই একজনকে বড় বল্‌ছে, আবার দুদিন পরে আর একজনকে বড় বল্‌ছে, আর তাকে ভুলে গেছে। এই হুজুগে যে ভোলে তার দফা রফা দেখিতেছি।

"কেশবকে বল্লেন, 'তোমরা এতো 'পাপ' 'পাপ' করো কেন'? এতদিনে একটা চট্‌কা ভাঙলো। স্কুলে যখন পড়ি তখন ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে বসি। বরাবর শুন্‌ছি 'পাপ' 'পাপ'। আজ কাল কেশবের মুখে একটু কম পড়েছে। আমাদের আজ কালের ধর্ম্ম দেখ্‌ছি সব খ্রীষ্টানদের কাছে শেখা। তাও ভালকরে শেখা নয়। যিশু, সেকালের আর নিজের দেশের লোকের যা দরকার, তাই বলেছিলেন। 'অনুতাপ করো, তা না হলে পাপের শাস্তি পাবে—নরক হবে।' খ্রীষ্টানধর্ম্ম দাঁড়িয়েছে এই, যিশুকে ধরো তবে 'উদ্ধার' হবে 'পরিত্রাণ হবে'। হিন্দুধর্ম্ম ঠাকুরের মুখে শুনছি, সনাতন ধর্ম্ম! এতে পাপের কথা আছে, পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথাও আছে। কিন্তু কেবল 'পাপ' 'পাপ' এই কথা নেই। প্রধান

কথা, ঈশ্বরকে ভক্তি করো, সব অন্য আসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরকে ভালবাসো। যেমন শুকদেব, নারদ, প্রহ্লাদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ ভাল বেসেছেন। যেমন ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ভালবেসেছেন।

"সনাতন ধর্ম্মের কি শিক্ষা! ঠাকুর বল্লেন, ভক্তে বলে 'তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ!'—ভগবানের নামে দেহ মন শুদ্ধ হয় বলে, পাপ পালিয়ে যায়—পাপের পাহাড় তুলার পর্ব্বতের ন্যায় নামাগ্নিতে একক্ষণে পুড়ে যায়। আহা কি গান!

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে
গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি
বিনাশি নারী।
এসব পাতক, নাভাবি তিলেক, (ওমা) ব্রহ্মপদ
নিতে পারি॥

"কৈ শ্রীগৌরাঙ্গ ও তো পাপের কথা তুলতেন না! কেবল তাঁর নাম সঙ্কীর্ত্তন। কেবল ঈশ্বরকে ভালবাসবার কথা। কেবল ভজনানন্দ, প্রেমানন্দ; নিশিদিন হরিপ্রেমে মাতোয়ারা। ঠাকুর ও জীবকে শিখাচ্চেন, ঈশ্বরকে ভালবাসা, এরিনাম 'ধর্ম্ম' (religion) তাঁর প্রেমে ডুবদাও, মরবে না, সে প্রেমসাগর অমৃতের সাগর'।

"আবার মনে হচ্চে উপনিষদের কথা—'কে এ সৌম্য! ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি মানুষ না দেবতা!' এঁর কাছে হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, সকলেই আসে দেখছি। শাক্ত বাউল, বৈষ্ণব, সকলেই বলে, ইনি আমাদের লোক! ব্রাহ্মসমাজে দলাদলি, কিন্তু সব দলের লোকেরা, দলপতিরা, আসে আর বলে, ইনি আমাদের। ইনি কেশবের, আবার ইনি বিজয়ের!

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নো
দ্বিজতে চ যঃ"।
এসৌম্য কে রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতহিতেরত
ইনি কে?

সাকারবাদীরা জানে, ইনি পাকা সাকারবাদী। নিরাকারবাদী ইদানীন্তন ব্রহ্মজ্ঞানীরা জানেন, উনি নিরাকারবাদী। যদি সাকারবাদী, নিরাকারবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীকে বলেন 'দেখ ঠাকুর রামকৃষ্ণ কালী মানেন' তখন ব্রহ্মজ্ঞানী বলেন "সে কালী মানে কি আপনি জানেন? তাঁর 'কালা' মানে আলাদা; সে গভীর তত্ত্ব; আপনারা বুঝবেন না।" এরই নাম কি যিশু যা বলেছিলেন, "Be perfect as your Father in heaven is perfect'? ঈশ্বরের সূর্য্য সুহৃৎ মিত্র-অরি-উদাসীন-নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপর আলো দিতেছেন! এ বিশ্বজনীন ভাব কি সামান্য মানুষের হতে পারে? সামান্য মানুষ 'ধর্ম্মপ্রচার' করে কিন্তু লোক রঞ্জন করিতে, লোকমান্য হবার জন্য, ব্যতিব্যস্ত—দলাদলি করে ফেলে! আবার, এই মহাপুরুষের কি নিরহঙ্কার। সামান্য লোকে শিক্ষাদিতে গেলেই 'আমি শিক্ষা দিতেছি' এই অভিমান এনে ফেলে। এঁর ভাব 'আমি যন্ত্র, ঈশ্বর যন্ত্রী,'—গুরু একমাত্র তিনি।

কিরূপে লোক শিক্ষা দিতে হয়, সেইটী দেখাবার জন্য, কিরূপে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়, এইটী জীবকে দেখাবার জন্য, ঈশ্বর নিজে কি নরদেহ ধারণ করে এলেন নাকি? ব্রাহ্ম ভক্তদের গানে যে আছে 'নরহরি' ইনি কি তাই? "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এ কি তাই?

"ঈশ্বর কি মানুষ হন? অনন্ত ঈশ্বর সাড়ে তিন হাত মানুষ? হিন্দুরা তো

বলেন; অবতার। খৃষ্টানরাও বলেন—যিশুর কথা। শুনেছি ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। তা হলে তাঁর শক্তিতো সব তাতেই অবতীর্ণ। তবে একটা কথা আছে, জল সব জায়গায় আছে বটে—মাটী খুঁড়ে গেলেই জল বেরোয়। কিন্তু সকলে মাটী খুঁড়ে জল নিতে চায় না, পারেও না। তাই নদী, পুষ্করণী, কূপের কাছে যায়। ঠাকুর বলছেন যে, ভক্তের হৃদয় ঈশ্বরের বৈঠকখানা। তবে উত্তম ভক্তও আছে, মধ্যম ভক্তও আছে, অধম ভক্তও আছে। যদি ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ দেখতে হয়, তবে এরূপ রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতহিতেরত, হরি প্রেমে মাতোয়ারা প্রেমিক বৈরাগী, আবার সর্ব্বদা সমাধিস্থ আদর্শ মানব মহাপুরুষেই দেখা সুবিধা। তাই বুঝি পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে লিখেছেন যে, 'হয় যমনিয়মাদি ষড়াঙ্গ যোগ অভ্যাস কর, নয় কোন মহাপুরুষের সর্ব্বদা ধ্যান চিন্তা কর। দুইয়ের মধ্যে একটী উপায় অবলম্বন করিলে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হবে, ঈশ্বর দর্শন হবে।'

"অহেতুক কৃপাসিন্ধু! সংসারী লোক বলিয়া ঘৃণা নাই! মার কাছে শাশ্রুনয়নে বলছিলেন, 'মা আমি কি এদের ব্যাড়ার ভিতর থেকে বাঁচাতে পারি'! ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু' এই কথা বোলে সংসার ত্যাগ করতে বল্লে, কোন্ সংসারী শুন্‌বে বা করবে? ঠাকুর বুঝেছেন তাদের 'problem' বড় কঠিন। Fool! here is thy ideal :or nowhere'.* তাই বল্‌ছেন," সংসারেতেই থাকো, মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাক্‌বে, 'শুদ্ধাভক্তি দাও, দেখা দাও' এই বলে।" আর অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হতে বলেছেন। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করতে বলেছেন। "আমি অধম, আমি পাপী, আমি বদ্ধজীব, এ সব কথা দূর করে দাও, তাঁর নামে বিশ্বাস করো, অমনি শুদ্ধ হবে; দুর্ব্বলের ন্যায় মিউ মিউ কোরো না; বল আমি মুক্ত, আমি মায়ের ছেলে, রাজরাজেশ্বরীর ছেলে, আমার আবার বন্ধন কি, পাপ কি, আমার কি ভয়; আর নিষ্কাম কর্ম্ম করবার শক্তির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করো।" আহা কি অভয় দান! গৃহস্থের পথ কঠিন বটে, কিন্তু ভয় নাই। ঠাকুর যা শিখালেন, এই ধর্ম্মের এতটুকুও সত্য সত্যই মহৎ ভয় থেকে ত্রাণ করে।† আবার, "তোমাদের সংসার ত্যাগ করতে হবে না, তবে মন রেখো তাঁর পাদপদ্মে; নির্জ্জনে ব্যাকুল হয়ে ভেবো, সময় হলে তাঁর দর্শন পাবে।"

"ঈশ্বর দর্শন কি? ঈশ্বর দর্শন করলে কি হয়? কি অবস্থা হয়? বোধ হয় এই মহাপুরুষের অবস্থা হয়!

'ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু!—কি সুন্দর রাত্রি! (এইবার ভক্তটী গান ধরিলেন—নরেন্দ্রের গান)—

কি সুখ জীবনে ওহে নাথ দয়াময় হে।
যদি চরণ-সরোজে, পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে॥
অগণন ধনরাশি তায়, কিবা ফলোদয় হে।
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে॥
সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে।
যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাইহে॥
কি ছার শশাঙ্ক জ্যোতি দেখি আঁধারময় হে।
যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেমচাঁদ নাহি হয় উদয়হে॥

"কি সুন্দর রাত্রি! (আবার গান)

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে
তারকা মণ্ডিত চমকে মোতিরে।

* Carlyle.

† নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো নবিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ॥

"চন্দ্র তারামণ্ডিত সুনীল নভোমণ্ডল। যেন বৃহৎ পুষ্পপাত্রে ফুলন্ত জ্যোতিঃ অসংখ্য কুসুম। বুঝি চরাচর বিশ্বের এক সঙ্গে পূজা হচ্চে। শীতল শারদ সমীরণ। 'পওন চৌরি করে'। গ্রহগণের নৃত্যগীত। Pythagoras বলেছিলেন। সকল লোক গায় 'ধন্য! তুমি ধন্য! এই গীতি অনিবার।' সাধু মহাত্মারা কেউ সমুদ্র-প্লাবিত নদীকূলে, কেউ প্রান্তরে, কেউ গিরিগুহার বাহিরে আসিয়া, কেহবা মানসসরোবরে এই পূজা দেখিতেছেন, আর কত স্তব স্তুতি করিতেছেন। মা সাক্ষাৎকার হয়ে পূজাগ্রহণ কর্‌ছেন, সন্তানদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছেন, বরাভয় দিবেন। মা বিপদনাশিনী, ব্রহ্মময়ী, ভক্তিদায়িনী'—

নমস্তে ভুবনেশানি নমস্তে প্রণবাত্মকে।
সর্ব্ববেদান্ত সংসিদ্ধে নমোহহংকারমূর্ত্তয়ে॥

"মধুমান্ আকাশ, মধুমান চন্দ্র, মধুমৎ নক্ষত্র, মধুমৎ জগৎ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। সব মধুমৎ। সুন্দর নগরী, সুন্দর সৌধধবলিত গৃহ, সুন্দর রাজপথ, সুন্দর মানুষ, জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা! জগৎপ্রসবিনী আবার জগতেই রয়েছেন। সর্ব্বব্যাপিনী। মাকড়সার জাল মাকড়সা বার করেছে, আবার মাকড়সা সেই জালের উপর আছে। শুধু উপরেই বা কেন? উপরে, অন্তরে, বাহিরে।

"কিন্তু মাকড়্‌সা আবার জাল নষ্ট করে; খেয়ে ফেলে! এ সব কিছুই থাকিবে না! জীবের বিনাশতো রোজ দেখা যাচ্চে। আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণ বল্লেন, প্রলয় হয় মাঝে মাঝে। এই চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, জীব, জগৎ কিছুই থাকবে না! আকাশ, কাল, এ সবও থাকবে না? ঐ যা! সব গোল হয়ে গেল। কে বুঝিবে! বুদ্ধির অতীত!

"এই সুন্দর লীলারসতরঙ্গ—হয় যায়! মা লীলাময়ী জগৎ সৃষ্টি করেন। আমাদের মন, বুদ্ধি, অহং, এ সব সৃষ্টি করেন। আবার পালন করেন।

জগৎ অম্বে জনপালিনি জনমোহিনী জগৎজননী।

বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারাবতী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস! শুনিতে পাই কতই লীলা হইল। গোপীপ্রেম। দুষ্টের দমন; শিষ্টের পালন। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। নিষ্কাম ধর্ম্ম ও ঈশ্বরে ফল সমর্পণ। রাজ্যশাসন। কত কাণ্ড হলো! কিন্তু লীলা সাঙ্গও হলো। 'হে উদ্ধব!* এ সংসার মিথ্যা, এই যে সব লীলা দেখ্‌লে এ সব মায়া। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তুমি আমার বড় প্রিয় তাই তোমায় বল্‌ছি। এখানে আর থেকো না। যাও বদরিকাশ্রমে। সেখানে পরব্রহ্মের চিন্তা করগে। আমি লীলা সম্বরণ কর্‌বো। যদুবংশ ধ্বংস হবে।'

কে সেই পরব্রহ্ম? ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাঁকে মহাকালী, নিত্যকালী বল্লেন? যিনি প্রলয়ের সময় 'ন্যাতাকাতার হাঁড়িতে' ব্রহ্মাণ্ডের বীজ তুলে রেখেছেন! যিনি দেশ কালের অতীত, যিনি গুণের অতীত, যিনি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির সাক্ষীস্বরূপ! প্রলয়ের পর সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। কেবল তিনি। নরেন্দ্রের সেই গান—

রূপ অরূপ নামবরণ, অতীত আগামী কালহীন,
দেশহীন সর্ব্বহীন নেতি নেতি বিরাম যথায়।

নিবিড় আঁধার। মা নিরাকারা। এই সুন্দর চন্দ্র নাই, শারদকৌমুদী নাই, সূর্য্য নাই, মন নাই, বুদ্ধি নাই, অহং নাই! মহাকালী মহাকাল!

নাহি সূর্য্য নাহি ভাতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
অস্ফুট মন আকাশে জগৎ সংসার ভাসে,

* শ্রীমৎভাগবত, একাদশ স্কন্ধ।

উঠে ভাসে ডুবে পুন, ছবি বিশ্ব চরাচর।
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল,
রহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই ধারা নিরন্তর;
সে ধারাও রুদ্ধ হলো শূন্যে শূন্য মিশাইল,
অবাঙ মনসোগোচর বুঝে প্রাণ বুঝে যায়॥

"মুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেল। একটু নেমেই গলে গেল কে তার খপর দেয়! ওমা এতো সব মিথ্যা! কেবল তুমি, তুমি! সে দিন কবে হবে! ঠাকুরের গান মনে পড়ছে;—

কবে সমাধি হবো শ্যামাচরণে
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়া মহত্তত্ত্ব ত্যজি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব,
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনি আপনে।

"কিন্তু যতদিন দেহবুদ্ধি রাখবে, ততদিন যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি থাকে। আর যেন তোমার শ্যামাকালী, রক্ষাকালী বরাভয়দায়িনী চিন্ময়রূপ দেখতে পাই। যতদিন এই মায়াময় সংসার সত্য বলে বিশ্বাস করাবে, ততদিন যেন এ সমস্তই তোমার সত্তায় সত্তবান এইটী বোধে বোধ হয়। দেহবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি যখন তুমি দূর করবে তখন যা তোমার ইচ্ছা তাই হবে। কৃপা করে এই আশীর্ব্বাদ কর।"

ভক্তটী অনেক রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

লক্ষ্মীপূর্ণিমা। এমন রাত্রে জাগরণ বিধি। কি মনোহর রাত্রি! এই মহাপূজাকালে কে নিদ্রা যাইবে? তিনি দেহবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি রেখে দিয়েছেন, অতএব আমি কেন না এই মহাপূজায় যোগদান করিব? আমিতো মায়া দেখ্‌ছি না; স্বপ্নবৎ দেখ্‌ছি না; জীব জগৎ সব সত্য দেখ্‌ছি। এই মহালক্ষ্মী পূজা আমারই জন্য।

অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন-হার
কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়; (হায়) পূর্ণ তোমারি ভাণ্ডার।

হে মহেশ! অগণন লোক গায় ধন্য! ধন্য! এই গীতি অনিবার!

রাজা সুবোধ নারায়ণ।

রাজা সুবোধ নারায়ণ শ্রীহট্টস্থ প্রাচীন হিন্দু রাজাদের অন্যতম। কিন্তু কালের সর্ব্ববিধ্বংসিনী শক্তি বলে তাঁহার নাম ভিন্ন দেশীয় দূরে থাকুক, স্বদেশীয়দের মধ্যেই লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল তাঁহার বংশধরেরাই কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহার নামের সহিত শ্রীহট্টস্থ সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বিশেষ সম্বন্ধ বিজড়িত। বহু আয়াসে উক্ত রাজার সম্বন্ধে তাঁহারই বংশধর বিষ্ণুপুরনিবাসী স্বর্গীয় গোলোকচন্দ্র চৌধুরী মোক্তার মহাশয় যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাই স্থল বিশেষে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া অতি সংক্ষেপে আমি প্রকাশ করিলাম। ক্রমে সুবোধ নারায়ণের বংশীয়দের নামধাম প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল।

অতি প্রাচীন কালে শ্রীহট্টের অধিকাংশ স্থল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহামহিমান্বিত বর্ত্তমান ত্রিপুরাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুষ খ্যাত নামা স্বর্গীয় আদিধর্ম্মপা মাণিক্য বাহাদুর ৫০ ত্রিপুরাব্দে রাজ্যাধিকারে হইয়া যজ্ঞকার্য্যে অভিলাষী হন। কিন্তু তৎ সময়ে স্বদেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব ছিল বলিয়া ৫১ ত্রিপুরাব্দে মৈথিলাধিপতি স্বর্গীয় বলভদ্র সিংহকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহার অধিকৃত কান্যকুব্জের ইটোয়া গ্রাম হইতে চতুর্দ্দশ গুণ সম্পন্ন বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রয় ও পরাশর গোত্রীয় শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোত্তম নামক পাঁচজন বৈদিক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণগণ স্বদেশ প্রত্যাগমন পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরাধিপতিরই অধীনতায় বাস করার জন্য উক্ত মহারাজ ব্রাহ্মণপুঙ্গবদিগকে বিশেষ স্তব স্তুতি করায় তাঁহারা মহারাজের আশ্রিত ভাবেই বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। অনন্তর তাঁহারা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনদিগকে স্বদেশ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক ত্রিপুরা মহারাজের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী উদয়পুরে আসিয়া মহারাজ আদিধর্ম্মপা মাণিক্য বাহাদুর হইতে পঞ্চান্ন (৫৫) ত্রিপুরাব্দের মাঘী পূর্ণিমা দিনে "পশ্চিম ও উত্তরে ক্রোশিরা (কুশিয়ারা) নদী, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে হাঙ্কালা কুকীর অধিকৃত স্থান" এই চতুঃসীমার অন্তর্গত 'টেঙ্গরী কুকী কর্ষিত' ভূখণ্ড ব্রহ্মোত্তর গ্রহণ ক্রমে তথায় বাস করিতে থাকেন। শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ সব্‌ডিবিসনের অন্তর্গত পঞ্চ পরগণাই অধুনা উক্ত ভূখণ্ডের পরিচায়ক। উক্ত ভূমির দান পত্রের অনুলিপি যে তাম্রফলক আজ ও ত্রিপুরারাজধানীতে বর্ত্তমান, তাহাতে এইরূপে বর্ণিত আছে:—

"ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশ শ্রীশ্রীযুক্তাদি ধর্ম্মপা,
সমাজ্ঞং দত্তপত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপস্বিষু।
বৎস বাৎস্য ভরদ্বাজ কৃষ্ণাত্রয় পরাশরাঃ।
শ্রীনন্দানন্দ গোবিন্দ শ্রীপতি পুরুষোত্তমাঃ।
প্রতীচ্যা মুত্তরস্যাঞ্চ বক্রগা ক্রোশিরা নদী।
দক্ষিণস্যাঞ্চ পূর্ব্বস্যাং হাঙ্কালা কৌকীকাপুরী॥
এতন্মধ্যাং সশস্যাং যাং টেঙ্গরী কুকী কর্ষিতাং।
অলভ্য দত্তা তদ্‌ভূমিন্তেষু পঞ্চ তপস্বিষু।
মকরস্থে রবৌ শুক্লে পক্ষে পঞ্চদশী দিনে।
ত্রিপুরা চন্দ্রবর্ষাব্দে প্রদত্তা দত্তপত্রিকা।"

উক্ত তপস্বিগণ কথিত পঞ্চখণ্ড পরাগণাতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রমশঃ তদ্দেশবাসী কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মদ্‌গুল্য, স্বর্ণ কৌশিক ও গৌতম এই পাঁচ গোত্রীয় সাগ্নিক বৈদিক ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক সহ আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তদবধি উক্ত বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রয়, কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মদ্‌গুল্য, স্বর্ণ কৌশিক ও গৌতম এই দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অশেষ প্রতিপত্তিশালী। ইহাঁদের স্বাক্ষর ব্যতীত কোন বিধি ব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত নাই। ইহারা শ্রীহট্টে "বৈদিক সাম্প্রদায়িক" বলিয়া খ্যাত আছেন। ক্রমে বংশ বৃদ্ধি সহকারে ইহাদের সন্তান সন্ততিগণ সম্প্রতি চৌধুরী, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য ও শিকধার প্রভৃতি উপাধিধারণে পঞ্চখণ্ড, ঢাকাদক্ষিণ, রেঙ্গা, ব্রহ্মচাল, লংলা ইটা, ছয়চিরি, সাতগাঁও, বালিশিরা, তরপ, বুরুঙ্গা প্রভৃতি পরগণাতে বাস করিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত বাৎস্য গোত্রীয় তপস্বী আনন্দের বংশীয় নিধিপতি ভট্ট্যাচার্য্য নামক সুধী পুরুষ স্বীয় কৃতিত্ব বলে মহারাজ আদিধর্ম্ম পা মাণিক্য বাহাদুরের বংশোদ্ভব স্বর্গীয় সুধর্ম্মপা মহারাজ হইতে ১৬৪ ত্রিপুরাব্দের বৈশাখীয় শুক্লা তৃতীয়া দিবসে জঙ্গলাকীর্ণ "মনুকূল" নামক প্রদেশ ব্রহ্মোত্তর গ্রহণ করেন। দান পত্রের অনুলিপি ত্রিপুরা রাজধানীতে বর্ত্তমান। ঐ তাম্রফলকে এইরূপ বর্ণিত আছে:—

ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশ শ্রীশ্রীযুক্ত সুধর্ম্মপা
সমাজ্ঞং দত্তপত্রঞ্চ মৌখিলায় তপস্বিনে।

শ্রীনিধিপতি বিপ্রায় বৎস্য গৌত্রায় ধর্ম্মিণে।
প্রাচ্যাং লংলাইকুকীস্থানং প্রতীচ্যাং গোপলা নদী।
চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরসা(দক্ষিণস্যামরণ্যকম্।
ক্রোশিরা লঙ্ঘ্যোত্তরস্যাং প্রাগ্‌দত্ত স্থানমেবহি।
এতন্মধ্যা সশস্যা যা মনুকুল প্রদেশিনী।
সাপি প্রদত্তা তস্মৈ তদ্বৈদিকায় তপস্বিনে।
শুক্লে পক্ষে তৃতীয়ায়ান্দিনে মেষগতে রবৌ।
চতুঃ ষড়েক রাজাব্দে ত্রৈপুরে দত্ত পত্রিকা॥"

উল্লিখিত তাম্রফলক হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, 'মনকূল' প্রদেশের পূর্ব্বে লংলাই কুকীর বসতিস্থান, পশ্চিমে গোপলা নদী, দক্ষিণে চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরার জঙ্গলময় আবাসভূমি ও উত্তরে ক্রোশিরা নদী ছিল। লংলাই কুকীর বাসস্থান এখন 'লংলা পরগণা' বলিয়া পরিচিত। মনুনদীর দক্ষিণতীরেই দক্ষিণ শ্রীহট্ট সব্‌ডিবিসন্ অবস্থিত। এবং উক্ত সীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থান দক্ষিণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত ইটা ও চোয়ালিশ পরগণা বলিয়া অভিহিত।

নিধিপতি ভট্টাচার্য্য প্রাগুপ্ত ব্রহ্মোত্তর গ্রহণ করিয়া আত্মীয় স্বজন সহ ইটা পরগণার এওলাতলী গ্রামে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ ইটোয়া গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার বাসস্থানের 'ইটা পরগণা' নামাকরণ করেন। তাঁহার যত্নে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নানা জাতীয় লোক আসিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করিতে থাকে।

নিধিপতি ভট্টাচার্য্যের পুত্র ভূধর ভট্টাচার্য্য। ভূধর ভট্টাচার্য্যের ভাস্কর, পুষ্কর ও প্রভাকর নামে তিন পুত্র ছিলেন। (কোন কোন প্রাচীন হস্তলিপি মতে ভাস্কর, পুষ্কর ও প্রভাকর ভট্টাচার্য্যগণ ভূধর ভট্টাচার্য্যের প্রপৌত্র পুত্র।) পুষ্কর ও প্রভাকর ভট্টাচার্য্য দ্বয় ইটা পরগণার পূর্ব্ব সীমাস্থ ব্রহ্মচাল পরগণার অধিকারী হইয়া তথায় বাসস্থান পরিবর্ত্তিত করেন। তাঁহাদের বংশীয়েরা অদ্যাপি ভূধ্যধিকারী রূপে চৌধুরী, শিকধার নামে নন্দনগর, সীঙ্গুর, গুড়াভূই, উত্তর ভাগ ও বড়কাফন প্রভৃতি স্থানে সসম্মানে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক ব্রহ্মচাল পরগণার নন্দনগর মৌজাধিবাসী প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বোক্ত প্রভাকর ভট্টাচার্য্যের বংশীয় জনৈক বি, এ।

ভাস্কর ভট্টাচার্য্যের পুত্র শুভরাজ মান্ (শুভঙ্কর ?) ইটা পরগণার পঞ্চগ্রাম মৌজায় তৎখাত একটী দীর্ঘিকা আজও "সুরাজখার দীঘি" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্র ভান নারায়ণ। ইনিই সর্ব্ব প্রথমে "রাজা" উপাধি লাভ করেন। একদা চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরা নামক ত্রিপুরা রাজের জনৈক পার্ব্বতীয় প্রজা স্বদলসহ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, ত্রিপুরাধিপতি প্রেরিত সৈন্যের সাহায্য ভানু নারায়ণ, চন্দ্রসিংহকে বন্দী অবস্থায় ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব রাজধানী উদয়পুরে উপস্থিত করেন। ইহাতে মহারাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভানু নারায়ণকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং মনুকূল প্রদেশের অধীশ্বর করিয়াছেন। রাজা ভানু নারায়ণ উদয়পুর হইতে প্রত্যাগত হইয়া একটী দীর্ঘিকা খনন পূর্ব্বক তৎপশ্চিমে নূতন বাসস্থান নির্ণয় করেন। রাজ বাড়ীর চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। দক্ষিণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত রাজনগর থানা উক্ত রাজ বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত। রাজার আবাস ভূমিই রাজনগর বলিয়া পরিচিত।

সুবোধ নারায়ণ, ধর্ম্মনারায়ণ, রামনারায়ণ ও রূপনারায়ণ নামে রাজা ভানু নারায়ণের চারি পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে

রূপ নারায়ণ কৈশোরেই মানবলীলা সংবরণ করেন এবং জ্যৈষ্ঠ সুবোধ নারায়ণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবশিষ্ট সহোদর সহ কিয়ৎকাল রাজ্যভোগ করেন। ইটা পরগণার পূর্ব্ববর্ত্তী বাড়ুয়া পাহাড়ে রাজা সুবোধ নারায়ণের দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বরদানাম্নী কন্যাখ্যাত রাজবাড়ীর দক্ষিণস্থ দীর্ঘিকা এখন "বল দা (বরদা) সাগর" বলিয়া প্রসিদ্ধ রাজা সুবোধনারায়ণ তাঁহার একটী কন্যাকে কাত্যায়ন গোত্রীয় রঘুপতি ভট্টাচার্য্যের সহিত বিবাহ সূত্রে বদ্ধ করিয়া পাচ গাঁও, ভূমিউড়া, পশ্চিমভাগ, সুরানন্দ ও এওলাতলী নামক পাঁচখানি গ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উক্ত কাত্যায়ন বংশীয়েরা সুখ্যাতির সহিত বাস করিতেছেন। রাজা সুবোধ নারায়ণ নিজ বাড়ী স্থানান্তরিত করার মানসে ইটা পরগণার প্রসিদ্ধ "সাগর দীঘি" খনন করাইয়া তাহার পশ্চিমে প্রকাণ্ডবাড়ী প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করেন। ঐ বাড়ীর চারি দিকের গড়ের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি সম্প্রতি ঘড়াও (গড়গ্রাম) বলিয়া পরিচিত। "সাগর দীঘি" পদ্মবন সুশোভিত হইয়া আজও তাহার কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতেছে। কিন্তু ভবিষ্যমান দুর্ঘটনা নিবন্ধন তিনি স্বীয় ভদ্রাসন স্থানান্তরিত করণে পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই। এবং ঐ দুর্ঘটনাই রাজা সুবোধ নারায়ণ তৎপূর্ব্বপুরুষ নিধিপতি ভট্টাচার্য্যের বংশের পরিচায়ক হওয়ার এক মাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়।

একদা রাজা সুবোধ নারায়ণ মধ্যাহ্নকালে স্বীয় বিষ্ণু মন্দিরে সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় মুর্শিদাবাদের পাঠান বংশীয় জনৈক খওয়াজওসমান খা নানা স্থান জয় করার পর হঠাৎ সসৈন্যে রাজবাড়ী আক্রমণ করে। এরূপ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া রাজা নিরুপায় ভাবিয়া পূজা মণ্ডপেই রাজোপাধির সহিত স্বকীয় জীবনের পরিসমাপ্তি করেন। ধর্ম্ম নারায়ণ স্ত্রী পুত্রাদিসহ গুপ্ত পথে পলাইয়া দক্ষিণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছয়গিরি পরগণার চৈত্র ঘাট মৌজার পশ্চিমের জঙ্গলে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। কিন্তু রামনারায়ণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বোধ হয়, ভ্রাতৃবিরোধই এই অনর্থপাতের মূল কারণ।

মুসলমানগণ রাজবাড়ী প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রনারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ, শিবনারায়ণ ও বিষ্ণুনারায়ণ নামক সুবোধনারায়ণের চারি জন অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রব্যতীত রাজপরিবারের অন্য কাহাকেও না পাইয়া বাড়ী লুণ্ঠন করতঃ তাহাদের জাতিধ্বংস করিয়া ক্রমে জামাল খাঁ, কামাল খাঁ, হাজি খাঁ ও ইছা খাঁ নামকরণ করে। জামাল খাঁ ও কামাল খাঁ নিঃসন্তান অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন। অপর দুই জনের সন্তানাদি মধ্যে ইটা পরগণাস্থ স্বনামখ্যাত সদাশয় জমিদারের দেওয়ান শ্রীযুক্ত আবদুল আলেক চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতিই বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত বাস করিতেছেন। ইটা পরগণার শ্রীসূর্য্য মৌজার নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে খাওয়াজওসমানের নির্ম্মিত একটী দুর্গ এখনও "খাওয়াজওসমানের গড়" বলিয়া পরিচিত আছে।

দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর খাওয়াজওসমানের দৌরাত্ম্যের বিষয় অবগত হইয়া সুজাৎখাঁ নামক একজন সেনাপতিকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। সেনাপতি উৎপীড়ন-

কারীকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়া বিজিত ভূভাগ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করতঃ হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বহুমূল্যের দ্রব্য লইয়া প্রস্থান করেন। এই বিবরণ পারস্য ভাষায় লিখিত "একবাল" নামক জাহাঙ্গীরি পুস্তকেও "তারিখ ফিরিস্থা" নামক ইতিহাসে সংক্ষেপে উক্ত আছে।

মুসলমান রাজত্বকালে সকল পরগণাতেই খ্যাতনামা প্রতাপশালী জমিদারেরা শাসন সংরক্ষণের জন্য "চৌধরাই" সনন্দ লাভ করেন, তদবধি রাজা সুবোধ নারায়ণের বংশীয়েরা চৌধুরী উপাধি ধারণে সসম্ভ্রমে বাস করিতেছেন।

ধর্ম্মনারায়ণ কিছুদিন পরে ছয় চিরি পরগণার স্বপ্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুর মৌজায় মানস সরোবর সদৃশ সুবিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করিয়া তৎপশ্চিম চৈত্র ঘাটস্থ স্বীয় বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি অশেষ প্রতিপত্তির সহিত তথায় অবস্থিত। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী মহাশয়দ্বয় বি, এ,উপাধি লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্মনারায়ণ-প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা কীর্ত্তিবানের অতীত সাক্ষীস্বরূপ আজও সুনির্ম্মল সুপেয় দানে "ধর্ম্মনারায়ণ" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

শ্রীহট্টের অন্যান্য ভূমির সহিত রাজা সুবোধ নারায়ণের অধিকৃত ভূমি ইংরেজাধিকৃত হইলে ত্রিপুরাধিপতি উক্তভূমি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ-দত্ত সম্পত্তি বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু মুসলমানগণ রাজা সুবোধ নারায়ণকে স্বাধিকার চ্যুত করিলে ত্রিপুরাধিপতি কোন আপত্তি করেন নাই, এবং ইংরাজগবর্ণমেণ্ট মুসলমানদেরই নিকট হইতে ইহা অধিকার করিয়াছেন,—এই বলিয়া ত্রিপুরারাজের দাবী অগ্রাহ্য হয়। এই মোকদ্দমার আদেশপত্রে রাজা সুবোধ নারায়ণের বিবরণ লিখিত আছে।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুর নিবাসী খ্যাতনামা বাৎস্যগোত্রধুরন্ধর সঙ্গতিপন্ন কৃতী পুরুষ শ্রীযুক্ত হরসুন্দর তর্করত্ন মহাশয়ের অনুগ্রহ লিপিতে জানিতে পারিলাম, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ স্বর্গীয় কাশীরাম ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় অকৃতদার অবস্থায় যবনপীড়িত হইয়া শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ইটা পরগণাস্থ নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ নবাব বাড়ীর নিকট গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। তৎকালে মুর্শিদাবাদ নবাবের শাসনাধীন উক্ত সেরপুরের গাজী নামক প্রবল প্রতাপান্বিত লম্পট জমিদার স্বীয় কর্ম্মচারী জনৈক রমাই মজুমদারের পরমাসুন্দরী কন্যা লাভে বিফল-মনোরথ হওয়াতে স্বহস্তে রমাইর জীবনান্ত করিয়া নিজ জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে। রমাইর অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র রামনাথ মজুমদার তাহার প্রাচীন ভৃত্যের পরামর্শে পিতৃবধের প্রতিকার-পরায়ণ হইয়া মুর্শিদাবাদ নবাবের বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত ক্রমে জননী ও প্রভুভক্ত ভৃত্য সহ নবাব বাড়ীর নিকটে বাস করিতে থাকেন। তখন উক্ত কাশীরাম ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নায়ী ও জপপূজা-পরায়ণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি রামনাথ ও ভৃত্যের অচলা ভক্তি জন্মে। পরে তাৎকালিক বিচার পদ্ধতির মহিমায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলেও, অভিযোগের কোন ফলাফল জানিতে না পারিয়া, তাহারা তাহাদের মঙ্গলার্থ শান্তিস্বস্ত্যয়ন করার জন্য ন্যায়

লঙ্কার মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। তিনি প্রথমে অস্বীকৃত হইলেও অবশেষে তাহাদের আর্ত্তনাদ ও নির্ব্বন্ধাতিশয্যে দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদের মঙ্গল চেষ্টায় প্রতিশ্রুত হন। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই নবাববাহাদুর বিচারালয়ে রামনাথের তলব লয়। রাম নাথ নবাব কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া স্বীয় ভৃত্যের পূর্ব্বপরামর্শানুসারে পিতৃহন্তার জীবনের পরিবর্ত্তে সমুদয় সম্পত্তি প্রার্থনা করেন। তদনুসারে গাজীর জমিদারী সেরপুর পরগণা রামনাথের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ার আদেশ হয়। রামনাথ মজুমদার এইরূপ অভাবনীয় শুভ সংঘটনে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভক্তি ভরে অনেক স্তব স্তুতিতে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে সন্তুষ্ট করেন এবং তৎসন্নিধানে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজ জমিদারী হইতে ব্রহ্মোত্তর প্রদান পূর্ব্বক বিশেষ প্রযত্নে তাঁহার সেরিগ্রামে বাস করার প্রবৃত্তি জন্মাইতে সক্ষম হন। তদবধি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বংশীয়েরা সেরিগ্রামে প্রভূত প্রতিপত্তির সহিত বাস করিতেছেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে অনুমান হয় যে,উক্ত কাশীরাম ন্যায়ালঙ্কার রাজা সুবোধ নারায়ণের কনিষ্ঠ পলায়িত রামনারায়ণেরই নামান্তর, অথবা তাঁহারই কোন বংশধর। যে হেতু অতি পূর্ব্বে সুবোধ নারায়ণের বংশীয় ব্যতীত বাৎস্য গোত্রীয় অন্য কোন ব্রাহ্মণ বংশ ইটা পরগণায় ছিলেন না।

ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে; প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইলেও নিধিপতি ভট্টাচার্য্যের বংশধরেরা শাস্ত্রালোচনা করিয়া জ্ঞান লাভ করতঃ ঈশ্বর চিন্তায় কালযাপন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বস্তুতঃ অনেকেই সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। সুতরাং রাজ সহোদর রামনারায়ণের (বা কাশীরামের) "ন্যায়ালঙ্কার" উপাধি থাকা বিচিত্র নহে।

শ্রীযুক্ত হরসুন্দর তর্করত্ন মহাশয় আরও বলেন যে, বগুড়াতে তাঁহাদের এক ঘর জ্ঞাতি আছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সপিণ্ডতা নাই; অথচ তাঁহার কোন্ পূর্ব্ব পুরুষ বগুড়াবাসী হন, তাহাও তিনি জানেন না।

যে হিন্দুকুলতিলক রাজবংশের প্রসাদে অরণ্যসঙ্কুল শ্রীহট্টে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রসার হইয়াছে, সেই পুণ্যশ্লোক ত্রিপুরারাজবংশ স্বকৃতকীর্ত্তির সহিত অক্ষুণ্ণ থাকিয়া চিরদিন দেশহিত ব্রতে রত থাকুন, প্রবন্ধাবসানে ইহাই মঙ্গলময় সন্নিধানে নির্ব্বন্ধ প্রার্থনা।

উপসংহারে সানুনয় নিবেদন এই যে, কোন স্বদেশানুরাগী প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা সুবোধ নারায়ণের বংশের এতদতিরিক্ত বিশেষ বিবরণ প্রমাণ সহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে চিরবাধিত হইব।

শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী।

সাবিত্রী তত্ত্ব।

চন্দ্রনাথ বাবু সাহিত্য সংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার প্রণীত সাবিত্রী-তত্ত্ব পড়িতে বড় আগ্রহ হইয়াছিল। পুস্তকখানি পড়িবার পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে তৎসম্বন্ধে দু একটী ভাল মন্দ সমালোচনাও পড়িয়াছিলাম। তাহা আমার আগ্রহের "পরিবর্দ্ধক ও তীব্রতা-

সাধক" হইয়াছিল। অত আশা করিয়াছিলাম বলিয়াই কি এত নিরাশ হইয়াছি?

আমার একটি বন্ধু একখানি বিখ্যাত সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক। সংবাদপত্রে দু চারিবার যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া আমার মনে একটা খটকা লাগে। বন্ধুকে এক পত্র লিখি। উত্তরে বন্ধু লিখিয়াছিলেন "সংবাদপত্রে যাহা লিখি, তাহা যে আমার মত, আপনাকে কে বলিল? আমি দোকান করিতে বসিয়াছি, যাহা বিকায় তাহা প্রস্তুত করি, লোকে যাহা চায়, আমি তাহা যোগাই।" বস্তুতঃ সংবাদ পত্র ও সংবাদ পত্র আছে। কোন সংবাদ পত্রে লেখকের মত প্রকাশ হয়। সম্পাদক আপন মতের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়া সাধারণকে সেই মত গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। দ্বিতীয় প্রকারের পত্রে পাঠকের ভ্রম নিরাকরণ করিবার বা তাঁহাকে উচ্চমত শিখাইবার ভাণ বা প্রয়াস নাই। লোকে যাহা বলে, দ্বিতীয় প্রকারের পত্রে তাহাই প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের সংবাদ পত্র পাঠকের মুখপাত্র, প্রথম প্রকারের পত্র সম্পাদকের মুখপাত্র। উভয় প্রকারের পত্রেরই আবশ্যকতা আছে। প্রথমটি শিক্ষক, দ্বিতীয়টী দূত। তুমি হয়ত বলিবে, প্রথমটীর গৌরব অধিক, আমি বলি, দ্বিতীয়টীর আদর অনেক।

কিন্তু সম্পাদকের দৌত্যকার্য্য আদরণীয় হইলেও, গ্রন্থকারের শিক্ষকতা কার্য্য অবশ্য প্রতিপাল্য। গ্রন্থকার ভাটের কার্য্য গ্রহণ করিলে সমাজের সমূহ বিপদ ঘটে। চন্দ্রনাথ বাবু বিজ্ঞ, সুপণ্ডিত ও সুলেখক। সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে তাঁহার প্রয়াস আছে। অন্যে না বলুক, আমি বলি, সে কার্য্য করিতে তাঁহার অধিকারও আছে। সাবিত্রী-তত্ত্ব সমাজের মঙ্গলের জন্য রচিত। এ গ্রন্থ পড়িয়া লোক সমাজের, না হয় বলিলাম হিন্দু সমাজের, কতদূর মঙ্গল হইবে, আমি কেবল সেই কথারই আলোচনা করিব।

এখন "আর্য্যামির" যুগ। গ্রন্থকার আর্য্যামি দেখাইয়া গ্রন্থখানি আরম্ভ করিয়াছেন।

একটা পুরাতন কথা বলি। অনেক দিন হইল, মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণী আপিশে অক্ষয়কুমার সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সেখানে গিয়াছিলাম। তখন শশধর তর্কচূড়ামণি দেখা দিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর ওখানে যাইয়া দেখিলাম, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে কথা হইতেছে। বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিধবা বিবাহের অনুকূলে, অক্ষয় বাবু, ইন্দ্রবাবু, চূড়ামণি প্রতিকূলে, একটু অবসর পাইয়া আমি চূড়ামণিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"যাহা ছিল তাহাই? না ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া লইতে হইবে? দু চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখনকার দিনে তাহা কি চলিবে?" চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন "ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া লইতে হইবে।" তখনও বঙ্কিম বাবুর সহিত চূড়ামণির মতান্তর ঘটে নাই। অভ্যুত্থানকারীরা দুই দলে বিভক্ত হন নাই। ইন্দ্রনাথ চূড়ামণির কথায় সায় দিলেন না। "ছাঁটিবে ছুঁটিবে কে? সুতরাং যাহা ছিল, ঠিক তাহাই লইতে হইবে।" ছাঁটিবার আবশ্যকতায় কাহারও সন্দেহ ছিল না, উপযুক্ত রাঁধুনীর অভাবেই কাঁচা তরকারী খাইতে হইবে।

চন্দ্রনাথ বাবু হিন্দু আচার পদ্ধতির পক্ষপাতী। তিনি বোধ হয় বঙ্কিম বাবুর দলের, ঠিক বলিতে পারিতেছি না। প্রথমেই

তিনি ভণিতা করিয়াছেন যে "ইউরোপীয়দিগের প্রথম দৃষ্টি শরীরের উপর, হিন্দুর প্রথম দৃষ্টি স্বভাব প্রকৃতির উপর।" উদাহরণঃ—"সাবিত্রীর জন্ম হইল। ব্যাস বলিলেন তিনি "রাজীবলোচনাম" অর্থাৎ কমললোচনা।" গ্রন্থকারের মতে কমললোচনা স্বভাব প্রকৃতির পরিচায়ক। আবার "দুর্য্যোধন ভূমিষ্ঠ হইল, ব্যাস বলিলেন, দুর্য্যোধন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই গর্দ্দভ সদৃশ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিল।" সন্তান লাভের জন্য হিন্দুরা কার্ত্তিক পূজা করে, পুরাণ কথা শুনে, মা বাপ ভাই বোনের মঙ্গলের জন্য ছোট ছোট মেয়েরা যমপুকুর পুণ্যপুকুর করে। "এ বিশ্বাস সমূলক কি অমূলক, তাহার বিচার বা মীমাংসা বড় সহজ নহে।" "কিন্তু এ বিশ্বাস বড় গভীর, এইরূপ বিশ্বাসের গভীরতায় তাহা হওয়া অসম্ভব নয়।" বিশ্বাস গভীর হইলে অসম্ভব সম্ভাবনা হইতে পারে—চন্দ্রনাথ বাবু এই কথা বলিয়াছেন—"শুদ্ধ শারীরিক সামর্থ্যে বা শরীরের ধর্ম্মে যাহা অসাধ্য, মানসিক সামর্থ্যে বা ধর্ম্মবলে তাহা সাধিত হওয়া সম্ভব।" বন্ধ্যার সন্তান হয়, মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করে, মরা মানুষ ফিরে আসে ইত্যাদি। পরকালে সদ্গতি লাভ হইবে বিশ্বাস করিয়া খন্দ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতি বৃদ্ধ জরাজীর্ণ পিতা মাতাকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে। চীনেরা মৃত কুমার কুমারীর বিবাহ দিবার জন্য কাগজে দুই জনের ছবি আঁকিয়া একত্র করিয়া পোড়ায়। তাহাদেরও চিত্তের একাগ্রতা,—দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, সাত্ত্বিকতা থাকে "অনেক স্থলে" তাহাদের উদ্দেশ্য "সাধিত হয় কি না? প্রশ্নটী গুরুতর। কাপালিক কর্ত্তাভজা প্রভৃতির বিশ্বাসের একাগ্রতা যথেষ্ট আছে। যে বিশ্বাসে একাগ্রতা থাকিবে, তাহাই মঙ্গলপ্রদ কি না, এ কথার মীমাংসা হওয়া উচিত। বিশ্বাস করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই ভাল, এরূপ মতের প্রচার হইলে হিন্দু সমাজ কেন, কোন সমাজ একদিন বাঁচিতে পারে না, ঠগ, ডাকাইত, তাহাদেরও একাগ্র বিশ্বাস আছে। ব্যভিচারী ও অনাচারী ও একটা কিছু বিশ্বাস করিয়া কুকার্য্য (?) করে। তোমার মঙ্গল হইবে বলিয়া তোমাকে হত্যা করিলে আমার অপরাধ হইবে না; ইগ্নেসিয়স্ লয়লার শিষ্যেরাও এমন ভয়ানক মত প্রচার করিতে সাহসী হয় নাই। কল্পনার গোলাপী নেশায় কবিতার সৌন্দর্য্য সাধন করে কিন্তু সমাজশাসনে কল্পনার ঢুকুঢুকু আরম্ভ হইলে সমাজের সর্ব্বনাশ হয়। এ সম্বন্ধে আর একটী কথার আলোচনা করিব। কার্ত্তিক পূজা, যমপুকুর কি পুণ্যপুকুর করায় বা পুরাণ কথা শোনায় ভাবের উৎকর্ষ হয়। ভাবের উৎকর্ষ সাধনে এ রকমের কার্য্য প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে আজ কাল ইহারা সে কার্য্য সাধনেও সক্ষম নহে। কার্ত্তিক এখন বারবনিতার আশ্রয় লইয়াছেন, পুরাণ কথা বারোয়ারী তলায় স্থান পাইয়াছে। যদি কেবল ভাবের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই প্রকার কার্য্যগুলির আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ইহাদের অপেক্ষা যাহারা অধিকতর ফলপ্রদ, ইহাদিগের স্থানে তাহাদিগকে গ্রহণ করা উচিত কি না, ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু ভাবের উৎকর্ষের জন্য কার্ত্তিক পূজা করিবেন না। বন্ধ্যার সন্তান হইবার জন্য তিনি কার্ত্তিক পূজার ব্যবস্থা করেন। থিয়সফি বা মার্কিন ব্রহ্মবিদ্যা হিন্দুয়ানীর স্যান্সেনী ব্যবস্থা করা অবধি

হিন্দুধর্ম্ম একটা নেবুলস অবস্থা লাভ করিয়াছে। কেহ বা যেখানে যুবক যুবতীকে প্রণয় সম্ভাষণে প্রবৃত্ত দেখেন, অপরে সেখানে দীর্ঘশ্মশ্রু তপোধনকে ধ্যানগত অবলোকন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ হিন্দু ভিন্ন কাহারও এ বিশ্বাস নাই, কি ও বিশ্বাস নাই, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের উদাহরণ দিয়া এরূপ অহঙ্কার করিলে বাজারে লোকের কাছে সং সাজা হয় মাত্র। ইহাতে অর্থ ও আদর ও লাভ হয়, কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর কাছে এরূপ আচরণ আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

চন্দ্রনাথ বাবুর আর্য্যামির আর একটী পরিচয় দেই। চন্দ্রনাথ বাবু বলিতেছেন যে, সন্তানোৎপাদন ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া হিন্দুরা জানে এবং ধর্ম্মকার্য্য করিতে তাহারা যেরূপ সংযত হয়, সন্তানোৎপাদন কার্য্যও সেইরূপ সাধু ও সংযত চিত্তে করিয়া থাকে, তাই হিন্দুরা এমন সাধু ও মনিষী সন্তান উৎপাদন করিতেছেন যে, আমাদের সন্তান দেখিয়া সমস্ত ইউরোপ মহাশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। আর ইউরোপের লোকে অসংস্কৃতভাবে শারীরিক শক্তি নিয়োগ করিয়া সন্তান উৎপাদন করে, তাই ইউরোপে কেবল ষণ্ডামার্ক জন্মিতেছে। অর্থাৎ হিন্দুর সন্তান অধিকাংশ দেবতা, ও ইউরোপীয়ের সন্তান অধিকাংশ অসুর। চন্দ্রনাথ বাবু ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া তথাকার বিভিন্ন জাতির সামাজিক রীতিনীতি চর্চ্চা করিয়া এ কথা বলিয়া থাকিবেন। তাঁহার মত আমাদের অভিজ্ঞতা নাই এবং ইউরোপীয় অসুরের নিকট তিনি যত শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়াছেন, আমরা তত করি নাই। তাঁহার এই একটা কথাতেই প্রমাণ হইয়াছে, হিন্দু কিরূপ সাধু ও মনিষী সন্তান উৎপাদন করিতেছেন, যাহা দেখিয়া সমস্ত ইউরোপ মহা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ চন্দ্রনাথ বাবুর অবিবেচনার যথোচিত নিন্দা করা যায় না।

চন্দ্রনাথ বাবুকে আমি সম্মান করি। তাঁহার সম্বন্ধে এমন কঠোর কথা সকল লিখিতে কষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহার আর্য্যামি অতি প্রবল হইয়াছে এবং তাহা দ্বারা সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া আমাকে এমন তীব্র সমালোচনা করিতে হইতেছে। সাবিত্রীর বধূত্ব, পাতিব্রত্য প্রভৃতি অধ্যায় তিনি এত গুণপণার সহিত লিখিয়াছেন যে, তাহাতে সমাজের প্রকৃতই মঙ্গল হইবে। হিন্দু সমাজের গুণাগুণের কথা বলিতে অন্য সমাজের সহিত তুলনা করিবার প্রয়োজন সামান্য ছিল। ইউরোপীয় সমাজের কথা তিনি অল্পই জানেন এবং অল্প শিক্ষিত সাধারণ লোকের ন্যায় ইউরোপীয় সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতি কুৎসিত। তিনি মনে করেন, ইউরোপীয় মহিলার পতিপ্রেম ধর্ম্মমূলক নহে। তিনি বলেন, "যে সকল সমাজে অধিক বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়, তথায় বিবাহের পূর্ব্বে অনেক রমণী যে এক বা একাধিক পুরুষের অভিলাষিণী হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে, বোধ হয়, সন্দেহ হইতে পারে না।" এইরূপ অনেক কুৎসিত কথায় চন্দ্রনাথ বাবুর সাবিত্রী-তত্ত্ব কলঙ্কিত হইয়াছে। এ গুলি না থাকিলে গ্রন্থখানি বড়ই সুন্দর হইত। ইংরাজের নিন্দা এখন বাঙ্গালীর বড় ভাল লাগে। চন্দ্রনাথ বাবুও সেই স্রোতে ভাসিয়াছেন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

নীতির মূলতত্ত্ব কি ?

এই অন্ধকারময় সংসারারণ্যে আলোক কোথায় ? এই মহাসমুদ্রে জীবনপোতে দিগ্‌দর্শন শলাকা কি ? জ্ঞানই আলোক। বিবেকই দিগ্‌দর্শন শলাকা।

জ্ঞান কাহাকে বলে ? সত্যের ধারণা। বিবেক কি ? অনেকে মনে করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসাহিত্যে বিবেক শব্দ যেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা উহার প্রকৃত অর্থ নহে। এক্ষণে ইংরেজী conscience শব্দের প্রতিশব্দরূপে বিবেক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে বিবেক শব্দ ঐ প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। আর্য্যশাস্ত্রে বিবেক শব্দের অর্থ, সংসার মিথ্যা, ঈশ্বর সত্য, ইত্যাকার জ্ঞান।

ইহা প্রকৃত কথা নহে। আমাদের অধ্যাত্ম শাস্ত্রে তিন প্রকার অর্থে বিবেক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম, নিত্যানিত্য বিবেক অর্থাৎ নিত্য বস্তু কি, এবং অনিত্য বস্তুই বা কি, ইহার ভেদ জ্ঞান। দ্বিতীয়, আত্মানাত্ম বিবেক। অর্থাৎ আত্মা কি, এবং অনাত্মা কি, ইহার ভেদ জ্ঞান। তৃতীয়, ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক। অর্থাৎ ধর্ম্ম কি ও অধর্ম্ম কি, ইহার ভেদজ্ঞান। এখন দেখুন, এই তিন প্রকার বিবেকের মধ্যে, তৃতীয় প্রকার বিবেক, ইংরেজী conscience শব্দের অর্থের সহিত মিলিতেছে কি না ? যাঁহারা বলেন, conscience শব্দের প্রতিশব্দ রূপে বিবেক শব্দ ব্যবহার করা ভুল, তাঁহাদের কথা সম্পূর্ণ ঠিক্ বলিয়া মনে হয় না। তবে, কেবল বিবেক না বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক বলিলে কথাটা সম্পূর্ণ হয় বটে। ধর্ম্মবুদ্ধি শব্দও ইংরেজী conscience শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ধর্ম্মবুদ্ধি শব্দের ঐ প্রকারই অর্থ, এবং ঐ প্রকার অর্থেই উহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

বিবেক স্বাভাবিক ; তবে নৈতিক বিষয়ে মতভেদ কেন ?

এই যে বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি, ইহা মানবপ্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবতঃ বর্ত্তমান। এ কথায় সচরাচর এই আপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে যে, যদি বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে নৈতিক বিষয়ে মানুষের মধ্যে এত মতভেদ কেন ?

মতভেদ আছে সত্য। মতভেদের কারণ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রথম কথা এই যে, কোন একটা বিষয় স্বাভাবিক হইলেই যে, সে বিষয়ে মতভেদ থাকেনা, এমন নহে। কোন বিষয়ে মতভেদ থাকিলেই তাহার অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয় না। কোন বিষয়ে মতভেদ হইলেই যে, বিষয়টা মিথ্যা বা অমূলক, এরূপ সিদ্ধান্ত কখন যুক্তিযুক্ত নহে।

বিবেক ও সৌন্দর্য্যবোধ।

এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সৌন্দর্য্যবোধ স্বাভাবিক। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সৌন্দর্য্য বোধ দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ সে বিষয়ে মতভেদও দৃষ্ট হয়। চীন দেশীয়েরা মনে করেন যে, স্ত্রীলোকের পক্ষে ছোট পা সৌন্দর্য্যের লক্ষণ। অথচ আমরা কখন সেরূপ মনে করি না। যাহাতে পা

বড় হইতে না পারে, সেই জন্য তাঁহারা অল্প বয়সে স্ত্রীলোকদিগকে লৌহনির্ম্মিত পাদুকা পরাইয়া দেন। ইংরেজেরা মনে করেন যে, লম্বা গলা ও কটা চক্ষু হইলে নারীজাতির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। আমাদের স্ত্রীলোকদিগের যদি হাঁসের ন্যায় লম্বা গলা এবং বিড়ালের ন্যায় কটা চক্ষু হয়, তাহা হইলে কি আমরা তাহাদিগকে সুন্দরী দেখি? এখন দেখুন, সৌন্দর্য্য বোধ যে স্বাভাবিক, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। উহার স্বাভাবিকত্ব কেহ অস্বীকার করেন না। অথচ সৌন্দর্য্যবোধ সম্বন্ধে কত মতভেদ রহিয়াছে।

নৈতিক বিষয়ে মতভেদের কারণ।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, নৈতিক বিষয়ে এত মতভেদ কেন? মতভেদের তিনটি প্রধান কারণ। প্রথম, আংশিক দৃষ্টি। দ্বিতীয়, নৈতিক অবনতি। তৃতীয়, ধর্ম্মবুদ্ধির অবিকশিত অবস্থা।

প্রথম, আংশিক দৃষ্টি যে মতভেদের একটি কারণ, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কোন ব্যক্তি দূর হইতে দেখিলেন যে, দুই জন লোক একটি শিশুকে বলপূর্ব্বক ধরিয়াছে, আর এক জন উহার উরুদেশে তীক্ষ্ণাস্ত্র বিদ্ধ করিয়া দিতেছে। শিশুটি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছে। এই ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিয়া সেই ব্যক্তির বড়ই ক্রোধ হইল। শিশুটিকে উহাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় গিয়া শুনিলেন যে, ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন শিশুর পিতা, আর একজন তাহার 'পিতৃব্য'; আর যিনি শিশুর উরুদেশ অস্ত্র বিদ্ধ করিতেছিলেন, তিনি একজন ডাক্তার। শিশুর উরুদেশে স্ফোটক হইয়াছে বলিয়া তিনি অস্ত্রচিকিৎসা করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তির ক্রোধ একেবারে চলিয়া গেল। তিনি সকলই বুঝিতে পারিলেন।

এখন দেখুন, ঐ ব্যক্তির যে ক্রোধ হইয়াছিল, উহা আংশিক দর্শনের ফল। আংশিক দর্শনে প্রকৃত কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং ক্রোধ হইল। যখন সকল দিক জানিতে পারিলেন, তখন ক্রোধ চলিয়া গেল। যাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। অনেক স্থলেই, কি নৈতিক বিষয়ে, কি অন্যান্য বিষয়ে, মানুষের মধ্যে মতভেদের একটি প্রধান কারণ, আংশিক দৃষ্টি।

দ্বিতীয়, নৈতিক অবনতি, নৈতিক বিষয়ে মতভেদের আর একটি কারণ। চক্ষুর দোষ হইলে, দর্শন বিষয়ে, মানুষে মানুষে প্রভেদ উপস্থিত হয়। অন্য লোকে যেরূপ দেখে, চক্ষুরোগী সেরূপ দেখেনা। অন্য লোকে যাহা অন্য বর্ণ দেখিতেছে, যাহার ন্যাবা হইয়াছে, সে তাহা হরিদ্রাবর্ণ দেখে। অন্য লোকে যাহা দেখিতেছে, চক্ষুরোগী তাহা ভাল করিয়া অথবা আদবেই দেখিতেছে না।

নৈতিক বিষয়েও সেইরূপ হয়। এক খানি তীক্ষ্ণাস্ত্রকে প্রস্তরের উপর আঘাৎ করিলে কি হয়? তীক্ষ্ণাস্ত্র ক্রমে ক্রমে তাহার তীক্ষ্ণতা হারায়। সেইরূপ পুনঃপুনঃ দুষ্কার্য্য করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির প্রতি আঘাৎ করিলে ধর্ম্মবুদ্ধি ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে, ধর্ম্মবুদ্ধি ক্রমে তাহার তীক্ষ্ণতা হারায়, নীতিসম্বন্ধীয় স্বাভাবিক সহজ জ্ঞান মলিন হইয়া যায়। ধর্ম্মবুদ্ধির সে প্রকার শোচনীয় অবস্থায় মনুষ্য অনেক স্থলে ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না।

তৃতীয় ধর্ম্মবুদ্ধির অবিকশিত অবস্থা, নীতি সম্বন্ধীয় মতভেদের একটি গুরুতর কারণ। ব্যক্তিগত জীবনে বা জাতিগত জীবনে, যদি কোন বিশেষ নৈতিক ভাব বিকশিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে বিষয়ে অন্য উচ্চতর অবস্থার ব্যক্তি বা জাতির সহিত তাহাদের মতভেদ নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে।

এস্থলে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। প্রাচীন গ্রীস দেশে স্পার্টানদিগের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল ও চিররুগ্ন শিশুদিগকে হত্যা করিতেন। উহাকে অসৎ কার্য্য বলিয়া মনে করা দূরে থাকুক, সৎকার্য্য বলিয়াই মনে করিতেন। আমাদের নিকটে উহা মহাপাপ। উহা স্মরণ করিলে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এরূপ মতভেদের কারণ কি? প্রাচীন স্পার্টানদিগের মধ্যে কোন কোন ধর্ম্মভাবের অস্ফুট অবস্থাই ইহার কারণ। জনসমাজকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করাই তাঁহারা অতি মহৎ কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের মহত্ত্ব ভাল বুঝিতেন না। সমগ্র জনসমাজের মঙ্গলের জন্য, ব্যক্তিগত জীবনকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই মনে করিতেন। ব্যক্তিগত জীবনের মহত্ত্ব না বুঝিবার একটি কারণ এই যে, মানবাত্মার অমরত্বে, ও অনন্ত জীবনে, তাঁহাদের বিশ্বাস পরিস্ফুট হয় নাই। সেই জন্য তাঁহারা মনে করিতেন যে, যাহাদের দ্বারা জনসমাজের কোন কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই, যাহারা জনসমাজের কোন প্রকার সেবা করিতে পারিবে না, বরং যাহাদের দ্বারা জনসমাজের কদর্য্যতা ও দুঃখতার বৃদ্ধি হইবে, তাহাদিগকে জনসমাজ হইতে অপসারিত করাই বিধেয়। সেইজন্য তাঁহারা তাহাদিগকে হত্যা করা পাপ বলিয়া মনে করিতেন না।

এইরূপ হত্যা করিবার আর একটি কারণ ছিল। স্পার্টানদিগের ব্যবস্থাপক লাইকরগসের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে একটি যোদ্ধা জাতি করেন। তাঁহার সমস্ত ব্যবস্থারই ঐ এক লক্ষ্য, যাহাতে স্পার্টাবাসিগণ একটি যোদ্ধা জাতি হয়। দুর্ব্বল, চিররুগ্ন, শিশু হত্যারও তাহাই একটি কারণ। দুর্ব্বল, চিররুগ্ন শিশুর পক্ষে যুদ্ধোপযোগী হইবার সম্ভাবনা অল্প, প্রত্যুত তাহাদের দ্বারা জনসমাজের কদর্য্যতা ও দুঃখভার বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। সুতরাং তাহাদিগকে বধ করাই শ্রেয়ঃ। স্পার্টাবাসীগণ ইহাই মনে করিতেন। এ স্থলে কোন কোন উচ্চভাবের অপরিস্ফুট অবস্থা, এবং একটি বিশেষ ভাবের প্রবলতাবশতঃ ঐ ভীষণ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

বিবেকবাণী কিরূপ স্থলে প্রকাশ পায়?

সকল অবস্থাতেই যে বিবেকবাণী প্রকাশ পায়, এমন নহে। গো, মনুষ্য প্রভৃতি বধ করিয়া ঐ ভীষণ ব্যাঘ্র তাহাদিগকে আহার করিতেছে। তজ্জন্য তাহার লেশমাত্র অনুতাপ হয় না। নরহত্যা প্রভৃতিকে সে পাপ বলিয়াই জানে না। বিড়াল যে ইঁদুর ধরিয়া খায়, তাহাতে তাহার কিছুই পাপবোধ নাই, অনুতাপ নাই। কেন এমন হয়? ব্যাঘ্রের প্রবল জিঘাংসা প্রবৃত্তি রহিয়াছে। কিন্তু তাহার এমন কোন বৃত্তি নাই, যাহা

ঐ জিঘাংসার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে। ব্যাঘ্রের জিঘাংসা আছে, কিন্তু দয়া নাই। ব্যাঘ্রের যদি জিঘাংসা ও দয়া উভয় প্রবৃত্তিই থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ কখন কখন প্রাণীবধ করিতে তাহার সঙ্কোচ হইত। কিন্তু ব্যাঘ্রের মনে জিঘাংসার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দয়া প্রবৃত্তি কখন দণ্ডায়মান হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে, দুই প্রবৃত্তির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইত।

বিরোধের অবস্থায় বিবেকবাণী প্রকাশ পায়। যেখানে একটি মাত্র প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, কোন বিরোধী প্রবৃত্তি নাই, সেখানে বিবেকবাণী প্রকাশ হয় না। সেখানে পাপবোধ থাকে না। অসঙ্কোচে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। কার্য্যানুষ্ঠানের পর, আত্মগ্লানির উদয় হয় না। যেখানে উচ্চ ও নিকৃষ্ট, এই উভয় প্রকার প্রবৃত্তির মধ্যে সংগ্রাম, সেখানেই উচিত কি অনুচিত, ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম, এইরূপ বিচার সম্ভব। সেখানেই বিবেকবাণী প্রকাশ হইতে পারে। অন্য স্থলে নহে।

ব্যাঘ্রের জিঘাংসা আছে, দয়া নাই, সুতরাং সেখানে প্রাণীবধের সময় কোন সঙ্কোচ নাই, এবং তৎপরে গ্লানি নাই। কিন্তু মনুষ্যের জিঘাংসা ও দয়া উভয় প্রবৃত্তিই রহিয়াছে। সুতরাং মনুষ্যের পক্ষে, জীবহত্যা করিবার সময় সঙ্কোচ ও আন্দোলন, এবং তৎপরে আত্মগ্লানি সম্ভব। মনুষ্যের পক্ষে, হত্যা কার্য্য করিবার সময় বিবেকবাণী প্রকাশ হওয়া সম্ভব। সেক্ষপিয়ারের ম্যাকবেথ ইহার কেমন সুন্দর চিত্র। হত্যাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় কেমন সঙ্কোচ ও আন্দোলন, ও তৎপরে কি তীব্র অনুতাপ! এই বিষয়ে মহাকবির মানব চরিত্রের বর্ণনা কেমন সুন্দর! কেমনগভীর!

এই প্রকার উচ্চ ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিরোধের জন্যই আমাদের কার্য্য নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। নতুবা এ সম্ভাবনা থাকিত না। যদি কোন কৃপাপাত্র নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে ক্রোধান্ধ হইয়া প্রহার করি, তবে উহা অতিশয় নিন্দনীয়। কেননা আমি এস্থলে দয়া ও ন্যায়ের উচ্চ অধিকারকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছি। যদি প্রচুর অন্ন সত্ত্বেও আমি কোন দুর্ভিক্ষপীড়িত মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে অন্ন না দিয়া নিজে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করি, তাহা যারপরনাই নিন্দনীয়, কেননা এস্থলে আমি আমার উচ্চতর প্রবৃত্তিকে অধিকার-চ্যুত করিয়াছি। এই জন্যই সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মার্টিনোর মতে, আমাদের মনোবৃত্তি সকলের আপেক্ষিক উচ্চতানীচতাবোধনিবন্ধন বিবেকবাণী সম্ভব।

বলিয়াছি যে, নৈতিক মতভেদের তৃতীয় কারণ, নৈতিক জ্ঞানের অবিকশিত অবস্থা। মার্টিনোর মত ব্যাখ্যা করিবার জন্য যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, উহাতেই নৈতিক অবিকশিত অবস্থা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রাচীন স্পার্টাবাসিগণের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের মর্য্যাদা ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস বহুল পরিমাণে অবিকশিত অবস্থায় ছিল। সেই জন্যই তাঁহাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে বিষয় বিশেষে গুরুতর নৈতিক পার্থক্য।

মানবজাতির ক্রমোন্নতি হইতেছে। কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া মানবজাতির বিকাশ হইতেছে। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধেও বিকাশ হইতেছে। সমগ্র মানবজাতির অন্তর্গত সকল জাতির অথবা সকল বংশের বিকাশ, সকল বিষয়ে

যে, সমভাবে অথবা সমান পরিমাণে হইতেছে, এমন নহে। তবে, ইহা নিশ্চয় যে, গড়ের উপর সমগ্র মানবজাতির উন্নতি বা বিকাশ হইতেছে।

স্পার্টানদিগের রুগ্ন শিশুহত্যা, উহার একটি দৃষ্টান্ত। রুগ্ন শিশুহত্যা যে মহাপাতক, ইহা বর্ত্তমান সময়ে সভ্য জগতে কে না স্বীকার করিবে? রুগ্ন শিশু হত্যার কথা শুনিলে কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়?

এ বিষয়ে আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। দাম্পত্যনীতি এ বিষয়ের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, প্রাচীনতম সময়ে মানবসমাজে দাম্পত্য সম্বন্ধ ছিল না। স্পেন্সরের রচিত সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, মানবজাতির আদিম অবস্থায় দাম্পত্যধর্ম্ম থাকে না। প্রথম, দাম্পত্য সম্বন্ধের অভাব। দ্বিতীয়, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পক্ষেই বহু বিবাহ। তৃতীয়, একপত্নীত্ব ও একপতিত্ব, এইরূপ সোপান পরম্পরায় মানবজাতি দাম্পত্যধর্ম্মে অধিরোহণ করিতেছেন। দাম্পত্য সম্বন্ধ বিষয়ে মানবজাতির এইরূপ ক্রমোন্নতি বা বিকাশ (evolution) হইতেছে। আদিম অবস্থার লোকের মনে বিবাহ সম্বন্ধের ভাব অবিকশিত রহিয়াছে। দ্বিতীয় অবস্থার লোকের মনে বিবাহ সম্বন্ধে একানুগত্যের ভাব অবিকশিত রহিয়াছে। তৃতীয় অবস্থার লোক, বিবাহ সম্বন্ধে একানুগত্য অবলম্বন করিতেছে। সুতরাং এই তিন অবস্থার লোকের মধ্যে দাম্পত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে মতভেদ নিশ্চয়ই থাকিবে। সেই জন্যই বলিয়াছি যে, ধর্ম্ম বা নৈতিক ভাবের অবিকশিত অবস্থা, নৈতিক মতভেদের একটি প্রধান কারণ।

মহাভারতের শ্বেতকেতুর উপাখ্যান দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, প্রাচীন আর্য্য সমাজে এক সময়ে দাম্পত্য সম্বন্ধ যারপরনাই শিথিল ছিল। এখনও দাক্ষিণাত্যবাসী নেয়ার নামক অনার্য্য হিন্দু জাতির মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ, অত্যন্ত শিথিল। সেই জন্য তথায় পুত্রের পরিবর্ত্তে ভাগিনেয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। উক্ত জাতির মধ্যে এক্ষণে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা পুত্রের নামে উইল করিতে বাধ্য হইতেছেন। উইল না করিলে পুত্র বিত্ত হইতে বঞ্চিত হইবে, এবং ভাগিনেয় বিত্তাধিকারী হইবে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা পুত্রের নামে উইল করিতেছেন।

দাম্পত্যনীতি সম্বন্ধে নেয়ার জাতির মধ্যে যে অবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা মানবজাতির আদিম অবস্থার চিহ্ন বলিয়াই বোধ হয়।

এস্থলে এরূপ কেহ মনে করিতে পারেন যে, স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ বিষয়ে যে তিনটি সোপান বা অবস্থার কথা বলা হইল, উহা যুগে যুগে, পরে পরে আসিয়াছে। একটি অবস্থা চলিয়া গেলে আর একটি আসিয়াছে। বাস্তবিক তাহা নহে। ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে একটি অবস্থার পর আর একটি অবস্থা আসে বটে, কিন্তু সকল জাতি, সকল সমাজ ও সর্ব্ব প্রকার মনুষ্যের মধ্যে, সমগ্র মানবজাতিতে সমকালে যে, একটি অবস্থার পর আর একটি অবস্থা আসে, এমন নহে। বর্ত্তমান সময়েই জগতে এই তিন অবস্থার মনুষ্য রহিয়াছে। এমন কি, একই জাতিতে, একই সমাজে,

একই সময়ে বিভিন্ন অবস্থার লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। দাসত্ব প্রথা বিষয়ে মানবজাতির নৈতিক জ্ঞান যে, প্রাচীন কালে অবিকশিত অবস্থায় ছিল, এবং ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। ভারতবর্ষ, মিসর, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে, দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে একটি অক্ষরও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দাসত্ব প্রথা যে অন্যায়, মনুষ্যকে স্বাধীনতাবিবর্জ্জিত করিয়া গো ছাগের ন্যায় নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করা যে অন্যায়, প্রাচীনকালে সভ্যতম দেশ সকলেও, প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মনেও এ ভাবের অভ্যুদয় হয় নাই। মহাত্মা সেণ্টপল একটি ক্রীতদাসকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে আপনার প্রভুর নিকট যাইতে বলিলেন। দাসত্ব প্রথাকে অন্যায় বলিয়া বোধ থাকিলে, তিনি কখনও সেরূপ বলিতেন না।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ব্যক্তিগত জীবনের মর্য্যাদা বোধ, বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহরণ যে অন্যায় ও পাপ, সুসভ্য জগতে সহস্র সহস্র লোক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। এই জন্যই আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে, অসংখ্য মানবের শোণিতস্রোতে এই মহাপাতক বিধৌত হইয়া গেল! এই জন্য রুষরাজ আলেকজান্দারের লেখনীর এক আঁচড়ে চিরক্রীত সার্ফগণ স্বাধীনতা লাভ করিল।

ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, নৈতিক জ্ঞানের অবিকশিত অবস্থা ও তাহার ক্রমবিকাশ, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও বিশেষ বিশেষ জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদের একটি প্রধান কারণ। যাঁহারা বিকশিত নৈতিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত অপর লোকের নৈতিক মতের সামঞ্জস্য কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

বিবেকের মৌলিকত্ব।

নৈতিক বিষয়ে মতভেদের কারণ নির্দ্ধারণ করা হইল। এক্ষণে বিবেকের মৌলিকত্ব বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, তাঁহারা বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধিকে মানবহৃদয়জাত মৌলিক বৃত্তি বা জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা নীতিতত্ত্ব কেমন করিয়া ব্যাখ্যা করেন?

স্বার্থবাদ।

ইঁহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর দার্শনিক স্বার্থবাদ সমর্থন করেন। তাঁহাদের মতে মানুষ সুখ লাভ ও দুঃখ নিবারণের জন্যই সকল কার্য্য করিয়া থাকে। মানবের সকল কার্য্যের লক্ষ্য একমাত্র সুখ। যে কার্য্যে সুখোৎপত্তি, তাহাই উচিত কার্য্য, এবং যে কার্য্যে দুঃখোৎপত্তি, তাহাই অনুচিত কার্য্য।

স্বার্থবাদীরা অনেকেই বলেন যে, মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যের মূল, সুখের লোভ কিম্বা দুঃখের ভয়। সুখ লাভ বা দুঃখ নিবারণ ব্যতীত মনুষ্যের কার্য্যানুষ্ঠানের আর কোন অভিসন্ধি নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহা কি প্রকৃত কথা যে, মানুষ সকল কার্য্যই সুখের জন্য করিয়া থাকে? কখনই না। আমাদের কতকগুলি প্রবৃত্তি স্বতঃই কার্য্য করে। ফলাফল চিন্তার উপরে তাহাদের ক্রিয়া

নির্ভর করে না। ফলোৎপত্তির পূর্ব্বেই তাহাদের ক্রিয়া হয়

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে দুইটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। প্রথম ক্রোধ। যাহার প্রতি ক্রোধ হয়, তাহাকে কষ্ট দিয়া লোকে সুখী হয়। কিন্তু ঐ সুখের কারণ কি? সুখ হইবে বলিয়া ক্রোধ, না, ক্রোধের জন্য সুখ?

এস্থলে কারণ কি ও তাহার কার্য্য কি? সুখের লোভ কারণ, না, ক্রোধ কারণ? নিশ্চয়ই ক্রোধ কারণ। কিসের কারণ? কষ্ট দেওয়াতে যে সুখবোধ হয়, তাহার কারণ। ক্রোধ হয় বলিয়াই মানুষ শত্রুকে কষ্ট দিয়া সুখী হয়। ক্রোধ না হইলে তাহা হয় না। সুতরাং ক্রোধ কারণ, সুখবোধ তাহার কার্য্য।

এখন দেখুন, সুখের লোভে ক্রোধ হয় না, ক্রোধের জন্যই সুখ হয়। সুতরাং সুখকে লক্ষ্য করিয়া মানুষ, সকল কার্য্য করে, এ কথা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

ক্রোধ সম্বন্ধে যেমন, দয়া সম্বন্ধেও সেইরূপ। কোন ব্যক্তির কষ্ট দেখিলে মানুষের দয়া হয়। সেই কষ্ট দূর করিতে পারিলে মানুষ সুখী হয়। এস্থলে সুখের কারণ দয়া। দয়ার চরিতার্থতায় সুখ। দয়া পূর্ব্ববর্ত্তী, সুখ পরবর্ত্তী। দয়ার চরিতার্থতা কারণ, সুখ তাহার কার্য্য। দয়া চরিতার্থ না হইলে সুখ হয় না। যাঁহারা বলেন, সুখকে লক্ষ্য করিয়া আমরা সকল কার্য্য করি, তাঁহাদের কথার অযুক্ততা এস্থলে সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। সুখ হইবে বলিয়া দয়া হয় না, দয়া হয় বলিয়া তাহার চরিতার্থতায় সুখ। এস্থলে সুখের জন্য দয়া হয় বলিলে, কার্য্যকে কারণ ও কারণকে কার্য্য বলা হয়।

আর একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বার্থবাদীদিগের মতের অসারতা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। স্বার্থবাদীরা বলেন, যাহা সুখকর, তাহাই উচিত, এবং যাহা দুঃখকর তাহাই অনুচিত। কিন্তু সুখের ভাব ও নৈতিক ভাব কখনই এক নহে।

একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। সুন্দর পদার্থ ও উপকারী পদার্থ এক নহে। এ দুই ভিন্ন। সুন্দর বলিলেই যে, উপকারী বুঝায়, এবং উপকারী বলিলেই যে, সুন্দর বুঝায়, এমন নহে। মাথাল ফল দেখিতে সুন্দর, কিন্তু তাহাতে মনুষ্যের কি উপকার, তাহা জানি না। সেই জন্য মাথাল ফলকে সুন্দর বলি, উপকারী বলি না।

যেমন, সুন্দর ও উপকারী একার্থবোধক শব্দ নহে, সেইরূপ সুখকর ও উচিত, এই দুই শব্দও একার্থবোধক নহে। সুখকর বলিলে যাহা বুঝি, উচিত বলিলে কি তাহাই বুঝি? কখনই না। এ দুটি শব্দে আমাদের মনে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভাব আসে। এ দুটি শব্দ একার্থবোধক নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে যাহা সুখকর, তাহাই উচিত, এ কথার কোন অর্থ থাকিত না। অর্থাৎ সুখকর ও উচিত এ দুই শব্দের এক অর্থ হইলে, যাহা সুখকর তাহাই উচিত, এই বাক্যের অর্থ হইত, যাহা সুখকর, তাহাই সুখকর। দুঃখকর ও অনুচিত একার্থবোধক শব্দ হইলে, যাহা দুঃখকর, তাহা অনুচিত, এবাক্যের অর্থ হইত, যাহা দুঃখকর, তাহাই দুঃখকর।

তবেই হইল যে, সুখবোধ ও নৈতিক জ্ঞান এক নহে। সুখের ভাব ও ঔচিত্যের ভাব এক নহে। এ দুই ভিন্ন। সুতরাং সুখেচ্ছা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান এক নহে। সুখে-

চ্ছায় কোন কার্য্য করা এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানে কোন কার্য্য করা, এ দুইয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সুখেচ্ছা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান এক হইলে, চোর ও লম্পটের সহিত সাধুর প্রভেদ কোথায়? কেবল সুখেচ্ছার কার্য্য করিলে, উহা কেমন করিয়া নৈতিক কার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য হইবে? যতই কেন অধিক সুখ হউক না, কেবল সুখেচ্ছায় কার্য্য করিলে, উহা ধর্ম্মকার্য্য হইতে পারে না। নৈতিক-বোধ (moral sense) ব্যতীত, নৈতিক কার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য হইতে পারে না। কেবল সুখের ইচ্ছায় কার্য্য করিলে, যদি নৈতিক কার্য্য হয়, তাহা হইলে পোলাও খাওয়া, থিয়েটারে যাওয়া পাসার্থেলা, ম্যাড়ার লড়াই দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যের সহিত নৈতিক কার্য্যের প্রভেদ কোথায়? সুখেচ্ছাপ্রণোদিত এই সকল কার্য্যের সহিত কি নৈতিক কার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য এক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে?

এস্থলে আমাদের মনের ভাব বুঝিতে কেহ যেন ভুল না করেন। আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, সুখ পরিত্যাজ্য। আমরা সেরূপ বিকৃত বৈরাগ্যমতাবলম্বী নহি। পরমেশ্বর মনুষ্যকে সুখ দিয়াছেন, মনুষ্য উহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবে। আমাদের অভিপ্রায় এই যে, কেবল মাত্র সুখলালসা হইতে যে কার্য্য প্রসূত হয়, উহা প্রকৃত ভাবে নৈতিক কার্য্য নহে। যে কার্য্য, ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেকের ফল, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মকার্য্য। প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, পার্থিব বা পারলৌকিক কোন প্রকার সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, কর্ম্মফল প্রত্যাশা না করিয়া, বিশুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধিতে জীবনের কর্ত্তব্যকার্য্য সকল সম্পন্ন করেন। ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্ম। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। সুখের জন্য ধর্ম্ম, ইহা অতি অসার কথা। ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি আছে, যাহার জন্য ধর্ম্মসাধন করা যাইতে পারে? যিনি বলেন, সুখ উদ্দেশ্য, ধর্ম্ম তাহার উপায়, তিনি ধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য কিছুই জানেন না। "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ"। স্বার্থবাদীরা বলেন যে, মানবপ্রকৃতিতে, স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক মত। মানব প্রকৃতিতে স্বার্থপরতা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান, কে এ কথা অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে নিঃস্বার্থ ভাবও যে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ সত্য। স্বার্থ ও পরার্থ, এই উভয় প্রকার ভাব স্বভাবতঃ মানবের অন্তরে বর্ত্তমান। ইহার কোনটিকেই অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং স্বার্থবাদীদিগের মূল কথা যে অমূলক, তাহাতে লেশ মাত্র সংশয় নাই।

সুখবাদ।

যাঁহারা বিবেকের মৌলিকত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বলেন যে, ব্যক্তিগত সুখ বা স্বার্থই যে নীতির মূল, ব্যক্তিগত সুখকে লক্ষ্য করিয়াই যে, কার্য্য করিতে হইবে, এমন নহে। যাহাতে নিজের সুখ হয়, তাহাই যে উচিত কার্য্য, এরূপ নহে। নীতিসঙ্গত কার্য্যের উদ্দেশ্য, নিজের সুখ নহে, আমার সুখ নহে, জনসমাজের অধিকাংশ লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ। জনসমাজের অধিকাংশ লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখের দিকে যে কার্য্যের গতি, অর্থাৎ যে কার্য্যের দ্বারা জনসমাজের অধিকাংশ লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ

হইবার সম্ভাবনা, তাহাই নীতিসঙ্গত কার্য্য, তাহাই উচিত কার্য্য। স্থূল কথায় ব্যক্তিগত সুখ, নীতির উদ্দেশ্য নহে, জনসমাজের সুখই উদ্দেশ্য।

যদি সকলেই সত্য ব্যবহার করে, তাহা হইলে জনসমাজের সুখ ও সুবিধা বৃদ্ধি হয়। আবার সকলেই যদি মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহা হইলে জনসমাজের অসুখ ও অসুবিধা বৃদ্ধি হয়। সেইজন্য সত্যব্যবহার সৎকার্য্য, নীতিসঙ্গত কার্য্য, এবং মিথ্যাব্যবহার অসৎ কার্য্য, নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য। যাহা সৎকার্য্য, অর্থাৎ যাহাতে জনসমাজের সুখ হয়, তাহাই করা উচিত, এবং যাহা অসৎ কার্য্য, অর্থাৎ যাহাতে জনসমাজের ক্লেশ হয়, তাহা করা অনুচিত। এই মতকে সুখবাদ বলা যাইতে পারে।

স্বার্থবাদ ও সুখবাদের মধ্যে প্রভেদ কি, এবং ঐক্যই বা কি? প্রভেদ এই যে, স্বার্থবাদের লক্ষ্য ব্যক্তিগত সুখ, এবং সুখবাদের লক্ষ্য জনসমাজের অধিকাংশের সুখ। স্বার্থবাদী বলেন, আমার সুখ, আমার কার্য্যের লক্ষ্য। সুখবাদী বলেন, আমার সুখ হইলে, যদি জনসমাজের অধিকাংশ লোকের অসুখের সম্ভাবনা থাকে, তবে আমার সুখ চাইনা, জনসমাজের অধিকাংশ লোকের সুখ চাই। স্বার্থবাদী ও সুখবাদীর মধ্যে ইহাই প্রভেদ।

ঐক্য কোথায়? ঐক্য এই যে, উভয়েরই লক্ষ্য সুখ। ইহা ভিন্ন আরও একটি বিষয়ে ঐক্য আছে। উভয় দলের লোকই সাধারণতঃ স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ নৈতিক জ্ঞান স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা হইতে মনুষ্য, সকল জ্ঞান লাভ করে। এমন লোক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মবুদ্ধির মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়াও সুখবাদ সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন, মানুষের স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, মৌলিক কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে। কিন্তু কি কর্ত্তব্য এবং কি অকর্ত্তব্য, তাহা বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে। যাহাতে অধিকাংশ লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ হইবার সম্ভাবনা, তাহাই কর্ত্তব্য কার্য্য, এবং যাহাতে তাহার বিপরীত হইবার সম্ভাবনা, তাহাই অকর্ত্তব্য কার্য্য। স্বাভাবিক নৈতিক জ্ঞান থাকিলেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এইরূপে নিদ্ধারণ করিতে হইবে। ইহাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের কষ্টিপাথর স্বরূপ।

এখন একটি বিশেষ প্রশ্ন এই যে, সুখই লক্ষ্য হইলে, কোন্ প্রকার সুখকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতে হইবে? সুখের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে। সুতরাং কোন্ প্রকার সুখ কার্য্যের লক্ষ্য, তাহা কে নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে? ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করাতে সুখ, এবং জ্ঞানচর্চ্চাতেও সুখ। এই উভয় প্রকার সুখের মধ্যে কোন্ প্রকার সুখ ভোগ করিব? এপ্রশ্নের উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, উভয় প্রকার সুখই ভোগ কর। পরমেশ্বর মনুষ্যকে এই উভয় প্রকার সুখ দিয়াছেন। সুতরাং উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত ভাবে, এই উভয় প্রকার সুখই ভোগ কর। কোনটাই পরিত্যাজ্য নহে।

এ উত্তর যথেষ্ট হইল না। যে স্থলে ইন্দ্রিয়সুখ ও জ্ঞানালোচনাজনিত সুখ পরস্পর বিরোধী হয়, সেখানে কি করিব? যেখানে একপ্রকার সুখভোগ করিতে গেলে, অন্যপ্রকার সুখভোগের সম্ভাবনা থাকে না, সেখানে কি করিব? এস্থলে

সুখবাদী বলিবেন, যাহাতে শ্রেষ্ঠ সুখ, তাহাই গ্রহণ কর। এ উত্তরও যথেষ্ট হইল না। শ্রেষ্ঠ কি, অশ্রেষ্ঠ কি, কে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে? এই প্রশ্নেই সুখবাদীর চক্ষু স্থির! তাঁহার সুখবাদ দর্শন এখানে নীরব। এ কথা বলিলে চলিবে না যে, অধিকাংশ লোক যাহাকে শ্রেষ্ঠ সুখ মনে করে, তাহাই বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ সুখ। অধিকাংশ লোক যদি ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করাকেই শ্রেষ্ঠ সুখ বলে, বাস্তবিক কি তাহাই শ্রেষ্ঠ সুখ হইবে? কোন্ সুখ শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ের এক সাক্ষী আপনার অন্তরাত্মা। ইন্দ্রিয়সুখ, জ্ঞানালোচনার সুখ, পরমেশ্বরের উপাসনার সুখ, এই বিবিধ প্রকার সুখের মধ্যে, কোন্ সুখ শ্রেষ্ঠ, তাহা তর্ক বিতর্ক দ্বারা স্থির হয় না। আপনার অন্তরই বলিয়া দেয়, কোন্ সুখ শ্রেষ্ঠ। এখানে হৃদয়ের বাণী শুনিতেই হইবে। বুদ্ধি ও বিচারদ্বারাই সকল নৈতিক তত্ত্ব স্থির হয়, সুখবাদীদিগের এ মত টেঁকিতেছে না।

নৈতিক বাধ্যতাবোধ।

সুখবাদীদিগের মত সমালোচনা করিতে হইলে, আর একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। 'উচিত' ও 'অনুচিত' শব্দের অর্থ কি? উচিত ও অনুচিত বলিলে কি বুঝায়? যাহাতে অধিকাংশ লোকের সুখ, সেইপ্রকার কার্য্য করাই উচিত, এরূপ বলিলে উচিত শব্দে কি বুঝায়? উচিত শব্দে বাধ্যতা বুঝায়। কোন কার্য্য করা উচিত, বলিলে ইহাই বুঝায় যে, উহা করিতে আমি বাধ্য। কোন কার্য্য করা আমার অনুচিত বলিলে, ইহাই বুঝায় যে, উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে আমি বাধ্য।

যে কার্য্যের দ্বারা অধিকাংশ লোকের সুখ হইবার সম্ভাবনা, তাহা আমার করা উচিত। অর্থাৎ তাহা করিতে আমি বাধ্য। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহা করিতে আমি বাধ্য কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মানুষের মনে ভাব (feeling) আছে। কোন একটি ভাব প্রবল হইলে, মানুষ তদুপযোগী কার্য্য করিবে, ইহা স্বাভাবিক। এক জন দুঃখী ব্যক্তিকে দেখিয়া তোমার দয়া হইল, তুমি তাহাকে কিছু দান করিলে। তোমার দয়া চরিতার্থ হইল। জনসমাজের হিতসাধন করিতে, তোমার ইচ্ছা হইল, তোমার হৃদয়ের সদ্ভাব উত্তেজিত হইল, তুমি জনসমাজের হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে। সৎকার্য্য সাধনোপযোগী ভাব মানুষের হৃদয়ে উদ্দীপিত হইলেই মানুষ সৎকার্য্য করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ইহার অধিক আর কি বলা যাইতে পারে?

ইহা প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হইল না। এইরূপ উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে বটে, এমন কি, জন ষ্টুয়ার্ট মিল পর্য্যন্ত ঐ প্রকার উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু ইহাই কি সদুত্তর? ভাব (feeling) চরিতার্থ করিতে হইবে বলিলে কিছুই বলা হইল না। ভাব চরিতার্থ করিতে আমরা বাধ্য কেন? এই প্রশ্নের উত্তর চাই। কেবল ভাব হইলেই ঐ কার্য্য করিতে হইবে, কে বলিল? ভাব হইলে কার্য্য করিব, এবং খুসি হইলে কার্য্য করিব, এ দুই কি এক প্রকারের কথা নহে? আমার ইচ্ছা হইল, তাস ক্রীড়া করিব, তাসক্রীড়া করিলাম। আমার ইচ্ছা, আমার মনের ভাব, আমার খুসি চরিতার্থ হইল।

কিন্তু ইহাতে কোন নৈতিক কার্য্য, ধর্ম্ম কার্য্য হইল না। যে কার্য্যে ধর্ম্মবুদ্ধি, নৈতিক বাধ্যতাবোধ বর্ত্তমান নাই, সে কার্য্য কখনই নৈতিক কার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

অধিকাংশ লোকের যাহাতে সুখ হয়, এমন কার্য্য করিতে আমি বাধ্য কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, আমি জনসমাজের একজন, যাহাতে অধিকাংশ লোকের সুখের সম্ভাবনা, তাহাতেই আমারও সুখের সম্ভাবনা, সুতরাং সেরূপ কার্য্য আমাকে অবশ্য করিতে হইবে।

ইহা সদুত্তর হইল না। সুখবাদ সমর্থন করিতে গিয়া স্বার্থবাদ আনা হইল। স্বার্থবাদ যে অযুক্ত, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং স্বার্থবাদের দ্বারা সুখবাদের সমর্থন সম্ভব নহে। প্রশ্ন এই যে, আমি অধিকাংশ লোকের সুখের জন্য কার্য্য করিতে বাধ্য কেন? স্বার্থবাদের দ্বারা এ প্রশ্নের উত্তর কেমন করিয়া হইবে? কেহ সুখবাদ রক্ষা করিতে গিয়া স্বার্থবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, আবার স্বার্থবাদ রক্ষা করিতে গিয়া সুখবাদের শরণাপন্ন হন। ইহাতে কোনটাই রক্ষা পায় না। উভয়ই মারা যায়। গল্পের মুষিক যেমন বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, "পুনর্ম্মূষিকোভব" এই ঋষিবাক্যে পুনর্ব্বার মুষিকত্ব প্রাপ্ত হইল, সেইরূপ স্বার্থবাদ একবার সুখবাদের আকার, আবার স্বার্থবাদের আকার, কখন ধারণ করিতে পারে না। স্বার্থবাদের দ্বারা নৈতিক বাধ্যতাবোধের ব্যাখ্যা হইতে পারে না। তবে এই বাধ্যতাবোধ কোথা হইতে আসিল?

যদি কোন নির্জ্জন স্থানে দশ সহস্র মুদ্রা কুড়াইয়া পাই, তাহা আমি কি করিব? আত্মসাৎ করিব, অথবা উহা যে ব্যক্তির টাকা অন্বেষণ করিয়া তাহাকে দিব? এ স্থলে আমার স্বার্থপর প্রকৃতি বলিতে পারে, উহা গ্রহণ করিয়া আত্মসুখ বৃদ্ধি কর। কিন্তু আমার ভিতরে আর কি আছে, যাহা বলিবে "ছি! ছি! করিও না। যে ব্যক্তি ঐ অর্থের সত্ত্বাধিকারী, অন্বেষণ করিয়া উহা তাহার হস্তে সমর্পণ কর। তুমি উহা করিতে বাধ্য। না করিলে তুমি অপরাধী। স্বার্থবাদ ও সুখবাদ, এই বাধ্যতাবোধের ব্যাখ্যা কেমন করিয়া করিবে? করিতে নিতান্তই অক্ষম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বার্থবাদী ও সুখবাদী, বিবেকের স্বাভাবিকত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, বুদ্ধিদ্বারা ন্যায়, অন্যায়, উচিত, অনুচিত স্থির হয়। আমাদের নৈতিক জ্ঞান, বুদ্ধি বৃত্তিরই ক্রিয়া।

বুদ্ধি ও বিবেকের প্রভেদ।

বুদ্ধি হইতে কি নৈতিক বাধ্যতাবোধ উৎপন্ন হইতে পারে? নৈতিক বাধ্যতাবোধ কি বুদ্ধির ক্রিয়া হইতে পারে? অভিজ্ঞতা হইতেও কি বাধ্যতাবোধ আসিতে পারে? কখন না। বুদ্ধির কার্য্য কি? ঘটনা বা পদার্থ সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করা, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থির করা, জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত তত্ত্ব নির্ণয় করা, এই সকল বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধি হইতে নৈতিক বাধ্যতাবোধ কেমন করিয়া আসিবে?

চিকিৎসা দ্বারা রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা এ কথা বলে। কিন্তু রোগীর চিকিৎসা করান যে উচিত, বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা তাহা কেমন করিয়া বলিবে? উহা বলে, বিবেক। কোন

ঘটনার কি কারণ, বুদ্ধি তাহা অনুসন্ধান দ্বারা বলিতে পারে। কোন্ কার্য্যের কি ফল, অভিজ্ঞতা তাহা জানিতে পারে। ইহার অধিক আর বলিতে পারে না। বিষ ভক্ষণে প্রাণ নষ্ট হয়, অভিজ্ঞতা ইহা বলিতে পারে। কিন্তু বিষ ভক্ষণে প্রাণবিনাশ করা যে অধর্ম্ম, ইহা বিবেকের বাণী। দুঃখীকে দান করিলে তাহার দুঃখ দূর হয়। অভিজ্ঞতা ইহা বলিতে পারে। কিন্তু দুঃখীকে দান করা যে উচিত, তাহা কে বলে? উহাই বিবেকের বাণী।

বিবেক, এবং বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্বন্ধ কি? বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা যেরূপ ঘটনা আনিয়া বিবেকের সম্মুখে উপস্থিত করে, বিবেক তদনুসারে বলিয়া দেয়, উহা উচিত কি অনুচিত। স্ফোটক অস্ত্র করার দৃষ্টান্ত এ স্থলে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলে এ বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। তুমি কোন স্থানে হঠাৎ দেখিলে এক ব্যক্তিকে কয়েকজন লোকে বলপূর্ব্বক ধরিয়াছে, আর একজন উহার দেহে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া দিতেছে। সে লোকটি যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে। তুমি ইহা ভীষণ নিষ্ঠুরতা মনে করিয়া সেই লোকটিকে রক্ষা করিবার জন্য সেই দিকে ধাবমান হইলে। কিন্তু গিয়া শুনিলে যে, সে লোকটির দেহে ভয়ঙ্কর স্ফোটক হইয়াছে, একজন ডাক্তার উহা অস্ত্র করিতেছেন এবং কয়েকজন আত্মীয় ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়াছেন। এ স্থলে ঘটনাটি প্রথমে যেরূপে তোমার জ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহাতে তুমি সিদ্ধান্ত করিলে যে, উহা ভীষণ নিষ্ঠুরতা, সুতরাং উহা নিবারণ করা উচিত। তাহার পরে আবার ঘটনাটির সকল দিক্ যখন তোমার জ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তুমি অন্য মীমাংসায় উপস্থিত হইলে। বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য, ঘটনার প্রকৃত অবস্থা নির্দ্ধারণ করা। বিবেকের কার্য্য, যেরূপ ঘটনা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তদনুসারে উচিত কি অনুচিত বলিয়া দেওয়া, সেই সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি বলিয়া দেওয়া।

শাস্তিভয় ও বিবেক।

নৈতিক বাধ্যতাবোধ কোথা হইতে আসিল? এ প্রশ্নের আর একটি উত্তর এই যে, উহা সামাজিক ও রাজনৈতিক শাস্তিভয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে দুষ্কার্য্যের শাসন জন্য জনসমাজে শাস্তি প্রচলিত। লোকে যখনই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখনই স্বভাবতঃ তাহাদের মনে শাস্তিভয় উপস্থিত হইয়াছে। বংশপরম্পরায় এই প্রকার হওয়াতে, ক্রমে ক্রমে, বৈজিক নিয়মানুসারে, উহা মানবের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাকে বিবেক, নৈতিকবাধ্যতা, দায়িত্ববোধ বা কর্ত্তব্যজ্ঞান বলিতেছ, উহা সামাজিক বা রাজনৈতিক শাসনভীতি হইতে উৎপন্ন। উহা, বাস্তবিক, কোন মৌলিক বৃত্তি নহে। এক সময়ে যাহা, শাসনভয় ছিল, তাহাই বিকাশের নিয়মানুসারে, বংশপরম্পরায়, বৈজিক তত্ত্বানুসারে, রূপান্তরিত হইয়া মানবহৃদয়ে বিবেক বা নৈতিক বাধ্যতার আকার ধারণ করিয়াছে।

ইহা যুক্তিযুক্ত মত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ভয় হইতে বিবেকের উৎপত্তি, কখনই সম্ভব নহে। ভয় হইতে বিবেক কেমন করিয়া আসিবে? যদি ভয় ও বিবেক সমধর্ম্মী পদার্থ হইত, তাহা হইলে এ মতের কতকটা যুক্তিযুক্ততা

থাকিতে পারিত। কিন্তু ভয় ও বিবেক বিপরীত ভাবাপন্ন। সুতরাং একটি হইতে আর একটির উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। ভয়ের গতি ও নৈতিক বাধ্যতার গতি, বিপরীত দিকে। ভয় ও বিবেক এতই বিপরীত ভাবাপন্ন যে, একটী আর একটিকে বিনাশ করে। যে পরিমাণে বিবেক প্রবল হয়, সেই পরিমাণে ভয় হ্রাস হইয়া যায়, আবার যে পরিমাণে ভয় প্রবল হয়, সেই পরিমাণে বিবেক ক্ষীণ হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তির হৃদয়ে বিবেক প্রবল ও উজ্জ্বল, তাহার ভাব কি? যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিব। কোন কষ্ট, কোন বিপদ, কোন প্রকার লোক-ভয় গ্রাহ্য করিব না।

সাধু মহাত্মাদিগের জীবন আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমাজভয় বা রাজভয় হইতে বিবেকের উৎপত্তির মত, একান্ত অসার ও অযুক্ত। সক্রেটিস্, ইসা, সেণ্টপল, পার্কার, নানক, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবন আলোচনা করিলে এক নিমেষের জন্যও মনে করিতে পারিনা যে, বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভয়সম্ভূত ভাবমাত্র। জগতের মহাত্মাগণ, যাহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, জনসমাজের কল্যাণের জন্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা নির্ভীকচিত্তে, অসঙ্কুচিত ভাবে, সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কোন প্রকার সামাজিক বা রাজনৈতিক শাসনকে গ্রাহ্য করেন নাই। কোন প্রকার ভয় ও বিপদ, এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। যে পরিমাণে বিবেক প্রবল ও উজ্জ্বল হয়, সেই পরিমাণে মানব, পার্থিব ভয় ভাবনার অতীত হয়, সেই পরিমাণে সামাজিক শাসনভীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্যপথে, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে। ভয় হইতে, ভয়ভাবনাবিনাশকারী বিবেকের উৎপত্তি, এ কথা একান্তই অসার ও অযুক্ত। ভয় মানবপ্রকৃতির একটি নিকৃষ্ট ভাব, এবং ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেক, মানবপ্রকৃতির একটি উচ্চ ও মহৎ ভাব। যাঁহারা বলিতে পারেন যে, ভয় হইতে বিবেকের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে, অন্ধকার হইতে আলোক হইয়াছে।*

মানব প্রকৃতির মধ্যে যে বিবেক বা নৈতিক বাধ্যতাবোধ রহিয়াছে, উহাকে স্বতঃসিদ্ধ ও মৌলিক বলিতেই হইবে। যতই কেন চেষ্টা করনা, উহাকে অন্য কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে পারিবে না।

নৈতিকজ্ঞান স্বাভাবিক।

মানবপ্রকৃতির গভীর স্থান হইতে নীতির উৎপত্তি। পবিত্রতা, ন্যায়, সত্য, নিঃস্বার্থ হিতৈষণা, কর্ত্তব্য এই সকলের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা স্বভাবতঃ বিকশিত হয়। বাহির হইতে এই সকল নৈতিক ভাবের উৎপত্তি নহে, ভিতর হইতেই ইহাদের উৎ-

* সমাজশাসন ও রাজশাসন হইতে বিবেকের উৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা অসার ও অযুক্ত হইলেও ইহা বলিতেই হইবে যে, সমাজবিধি ও রাজবিধি দ্বারা মনুষ্যের ধর্ম্মবুদ্ধি বংশপরম্পরায় ক্রমশঃ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ সমাজবিধি ও রাজবিধি সমাজসংরক্ষণের অনুকূল। সুতরাং ঐ সকল বিধি, ধর্ম্মবুদ্ধিরও অনুকূল। কেননা, ধর্ম্মবুদ্ধি সর্ব্বথাই সমাজসংরক্ষণের পক্ষপাতী। সুতরাং সমাজবিধি ও রাজবিধি ধর্ম্মবুদ্ধির উৎপত্তির কারণ না হইলেও, বংশপরম্পরায় ধর্ম্মবুদ্ধিকে দৃঢ়ীকৃত করিয়াছে।

পত্তি। তবে বাহিরের অনুকূল অবস্থা, নৈতিক ভাবের বিকাশের সাহায্য করে।

আমাদের উচ্চতর প্রকৃতি ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির মধ্যে যে বিবাদ রহিয়াছে, যে সংঘর্ষণ রহিয়াছে, তাহা হইতেই আমরা স্বভাবতঃ পবিত্রতার জ্ঞান লাভ করি। ন্যায়বোধও মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। উহা স্বভাবতঃ মানবঅন্তরে বাস করিতেছে।

কেহ কেহ বলেন যে, প্রতিহিংসা বৃত্তি হইতে ন্যায়বোধের উৎপত্তি। আদিম অবস্থায় মনুষ্যের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে, তাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রবল হয়। প্রতিহিংসা সাধন করিবার জন্য সে ব্যস্ত হয়। এই প্রতিহিংসা হইতেই ন্যায়-বোধের উৎপত্তি। অপরাধীকে শাস্তি প্রদান, ইহা হইতেই বিকশিত হইয়াছে। এক সময়ে যাহা ছিল, প্রতিহিংসা, এখন বিকাশের নিয়মে, তাহাই হইয়াছে, ন্যায়বিচার।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, একথা নিতান্তই অযুক্ত। কেবল অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই যদি ন্যায় হইত, তাহা হইলে একবার মনে করিলেও করিতে পারিতাম যে, প্রতিহিংসা হইতে উহার উৎপত্তি। কিন্তু ন্যায় বলিলে কেবল অপরাধীর শাস্তি কখনই বুঝায় না। ন্যায়ের অর্থ, যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দেওয়া। অপরাধীর শাসন, উপকারীর প্রত্যুপকার, উত্তমর্ণের ঋণপরিশোধ প্রভৃতি সকলই ন্যায়পরতার কার্য্য। ন্যায়পরতা কেবল অত্যাচারীর শাস্তিতেই বদ্ধ নহে। যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহাই দেওয়া ন্যায়। সুতরাং প্রতিহিংসা হইতে ন্যায়ের উৎপত্তি, একথা একান্ত অসার ও অযুক্ত।

স্বভাবতঃ মানুষ সত্যকে ভালবাসে, মিথ্যাকে ঘৃণা করে। যে নিজে মিথ্যাবাদী, সেও ইচ্ছা করে না যে, লোকে তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতারণা করে। পরোপকার পরম ধর্ম্ম। কিন্তু পরোপকার যে ধর্ম্ম, তাহা কি যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে? কখনই না। পরোপকার কর্ত্তব্য কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কি? দয়াবৃত্তি চরিতার্থ হয়, ভাব (feeling) চরিতার্থ হয়, সুতরাং কর্ত্তব্য, একথাও একান্ত অযুক্ত। কেননা, ভাবকে চরিতার্থ করিতে আমরা বাধ্য কেন, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। পরোপকার কর্ত্তব্য কেন, এ প্রশ্নের আর এক উত্তর এই যে, যদি জনসমাজের সকলেই পরোপকারব্রত গ্রহণ করে, তাহা হইলে সমাজের সকলেই উপকৃত হয়, আমি সমাজের একজন, সুতরাং আমিও উপকৃত হই। অতএব, প্রতিপন্ন হইল যে, পরোপকার কর্ত্তব্য। কিন্তু, বাস্তবিক, ইহাতে কিছুই প্রমাণ হইল না। পরোপকার যে ধর্ম্ম, তাহা প্রমাণ হইল না। উহাতে যে আত্মউপকারের সম্ভাবনা, ইহাই প্রদর্শন করা হইল। বাস্তবিক, পরোপকার যে ধর্ম্ম, পরোপকার যে কর্ত্তব্য, ইহা কোন প্রকার যুক্তিতে প্রতিপন্ন হয় না। পরোপকার ধর্ম্ম, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। ইহা নৈতিক সহজ জ্ঞান।

বাধ্যতাবোধে দুই জন বুঝায়।

এখন নৈতিক বাধ্যতাবোধ সম্বন্ধে আর একটি প্রয়োজনীয় কথার আলোচনা একান্ত আবশ্যক। বাধ্যতা বলিলেই এরূপ বুঝায় যে, একজন বাধ্য করিতেছে, আর এক জন বাধ্য হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বাধ্য করে কে? আমি আপনাকে আপনি কি বাধ্য করি? তাহা কখনই হইতে পারে না। কেননা, আমার ইচ্ছা ও কর্ত্তব্যবোধ, অনেক সময় বিপরীত পথে চলিয়া থাকে। আমার ইচ্ছা হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি, তাহাই আমার কার্য্য। যাহা আমার ইচ্ছার বিপরীত, তাহা কখন আমার কার্য্য হইতে পারে না। অনেক সময়, কি এমন হয় না যে, আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান, আমার নৈতিক বাধ্যতাবোধ, আমার ইচ্ছার বিপরীত দিকে আমাকে লইয়া যায়? আমি বলি, আমি ক্রীড়া করিয়া, আমোদ করিয়া সময় অতিপাত করি, কিন্তু আমার হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে কে বলে, তোমার অমুক আত্মীয় রোগ শয্যায় কাতর, তাঁহার নিকটে গিয়া যথাসাধ্য তাঁহার সেবা কর। আমি ইচ্ছা করি, উপাদেয় সুখাদ্যে আমার রসনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করি, কিন্তু ভিতর হইতে কে বলে "অগ্রে ঐ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মৃতপ্রায় দরিদ্রকে আহার দান কর।" আমি ইচ্ছা করি, মূল্যবান, শোভন বস্ত্রে আমার দেহকে সজ্জিত করি, কিন্তু আমার ভিতর হইতে অবাক্ গম্ভীর ধ্বনিতে কে বলে, "ঐ শীত বাতে কম্পিত অসহায় দরিদ্রকে অগ্রে উপযুক্ত গাত্রাবরণ প্রদান কর।'

আমারই ভিতরে আমার অন্যায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে অন্য রূপ আদেশ কে করিতেছেন? আমি কি দুই জন? যদি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করি, "আমি কি দুই জন?" তাহা হইতে এই সুস্পষ্ট নিঃসংশয় উত্তর পাই, "না, আমি এক।" যদি কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করি, "মহাশয়! আপনি একজন, না, দুই জন?" তিনি নিশ্চয়ই হাস্য করিবেন। আত্মার একত্বে সকলেরই সুদৃঢ় বিশ্বাস।

আমি একজন। তবে এই বিপরীত ভাব কেন? তবে আমাকে বাধ্য করে কে? অন্য কোন প্রকারে এই বাধ্যতাবোধের ব্যাখ্যা হইতে পারে না। বলিতেই হইবে, উহা ঈশ্বরপ্রেরিত। মহাত্মা থিওডোর পার্কারের মাতার ন্যায় বলিতেই হইবে, উহা মানবহৃদয়ে পরমেশ্বরের বাণী।

ঐ বাণী একদিকে যেমন আমার নহে, পরমেশ্বরের বাণী, সেইরূপ আবার উহা আমার। উহা আমার আত্মার অবস্থা, উহা আমার মনের ভাব। এস্থলে আমার সহিত আমার ঈশ্বরের একত্ব দেখিতেছি। যাহা ঈশ্বরের বাণী, তাহাই আবার আমার বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি। এস্থলে একে দুই, দুইয়ে এক। মানবের নৈতিক প্রকৃতি মধ্যে এই দ্বৈতাদ্বৈত চিরদিনই বর্ত্তমান। ব্রাহ্মসমাজ বহুকাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন, বিবেক পরমেশ্বরের বাণী। সুতরাং মানবের নৈতিক প্রকৃতিতে এই দ্বৈতাদ্বৈত, ব্রাহ্মসমাজকে স্বীকার করিতেই হইবে।

এস্থলে পরমেশ্বরের সহিত আমরা এক। কেননা, যাহা তাঁহার বাণী, তাহাই আমার ধর্ম্মবুদ্ধি। এক অথচ দুই। কেননা, নৈতিক বাধ্যতাবোধে দুই জন বুঝায়। বিবেক আমাদের পরিচালক। সংসার-পথে, ধর্ম্মপথে, বিবেক আমাদিগকে চালাইতেছে। বিবেক আমাদের উপদেষ্টা। বিবেক আমাদিগকে উপদেশ দিতেছে। বিবেক আমাদের তিরস্কর্ত্তা। আমরা কোন অনুচিত কার্য্য করিলে বিবেক আমাদিগকে তিরস্কার করে। বিবেক বলে, "ছি! ছি! এমন কার্য্য করিলে!" আমি যদি কোন

অন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই, বিবেক বলে, "উহা করিওনা, উহা করিও না।" বিবেকের আদেশের সঙ্গে আমার ইচ্ছার কখন মিলন হয়, কখন বা উহা অতিক্রম করি। কিন্তু যখন বিবেকের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলি, তখনও বিবেক, তাহার কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকে, ক্ষান্ত হয় না।

বিবেকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? বিবেক পরিচালক, আমি পরিচালিত; বিবেক নেতা, আমি নীত; বিবেক উপদেষ্টা, আমি উপাদিষ্ট; বিবেক শিক্ষক, আমি শিক্ষিত; বিবেক শাসক, আমি শাসিত; বিবেক তিরস্কর্ত্তা, আমি তিরস্কৃত। বিবেকের সহিত আমার এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ।

যে পরিচালক, সেই পরিচালিত; যে নেতা সেই নীত; যে উপদেষ্টা, সেই উপদিষ্ট; যে শিক্ষক, সেই শিক্ষিত, যে তিরস্কর্ত্তা, সেই তিরস্কৃত, ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে?

আমাদের অন্তরে একজন রহিয়াছেন, যিনি পিতার ন্যায়, গুরুর ন্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, আদেশ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেছেন, "ইহা কর, ইহা করিও না।" এই প্রবন্ধের উপসংহারে, সেই অন্তরাত্মা, সেই অন্তরবিহারী হরি, সেই চৈত্যগুরুর শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্মরণার্থ।

গত ফাল্গুনমাসের নব্যভারতে "বালিকার কবিতা" নামে যাহার রচিত তিনটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, শ্রাবণ মাসের নব্যভারতেও "বাঙ্গালির ছেলে" নামক যাহার আরও একটী সুন্দর কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই পঙ্কজিনী আর ইহজগতেই নাই। সম্পর্ক গুণেই পঙ্কজিনী আমার স্নেহের পাত্রী ছিল। সদ্ভাবপূর্ণ সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিয়া পঙ্কজিনী আমার অধিকতর স্নেহের পাত্রী হইয়াছিল। তাহাতেই তাহার অকাল মৃত্যু আমার পক্ষে দারুণ দুঃখের কারণ হইয়াছে। পঙ্কজিনীর শ্বশুর বন্ধুবর কুমুদ বাবু লিখিয়াছেন, পঙ্কজিনী বিয়োগে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহার পত্র পাঠ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পুত্রবধূকে তিনি কন্যানির্ব্বিশেষে প্রাণ ভরিয়া স্নেহ করিতেন; আবার সেই বালিকার মধ্যে যে মূর্ত্তিমতী দেবীভাব ছিল, মাতৃজ্ঞানে তাহার পূজা করিতেন। কুমুদ বাবু লিখিয়াছেন, পঙ্কজিনী দেবকন্যা ছিল, তাহার দেব চরিত্রের গুণে পরিবারের আবাল বৃদ্ধ সকলেই তাহাকে ভালবাসিত, আর তাহার সম্মান করিত। পঙ্কজিনীর স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি ছিল। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের মধ্যেই সে যে সকল কবিতা লিখিয়াছে, তাহাতেই তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার বড় আশা ছিল, কালক্রমে সেই কবিত্বশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া আত্মীয় এবং স্বদেশীয়দিগের সুখ ও গৌরবের কারণ হইবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, তাই তিনি দেবকন্যা পঙ্কজিনীকে দেবধামে লইয়া গিয়াছেন। পঙ্কজিনীর স্মরণার্থে যাহা লিখিয়াছি, তাহাই পাঠাইলাম। পঙ্কজিনীর লিখিত কয়টী কবিতা আমার নিকটে আছে। নব্যভারতে প্রকাশ করিবার জন্য উহা পরে পাঠাইব। পঙ্কজিনীর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা-মিশ্রিত এই চিহ্নগুলিই তাহার আত্মীয়দিগের পরম যত্নের জিনিস হইয়া থাকিবে।

বুঝিতে না পারি বিধি, কেন পাঠাইলে
হেন পুষ্প পৃথিবীর পঙ্কিল সলিলে?
সৌরভ-শোভায় যার পুষ্কর ভরিলে,
অকালে তারেই বিধি ছিঁড়িয়া লইলে!
শত শত পুষ্প আছে উদ্যান ভরিয়া,
আঁধার করেছ কিন্তু একটী হরিয়া।
শত শতদল সম ছিল যার প্রাণ,

বিকচ কমল সম পবিত্র বয়ান,
সেই পঙ্কজিনী হায় ষোড়শী বালিকা,
প্রেমপুণ্যে প্রভাময় ফুটন্ত কলিকা;
দুর্ব্বল মৃণাল দেহ স্বহস্তে ছিঁড়িয়া
কেন বিধি হেন নিধি নিয়েছ কাড়িয়া!
অথবা এ অনুযোগ নহে সমুচিত,
ভাল মন্দ, কালাকাল তোমারি বিদিত;
যা করেছ, তাই ভাল; হেন মনে লয়,
তোমার পূজার যোগ্য যেই ফুল হয়,
তারে তুমি ধরা হতে লইয়া যতনে,
রেখে দেও আপনার পবিত্র চরণে;
তোমারি হাতের পুষ্প পূত পঙ্কজিনী,
আপনার পদে তারে রেখেছ আপনি।

বন্ধুবর, বুঝি আমি যে দুঃখ তোমার,
পঙ্কজিনী বিনে তব গৃহ অন্ধকার!
এ হেন কুসুম শোভে যেই পরিবারে,
সুখ-সরোবর সেই সংসার মাঝারে;
শান্তির সুগন্ধ আর ভক্তি-পরিমল
সেই পরিবারে সদা থাকে অবিচল।
স্বর্গের সম্পদসম আছিল তোমার
পঙ্কজিনী পুত্রবধূ গুণের আধার;
লক্ষ্মী সরস্বতী দুটী মিলে একাকারে
স্বর্গসুখে সুখী সদা করিত তোমারে;
কন্যাজ্ঞানে ছিল যাতে স্নেহ অনিবার,
মাতৃজ্ঞানে পূজিয়াছ দেবত্ব যাহার,
সে যে কি পদার্থ ভাই, বুঝে কি সকলে?
হেন মাতৃরূপ হায় মর্ত্ত্যে ক'টী মিলে?
হৃদয়ের স্নেহ আর ভক্তির মিলনে
আসক্তির আবিলতা নাহি থাকে মনে;
সুখ সদ্গতির ভাই, এমন সহায়
দুঃখের সংসারে বল সহজে কে পায়?
পেয়েছিলে তুমি, তাই হারায়ে এখন,
মাতৃহীন শিশু সম করিছ ক্রন্দন!

সন্তাপনাশিনী সেই পরম জননী,
তোমারে সান্ত্বনা ভাই, দিবেন আপনি;
জরা মৃত্যু রোগ শোকে কাঁদে বটে প্রাণ,
অমঙ্গলে সুমঙ্গল তাঁহারি বিধান।
পঙ্কজিনি মা আমার সংসার ছাড়িয়া,
গিয়াছ বন্ধুর গৃহ আঁধার করিয়া!
সহিষ্ণুতা, প্রীতি আর প্রিয়সেবালয়ে
আছিলে বঙ্গের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হয়ে;
পুণ্যের প্রতিমা তুমি, তোমার লাগিয়া
বিষাদে কাতর প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া!
ঠিক যেন শাপভ্রষ্ট দেবকন্যা প্রায়,
কয়টী বৎসর মাগো আছিলে ধরায়;
সকলে করিয়া সুখী, দেবত্বের গুণে,
দহিলে মা, অবশেষে শোকের আগুনে!
ভবিষ্যৎ বাসগৃহ ছিল মা তোমার,
বুঝেছিলে সংসারের কতটুক সার;
ভক্তির সুগন্ধ মাখা হৃদয় কোটরে
কত ভাব, কত আশা রেখেছিলে ভবে;
পূরিবে তোমার আশা গিয়ে দেবলোকে,
আকুল আত্মীয় যত মা তোমার শোকে!
অশিক্ষায় কুশিক্ষায় অজ্ঞান আঁধারে,
পড়ে আছে বঙ্গনারী দুঃখের আগারে,
নীচ বুদ্ধি, নীচ সুখ, নীচ প্রাণ লয়ে
পড়ে আছে দেবী যেন পিশাচী হইয়ে!
এ সময়ে পঙ্কজিনি, তোমার মতন
দেখা দিলে দেব কন্যা দুই চারি জন
হয় মা, সান্ত্বনা বড় তাপিত অন্তরে;
তোমার বিয়োগে মাগো, হৃদয় বিদরে!
পঙ্কজিনি, মা আমার, গিয়ে দেবলোকে,
দেবতার সহবাসে থাক তুমি সুখে;
বিধাতার কাছে এই আমার প্রার্থনা,
আত্মজনে কৃপা করে দিউন সান্ত্বনা।

শোক-সন্তপ্ত
আনন্দ চন্দ্র মিত্র।

সমন্বয়ভাষ্যের সমালোচনা।(১)

নববিধানমণ্ডলীর উপাধ্যায় ঋষিকল্প পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ভগবদ্গীতার যে সমন্বয়-ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এতদূর বিস্তৃত, পাণ্ডিত্য ও গবেষণা পূর্ণ যে, মাসিক-পত্রিকার এইরূপ দুইএকটী সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে তাহার পূর্ণ-সমালোচনা হওয়া অসম্ভব। তথাপি এই ভাষ্যটী আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে যে, ইহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই ভাষ্যে বহুবিধ মত ও সিদ্ধান্ত নূতন ভাবে বিন্যস্ত ও যুক্তি তর্কদ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, আমরা তাহারই মধ্যে হইতে দুই চারিটী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া গৌরগোবিন্দ বাবুর অবলম্বিত প্রণালী পাঠকবর্গকে দেখাইব। এই একটীমাত্র ভাষ্যেই পাঠক কেবল প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত নব্য টীকাকৃৎদিগের ব্যাখ্যা দেখিতে পাইবেন, তাহা নহে; ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারদিগের বিরোধিমতের সামঞ্জস্য কিরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত ইহাতে বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিবেন। গীতার এ পর্য্যন্ত বহুবিধ সংস্করণ হইয়াছে, কিন্তু এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ এ পর্য্যন্ত এ দেশে আর কেহ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। নববিধানমণ্ডলীর অর্থব্যয়, কান্তি বাবুর উদ্‌যোগ ও উৎসাহ সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে।

Subject এবং Object, Thought এবং Being, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়,—এতদুভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে একটা মহা বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। কি ইউরোপীয়, কি ভারতীয় দর্শন, সর্ব্বত্রই এই গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, উভয়ই অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ; কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্পর্ক নাই। আর কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞেয় জ্ঞাতারই রূপান্তর মাত্র। জ্ঞেয় পদার্থের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। পৃথিবীতে একমাত্র জ্ঞান বা জ্ঞাতাই বর্ত্তমান; যাহাকে জ্ঞেয় বলিয়া বোধ হইতেছে, উহা সেই জ্ঞানেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা (modified states)মাত্র। আবার কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞেয় পদার্থ রাশির মূলে একটা অজ্ঞেয় পদার্থ আছে। সেই অজ্ঞেয় পদার্থের (Substratum) ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বা একই ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় পথে উপস্থিত হইলে, জ্ঞেয়কে নানা ভাবে উপলব্ধি করা যায়। যাঁহারা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন বক্তব্য নাই। শেষোক্ত দুই প্রকার দার্শনিক মতের মধ্যে, প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকেরা জ্ঞেয়কে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। ইঁহারা বলেন যে, যাহাকে জ্ঞেয় বলিয়া বোধ হইতেছে, উহারা জ্ঞানেরই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ামাত্র। জ্ঞেয়-পদার্থের অন্তস্তলে আর কোন বস্তু বা (Substratum) স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদের মতে গুণেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; এই গুণগুলি দ্রষ্টার অন্তরে; ইহারা বাহ্যবস্তু নিহিত নহে। যদি কাহারও সত্বা স্বীকার করিতে হয়, তবে আত্মারই সত্বা স্বীকার কর, বাহ্য-সত্বা স্বীকারের প্রয়োজন নাই। Primary এবং Secondary গুণ সকল, আত্মারই বিকারভূত অবস্থা মাত্র। এক দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। বৃক্ষ কি? বৃক্ষ আর কিছুই নহে, কতকগুলি প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার মিলন মাত্র। এবং এই প্রত্যক্ষ ক্রিয়াগুলি আন্তরিক,—আত্মারই অবস্থা-ভেদ; উহারা বাহ্যিক নহে। বৃক্ষের প্রত্যক্ষ ও বৃক্ষ একই পদার্থ; প্রত্যক্ষ ক্রিয়া বাদ্ দিলে, বৃক্ষের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। বর্ণ, কাঠিন্য, গন্ধ, স্পর্শাদি তোমারই অন্তঃকরণে;—উহারা জ্ঞানেরই বিকার মাত্র। বৃক্ষের প্রত্যক্ষ সময়ে তোমার জ্ঞানেরই ঐ ঐ রূপে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব জগতে রূপবান্, গন্ধবান্ এইরূপ গুণ-বিশিষ্ট কোন স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব নাই; অস্তিত্ব আছে কেবল তোমার জ্ঞানের এবং জ্ঞানের ক্রিয়া বা আকার সমূহের। শব্দ স্পর্শ কাঠিন্যাদি সমস্তই তোমার আন্তরিক পরিবর্ত্তন মাত্র। অতএব প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার অনুভূতি ব্যতীত বস্তুর পৃথক্ সত্বা নাই, এবং এই প্রত্যক্ষ ক্রিয়া গুলি অন্তঃকরণের, বাহ্যিক নহে। শব্দ স্পর্শাদি গুণ গুলিকে একত্র ধরিয়া রাখিবার জন্য বাহ্যিক কোন Substratum এর সত্বা স্বীকারের আবশ্যকতা নাই; কেননা উহারা মানসিক বিকারমাত্র এবং অন্তঃসত্বাতেই অবস্থিত আছে। এই আন্তরিক ক্রিয়াগুলিকে লোকে ভুল করিয়া বাহ্য পদার্থে আরোপ করিয়া থাকে। বিষয়ের জ্ঞান হয় না; বিষয়ের আকারের (Ideas) জ্ঞান হয় মাত্র। এই idea র মধ্যদিয়াই বস্তুজ্ঞান জন্মিয়া থাকে; মন বা জ্ঞান, বস্তুর এই আকার মাত্র বুঝিতে পারে। সুতরাং আন্তরিক যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইতেছে, আমরা তাহারই মাত্র জ্ঞানলাভে সমর্থ। এই আকার বা পরিবর্ত্তন গুলি মনে, বাহিরে নহে। Berkley, Fichte, Hegel প্রভৃতি দার্শনিক বৃন্দ এইরূপ মত পোষণ করিয়া গিয়াছেন। আর এক সম্প্রদায় দার্শনিক আছে, তাঁহারা বাহ্যিক্ Substratum বা গুণ গুলির আধারকে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। ইঁহারা বলেন যে, শব্দস্পর্শ-রূপ রসাদি মানসিক পরিবর্ত্তন বটে, কিন্তু এই মানসিক পরিবর্ত্তন জন্মাইবার একটা বাহ্য "হেতু" থাকা একান্ত আবশ্যক। মনে কর, তোমার একটী অশ্বের প্রত্যক্ষ হইতেছে। এস্থলে তুমি কি বুঝিতেছ? তুমি বুঝিতেছ যে বাহ্যিক 'একটা কিছু' তোমার ইন্দ্রিয়ের পথে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া উৎপন্ন করিতেছে এবং সেই ক্রিয়া গুলি উৎপন্ন হইবা মাত্র, সেই 'কোন কিছু' টীকে অশ্ব বলিয়া বুঝিতে পারিলে। অবশ্য এই বাহ্যিক হেতুটীর স্বরূপ আমাদের ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অজ্ঞেয়ই থাকিয়া গেল। আমাদের জ্ঞানে কেবল শব্দ স্পর্শাদিরই জ্ঞান হওয়া সম্ভব; সেই জন্য যাহা হইতে বিশেষ বিশেষ শব্দস্পর্শাদি উৎপন্ন হইল, সেই শব্দস্পর্শাদি ভিন্ন অন্য কিছুরই জ্ঞান লাভ করিবার উপায় আমাদের নাই। তাহা হইলেই, দেখা যাইতেছে যে, এরূপ মতে, জ্ঞান ও জ্ঞেয় একই পদার্থ নহে। বাহ্যিক অজ্ঞেয় হেতু (cause) হইতে, নিয়ত আমাদের মনে কতকগুলি ক্রিয়া উত্তেজিত ও উদ্ভূত হইতে থাকে, সেই ক্রিয়ার জ্ঞানই আমাদের বস্তুজ্ঞান। সেই সেই শব্দ স্পর্শাদি ক্রিয়ার জ্ঞান ভিন্ন, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান লাভের অধিকার আমাদের নাই। তুমি

একটী আম্রফল চক্ষুদিয়া দেখিলে, হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন করিলে,—এইরূপে তুমি বুঝিলে যে তুমি আম্র ফলের জ্ঞান লাভ করিয়াছ। এ জ্ঞান কিরূপ? ইহা আর কিছুই নহে, কেবল ঐ ফলটী তোমার ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির উপর যে যে ক্রিয়া জন্মাইয়া দিল, সেই ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া সমূহের জ্ঞান মাত্র। অতএব ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ও বস্তুর স্বরূপজ্ঞান এক কথা নহে। যদি তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয় না থাকিত, তবে কি হইত? তখন ঐ ফলের একটী গুণ (অর্থাৎ রূপ) কমিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইত অর্থাৎ ফলটীর আর রূপ দর্শন ঘটিত না। আবার মনে কর, তোমার গন্ধ ও স্বাদেন্দ্রিয় নাই;—এবারে কি হইল? হইল এই যে, তোমার ফলের জ্ঞান হইতে আর দুইটী গুণ বা ক্রিয়া কমিয়া গেল। সুতরাং এইরূপে বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের বস্তুজ্ঞান ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান মাত্র। যতটী ইন্দ্রিয় তোমার যতদিন আছে, ততদিন সেই সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সেইরূপ জ্ঞান হইতেই থাকিবে। একটী দুইটী করিয়া তোমার ইন্দ্রিয় কমাইয়া দেও, তোমার বস্তু বিষয়ক জ্ঞান ও সেই সেই ভাবে কমিয়া যাইবে। আবার যদি তোমার আরো কয়েকটী অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় থাকিত, তবে ঐ ফলটী সম্বন্ধে আরো অন্যবিধ কয়েকটী অতিরিক্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারিতে। এক এক ইন্দ্রিয়ের উপর বস্তু যেরূপ ক্রিয়া করে, যতদিন ঐ ইন্দ্রিয় মানুষের আছে, ততদিন সেই সেই ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান হইবেই। ইহাই আমাদের বস্তুজ্ঞানের স্বরূপতত্ত্ব। এতদতিরিক্ত জ্ঞান-পরিগ্রহে মানুষাদির অধিকার নাই। অতএব, বস্তু আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপর যে ক্রিয়া উৎপাদন করে, সেই ক্রিয়ার জ্ঞান ভিন্ন, বস্তু-জ্ঞানের অন্য উপায় আমাদের নাই। তবেই এ মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয় একই পদার্থ নহে। অগ্নিতে তোমার হস্ত দগ্ধ হইল, দগ্ধস্থানে তুমি যাতনা অনুভব করিলে; তুমি কি বলিবে যে অগ্নি ও যাতনার অনুভূতি একই পদার্থ? যদি পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে চেতন প্রাণী সমূহ একেবারে বিলুপ্ত হইত, তবে অগ্নির এই যন্ত্রণাজনকত্ব গুণ, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যাইত; কেননা যন্ত্রণানুভূতি মনেরই একটী পরিবর্ত্তনাত্মক বিকার মাত্র। এইরূপ, আলোক, উত্তাপ, শব্দ, যন্ত্রণাদির গ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলি না থাকিলে, সে গুলির জ্ঞান জন্মিবে কি প্রকারে? উত্তাপ অগ্নিতে নাই, উহা আমাদের মনে। মিষ্টতা চিনিতে থাকে না, উহা আমাদের মনে! যতদিন ঐ ঐ গুণের গ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলি বর্ত্তমান আছে, ততদিন ঐ ঐ প্রকারের জ্ঞান হওয়া অনিবার্য্য। ঐ ঐ ইন্দ্রিয় না থাকিলে, ঐ ঐ প্রকারের জ্ঞানও হইতে পারিত না। অগ্নি কাগজকে পোড়াইতে সক্ষম, কিন্তু কাগজে যন্ত্রণার অনুভূতি জন্মাইতে পারে না। চিনি জলে মিশিয়া যায়, কিন্তু চিনি জলেতে মিষ্টতার অনুভূতি দিতে পারে না। এইরূপ তাপ, বর্ণ প্রভৃতি সমস্তই আমাদের ইন্দ্রিয়েরই ক্রিয়াত্মক অনুভূতি মাত্র; আমরা ভ্রমবশতঃ অগ্নিতে তাপের ও পুষ্পে বর্ণের আরোপ করিয়া থাকি। বাস্তবিক অগ্নি ও পুষ্প কি পদার্থ,—উহাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা আমাদের ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানে জানিবার উপায় নাই। গুণগুলি ইন্দ্রিয়েরই ক্রিয়ামাত্র, উহারা মনেরই সম্পত্তি (Subjective)। অন্যরূপ ইন্দ্রিয় থাকিলে, এই সকল

বস্তুই অন্যরূপ জ্ঞান আমাদের মনে উৎপাদন করিতে পারিত। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কেবল শব্দ স্পর্শরূপাদির জ্ঞান লাভ করিতেই সমর্থ, তদতিরিক্ত বস্তুজ্ঞানে সমর্থ নহে। অতএব এই সকল দার্শনিক পণ্ডিতবর্গের মতে, শব্দ স্পর্শাদির অন্তরালে, তাহাদের হেতুভূত একটা পদার্থ আছে; সেই পদার্থ হইতে ইন্দ্রিয়ের উপরে যে যে প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া হইতেছে, আমরা কেবল তাহাই বুঝিতেছি। অতএব ইহা এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইহাঁরা এ জগৎটাকে উড়াইয়া দেন নাই। Lock এবং Kant প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ এই মতের পরিপোষক ও অগ্রণী।

এখন আমরা দেখিব, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এই দ্বিবিধ মতের কোন্ মত গ্রহণ করিয়াছিলেন? আমাদের বিশ্বাস, শঙ্করাচার্য্য এই শেষোক্ত মতটীকেই সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, কি দেশে, কি বিদেশে, সর্ব্বত্রই শঙ্করাচার্য্যকে অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। "মায়া" শব্দটীর প্রয়োগ দেখিয়াই, অনেক বড় বড় পণ্ডিত ও মনস্বী ব্যক্তিও, শঙ্করাচার্য্যকে মায়াবাদী অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব-অস্বীকারকারী রূপে অনেকেই দোষ দিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে শঙ্কর সেরূপ মায়াবাদী নহেন। আমরা দুইটী মাত্র স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, তিনি জগৎকে এক নিঃশ্বাসে উড়াইয়া দেন নাই।

প্রাণি কর্ম্মাণি ক্রিয়াত্বাৎ সংস্কারং জনয়ন্তি। সংস্কার বশাদেব স্বোপাদানে লীনকার্য্যসংস্কার রূপ শক্তিবলাৎ উত্তরসৃষ্টিঃ পূর্ব্বসৃষ্টি সজাতীয়কা ভবতি। অন্যথা সংস্কার-প্রলয়ে জগদ্বৈচিত্র্যমাকস্মিকত্বং স্যাৎ"।

অন্য আর একস্থলে তিনি বলিয়াছেন যে—"নন্থ বিষয়াকারং জ্ঞানং ন বিষয়ঃ। * * * সর্ব্বংহি যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তদাকারং ভবতি।" আর একস্থলে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরা বোধসৌকর্য্যার্থ তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করিতেছি:—

"Again you can not argue that there are no outward objects, on the ground that idea takes the form of outward object; for if there were no outward object in existence, the idea could not take the form of an outward object. You will have to admit then that the reason, that the idea and the object perceived are always presented simultaneously, is *not that the object is one and the same with the idea, but that the object is the occasion of the perception.* (A. E. Gough's translation.)

পাঠক দেখুন, ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট উক্তি আর কি হইতে পারে? বস্তুর জ্ঞান (idea) এবং বস্তুর স্বরূপ যে এক নহে, ইহা অপেক্ষা আর কি স্পষ্ট উক্তি হইতে পারে? পাঠক এখন বুঝিলেন যে, আমরা উপরে যে দার্শনিক মতটীর কথা বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছি, সেই মতটী, ও শঙ্করের মতটী ঠিক্ একরূপ। যিনি স্বকৃত ভাষ্যের নানা স্থানে প্রলয়ে জগতের শক্তিময়রূপ স্বীকার করিয়াছেন, যিনি অভাব হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই, যিনি বস্তু এবং বস্তুর idea কে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহার মতে এজগৎ অলীক পদার্থ, বলা অতি দুঃসাহসের কার্য্য। পণ্ডিতপ্রবর Maxmuller শঙ্করকে প্রকৃত রূপে বুঝিয়া বলিয়াছেন যে,—"The danger with Sankara's Vedantism was that what to him was simply phenomenal, should be taken for purely fictitious. There is however a great difference between the two, maya is the cause of a phenomenal, not of a fictitious world; and if Sankara adopts the विवर्त्त instead of परिणाम doctrine, there is always something on which the विवर्त्त is at work and which can not be

deprived of its reality." সুবিখ্যাত পণ্ডিত Jones বলেন—"The fundamental tenet of Vedanta consisted not in denying the existence of matter *i, e.* of primary and secondary qualities but in contending that it has no essence independent of mental perception." শঙ্কর, জগৎকে phenomena মাত্র বলিয়াছেন। কিন্তু phenomena হইলেই তাহার মূলে কোন Real বস্তুর সত্তা না থাকিয়া পারে না। Kant এর মতে সেই বস্তুটী অজ্ঞেয়; শঙ্করের মতে তাহা সেই ব্রহ্মপদার্থ।

মহাত্মা পণ্ডিত গৌর গৌবিন্দ উপাধ্যায়, শঙ্করের এই মিথ্যা মায়াবাদের কলঙ্ক, তাঁহার সমন্বয় ভাষ্যে উত্তম বিচারের সহিত ক্ষালিত করিয়াছেন। এই সকল স্থানেই এই নবীন ভাষ্যকারের অসাধারণ কৃতিত্ব ও বিচার-চাতুর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। তিনি শঙ্করকে প্রকৃতরূপে বুঝিয়াছেন। এবং প্রকৃতরূপে বুঝিয়াছেন বলিয়াই জগৎটাকে তিনিও অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। জগৎকে উড়াইয়া দেন নাই বলিয়াই রামানুজ-প্রবর্ত্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মধ্যে তিনি কোনরূপ পার্থক্য দেখিতে পান নাই। যে শঙ্কর matter কে সূক্ষ্ম শক্তিরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার মতে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে সেই শক্তিবশে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বররূপে পরিণত হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য। এইরূপেই শঙ্কর, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভাষ্যকার পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ, শঙ্করাচার্য্যের এই মধুর তাৎপর্য্য ও অতি চমৎকার রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

ভরসা।

সে দিন বসিয়া আছি নৈহাটী ষ্টেশনে,
দেখা হ'লো এক পূর্ব্ব সহাধ্যায়ী সনে।
তাড়াতাড়ি বন্ধুবর বাড়াইয়া কর,
'হ্যাণ্ড-শেক্' করিলেন সানন্দ অন্তর।
গলে ঘড়ী হাতে ছড়ি কি উৎসাহ তার,
বিমলিন জীর্ণ বস্ত্র কটীতে আমার।
কে কোথায় কর্ম্ম করি, কত বা বেতন,
যখন এ আলাপের হ'ল সমাপন,
কহিলেন বন্ধু মোরে "এত লিখে প'ড়ে,
শেষকালে র'লে কি না গুরু-গিরি ধ'রে!
এ সামান্য বেতনেতে দিন চলা ভার;
কি আশা ভরসা, সখে, এ কর্ম্মে তোমার?"
অণুমাত্র না ভাবিয়া কহিনু সহসা—
"বাঁচিব না বেশী দিন এই তো ভরসা।"

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

খুকুমণি।

১

দেবতার দেশে তুই ছিলি দেবরাণী,
তোর ঐ রাঙ্গা ঠোঁটে,
স্বরগের ফুল ফোটে,
মুখে আধা কথামৃত চোকে মন্দাকিনী।

২

হৃদয়-স্বরগে তুই স্নেহের-নন্দন,
তোর হাসি মুখে খুকী
রাঙ্গা রবি দেয় উঁকি,
হাসি মুখে বসন্তের নব-ফুল-বন।

৩

অনন্তের মহাদান অমূল্য রতন
তোমার অঙ্গের বায়
পথে ঘাটে পাওয়া যায়,
পাকা হরিতকি ফল রজত কাঞ্চন।

৪

তোরি সরলতা ছাঁচে গড়া বুল্ বুল্
মূর্ত্তিমতী দয়া প্রেম
ফুলদলে গড়া হেম,
পুণ্যালোকে করুণার অশ্রুর পুতুল।

৬

কে ফুটালো এ অরণ্যে নব-ফুল-কলি
কমনীয় কলেবর,
গোলাপ ফুলের থর
পবিত্রে পুরাণ বেদ, সৌন্দর্য্যে বিজলী।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

টডের মহত্ত্ব।

১

মহারাষ্ট্র দাপে সোণার মিবার,
দলিত—নিষ্পিষ্ট, হ'লো ছার খার;
নাগরিক যত করে হাহাকার!
জনমভূমির দুর্গতি হেরি!

সমর-সাগরে করি' সন্তরণ,
সে সমর সিংহ—অমূল্য জীবন
দৃষদ্বতী-তটে দিল বিসর্জ্জন
যার তরে, হায়, আ' মরি মরি!

২

সংগ্রাম, প্রতাপ—প্রতাপে তপন,
যাঁদের প্রতাপে কাঁপিত ভুবন;
রক্ত বিনিময়ে স্বাধীনতা-ধন
রক্ষিলেন যাঁরা যতনে কত;

তাঁদের জননী কনক-মিবার,—
বিদেশীয় দলে দলি' অনিবার,
করিয়াছে আহা! কত অত্যাচার!
কত নর নারী হয়েছে হত!

৩

বাপ্পা রাওলের পূত সিংহাসন,
মিবারের শুভ্র বিজয়-কেতন,
আজি কাপুরুষ ভীম অভাজন,
কালিমা ছড়া'য়ে দিয়াছে তায়।
তাই সে পাষণ্ড মহারাষ্ট্রগণ,
চরণে পেষিছে মিবার ভুবন;
হিন্দুজাতি করে হিন্দু নির্য্যাতন,
হেন বিসদৃশ কোথায় হায়!

৪

"যায় যায় আজি যায় রসাতলে
সোণার মিবার," এ' মহীমণ্ডলে
গাও এ কাহিনী মিলিয়া সকলে,
ঢাল অশ্রুবারি মিবার-শোকে!
ভারতের দুঃখে ভারত-সন্তান,
একবিন্দু অশ্রু করে না প্রদান;—
হায়রে, বিধির বিচিত্র বিধান!—
কি ঘোর কলঙ্ক ভারত-বুকে!

৫

সবে মত্ত স্বীয় স্বার্থ-অন্বেষণে,
নিজ পরিবার-উদর পোষণে;
স্বদেশের তরে, হায়, একজনে
নাহি করে বিন্দু শোণিত দান!
"এ মহাবিপ্লবে কে রক্ষিবে আর
রাজস্থান-রাণী-কনক-মিবার?
আজি এ' ভারত হ'ল ছারখার!"
অশ্রুনীরে তিতি গাহ ঐ গান!

৬

নিস্তেজ আজিরে ভারত-তপন,
তাই সে উদার বৃটন-নন্দন,
চিতোর-দুর্গতি করিতে মোচন,
সপ্ত সিন্ধু-পারে এসেছে হেথা।

ধন্য হে বৃটন! ধন্য তব দয়া!
পরস্ব রাখিতে কার কাঁদে হিয়া?
স্বজাতি বোঝেনা স্বজাতির মায়া!
তব মহিমার তুলনা কোথা?

৭

এসেছ সাধিতে মিবার-কল্যাণ,
টড্ মহোদয়, য়ুরোপ-সন্তান!
ভারত-বান্ধব কে তব সমান?
এমন মহত্ত্ব কোথায় মিলে?
বিদ্রোহী সামন্ত তব প্রতিভায়,
আজি সভাস্থলে হইয়ে উদয়,
গায় সমস্বরে—"ভারতের জয়"
নির্যাতন-স্পৃহা গিয়াছে চ'লে!

৮

প্রতিহিংসা-বহ্নি গিয়াছে নিবিয়া,
স্বদেশের তরে কাঁদিয়াছে হিয়া,
সবাই রয়েছে সবারে চাহিয়া,—
রাখিতে মিবারে মার্হাট্টা-করে,
হে বৃটন! তব প্রতিভার বলে,
দুরন্ত—দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্র দলে,
হয়েছে বিনীত তব পদতলে!
লুপ্ত দ্রোহ-বহ্নি অনন্ত তরে!

৯

আজি 'ভিলবারা' অট্টালক চূড়ে
হয়েছে শোভিত; চরাচর যুড়ে
নাগরিক যত গায় সমস্বরে,—
"জয় দয়াময় বৃটন জয়!"
সুখে নিদ্রা যায় আজি রে মিবার!
থামিয়াছে যত শোক-অশ্রুধার!—
আর না শ্রবণে পশে হাহাকার!—
হর্ষে বৃটনের মহিমা গায়।

১০

ভারত-বান্ধব বৃটন নন্দন!
ছাড়িয়াছ কবে এ' মরভবন!
আজো তব নাম হইলে স্মরণ,
ভক্তি মদে মাতি নাচয়ে প্রাণ!
'রাজবারা' নাম র'বে যতদিন,
কালের গরভে না হ'বে বিলীন;
ভারত-নিবাসী সবে ততদিন,—
গাহিবে তোমার মহিমা গান!

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী ঘোষ।

প্রাচীন খ্রীষ্টীয় পূজাবিধি। (৩)

(সাধু জেম্‌সের সাধারণ পূজা-বিধির শেষভাগ)।*

আচার্য্য। এই মুহূর্ত্তটী কি ভয়ঙ্কর! প্রিয়জনগণ, যে মুহূর্ত্তে পরমাত্মা, জীবিত ও পবিত্র আত্মা, সর্ব্বোন্নত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, এই পুণ্য স্থানে আসিয়া, পরম প্রসাদের উপর আন্দোলিত হইয়া, উহাকে উৎসর্গ ও পাবিত করেন, সেই মুহূর্ত্তটী কি ভয়ঙ্কর! আইস আমরা সসম্ভ্রমে ও সভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করি।

পুরোহিত। [প্রণিপাত পূর্ব্বক পবিত্র পরমাত্মাকে এই বলিয়া আহ্বান করেন]

হে প্রভো, সর্ব্বশক্তিমান পিতা, আপনি আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের উপর এবং এই স্থানে প্রদর্শিত নৈবেদ্য-দ্বয়ের উপর, জীবনের যিনি প্রভু ও বিধাতা, যিনি আপনার সিংহাসনোপরি, পিতা পরমেশ্বর যে আপনি আপনার ও আপনার পুত্রের সহিত সমতুল্য, রাজ্যে তুল্য ক্ষমতা বিশিষ্ট, সম-বস্তু-সম্পন্ন, সমনিত্য, যিনি ব্যবস্থাতে প্রকাশিত, দৈবজ্ঞ দল দ্বারা প্রকাশিত, আপনার নূতন সন্ধি বন্ধনেও প্রকাশিত, যিনি আমাদের প্রভু যীশু মশিহের উপর যর্দ্দন-নদোপকূলে কপোতাকারে অবতীর্ণ হয়েন; যিনি সাধু শিষ্য দলের উপর দীপ্তিমান রসনার আকারে অবতীর্ণ হয়েন, সেই পবিত্র পরমাত্মাকে আপনি প্রেরণ করুন।

হে প্রভো, আমার এই প্রার্থনার উত্তর আপনি দান করুন।

লোকেরা। হে প্রভো, দয়া করুন।

পুরোহিত। এই নিগূঢ় পদার্থের উপর অবতীর্ণ ও বিস্তীর্ণ হইয়া তিনি যেন আমাদের শরীর ও আত্মার ক্ষমার জন্য ইহাকে একটী জীবিত দেহে, পরিত্রাণদায়ক দেহে, স্বর্গীয় দেহে, আমাদের প্রভু যীশু মশিহের দেহে, পরিণত করেন; যেন যে কেহ এই পদার্থ গ্রহণ করিবে, সে পাপের মোচন ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে গ্রহণ করে।

পুরোহিত। আর এই পান পাত্র * যেন নূতন নিয়মের রক্তে, ত্রাণদায়ক রক্তে, জীবনদায়ক রক্তে, স্বর্গীয় রক্তে, আমাদের আত্মা ও শরীরের পূর্ণ পরিশুদ্ধির উপযোগী রক্তে, প্রভু ঈশ্বরের ও আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু মশিহের রক্তে, পরিণত হয়, যেন যে কেহ ইহা গ্রহণ করি তাহারা যেন পাপের মোচন ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে।

লোকেরা। তথাস্তু।

পুরোহিত। যেন এই পদার্থদ্বয় আমাদের জন্য, আর যে কেহ ইহাদের গ্রহণ ইহাদের সহভাগী হইবে, তাহাদের জন্য, আত্মা ও শরীরের পবিত্রতা বিধান করে, সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দান করে; আর যমালয়ের দ্বারদেশ যেন সফল-মনোরথ না হয়, এই জন্য আপনি যে পবিত্রমণ্ডলীকে বিশ্বাসরূপ গিরির উপর স্থাপন করিয়াছেন, সেই মণ্ডলী যেন দৃঢ় সংস্থাপিত হইয়া বিরাজ করেন। জগতের পূর্ণাবস্থা যত দিন না উপস্থিত হয়, ততদিন আপনি মণ্ডলীকে তাবৎ উপধর্ম্ম হইতে উদ্ধার করুন। আপনার অদ্বিতীয় পুত্রের আশীর্ব্বাদ, দয়া মনুষ্য জাতির উপর করুণা দ্বারা এইরূপ ঘটুক, যাঁহা দ্বারা ও যাঁহার সহিত আপনার মহিমা ও সম্মান একত্রে জড়িত।

লোকেরা। তথাস্তু।

[এই সময়ে আচার্য্য মণ্ডলীর জন্য মণ্ডলীর কর্ত্তৃপক্ষদের জন্য লোকদিগকে প্রার্থনা করিতে অনুযোগ করেন।]

পুরোহিত। [প্রণিপাত হইয়া]

হে প্রভো, আমরা এক্ষণে এই ভয়ঙ্কর অথচ রক্তপাতবিহীন বলি, যে সকল পুণ্য স্থানকে আপনার পুত্র মশিহের আবির্ভাব দ্বারা আপনি মহিমান্বিত করিয়াছেন, ঐ

* গত পূর্ব্ব মাসের নব্যভারতে খ্রীষ্টীয় স্তোত্রটী "আইস আমরা" (Venite) সম্পূর্ণ ভাবে না দিয়া * * * চিহ্ন দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন। লেখকের উদ্দেশ্য নহে কোন অংশ লোপ করা বা আধুনিক ভাবে কোন ভাব প্রকটিত করা। কোন দুষ্য মত সাধু জেম্‌সের সাধারণ পূজা বিধির মধ্যে যদি থাকে, সে মতটী অপলাপ করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে। ভাল হউক, মন্দ হউক, পূজা বিধিটীর যথাযথ অনুবাদ করাই লেখকের উদ্দেশ্য। লুপ্ত অংশটী এই—

"যেমন ঈশ্বরকে কোপান্বিত করিবার দিনে, যেমন অরণ্যের প্রলোভনের দিনে, করিয়াছিলে, যখন তোমাদের পিতৃগণ আমাকে পরীক্ষা করিয়া ও কষিয়া মাজিয়া, আমার কীর্ত্তি দেখিতে পাইল। চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমি এই বংশের উপর ক্ষুব্ধ ছিলাম, আর বলিয়াছিলাম, এই জাতি হৃদয়ে প্রান্ত কারণ আমার গতিবিধি ইহারা বুঝিল না, যাহাদিগের সম্বন্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া আমি শপথ করিয়াছিলাম, উহারা যেন আমার শান্তিতে প্রবেশ না করে।" নি-গো-মু।

* কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে "এই পান-পাত্র স্থিত মিশ্র পদার্থ" এই কথাগুলি দৃষ্ট হয়।

সকল স্থানের ক্ষেমার্থ উৎসর্গ করিতেছি। বিশেষতঃ তাবৎ মণ্ডলীর প্রসূতি পবিত্র জায়নের * জন্য এবং সর্ব্বভূমণ্ডল ব্যাপিয়া যে মণ্ডলী বিরাজ করিতেছেন, সেই সনাতন মণ্ডলীর জন্য, যেন, হে প্রভো, আপনি উঁহার উপর পবিত্র পরমাত্মার বহুমূল্য দান সকল অর্পণ করেন। হে প্রভো, আমাদের ঈশ্বরপরায়ণ গুরুদেবদিগকে স্মরণ রাখিবেন; যাঁহারা সত্যের বচন আমাদিগের নিকট প্রকৃতরূপে বণ্টন করিয়াছেন, বিশেষতঃ আমাদের পিতৃগণকে আমাদের ধর্ম্মপাল .....কে এবং অবশিষ্ট সকল সত্যধর্ম্মনিষ্ঠ গুরুগণকে। হে প্রভো, আপনি উঁহাদিগকে সম্মানসূচক বার্দ্ধক্যে ভূষিত করুন, ধর্ম্ম ও পুণ্যে অনেককাল ধরিয়া আপনার লোকদিগের পালন করিবার জন্য আপনি উঁহাদিগকে রক্ষা করুন। হে প্রভো, আপনি এই পুরোহিত মণ্ডলীকে এবং আর আর স্থানের পুরোহিত মণ্ডলীকে এবং খ্রীষ্টের আচার্য্য মণ্ডলীকে, এবং পবিত্র সেবায় নিযুক্ত আর আর দলকে, এবং মণ্ডলীর প্রত্যেক সেবক-পর্য্যায়কে স্মরণে রাখিবেন। হে প্রভো, আমার দারিদ্র্যও আপনি স্মরণে রাখিবেন; আমি আপনাকে আহ্বান করিবার অযোগ্য হইলেও আপনি আমাকে যোগ্য করিয়া লইয়াছেন। আমার যৌবন কালের পাপ সমুদায়, আমার অজ্ঞানতা সমুদায় স্মরণ না করিয়া, আপনার স্বকীয় দয়ার প্রাচুর্য্যে আপনি আমাকে স্মরণ করুন। কারণ, হে প্রভো আপনি যদি কদাচরণ নিরীক্ষণ করেন, তবে কে আপনার দৃষ্টির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম? কিন্তু আপনার নিকট প্রায়শ্চিত্ত বিদ্যমান থাকিবার কারণ আপনি আমাকে দর্শন দিয়া আমার হৃদয় শুদ্ধ করুন; যেন পাপ যেখানে আপ্লুত করিয়াছিল, সেখানে গভীরতর ভাবে আশীর্ব্বাদ আপ্লুত করিয়া থাকিতে পারে। হে প্রভো,যাঁহারা বন্ধনে বা কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছেন, যাঁহারা নির্ব্বাসনে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সকল ভ্রাতৃগণকে, পীড়িত ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে,যাঁহারা অসদাত্মা দ্বারা উৎপীড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া আছেন,সেই সকল লোককে, আপনি স্মরণে রাখিবেন। হে প্রভো, বায়ু, বৃষ্টি, শিশির,ভূমিজাত শস্য এবং মুকুট ধারণরূপ বৎসরের যে শস্য চ্ছেদনকাল, এই সমস্ত আপনি স্মরণে রাখিবেন; কারণ সকলের দৃষ্টিই আপনার আশাপথ লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে এবং আপনিও তাহাদিগকে যথাসময়ে আহার দান করিবার জন্য আপনার হস্ত উন্মুক্ত করিয়া সকলকে পরিতৃপ্তি দান করেন, এবং তাবৎ জীবকে আপনার মঙ্গলময় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি দ্বারা পূর্ণ করেন।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

* সাধু জেম্‌সের পূজা বিধির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এই আর একটী নিদর্শন। রোম বা এণ্টিয়ক বা এডেসার মণ্ডলী তাবৎ মণ্ডলীর প্রসূতি বলিয়া এস্থলে গ্রাহ্য হয় নাই। এখনও জগৎব্যাপী সনাতন মণ্ডলী জেরুসালেম বা জায়নকে মণ্ডলীর কেন্দ্র বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। এখনও পিটার জেরুসালেমে থাকিয়া মণ্ডলীর বিবাদ বিসম্বাদ ভঞ্জন করিতেছেন, এখনও প্রেরিতগণ জেরুসালেম কেন্দ্র হইতে পশ্চিমে স্পেন ও ব্রিটন, দক্ষিণে আবিসিনিয়া, উত্তরে পারস্য ও মেসোপোটেমিয়া এবং পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও চীন পর্য্যন্ত সুসম্বাদ প্রচারে বাহির হইতেছেন। এখনও জেরুসালেম ধ্বংশ হয় নাই, রোম অথবা এণ্টিয়ক জেরুসালেমের স্থান অধিকার করে নাই। এস্থলে ক্রুশ চিহ্ন ভাবটীর গুরুত্ব জ্ঞাপক বলিয়া বলিতে হইবে। জেরুসালেম মণ্ডলী প্রমুখ সনাতন মণ্ডলী যে এক অভিন্ন সমাজ, এই গুরুভাবটী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র। (১)

[ভাষা-ব্যাকরণ-বর্ণমালা]

ভাষার কি অবস্থায় কোন্ স্তরে সাহিত্যের সংগঠন হইতে আরম্ভ হয়?

ব্যাকরণ-বিধি ও বর্ণমালা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে বিকাশ লাভ করার পূর্ব্বে সাহিত্যের সংগঠন স্বভাবতই সম্ভাবিত হইতে পারে না।

সাহিত্য কি?

সদ্ভাবের বা ভাবের সপ্রকাশ শরীরই, এক কথায়, সাহিত্য। চিন্তা-প্রবাহের প্রকট ও প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিকেই সাহিত্য বলি। চিত্তের ক্রিয়ার ও প্রতিক্রিয়ার বাক্য-চিত্রই সাহিত্য। সাহিত্য অন্তঃপ্রকৃতির বহিঃস্ফূরণ ও বহিঃপ্রকৃতির পুনঃ মুদ্রণ। স্বভাবের ও ভাবের সুনির্ম্মিত শব্দ-শরীরই সাহিত্য বটে।

অশরীরী সাহিত্য যাহাই হউক বা যাহা হওয়া সম্ভব হউক;—শরীরী সাহিত্য ভাষার সহিত ভাবের শোভনীয় শুভ পরিণয় সম্মিলন।

অতএব ভাব প্রকাশোপযোগী ও স্বভাব-অঙ্কনোপযোপী ভাষার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সাহিত্যের আবির্ভাব অসম্ভব। অর্থযুক্ত শব্দের সৃষ্টি এবং বাক্যের বিকাশ হইবার পূর্ব্বে সাহিত্যের সংগঠন সম্ভবে না। পরন্তু তদ্রূপ শব্দের বা বাক্যের লোক-পরিগৃহীত ও মনুষ্যের বোধগম্য সংযোজনা-প্রণালী যাহার আর এক নাম ব্যাকরণ-বিধি, পরিব্যক্ত বা প্রস্তুতীকৃত এবং প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেও সাহিত্য সংগঠন অসম্ভব। অপিচ, শব্দের স্বরূপাদি পরিব্যঞ্জক ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পরিচায়ক প্রতিনিধি বা প্রতিরূপ—লিপি করণোপযোগী চিহ্ন-বর্ণ—বাহ্যাবয়ব বা অক্ষরাবলীর অভিব্যক্তি ও বিকাশ ব্যতীতও বিশুদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সাহিত্যের সংগঠন হওয়া সম্ভাবিত হইতে পারে না।

ভাষায় যত কাল বহুবিধ ভাব পরিজ্ঞাপক বহু সংখ্যক শব্দের সৃষ্টি না হয়,ভাষা যতকাল ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক সূত্রে দৃঢ়ীকৃতা, সংযতা ও স্থায়ী-সংবদ্ধা হইয়া, অপরিবর্ত্তনশীলা ও উচ্ছৃঙ্খলতা-বিহীন না হয় এবং যতকাল কোনও না কোনও আকারে বর্ণমালা অভিব্যক্ত না হয়, ততকাল সাহিত্য মনুষ্যের মানস-কুক্ষি-অভ্যন্তরে, ভ্রূণবৎ বিদ্যমান বা বিলীন থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু,সাহিত্যের সংযোজনা ও রচনা, সাহিত্যের সম্প্রকাশ ও বহিঃবিকাশ ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গহ্বরে নিহিত থাকে। ভাবার্থযুক্ত শব্দাবলী, ব্যাকরণবিধি ও বর্ণমালা গঠিত বা সৃজিত হইবার পূর্ব্বে, ভাষা বিশেষে গ্রাম্য-গাথা বা তৎসদৃশ অবিশুদ্ধ হর্ষ বিষাদ পরিজ্ঞাপক ও ভয় ভক্তি পরিব্যঞ্জক, প্রকৃত ভাবার্থ ও ছন্দ যতিঃ বিরহিত অব্যয় ও অস্থায়ী শব্দে মাত্রে, উচ্ছৃঙ্খল ভাবে সংযোজিত, বাক্য বা পদাবলী বিরচিত ও লোকে তাহা বিস্মৃত না হওয়া অবধি কিয়ৎকাল মাত্র ব্যবহৃত বা গীত হওয়া সম্ভাবিত ও সংঘটিত হয়; কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে যাহাকে সাহিত্য বলা যায়, তাহা রচিত ও গঠিত হওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব থাকে।

বলা বাহুল্য যে, উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য ইহা নয় যে, সমগ্র শব্দ-শাস্ত্র ব্যাকরণ বিজ্ঞান ও অলঙ্কার-সংহিতা পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত হওয়ার পর তবে সাহিত্যের অঙ্কুর

হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব্বে সাহিত্যের সূত্রপাতই হয় না। না—উপরোক্ত কথার তাৎপর্য্য আদৌ তাহা নয়;—বরং তাহার বিপরীত।

ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্র সম্যক অবয়ব লাভ করার পর তখন সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয় নাই। প্রত্যুত ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্র ভাষার ও সাহিত্যের নিয়ামক ও পরিচালক হইলেও তাহারা ভাষা ও সাহিত্যের সংগঠিত শরীর হইতে আপন আপন অবয়বের অনেকখানি করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে এবং করে।

ফলতঃ এক পক্ষে, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদি বিজ্ঞান,ভাষা ও সাহিত্য সমালোচনারই ফল। ভাষা ও সাহিত্যের ছেদন, বিশ্লেষণ, শ্রেণী গঠন, নিয়ম-বন্ধন ও শৃঙ্খলা সংস্থাপন করিয়া এবং করিবার নিমিত্ত, ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি সৃষ্ট,সংগঠিত ও ক্রমশ জ্ঞান হইতে বিজ্ঞানে পরিণত হয়। কেন না শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শৃঙ্খলা সংবর্দ্ধক জ্ঞানই বিজ্ঞান।

কিন্তু, তাই বলিয়া, ব্যাকরণাদি বিজ্ঞান ও শব্দালঙ্কারাদি শাস্ত্র ভাষা ও সাহিত্যের সমালোচন ও শৃঙ্খলীকরণ হইতে উদ্ভূত ও বিকাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া, ভাষা ও সাহিত্যের সম্যক সৃষ্টি ও বিকাশ হইবার পর তবে ব্যাকরণাদি সৃষ্ট হইয়াছে, এমন কদাচ বলা যায় না। বলিলে সে বাক্যে বাতুলতাই বর্ত্তে।

ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি ভাষা ও সাহিত্যের সমালোচনার ফল হইলেও সে সমালোচনার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ভাষাদি সম্যকরূপে সংগঠিত ও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হওয়ার পর তাহার ছেদন বিশ্লেষণাদি হইয়া ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের ও গ্রন্থের সঙ্কলন হয় বটে। কিন্তু ভাষাগত ব্যাকরণাদি প্রণালী তাহার বহু পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমতঃ ভাষা ও ব্যাকরণের সম্বন্ধই দেখুন। ভাষা ও ব্যাকরণের পরে পরে নহে,—একত্রে অবিচ্ছেদ্য ভাবেই, আবির্ভাব হয়। এবং উভয়ে একত্রে ক্রম বিকাশ ও উন্নতির সহিত, স্তরে স্তরে বিস্মৃতি ও ঔৎকর্ষ্য লাভ করিতে থাকে। যখন যেমন ব্যাকরণ তখন তেমনি ভাষা; অথবা যখন যেমন ভাষা, তখন তেমনি ব্যাকরণ। শৈশব, কৈশোর, যৌবন সর্ব্বাবস্থাতেই ব্যাকরণে ও ভাষায়, শব্দ এবং অর্থের ন্যায় নিত্য সম্বন্ধ। ব্যাকরণ অর্থে কেবল গ্রন্থ বিশেষ নহে; ভাষার বোধগম্যতা, সংযোজন-গ্রন্থি, কখনও লিখনের রীতিই ব্যাকরণ। ব্যাকরণের বই লিখিত ও কায়দা কানুন সঙ্কলিত হইবার বহু পূর্ব্বে ব্যাকরণ জন্মিয়াছিল।

যখন ব্যাকরণ কাঁচা, তখন ভাষা ও কচি,—নেহাত না-বালিকা—সূতিকা গৃহের খুকী। যখন ব্যাকরণ শিথিল ও বন্ধনে অপটু, তখন ভাষাও আল্‌গা অস্থিমজ্জা-হীনা, আত্ম-বিস্মৃতা, উত্থান-শক্তি রহিতা; কোনও প্রকারে তৃণ-শয্যায় শায়িতা থাকিয়া,দুগ্ধ পোষ্যা শিশুর ন্যায় দুই চারিটী অর্দ্ধ সংবদ্ধ বা আদৌ অসংবদ্ধ এবং অসংলগ্ন, অস্ফুট, অবোধ্য ও সদা পরিবর্ত্তনশীল শব্দ উত্থিত করিয়া, কখনও বা রোদন করিয়া, কখনও ইশারা ইঙ্গিত করিয়া,—হাত পা মুখ নাড়িয়া, তখন তিনি স্বকার্য্য সাধন করেন। তখনকার সেই অস্ফুট অসংবদ্ধ আওয়াজ, ক্রন্দন, ও অঙ্গাদির সঞ্চালনের মধ্যে ভাষার, অতএব সেই সেই ভাষার ব্যাকরণের ভ্রূণ বিদ্যমান থাকে। পরন্তু

ভাষা, যখন সূতিকা-গৃহ হইতে বহির্গতা, হাঁমাদিতে বা হাঁটিতে শিখিয়াছেন, তখন ব্যাকরণ ত একটী বর্দ্ধনশীল বালক;—ভাষা-বালিকা দুই হাত ধরিয়া "হাঁটি হাঁটি পায় পায়" করিতেছে; সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে আছে, কখনও আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে; কভু বা ভাষা-বালিকাকে আদরে অগ্রে করিয়া, ব্যাকরণ-বালক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। তখন বালক বালিকায় মেলা মেলি গলাগলি;—দলাদলি ঠেলাঠেলি নহে। বালিকার সহিত বালকের একত্রে অবাধ গতি বিধি; বালক বালিকার গতি বিধি চালায় ও বুঝিয়া চলে; বালিকার অঙ্গ মার্জ্জনা, কেশ-বিন্যাস করিয়া দেয়, খেলা-ঘর সাজাইয়া দেয়। তখন তথা-কথিত "ভট্টাচার্য্য-ব্যাকরণ" এর ভূত বাহির হয় নাই। তখন স্বভাবজা ভাষার স্বাভাবিক ব্যাকরণ, তাহার সহজ, সরল ও সাদর সাহচর্য্যে সমুত্থায়মান।

ক্রমে যখন ভাষা কৈশোর চাঞ্চল্যে, অতিমাত্র চঞ্চলা বা উন্মেষ যৌবনে উদ্দাম গতিশীলা; উঠিতে ও ফুটিতে, লুটিতে ও ছুটিতে শিখিয়াছে; দিগ্বিদিক-হাসিনী দামিনীর মত অতিদ্রুত দৌড়িতে পারে, তরুণ বয়সের বৈদ্যুতিক তেজে "অভাঙা" অশ্বিনীর ন্যায় দিগ্বিদিক্ না মানিয়া, উধাও ছুটিতে চায়; শৃঙ্খলা ও সংযম অতিক্রম ও উপেক্ষা করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতায় ধাইতে যায়;—ভাষা-ভগিনীর যখন এই ভাব—সদা ঊর্দ্ধ দৃষ্টি ও অপাঙ্গ হেলন, বিস্ফারিত বক্ষ, রক্তিম গণ্ড ও চঞ্চল চরণ এবং নিয়ত নিত্য-শীল নয়ন; তখন ভ্রাতা ব্যাকরণও বিলক্ষণ একজন বলিষ্ঠ ও বিশিষ্ট ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। ভগিনী ভাষা রূপিণী তরুণ অশ্বিনীর অসংযত গতি, উদ্দাম বিকৃত বেগ বারণার্থে, তাহার সুন্দর অধর-বিবরে, ভ্রাতা ব্যাকরণ তখন ধীরে ধীরে অপ্রকাশ্যে অদৃশ্যে একটী সুবর্ণময় বল্গা আঁটিয়া, তাহার শ্লথ রজ্জু স্বয়ং ধরিয়া রহিয়াছেন। "পাগলী! কত ছুটবি ছোট্, কত ফুঠবি ফোট;-কিন্তু খবরদার, আপথে কুপথে যেতে পারবি না। আমি বাম হস্তে বল্গা ধরে' আছি।"

বিচক্ষণ ভ্রাতা উদ্ভ্রান্তা ভগিনীকে তখন যেন ঐরূপ বলিতেছেন। ভ্রাতা মাত্রেই বলিয়া থাকেন। কথা কটী ও কার্য্যটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপযুক্ত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই বটে। কিন্তু, অনেক অবস্থায়, কনিষ্ঠেও জ্যেষ্ঠের মত কার্য্য মত কার্য্য করিয়া থাকে। ব্যাকরণ ভাষার জ্যেষ্ঠ না হইলেও কনিষ্ঠ নহে। ভাষা ও ব্যাকরণ যমজ ভগিনী ভ্রাতা; যুগপৎ স্বভাব ও শিল্প হইতে অভিব্যক্ত।

উপরি অঙ্কিত অবস্থায়, বা উহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কোন অবস্থাতেই ভ্রাতা ব্যাকরণ ভগিনী ভাষার স্বাধীনতার ও স্বাভাবিক উন্নতির বিরোধী নহে। প্রত্যুত সকল সময়েই ও সর্ব্ববিষয়েই তাহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী এবং পৃষ্ঠপোষক। সদা অঙ্কুশ হননে বা অযথা বল্গা আকর্ষণে ভগিনীর স্বাভাবিক পতি-রোধ করা—শরীর মনের সঙ্কোচতা সাধন করা ভ্রাতার উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবে তাহাদের স্বাস্থ্যকর সম্প্রসারণ করাই তাহার লক্ষ্য। ভাষার বেগ-শীলতার বৃদ্ধি, উচ্ছ্বাসের সাভাবিক স্বাধীনতা, নিত্য নূতন পরিচ্ছদ, নূতন ভঙ্গিমা, নূতন লীলারঙ্গ—নিত্য নূতন শক্তি-সম্পদ, সম্ভারের সংগ্রহে ব্যাকরণ উৎকর্ষ লাভ করে—উপকৃত হয়; ব্যথিত হয় না;

বাধাও দেয় না। ব্যথিত হইবার বা বাধা দিবার ত কথাও নয়। তবে, ব্যাকরণ-বৃক্ষে, একাল সে কাল, সর্ব্বকালেই বানরে যাইয়া ও বাসা বাঁধিয়া থাকে বটে। সে বাসা তখনও ছিল, এখন হয়ত বেশি হইয়া থাকিবে। ব্যাকরণ-বৃক্ষের সেই বানর গুলাই ব্যাকরণের সংরক্ষক সাজিয়া, ভাষার অভিনব গতি শক্তি দেখিবা মাত্র আঁতকে উঠে, তাহাতে বাধা দিবার জন্য দুপাটি দন্ত বাহির করিয়া ব্যাকরণের বৃথা দোহাই দেয়, লাঙ্গুল আছড়ায়, মুখ ভ্যাঙ্গচায়। যে আঁতকাণি, আছড়ানি, পিছড়ানি ও ভ্যাঙ্গচানি দেখে ব্যাকরণ-ভায়া নিজেই হাঁসিতে হাঁসিতে ওষ্ঠাগত-শ্বাস;—ভাষাকে বলেন—"ভগিনী, তুমিই এখন আমায় বস্ত্রাঞ্চলের একটু বাতাস দিয়া বাঁচাও। এই বানর গুলা, আমার হইয়া তোমায় বাধা দিতে যাইয়া আমায়ই যে আগে খুন করে বসিল।"

বলা বাহুল্য, বৈয়াকরণ-বানরের বাঁদরামির দৌরাত্ম্যে ব্যাকরণের ও ভাষার কিছুই আসিয়া যায় না। জানোয়ারে মনুষ্য জাতির সাহিত্যের অঙ্গে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া, শত সহস্র নখাঘাত ও লাঙ্গুল পাত করিয়াও কোন চিহ্ন স্থাপন করিতে পারে না।

ফলতঃ ব্যাকরণ, ভাষার সকল স্তরেই, তাহার উন্নতির সাধক;—বাধক কেবল তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার। উচ্ছৃঙ্খলতা উন্নতি নয়। উন্নতি অতীতের সংরক্ষণ সাপেক্ষ। ব্যাকরণ ভাষাকে তাহাই করায়। তজ্জন্য, যে শাসনের প্রয়োজন, আবশ্যক স্থলে, কেবল সেই শাসনই করে। সে শাসনের পরিমাণ প্রসার কি, ব্যাকরণ নিজে তাহা বিলক্ষণই বুঝেন। বৈয়াকরণগণ কোন কোন সময়ে তাহা না বুঝিলেও পারেন। কিন্তু, কেবল ব্যাকরণবাহী বলদদের, কোন কালে, কিছুতেই, তাহা বুঝিবার কথা নয়। ব্যাকরণ নিজে তাহা বুঝিয়া, ভাষার নব নব ভঙ্গিমায়, নিজ ভবনের সংস্কার করেন—সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচন করেন।

পক্ষান্তরে, ভাষা যদি কখন উচ্ছৃঙ্খলতায় উদ্ধতা ও আত্ম বিস্মৃতা হইয়া নিজ দেহে ব্যাকরণ-নির্ম্মিত অতীতের দৃঢ় দুর্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া-নাশের সোপানারোহণে প্রবৃত্তা হন, ব্যাকরণ তখনি স্বহস্তস্থ, ঠাকুরাণীর শশাঙ্ক-বদন-সংলগ্ন সুদীর্ঘ সুবর্ণ "লাগাম" টী সজোরে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পতন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। ভাষার স্বাস্থ্যকর স্বাধীনতায়, অভিনব শক্তি সঞ্চালনে, বা সাময়িক গতি পরিবর্ত্তনে, ব্যাকরণ, এক বিন্দুও ব্যাঘাত করেন না। ব্যাকরণ প্রতিবাদ করেন, বাধা দেন, প্রতিবন্ধক হন কেবল ভাষার উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতায়। কেন না স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এক বস্তু নয়; সম্পূর্ণ পৃথক ও সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ। স্বাধীনতায় উন্নতি;—স্বেচ্ছাচারিতায়,—পতন ও ধ্বংস। স্বাধীনতা অতীতের শৃঙ্খলার সংরক্ষণ ও সামঞ্জস্য করিয়া, অভিনব অর্জ্জন বা সৃজন করিতে অগ্রসর হন। আর স্বেচ্ছাচারিতা শৃঙ্খলা-ভ্রষ্ট হইয়া ও স্থায়িত্বনষ্ট করিয়া, এক পাদ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই অধঃপাতে যায়। তফাৎ এই।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, ব্যাকরণ একদিকে ভাষার সেবক ও সংবর্দ্ধক এবং অপর দিকে শাসক ও সমালোচক। একই সঙ্গে ব্যাকরণের এই উভয়বিধ অধিকার;—সেবার অধিকার এবং শাসন ও সমালোচনার অধিকার। এই দুই অধিকারেই

ব্যাকরণের বিধি ও নিষেধ নির্ম্মিত। অথচ, আমরা আরও দেখিতেছি যে, ভাষা এবং ব্যাকরণ মূলতঃ একটীর পর অপরটীর জন্ম নহে; উহারা উভয়েই একত্র উদ্ভূত; এবং ভাষায় ও ব্যাকরণে নিত্য সম্বন্ধ।

ভাষা ও ব্যাকরণকে পৃথক করিয়া, স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিলেই, ঐ কথা বলিতে হয়। নতুবা আর এক দিক দিয়া দেখিলে ভাষা ও ব্যাকরণ মূলতঃ একই বস্তু; উভয়ের একই দেহ একই প্রাণ; পার্থক্য ও দূরত্ব কিছু মাত্র নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে পার্থক্য হইতেই পারে না। যেহেতু ব্যাকরণ বিরহিতা ভাষা, বিশষতঃ বোধ্য ও বিশুদ্ধ ভাষা, আদৌ অসম্ভব; আদৌ হইতে পারে না। কেন? একটু বিচার করা যাউক।

ভাষা কাহাকে বলে?

অর্থযুক্ত ও ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দ এবং সেই শব্দ পরম্পরার বিন্যাসকেই ভাষা বলি। সংক্ষেপে বলিলে, ভাষা আর কিছুই নয়,—বহু প্রকারে সংযোজিত বহুপ্রকারের শব্দ-সমষ্টি মাত্র। শব্দ সকলের ভিন্ন ভিন্ন ব্যষ্টির প্রয়োগ-বিন্যাস বা সংযোজনার তারতম্যানুসারে, বাক্য বা বাক্যাবলী প্রস্তুত হইয়া, মনুষ্য-মনের সাধারণ এবং বিশেষ বিশেষ ভাব পরম্পরা প্রকাশিত হয়। যে শব্দের দ্বারা যে ভাব প্রকাশ করিতে হয়, সেই শব্দ সেই ভাবের স্বরূপ-সমন্বিত বা ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া আবশ্যক এবং উচিত। অন্যথা, শব্দ অর্থশূন্য ও তাহার প্রয়োগ বিড়ম্বনা মাত্র হয়। প্রথমতঃ শব্দের অর্থোপযোগিতা এবং দ্বিতীয়তঃ শব্দের প্রয়োগ পন্থার কার্য্যকারিতার উপর বাক্যের সাফল্য বা বিফলতা নির্ভর করে। যে যে স্থলে শব্দ সমূহের অর্থ-বৃত্তি বা অর্থ-বহন-শক্তি উপযুক্ত এবং সেই সেই শব্দের বিন্যাস রীতি, সুসমর্থ, সেই সেই স্থলেই বাক্য ভাব প্রকাশক্ষম হইয়া, ভাষা নাম প্রাপ্ত হয়। তদ্বিপরীত স্থলে তাহা হয় না। অন্ততঃ হওয়া উচিত হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভাষা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম শব্দ ও তাহার অর্থ-বৃত্তি এবং দ্বিতীয়, শব্দ-বিন্যাস ও বিন্যাসের বৈচিত্র্য।

এখন দেখা যাউক ব্যাকরণ কি?

শব্দের অর্থ-বৃত্তির নির্দ্ধারণ ও শব্দ-বিন্যাস-বিধিই, এক কথায় ব্যাকরণ। ব্যাকরণ বস্তুটা আর কিছুই নয়। বাঘও নয়, ভালুকও নয়, টিকি বা টোপর মাথে, বেতহাতে "গুরুমশাইও" নয়; আর তাহা মেছুনী-মুখো ময়লা-ভুকো জন্ম-হন্যা জানোয়ারত নিশ্চয়ই নয়। ব্যাকরণ—ব্যাকরণই। যদিও ইদানীং বঙ্গদেশে গাছবানরে ও জন্তু-জানোয়ারে ব্যাকরণ টোল খুলিয়া ছোঁছো-ন্দরিক "ষত্ব বিধান" ও 'নৈষ্ঠীবনিক' "ণত্ব বিধান" হুঙ্কার করিয়া রাজপথ নোঙ্গরা করিতেছে।

অথবহ শব্দ বিন্যাসই ভাষা। শব্দার্থ সংযোজন ও শব্দ প্রয়োগ-নিবাকরণই ব্যাকরণ। অতএব ব্যাকরণ-বিরহিতা শাব্দিক ভাষা সম্ভবে না। ভাষার অভ্যন্তরে ব্যাকরণ স্বতঃ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ভাষারি ভাষাত্ব সৃজনই ব্যাকরণ। ভাষার আত্ম-প্রকাশ রীতিই ব্যাকরণ। অতএব এক সময়ে ভাষা ও আর এক সময়ে তাহার আত্ম প্রকাশ রীতি সৃষ্টি হওয়া যেমন সম্ভবে না; তেমনি এক সময়ে ভাষা ও অপর সময়ে বা ভাষা সৃষ্টির পরবর্ত্তী সময়ে, ব্যাকরণের আবির্ভাব কল্পনা করা সঙ্গত

হইতে পারে না। যে হেতু ভাষার আত্ম-প্রকাশ-রীতি বা প্রয়োগ-বিধিই মূলতঃ ব্যাকরণ।

ফলতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে, যাহাকে ভাষা বলা যায়, তাহা ব্যাকরণের সাহচর্য্য ও সহায়তা ভিন্ন কখনই সংগঠিত ও সৌষ্ঠবান্বিত হইতে পারে না। প্রয়োগ-বিধি-বিবর্জ্জিত ও অসংলগ্ন কতকগুলি শব্দকে ভাষা বলা যায় না। যেহেতু তদ্দ্বারা মনোভাব পরিব্যক্ত হয় না। ভাষার উদ্দেশ্য মনোভাব ব্যক্ত করা এবং তাহা করে বলিয়াই, সেই করাকে ভাষা বলে। ভাষার যে স্বরূপ ও স্বভাব থাকিলে মনোভাব ব্যক্ত হয়, সেই স্বরূপ ও স্বভাব ব্যাকরণ কর্ত্তৃক গঠিত, নিয়মিত ও বর্দ্ধিত হয়।

ব্যাকরণ, এক দিকে, যেমন ভাষার ছেদন, বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ প্রণালী নির্দ্দেশ করেন, অপর দিকে তেমনি, বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিয়া ভাষার সম্যক সংগঠনও করেন। ব্যাকরণ, যে পরিমাণে, ভাষার সমালোচক, ঠিক সেই পরিমাণে তাহার সংগঠন কার্য্যেরও অবিভাবক, নিয়ামক।

ভাষার সহিত ব্যাকরণের সম্বন্ধ এই। ইহার অধিকও নয়, অল্পও নয়।

ব্যাকরণের বিধি-ব্যবস্থা রূপ রাজকীয় মুকুট মস্তকে পরিয়া, তাহার অনুশাসন-সংহিতা কক্ষে ধরিয়া এবং তাহার সাহচর্য্যের এবং সেবার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি এবং স্মৃতির শত শত অখণ্ড ও খণ্ড চিহ্ন বক্ষে করিয়া, ভাষা যখন পরিপূর্ণ-শরীরা, অতুল শক্তিশালিনী; অপরিমেয় ধন রত্নের অধিকারিণী, নানা দিক্‌দেশের শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-ভাগিনী, সর্ব্বলোক সংপূজ্যা, সুসংযতচিত্তা, ধীর গম্ভীর সমুন্নত সৌন্দর্য্য-বিকাসিনী এবং সাহিত্য-রাজ্যের সিংহাসনারূঢ়া জননী পাটরাণী, তখন ব্যাকরণ কোথায়? তখন ব্যাকরণ কি? তখন ভাষা-পাটরাণীর "প্রাইম মিনিষ্টার"—প্রধানতম মন্ত্রী,তখন ব্যাকরণ সেই সাহিত্য সাম্রাজ্যের মহা পার্লামেণ্টের "লর্ড কমন্‌স" উভয় গৃহেরই "প্রেসিডেণ্ট" "স্পিকার" পরিচালক। মহামন্ত্রীর মন্ত্রণা ও "মিনিট" "মেনিফেষ্টো" এবং "ম্যানডেট" মতেই মহারাণীর রাজকার্য্য পরিচালিত ও রাজশক্তি সমর্থিত হয়। সাহিত্যের সাধারণ-তান্ত্রিক সভায় শত শত সদস্য। ব্যাকরণ-রূপী সভাপতির শতশত সহযোগী এবং প্রতিযোগী। শত শত শিল্পী, শত শত সমালোচক দ্বারা সে মহা পার্লামেণ্টের আবার "অপোজিসন বেঞ্চ" গঠিত। 'অপোজিসন বেঞ্চ' 'মিনিষ্টিরিয়াল বেঞ্চের' প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিবাদকারী। 'মিনিষ্টিরিয়াল বেঞ্চ' প্রেসিডেণ্ট ও তাঁহার 'ক্যাবিনেট-মিনিষ্টার' অর্থাৎ সহকারী মন্ত্রী-সম্প্রদায়ের আসন। পরন্তু 'অপোজিসন বেঞ্চ' প্রেসিডেণ্ট ও প্রসিডেণ্ট-প্রমুখ মন্ত্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত নীতি ও বিধি ব্যবস্থায় আপত্তিকারী সম্প্রদায়ের আসন। উভয় আসন বা বেঞ্চ বেড়িয়া সহস্র সহস্র সদস্য বা "এম-পি;—(মেম্বর সাহিত্য-পার্লামেণ্ট) অবস্থিত। মেম্বরগণের মধ্যে অধিকাংশ, মন্ত্রী সম্প্রদায়ের সমর্থক, এবং কিয়দংশ আপত্তিকারী-সম্প্রদায়ের বা 'অপোজিসন বেঞ্চের' অনুগত ও দলভুক্ত। উভয় আসনেই মহা মস্তিষ্কবিশিষ্ট মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ও প্রবল প্রতিভাশালী প্রতাপান্বিত সাহিত্যাচার্য্যগণ উপবিষ্ট। —ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্ মহর্ষি, মনস্তত্ত্ববিদ্ মনীষী

দার্শনিক, কলা-বিদ্যাবিদ্ কবি, আলঙ্কারিক, শিল্পী ও সমালোচক, বিপুল জড় বিজ্ঞানের বহু ভাগ ও বিভাগীয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ, তথা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, নৈয়ায়িক,তার্কিকগণ,বিভিন্ন শ্রেণীর বৈয়াকরণ, ও মহাবাগ্মী বাচস্পতিগণ তথায় স্থির নেত্রে, গম্ভীর বদনে, প্রগাঢ় চিন্তায়, গভীর ধ্যানে, যেন সমাধি-নিমগ্ন সমাসীন।

ভাষা মহারাণীই সাহিত্য-রাজ্যের চির অধিশ্বরী। কিন্তু, সাধারণ তান্ত্রিক নীতি ও নিয়মে সে রাজ্যের সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত ও চালিত হয়।

ভাষা মহারাণীর সাহিত্য সাম্রাজ্য রক্ষার্থে, এবং সে রাজ্য নিত্য নবার্জ্জিত রাজৈশ্বর্য্যে বিপুল বর্দ্ধিত ও বিভূষিত করণার্থে,—মহারথী, রথী, সেনাপতি, সেনা-নায়ক অসংখ্য অসংখ্য, স্বতঃনিযুক্ত। সাহিত্য-রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এবং কেন্দ্রে, দেশে এবং প্রদেশে, ইহাঁদের অধীনে এক একটী অতি বৃহৎ বাহিনী বা সৈনিক-রেজিমেণ্ট। ইহাঁরা, —গ্রন্থকার, লেখক, চিন্তক, চালক, শিক্ষক, পরীক্ষক, সমালোচক, পর্য্যটক, আবিষ্কারক এবং ভাবুক;—সাহিত্য রাজ্যের শস্ত্রধারী সেনা, সংগ্রামকারী "ষ্ট্যানডিং ফিল্ড ফোরস্" —যুদ্ধক্ষেত্রে, নিয়ত দণ্ডায়মান সৈনিক বল। ইহাঁরা জয়াশায় দিবা নিশি যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সাহিত্যরাজ্যে, নিত্য নূতন ভূমি, নবীন সম্পদ সম্পত্তি জিত ও সংযোজিত হইতেছে। জ্ঞান-রাজ্য, বিজ্ঞান-রাজ্য, তত্ত্ব-রাজ্য, ভাবরাজ্য, বহু রাজ্যই সাহিত্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। সকল রাজ্যেই সৈন্য-বাহিনী ও কৃষিবল আছে। সকল রাজ্যেরই ভূমি সৈনিক বলে বর্দ্ধিত হয় ও কৃষি-বল দ্বারা কর্ষিত হয়।

এই সকল সৈনিক বাহিনীর "ফিল্ড মার্শাল, জাঁদরেল, ও মহারথী, অতিরথী হইতে "কমন সোলজার"—সামান্য সিপাহী পর্য্যন্ত এবং কৃষি-বলের জমিদার তালুকদার হইতে কৃষক "কালটিভেটর" পর্য্যন্ত সকলেই সাহিত্য-পার্লামেণ্টের স্বাধীন সদস্য। কেহ মন্ত্রী সম্প্রদায়ের অনুগত, আশ্রিত, কেহ বা উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দীদিগের দলভুক্ত।

প্রাইম মিনিষ্টার ও তৎপ্রমুখ মন্ত্রী ও লিডিং মেম্বর সম্প্রদায়েরই সমর্থক বেশী, লোক-বল ও ভোট-বল বেশী। কিন্তু প্রতিদ্বন্দী দলের অপোজিসন বেঞ্চেরও শক্তি নিতান্ত অল্প নহে। মিনিষ্টরিয়াল বেঞ্চের মেম্বরগণ ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী সদস্যগণ সকলেই "ইম্পিরিয়ালিষ্ট" অর্থাৎ রাজতান্ত্রিক এবং সংরক্ষণশীল, কি-না—কনজারভেটীব। পক্ষান্তরে "অপোজিসন বেঞ্চ" উদার নৈতিক সাধারণ তান্ত্রিক লইয়া গঠিত। ইহাঁরা অত্যুন্নতিশীল "লিবারাল"—ইহাঁদের মধ্যে "আলট্রা-লিবারাল," "র‍্যাডিকাল" এবং অতিরিক্তর‍্যাডিকাল পর্য্যন্ত আছেন। এমন কি, সংরক্ষণ সংহারবাদী "সোসিয়ালিষ্ট" ও নিহিলিষ্টও ইহাঁদের দলে আছেন। সংরক্ষণশীল মন্ত্রী সম্প্রদায় ও মেম্বরগণ ভাষা মহারাণীর রাজশক্তি সম্পূর্ণ রূপে সংরক্ষণ করিতে ও রাজকীয় প্রথা সকল ষোল আনা অক্ষুণ্ণ রাখিতে নিয়ত সচেষ্টিত। পক্ষান্তরে, তাঁহাদের প্রতিপক্ষীয় উন্নতিশীল আপত্তিকারীগণও যে ভাষা রাণীকে রাজ্যচ্যুতা করিতে অভিলাষী, তাহা নহে। তাঁহারাও রাণীর রাজভক্ত ও রাজ্য-ভুক্ত প্রজা, 'সেবাইত,' সৈনিক এবং কৃষি-বল। তাঁহারা রাণীর রাজ-সিংহাসনের অনুরক্ত বটে। তবে-কিনা তাঁহারা রাণীর রাজকীয় সারেক

রীতি নীতি প্রথা এবং কায়দা কানুন অতিরিক্ত মাত্রায় পরিবর্ত্তন করিতে এবং কোন কোনও স্থলে একেবারে উঠাইয়া দিতে উৎসুক।

এক দিকে, উদার নৈতিকদিগের নব্য উন্নতিশীলতার এই সম্প্রসারণ-প্রিয়তা, অপর দিকে, বৃদ্ধ ব্যাকরণাবর্ত্তী বিরাট বলশালী-সংরক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রাচীন সংরক্ষণশীলতার আকুঞ্চন-প্রবণতা,—এই দুই পরস্পর প্রতিদ্বন্দী-শক্তির সামঞ্জস্যে ও সমাহারে সমাগত, এবং ভাষা রাণীর অভিনব উন্নতি ঐশ্বর্য্যের সমাগম হয়, সুদৃঢ় ও সুচিরস্থায়ী শ্রী ও সম্পদ এবং পুরানতায় পবিত্র ও চিরপ্রচলিত রাজকীয় রীতি-পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার পথে পরিবর্ত্তিত হইতে পায় না। পরস্পর প্রতিদ্বন্দী শক্তিদ্বয়ের ঘাত প্রতিঘাতে, ক্রিয়ায় ও প্রতিক্রিয়ায়, প্রজা-তান্ত্রিক রাজনীতিক ক্ষেত্রের ন্যায়, সাহিত্য-ক্ষেত্রে ও ভাষার রাজ্যে অতি স্বাস্থ্যকর সুফল উৎপন্ন করে।

ভাষার চির অপরিবর্ত্তিত, প্রাইমমিনিষ্টার' ও ভাষা-পার্লামেণ্টের চিরস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট অতি বৃদ্ধ ব্যাকরণ মহাশয় নিয়ত নবীন যুবার জ্বলন্ত তেজে "অপোজিসন বেঞ্চের" বড় বড় বাগ্মী ও দুরন্ত দুরন্ত "ডিবেটিয়া"-রদের সহিত সংগ্রাম করিয়া এবং সময় বিশেষে সন্ধি স্থাপন করিয়া, ভাষা রাজ্যে চিরকাল আত্ম প্রভুত্ব ও ভাষার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও সমুন্নত করিয়া আসিতেছেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে "মিনিষ্ট্রির" বদল হয়। কিন্তু, সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যাকরণ-মহাত্মার প্রধান মন্ত্রিত্ব ও সভাপতিত্ব কোনও কালে পরিবর্ত্তিত হয় নাই; হইবার সম্ভাবনাও কোনও কালে নাই।

ভাষা রাণীর মন্ত্র-ভবনে, প্রধান মন্ত্রী-ব্যাকরণ মহাশয়ের দুই জন সর্ব্বপ্রধান সহযোগী আছেন। তাঁহাদের পদ গৌরব ও কার্য্য-মাহাত্ম্য ব্যাকরণের অব্যবহিত নিম্নেই, তাঁহারাও ক্যাবিনেট মিনিষ্টার। মন্ত্র-গৃহের গঠন এই রকম;—

নাম	পদ
ব্যাকরণ.....	প্রধান মন্ত্রী—প্রাইম মিনিষ্টার।
ন্যায় বা লজিক..	দ্বিতীয় মন্ত্রী লর্ড চান্সালার বা বার বিচার ব্যবস্থাপক।
অলঙ্কার বা রেহ্‌টরিক...	তৃতীয় মন্ত্রী দেওয়ান তোসাখানা বা লর্ড চাম্বারলান।

এই মন্ত্রীত্রয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, ভাষা মহারাণীর সাম্রাজ্যের ও শরীরের সংরক্ষক এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য-শুদ্ধি-সৌন্দর্য্যের এবং কুশল মঙ্গলের মন্ত্রণাদাতা। ভাষার বিশুদ্ধি, সুসঙ্গতি এবং লাবণ্য-প্রসাধন-কলা, যথা ক্রমে তিন মন্ত্রীর এলাকাধীন। মন্ত্রীত্রয়, এক যোগে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে, কার্য্য করিয়া থাকেন।

ব্যাকরণ।—শব্দের বিভক্তি ও বিমিশ্রণ, ঐক্য এবং অনুসাশন, সংযোজন ও অর্থ সামর্থ্যের সঙ্গতি নিয়মিত করিয়া, ব্যাকরণ, ভাষার সংসারে সুস্পষ্ট, সুবোধ্য ও বিশুদ্ধ বাক্য গঠন করিয়া দেন। বাক্যের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব, যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা ব্যাকরণের বিবেচ্য নহে। ব্যাকরণ বিশুদ্ধ ও বোধগম্য বাক্য গঠন করিয়া দিয়াই খালাস। ব্যাকরণের গঠন করিয়া দেওয়া বিশুদ্ধ ও বোধ্য বাক্য সত্য হইলেও হইলেও পারে, মিথ্যা হইলেও পারে। সঙ্গত হইলেও পারে, অসঙ্গত হইলেও পারে। সম্যক বা অসম্যক হইলেও হইতে পারে। সিদ্ধান্ত নিষ্কাষনোপযোগী হইলেও পারে; না হইলেও পারে। এ সকল হইল বা না হইল, ব্যাকরণ ও তাহার আইন কানুন তাহা দেখেন না। তাহা দেখেন, যুক্তি বা ন্যায় দর্শন। ব্যাকরণ দেখেন কেবল ভাষার বিশুদ্ধতা ও বোধযোগ্যতা এবং শব্দের শক্যার্থ ও সার্থকতা।

ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র।—বিষয়ের বা বাক্যের প্রতিজ্ঞা, হেতু প্রমাণ, প্রেমেয়, প্রয়োজন, পরীক্ষা, সংশয়, সিদ্ধান্ত, নির্ণয় ও নিরুপণাদি নিয়মিত করিয়া ভাষার যৌক্তিকতা, সঙ্গতি ও সংস্থান-সম্যকতা-প্রতিপন্ন করেন ন্যায় শাস্ত্র বা তর্ক বিদ্যা। কার্য্য কারণ শৃঙ্খলের ও তাহাদের সম্বন্ধ পরম্পরার বিচার, বিবেচনা ও সমালোচনা করিয়া প্রমাদ শূন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ন্যায়-শাস্ত্র শিক্ষা দেন। ন্যায়ের নিয়ন্ত্রিত্বে ভাষা-প্রকাশিত এবং সাহিত্যগত সিদ্ধান্ত সকলভ্রম প্রমাদ শূন্য হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সেই সিদ্ধান্তের যথার্থতা বা সত্যতা ন্যায় শাস্ত্র অঙ্গীকার করেন না। প্রতিজ্ঞা ও প্রমাণাদির যথার্থতার উপরেই সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্ভর করে। ভ্রান্ত প্রতিজ্ঞা ও মিথ্যা প্রমাণ হইতে ভ্রান্ত ও অসত্য সিদ্ধান্তই উৎপন্ন হয়। ন্যায় শাস্ত্র কেবল সাধনা ও সমালোচনা প্রণালীর পথেই অভ্রান্ত ভাবে কার্য্য করেন। প্রমাণাদির পরীক্ষা করিয়াও দেখিতে পারেন। কিন্তু, কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য কি পরিমাণ ও কি প্রকার প্রমাণ প্রয়োজন, তাহা ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা দেন না; সেই সেই বিষয়ক শাস্ত্রই তাহা শিক্ষা দেন। ন্যায় শাস্ত্র অভ্রান্ত বিচার প্রণালীই প্রদর্শন করেন।

অলঙ্কার।—শব্দের শক্যার্থ বা অবিধাবৃত্তি লইয়া ব্যাকরণ। শব্দের লক্ষণ ও ব্যঞ্জনা বৃত্তি বা লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ লইয়া অলঙ্কার। শব্দের ঐ সকল অর্থ-বৃত্তি কি রূপ, তাহা বিদ্যালয়ের বালকেও জানে। অতএব তাহার আলোচনা আর এখানে করিব না। ভাষার সম্প্রসারণে ব্যাকরণের অতি-নিষ্ঠ নিয়ম যে স্থলে নিরস্ত হন, অলঙ্কার শাস্ত্র সেই স্থলে কার্য্য আরম্ভ করেন। অবিমিশ্র ব্যাকরণ-সঙ্গাত ভাষা সম্বোধন করেন মনকে ও জ্ঞানকে। অলঙ্কার বিভূষিতা ভাষা উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত ও বিমোহিত করেন হৃদ্‌বৃত্তি নিচয়কে। ভাষার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, বৈচিত্র্য ও রসময়তা অলঙ্কার সঙ্গাত। অলঙ্কার বহুবিধ।

ভাষার সহিত ব্যাকরণের সঙ্গ সূতিকাগার হইতে শ্বাস-নিবৃত্তির শেষ-শর্য্যা-পর্য্যন্ত। অপর মন্ত্রীদ্বয়ের সঙ্গ ব্যাকরণের পরবর্ত্তী। কাযেই ব্যাকরণের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব অধিক। তর্কশাস্ত্র আসিয়া যখন ভাষার সহিত মিলিত হন, তখন ব্যাকরণ ভাষাকে অনেকটা গড়িয়া পিটিয়া তুলিয়াছে। অলঙ্কার-বিজ্ঞান ন্যায় দর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী—; কিন্তু বিজ্ঞান রূপে নহে;—মনুষ্য প্রকৃতির মৌলিক প্রবণতা রূপে। অলঙ্কারে আত্ম-শোভার বন্ধন ও বিকাশ ও অলঙ্কারে আত্ম-ভাব প্রকাশ, মনুষ্য-প্রকৃতির প্রবল প্রবণতা এবং মনুষ্য-সমাজের ও মনুষ্যের অতি আদিম অবস্থা ও সময় হইতে কোনও না কোনও আকারে অলঙ্কারের আবির্ভাব। এমন কি, শাব্দিক ও বৈয়াকরণিক ভাষা-জন্মিবার বহুপূর্ব্বে, মনুষ্যের মনোভাব প্রকাশার্থে, অলঙ্কার—একই মাত্র অবিমিশ্র অলঙ্কার কার্য্য করিত ও ব্যবহৃত হইত। বলা বাহুল্য, সে অলঙ্কার শব্দালঙ্কার, বাক্যালঙ্কার, ভাবালঙ্কার বা বাক্যালঙ্কার নহে।

শব্দগত ভাষার সহিত তাহার অতি কমই সংশ্রব ছিল বা এক সময়ে কোন সংশ্রবই ছিল না। সভ্যতার চক্ষে, তখনকার সেই আদিম অলঙ্কারে, শিল্প শোভা নৈপুণ্যও কিছুমাত্র ছিল না। অথচ তাহা অলঙ্কারই বটে। তাহা অলঙ্কারের অঙ্কুর;—বর্ণমালার বীজ;—চিত্রবিদ্যার সর্ব্ব প্রাথমিক আভাস,—শিল্প-শাস্ত্রের মূল ভিত্তি। তাহা ভাষার অলঙ্কার বা সাহিত্যালঙ্কারের এবং বহু পরবর্ত্তী অলঙ্কার বিদ্যার বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ আদি পুরুষ। কিন্তু সে অলঙ্কার কিরূপ ছিল ও অদ্যাবধি অরণ্যবাসী অসভ্য ও আদিম জাতি নিচয়ের মধ্যে কি আকারে আছে? তাহা, সেই আদিম অলঙ্কার, মনুষ্য প্রকৃতি কর্ত্তৃক ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গিতে প্রকাশিত বা বাহ্যাবয়বে অঙ্কিত জড় ও জীব প্রকৃতির অনুকৃতির অনুলিপি দ্বারা মনোভাব অভিব্যক্তির আলেখ্য—পরিচিহ্ন, চিত্রপট, বা প্রতিনিধি। শব্দ, অর্থ, ভাষা, শিল্প ও শিল্প কৌশল এবং অলঙ্কার ইত্যাদি বাহ্য-ব্যক্ত যাহা কিছু ও যত কিছু বিদ্যা, তাহাদের সকলেরই পূর্ব্ববর্ত্তী ও পূর্ব্বসৃষ্ট মনুষ্যের মনোভাব ও মনোবৃত্তি। ভাব না থাকিলে ভাষা জন্মিত না, ভাষার প্রয়োজনই হইত না। মনুষ্যের মনোবৃত্তির অস্তিত্ব হেতুই যাবতীয় বিদ্যার—সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পাদির আবির্ভাব।

যতই শৈশব অবস্থায় থাকুক, মনুষ্যের শাব্দিক ভাষা সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেও, মনুষ্যের মনোভাব ও মনোবৃত্তি ছিল। এবং তাহা ব্যক্ত করিবারও আবশ্যক হইত। কিরূপে তাহা ব্যক্ত হইত? হর্ষ, বিষাদ, ভীতি, প্রীতি, করুণা, ক্রোধ প্রভৃতি মনোবৃত্তি-ব্যঞ্জক, স্বভাবের আবেগ হইতে স্বতঃ-উত্থিত স্বর বা ধ্বনি দ্বারা হইত। পরন্তু, ইশারা, ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গি দ্বারাও মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা হইত। তখনকার বৈয়াকরণিক ভাষা ঐ স্বর ও ধ্বনি এবং আলঙ্কারিক ভাষা ঐ ইসারা, ইঙ্গিত ও অঙ্গ-ভঙ্গি আদি। এ উভয়েরই আবির্ভাব একত্রে বলা যাইতে পারে। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, উপরি উক্ত সুখ শোকাদি বৃত্তি-ব্যঞ্জক স্বতঃ-উত্থিত ধ্বনি হইতে,—ধ্বনির বহু বিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন হইতে, সুনির্দ্দিষ্ট,অর্থযুক্ত, শব্দগত ভাষার সৃষ্টি এবং মনোভাবের পরিচায়ক ও প্রকাশক শব্দ-বিহীন বহিঃ চিহ্ন ইসারা, ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গি এবং তদনুরূপ বহুবিধ সঙ্কেত হইতে ও সঙ্কেতের সম্প্রসারণ ও ক্রমবিকাশ হইতে অলঙ্কার-শিল্পের, এবং চিত্রের, শব্দের স্মারক সঙ্কেতের এবং বর্ণমালার সৃষ্টি। ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গি আদি দ্বারা প্রকৃতির অনুকরণ বা অনুবর্ত্তন করিয়া, প্রকৃতিগত ভাব প্রবৃত্তি ও ঘটনাদি প্রকাশের প্রয়াস। চিত্রাদি অঙ্কিত পদার্থ প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির আলেখ্য—অনুলিপি; তাহাতেও সেই প্রয়াস। এ উভয়েই অলঙ্কার এবং ভাষালঙ্কারের অঙ্কুর;—মনুষ্য-প্রকৃতির অলঙ্কার-প্রবণতা হইতে উদ্ভূত। অলঙ্কার শিল্পজ হইলেও মনুষ্য স্বভাবের সহজাত। স্বভাব উহার মূলে সজীব ভাবে বিদ্যমান। সাহিত্যালঙ্কার শব্দের বা শব্দশক্তির স্বাভাবিক সম্প্রসারণ মাত্র।

এখন বিবেচ্য হইতেছে, কখন সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। আমরা বলিয়াছি, ভাষার অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে পরিপুষ্টি ও আপেক্ষিক পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে, প্রকৃত প্রস্তাবে, সাহিত্যের সংগঠনারম্ভ সম্ভবে না। পুনঃ বিবেচনা কর, সাহিত্য কাহাকে

বলে? সাহিত্যের শরীরের গঠন কিরূপ, গঠনের উপাদান কি কি?

সুস্পষ্ট, সঙ্গত, সুশৃঙ্খলা-সমন্বিত, বোধ্য ও বিশুদ্ধ ভাষায়, সারবান সদ্ভাব নিচয় সুন্দররূপে, পরিব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করাকে যদি সাহিত্য বল,—কেননা তাহাকেই সচারাচর সাহিত্য বলে,—তাহা হইলে, সাহিত্যের জন্য, ভাবপরিব্যঞ্জক, পরিপুষ্ট ও ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদির বিধি বিধান নিয়ন্ত্রিত, বিশুদ্ধ, বলিষ্ঠ এবং বাক্য-বৈচিত্র্যোৎপাদন-সমর্থ, ভাষার অবশ্যই আবশ্যক হয়। কাযেই, ভাষা জন্মিতে, জন্মিতেই ব্যাকরণ যেমন জন্মে, সাহিত্য সে রূপ জন্মে না। আত্ম-প্রকাশোপযোগী ভাষা প্রাপ্তির অপেক্ষায়, সাহিত্যকে কিছু কাল বিলম্ব করিতে হয়। বর্ণমালার আবির্ভাবের জন্যেও অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু, তাই বলিয়া, ভাষার পূর্ব্বোক্ত রাণীত্ব প্রাপ্তি পর্য্যন্তও, অব্যক্ত ও অব্যয় অবস্থায় সাহিত্যকে শুইয়া থাকিতে হয় না। ভাষার ভ্রূণাবস্থায়, সাহিত্য অবশ্য অসম্ভব। কিন্তু, ভাষার বালিকা কাল হইতেই, সাহিত্য কিছু কিছু জন্মিতে থাকে ও ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যায়। তাহার পর, ভাষা ঠাকুরাণীর যখন যেমন গতি, সাহিত্য ঠাকুরের তখন তেমনি প্রকৃতি। সাহিত্য ভাষাকে ভর করিয়া যেমন উঠে, ভাষাও আবার তেমনি সাহিত্যের সহায়তায় ও সাহচর্য্যে, পরিপুষ্ট হয় ও পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে। ভাষার উন্নতি সাধনও সাহিত্যের অনেকানেক উদ্দেশ্যের মধ্যে এক প্রধান উদ্দেশ্য।

মনুষ্য, মনোভাব ব্যক্ত করার জন্যে, সদাই ব্যস্ত। মনুষ্য, মনোবৃত্তির সঞ্চালন ও দৃষ্ট বস্তুর বিবৃতি করিবার উদ্দেশে, অহর্নিশি অস্থির। এই অস্থিরতা, ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা কতক মানুষের স্বভাবে এবং কতক অনিবার্য্য প্রয়োজনে। জীবন ধারণের প্রয়োজন প্রবল এবং গুরুতর। সেই একই প্রয়োজনে শত শত প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আরও কত শত অষ্ট দিক হইতে উঁকি ঝুঁকি মারে। মনোভাব প্রকাশ,—মনোবৃত্তি ব্যক্ত না করিলেই চলে না। জীবন ধারণ, কঠিন জীবন যাপন প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। একের সহিত অপরের, পরিবারের সহিত পরিবারের, সমাজের সহিত সম্প্রদায়ের,—সমষ্টির সহিত সমষ্টির ও সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির, মনোভাবের আদান প্রদানের ও চিন্তার সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। এবং অনেক সময়ে সেই সকল মনোভাব ও চিন্তাদির কোনও না কোন প্রকার স্থায়ী আকার দিয়া, স্মৃতির অর্গলে আবদ্ধ করিয়া রাখার দরকার করে। নহিলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন করা চলেই না। তাহার প্রায় সকল কার্য্যই অচল হইয়া পড়ে।

মনোভাব ব্যক্ত করার এবং তাহা যেরূপে হউক বাঁধিয়া,ধরিয়া,আঁকিয়া রাখার এই ঘোরতর প্রয়োজন এক দিকে; অপর দিকে উহা ব্যক্ত করা ও বন্ধন, অঙ্কন করার প্রয়াস পাওয়া মনুষ্য স্বভাবের এক অনিবৃত্ত বৃত্তি বা বাতিক। মানুষ, যাহা দেখে, ভাবে, অনুভব করে, তাহা প্রকাশ করিতে এবং সময়ে সময়ে তাহার কতকাংশ প্রকটিত করিয়া রাখিতে তাহার এক অসংযমনীয় ও দুর্দ্দমনীয় ঝোঁক। সে ঝোঁক তৃপ্তি করার জন্য মানুষের নিয়তই নানারূপ চেষ্টা।

এক দিকে,অভাবগত অত্যন্ত প্রয়োজন, অপরদিকে স্বভাবগত অত্যন্ত আকিঞ্চন; অতএর আর অধিক বলা বাহুল্য যে, মনুষ্য জাতি তাহার সকল অবস্থাতেই, মনোভাব ব্যক্ত ও বন্ধন করিবার উপায় অনুসন্ধানে, অনুধ্যানে, অনুধাবনে নিয়তই নিরত।

এস্থলে একটা বন্ধনীর অভ্যন্তরে উল্লেখ করা যাইতে পারে—উল্লেখ করা কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও অনিষ্টকর হইবে না যে, মানুষের ঐ "অভাবগত প্রয়োজন" ও "স্বভাবগত আকিঞ্চন" হইতেই ভাষার, সাহিত্যের,সর্ব্ব শিল্পের ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও আরম্ভ।

"অভাবগত প্রয়োজন" হইতে প্রয়োজনীয় শিল্পের, (useful arts) বিজ্ঞানের (material science) এবং বৈষয়িক বা সাংসারিক সাহিত্যের উৎপত্তি। পক্ষান্তরে "স্বভাবগত আকিঞ্চন" হইতে, শরীর ধারণের ও ঘরকন্নার অপ্রয়োজনীয় অথচ অন্য দিকে অত্যুচ্চ, সুকুমার সাহিত্যের, সূক্ষ্ম শিল্পের (Fine arts) এবং অধ্যাত্ম তত্ত্ব মূলক দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি। কিন্তু এসব কথার অধিক আলোচনার স্থান এটী নয়!

আমরা বলিতেছিলাম, মনুষ্য, মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য, এবং তাহা আবদ্ধ ও অঙ্কিত করিয়া রাখিবার জন্য, দিবা নিশি পাগল। তাহা করিবার একটা কিছু উপায়ে উপলক্ষ পাইলেই হয়। উপায়, অনুপযুক্ত হউক, অপ্রচুর হউক, মনোভাব ব্যক্ত করার কোন একটা উপায় পাইবা মাত্র মানুষে তাহা মহা আগ্রহে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। উপায় পাইলেত কথাই নাই। তাহা না পাইলেও নিবৃত্তি নাই। ভাষার অভাব বা অনভিজ্ঞতা ঘটিলে এবং ভাষায় কুলাইয়া না উঠিলেও, মানুষে ছাড়ে না। নানা কলে কৌশলে, ইসারা ইঙ্গিত ও অঙ্গ ভঙ্গিতে, অনুকরণ ও অভিনয়াদি দ্বারা"যেন তেন প্রকারেণ"যতটা হউক আর যতটা পারুক, মানুষে, মনোভাব ব্যক্ত করার চেষ্টা করিয়া, অভাব-ঘটিত প্রয়োজন পূরণ ও স্বভাবগত উদ্বেগ ও আকিঞ্চন প্রসমন করিবার প্রয়াস পায়। ইহা যে কেবল অতি আদিম কালের কথা, তাহাও নয়;—ইহা এখনও আমরা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এবং আবশ্যকে পড়িলে আমরা নিজে নিজেও ইহার আশ্রয় লইতে বাধ্য হই।

অতএব, দেখা যাইতেছে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভাষার অঙ্কুর উদ্ভব হইতে হইতেই, মানুষে তাহার পুরা ব্যবহার করিতে ছাড়ে না। সে অবস্থায়, যদি সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হইত, তাহা নিশ্চয়ই হইত। কিন্তু তাদৃশ অবস্থায় সাহিত্য সম্ভব হইতে পারে না। সাহিত্য সূতিকা গৃহেও তখন শায়িত নন; ভূমিষ্টই হন নাই। সাহিত্যের শৈশবোপযোগী, সূতিকা গৃহোপযোগী ভাষারই যে কেবল তখন অভাব, তাহা নয়; প্রত্যুত সাহিত্যের শৈশবোপযোগী সদ্ভাব বা ভাব নিচয়ও মানুষের তাদৃশ আদিম ও বন্য অবস্থায়, বুদ্ধির ও হৃদ্বৃত্তির বীজ হইতে অঙ্কুরিত, উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব। ভাষার ন্যায় ভাবের বিকাশ প্রাপ্তিও সময় ও আপেক্ষিক সভ্যতা সাপেক্ষ।

ফলতঃ সাহিত্য ভূমিষ্ট হয়, সৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়—হওয়া সম্ভাবিত হয় তৎকাল হইতে, যৎকালে, মনুষ্যের মনোভাব, হৃদ্বৃত্তি নিচয়, কথঞ্চিৎ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, অন্ততঃ

তৎকালোচিত গীতি ও গাথাদি সাহিত্যে, (কেননা মনুষ্য জাতির সাহিত্যের ইতিহাস যেরূপ সাক্ষ্য দেয়, তাহাতে গীতি গাথাদির অল্লাধিক অনুরূপ বাক্যাবলী বা পদ নিচয়কে সাহিত্যের শৈশবাস্থার সর্ব্ব প্রথম ফল বলিয়া অনুমান করিতে বা ধরিয়া লইতে হয়) প্রকাশোপযোগী অবস্থা সম্পন্ন হয়। এবং তাদৃশ হৃদ্বৃত্তি সকলকে, বুদ্ধি-শক্তি, যথোপযুক্ত প্রসারিত হইয়া, বহিঃপ্রকৃতির উপাদান ও উপলক্ষাদি সহযোগে, বিন্যস্ত ও বিকৃত করিতে সক্ষম হয়। অপিচ সেই বিবৃতির বা বর্ণনার অল্লাধিক উপযোগী, ও শব্দ সংযোজন প্রণালী ভাষায় বিদ্যমান থাকে। কিন্তু, ভাষার এবম্বিধ অবস্থা ও ভাবের সংঘর্ষেই প্রস্তুত হয়; আপনা হইতে হয় না। অন্য কেহও ইহা করিয়া দেয় না।

মনুষ্যের মনোভাব আপেক্ষিক বিকাশ প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের ভাষার আপেক্ষিক বিকাশ হয়। * ভাব আবেগযুক্ত ও উৎক্ষিপ্ত হইয়া অভিব্যক্তির পন্থা অনুসন্ধান করে;—প্রয়াসের পর প্রয়াসে, যে আকারে বা যে অধিকারেই হউক, সে পন্থা প্রস্তুতও করে। ভাবের আবেগে ভাষা উৎপন্ন ও উন্নত হইয়া চলিতে থাকে। এবং তাহার দ্বারা ধীরে ধীরে সাহিত্যের শৈশব কাকলী ধ্বনিত হয়। তাহা সর্ব্ব প্রথম হয় সম্ভবতঃ স্বর-সঙ্গীতে। স্বর-সঙ্গীতের বাক্যাংশ সাহিত্যাধিকারে অবস্থিত বটে।

স্বর-সঙ্গীতের স্বরাংশ, অন্যতম এবং অত্যুচ্চ সূক্ষ্ম শিল্প (Fine art) বলিয়া, পরিগণিত। অথচ তাহাই শৈশব সাহিত্যের ও শিশু সূক্ষ্ম শিল্পের সর্ব্ব প্রথম সরল কোমল কাকলী। সর্ব্ব প্রথমেই সর্ব্বোচ্চের সংস্পর্শ—অত্যুচ্চের আভাস! কিছুই অস্বাভাবিক নয়! ভাবের উদ্বেলিত অবস্থা স্বভাবতই উচ্চারিত হয় স্বর-সঙ্গীতে বা সঙ্গীত সূচক স্বরে। আদিম মনুষ্যের উচ্চতর হৃদ্বৃত্তি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত অবস্থাতেই অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভব এবং স্বাভাবিক। অতএব তাহার অভিব্যক্তি স্বর-সংগীতে। সুতরাং, সর্ব্ব প্রথমেই, অত্যুচ্চের আভাস। আত্মার ক্রম বিকাশ, যত স্তরে, যেরূপেই হউক, আত্মা, তাহার আত্ম শক্তি বলে, সর্ব্ব প্রথম বিকাশেই সর্ব্বোচ্চে সংস্পৃষ্ট হয়। যতই উচ্চ হউক, সূক্ষ্ম শিল্প, শাব্দিক সাহিত্য ত তুচ্ছ কথা। যিনি সর্ব্বোচ্চতম—সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টা, পাতা পরমেশ্বর, স্বভাবের শিশু তাঁহারই সত্বা অনুভব করিতে সক্ষম হয়।

ভয়, বিস্ময়, প্রণয় স্বভাবতই মানুষের মানস-উদ্যানে ফুটে। ভাষা যাইয়া তাহা ব্যক্ত করে ও বাহিরে বহন করিয়া আনে। অথবা ভাব তাহার ভাষা গঠন বা নির্ব্বাচন করিয়া বাহিরে ব্যক্ত হয়।

ভাষার যখন যেরূপ অবস্থা, ভাবও ভাবাবেগ তখনি তাহার উপর ভর করিয়া আত্ম প্রকাশের "আতি-বিথি" করে। সেই "আতি-বিথি"র ফলেই, ভাষার প্রসার ও ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। সেই ক্রমোন্নতির কোনও এক প্রাথমিক স্তরে, প্রতিভা কর্ত্তৃক, ভাবে ভাষায় অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত রূপ সংমিশ্রণ,—ফল সাহিত্যাঙ্কুরের উদ্ভব। তাহার পূর্ব্বেও অবশ্য ভাবকে ভাষায় ব্যক্ত করিবার বহু চেষ্টা, বিস্তর প্রয়াস পুনঃপুনঃই হয়। সে পৌনপুনিক প্রয়াস,চেষ্টা ও যত্ন ভাব

* ভাষা ও ভাবের পরবর্ত্তিতা লইয়া মতভেদ বিস্তর আছে।

TIGHT BINDING

ও ভাষাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহিত্যে পরিণত করিতে না পারিলেও, গৌণ ভাবে তাহারই পথ প্রসারিত, পরিষ্কৃত ও প্রস্তুত করে ;—যাহাতে করিয়া, পশ্চাৎ, সাহিত্য-প্রতিভার আবির্ভাব ও সাহিত্য-বীজ হইতে সাহিত্যাঙ্কুরের উদ্ভব হয়।

সাহিত্যের ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও ব্যাকরণ অলঙ্কারাদির উন্নতি হইতে থাকে। সাহিত্যের বিকাশ ও বিস্তৃতি ব্যতীতও তাহা হয় না। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ও সহায়তা দ্বারাই তাহা হয় ; হইয়া পরবর্ত্তী সাহিত্যেরই পুনঃ সহায়তা করে। ভাষা ও সাহিত্যের পারস্পারিক সম্বন্ধ-গত ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া বিবেচনা করি। যদিও এ সম্বন্ধে বিশেষতঃ ভাব ও ভাষার আবির্ভাব ও লক্ষণ ও ব্যাকরণাদির নিয়ম সম্বন্ধে বহু মতভেদ বিদ্যমান।

বলা আবশ্যক যে, ভাষা সম্বন্ধে এই প্রস্তাবে যে সকল কথা বলা হইতেছে, তাহা আদিম ও মৌলিক এমন ভাষার উপরেই প্রযোজ্য, যে আদিম ও মৌলিক ভাষার সবিশেষ উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়া তাহাতে বিস্তীর্ণ ও বহুবিধ সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে বা হইয়া গিয়াছে। সে ভাষা এ সময়ে প্রচলিত থাকিলেও পারে ; না থাকিতেও পারে। কেননা, বর্ত্তমান কালে, ইয়ুরোপে, এসিয়া ও অন্যদেশে যত ভাষা সুপ্রচলিত ও সজীব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের অধিক সংখ্যকই অনাদিম ভাষা। ভাষান্তর হইতে তাহাদের অনেকেরই উৎপত্তি। পক্ষান্তরে আদিম ও মৌলিক এমনও কত ভাষা ছিল বা আজও আছে, তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। অরণ্যবাসী অসভ্যদের মধ্যে ভাষার পরিবর্ত্তন ও অস্থায়িত্ব প্রায়ই হইয়া থাকে। একটা ভাষা ভাসিয়া উঠিয়া কতক দিন থাকিয়া কোথায় উড়িয়া পলায়, আবার একটা আসিয়া তাহার স্থল অধিকার করে। ভাষার ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নহে। বলিতে চাই যে, আমরা কোনও অনাদিম, অসভ্য, অল্পকাল স্থায়ী, অনুন্নত ও অমার্জ্জিত এবং সাহিত্য-বিহীন ভাষার কথা বলিতেছি না। যদিও আমরা কোনও ভাষা বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নাই, তথাচ আমরা যে আলোচনা করিতেছি, তাহাতে এই বুঝাইতেছে ও এই বুঝিতে হইবে যে, আমাদের উদ্দিষ্ট ভাষা আদিম, মৌলিক, মার্জ্জিত, উন্নত, সভ্য ও সুবিস্তীর্ণ এবং বহুবিধ ও বিপুল সাহিত্য-সমন্বিত। তাদৃশ ভাষার উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হইতেও তাহার স্তরে স্তরে অসংখ্য প্রকারের সাহিত্যের সংগঠন হইতে শত শত শতাব্দীর প্রয়োজন হইয়াছিল বা হইতে পারে।

অতঃপর ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বর্ণমালার সম্বন্ধ-ঘটিত কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্যক হইতেছে।

বর্ণমালার বিকাশ ব্যতীত সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না ; ভাষাও দীর্ঘ কাল টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। অতএব আমাদের এই স্বর ও ব্যঞ্জনাদি বর্ণগুলি বড় সাধারণ ব্যক্তি নহেন। বর্ণ বা অক্ষর দেখিতে এক একটী সামান্য চিহ্ন মাত্র মটে। কিন্তু বলে, বিক্রমে ও কার্য্য মাহাত্ম্যে ইঁহারা এক একটী জীবন্ত ও জাগ্রত দেবতা। বর্ণবিরহে সাহিত্য অসম্ভব ; ভাষাও অচিরস্থায়ী।

আমাদের "শ্রুতি" এবং স্মৃতি, ঠিক অলিখিত সাহিত্য ছিলেন বলিয়া, এবং ঋষি বংশ পরম্পরার শ্রবণে ও স্মরণে জীবিত ও প্রবাহিত থাকিতেন বলিয়া, তাঁহাদের নাম "শ্রুতি" ও "স্মৃতি" হইয়াছে কিনা জানি না। কিন্তু, যথার্থই যদি তাহা হয়, তাহা হইলে, কাযে কাযেই, কেবল ইহাই মানিয়া লইতে ও বলিতে হয় যে, তখনকার ঋষিগণ ও তাঁদের বংশধরগণ, নিশ্চয়ই এক একটী সুবিশাল শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর ছিলেন এবং তাঁহারা কেহ কখনও কেবল "শ্রুতি" "স্মৃতি" ভিন্ন, সাহিত্যান্তরে এবং বিষয়ান্তরে মনসংযোগ করিতে বাধ্য হইতেন না। পরন্তু, তৎকালে, সাহিত্যও তাদৃশ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। কিন্তু, সে 'সত্য যুগের' কথা। তখন ত সবই সম্ভব ছিল এবং এখানকার হইতে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল বলিয়াই শুনিতে পাই। কিন্তু, এই কলিকালে, বর্ণাশ্রয় না পাইলে, শ্রুতি স্মৃতি, বেদবাক্য ঋষিবাক্য হইয়াও যে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

ইহা সত্য বলিয়া কথিত হয় বটে যে, পুরাকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মনুষ্যের মানসিক ও আধ্যাত্মিক রচনা বা রচনাবলী বংশ-পরম্পরার মুখে মুখে চালিত ও স্মৃতিপট মাত্রে অঙ্কিত হইয়া, সংরক্ষিত হইত ; এবং ইহাও সত্য হইতে পারে যে, তাহার পরবর্ত্তী কাল হইতে, বর্ণের আবিষ্কারে, বহুগ্রন্থের প্রচারে, বা লিপিকরের অত্যাচারে, মনুষ্যের স্মৃতি-শক্তি, ক্রমশ শক্তিহীন ও খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও, ইহা স্থির যে, মনুষ্যের স্মৃতি-শক্তি, কোন ক্রমেই, অসীম নহে। পরন্তু, স্মৃত বস্তু ও বিষয়াদিরও প্রসার পরিমাণগত একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা না হইলে চলে না। কাযেই, বলা বাহুল্য যে, কেবল এক মাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া, সাহিত্য বিস্তৃত হইতে ও সজীব থাকিতে কোন ক্রমেই পারে না। বর্ণাশ্রয় ব্যতীত, সৃষ্ট হইয়াও তাহাকে বিলুপ্ত হইতে হয়।

ফলতঃ অক্ষরের আবিষ্কার এবং বর্ণলিপির প্রচারেই, সাহিত্য বিজ্ঞানাদির সংস্থিতি ও সম্প্রসারণ। উহার অভাবে, মনুষ্যের অতীত ও বর্ত্তমান কি ভয়ঙ্কর তমসাচ্ছন্ন থাকিত, তাহা কেবল মাত্র অনুমেয়ই হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, বর্ণ বা অক্ষরমালা, অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হইয়া বা কেবল মাত্র কৌশলের কল-কারখানায় গঠিত নির্ম্মিত হইয়া বা কোন দৈব শক্তি প্রভাবে, প্রকাশমান হইয়া, মনুষ্যের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। ভাষা এবং সাহিত্যেরই ন্যায় বর্ণমালার সৃষ্টি সংগঠন ও শৃঙ্খলা সংস্থাপন কল্পে, যুগ যুগান্তরে, বহু বহু যুগ ধরিয়া, বহু বহু জাতির ও বহু বহু ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, আবশ্যকতা ও বুদ্ধিমত্তা, কল্পনা ও সমালোচনা, সৃষ্টি-কৌশল ও শিল্প-নৈপুণ্য একত্রে কার্য্য করিয়াছে। বহু বহু কালের অনুশীলনে, বিবর্ত্তনে এবং বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে, বর্ণমালা স্তরে স্তরে, বিনির্ম্মিত, ও বিবর্ত্তিত ও বিশোধিত হইয়া ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়াছে। এবং তাহাদের ক্রম-বিকাশ-প্রবাহ এখনও প্রবাহিত। বর্ণমালার বয়ঃক্রম, বহু বহু কাল, কোটি কোটি কল্প হইলেও, তাহার বর্দ্ধনশীলতা, অদ্যাবধিও, বিদ্যমান আছে। জগতের সর্ব্ববিধ স্বভাবজ সৃষ্টি ও শিল্পজাত সৃষ্টির ন্যায়, বর্ণমালার সৃষ্টিতেও ক্রমে-বিকাশ-

প্রক্রিয়া, সুস্পষ্ট পরিদৃশ্যমান। যে কোনও ভাষার বর্ণমালার ইতিবৃত্ত ও আকারাবয়বের পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষা করিলে, এই ক্রম-বিকাশ-প্রক্রিয়া, নিসংশয় অনুভূত ও স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতে পারে।

অক্ষর-তত্ত্বের আলোচনা, এস্থলে আমাদের অভিপ্রেত না হইলেও, কেবল প্রসঙ্গত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে যে, শব্দের প্রতিনিধি বা ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির পরিচায়ক আমাদের বর্ত্তমান বর্ণমালা অর্থাৎ (Phonetic Letters) ধ্বন্যাত্মক অক্ষরাবলী, বিকাশ লাভ করার পূর্ব্বে, মনুষ্যের স্মৃতির সহায় স্বরূপ, মনোভাব বাহক বা পদার্থাদির জ্ঞাপক বা গণনাদির ব্যঞ্জক অন্যান্য প্রকারের চিহ্ন, চিত্র বা স্মারক লিপি, প্রচলিত ছিল। এবং সেই সকল হইতেই, ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত ও উন্নীত হইয়া, ধ্বন্যাত্মক বর্ত্তমান বর্ণাবলী বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

অক্ষর তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ, অক্ষরের অর্থাৎ স্মারক-চিহ্নের বিকাশের ক্রম, সাধারণতঃ চারিটী প্রধান স্তরে, বিভক্ত করেন। এই বিভাগ, মনুষ্য জাতির আদিম অন্যান্য ব্যাপরের ন্যায়, সুনির্দ্দিষ্ট এবং সূক্ষ্ম না হইলেও, আদিম কালের ঐতিহাসিক নিদর্শনের উপর স্থাপিত। স্তর চারিটী এইরূপ—

১ম	স্তর ;—	দ্রব্য-লিপি।
২য়	স্তর ;—	চিত্র লিপি।
৩য়	স্তর ;—	চিহ্ন-লিপি।
৪র্থ	স্তর ;—	শব্দ-লিপি।

অক্ষরের বিকাশ ক্রম-ঘটিত এই স্তর চতুষ্টয়ের বিস্তৃত ও বিশদ ব্যাখ্যা এখানে আদৌ অসম্ভব; অনাবশ্যকও বটে। ইঙ্গিতে কেবল এই বক্তব্য যে, প্রথম হইতে দ্বিতীয়ের, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়ের এবং তৃতীয় হইতে চতুর্থের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব। চতুর্থ স্তর অক্ষরের ধ্বন্যাত্মক লিপি চিহ্ন; যাহার অন্যতম বিকাশ অক্ষরের অধুনাতন বা উপস্থিত অবস্থাও অবয়ব।

১ম স্তরে, বাহ্য বস্তুর নিদর্শন দ্বারা, ২য় স্তরে, চিত্রের দ্বারা, এবং ৩য় স্তরে, চিত্র পরিব্যঞ্জক চিহ্নের দ্বারা, স্মৃতি লিপি। শাব্দিক ভাষার অভাবে বা অবিদ্যমানে, এবং শাব্দিক ভাষার পরিবর্ত্তে, ইহারা কিঞ্চিন্মাত্রায় মনুষ্যের মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ। অতএব, ইহারা, কেবল ভাষার স্মারক লিপি নহে;—পরন্তু, অস্পষ্ট ও অপ্রচুর ভাবে, মনোভাব প্রকাশের ও অপরাপর উপায় স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। ইহারা ভাষা এবং ভাষার স্মারক-লিপি উভয়তই কার্য্য করিত। ইহারা অগ্রে ভাষা, পশ্চাৎ হইয়াছিল স্মারক লিপি। ইহারা পর্য্যায়ক্রমে পদার্থ বা বস্তুগত, চিত্রগত, এবং চিহ্নগত, পরন্তু বস্তু, চিত্র ও চিহ্নে প্রকাশিত মনুষ্য-ভাষা। এ ভাষা ছিল দর্শনীয়, শ্রবণীয় নহে।

আমরা এখন ব্যবহার করি জিহ্বা-বিনিসৃত, বাক্যে প্রকাশিত এবং কর্ণে শ্রুত শাব্দিক ভাষা। শাব্দিক বা শ্রবণীয় ভাষার ন্যায়, চাক্ষুষ চিত্রাদিগত ভাষাও ব্যবহার্য্য বটে। পরন্তু, এখনকার ধ্বন্যাত্মাক বর্ণের ন্যায় পুরাকালে বাহ্য বস্তু, চিত্র এবং চিত্রাদির চিহ্ন স্মারক লিপি-স্বরূপ বা মনোভাবের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

বর্ণাবাহুল্য, শাব্দিক ভাষা ও মূল্যাত্মক বর্ণই সাহিত্যের উপাদান। চাক্ষুষ ভাষাও চিত্র-লিপি শিল্পের উপাদান, সাহিত্যের নহে।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

সমন্বয় ভাষ্যের সমালোচনা। (২)

ব্রহ্ম যখন কার্য্যের কারণরূপে প্রকাশিত হন, সেই অবস্থায় ইনি "ঈশ্বর" পদবাচ্য। আমরা "ব্রহ্ম ও জগৎ" নামক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, এস্থলে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইতেছে। "সৎপদার্থ যখন তাঁহার মধ্যস্থ শক্তি বিকাশ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন এই সৎই কারণ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার শক্তিই "অব্যক্তকার্য্য" রূপে অবস্থিত থাকে। * * * * সমুদ্রের জলরূপ উপাদান কারণে যেরূপ পরে প্রকাশিত ফেন, তরঙ্গ বুদ্বুদ প্রভৃতি অব্যক্তাবস্থায় লীন থাকে, ব্রহ্মও তদ্রূপ পরে প্রকাশিত বুদ্ধি, মন প্রভৃতি অব্যক্তাবস্থায় লীন থাকে। এ অবস্থায় অব্যক্ত মায়া নিতান্ত অসৎ বা অভাবাত্মক হইতে পারে না। কেন না, সায়নাচার্য্য বলেন যে, 'জগৎ সৃষ্টির আদি নাই। এক প্রলয় সময়ে যাহা অব্যক্ত ভাবে লীন ছিল, পর সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই গুলিরই ক্রমে বিকাশ হয়।' সুতরাং এই অব্যক্ত মায়াতে পূর্ব্বসৃষ্ট সমুদয় পদার্থই অতি সূক্ষ্মভাবে বিলীন অবস্থায় নিহিত ছিল। সেই গুলিরই সৃষ্টির সময়ে পুনরায় সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাবে বিকাশের নামই "সৃষ্টি"। * * * ব্রহ্ম নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান স্বরূপ। তাঁহার শক্তি জ্ঞানেরই ক্রিয়া মাত্র। জ্ঞানের এই ক্রিয়ার সুতরাং তিনটী অবস্থা। ক্রিয়োন্মুখ বা অব্যবস্থা এবং ক্রিয়ার স্থূল বা ঘনীভূত বস্থা। ক্রিয়োন্মুখাবস্থায় জ্ঞান নির্ব্বিশেষ; গাঢ় সুষুপ্তি অবস্থায় মনুষ্যের জ্ঞান যেরূপ সত্তামাত্র অনুভব করে, এ অবস্থায়ও তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ সত্তাত্মকজ্ঞান মাত্র। ঈশ্বর এ অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। যেহেতু তিনি এ অবস্থায় নির্ব্বিশেষভাবে ভবিষ্যৎ কালে প্রকাশিত সমস্ত শক্তি ও ক্রিয়ার বিষয় অবগত আছেন। তিনি এ অবস্থায় সর্ব্বনিয়ন্তা(actuator)। যেহেতু যে যে প্রাণী ও বস্তু যে যে শক্তি লইয়া তাঁহার শক্তিতে লীন হইয়াছিল, তিনি এই ত্রিয়োন্মুখ অবস্থায়, সেই সেই প্রাণী ও বস্তু প্রভৃতির সেই শক্তি ও ক্রিয়াদির বিকাশ করেন। এই ঈশ্বর যেমন সৃষ্টিকালে পূর্ব্ব নিহিত শক্তি ও ক্রিয়াদির বিকাশ করাইয়া দেন, তেম্‌নি তিনি সর্ব্বাবস্থায় সমস্ত শক্ত্যাদিকে নিজের আলোকে আলোকিত করিয়া থাকেন।" এইরূপে জগৎ ও জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়া ব্রহ্ম "ঈশ্বর" পদবাচ্য হন। অতএব এভাবে ঈশ্বর অলীক পদার্থ নহেন। উপাধ্যায় মহাশয় উত্তম বিচার বলে, এই ঈশ্বরকে জগতের অন্তঃপ্রবিষ্ট অথচ বিশ্বাতীত রূপে প্রমাণ করিয়া, ইহাঁকেই গীতার উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সর্ব্বান্তর্ভাবক হইয়াও সর্ব্বাতীত। উপাধ্যায় মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত-বলে, গাফ্ (Gough) সাহেব তাঁহার প্রণীত "The philosophy of the upanishads" নামক গ্রন্থে যে বলিয়াছিলেন যে,—"Iswar can hardly be conceived to have

any *separate* personality apart from the souls he permeates and vivifies"—এই ভ্রমাত্মক উক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয়ের এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রকৃত সিদ্ধান্ত; ইহাই শঙ্করাচার্য্যেরও অভিপ্রায়। উপাধ্যায় মহাশয় এইরূপভাবে শঙ্করকে এস্থলেও বুঝিয়াছেন বলিয়া, রামানুজের সবিশেষবাদ এবং শঙ্করের তথা-কথিত নির্ব্বিশেষবাদ তাঁহার চক্ষে এক হইয়া গিয়াছে। এলতঃ গৌরগোবিন্দ বাবুর গীতা ভাষ্য একখানি আশ্চর্য্য গ্রন্থ। আমরা দুই তিনটী মাত্র প্রধান সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করিলাম। এরূপ আরো অনেক চমৎকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত তাঁহার ভাষ্যে রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা পঞ্চমাধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকের ভাষ্যটী উল্লেখ করিতে পারি। নীলকণ্ঠ নামক টীকাকার পরমেশ্বরের, সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশকত্ব মাত্র স্বীকার করিয়া, পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয় অকাট্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পরমেশ্বরের প্রেরকত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব সংস্থাপিত করিয়াছেন।

আমরা আর একটী স্থলের ব্যাখ্যা-কৌশল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। নবমাধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে "প্রকৃতের্বশাদবশং" এই পদটীর অনেকেই "প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত তত্তৎস্বভাববশাদবশং"—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয় এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। প্রাচীন কর্ম্ম স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য (২।২।৩৭) হইতে সেই দোষ দেখাইয়া, তিনি "সৃজ্যশক্তির স্বাভাবিক বিচিত্র স্বভাব বশতঃ অবশ"—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে একটী উত্তম ফল হইয়াছে। Rev. K. M. Banerjee তৎ প্রণীত "Dialogues" নামক গ্রন্থে শঙ্করের এই ভাষ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া, ইহার সহিত শঙ্করের লিখিত, বেদান্তদর্শনের ২য় অধ্যায়ের ১ম পাদের ৩৪ সূত্রের ভাষ্যাংশের সহিত, অনৈক্য ও বিরোধ দেখাইয়া, শঙ্করকে দোষ দিতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু গৌর গোবিন্দ বাবুর এই ব্যাখ্যায়, এখন ইহা বুঝা গেল যে, শঙ্করের অভিপ্রায়ও এইরূপ; বাস্তবিক পক্ষে বিরোধ নাই। শঙ্কর-লিখিত ২য় অধ্যায়ের ১ম পাদের ৩৪ সূত্রের ভাষ্যোক্ত কর্ম্মশব্দের অর্থও—সৃজ্য-শক্তির স্বাভাবিক বিচিত্রতা। এইরূপ অর্থ করিলেই, ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ে কোন বৈষম্যাদি দোষ আসিতে পারে না। এইরূপ, এই ভাষ্যে যে কত চমৎকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মীমাংসা আছে, সেগুলি স্থানাভাব বশতঃ উল্লেখ করিতে না পারিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত রহিলাম। এই সমন্বয় ভাষ্যে উপাধ্যায় মহাশয়ের গভীর পাণ্ডিত্য, অসাধারণ গবেষণা, অনন্যসামান্য বহুদর্শিতা এবং তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। একালে, ইহাঁর মত সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি এ দেশে বড় নাই।

আমরা এখন এই ভাষ্যের ভাষা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। সংস্কৃত ভাষার উপরে উপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ অধিকার। প্রাঞ্জল অথচ সরল ও মিষ্ট সংস্কৃত লিখিতে, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি, দ্বিতীয় পাওয়া কঠিন হইবে। ভাষা এত চমৎকার যে, পড়িলে মোহিত হইতে হয়। এই ভাষ্যে তিনি সর্ব্ববিষয়েই যেরূপ অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। হিন্দুর সমস্ত দর্শন, প্রায় সমস্ত পুরাণ, সংহিতা ও উপনিষদ্ প্রভৃতি যেন তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক মাত্র। এ বিষয়ে তাঁহার বহুদর্শিতা অসাধারণ। তাঁহার হস্তে সমস্ত শাস্ত্রভাণ্ডার হিতৈষী কামধেনুর ন্যায় আচরণ করিয়াছে। পরস্পর-বিরুদ্ধ পন্থাগুলি হইতে সার সংগ্রহ করিয়া, উহাদের একতা সম্পাদনে, তিনি যে কৃতিত্ব, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা যে কোন দেশের গৌরবের বিষয়। তাঁহার মত পণ্ডিত এ দেশে আছে, একথা মনে হইলেও পুলকে ও জাতীয় গৌরবে আমাদের শরীর কণ্টকিত হয়। তাঁহার এই ভাষ্য দ্বারা এদেশের যেরূপ মহোপকার সাধিত হইল, তাহা প্রশংসা করিয়া নির্দ্দেশ করা আমাদের পক্ষে কঠিন। বিধাতা ইঁহাকে সুস্থ শরীরে রাখিয়া দেশের মঙ্গল করুন্।

আমরা এই সমন্বয় ভাষ্যের একটী সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটী কথা বলিব। আশা করি, উপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। জীবের পারলৌকিক গতি বলিতে গিয়া, উপাধ্যায় মহাশয়, জীবের মৃত্যুর পর, কর্ম্মিজীবের, আমাদের এই মনুষ্য-লোকে পুনরাবর্ত্তন হইবে না,—উপনিষদাদির এইমত, ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে, অতি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। এ বিষয়ে আমাদের চারি প্রকারের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। (১) যদি মৃত্যুর পর জীবের এ লোকে আর পুনরাগমন হইল না, তবে অধিকাংশ জীবনিবহ শীঘ্রই পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, অথবা নূতন নূতন জীবের জন্ম নিতান্তই আকস্মিক ও অহৈতুকী হইয়া পড়ে। (২) যদি অন্য লোকেই গতি হয়, ইহা স্বীকার করা যায়, তবে এই মনুষ্যলোকে গতি হইবার বাধা কি? (৩) তাঁহার এরূপ ব্যাখ্যা কিছু কষ্ট-কল্পিত হইয়াছে। (৪) শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে অতি সুস্পষ্টকাক্যে জীব এই মর-লোকেই পুনরাবর্ত্তন করে, একথা বলিয়াছেন। পণ্ডিত গৌর বাবুর সিদ্ধান্ত সুতরাং শঙ্করের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু আমরা সম্মানের ও বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যিনি সমন্বয় ভাষ্য লিখিতে যাইতেছেন এবং যাঁহার ভাষ্য আর্য্য পণ্ডিতমণ্ডলীর আদরের জিনিষ হইবে, সে ভাষ্য শঙ্করের বিপরীত মত পোষণ করিলে, তাহার আদর হইবে কি? পরলোকগতি সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ সন্দেহ হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলিলাম। ভরসা করি, আমরা বুঝিয়া থাকিলে, মাননীয় উপাধ্যায় মহাশয় দয়া করিয়া, আমাদের সে ভুল সংশোধন করিয়া দিবেন।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

কানীনতা।

কাদম্বরীর বৈশম্পায়ন মহাশ্বেতার বিরহানলে অল্প বয়সে দগ্ধ হইয়াছিলেন। এই অকাল মৃত্যুর কারণ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অয়ং হি কামরাগ মোহ ময়াদল্প সারৎ স্ত্রীবীর্য্যদেব কেবলাৎ উৎপন্নঃ। ইনি কেবল স্ত্রীর কাম আসক্তি ও অজ্ঞানতা-

প্রধান অল্পসার বীর্য্য হইতে জন্মিয়াছিলেন। অর্থাৎ বৈশম্পায়নের জন্মের নিমিত্ত পুরুষ-সংযোগ ঘটে নাই। বৈশম্পায়নের জননী লক্ষ্মী ছিলেন। এইরূপ, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে আর এক দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের পুরাণে অন্য প্রকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, দ্রোণ, কৃপ, কার্ত্তিক প্রভৃতি অনেকে কেবল পুরুষের শুক্র হইতে জন্মিয়াছিলেন।

ইহাঁদের জন্মবৃত্তান্ত পৌরাণিকী কথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে। কিন্তু জীব-রাজ্যে কেবল স্ত্রী হইতে সন্তানোৎপত্তি অসম্ভব নহে। পরন্তু কোন কোন জীবে সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। কন্যা বা কুমারী হইতে জাত বলিয়া এরূপ সন্তানকে কানীন বলা যায়। আমাদের শাস্ত্রের কানীন সন্তান বলিলে পুরুষ সংযোগাভাব বুঝায় না, কেবল স্বামী সংযোগাভাব বুঝায়। এখানে আমরা কানীন শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করিলাম।*

পৌরাণিকী কথা ছাড়িয়া দিলে, মানব জাতির মধ্যে কানীন সন্তানের দৃষ্টান্ত নাই। উহার বিশেষ দৃষ্টান্ত পতঙ্গশ্রেণীর মধ্যেই পাওয়া যায়। প্রথমে আরিষ্টটল নাকি বলিয়া গিয়াছেন যে, মধু মক্ষিকার অনিষিক্ত ডিম্ব (অর্থাৎ যে ডিম্বকে পুং মক্ষিকার শুক্র নিষিক্ত করে নাই, তাহা) হইতে মক্ষিকা জন্মিতে পারে। আর এক ব্যক্তি একটী স্ত্রী রেসমকীট কাচপাত্রে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কীট-প্রসূত ডিম্ব হইতে কীট জন্মিয়াছিল। ইহাও বহু পূর্ব্বকালের কথা, তখন বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদর্শন ছিল না।

কিন্তু অনেক কীট আছে, যাহাদের পুং আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না, (Rotifers)। কতকগুলির পুং এত ক্ষুদ্র ও বিকৃত যে, তাহাদের দ্বারা ডিম্বনিষেক (fertilisation) প্রায় সম্পন্ন হয় না। কর্কট-গণের মধ্যে কয়েকটী জাতিতে কানীন সন্তানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গাছে এক জাতীয় ছোট ছোট পতঙ্গ (Aphides) দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে কানীনতা সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

কোন কোন উদ্ভিদেরও কানীন সন্তান জন্মিতে দেখা গিয়াছে। গুড়ুচী লতার (গুলঞ্চ) স্ত্রী ও পুং লতা পৃথক্। অন্য এক জাতি গুড়ুচীর স্ত্রীলতা এমন স্থানে রোপিত হইয়াছিল যে, সেখানে পুং লতার পরাগ আসিতে পারিত না। তথাপি স্ত্রী-লতাটির বীজ হইত, এবং সেই বীজ হইতে অপর লতা জন্মিয়াছিল। নিম্নশ্রেণী উদ্ভি-

কানীন অর্থে parthenogenetic করা গেল। Asexual অর্থে কেহ কেহ অযৌন শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু শব্দ নির্ব্বাচন ভাল হয় না। বৈশম্পায়ন অযৌন ছিলেন না, কিম্বা তাঁহাকে asexually produced বলা যাইতে পারে না। বশিষ্ঠাদি অযৌন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উৎপত্তির নিমিত্ত sexdifference আবশ্যক হইয়াছিল। Asexual অর্থে অমৈথুন, এবং asexually produced অর্থে অমৈথুন্য করা যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে অলৈঙ্গিক করিলে অর্থ সুস্পষ্ট হইবে, যথা, asexual generation অলৈঙ্গিক পুরুষ বা সন্তান। যে জীবের পুং স্ত্রীভেদ আছে, তাহা লৈঙ্গিক; যাহার নাই, তাহা অলৈঙ্গিক। এইরূপে, একলিঙ্গ জীব unisexual, দ্বিলিঙ্গ জীব bisexual. পুং স্ত্রী যোগে জাত সন্তান, মৈথুন্য, অযোগে জাত অমৈথুন্য। অমৈথুন্যের মধ্যে asexually produced এবং parthenogenetic উভয়েই থাকিবে। কেবল স্ত্রী হইতে জাত অমৈথুন্যের নাম কানীন করা গেল।

দের মধ্যে কানীনতার দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু সকল স্থলে প্রত্যক্ষ করা সহজ নহে।

উপরের দৃষ্টান্তে কানীন সন্তান সর্ব্বদা ঘটে। সময়ে সময়ে অপর জীবের কানীন সন্তান জন্মিতে দেখা গিয়াছে। এইরূপে রেসম কীট সময়ে সময়ে কানীন সন্তান প্রসব করে। সমুদয় পতঙ্গের এইরূপ হয়। যে সকল প্রাণীর মধ্যে কানীন সন্তান সর্ব্বদা দেখা যায় না, রোগ বিশেষে তাহাদেরও এইরূপ সন্তান জন্মিতে দেখা গিযাছে। কোন কোন বিচক্ষণ দ্রষ্টা ভেক ও কুক্কুটের কানীন সন্তান জন্মিতে দেখিয়াছেন।*

মধু মক্ষিকার জীবনেতিহাস অনেকে অবগত আছেন। মধুমক্ষিকার 'রাণী' উড়িতে উড়িতে 'রাজা' কর্ত্তৃক নিষিক্ত হয়। রাজার পুং কোষাণু সমূহ (sperm cells) তৎকালে রাণীদেহে সযত্নে রক্ষিত হয়, এবং রাণী মধুচক্রে যেমন ডিম্ব প্রসব করিতে থাকে, রক্ষিত পুং কোষাণু সেগুলিকে নিষিক্ত করিতে থাকে। এইরূপে কিন্তু সকল ডিম্ব নিষিক্ত হইতে পারে না। যে গুলি হয় না, সেগুলি নিষ্কর্ম্মা রাজা হইয়া কানীনতার পরিচয় দেয়। যে গুলি হয়, তাহাদের মধ্যে রাণী ও দাসী জন্মে। আহার গুণে রাণী ও দাসীর প্রভেদ বটে। রাজভোগ্য ভোজ্য ভোজন করিয়া কোন ডিম্ব রাণীরূপে (অর্থাৎ স্ত্রী) এবং আহার ক্লেশে কোন ডিম্ব দাসী (অর্থাৎ বন্ধ্যা স্ত্রী) রূপে পরিণত হয়।

স্ত্রী-মধু-মক্ষিকা লইয়া অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। পরীক্ষার ফল বড় কৌতুকাবহ। রাণীর ডানা কাটিয়া দিয়া তাহাকে উড়িতে অক্ষম করিলে, কিম্বা সে বৃদ্ধা হইয়া পুং-কোষাণু রক্ষণে অসমর্থা হইলে, নিষ্কর্ম্মা মক্ষিকাদলের জন্ম হয়। যে অঙ্গে রাণী পুং কোষাণু রক্ষা করে, তাঁহাকে সরাইয়া লইলেও প্রসূত ডিম্ব নিষিক্ত হইতে পারে না, ফলে রাজপুত্রগণের জন্ম হয়।

এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু ব্যাখ্যা সহজ নহে। জীব বিদ্যার প্রত্যেক বিষয়ই দুরূহ, তাহার মধ্যে দুরূহ জনন ক্রিয়া, তাহার মধ্যে দুরূহ কানীনতা। জীবনের অনেক ব্যাপার নিত্য দেখি বলিয়া তাহাতে বিস্ময় জন্মায় না। নতুবা প্রত্যেক ব্যাপারই বিস্ময়জনক হইত। সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত স্ত্রী পুরুষের সংযোগ আবশ্যক। ইহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাই মিথুনের আবশ্যকতায় বিস্মৃত হই না। কিন্তু স্ত্রী পুরুষের সংযোগ কেন আবশ্যক, স্ত্রী ও পুংসৃষ্টি দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে,—ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক।

দাম্পত্য প্রেম বিকাশের নিমিত্ত পুং স্ত্রী-সৃষ্টি বলিলে উত্তর একদেশদর্শী হয়। অপেক্ষাকৃত উচ্চ প্রাণীতেই দাম্পত্য প্রেমের লক্ষণ দখা যায়, অথচ বহু নিম্নশ্রেণীস্থ জীবের মধ্যে মৈথুন সন্তান জন্মিয়া

* যাঁহার প্রাণিহিংসার ভয়ে নিরামিষাশী, অথচ দেহের পুষ্টিসাধন সংকল্পে হংস কুক্কুটাদির অসিক্ত ডিম্ব (বায়াডিম) অম্লান বদনে ভক্ষণ করেন, এই সকল বিষয় তাঁহাদের স্মরণ করা আবশ্যক। আমার কোন বন্ধু মৎস্য মাংস ভোজন করেন না, কিন্তু ডিম্ব ভক্ষণের সময় মনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করেন না। তিনি স্থির করিয়াছেন, ডিম্বের চৈতন্য নাই, সুতরাং বধে পাপ নাই। বোধ করি, তিনি নড়নচড়নেই চৈতন্যের লক্ষণ দেখিতে পান। কিন্তু জীবন অর্থেই যে নড়নচড়ন! বায়া ডিম অবশ্য মৃত নহে।

থাকে। সুতরাং প্রেমবিকাশ নিমিত্ত পুং স্ত্রীসৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। জীব বিদ্যায় ও নীতিশাস্ত্রীয় বা ভাব সম্বন্ধীয় বিচার চলে না।

পুরুষ সন্তান প্রসব করিতে পারে না কেন?—সন্তান প্রসবের আবশ্যক সাধন তাহার নাই। কিন্তু স্ত্রীর ত আছে। তবে, পুং সংযোগ কেন আবশ্যক হয়?—স্ত্রীর সাধন আছে বটে, কিন্তু পূর্ণ সাধন নাই। পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী ডিম্ব প্রসব করিতে পারে, এবং করিয়া থাকে, কিন্তু সেই ডিম্বকে স্বয়ং সন্তানবহ করিতে পারে না। আরও বলা যাইতে পারে, যে, পুরুষ সংযোগ ব্যতীত যে ডিম্ব জাত হয়, তাহাতে এমন কোন পদার্থের অভাব থাকে, যাহা কেবল পুরুষেই দিতে পারে। যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে সে অভাব কিসের? সে অভাব কি কোন দ্রব্যের, না কোন শক্তির, না উভয়েরই? পুরুষ যাহা দেয়, তাহার ধর্ম্ম কি, ডিম্বের প্রতি তাহার ক্রিয়া কি?

যাঁহারা জীবনকে রসায়ন শক্তিবিদ্যার (Physics) বহির্ভূত মনে করেন, তাঁহারা অবশ্য ঐ সকল প্রশ্ন ত্যাগ করিতে বলিবেন। পূর্ব্বে জীববিদ্যা একটী স্বতন্ত্র বিদ্যা বোধ হইত। এক্ষণে উহা ক্রমশঃ জড়-বিদ্যার (Physical sciences) অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। জড়বিদ্যাই বা বলি কেন, রসায়ন বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বলিলেই বা দোষ কি। জীবদেহ ত নূতন বস্তুতে নির্ম্মিত নহে। রাসায়নিকের দ্বিসপ্ততি সংখ্যক মূল পদার্থের অতিরিক্ত কোন পদার্থ জীবদেহে নাই। সুতরাং জীবন ক্রিয়াও রাসায়নিক ক্রিয়ার অন্যতর বলিতে হইবে।

কিন্তু জৈব রসায়ন (organic chemistry) অতিশয় কঠিন, অতিশয় দুর্বোধ্য। এজন্য জীবনক্রিয়াকে রাসায়নিক ক্রিয়া বিশেষে পরিণত করিতে বহুকাল বিলম্ব আছে। যদি কোন দিন জীবন ক্রিয়াকে রাসায়নিক ক্রিয়া বিশেষ নির্ভয়ে বলিতে পারা যায়, সেই দিনই স্ত্রী পুরুষের সংযোগে সন্তানোৎপত্তির ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে।

এই সূক্ষ্ম দর্শন এক্ষণে সম্ভাব্য নয়। বর্ত্তমান স্থূল দৃষ্টিতেও অনেক ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদেরও প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। জটিল সূক্ষ্ম ব্যাপার ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, স্ত্রী ও পুরুষ এক প্রকার বোধ হইলেও এক প্রকার নয়। স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া মিথুন। স্ত্রী ও পুং দেহে কি প্রভেদ আছে, দেহগঠন-গত, দেহ ব্যবচ্ছেদ গত, সাধনগত, ক্রিয়া-গত, ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের নির্দ্ধারণ আবশ্যক। সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত এক জাতীয় (species) জীব মিথুন আবশ্যক। সিংহ ও বিড়াল, কিম্বা ব্যাঘ্র ও বিড়াল মিথুন হইলে চলে না। পুং ব্যাঘ্র ও স্ত্রী ব্যাঘ্র, পুং বিড়াল ও স্ত্রী বিড়াল,—এইরূপ মিথুন আবশ্যক। তার পর, পুং বিড়ালের শুক্রস্থিত পুং কোষাণু বা বীজ কোষাণু (Sperm cells) এবং স্ত্রী বিড়ালের স্ত্রী-কোষাণু বা ডিম্ব কোষাণু (ovum cells) আবশ্যক। তার পর, জীবকোষ ও ডিম্ব-কোষের মিলন ও একীভবন; তার পর, ডিম্বকোষের পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তনের ফলে ভ্রূণ। যে পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা গেল, তাহা অত্যন্ত জটিল। উহার কতকটা জানা থাকিলেও তাহা সাধারণ পাঠকের দুর্বোধ্য, এবং লেখকের ভাষার ক্ষমতার

বহির্ভূত। তথাপি দেখা গেল, এক জাতীয় জীবের বীজকোষ ও ডিম্বকোষের মিলন না হইলে সন্তান হয় না। অর্থাৎ বীজকোষ হইতে ডিম্বকোষ এমন কিছু পায়, যাহার ক্রিয়াবশতঃ ডিম্বকোষের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, এবং যে পরিবর্ত্তনের ফলে ভাবী সন্তানের অবয়ব উদ্ভূত হইয়া থাকে। মৈথুনিক জনন ক্রিয়ার এই স্থূল ব্যাখ্যা।

কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রশ্ন মনে আসে। পুং স্ত্রী ভেদ হইল কেন? কেবল পুং কিংবা কেবল স্ত্রী থাকিল না কেন? সৃষ্টি প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত অন্য বহুবিধ কৌশল থাকিতে পারিত। নিম্ন-শ্রেণী জীবের পুং স্ত্রী ভেদ নাই, অথচ তাহাদের বংশ চলিতেছে। উচ্চশ্রেণী প্রাণীতেই বা সে নিয়ম রহিল না কেন?

এই প্রকার বিভেদে সৃষ্টিকার্য্যের অবশ্য সুবিধা হইয়াছে। এ কথা বলাই বাহুল্য। সৃষ্টিকার্য্যে সুবিধা না হইলে বিভেদটা থাকিতেই পারিত না, জীববংশ ধ্বংস হইবার সহিত বিভেদটাও চলিয়া যাইত। ইহার সহিত জীব বিদ্যার আর একটা প্রধান কথা যোগ করা যাইতে পারে। মৎস্য অপেক্ষা পক্ষী উচ্চশ্রেণীর, কিংবা মৎস্য নিকৃষ্ট, পক্ষী উৎকৃষ্ট,—অথবা পক্ষী অপেক্ষা স্তন্যপায়ী উৎকৃষ্ট। এই প্রকার উক্তির মূলে যাহা আছে, পুং স্ত্রী ভেদের মূলেও তাহাই। এক জীব হইতে অন্য জীব উচ্চ কি নীচ, এক মানব সমাজ হইতে অন্য মানব সমাজ উন্নত কি অবনত, তাহা নির্দ্ধারণের মূলে যাহা আছে, মৈথুন ও অমৈথুন জন্মের মধ্যে তাহাই আছে। মৈথুন জননের মূলে সৃষ্টি কার্য্যবিভাগ আছে, এবং কার্য্য বিভাগেই উচ্চ নীচ নির্দ্ধারণের মূল নিয়ম। বিষয়টা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচিত হইতে পারে না। তবে, সংক্ষেপে বলা যাইতে পাতে যে, নারীদেহ পুষ্টির আধার, নরদেহ ক্ষয়ের আধার। স্ত্রী জীবন সঞ্চয়ের, পুং দেহ ব্যয়ের। নারীদেহ অর্থেই পূরণ, নরদেহ অর্থেই ক্ষয়। পুরুষ চঞ্চল, অসহিষ্ণু, ব্যগ্র, পরি-বর্ত্তনের পক্ষপাতী; নারী স্থির, নিশ্চেষ্ট, সহিষ্ণু, পরিবর্ত্তন-বিরোধী। এই দুই বিপ-রীত ধর্ম্মাক্রান্ত জীব মিথুনের যোগে জীব প্রত্যহ রক্ষিত হইতেছে।

এই মূলনিয়ম অঙ্গীকার করিলে কানী-নতার কতকটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, অসিক্ত ডিম্বে পুংকোষানুর প্রভাব বর্ত্তমান থাকে। পুরুষ সংযোগ একবার ঘটিলে তাহার ফল পুরুষানুক্রমে বংশ পরম্পরায় চলিতে থাকে। কিন্তু যদি পুংকোষাণু ব্যতীত কেবল ডিম্ব কোষাণু হইতে সন্তান জন্মে, তাহা হইলে সামান্য ডিম্বকোষাণু হইতে সেরূপ ডিম্বকোষাণু ভিন্ন। যেমন অমৈথুন্য সন্তানোৎপাদনে একটী কোষ—না পুং, না স্ত্রী,—সন্তান জন্মাইতে পারে, তেমনই ডিম্বকোষাণুও পারে। বস্তুতঃ কানীনতা না থাকিলে মৈথুন্য ও অমৈথুন্য উৎপাদনের দুইটী ব্যাপারকে স্বতন্ত্র মনে করিতে হইত। প্রকৃতির মধ্যে এমন কোন ব্যাপার নাই, যাহা কেবল একটী, যাহা অন্য হইতে একেবারে ভিন্ন, যাহাকে অপ-রের সহিত যোগ করিতে পারা যায় না। এরূপ না হইলে জীবের ক্রমবিকাশ বা বিব-র্ত্তন বাদ মিথ্যা হইত। পুং স্ত্রী দুইটী এক লিঙ্গ পৃথক জীব যেমন আছে, তেমনই পুং স্ত্রী অঙ্গ ও সাধন সহ দ্বিলিঙ্গ জীব আছে; আবার তাহাও গিয়া পুং স্ত্রী সাধন বিহীন

অলৈঙ্গিক জীব আছে, যাহার শরীরের অপরাপর অঙ্গের ন্যায় অঙ্গ বিশেষ হইতে সন্তান জন্মে; শেষে তাহাও গিয়া অঙ্গ বিশেষও থাকে না, দেহের সর্ব্বাঙ্গ হইতেই সন্তান জন্মিতে পায়ে।

এই ভাবে দেখিলে, কানীনতায় বিস্ময় হয় না। যদি দেহের সর্ব্বাংশ বা অংশ বিশেষ হইতে সন্তান জন্মিতে পারে, তাহা হইলে পুং অভাবে স্ত্রীর সন্তান না হইতে পারিবে কেন, কিংবা স্ত্রী অভাবে পুরুষেরই বা সন্তান না হইতে পারিবে কেন? শৈবাল শ্রেণীর কোন উদ্ভিদের পুংকোষ হইতে সন্তান জন্মিতে দেখা গিয়াছে। ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বটে, কিন্তু এই প্রকার ঘটনা আছে বলিয়াই পুং স্ত্রী ভেদ বুঝিতে পারা যাইতেছে। বস্তুতঃ মৈথুন্য পরবর্ত্তী সৃষ্টি, অমৈথুন্যই পূর্ব্বের।

যদি স্ত্রীকোষাণু হইতে সন্তান জন্মিতে পারে, তবে পুং কোষাণু সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল? কানীন সন্তান দ্বারা কোন কোন জীবের বংশরক্ষা পাইতেছে, তবে আর নিষেক ক্রিয়ার কি আবশ্যকতা ছিল? এই প্রশ্নের নানাবিধ উত্তর পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, মিথুনের মিলন বা নিষেক ক্রিয়া দ্বারা জীবজাতি নূতন বল প্রাপ্ত হয়। ইহাঁদের অনুমানে অমৈথুন উৎপত্তি জীব জাতির অপকর্ষ হইয়া থাকে। এমন কি, জাতি ধ্বংসও হইতে পারে। অমৈথুন্য উৎপত্তি আছে বটে, কিন্তু মৈথুন্য উৎপত্তিই অধিক। দেহ বিভাজন বংশ রক্ষা বহু কাল চলিতে পারে না, পুং স্ত্রী কোষাণুর মিলন দ্বারা নবযৌবন লাভ হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে স্ত্রী কোষাণুই পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়, অন্যান্য কোষ মরিয়া যায়।

কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধেও কেহ কেহ বলিয়াছেন। জীববিদ্যাবিৎ জর্ম্মাণ বাইসমান (Weismann), ইঁহাদের অগ্রণী। তিনি বলেন, "অমৈথুন উৎপত্তির যে সীমা আছে, তাহার প্রমাণ কই? পুনর্জন্ম বা নবযৌবন লাভ, এই একটা কথার মধ্যে সমস্ত বিষয়টা অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট রাখিলে চলিবে কেন? যে কীট (Infusoria) পুনঃ পুনঃ সেই বিভাগ দ্বারা ক্ষীণবল ও অপকৃষ্ট হইল, তেমন দুইটী ক্ষীণবল জীবের মিলনে নবযৌবন লাভ হইতে পারে কি? অভাব হইতে, ভাব হইতে পারে না।" ইত্যাদি।

বোধ হয়, ইনিও এক দেশ দেখিয়াছেন। অথবা ইঁহার যুক্তি সত্য হইলেও সম্পূর্ণ নয়। অমৈথুন দেহ বিভাগ দ্বারা বংশ চলিতে পারে বটে, কিন্তু সে বংশের উন্নতির দিকে গতি লোপ পায়। যদি জীব বিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেই বিবর্ত্তনের নিমিত্ত কোন বেগ থাকা আবশ্যক। সেই বেগ পুংকোষ দেয়। জীবনের মধ্যে যত প্রকার ক্রিয়াই দেখা যাক্ না, তৎসমুদায়কে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। একটী স্বদেহ পোষণ; অন্যটী সন্তান জনন। কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত দেহ পোষণ চলে, তার পর তাহার শেষ, অথবা জননক্রিয়া আসে। পোষণে নিজের স্থিতি, জননে নিজের লোপ ও অন্যের আগমন। কিংবা যে পোষণে নিজের স্থিতি সম্পাদন করে, তাহাই সন্তানরূপ অপর দেহের স্থিতি আনয়ন করে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, এই দুই ক্রিয়া স্ত্রীদেহে ও পুংদেহে কতকটা পৃথক্ হইয়াছে। স্ত্রীদেহ মৃত্তিকারসাদি যুক্ত ক্ষেত্র, পুংদেহ বেগরূপ বীর্য্য। পুংকোষই

জীবজাতি পরিবর্ত্তনের প্রধান সহায়। স্ত্রী পরিবর্ত্তন আনে না, পুরুষ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে। এই স্থিতি শক্তি, ও গতি শক্তির সমবায়ে জীবোৎপত্তি। কেবল স্থিতি শক্তি দ্বারা গতি হয় না, এবং কেবল গতিশক্তি দ্বারা স্থিতি হয় না। স্থিতির পর গতি, এবং গতির পর স্থিতি,—এই নিয়মে জীব জগৎ চলিতেছে। স্ত্রীরূপ স্থিতিশক্তি দ্বারা স্থিতিই হইত, তাহাতে পুরুষ রূপ গতিশক্তি বেগ সঞ্চারিত করিলে অগ্রগতি হয়।

এতদ্ বিষয়ে প্রত্যক্ষ পরিদর্শনলব্ধ ফল আছে। উক্ত জাতীয় (Infusoria) একটী কীটকে বৎসরাধিক কাল রাখিয়া তাহার বংশবৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল। এই সময়ে তাহার ২১৫ পুরুষ অমৈথুন দেহ বিভাজন দ্বারা জন্মিয়াছিল। অবশেষে বংশটী ক্রমশঃ ক্ষীণকায় হইতে দেখা গেল, যেন বৃদ্ধ হইয়াই জন্মিতেছে। এখানে অমৈথুন জননের শেষসীমা বলা যাইতে পারে।

এই অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে কয়েকটাকে লইয়া অন্য বংশের সহিত রাখা হইয়াছিল। এই প্রাণী স্ববংশের কোন সন্তানের সহিত মিলিত হয় না। ভিন্নবংশ পাইয়া প্রথম বংশের প্রাণী দ্বিতীয় বংশের প্রাণীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। ইহার মিলনোৎপন্ন একটীকে পাঁচ মাস পর্য্যন্ত আবার পৃথক্ রাখা হইয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল, পর পর সন্তান জন্মিতে লাগিল। বিভিন্ন সময়ে এই সকল সন্তানকে অন্য বংশের সন্তানের সহিত রাখা হইল। উহাদের মধ্যে মিলন হইল। এইরূপে ১৩০ পুরুষ পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল। তখন আবার তাহাদের ক্ষীণাবস্থা দৃষ্ট হইল, এবং অন্য বংশের সহিত রাখাতেও সন্তান হইল না। যখন প্রায় ১৮০ পুরুষ হইয়া গিয়াছে, তখন দেখা গেল, সেই বংশের বিভিন্ন সন্তান পরস্পর মিলিত হইতেছে। কিন্তু কোন ফল হইল না, বংশটী ধ্বংস হইল।

তবেই বলিতে হইবে, কোন অজ্ঞাত কারণে অমৈথুন জনন দ্বারা উক্ত প্রাণিগণ ক্ষীণবীর্য্য হয়। উহাদের দেহ প্রথমে ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে, ক্রমশঃ দেহের আকার প্রায় চতুর্থাংশ হয়। দেহমধ্যে অনেক বিকার জন্মে, শেষ আকারহীন হইয়া সূক্ষ্ম পিণ্ডে পরিণত হয় এবং জীবন ধারণ ও সন্তানোৎপাদন অসম্ভব হয়। তবেই, এই সকল নিকৃষ্ট প্রাণীতেও সময়ে সময়ে মৈথুন জন্ম আবশ্যক হয়, নচেৎ বংশ প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, অমৈথুন কিংবা কানীন জন্ম জীব প্রবাহ রক্ষা বিষয়ে উপযোগী নয়। মৈথুন জনন দ্বারা জীবের যে অল্প অল্প পরিবর্ত্তন হয়, তাহার ফলে একদিকে তাহার বংশ অক্ষুণ্ণ থাকে, অন্য দিকে তাহার উন্নতির সম্ভাবনা ঘটে। ইহার অতিরিক্ত বলিতে গেলেই কল্পনা রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

জাতিভেদ হিন্দু শিক্ষা-প্রণালী।

হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশ এই, যিনি পূর্ব্বজন্মে যেরূপ গুণসম্পন্ন হইয়াছেন, ইহজন্মে তাঁহার তদনুরূপ জাতিতে জন্মলাভ হয়। জগতের কিছুই যখন একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত

হয় না, তখন পূর্ব্বজন্মের বিশেষ গুণসম্পন্ন চিত্তপুরুষই বা বিনষ্ট হইবে কেন? এজন্মে যেস্থানে আসিয়া যিনি শেষ করিলেন, পরজন্মে সেই স্থান হইতে তিনি আরম্ভ করিবেন, ইহাই নিয়তি, পূর্ব্ব সংস্কার ও প্রালব্ধ। এই নিয়মানুসারে ধরিয়া লইতে হয় যে, যাঁহার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, জন্মাবধি তাঁহার চিত্তপুরুষ তজ্জাতীয় গুণসম্পন্ন। ব্রাহ্মণ জাতি সত্ত্বগুণ-প্রধান। সত্ত্বগুণ-প্রধান বলিতে এমন বুঝায় না যে, তাহাতে অপর দুই গুণের প্রাদুর্ভাব একেবারেই নাই। সত্ত্বগুণ-প্রধান চিত্ত-পুরুষে তম ও রজোগুণ আছে বটে, কিন্তু সত্ত্বগুণেরই আধিক্যবশতঃ তাহা ব্রাহ্মণ জাতীয় হইয়াছে। এই রজ ও তমোগুণের বিনাশ সাধন করিয়া ব্রাহ্মণ-ঋষি সত্ত্বগুণের সম্পূর্ণতায় আসিলে ব্রাহ্মণ্যলাভ করেন। এইরূপ সম্পূর্ণতা সাধনার্থ বৈদিক আর্য্যধামে ব্রাহ্মণ জাতির সৃষ্টি। সেই সম্পূর্ণতা সাধন জন্যই ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ। এইরূপ ব্রতে ব্রতী বলিয়া আর্য্যকুলের ব্রাহ্মণ জাতি জগতের অপর দেশীয় সত্ত্বগুণ-প্রধান লোকমণ্ডলী হইতে পৃথক হইয়াছেন। পৃথক্ হইয়া উপবীতধারী হইয়াছেন। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ জাতীশ্বর হইয়া সেই গৌরবের চিহ্ন স্বরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন। আর্য্য সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণ যে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণ করিয়া সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, এই যজ্ঞোপবীত তাহারই চিহ্ন। সুতরাং চিহ্নিত হইয়া তিনি সমাজ মধ্যে (Covenanted) জাতি। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতই তাঁহার (Covenant)। ব্রাহ্মণ দুই কারণে জাতীশ্বর; তিনি সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং অপরাপর বর্ণভেদের মূলকারণ তিনি; কারণ, অপরাপর জাতি মূল ব্রাহ্মণ জাতি হইতে সমুৎপন্ন। কিরূপে সমুৎপন্ন, তাহা আমরা "ব্রাহ্মণ ও জাতিভেদ" নামক প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। হিন্দু সমাজে শ্রেষ্ঠের দৃষ্টান্তই গ্রহণীয়। হিন্দু সমাজে কেন, সকল সমাজেরই এই নিয়ম। গীতাও সেই কথা বলিয়াছেন। তাই সেই শ্রেষ্ঠ জাতির জাতীয় নিয়ম অপরাপর জাতির পক্ষে শাস্ত্রে নিয়োজিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সর্ব্বজাতির আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন। কোন্ বিষয়ে আদর্শ স্থানীয়? ব্রাহ্মণ যে সাত্ত্বিকগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার সেই সাত্ত্বিকতাই সর্ব্ব জাতির আদর্শ স্থানীয়। যেহেতু সাত্ত্বিকতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ, সেই শ্রেষ্ঠ গুণ ভিন্ন আর কি আদর্শ হইতে পারে?

ব্রাহ্মণ জন্মাবধি সত্ত্বগুণ-প্রধান হইলেও তাঁহার রজ ও তমোগুণ যে একেবারেই নাই, এমত নহে। সেই দুই গুণ অপ্রধান মাত্র। অপ্রধান বটে কিন্তু তাহাদের যথেষ্ট প্রাবল্য থাকে। এই দুই গুণের অত্যধিক প্রাধান্য হইলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়েন। এই দুই গুণের বিনাশ সাধন করাই ব্রাহ্মণ্য। ব্রাহ্মণ এই দুই গুণের বিনাশ কিরূপে সাধন করেন? ব্রাহ্মণ ব্রতধারী হইয়া যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন, সেই জাতীয় শিক্ষা প্রভাবেই সেই গুণদ্বয়ের ধ্বংস সাধন হয়। প্রাচীন কালে যে চারি আশ্রম নিয়ম ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধানিত ছিল, এই চারি আশ্রম নিয়মই সেই শিক্ষা-প্রণালী। এক্ষণে আর চারি আশ্রম নিয়ম নাই বটে, কিন্তু এক সংসারাশ্রমেই সেই চারি আশ্রম-নিয়ম প্রতিপালিত হইতে পারে। সংসারাশ্রমে সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থের নিয়ম-পালনের কোন বাধা হইতে পারে

না। এক্ষণকার চতুষ্পাঠী প্রাচীন কালের ব্রহ্মচর্য্যের ছায়ারূপে আজিও বিদ্যমান।

জ্ঞান, ইচ্ছা ও কর্ম্মশক্তি সম্পন্ন হইয়া মনুষ্য সম্পূর্ণ জীব। এই ত্রিবিধ শক্তির পূর্ণানুশীলনে তাহাদের উন্মেষ হয়। সেইরূপ উন্মেষ-সাধনই পূর্ণ মনুষ্যত্ব। জ্ঞানানুশীলন দ্বারা জ্ঞানবৃত্তির তৃপ্তি, কামনার অনুশীলনে প্রবৃত্তি বা ইচ্ছার তৃপ্তি, কর্ম্ম সেই জ্ঞান ও ইচ্ছার পরিণাম। জ্ঞান হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে কর্ম্ম। এই ত্রিবিধ শক্তির সম্বন্ধ এইরূপ। তুমি সরোবরে একটী পদ্মফুল দেখিলে, সেই পদ্ম ফুলের জ্ঞান হইল, জ্ঞান সেই পদ্মফুল লাভেচ্ছা উৎপাদন করিল। শেষে কর্ম্মশক্তি সেই সরোবর হইতে পদ্মফুল আনিয়া দিল। সুতরাং জ্ঞানই সর্ব্ব কর্ম্মের মূল। কামনা জ্ঞান দ্বারা শাসিত হয়, কামনা শাসিত হইলেই কর্ম্ম শাসিত হয়। আর্য্য জাতির শিক্ষা-প্রণালী তাই প্রথমে এই জ্ঞান-শিক্ষার প্রতি নিয়োজিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যই জ্ঞানানুশীলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। সেই ব্রহ্মচর্য্যে যে জ্ঞানানুশীলন হইবে, সংসারে তাহাই কামনার উৎপাদক হইয়া ক্রিয়াশীল হইবে।

ব্রহ্মচর্য্যে কিরূপ জ্ঞানের অনুশীলন হইত? সে জ্ঞান বেদাধ্যয়নে এবং গুরুর কঠিন সংযম-নিয়মে অর্জ্জিত। এই সংযমের প্রধান শাসন গুরুভক্তি। গুরুভক্তি-প্রভাবেই সংযম-শিক্ষা এবং সংযমের সহিত বেদশিক্ষা। এরূপ শিক্ষা প্রণালী ক্রমে যে জ্ঞান অর্জ্জিত হইত, তাহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান; সেই শ্রেষ্ঠজ্ঞানে সুশিক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণ সংসারের বিশাল প্রবৃত্তি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন।

এই সংসারই ব্রাহ্মণের যজ্ঞভূমি। এই যজ্ঞভূমিই প্রবৃত্তি অনুশীলনের বিস্তারিত ক্ষেত্র। জ্ঞানানুশীলনের পর প্রবৃত্তির অনুশীলন। এই প্রবৃত্তির অনুশীলন শুধু পুত্র কন্যা লইয়া নহে সে সংসারভুক্ত জগতের সকলেই—পশু, পক্ষী, অতিথি, সজ্জন, দেবতা, ব্রাহ্মণ, রাজা, প্রজা, গুরু, শিষ্য, পুরোহিত, আত্মীয়, স্বজন, দাস, দাসী, ভাই, ভগিনী, ভাগিনেয়, মাসী, পিসী, কুটুম্ব, সাক্ষাৎ—সবাই সংসার ভুক্ত। ভক্তিতে, স্নেহে, মমতায়, ক্ষমায়, আদরে, দয়ায়, দাক্ষিণ্যে, ধৈর্য্যে, লজ্জায়, খাতিরে আর কত মত প্রবৃত্তির অনুশীলনে তবে সংসার-ধর্ম্মের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। ব্রাহ্মণের সংসার পশু সেবা নহে, তাঁহার সংসার দেব-সেবা। তাঁহার সংসারাশ্রম মহা যজ্ঞক্ষেত্র, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞের মহা শ্রীক্ষেত্র। সে আশ্রম তাই মহা ধর্ম্মক্ষেত্রের পবিত্র দেব মন্দির। এই ধর্ম্মক্ষেত্র ও দেবমন্দিরের দেব কার্য্য সাধনে তাঁহার জ্ঞান কামনাকে চরিতার্থ করিয়া এরূপ নিয়মিত করে, যদ্দ্বারা তাঁহার পশুত্বের হ্রাস হয় ও মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। ব্রহ্মচর্য্যের জ্ঞান, সংসারের প্রবৃত্তি পথকে এরূপ সংযত ও নিয়মিত করে, যদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের উপযোগী হইতে পারেন। তাহা হইলেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারেন। জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও কর্ম্মের এইরূপ অনুশীলনেই মানুষ দেবত্বে উপনীত হয়েন। পশু মানুষ হয়, মানুষ দেবতা হয়। দেবত্বই সাত্ত্বিকতার পূর্ণত্ব। সাত্ত্বিকতার পূর্ণত্ব প্রাপ্তিই মনুষ্যের চরমোৎকর্ষ। এই চরমোৎকর্ষ লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ সৃষ্ট। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় ব্যক্তিকে এই দেবত্ব ও চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে হয়। ব্রাহ্মণ্য লাভ

করিতে হইলে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করা উচিত। ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিতে হইলে ইহলোকে সাত্ত্বিক গুণের অনুশীলন করিয়া সাত্ত্বিক গুণাধিক্য লাভ করা চাই। সাত্ত্বিক গুণের অনুশীলন করিতে হইলে সাত্ত্বিক কার্য্যানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সাত্ত্বিক কার্য্যানুষ্ঠান সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি ব্যতীত সমুৎপন্ন হয় না। প্রবৃত্তিকে সাত্ত্বিক পথে আনিতে হইলে,সংযম ও স্বার্থ ত্যাগ করা আবশ্যক। প্রেমকে স্বার্থ হইতে যতই পরার্থ করা যায়, ততই প্রবৃত্তি সাত্ত্বিক পথে আইসে।

ব্রাহ্মণ সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্তি-স্রোতকে এইরূপ স্বার্থপথ হইতে পরার্থ পথে আনিয়া সাত্ত্বিকতা লাভ করেন। তিনি স্বজাতি নিবিষ্ট থাকিয়া সর্ব্বজাতিতে নিজ প্রেম প্রসারিত করেন। সমদর্শিতাই ব্রাহ্মণ্য লাভের প্রশস্ত পন্থা। তাই ব্রাহ্মণের প্রেম সর্ব্ব জাতিতে, সর্ব্বভূতে বিস্তৃত। তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্য শুধু মানুষ জাতির প্রতি নহে, যিনি ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী, সর্ব্বজীবে ব্রহ্ম বর্ত্তমান বলিয়া সকলেরই ব্রাহ্মণ জাতীয়ত্ব হেতু সর্ব্বজীবে তাঁহার প্রেম। মনুষ্যের সর্ব্ব জাতীয় লোকের সহিত ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ। শুধু গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ নহে, সমদর্শিতার নিদানভূত বিশ্ব-প্রেমের সম্বন্ধ। সর্ব্ব জাতিকে না ভাল বাসিতে পারিলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করা দুষ্কর।

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, দান ও প্রতিগ্রহ —এই সমস্ত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে সুশিক্ষিত হওয়াই ব্রাহ্মণের জাতীয় শিক্ষা। এই জাতীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণ আত্মসেবী ও সমাজ-সেবী। সমাজসেবা না করিতে পারিলে তাঁহার আত্মসেবা ও আত্মার পরাগতি লাভ করিবার যো নাই। সুতরাং প্রকৃত-পক্ষে আত্মসেবা করিতে হইলে সমাজ-সেবা করা চাই। দুই এক কাজ হইয়া দাঁড়ায়। আত্ম ইষ্টের সহিত সামাজিক ইষ্ট এক সূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহে সুশিক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণ একদা আত্মসেবী ও সমাজসেবী। সমাজ সেবা তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের অপরাংশ মাত্র। এইরূপ শিক্ষায় সুশিক্ষিত করাই ব্রাহ্মণের জাতীয় শিক্ষা।

ব্রাহ্মণকে স্ববৃত্তিতে সুশিক্ষিত করিয়া আনা যেমন তাহার জাতীয় শিক্ষা, তেমনি ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতি সমূহকে নিজ নিজ ব্যবসায় ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে সুশিক্ষিত করিয়া আনিবার জন্য আর্য্যসমাজে জাতিভেদের ব্যবস্থা। নিজ নিজ ব্যবসা ও বৃত্তিতে নিপুণতা লাভ করিতে হইলে শিক্ষা জাতীয় ভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে সুসম্পন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। যে কার্য্যে জীবনব্যাপী শিক্ষালাভ করা যায়, তাহাতেই পটুতা অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য হিন্দু সমাজে কুল-ক্রমাগত ব্যবস্থা। গুণানুসারে ও লোকের প্রকৃতি অনুসারে সমাজকে নানাভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি বিভাগের প্রকৃতি ও গুণানুসারে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত জাতি-ভেদ। ছাত্রগণের অধিকার অনুসারে যেমন বিদ্যালয়ে বিবিধ শ্রেণী বিভাগ, জাতিভেদও তদ্রূপ সামাজিক শ্রেণীবিভাগ। স্বস্ব বৃত্তিতে সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত এই বিভাগের অবস্থা। নহিলে সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কেন? সকল ব্যবসা বৃত্তির সুদক্ষ লোক সমাজে সুলভ হইবে কি প্রকারে? ভারতের ন্যায় কৃষি প্রধান দেশে কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র

শ্রেণীর লোক। মেষপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বহুল পরিমাণে চলিতে পারে না। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিকার্য্যের গৌরব সামান্য শ্রমজীবি-লোকের উপরে স্থাপিত। শূদ্রজাতীয় শ্রম-জীবিলোক হিন্দুসমাজে বড়ই সুলভ, এত সুলভ অন্য সমাজে নহে। অন্য সমাজে শূদ্র জাতীয় স্বতন্ত্র শ্রেণীস্থ এতবৃহৎ লোকারণ্য পাওয়া বড়ই কঠিন। অপর সমাজের শ্রমজীবি লোক এবং দাসব্যবসায়ীদিগের দর বড়বেশী। অন্য সমাজে হাড়ি, মুচি, মেথর প্রভৃতির নীচ ও ঘৃণাকর কার্য্যে কে নামিতে চায়? কিন্তু হিন্দুসমাজে জাতিভেদ কুলক্রমাগত হওয়াতে এখানে সর্ব্বজাতীয় ব্যবসাবৃত্তির লোক অতিসুলভ। হিন্দুসমাজের বিশালশূদ্র জাতি সমূহ সমাজের মহাবল ও স্তম্ভ স্বরূপ।

স্ববৃত্তিতে সুশিক্ষিত করিবার জন্য হিন্দু সমাজে যে জাতিভেদের সৃষ্টি, তাহা প্রতি জাতির ধর্ম্মশিক্ষা পথেরও অনুকূল ছিল। সকল আর্য্য ব্যবস্থায়ই মূল ধর্ম্ম। জাতি-ভেদের উদ্দেশ্যও সেই ধর্ম্ম। জাতিভেদ যে যেরূপ শিক্ষা প্রণালী,সেই শিক্ষা প্রণালীরও উদ্দেশ্য সেই ধর্ম্ম। সাধন ধর্ম্ম এবং সমাজ-ধর্ম্মভেদে ধর্ম্ম দ্বিবিধ। প্রতি ব্যক্তির হিতার্থ সাধন ধর্ম্ম এবং সমাজের হিতার্থ সমাজ ধর্ম্ম। জাতিভেদ এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম-সাধক। প্রতিব্যক্তির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বিধান করা প্রতি ব্যক্তির ইষ্ট এবং সমাজের পুষ্টি সাধন করাই সমাজের ইষ্ট। জাতিভেদ একদা এই দ্বিবিধ ইষ্ট সাধক। স্ববৃত্তিতে সুশিক্ষিত হইতে পারিলেই সামাজিক ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। জাতিভেদ কুলক্রমাগত হওয়াতে সর্ব্বজাতীয় লোক নিজ নিজ বৃত্তিতে সুশি-ক্ষিত হইয়া যেমন নিজ নিজ জীবিকা লাভের সদুপায় করিতে পারেন, তেমনি সমাজের সর্ব্বজাতীয় সুশিক্ষিত লোক সুলভ হইলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গে বলোপায় হয়। তজ্জন্য প্রাচীন কালে আর্য্য-সমাজ এইরূপ সর্ব্বা-ঙ্গীণ বলসম্পন্ন ও সমুন্নত হইয়া পৃথি-বীতে সভ্যতা ও ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। পাছে এই সমাজধর্ম্মের ত্রুটি হয়, তাই আর্য্য শাস্ত্রে স্ববৃত্তি পরিত্যাগের পাপ ঘোষিত হইয়াছে। নিজ জাতির মধ্যে স্ববৃত্তিতে থাকিয়া যিনি শ্রীবৃদ্ধি সাধন করি-য়াছেন, হিন্দুমতে তিনি তজ্জাতীয় কৌলীন্য লাভ করিয়াছেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, "বৃত্তি" কুললক্ষণের মধ্যে গণ্য। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন জাতিই বেদাধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং তজ্জন্য যে রূপ বুদ্ধির পরিমার্জ্জনা সাধিত হইত, সেই পরিমার্জ্জিতা বুদ্ধি সহকারে সকলেই আপন আপন বৃত্তির উন্নতি-সাধনে সমর্থ ছিলেন। তাই আর্য্য সমাজে সর্ব্ববিধ বিদ্যা ও কলার ক্রমশঃ উৎ-কর্ষ লাভ হইয়াছিল। এতদূর উৎকর্ষ যে আজিও তাহার সমতুল্য হওয়া সুকঠিন হইয়াছে। পূর্ব্বকালে তাই স্ববৃত্তিতে থাকিয়া লোকের যে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা থাকিত না, এমন নহে, তদ্দ্বারা অনেকে বিল-ক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়া দান-ধ্যান পূর্ব্বক সমাজধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু হিন্দু সমাজে পূর্ব্বে ধনগৌরবই প্রধান গৌরব ছিল না, ধন কেবল ধর্ম্মের জন্য, দান ধ্যানের জন্য। বেশি দিনকার কথা নহে, ইদানীনকালেও, আমাদের বাপ-পিতামহের কালেও,ধর্ম্মগৌরবই সমাজের প্রধান গৌরব রূপে গণ্য হইত। এক্ষণকার মত তত ধন-লোভ না থাকাতে সকলেই নিজ নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট হইয়া সংসার যাপন করিত। যে

জাতীয় লোকের জাতিকুল যাহা হউক না কেন, তাহাতে বড় আসিয়া যাইত না। যে যেমন ধার্ম্মিক, সমাজে তাহার তত মান সম্ভ্রম। সুতরাং সামাজিক উচ্চনীচত্ব এই ধর্ম্মের উপরই নির্ভর করিত। এই ধর্ম্মানুরাগই সর্ব্বজাতীয় লোককে নিজ নিজ সাধন-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিত। জাতিভেদ দ্বারা সমাজিক বিভিন্নতা থাকিলেও সাধন-ধর্ম্মপথের পথিক সকলেই। যে সাত্ত্বিকতা ব্রাহ্মণের সম্পত্তি ও গৌরব, সেই সাত্ত্বিকতা লাভের অধিকারী সবাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় সকলেই বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইয়া ব্রাহ্মণের উপদেশে সেই সাত্ত্বিকপথে আসিতে পারিতেন। শূদ্রগণও গুরু পুরোহিতের উপদেশে নীয়মান হইয়া এবং পুরাণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তদ্রূপ ভক্তি পথে সমুন্নত হইতে পারিতেন। দান ধ্যান, যাগ-যজ্ঞে, বার ব্রতে এবং পূজাদিতে সকলেই সমান অধিকারী। এই বিষয়ে বিভিন্নতা কাহারই নাই। পুরাণাদি শ্রবণ ও পাঠে শূদ্র জাতীয় লোকের ভক্তিপথ আরও সহজ ছিল। এই সাত্ত্বিকতা লাভ করা যখন সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে,—সংযম ভিন্ন, চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন কোন প্রকারেই ধর্ম্মলাভ করা যখন সাধ্য নহে, তখন কেবল বিশেষ গ্রন্থাধ্যয়নে অধিকারী থাকা আর না থাকা সমান কথা। যাঁহারা বেদের অধিকারী, তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞান যেরূপ গুরুর উপদেশ-সাপেক্ষ, আর যাঁহারা কেবল পুরাণাদির অধিকারী, তাঁহাদের ও ধর্ম্মজ্ঞান তদ্রূপ গুরুর উপদেশ সাপেক্ষ। কারণ, হিন্দুধর্ম্মের সমুদায়ই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। গুরুর উপদেশ ভিন্ন আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে জ্ঞান লাভ করা দুঃসাধ্য। শূদ্রের গুরু যে ব্রাহ্মণ, অপর জাতীয় লোকেরও গুরু সেই ব্রাহ্মণ। সুতরাং ধর্ম্মপথের নেতা একই থাকাতে শাস্ত্রের অধিকার ভেদের বিভিন্নতায় কিছুই আসিয়া সাধন-ধর্ম্মে সর্ব্বজাতীয় লোকপ্রায় যাইত না। সাধারণ লোকশিক্ষার নিমিত্ত, সাধারণ শূদ্র ও মূর্খজাতীয় লোক শিক্ষা, এবং অল্পবুদ্ধি স্ত্রীজাতির শিক্ষার জন্য এই অধিকার বিভিন্ন করিয়া দিবার বিশেষ কারণও ছিল। একইরূপ ভক্তিশিক্ষা প্রাপ্ত হইত। বেদের উপদেশে; যে ধর্ম্ম, পুরাণাদিরও উপাদেশে সেই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের নানাবিধ সাধনপথ সকল শাস্ত্রেই সমান। সকল পথই মোক্ষ সাধক। সাধনপথ যদিও বিভিন্ন, কিন্তু সকল পথেরই উদ্দেশ্য ও গন্তব্য স্থল একই। সকলই সংযম-মূলক চিত্তশুদ্ধি পথ। চিত্তশুদ্ধি সাধন না হইলে কোন পথেই সাত্ত্বিকতা-লাভ করা যায় না। সাত্ত্বিকতালাভ না করিতে পারিলে, কোন পথেই মুক্তিলাভ সুসাধ্য নহে। এরূপ স্থলে, সকল আনুষ্ঠানিক পথই সদ্‌গুরু-সাপেক্ষ। সেই সদ্‌গুরু একমাত্র ব্রাহ্মণ। সুতরাং যিনি যে জাতীয় হউন না কেন, তাঁহার ধর্ম্ম গুরু ও শিক্ষক সেই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ পথ দেখাইয়া দিয়া সর্ব্ব জাতীয় লোককে নিজ নিজ ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতেন। জাতীয় বিভিন্নতা থাকিলেও ধর্ম্মসাধন-পক্ষে কিছুই বিভিন্নতা ঘটিত না।

তবেই দেখা যাইতেছে, সমাজস্থ প্রতি ব্যক্তিকে তাহার স্ববৃত্তি এবং কুব্যবসায়ে সুশিক্ষিত করাই জাতিভেদের উদ্দেশ্য। এরূপ শিক্ষা প্রতি ব্যক্তির শুধু ঐহিক মঙ্গলের কারণ নহে, তদ্দ্বারা সমাজেরও সম্যক শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়া থাকে। অথচ এরূপ শিক্ষার সহিত যাহাতে প্রতি ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন হয়, তাহাও সামাজিক ব্যবস্থায় নিয়োজিত হইয়াছে। আর্য্যধামের সামাজিক নিয়ম এরূপ, যাহাতে সর্ব্ব জাতীয় লোক ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন। প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করিয়া ক্রমশঃ রজ ও তমোগুণের বিনাশ হেতু সাত্ত্বিক গুণে পরিপূর্ণ হইতে পারেন। এইরূপ ব্যবস্থা বলে প্রাচীনকালে অনেক ক্ষত্রিয় রাজ রাজভোগে থাকিয়াও রাজর্ষির পরমগুণে ভূষিত হইয়াছিলেন। অন্য লোকের পক্ষে ত সেরূপ গুণলাভ করা আরও সহজ হইবার কথা। অতএব কি সামাজিক উন্নতি, কি প্রতি ব্যক্তির লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি, সর্ব্ববিধ উন্নতির সদুপায় হিন্দু জাতিভেদের শিক্ষাপ্রণালী। এই শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজ সভ্যতা, ধর্ম্ম, এবং লৌকিক উন্নতির চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়া কিরূপ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল, ভারতীয় ইতিবৃত্ত পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। আজি সেই সভ্যতা ও ধর্ম্মোন্নতির নিদর্শন ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া শতমুখে প্রাচীন ভারত-গৌরব প্রচার করিতেছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

(শ্রীম—কথিত)

[শ্রীপরমহংসদেব—অষ্টাদশবর্ষ পূর্ব্বে]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী। মা কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ সালের মার্চ্চ মাস। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। মাষ্টার দেখিলেন, একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তাপোষে বসিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরিকথা বলিতেছেন। ভক্তেরা মেজ্যায় বসিয়া আছেন।

[কর্ম্মত্যাগ কথন ?]

মাষ্টার দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া দেখিতেছেন। বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ কথা কহিতেছেন, আর সর্ব্ব তীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "যখন একবার হরি বা একবার রামনাম কর্‌লে রোমাঞ্চ হয়, আর অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম্ম আর করতে হবে না। তখন কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম কি হরিনাম কি শুদ্ধ ওঁকার জপ্‌লেই হলো। "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।"

মাষ্টার বরাহনগরে এ বাগান ও বাগান বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন ; সিধুর * সঙ্গে এ বাগানে বেড়াতে এসেছেন। আজ রবিবার, অবসর আছে তাই বেড়াতে এসেছেন। প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে বেড়াচ্ছিলেন। তখন সিধু বলিয়াছিলেন 'গঙ্গার

* শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার উত্তর বরাহনগরে বাড়ী।

ধারে একটী চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটী কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।'

বাগানে সদর ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাষ্টার ও সিধু বরাবর ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে আসিয়াছিলেন। মাষ্টার অবাক্ হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন "আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়িতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু একবার দেখি কোথায় এসেছি। তারপর এখানে এসে বসিব"।

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। এককালে কাঁসর ঘণ্টা খোল করতালি বাজিয়া উঠিল। বাগানের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথী বক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল। সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দ্দিকে আয়োজন হইতেছে। মাষ্টার দ্বাদশ শিব মন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। সিধু বলিলেন, "এটী রাসমণির দেবালয়। এখানে নিত্যসেবা হয়। আর অনেক অতিথি কাঙ্গাল আসে।"

কথা কহিতে কহিতে ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুইজনে আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। এবার দেখিলেন, ঘরের দ্বার দেওয়া। মাষ্টার ইংরাজী পড়িয়াছেন, হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দ্বারদেশে বৃন্দে (ঝি) দাঁড়াইয়াছিল। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁগা সাধুটী কি এখন এর ভিতর আছেন?

বৃন্দে। হাঁ, এই ঘরের ভিতরে আছেন। এই মাত্র ধুনা দেওয়া হোলো।

মাষ্টার। ইনি এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দে। তা অনেক দিন আছেন—

মাষ্টার। আচ্ছা ইনি কি খুব বই টই পড়েন?

বৃন্দে। আর বাবা বই টই! সবই ওঁর মুখে!

মাষ্টার। সবে পড়া শুনা করে এসেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক্ হইলেন।

মাষ্টার।—আচ্ছা ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা কর্‌ছেন? আমরা কি এ ঘরের ভিতর যেতে পারি? তুমি একবার খবর দিবে?

বৃন্দে। তোমরা যাওনা বাবা। গিয়ে ঘরে বোসো।

তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন ঘরে আর কেহই নাই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ। মাষ্টার প্রবেশ করিয়াই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বসিতে অনুজ্ঞা করিলে তিনি ও সিধু মেজ্যাতে বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় থাকো, কি করো, বরাহনগরে কি করতে এসেছ ইত্যাদি। মাষ্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন। কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। পরে শুনিলেন এরই নাম ভাব। যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া

মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাঁতনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ্ হাতে করিয়া ফাঁতনার দিকে, একদৃষ্টে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না, এ ঠিক সেইরূপ ভাব। পরে শুনিলাম, ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন একবারে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইতেন। এরই নাম ভাবসমাধি।

মাষ্টার বলিলেন, "আপনি বোধ হয় এখন সন্ধ্যা করিবেন, তা হলে এখন আমরা আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না—সন্ধ্যা—এমন কিছু নয়। আর কিছু কথা বার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। ঠাকুর বলিলেন, আবার এসো।

মাষ্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন এ সৌম্য কে—যাঁহার কাছে আবার ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে? বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়? কি আশ্চর্য্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন, আবার এসো। কাল কি পরশ্ব সকালে আবার আসিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[গুরু—শিষ্য]

দ্বিতীয় দর্শন সকাল বেলা, বেলা আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন। এখনও একটু শীত আছে। তাই তাঁহার গায়ে moleskin এর র‍্যাপার। র‍্যাপারের কিনারায় সালু দিয়া মোড়া। মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি এসেছ? আচ্ছা এখানে বসো।

একথা দক্ষিণ পূর্ব্ব বারাণ্ডায় হইতেছিল। নাপিত উপস্থিত; সেই বারাণ্ডায় তিনি কামাইতে বসিলেন ও মাঝে মাঝে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। গায়ে ঐরূপ ব্যাপার; পায়ে চটী জুতা; সহাস্যবদন। কথা কহিবার সময় কেবল একটু তোত্‌লা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। হাঁগা, তোমার বাড়ী কোথায়?

মাষ্টার। আজ্ঞে, কলিকাতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে কোথায় এসেছ?

মাষ্টার। এখানে বরাহনগরে বড় দিদির বাড়ী আসিয়াছি। ঈশান কবিরাজের বাটী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওই ঈশেনের বাড়ী।

(শ্রীকেশবচন্দ্র সেন)

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁগা, কেশব কেমন আছে? শুনেছিলুম, বড় অসুখ হয়েছিল।

মাষ্টার। আজ্ঞে, আমিও শুনেছিলুম বটে; এখন বোধ হয় ভাল আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব চিনি মেনেছিলুম।

শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতো, আর মার কাছে কাঁদতুম; বলতুম, মা কেশবের অসুখ ভাল করে দাও; কেশব না থাক্‌লে আমি কল্‌কাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব? তাই ডাব চিনি মেনেছিলুম।

(মাষ্টারের প্রতি) হাঁগা কুক্‌সাহেব না কি একজন এসেছে? সে না কি লেক্‌চার দিচ্ছে? আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছ্‌ল, সেই জাহাজে কুক্‌সাহেবও ছিল।

মাষ্টার। আজ্ঞে এই রকম শুনিছিলুম বটে; কিন্তু আমি তাঁর লেক্‌চার শুনি নাই। আমি তাঁর বিষয় বিশেষ জানি না।

[গৃহস্থ ও পিতার কর্ত্তব্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। "প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজকর্ম্ম নাই। বলে আমি এখানে থাকব। শুনলাম, মাগছেলে সব শ্বশুর বাড়ীতে রেখেছে। অনেক গুলি ছেলে পিলে। আমি বকলুম। (মাষ্টারের প্রতি) দেখ দেখি, ছেলে পিলে হয়েছে, তাদের কি আবার ও পাড়ার লোকে এসে খাওয়াবে দাওয়াবে, মানুষ করবে? লজ্জা করে না যে, মাগ ছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, তাদের শ্বশুর বাড়ী ফেলে রেখেছে। আমরা অনেক বকলুম, আর কর্ম্ম কাজ খুঁজে নিতে বললুম। তবে এখান থেকে যেতে চায়।

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

(মাষ্টারের প্রতি) তোমার কি বিবাহ হয়েছে?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

মাষ্টারকে তিরস্কার ও তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণকরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিহরিয়া,রামলালের প্রতি) ওরে রামলাল! যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে!

মাষ্টার ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় অবাক্ হইয়া অবনত মস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—ভাবিতে লাগিলেন, বিয়ে করা কি এত দোষ? মাষ্টারের অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন "দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল, আমি কপাল চোক এসব দেখ্‌লে বুঝতে পারি। তোমার চক্ষু বেশ ছিল।*

আচ্ছা, তোমার স্ত্রী কেমন বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যা শক্তি?

(জ্ঞান কাহাকে বলে?)

মাষ্টার। আজ্ঞে ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। সে অজ্ঞান? আর তুমি জ্ঞানী? তোমার জ্ঞান হয়েছে?

মাষ্টার জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন নাই। এখন এই পর্য্যন্ত জানিতেন যে, লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল—তখন শুনিলেন যে ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর যখন বলিলেন—'তুমি কি জ্ঞানী' তখন মাষ্টারের আবার অহঙ্কারে বিশেষ আঘাত লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস না 'নিরাকারে' বিশ্বাস?

(প্রতিমা-পূজা)

মাষ্টার আবার অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। সাকারে বিশ্বাস থাকিলে কি আবার নিরাকারে বিশ্বাস হয়? না ঈশ্বর নিরাকার, এ বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বর সাকার, এ বিশ্বাস হইতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটোই কি সত্য হইতে পারে? সাদা জিনিষ, যেমন দুধ, সে কি আবার কালো হইতে পারে?

মাষ্টার (অনেক চিন্তার পর)। "আজ্ঞে নিরাকার আমার এইটী ভাল লাগে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বেশ। একটা বিশ্বাস থাকলেই হল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাত

* রামলাল—ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীবাড়ীর পূজারি।

* মাষ্টারের বয়স তখন ছাব্বিশ সাতাইস।

ভালই। তবে এ বুদ্ধি কোরো না, এই সত্য আর সব মিথ্যা। নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য। তোমার যেটী বিশ্বাস সেটীই ধরে থাকবে।

মাষ্টার দুই সত্য এই কথা বার বার শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। একথা ত তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই! মাষ্টারের অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন।

মাষ্টার। আচ্ছা মহাশয়,তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হইল। কিন্তু মাটীর প্রতিমা তিনি ত নন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাটী কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।

মাষ্টার 'চিন্ময়ী প্রতিমা' কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন, আচ্ছা যারা মাটীর প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটীর প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর তাদের প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পূজা করা উচিত; মাটীকে পূজা করা উচিত নয়।

(Lecture ও শ্রীরামকৃষ্ণ)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক্। কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই। তুমি বোঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করিয়াছেন, চন্দ্র সূর্য্য করেছেন, মানুষ জীবজন্তু করেছেন, জীবজন্তুদের খাবার উপায় করেছেন, পালন করবার জন্য মা বাপ করেছেন, মা বাপের স্নেহ করেছেন, তিনিই বোঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ উপায় করবেন না। যদি বোঝাবার দরকার হয়, তিনিই বোঝাবেন। তিনি ত অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটীর প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না, তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হবেন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তাহার চেষ্টা কর।"

এইবারে মাষ্টারের অহঙ্কার বোধ হয় একেবারে চূর্ণ হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,"ইনি যা বলছেন তাতো ঠিক! আমার বোঝাতে যাবার কি দরকার? আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি না আমার তাঁর উপর ভক্তি হয়েছে। 'আপনি শুতে স্থান পায় না শঙ্করাকে ডাকে।' কিছু জানি ন শুনি না পরকে বোঝাতে যাওয়া বড় লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ সন্দেহ নাই। একি অঙ্ক শাস্ত্র,না ইতিহাস,না সাহিত্য যে পরকে বুঝাইব? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব! ইনি যা বলছেন, আমার মনে বেশ লাগছে।" মাষ্টারের ঠাকুরের সহিত এই প্রথম ও শেষ তর্ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি মাটীর প্রতিমা পূজা বলছিলে। যদি মাটীরই হয়, সে পূজাতেও প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা তিনিই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এ সব করেছেন। অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

"এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করছেন যার যা পেটে সয়। কারও জন্য মাছের পোলাও করেছেন। যার পেটের অসুখ, তার জন্য মাছের ঝোল করেছেন। আবার কাহারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চচ্চড়ি,

মাছ ভাজা, এই সব করেছেন। যেটী যার ভাল লাগে। যেটী যার পেটে সয়। বুঝলে ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(মাষ্টারের প্রতি উপদেশ।)

(ভক্তির উপায়।)

মাষ্টার। মহাশয়, ঈশ্বরে কি করে মন হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের নাম গুণ গান সর্ব্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ করতে হয়—যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, তাঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। কিন্তু সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাত দিন থাকলে ঈশ্বরেতে মন হয় না। তাই জন্য মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়া তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় নির্জ্জন মাঝে মাঝে না হলে ঈশ্বরেতে মন রাখা বড়ই কঠিন হয়।

"যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।

"ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্ব্বদা বিচার করবে সদসৎ বিচার। ঈশ্বরই সৎ, কিনা নিত্যবস্তু; আর সব অসৎ, কিনা অনিত্য। এই বিচার সর্ব্বদা করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে।

মাষ্টার। সংসারে কি রকম করে থাকতে হবে ?

(গৃহস্থ সন্ন্যাস।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী পুত্র বাপ মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে যেন কত আপনার লোক কিন্তু মনে জানবে তারা তোমার কেউ নয়।

"বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ করছে,কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের যেন আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে, 'আমার হরি।' কিন্তু মনে মনে বেশ জানে 'এরা আমার কেউ নয়।"

"কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান ? আড়ায় পড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।

"ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে, বিপদ শোক তাপ এ সবতাতে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত সংসারের কাজ করবে, যতই বিষয় চিন্তা করবে, ততই আসক্তি বাড়বে।

"তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙ্গতে হয়। তানা হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজ হাত দিতে হয়।

(উপায়—নির্জ্জনে সাধন।)

কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে নির্জ্জন হওয়া চাই। মাখম তুলতে গেলে নির্জ্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তার পর নির্জ্জনে বসে সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখম তোলা যায়।

"আবার দেখ এই মনে নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে কেবল ফেলে রাখলে ঐ মন

নীচ হয়ে যায়, কেবল কামিনী কাঞ্চন চিন্তা করে।

সংসারে যেন জল আর মনটী যেন দুধ, দুধ যদি জলে ফেলে রাখ তাহলে দুধে জলে মিশে এক হয়ে যায়, আর খাঁটি দুধ খুজে পাওয়া যায় না। কিন্তু দুধকে দইপেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তা হলে ভাসে। তাই নির্জ্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখম লাভ করবে। তার পর সেই মাখম সংসার জলে ফেলে রাখলেও মিশবেনা, ভেসে থাকবে।

"সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয় ? ভাত হয় ? ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার যায়গা হয়, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না, এর নাম বিচার। বুঝেছ ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে বস্তু বিচার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ বস্তু বিচার। এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে ? বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড় মাংস চরবি নাড়ি ভুঁড়ি মল মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে, কেন মন দেয় ? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়।

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়।]

মাষ্টার। ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বাস, তার নাম গুণ গান, বস্তু বিচার, এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

মাষ্টার। কি অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্যে লোকে একঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে ?

গান।—ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে। ইত্যাদি

'ব্যাকুলতা হইলেই অরুণ উদয় হল। তারপর সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন। তিন টান হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান এবং সতীর পতির উপর টান, এই তিন টান যদি কাহারও একসঙ্গে হয়, তাহলে সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে। কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, আর বিষয়ী লোক যেমন বিষয়কে ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা একত্র করলে যতখানি ভালবাসা হয়, ততখানি ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।

"ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছা কেবল মিউ মিউ করে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানে থাকে—কখন হেঁশালে, কখনও মাটির উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে মাকে ডাকে, আর কিছু জানেনা, মা যেখানেই থাকুক্, এ মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত।)

গোস্বামী মহাশয় নিত্যানন্দ-বংশসম্ভূত, তাহাতে রাধাশ্যামের সেবা-নিরত, তাহাতে পণ্ডিত ও রসগ্রাহী। চৈতন্যভাগবতের সংস্করণ করিতে এমন উপযুক্ত লোক আর কোথায় মিলিবে? বস্তুতঃ পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্নের হিতোপদেশের পরে বাঙ্গালা পুস্তকের এমন সুন্দর সংস্করণ আর দেখি নাই।

গ্রন্থখানি সুবৃহৎ। বারখানি পুঁথি মিলাইয়া, পাঠান্তর দেখাইয়া, পাঠ নিরূপণ করিতে হইয়াছে। সংস্কৃতশ্লোকগুলির আকর নির্দ্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা ও অনুবাদ দিতে হইয়াছে। অপ্রচলিত শব্দগুলির অর্থ, গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ও স্থান সকলের ভৌগলিক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লেখা হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা ভাল, বর্ণাশুদ্ধি সামান্য। সুতরাং গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে বলিতে হইবে।

চৈতন্যভাগবত বাঙ্গালা ভাষার আদি মহাকাব্য। যখন চরিতামৃত লেখা হইতেছিল, তখন বৃন্দাবনে ভক্তসমাজে ইহা গীত হইত। তখন ইহার নাম চৈতন্যমঙ্গল। পড়িবার সুবিধার জন্য বা অন্য কারণে কিছুদিন পরে গীতগুলি বাদ দেওয়া হয়। তদবধি ইহার নাম চৈতন্যভাগবত। এখন যে গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গল নামে প্রচারিত হইতেছে, তাহার রচয়িতা লোচন দাস। আজ কাল কেহ কেহ লোচনের নূতন নামকরণ করিয়া ত্রিলোচন বলিতে চাহেন, কিন্তু আমাদের লোচন 'লোচন' নামেই বিখ্যাত হইয়াছেন। এখন আর বৃদ্ধবয়সে নূতন নামকরণের প্রয়োজন নাই। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের কথাও শুনা গিয়াছে।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তিনি নিত্যানন্দের শেষ ভৃত্য। শ্রীচৈতন্যের কথা লিখিতে গিয়া নিত্যানন্দের কথা তাঁহার মনে পড়িত, নিত্যানন্দের কথা লিখিয়াই গ্রন্থ বৃহৎ হইয়া গেল। চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা আর লেখা হইল না, অন্ত্যলীলার বিবরণ জানিতে হইলে চরিতামৃত পড়িতে হইবে।

বৃন্দাবন দাস আকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভসম্ভূত, একজন টোলের পণ্ডিত। এমন শুষ্ক তরুতে এমন অমিয় ফল কোথা হইতে আসিল? গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন "শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রেমের অমিয়-মন্দাকিনী"। কথাটী বর্ণে বর্ণে সত্য। এ অমিয়মন্দাকিনী কঠোর পাষাণে কিরূপে উৎপন্ন হইল? বৈষ্ণব মহাজনগণ তাহার অনেক কারণ দেখাইয়াছেন। কতকগুলি অদ্ভুত রহস্যে বৃন্দাবন দাসের জীবনবৃত্তান্ত পরিপূর্ণ। তখন নিজের হাতে নিজের জীবনচরিত লিখিয়া "জন্মভূমিতে" ছাপিবার জন্য পাঠাইতে লোকে শিখে নাই। দীনাতিদীন বৃন্দাবন দীনতায় আপন ব্রহ্মণ্য গোপন করিয়া "দাস" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কাছে আত্মপরিচয়ের কোন কথা পাওয়া যাইবার আশা ছিল না। ছেঁড়া কাঁথাখানা যাঁহাদের সহ্য হইত না, তাঁহারা আপনার বা আত্মীয় স্বজনের গৌরবসূচক কোন কথা বলিবেন, তাহার আশা কোথায়? বস্তুতঃ কবে জন্ম, কোথায় জন্ম, কবে মৃত্যু, কোথায় মৃত্যু, কাহার পুত্র, বৃন্দাবন সম্বন্ধে একটী কথাও নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই।

কিন্তু তাহাতে কি? চৈতন্যভাগবত বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণবের প্রাণধন, সাহিত্যপিপাসুর অমৃতধারা। ইহা ধর্ম্মের দর্শন, সমাজের ইতিহাস, একটী অপূর্ব্ব চরিত্রের অপূর্ব্ব ইতিহাস। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান কাব্য। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহা গাইয়া ও গাওয়াইয়া, পড়িয়া ও পড়াইয়া অপবর্গ লাভ করিয়াছেন। আমরা ইহার সম্মান করিয়া কৃতার্থ হই। চৈতন্যভাগবত চৈতন্যের ন্যায় বৃন্দাবন দাসেরও জীবনচরিত বটে।

ইতিপূর্ব্বে ভক্তিভাজন শিশির কুমার ঘোষ চৈতন্যভাগবতের একটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিশির বাবুর সংস্করণের সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের সংস্করণের তুলনা করিতে স্বতঃই বাসনা হয়। শিশির বাবুর সংস্করণও সুন্দর। নির্দ্দোষ হইলে, বোধ হয়, গোস্বামী মহাশয়ের সংস্করণের আবশ্যক হইত না। দুঃখের বিষয়, সে সংস্করণ খানিতে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। বোধ হয় শিশির বাবু নিজে দেখিয়া দিতে পারেন নাই। তিনি যাঁহাদের উপর বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা উচিতমত কর্ত্তব্যপালন করেন নাই। আমরা কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া এ কথার সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছি।

৬ পৃষ্ঠা

"শ্রীনারদ গোসাঞি তম্বুরু করি স্কন্ধে" সংস্কারক ভাবিয়াছিলেন নারদ গোসাঞি গান গাহিবার সময় তম্বুরাটা কাঁধে করিয়া ফিরিতেছিলেন। কিন্তু আসল কথা তুম্বুরু নামে আর একটী ঋষি তখন গোসাঞির সঙ্গে দোয়ারকি করিতেছিলেন, তাই বৃন্দাবন লিখিয়াছিলেন।

শ্রীনারদ গোসাঞি তুম্বুরু করি সঙ্গে

৩৫ পৃষ্ঠা।

রাহু-কবল ইন্দু পরকাশ নাম-সিন্ধু
কলি-মর্দ্দন বাঙ্কে বানা

শিশির বাবুর গ্রন্থে আছে "বাঙ্গে বানা"। মর্দ্দনকে 'মর্দ্দল' লিখিয়া,বোধ হয় মাদল বাজিবার অনুমান করা হইয়াছে। সে কথা ঠিক হইলে "বানা" শব্দের অর্থ হয় না।

৩৮ পৃষ্ঠা

দুন্দুভি ডিণ্ডিম মঙ্গল জয়ধ্বনি
গায় মধুর বিমানে।
বেদের অগোচরে আজি ভেটবাবিলম্বে
নাহি আর কো জানে॥

এটী এইরূপ হইবে।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম মঙ্গল জয়ধ্বনি
গায় মধুর রসাল রে
বেদের অগোচর আজু ভেটব
বিলম্বে নাহিক কাজ রে॥

জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত একাদশীর উপবাস করিয়া বিষ্ণুপূজার জন্য নানা নৈবেদ্য আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য শিশু চৈতন্য বায়না ধরিলেন যে, সেই সকল নৈবেদ্য তিনি খাইবেন, বায়না শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্র মহাগোলে পড়িলেন, শিশুকে কতই বুঝাইলেন, শিশুর জিদ আরো বাড়িতে লাগিল। তখন জগন্নাথ বন্ধুদ্বয়কে সে কথা জানাইলেন। তাঁহারা মহা পরিতোষে নৈবেদ্যগুলি বিপ্রশিশুকে উপহার দিলেন। এই কথা বর্ণনা করিয়া বৃন্দাবন লিখিয়াছিলেন।

হেন প্রভু বিপ্রশিশু রূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি দেখে জন্মজন্মের কিঙ্করে॥

জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-জন্মের কিঙ্কর। ত্রেতা ও দ্বাপরে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্করতা করিয়াছিলেন। তাই বৃন্দাবন তাঁহাদিগকে "জন্ম-জন্মের কিঙ্কর" এই মনোজ্ঞ উপাধি দিয়াছেন। শিশির বাবুর সংস্করণে ইহাদিগকে "জগন্নাথের কিঙ্কর" বলা হইয়াছে, জিনিসটা তাই রহিল বটে, কিন্তু সে সুরটুকু হইল না।

৮৬ পৃষ্ঠা

প্রভু দেখি ভক্তমোহ স্বভাবেই হয়
বিনি অনুভবেও দাসের চিত্তে নয়।

"চিত্তে নয়"র স্থলে "চিত্ত-লয়" হইবে

৮৭ পৃষ্ঠা

আত্মা বিনে পুত্র বালক নহে বন্ধুগণ
গৃহ হইতে বাহির হইল ততক্ষণ ॥
অতএব পরমাত্মা সভার কারণে
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে।

প্রথম লাইনটী এইরূপ হইবে।—

আত্মা বিনে পুত্র বা কলত্র বন্ধুগণ

তৃতীয় লাইনটী এইরূপ হইবে।—

অতএব পরমাত্মা-স্বভাব-কারণে।

শিশির বাবুর গ্রন্থে মৌড়েশ্বরকে 'গৌড়েশ্বর' করা হইয়াছে, তীর্থযাত্রা বিবরণে ভৌগলিক নাম অনেকগুলি অশুদ্ধ হইয়াছে।

১৭৯ পৃষ্ঠা

ব্যবহারে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান
অঙ্গে পীত বস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান

এ দুটী লাইন এইরূপ হইবে,—

ব্যবহারযোগ্য বস্ত্র মাত্র পরিধান
অঙ্গে পানিতোলা পীত পটের সমান।

১৯৮ পৃষ্ঠা

সে সকল কিছু না কহিবা কাহা প্রতি
এইরূপ হইবে,—
তাহা পাছে বিপ্র আর কহ কাহা প্রতি

তোমার আমার দেহ ও শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী চৈতন্যের দেহে প্রভেদ কি? বৈষ্ণব দর্শনে বলে তোমার আমার "অপ্রাকৃত দেহ" কিন্তু লক্ষ্মী চৈতন্যের "অপ্রাকৃত দেহ"।

ঈশ্বর বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারি সহিতে
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে।
নিজ প্রাকৃত দেহ থুই পৃথিবীতে
চলিলেন প্রভু পাশে অতি অলক্ষিতে

তৃতীয় লাইনের "প্রাকৃত দেহ" "প্রতিকৃতি দেহ" হইবে।

৬৩৬ পৃষ্ঠার অদ্বৈত 'দ্বৈত' হইবে।

৬৩৭ পৃষ্ঠার "ব্যাখ্যা" "কক্ষা" হইবে। পূর্ব্ব পক্ষ করাকে কক্ষা করা বলে।

৫৬৭ পৃষ্ঠার "লীলাতত্ত্ব" "লীলাতনু" হইবে।

৫৬৮ আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্গের বন্ধনে।

এই পংক্তিটীর কোন অর্থ হয় না। নাট্যশাস্ত্রে নৃত্য করিবার নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। তাই প্রভু বলিতেছেন।

আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্গের বিধানে।

৬১৬ পৃষ্ঠায় একটী হাস্যকর ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। একদিন মুরারি গুপ্ত ভাবাবেশে অনেক ঘৃতান্ন প্রভুকে নিবেদন করিয়াছিলেন। মুরারি যাহা দেন, প্রভু তাহাই খান, অস্বীকার করিতে পারেন না। সে দিন ভাবের আবেশে মুরারি অনেক অধিক অন্ন নিবেদন করিয়াছিলেন; খাইয়া প্রভুর পেটের অসুখ হয়। পেটের অসুখের নাম 'বিষ্টম্ভ'। শিশির বাবুর গ্রন্থে পেটের অসুখকে 'মিষ্টান্ন' করা হইয়াছে।

এইরূপ আরো অনেক ভুল আছে। অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই।

এইখানে আর একটি কথা বলিবার আবশ্যক হইয়াছে। ঈশ্বর পুরী ব্রাহ্মণ কি শূদ্র ছিলেন? এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তথাপি একবার সে কথার পুনরুল্লেখ করিতে হইতেছে। শিশির বাবুর

গ্রন্থে "শূদ্রাধম" শব্দটী আছে। গোস্বামী মহাশয় "ক্ষুদ্রাধম" লিখিয়াছেন। শূদ্রাধম শব্দ প্রকৃত হইলেও কথাটী দীনতার পরিচায়ক, জাতির নহে। অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান বৈষ্ণবী দীনতায় আপনাকে চণ্ডালের অধম বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন সন্ন্যাসী হইত না, ঈশ্বর পুরীকে বারবার "সন্ন্যাসী গোসাঞী" বলা হইয়াছে। সন্ন্যাসী ভিন্ন "ভিক্ষা" গ্রহণে অন্য কাহারও অধিকার নাই। বৃন্দাবন দাস আদি খণ্ডের শেষ ভাগে ঈশ্বরপুরী ও চৈতন্যের, তখন প্রভু অপ্রকট, পার্থক্য দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরপুরী "ভিক্ষা" করিতেছেন, চৈতন্য "ভোজন" করিতেছেন। চরিতামৃতে লেখা আছে যে, ঈশ্বর পুরী শূদ্র গোবিন্দকে শিষ্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাতেই রামানন্দ বিস্মিত হন।

পুরী যদি শূদ্র হইতেন, তাহা হইলে সার্ব্বভৌমের বিস্ময়ের কি কোন কারণ থাকিত?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণ কি শূদ্র ছিলেন, এ সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। তথাপি এ কথাটা উল্লেখ করিবার একটু আবশ্যক হইয়াছে। মোক্ষ মুলারের ন্যায় সাহেবেরা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে কুলীন ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমান করিলে তত দোষ হয় না। তাঁহাদের কাছে মিত্র ও মিশ্র শব্দ দুটী বড় কাছাকাছি। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে বসিয়া কেহ এরূপ ভ্রম করিলে একটু কৌতুক অনুভব হয়। আমার যেন বোধ হয় কোথাও কোথাও একটু চেষ্টা করিয়া এরূপ ভুল করা হইতেছে। একদিকে নিম্নশ্রেণীকে উচ্চতর আসনে বসাইবার চেষ্টা হইতেছে। যুগী এখন যোগী, কৈবর্ত্ত এখন মাহিষ্য, ইত্যাদি। অন্য দিকে ব্রাহ্মণকে উচ্চতর স্থান হইতে টানিয়া নীচে নামাইবারও প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষ সম্পাদক। তিনি উৎসাহী যুবাপুরুষ, বিশ্বকোষ সম্পাদনে বেশ সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন। দেখিলাম, তিনি বঙ্গের জাতি নির্ণয় করিতে একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছেন—নাম দিয়াছেন বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। তাহাতে বলা হইয়াছে, কোন কোন ব্রাহ্মণ বংশ শূদ্র বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কায়স্থ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেন বংশীয় রাজাগণকে কায়স্থ করিতে কত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কায়স্থ রাজা হইয়াছিল প্রমাণ করিতে পারিলে তিনিও রাজবংশ বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন। নগেন্দ্র বাবুও কায়স্থ। এক কলমের খোঁচায় ব্রাহ্মণের স্বজাতীয় হইতে পারিলে ছাড়িবেন কেন? নগেন্দ্র বাবু জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণ খণ্ড লিখিতে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্বকোষের সম্পাদক বলিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতিও লাভ করিয়াছেন। আমি বারান্তরে তাঁহার পুস্তকখানি একটু স্বতন্ত্র ভাবে সমালোচনা করিব, ইচ্ছা করিতেছি। সুতরাং এখানে আর অধিক কথা বলিব না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

"কালনিদ্রা।"

মা, মা, একি গভীর স্বপন,
নাহি সংজ্ঞা নাহি চেতনার লেশ;
একি ঘোর ঘুমে মুদিত নয়ন,
একি ধূলিম্লান এলো থেলো বেশ!

মা, মা, ওমা হের চক্ষু চেয়ে,
কত বল মাগো ঘুমাইবে আর ;
নবীন আলোকে ফেলিয়াছে ছেয়ে,
আকাশ অবনী নদী পারাবার।

হের চারিদিকে জেগেছে ধরণী,
বিহঙ্গ গাহিছে সুললিত গান ;
ফুটেছে কুসুম অনন্ত বরণী,
তুমি মাগো শুধু ঘুমেতে অজ্ঞান !

বিশ্ব প্রকৃতির জাগরণ মাঝে,
তোমার কি মাতা, সাজে এ স্বপন ?
রত যে যাহার আপনার কাযে,
জাগো মা জননি, খোল মা নয়ন।

নব জ্ঞান, নব উন্নতি আলোকে,
নূতন বিজ্ঞান নব ধর্ম্ম বলে,
জাগিয়াছে ধরা হের চারিদিকে,
তুমি কেন এই আঁধারের তলে ?

ওই দেখ মাতা, দূর সিন্ধুপারে
কিবা শোভা আজি-কিবা জাগরণ ;
স্নাত নব জ্ঞান-আলোকের ধারে
নর নারী কিবা প্রসন্ন বদন !

কীর্ত্তি-রশ্মি কিবা জ্বলিছে ললাটে,
কিবা নেত্র মাঝে মহিমা রঞ্জিত ;
স্বরগের শোভা হাটে মাঠে বাটে,
কুবেরের ধন ভাণ্ডারে সঞ্চিত।

অনল অনিল সিন্ধু সৌদামিনী,
আজি বাঁধা সেথা তোরণ দুয়ারে ;
রত্ন মণিমালা আজি এ মেদিনী,
ঢালিছে চরণে প্রীতি উপহারে।

অনন্ত বিমানে উঠে জয়গান,
নসাগরা ধরা কাঁপে পদভরে ;
ভূধরে সাগরে উড়িছে নিশান,
সুর নরে জয় গায় সমস্বরে।

হের গৃহদ্বারে 'জাপান' বালিকা
আজি রাজরাণী নিজ মহিমায় ;
দীপিছে ললাটে সৌভাগ্যের টীকা,
কত উচ্চাসনে জগত-সভায় !

ক্ষুদ্র 'শ্যাম' সেও নিদ্রা পরিহরি,
জেগেছে আপন সাধিতে কল্যাণ ;
কঠোর কর্ত্তব্য আজি শিরে ধরি,
উন্নতির তরে সঁপেছে পরাণ।

শুধু তুই মাগো স্বপনের ঘোরে,
থাকিবি পড়িয়া হীন অচেতন ?
সুসভ্য জগত ঘৃণা ভরে তোরে
করিছে বিদ্রূপ, কত নির্য্যাতন।

অয়ি সভ্যতার আদি লীলাভূমি,
কেন মা তোমার এ কলঙ্ক আজ ?
অসভ্য বর্ব্বর নীচ হেয় তুমি
নাহি তব স্থান জগতের মাঝ !!

তোমার রতনে রত্ন-প্রসবিনি,
কত লোকে আজি হল ধনবান ;
কাঙ্গালিনী তুমি লক্ষ্মী স্বরূপিণী,
অন্নবিনে তোর মরে মা সন্তান !

তোমার সভ্যতা তব জ্ঞান ল'য়ে,
কত জাতি আজি সাধিল উন্নতি ;
তুমি জগতের পদানত হ'য়ে,
ভিক্ষা ভাণ্ড করে জানাও দুর্গতি।

আজি পরদ্বারে কি পাবি মা বল্ ?
নিজ দোষে তুই মা গো ধনহীন ;
আজি আঁখি বারি মা তোর সম্বল,
শত লাঞ্ছনায় কেটে যায় দিন !

কি ছিল না তোর আপনার ঘরে ?
তোর সম কার ছিল এ ধরায় ?
আজি শত ধারে তোর আঁখি ঝরে ;
মা গো আমাদের বুক ফেটে যায়।

এখনো তো সব যায়নি ফুরায়ে,
এখনো জাগিয়ে হও সচেতন ;
নতুবা বিদেশী নেবে মা কুড়ায়ে,
তোর অঙ্গনের অমূল্য রতন।

—আছে হিমালয় রতন মণ্ডিত,
আছে ভাগিরথী জীবনদায়িনী ;
আছে কোমলতা ভূমিতে সঞ্চিত,
আজিও মা বঙ্গ শস্য-শালিনী।

ওই ভাগ্যদেবী তোমার আকাশে ;
এখনো ছড়ায় কনক কিরণ ;
আর যদি মোহে ছাড় অবকাশে,
চির অন্ধকার—অদৃষ্ট লিখন !

জেগেছে সকলে নবজ্ঞান বলে,
মেলেছে নূতন আলোকে নয়ন,
আর পুরাতনে ধরি বক্ষঃস্থলে
হারাইওনা মাতঃ, কল্যাণ আপন।

কুসংস্কার রূপ উন্নতি জঞ্জাল
ভ্রান্ত লোকাচার, মোহের ছলনা,
তাই নিয়ে মাগো রবে চিরকাল ?
কবে আর তবে জাগিবে বল না ?

আমরা তোমার দীন হীন ছেলে
ডাকি সকাতরে উঠ মা জননি ;
থেকোনা ধূলায় আর অঙ্গ ঢেলে,
পরিহাস করে নিখিল ভুবনী।

কিছুতেই নাহি চেতনার লেশ।
মা ! মা ! একি গভীর স্বপন !
একি কাল ঘুমে ছেয়েছে নয়ন !
এ নিদ্রার হয়ে ! নাহি বুঝি শেষ !!

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

পৌরাণিক পূজা।

আর্য্য অনার্য্য, মনুষ্য মাত্রেই মুখে ধর্ম্ম ইষ্টদেবতা, মঙ্গলকারিণী মঙ্গলকারী মাতা পিতা বলিয়া স্বীকার করেন এবং আপনার ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা শ্রেষ্ঠ ও অপরের নিকৃষ্ট জ্ঞানে হেয় করিয়া থাকেন। ফলে সকলেই পরস্পর হিংসা দ্বেষ বশতঃ কষ্টভোগ করিতেছেন। অতএব ধর্ম্মাবলম্বী নেতা নীত, গুরু শিষ্য প্রভৃতি সকলেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়,সামাজিক কল্পিত স্বার্থ ও ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতার ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত নাম শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে বিচার পূর্ব্বক সারভাগ গ্রহণ কর। যিনি যথার্থ ধর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা মাতা পিতা গুরু আত্মা, তিনিই সারভাব বা সত্য। তাঁহাকে চিনিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর ও শরণার্থী হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন কর, যাহাতে তাঁহার প্রসাদে জগতে অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হয় এবং জীব মাত্রেই পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি লাভ করে। বিনা বিচারে বস্তু বোধ হয় না। বস্তু বোধ বিনা জ্ঞান নাই। বিনা জ্ঞানে শান্তি নাই। যাহার বস্তু বোধ আছে, তাহার জ্ঞান আছে। যাহার জ্ঞান আছে, তাহার শান্তি আছে।

প্রথমতঃ বুঝিয়া দেখ, তোমরা যে ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা, জয়া, বিজয়া, দুর্গা, কালী,

স্বরস্বতী, গায়ত্রী সাবিত্রী মাতা ঈশ্বর গড আল্লা ও খোদা পরমাত্মা ব্রহ্মা ভগবান প্রভৃতি অসংখ্যনাম কল্পনা করিয়া পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশতঃ অশান্তি ভোগ করিতেছ, সে কি একই ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতার নাম? না বহু ইষ্টদেবতার বহু নাম।

শাস্ত্রে ও লোকে দুইটী শব্দ সংস্কার প্রচলিত আছে—এক মিথ্যা, এক সত্য। তোমাদের যে ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা, দুর্গামাতা ঈশ্বর আল্লাহ প্রভৃতি মিথ্যা না সত্য, তাঁহারা কোথায় আছেন, কি বস্তু? যদি বল মিথ্যা, তবে সকলেরই ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা মিথ্যা। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা দৃশ্যেও নাই, অদৃশ্যেও নাই। মিথ্যা ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। যদি সেই মিথ্যা ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা হইতে জগৎ ও জগতের অন্তর্পাতী তোমরা হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরাও মিথ্যা। তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা। এবং সকলেরই একই ধর্ম্ম মিথ্যা হওয়ায় দ্বেষ হিংসা প্রভৃতির স্থল থাকে না। যদি বল বা বোধ কর যে, তোমাদের ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা সত্য, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। সত্য কখনও মিথ্যা হয় না। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য স্বতঃপ্রকাশ, সত্যের সৃষ্টি স্থিতি নাশ নাই। সত্য সমভাবে দৃশ্যে অদৃশ্যে বিরাজমান। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিতেছে। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা সত্য হইতে হইয়াছে, সত্যের রূপ মাত্র। সত্য আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে সাকার ও সাকার হইতে নিরাকার হন, অর্থাৎ সত্য স্বয়ং কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নানা নাম রূপক জগৎ ইত্যাকারে প্রকাশমান হইতেছেন, অথবা সৃষ্টি করিতেছেন। এবং পুনশ্চ স্থূল নাম রূপ সূক্ষ্মে লয় করিয়া সেই সূক্ষ্ম আবার কারণে স্থিত হইতেছেন।

যখন সত্য জগৎরূপে প্রকাশমান হন, তখন নানা নাম রূপ বোধ হয়, যাহাকে সৃষ্টি বলে। যখন নানা নাম রূপ সঙ্কুচিত করিয়া তিনি কারণে স্থিত হন, তখন তাঁহাকেই প্রলয় বলে। যেমন জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় তুমি নানা শক্তি, নানা নামরূপে চেতন হইয়া সমস্ত কার্য্য কর—ইহা সৃষ্টি; আর যখন জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় থাক, তাহাকে প্রলয়, জ্ঞানাতীত, নির্গুণ ভাব বলে। পুনশ্চ জাগ্রত বা প্রকাশাবস্থায় নানা শক্তি সহযোগে নানা কার্য্য করিয়া থাক। জগৎ বা তোমরা সত্য হইতে হইয়াছ, তোমরা সত্য। তোমাদের জ্ঞান বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই সত্য ও যাঁহাকে ধর্ম্ম কর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ, তিনিও সত্য। এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সেই একই সত্য কারণ সূক্ষ্ম স্ত্রী পুরুষ নাম রূপ লইয়া পূর্ণসর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ। তিনি অনন্ত শক্তি দ্বারা অনন্ত প্রকারের কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। এই একই পূর্ণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে দুইটী শব্দ সংস্কার আছে। এক, অপ্রকাশ নিরাকার নির্গুণ জ্ঞানাতীত, অপর, প্রকাশ সাকার সগুণ দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর, জ্ঞানময়। নিরাকার জ্ঞানাতীত ভাবে ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই। যেমন তোমাদের সুষুপ্তি অবস্থায়।

সাকার সগুণ জ্ঞানময় ভাবে তিনি অনন্ত শক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কার্য্য করিতেছেন। নিরাকার ও সাকার ভাবে একই বিরাট ব্রহ্ম পূর্ণরূপে বিরাজমান।

এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম বা বিষ্ণু ভগবানের বেদাদি শাস্ত্রে অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপ গ্রহ দেবতা বা শক্তির বর্ণনা আছে। বিরাট ব্রহ্মের জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। এই বিরাট ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গ্রহ বা শক্তি বা মায়া বা দেবদেবী প্রকৃতি পুরুষ, যুগল ওঁকার রূপ, সাকার নিরাকার ঈশ্বর পরমেশ্বর, গড আল্লাহ খোদা, ধর্ম্ম ইষ্টদেবতা প্রভৃতি নানা নাম কথিত আছে। ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা, মঙ্গলকারিণী বা মঙ্গলকারী হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই, ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখ, যখন যাহা কিছু আছে বা যিনি আছেন, তাঁহারই এক কল্পিত নাম বিরাট ব্রহ্ম। তখন তিনি ব্যতীত তোমাদের ধর্ম্ম ইষ্টদেবতা দেব দেবী কোথায় থাকিবেন ও কি হইবেন। যদি থাকেন ত ইহারই অন্তর্গত আছেন।

এই মঙ্গলকারী এক অক্ষর ওঁকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপ মাতাপিতা গুরু আত্মা হইতে জীব মাত্রেরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি, পালন ও লয় হইতেছে। ইহার চরণ বা শক্তি পৃথিবী হইতে জীবের হাড় মাংস গঠন ও অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীবের পালন হইতেছে। নাড়ীরূপী শক্তি বা দেবতা জল হইতে বৃষ্টি হইয়া অন্নাদি উৎপন্ন হইতেছে ও জীব স্নান ও পান করিতেছেন এবং এই জলই জীবের রক্ত, রস নাড়ী। মুখ্য শক্তি বা দেবতা অগ্নি হইতে জীবের ক্ষুধা পিপাসার উদয় হইতেছে এবং পান আহার পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণ হইতেছে। প্রাণ শক্তি বা দেবতা বায়ু হইতে জীবের নাশিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। তাঁহার মস্তক আকাশ শক্তি বা দেবতা হইতে জীব কর্ণের ছিদ্রে শব্দ গ্রহণ করিতেছে। তাঁহার মনোরূপী চন্দ্রমা জ্যোতিঃ—স্বরূপ শক্তি বা দেবতা জীবের মনোরূপে অবিরত সঙ্কল্প বিকল্প উঠাইতেছেন "ইহা আমার, উহা তোমার" ইত্যাদিরূপ বোধ জন্মাইতেছেন। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্মের শক্তি বা জ্ঞান নেত্র সূর্য্যনারায়ণ জীবের মস্তকে চেতনরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রকাশে জীব মাত্রেই চেতন হইয়া নেত্র দ্বারে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও সত্যাসত্যের বিচার করিতেছেন। যখন বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ তেজোময় জ্ঞান জ্যোতিঃ মস্তক ও নেত্র হইতে সঙ্কোচ করেন, তখন জীবের জ্ঞানাতীত সুষুপ্তি বা নিদ্রার অবস্থা ঘটে। যে জীবকে তিনি শোয়াইয়া রাখেন, সে জীব শুইয়া থাকে। যাহাকে জাগাইয়া রাখেন, সে জীব জাগিয়া জগতের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করে। এইরূপে বিচার করিলে দেখিবে যে, তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গরূপ বা শক্তি হইতে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি, যাহার দ্বারা তোমরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ। ইহাঁর কোন একটী অঙ্গ বা শক্তির অভাব বা কার্য্যে বিরতি ঘটিলে তোমরা মুহূর্ত্ত কাল থাকিতে বা নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিতে

পারিবে না। পৃথিবীর অভাবে এক ত শরীরই উৎপন্ন হইতে পারে না, অধিকন্তু অন্নাভাবে শরীর নষ্ট হয়। সময় মত এক গেলাস জল না পাইলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়। অগ্নিমান্দ্য হইলে পরিপাক শক্তি নষ্ট হয় ও শরীর শীতল ও নিস্তেজ হয়। তখন সেক আদির দ্বারা চিকিৎসক অগ্নির আধিক্য ঘটাইয়া জীবন রক্ষার চেষ্টা করেন। দেহস্থ অগ্নির নির্ব্বাণে জীবের মৃত্যু হয়। বহির্মুখী অগ্নির দ্বারা রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জীবের ব্যবহার কার্য্য চলে। বায়ুর অভাবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। আকাশের অভাবে শ্রবণ শক্তির বিনাশ। চন্দ্রমা বা মনের অভাবে উন্মাদ ও সূর্য্যনারায়ণের তেজ সঙ্কুচিত হইলে জীবের জ্ঞান লোপ হয়। এইরূপ বিচার করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, তোমাদের উৎপত্তি স্থিতি গতির একমাত্র নিদান এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম। এই যে মাতা পিতা হইতে তোমরা হইয়াছ, তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি না করিয়া, যে নাই এইরূপ কল্পিত মাতা পিতার উদ্দেশ্যে নিষ্ফল শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি করা কতদূর লজ্জা, দুঃখ ও ঘৃণার বিষয়! সমস্ত অসৎ ধারণা ও সংশয় পরিত্যাগ করিয়া চাহিয়া দেখ, এই মঙ্গলকারী এক অক্ষর ওঁকার ব্রহ্ম নিরাকার সাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিশেষ, পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ ধর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। যদি তোমরা ইহাঁকে বিশ্বাস না করিয়া অপর কাহাকেও বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তিনি কোথায়, কি বস্তু—আমাকে বুঝাইয়া দেখাইয়া দাও, আমি তোমাদের নিকট জানিতে চাহি।

আরও বুঝিয়া দেখ, যদি প্রকাশমান মাতা পিতা গুরু আত্মা সাকারকে পরিত্যাগ করিয়া, অপ্রকাশ গুরু মাতা পিতা আত্মা নিরাকারকে বা নিরাকারকে ত্যাগ করিয়া সাকারকে পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান স্বীকার কর, তাহা হইলে দুইয়ের মধ্যে কেহই পূর্ণ বা সর্ব্বশক্তিমান হইবেন না। উভয়েই একদেশী ব্যষ্টি অঙ্গহীন হইবেন। কি সাকারবাদী কি নিরাকারবাদী, কাহারই পূর্ণরূপে মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতার উপাসনা হইতেছে না। অপ্রকাশ নিরাকারকে লইয়া প্রকাশমান সাকার ব্রহ্ম পূর্ণ এবং সাকার প্রকাশমানকে লইয়া অপ্রকাশ নিরাকার ব্রহ্ম পূর্ণ। মূল, শাখা, প্রশাখা, পাতা ফল ফুল তিক্ত মিষ্ট নামরূপ গুণ প্রভৃতি লইয়া বৃক্ষ পূর্ণ। এই সকল নাম রূপ গুণের কোন একটীকে ত্যাগ করিলে বৃক্ষের পূর্ণত্ব খণ্ডন হইয়া অঙ্গহানি হয়। বৃক্ষরূপী নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া পূর্ণ। এই পূর্ণভাব জানা ও জানিয়া তাহাতে স্থিতি লাভ করাকে জয়া বিজয়া বলে। অর্থাৎ দুর্গামাতা বা বিরাট পরব্রহ্মের এই দুইটী শক্তির নাম জয়া ও বিজয়া।

পরব্রহ্মের শক্তি বা মায়া বা জয়া বিজয়া, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মঙ্গলকারী ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বপ্রকারের জয় বিজয়কারিণী। জয়া চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। জীব বা ব্রহ্ম অর্থাৎ মন জয় হইলে সমস্ত জয়। বিজয়া সূর্য্যনারায়ণ। নিরাকার সাকার জীব ঈশ্বর অভেদে এক বোধ হওয়াকে বিজয়ার দিন জানিবে। বিজয়াতে কোলাকুলী করিতে হয়, ইহার

অর্থ এই যে, অভেদ জ্ঞান হইলে সমস্ত জীব চরাচরকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ বোধ হয়। তখন সকলে মিলিয়া পরস্পরের উপকার বা হিত সাধন করেন। বিজয়াতে নীলকণ্ঠ পক্ষী দর্শনের ভাব এই যে, মনকে লইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় জয় হইলে, আকাশময় সর্ব্বত্র চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ এক অখণ্ডভাবে দৃষ্ট হন। তাঁহার কণ্ঠে নীল আকাশ, অর্থাৎ জীব ও শিব বা ব্রহ্মকে অভিন্ন একভাবে দর্শন করার নাম নীলকণ্ঠ দর্শন। চরাচর জগৎরূপী বিষকে পান করিয়া অর্থাৎ আপনার অন্তর্গত করিয়া শিব নীলকণ্ঠরূপে বিরাজমান।

ষষ্ঠি সপ্তমী নবমী দশমিতে দুর্গা মাতার পূজা হয়। পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা জ্যোতিকে লইয়া ষষ্ঠির পূজা। ইহার সহিত সূর্য্যনারায়ণকে লইয়া সপ্তমীর এবং জীব বা তারাগণকে লইয়া অষ্টমীরপূজা। জীব দেহের নব দ্বারকে নবমী পূজা ও দশ ইন্দ্রিয়ের নাম দশমী। দশ ইন্দ্রিয়কে লইয়া দুর্গা মাতা অর্থাৎ বিরাট পরব্রহ্ম দশভুজা হইয়া স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। ইনি দশ ইন্দ্রিয় ভুজ দ্বারা চরাচর চেতন অচেতন ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করিতেছেন। জীব যে এই দশ ইন্দ্রিয়কে জয় করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও আপনার সহিত জগতকে যে ব্রহ্মময় দেখেন, তাহার নাম জয়া বিজয়া ও দুর্গা মাতার প্রকৃত পূজা জানিবে। এই বিরাট ব্রহ্মরূপিণী দুর্গা মাতাকে কামধেনু বা অন্নপূর্ণা বলে। ইনি স্বয়ং অক্ষয় হইয়া জগতের সমস্ত অভাব মোচন করেন। যতদিন তুমি আছ, ততদিন তোমার ইন্দ্রিয়াদির শক্তি কোন প্রকারে শেষ হইবে না। যত প্রয়োজন, তত পাইবে। প্রত্যক্ষ দেখ, যদি এক বাক্ শক্তি বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি দিবা রাত্র জ্ঞানের কথা কহ বা শাস্ত্র রচনা কর, তাহা হইলেও বাক্য ফুরাইয়া যাইবে না। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি বা দুর্গা মাতার দশ ভুজের সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবে।

ইন্দ্রিয়াদি লইয়া নিরাকার সাকার জগৎ চরাবরকে সমদৃষ্টিতে ব্রহ্মময় আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ, এই ভাবে দেখিলে বা ব্যবহার করিলে, তবে বিজয়ার পূজা সমাপ্ত হয়; নচেৎ কখনও কোন মতে দুর্গা মাতার প্রকৃত পূজা হয় না। এই মঙ্গলকারিণী মাতা পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ও তারাগণ এই অষ্টরূপে অষ্টাক্ষরী পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহাঁকে ব্রহ্মময়ী পূর্ণভাবে দর্শন ও সম্মান না করার নাম রাম লক্ষ্মণ সীতার বনবাস। লক্ষ্মণ অর্থে জ্ঞান। যাহাঁর সমদৃষ্টিরূপ জ্ঞান আছে, তাঁহার নাম লক্ষ্মণ। জ্ঞানের অভাবে জীবের পক্ষে বনবাস। রাম অর্থে যিনি সর্ব্বত্র রমণ করিতেছেন, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা বা ভগবান। সীতা অর্থে সতী সাবিত্রী, জগৎ জননী, সৃষ্টি পালন-সংহারকারিণী ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাশক্তি। ইহাঁকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক মায়া জানিয়া ত্যাগ করিবার নাম সীতাহরণ। সমদৃষ্টি বা জ্ঞান হইলে জীব দেখেন যে, পরব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের শক্তি একই, পৃথক নহে। এইরূপ সমভাবে সম্যক দর্শনের নাম সমস্ত দুর্বৃত্তির সহিত অহঙ্কার বারণের সদলে মৃত্যু ও সতী সীতার উদ্ধার। পরব্রহ্ম হইতে শক্তিকে পৃথক জ্ঞান করিয়া জগতে কষ্টের সীমা নাই। উভয়কে অভিন্ন একইভাবে দেখিলে সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া জগৎ মঙ্গলময় হয়। ইহা ধ্রুবসত্য জানিবে। যখন এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ বা

কিছু নাই,তখন সত্য ব্যতীত মায়া কি বস্তু? ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে একই সত্য ভাসিতেছেন। অজ্ঞান ব্যক্তি দেখিতেছেন মায়া, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই দৃষ্টি হয় না।

এই মঙ্গলকারিণী বা মঙ্গলকারী একাক্ষর ওঁকার বিরাট ভগবান জগতের মাতা পিতা চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রীরূপে বিস্তার হইয়াও সর্ব্বকালে এক অক্ষর পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই ব্রহ্মেরই একটী কল্পিত নাম গায়ত্রী। পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই চারি অন্তঃকরণ ও সত্ত্ব রজস্তম এই তিন গুণকে লইয়া চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী। ভূর্ভূবস্বঃ ব্যাহৃতির অর্থ যে, জ্যোতিরূপ একই বিরাট পুরুষ ওঁকার স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন ব্যাপিয়া স্বয়ং নানারূপে বিরাজমান। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ইত্যাদি মন্ত্র তাঁহারই নাম, উপাসনা ও প্রার্থনা। ওঁ ভুঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ; ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং এই সপ্ত মহাব্যাহৃতির অর্থ পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ—এই সাতটী।

পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক এই এক অক্ষর ব্রহ্মগায়ত্রী অর্থাৎ বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপকে উপাসনা ও জগতের হিতানুষ্ঠান রূপ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে বিজয় লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইদানীং গুরু বলিয়া অভিমানী সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ সর্ব্বমঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপকে মায়া বলিয়া নিজে ত্যাগ করিতেছেন ও অপরকে ত্যাগ করাইতেছেন। ইহার ফলে নিজে পুড়িতেছেন ও অপরকে পুড়াইতেছেন। মুখে সকলেই মায়া ত্যাগ করিতে বলিতে পারেন। কিন্তু ত্যাগ বা মায়া কাহার নাম,সে বিষয়ে বিচার নাই। এজন্য মায়া ত্যাগ করিবার চেষ্টা একটা সাহঙ্কার আস্ফালনে দাঁড়াইয়াছে। এবোধ নাই যে, যাঁহাকে মায়া বলিয়া ত্যাগ করিবার চেষ্টা,মায়া ত্যাগ করাইবার ক্ষমতা কেবল তাঁহারই আছে। মায়া ত্যাগের যথার্থ ভাব কি? ভিন্ন ভিন্ন নানা নামরূপে প্রকাশমান জীব বা জগৎ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এইরূপ ধারণার নাম মায়া। ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাষা সত্ত্বেও ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু, জীব বা জগৎ নাই, সকলই ব্রহ্মময়, এইরূপ দৃষ্টির নাম মায়াত্যাগ। যথার্থতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। তিনিই নামরূপ জগৎ বলিয়া অনুভূত হইতেছেন। শাস্ত্রে যে বলে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, তাহার প্রকৃত ভাব এই;—জগৎ নাম রূপ ভিন্ন ভিন্ন যে ভাবনা, তাহা মিথ্যা, ব্রহ্মই বৈচিত্র্যময় জগৎ বলিয়া গৃহীত হইতেছেন। জ্ঞানীর পক্ষে জগৎময় ব্রহ্ম ও অজ্ঞের পক্ষে জগৎ বা মায়া প্রতীয়মান হইতেছে।

দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে, মেঘ, বরফ, ফেন, বুদবুদ, তরঙ্গাদি মিথ্যা, জল সত্য। মেঘ বরফ ইত্যাদি যখন গলিয়া জলে মিশাইয়া যায়, তখনও তাহা জল এবং যখন ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে প্রকাশমান, তখনও তাহা জল। জ্ঞানী বরফ মেঘ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও জলই দেখিবেন, অজ্ঞ মেঘ বরফ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া দেখিবেন। জলরূপী নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ জগৎ বা জীব ভাবে ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে

প্রকাশমান হইয়াও তিনি নির্ব্বিশেষ সর্ব্বব্যাপী অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন—এইরূপ অনুভব হওয়াকে জীবের মায়া ত্যাগ বলে। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সহজে মায়া ত্যাগ হয় ও মায়া ত্যাগের যথার্থ ভাব বুঝা যায়। ব্রহ্মাণ্ডের বেদ বেদান্ত উপনিষৎ বাইবেল কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র পড়িলেও পরমাত্মার জ্যোতিঃ স্বরূপের নিকট শরণ লইয়া ক্ষমা ভিক্ষা না করিলে এবং জগতের হিতানুষ্ঠানরূপ তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে বিরত থাকিলে, কখনই মায়া ত্যাগ বা সে ত্যাগের ভাব বোধ হইবে না—কখনই কোন প্রকারে শান্তিলাভ ঘটিবে না। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

অতএব মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, কল্পিত সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, ধীর ও নম্র ভাবে যিনি মঙ্গলকারী যথার্থতঃ আছেন, সেই নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর হও। তিনি মঙ্গলময়, সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। জীব মাত্রকে সমভাবে পালন করা, প্রীতি পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ও সর্ব্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার রাখা, ইহাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। আলস্য ছাড়িয়া তীক্ষ্ণভাবে ইহার প্রিয় কার্য্য সাধন ও সর্ব্বপ্রকারে হিতানুষ্ঠানে যত্নশীল হও, ইনি দয়া করিয়া জীব মাত্রকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন, ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী।

মনোহরপুকুর, ঢাকুরিয়া পোঃ, কলিকাতা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

তরল রজত ধারে দুটী নির্ঝরিণী
বাহিরিল হেসে খেলে প্রফুল্ল প্রভাতে;
শৈলপথে চলে দুঁহে দোঁহার সঙ্গিনী,
অনুরাগে একসাথে ধরি হাতে হাতে।
নিজ হাতে বনদেবী বুকে দুজনার
পরাইয়া দেন শুভ্রমালা তিলকার।
লুকাচুরী বনচ্ছায়ে, কিম্বা ছুটাছুটি,
কখনো উপল তলে কোঁদল ক্রন্দন,
কিম্বা রবি করে কভু হেসে কুটি কুটি,
কখনো মিলনে হয় সুখ-আলিঙ্গন।
ঐ যায় নির্ঝরিণী ছুটে কলকলে;
প্রভাত জীবনে সুখ এমনি উছলে।
ছাড়িল পর্ব্বত গৃহ—বাড়িল যৌবন—
নামিল দুজনে ধূলাময় ধরাতলে;
দুজনা বিভিন্ন পথে করিল গমন।
আপনা তরঙ্গ ভঙ্গে আপনি উছলে।
আপনি বাসক-সজ্জা যখন রমণী,
ভুলে যায় বাল্যলীলা বাল্যের সঙ্গিনী।
নবরাজ্য, নবদেশ, নব শোভা কত;
নিত্য নিত্য কর্ণে বাজে নব প্রেম ধ্বনি।
বাসনা-তরঙ্গ হৃদে খেলে অবিরত;
আপনা সম্ভোগ-সুখে বিভোল আপনি।
বাড়ে দিন দূর পথে; ভাবে মনে মনে:—
"যায়রে যৌবন যায়, রোধিব কেমনে?"
"একেলা সুদীর্ঘ পথ কেমনে কাটাই?
"কোথা আমি,কোথা সখী,আজি পথহারা;
"কার তরে, একাকিনী কোথা লয়ে যাই
"এত যত্নে কাদামাখা বাসনার ধারা?"
শতেক যোজন দূরে আজি দুইজন,
পথহারা, ডেকে সারা, করিছে রোদন।
দূরে দূরে কর্ম্মক্ষেত্রে এমনি কি হারে
কাটাই যৌবন মোরা? বসি নিরজনে
পঙ্কিল জীবন-ধারা ধূলার সংসারে?
স্মরি বাল্যসুখ, যাপি জীবন রোদনে?
যে যার নির্জ্জন পথে বহিয়া জীবন
একাকী সাগরে দূরে করিব অর্পণ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

একা।

মোরে, কেহ ভালবাসিল না।
যার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া
আঁধার হইল আঁখি,

সেও, ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া
চলে যায় আঁখি ঢাকি।
কেহ বুঝে না আমার বেদনা;
মোরে কেহ কভু ভালবাসে না।

২

আমি, জানি কি তখন এত?—
এ বিশ্ব মাঝারে সকলি সুন্দর
সকলি সৌরভময়,
কেন, মানুষই কেবল এতই প্রখর,
এতই নিদয় হয়!
হায়, তাপিতের ছায়া সম সেত
অনায়াসে হইতে পারিত।

৩

যা'রে বেঁধেছিনু বুকে বুকে;
য'ার আঁখি জল নিজে মুছা'য়েছি;
ভগ্ন হৃদয় য'ার
যতনে সোহাগে যুড়িয়া দিয়াছি,
বয়েছি দুখের ভার;
হায়, নিজ হাতে যার শুখান মুখে
দিয়াছি গ্রাস; সেওত আমাকে—
কেন, সেওত আমাকে দেখে,
দূরে চলে যায় ভ্রুকুটি করিয়া;
সেওত আমারে বাম;
কাণে হাত দিয়া উঠে যে জ্বলিয়া
শুনিলে আমার নাম।
হায়, সে কথা কহিব কাহাকে?
শুধু মরমে সিহরি চমকে।

৫

হায়, আমার নিশ্বাসে বায়ু
তপ্ত হইয়া উঠিয়া ছুটিয়া
সরি যায় সেথা হ'তে;
আমার চলনে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
চাহে, মেদিনী সরিয়া যেতে।
বিধি, কত দিলা মোরে আয়ু?
কত দিলা, অস্থি শোণিত স্নায়ু?

৬

এই, জনতা পূর্ণ ধরা,
আমি যেথা যাই নীরবে সবাই
সরিয়া যায় যে কোথা;
শুনেনা আমারে, কাহারে শুনাই
মর্ম্ম বেদনা, ব্যথা।
আমার পরশে শুখায় মুকুল,
শুখায় সাগর, ভাঙ্গে দুই কূল,
আমি কহিব কা'রে সে কথা।
এই জনতা পূর্ণ ধরা;
আমি পড়িয়া রয়েছি একা একজন,
অর্দ্ধ জীয়ন্ত-মরা।
বিধি, কত দিলা মোরে আয়ু
হায়, কত দিলা মোরে অস্থি মাংস স্নায়ু?

শ্রীশশধর রায়।

প্রার্থনা।

গিয়াছে প্রভাত, গিয়াছে মধ্যাহ্ন,
সন্ধ্যাও নিকটে খাড়া,
ভাবি তাই মনে সাঁজ ব'য়ে গেলে
কোথা রবে পুত্র দারা!
বেলা নাই ভে'বে সুদূর হইতে
দৌড়িয়া আলয়ে আসি,
জীবনের বেলা অবসান হ'লে
কোথা রবে পুরবাসী!
আমার আমার ধূলি কণা হ'তে
সুবর্ণ কণারে কই,
একবার মনে ভাবিয়া দেখিনা
আমার আমিও নই।
অতিথি সকলে জীব দলে দলে
সংসারে আসিয়া হয়,
গিয়াছে 'যোগেশ' গিয়াছে 'রমেশ'
'মহেশ'ও অমর নয়।
কেহ যায় আগে কেহ যায় সাথে
কেহ পাছে পাছে ছুটে,
সে আনন্দ ধামে যাবার বেলায়
'না' রব মুখে না ফুটে!
যাওয়া ও আসার শুধু অধিকার
সংসারে জীবের আছে,
অতিথিশালার আসবাব হেরে
কেবল আনন্দে নাচে?
হায় ভগবান এমন অজ্ঞান
জীবেরে করিও দয়া,
জীবনের ব্রত হ'লে উদ্‌যাপিত
দিওহে চরণ ছায়া।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৺ বনলতা দেবী।*

বনলতা বনদেবি! কোথা গেলে চলে
না হইতে জীবনের স্বর্ণসুপ্রভাত।
নিশীথে ফুলের সনে খেলে, খেলে, খেলে,
শ্রান্ত দেহে ঘুমে প'ল হেম পারিজাত।
নব ঊষা কনকের স্নিগ্ধ সমীরণ
না লাগিতে রবিতাপ শরীরে তাহার,
পাপ, তাপে দেহ ক্লিষ্ট না হইতে ক্ষীণ,
না হতে জীবন বেলা গভীর আঁধার,
লয়ে গেল তারে বুঝি দেবতার দেশে
নবোদিত অরুণের সে তরুণ আভা
উজ্জ্বল হইবে আরো দেবের পরশে
জাগিবে নরের মনে সে বিমল প্রভা।
কে আজি সাধিবে তার কর্ত্তব্য সরল,
বঙ্গ অন্তঃপুর মাঝে ঘুরে ঘুরে ঘুরে,
বসন্তে কোকিল কণ্ঠ নীরব নিশ্চল
হেমন্ত শিশির সনে সে গিয়াছে ঝরে।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী সেন গুপ্তা।

সিন্ধু।

অবিরত তব বুকে,
বলকি তরঙ্গ উঠে,
কিসের লহরী ছুটে,
বিপুল গর্জ্জনে কারে ডাক শত মুখে?

নিস্তব্ধ দুইতীর,
স্বরগের গীতিলয়ে,
যেন হেথা যায় ব'য়ে
বসন্ত মলয় ঢালি শান্তির মদির।

যেন দেব বালাগণ,
বসি হেথা সারা বেলা,
খেলিছে প্রেমের খেলা,
বিশাল সৌন্দর্য্যে বাঁধি মানবের মন।

যেন সুনীল গগন,
ওপূত সৌন্দর্য্যে মাতি,
চাহিতেছে দিবা রাতি,
সখ্য ভাবে করিবারে প্রেম আলিঙ্গন।

নীলে নীলে একাকার,
দুজনে দুজনে টানে,
দুজনে উন্মত্ত প্রাণে
দেখাইছে সৌন্দর্য্যের মহিমা অপার।

তব ও বিশাল বুকে,
কতকি রয়েছে ঢাকা,
না দেখে যায় না থাকা,
তাই তোতে সারা বিশ্ব ধায় শত মুখে!

তোমাতে বিভল সবে,
রবি শশি তারা দলে,
আনন্দে ডুবিতে চলে,
ডুবিয়া তোমাতে যেন কত সুখী হবে!

যথা যত নদ নদী,
সবাই উধাও প্রাণে
আসিছে তোমার পানে,
ভরসা তোমাতে ডুবে শান্তি পায় যদি।

তুমিও বিভল চিতে,
আশ্রিতের করে ধ'রে,
লতেছ সোহাগ ভরে,
আমাকে কি বিন্দু ঠাঁই পারিবে গো দিতে।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

নিদ্রিত।

সংসারের শ্রম-ক্লান্তি, অবসাদ নিয়ে
ধরণীর স্নিগ্ধ বুকে পড়েছে ঘুমিয়া,
আসে নিশি বিষাদিনী,—শিয়রে বসিয়ে,
নীরবে ঝরিছে অশ্রু কপোল বাহিয়া;
গাহেনা বিহগ সেথা—দূর নীলিমায়,
নত শিরে, চেয়ে চেয়ে নীবরে মিশায়;
চুপি চুপি, ধীরে ধীরে বহিছে তটিনী
ঘেরিয়া তাহার সেই শ্যামল কানন,
নীরবে ফুটিছে ফুল, নীরবে চাঁদিনী
গগনের কোলে হাসে, বহে সমীরণ।
নীরবে বিলাপ গাথা, পাছে সে কাহিনী
পশিয়া কাতর করে তাহার শ্রবণ;
নিদ্রিতা ধরার বক্ষে লাবণ্য-কুসুম
ভাঙ্গিওনা কেহ তার বিশ্রামের ঘুম।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

---

* অন্তঃপুর নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা বনলতা দেবীর মৃত্যুতে কবিতাটী লিখিত হইল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৭। আমিষ ও নিরামিষ আহার।—শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র। মহিলারা শিক্ষালাভ করিয়া বিলাসিনী হন, অশিক্ষিত লোকের এইরূপ ধারণা। আমাদের গ্রন্থকর্ত্রী সম্ভ্রান্ত-বংশে সমুদ্ভূতা, ধনবানের দুহিতা, ধনবানের বনিতা, সুশিক্ষিতা, পুণ্য-সম্পাদিকা, অথচ তাঁহার মত সুগৃহিণী অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি স্বহস্তে বিভিন্ন রন্ধনীয় সমাবেশ করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আপন অভিজ্ঞতা মিলাইয়া "আমিষ ও নিরামিষ আহার" রচনা করিয়াছেন। রন্ধন সম্বন্ধে আরো দুইখানি পুস্তক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সে গুলি পুরুষের রচনা, গ্রন্থকারেরা কেহ স্বহস্তে রন্ধন করিতে জানেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। ইংরাজি গ্রন্থ দেখিয়া, পাচক ও বাবুর্চির নিকট শুনিয়া সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। "আমিষ ও নিরামিষ আহারের" নূতনত্ব এই যে, ইহার ব্যবস্থাপিত কোন কথাই অনুমান করিয়া বা শুনিয়া লেখা হয় নাই। গ্রন্থকর্ত্রী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দশজনকে খাওয়াইয়া সকলের সুখ্যাতি লইয়া তবে ব্যবস্থা গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা দু একটী আহার্য্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী পুত্র ভ্রাতাকে খাওয়াইয়া সুখী করিতে ও সুখী হইতে অভিলাষিণী হন বা পাচককে শিখাইয়া সুপাক করিতে চান, তাঁহারা প্রজ্ঞাসুন্দরীর আমিষ ও নিরামিষ আহারকে অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করিবেন। প্রণয়িনীকে প্রীতি উপহার দিবার এ গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী।

গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর। বস্তুতঃ বাঙ্গালা দেশে এমন "বিলাত বাঁধান" এখন হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল না। বাঙ্গালা বই এমন সুন্দর বাঁধান আমরা আর দেখি নাই।

মহিলা বিদ্যালয় সকলে পাকপ্রণালী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত আমিষ ও নিরামিষ আহার মহিলা বিদ্যালয়ের এবং অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা সকলের পাঠ্যগ্রন্থ হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

১৮। An Appeal for Mass Education. বারাসতের অধীন তেঘরা একটী সামান্য পল্লীগ্রাম। এই গ্রামে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চেষ্টা হইতেছে। বিধাতার কৃপায়, দীর্ঘকালের চেষ্টায়, স্কুলে এবং রজনী বিদ্যালয়ে ৮০ জন ছাত্র হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ১৮ জন বালিকা ভর্ত্তি হইয়াছে। কৃষি, শিল্প এবং সাধারণ শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। বাবু শশীভূষণ রায়চৌধুরী একজন আদর্শ চরিত্রবান ব্যক্তি। তাঁহারই অদম্য চেষ্টায় এই স্কুলটী কোনরূপে চলিতেছে। শশী বাবু একজন দরিদ্র ব্যক্তি; তাঁহার প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু অর্থ নাই। সৎ ইচ্ছার সহায় ভগবান। তাই অশেষ কষ্ট যন্ত্রণার মধ্য দিয়াও স্কুলটী চলিয়া আসিয়াছে। দরিদ্র, নিঃসহায় ব্যক্তিদিগের মুখের দিকে তাকায়, এ জগতে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। যেরূপ ভাবে শশীবাবু এই স্কুলটী চালাইতেছেন, তাহা পাঠ করিলে চক্ষে জল আইসে। ছাত্রদের বেতনে মাসে ৫৲ কি ৬৲ টাকার অধিক হয় না। বালিকাদিগের এবং অনেক ছাত্রের বেতন দেওয়া দূরে থাকুক, পুস্তকাদিও দিতে হয়। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড মাসিক ৮৲ সাহায্য করেন। ওয়েসলিয়ান ফণ্ড মাসিক ১৷৷০ দেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সুযোগ্য পুত্র বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাসিক ৫৲ দেন এবং চাঁদায় মাসিক ৪৲ আদায় হয়। এই আয় দ্বারা স্কুল কি চলিতে পারে? এই জন্য উদ্যোক্তা ঋণে ডুবিয়াছেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সাধারণের সাহায্য ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। যাঁহারা টাকার সৎব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের উপযুক্ত স্থান উপস্থিত। যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, সিটী কলেজের প্রিন্সিপাল, নানা সৎকর্ম্মের উৎসাহদাতা

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, মহোদয়ের নিকট পাঠাইবেন।

১৯। শ্রীঅদ্বৈত-বিলাস।—প্রথম খণ্ড। শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক কর্ত্তৃক গ্রন্থিত। মূল্য ১৵০ আনা। ভারতমিহির যন্ত্র। ঈশার সহিত বাপটিস্‌টাখ্য যোহনের যে সম্বন্ধ, চৈতন্যের সহিত অদ্বৈতাচার্য্যেরও সেই সম্বন্ধ। চতুর্দ্দশ শক শতাব্দীর তমোময় নবদ্বীপে চৈতন্য চন্দ্রোদয়ের অগ্রদূতরূপে অদ্বৈতাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁহারই পুণ্য চরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থে অবশ্য অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ আছে, কিন্তু সে সকলে যাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না, তাঁহারাও ইহা পাঠে কৃতার্থ হইবেন। কি জাতির ইতিহাস, কি ব্যক্তির ইতিহাস, আখ্যান-পরিপাট্যই ইতিহাস গ্রন্থের প্রাণ স্বরূপ। দুই চারিটী স্থান ছাড়া, বীরেশ্বর বাবুর আখ্যায়িকাও গঙ্গা স্রোতের মত চলিয়াছে; কোথাও প্রতিঘাত নাই—সর্ব্বত্রই তরস্বী, বলিষ্ঠ, মঙ্গল্য, মধুর। আমরা এ গ্রন্থের অন্তিম খণ্ড দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

২০। আঁখি জল। প্রকাশক শ্রীমৌলবী আবদুল গণি। ঐ যন্ত্র। মাটিয়া বুরুজ। বলা বাহুল্য, এখানি কবিতা পুস্তক। কবিতার একটা নমুনা দিই—

ঘুরে ফিরে ফুলের ধারে
যেমন যায়, চড়্ মারে মুখে।

তাই উচিত শাস্তি বটে। পুস্তকখানির ছাপা বড় সুন্দর; মূল্য কত, লেখা নাই।

২১।২২।২৩।২৪। কাব্য-প্রসূন, ১ম ভাগ। মূল্য ৵০ আনা। অশ্রুমালা, মূল্য ।৵০ আনা। মালা। মূল্য ৵০ আনা। অঞ্জলি, ১ম খণ্ড। মূল্য ৵০ আনা। চারিখানিই কবিতা পুস্তক, চারিখানিই আবার শ্রীকৃষ্ণ গোপাল চক্রবর্ত্তি-প্রণীত। কাব্য প্রসূন স্কুল-পাঠ্য পুস্তক, ছোট ছোট শিশুগণের পক্ষে অনুপযুক্ত নহে। অশ্রু মালার "প্রথম অশ্রু" হইতে "পঞ্চম অশ্রু" পর্য্যন্ত প্রত্যেক অশ্রুর কপালে গ্রন্থকারের স্বরচিত এক একটী পদ্যময়ী মটো এবং মধ্যে যাহা যাহা থাকিবার, তার সকলই আছে। তথাপি কিন্তু এ কাব্যের চেয়ে ইহার ভূমিকা পড়িয়াই আমরা বেশী সুখ লাভ করিয়াছি। ইহাকে অরসিকতাই বল আর নিষ্ঠুরতাই বল, স্বীকার করিতে আমাদের লজ্জা নাই; কেন না কাব্যের এমন কৌতুককর ভূমিকা আমরা দুই চারি দশ বৎসরে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থমতঃ, দেখিলাম আর মজিলাম—গ্রন্থকার মহাশয়ের "জ্ঞাতসারে ঠিক এইরূপ দুইটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কেহই সফলকাম হইতে পারেন নাই।" বলিতে কি, "তাঁহারা অদ্যাপিও জীবিত আছেন!" দ্বিতীয়ত; "কাহাকেও ভালবসিলে তাহাকে পাইতে ইচ্ছা হয়, ইহাই নিয়ম;" কিন্তু গ্রন্থকার তাহার বিপরীত "চাক্ষুষ" করিয়াছেন। এক বিজ্ঞ "বাস্তবিকই যাহাকে ভালবাসেন, তাহার সহিত বিবাহ হওয়ার কথায় দেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।" পুনশ্চ, ঐ বিজ্ঞ "প্রেমিক অবিবাহিত থাকিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" তৃতীয়তঃ, বাল্য প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে—কথাটা মিথ্যা না। কোনও প্রেমিকের ভালবাসা "ক্রমান্বয়ে এগারটী বালিকার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু সকলকেই তিনি হারাইয়াছেন। আরও কিন্তু, "তিনি এখনও জীবিত, কিন্তু উন্মাদরোগগ্রস্ত।" গ্রন্থকার এ তিনটী ছাড়া "আরও অনেক সংসার পতঙ্গকে বহ্নিদগ্ধ" হইতে দেখিয়াছেন, কিন্তু "বিশেষ কারণ বশতঃ" পতঙ্গ গুলির ইতিহাস দিতে না পারায় পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরা যেটুকু পাইয়াছি, তাহাতেই পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। মালা ও অঞ্জলি, এই অশ্রু মালারই সহোদরা ও সহোদর। অঞ্জলির সবে ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে!

২৫। চামেলী।—কবিতা পুস্তক। ভূমিকা, সাময়িক কবিতা ও পরিশিষ্ট সহ। শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন প্রণীত। ভারতমিহির যন্ত্র। মূল্য ।০ আনা। ভূমিকায় আলেক-

জাণ্ড্রিয়ার গ্রন্থাগারধ্বংস আছে, ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাত আছে, Divide and Rule নীতির কথা আছে; পরিশিষ্টে রঙ্গপুরের ভূমিকম্প আছে; কবিতায় পবিত্র প্রেমের পৌনঃপুনিক উচ্ছ্বাস আছে। সব আছে, কিন্তু চামেলীর সে গন্ধ কই?

২৬। কবিতা-কুঙ্কুম।—শ্রীশ্যামলাল বসাক এল, এল প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা। মহানন্দ প্রেস। এ পুস্তক খানিতে অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রীতির নিদর্শন আছে, কিন্তু কাব্যের নিশানা খুঁজিয়া পাই নাই।

২৭। কাব্যামৃত—১ম খণ্ড।—শ্রীকানাইলালনাগ প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। স্বভাব ও সৌন্দর্য্যের সহিত সাত জন্মেও যার পরিচয় নাই, তার কাব্য যেরূপ হইতে পারে, কাব্যামৃতও সেইরূপই হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এবারে, সমালোচ্য সকল কবিতাপুস্তক গুলিরই ভূমিকা মনোহর। কাব্যামৃতের গ্রন্থকার বলিতেছেন, "যদি পাঠক তাহার কবিতা পাঠে কিঞ্চন্মাত্র সন্তোষলাভ করেন, তবে সে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে সাহসিক হইবে।" কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত নিবেদন করি, এ অসম সাহসে আমরা তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু "২য় খণ্ড সে একটী বিষয় লইয়া লিখিবে, ইচ্ছা করিয়াছে।" তবুও না।

২৮। বিষাদ সংবাদ।—শ্রীভগবানচন্দ্র দাস প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। রাজসাহী তমোঘ্ন যন্ত্র। এ গ্রন্থের অধিকাংশই ৺মহারাণী স্বর্ণময়ীর চরিত কীর্ত্তনে মণ্ডিত। কিন্তু কাব্য খানি শুধু রাজ প্রশস্তি নয়, ভূমিকম্প প্রশস্তিও বটে; কেননা, বিগত মহাভূকম্পের বিষয়েও একটা লম্বা কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। বিষাদ সংবাদের মধ্যে আবার একস্থানে ঘোড়া, গরু, হাতী ও জাহাজের সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে এবং ৺ রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দীর "উইলের বিচার" ও "সম্পত্তির আয়" প্রভৃতি মনোহর প্রস্তাব সকল কবিতায় নিবদ্ধ হইয়াছে!

২৯। সঙ্গীত-কুসুম।—২য় খণ্ড-শ্রীরামজয় বাগছী প্রণীত। জয়ন্তী প্রেস। এই বৃহৎ পুস্তক বিবিধ বিষয়ক কতকগুলি সঙ্গীতের সংগ্রহ। বোধ করি, বলা বাহুল্য, ইহারও একটা ভূমিকা এবং একটা পরিশিষ্ট আছে। ভূমিকায় জীবিত গ্রন্থকারের জীবনচরিত ও পরিশিষ্টে সমালোচ্য গ্রন্থের ৩১ খানি সার্টিফিকেট প্রকাশিত হইয়াছে।

৩০। আবেগ।—মূল্য ১৲ টাকা। হরসুন্দর মেসিন প্রেস। আবেগ কোনও অপ্রকাশিত নাম্নী রমণীর রচিত গীতি কাব্য। যার বাড়া শোক আর অবলা জাতির সম্ভবে না, লেখিকাকে সেই শোকে ক্লিষ্টা বলিয়া বোধ হয়। নারীর প্রতি শ্বাসে যেন একটা স্তম্ভিত হাহাকারের পুটপাক হইতেছে।

শান্ত নদীবক্ষ মৃদুল বাতাস
কেঁপে কেঁপে অতি বহিছে ধীরে।
সুদূর গগনে সার দিয়ে পাখী
আঁকা বাঁকা পথে যেতেছে নীড়ে।

এতো শুধু বহিঃ সন্ধ্যার নয়, এ কবির মানসী সন্ধ্যারও চিত্র বটে। প্রদোষ তিমিরে বিগাহমানা ঐ পক্ষিণীর মত, আত্মার ঘোরা তমিস্রায় হাহা রবে তপস্বিনী নষ্ট নীড় অন্বেষণ করিতেছে। আবেগ সর্ব্বত্রই শোকাগ্নিশুদ্ধ, অতএব নির্ম্মল। ইহার স্থলে স্থলে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্যেরই আস্বাদ পাইয়াছি। লেখিকা অপরিপক্কা হইলেও মনস্বিনী, সন্দেহ নাই।

৩১। ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীকালীনাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ।০। কাইসর মেসিন যন্ত্র। সুকবি এবং সাধক পুণ্ডরীকাক্ষের মধুর কণ্ঠ চিরকালের জন্য নীরব হইয়াছে, তাঁহাকে হারাইয়া ভক্তিপিপাসু মাত্রেই ব্যথিত হইয়াছেন। তাঁহার অভাবের শীঘ্র পূরণ হইবে না। আমরা সেই পথে, সেই ভাবে কালীনাথ ঘোষকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইয়াছি। সঙ্গীত শিক্ষা এবং সাধনায় কালীনাথ এখনও অনেক পশ্চাতে, কিন্তু ভাবে, বুঝিবা, কালীনাথ পুণ্ডরী কাক্ষের

সমতুল্য ব্যক্তি। ভাবের উচ্ছ্বাসে পুণ্ডরীকাক্ষের চক্ষের ধারা বহিত, কালীনাথের ভাবের উচ্ছ্বাসেও তেমনি হয়। রামপুরহাটের উৎসবে যাইবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ পত্র উপস্থিত, ভাব-বিহ্বল পুণ্ডরীকাক্ষ উপাসনায় বসিয়া গান পাইলেন—

"বিশ্বরাজ হে, কেন ডাক সখা বলে আর।
(আর ডেক না ডেক না) (অমন করে সখা বলে)
তোমার মধুমাখা ডাকে হরি,
আমি নিদারুণ লাজে মরি,
আর ডেক না, ডেক না।"
কলুষ সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয়হে।
তার কি গুণে ভুলিয়ে পুণ্যময় হরি
সখা বলে ডাক তায় হে। (একি ভালবাসা)
যে জন মোহমদে মত্ত, সদাই উন্মত্ত,
গরবে গর্ব্বিত রয় হে, তার কি গুণ স্মরি
দেবদুর্ল্লভ হরি, সেধে ভালবাস তায় হে।
(অবাক্ হই হে হরি)
আমি বুঝিনু এখন, পতিতপাবন,
তোমার প্রেমের রীত;
যে জন চাহে না তোমারে, চাও তুমি তারে
সাধিয়ে কর সুহৃদ্।
(তোমার প্রেমের সীমা কোথায় প্রভু)
আমি থাকি সদা ঘুমের ঘোরে
কেন ডেকে পাগল কর মোরে।
(আর ডেক না ডেক না) (এমন নরাধমে)

এই সঙ্গীতে অশ্রুপাত হয় নাই, এমন লোক আমরা দেখি নাই।

কালীনাথও যখন ভাবে বিহ্বল হন, তখন তাঁহার গানে অশ্রুপাত হয় না, এমন লোকও বিরল। পুণ্ডরীকাক্ষের গানের ন্যায় একটী গান এই—

তবু ঘুম ভাঙ্গে কই!
(তুমি এত যে ডাকিছ, এত জাগাইছ,
আমি শুনেও বধির হই।
(তুমি) প্রতি পরীক্ষায়, প্রতি ঘটনায়
কত না ডাকিছ জাগাতে আমায়,
(আমি) দেখেও দেখি না, শুনেও শুনি না,
জাগিয়া ঘুমায়ে রই॥ ইত্যাদি

পুণ্ডরীকাক্ষের অকৃত্রিম গুরু ও শিষ্য, সুগায়ক বাবু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কালীনাথের গান অতি সুন্দর, অতি মিষ্ট, অতি মধুর। আমরাও বলি, অতি সুন্দর এবং অতি মধুর। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, কালীনাথ দীর্ঘজীবী হউন।

৩২। গীত-মালা। ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ, শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায় গ্রথিত, মূল্য ১৲ মেটকাফ প্রেস।

সংসার-মরুতে মানবের শুষ্ক প্রাণে শান্তি-ধারা বর্ষণ করে, একমাত্র সঙ্গীত। সঙ্গীতে রোগ-কষ্ট যায়, শোক যায়, অশান্তি যায়, বিপদ যায়, দুশ্চিন্তা যায়। সঙ্গীত এই মর্ত্ত্যে অমিয়াধারা। বাল্যকাল হইতে কত সঙ্গীত শুনিয়াছি, কত সঙ্গীত ভুলিয়াছি—কত শান্তি পাইয়াছি, কত শান্তি হারাইয়াছি; কিন্তু কোন কোন সঙ্গীত জীবনের চিরসঙ্গী হইয়াছে—তাহারা চিরকালই শান্তি বর্ষণ করিতেছে। মানবপ্রাণ এই রূপ চির উৎস খুলিয়া দিতে পারেন যাঁহারা, তাঁহারা মানব, না দেবতা? আমি কতবার ভাবিয়াছি—তাঁহারা মানব নহেন, দেবতা।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, এই বঙ্গে সেই দেবপদবাচ্য। কেননা, তাঁহার কত সঙ্গীত কত জনের জীবন-সর্ব্বস্ব হইয়া রহিয়াছে। দুই চারিটী নমুনা এই—

১। "তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার,
ফলভরে অবনত শাখার আকার।" ইত্যাদি
২। "ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
ইত্যাদি
৩। "ওরে, আমার মন ভুলা'লে যে, কোথায় আছে সে।"
৪। "তরু বলরে বল ও তরু বলরে
কে তোরে সাজালে দিয়ে গায়ে গায়ে
পত্রপুষ্প ফল রে।"
৫। "এই বিশ্ব মাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।"
ইত্যাদি—

বেচারাম বাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন,—আর যে দীর্ঘকাল এই ধরায় থাকিবেন, বোধ হয় না। তাঁহার পুণ্যময় জীবনের এই মধুরধারা বঙ্গের ঘরে ঘরে অক্ষয় অমিয়ধারা রূপে চিরপ্রবাহিত হউক।

৩৩। Songs to Myrtilla and other Poems. By Aurobind Ghose. Barada, Lakshmi Vilas Printing Press. এই গীতি কাব্যের রচয়িতা প্রসিদ্ধ সিভিল্ সার্জন্ ৺ কৃষ্ণধন ঘোষের প্রসিদ্ধ পুত্র শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ। বাঙ্গালীর রচিত এক ডজন বাঙ্গালা কাব্যে যাহা পাইলাম না, বাঙ্গালীর রচিত এই ক্ষুদ্র ইংরেজী কাব্যে

তাহা পাইয়াছি। এমন মধুর, মধুমাদিনী, মোহকরী গীতি অনেক দিন শুনি নাই। একাব্যে বিরহ নাই, শুধু সম্ভোগ——শুধু crimson kisses, crimson pleasures, ——"মরণের তটপ্রান্তে বসি' জীবনের একান্ত সম্ভোগ," তেমনই সম্ভোগ। অরবিন্দের কাব্যে কেবলই মধু। রূপ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, সকলে সমস্তাৎ মধু আহরণ করিতেছে—

Behold the rose her lovely birth,
What fires from the bud proceed,
As if the vernal air did bleed.

* * * *

The wide-world perfumes when she sighs
And burning all the winds, of love she dies.

* * * *

.....unseen and near
The windlark gurgles in the golden leaves

অরবিন্দ মধু পান করিতেছেন—

* * * *

Emparadised in odours.....

* * * *

In odorous gloom of trees.....

* * * *

In thy bosom's snowwhite walls
Softly and supremely housed

* * * *

Ruby-guided through a kiss
To the Sweet highways of bliss.

এত নেশা, তবু সে ছাই স্মৃতিটা যায় না—

Are we more than summer flowers ?
Shall a longer date be ours,
Rose and springtime, youth and we
By the everlasting sea ?

যাইতে হইবেক ? যাবে—সে তো অনেক দিনই জানি—

.....as one who tasted all
Life's honey and must now depart
A broken prodigal from pleasure's mart..

তবে তাই হোক্—

With thy kisses chase this gloom
Thouhts, the children of the tomb.
Kiss me, Edith, soon the night
Comes and hides the light.

এমন মধু, এমন আনন্দ, এমন মোহ আমরা Keats এর কাব্য ছাড়া আর কোথাও পাই নাই। কিন্তু Keats এর আনন্দের মত এ আনন্দও ঐন্দ্রিয়িক, ঐহিক নাস্তিকতাগন্ধি। ঐহিক, তাই এ আনন্দে ভয় আছে—tomb এর নামে, night এর নামে শিহরিতে হয়। যাহা ঐহিক মাত্র, তাহাতে মানুষের ক্ষুধা মিটে কই ? যে আনন্দে ভয় নাই, যে আনন্দের ক্ষয় নাই, এ কাব্যে আমরা সে আনন্দের দেখা পাই নাই। অরবিন্দের কাব্যের অভাবও এই, কলঙ্কও এই। আর একটা কথা। নব্য-ভারতের অনেক পাঠকই শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, যিনি কেমব্রিজের Classical tripos যে অপার লাটিন গ্রীক সাহিত্যসাগর অগস্ত্য গণ্ডূষে পান করিয়াছেন, তিনিও মধুসূদন দত্ত আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ভুলিতে পারেন নাই। এই ক্ষুদ্র কাব্যে মধুসূদন সম্বন্ধে একটী এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে দুইটী কবিতা আছে। বঙ্কিম সম্বন্ধে কবিতা দুইটীর দ্বিতীয়টীর উপসংহার এই—

He sowed the desert with the ruddy-hearted rose,
The sweetest voice that ever spoke in prose.

অরবিন্দের অমৃতবাণী নিখিল বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

৩৪। পারিজাত হরণ নাটক।—মণিকা প্রেস। শ্রীরামচন্দ্রনাগ প্রণীত। মূল্য ৷৷০ আনা। পারিজাত হরণ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, ইনি নাটক নহেন, যাত্রা। ইহাতে আত্মারাম আছে, বাঞ্ছারাম আছে, শ্রীকৃষ্ণ আছে, নারদ আছে, ভক্তিরাম আছে, গরুড় পক্ষী আছে। অধিকন্তু, ইহাতে স্বয়ং সর্ব্বংসহা পৃথিবী আছেন। তবে আর চিন্তা কি ?

৩৫। রমা-নাটক।—সেরিডান্ কর্ত্তৃক অনূদিত কোনও জর্ম্মান নাটকাবলম্বনে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা। প্রেসের নাম নাই। সাহিত্য সেবক সমিতি, ৩২।৭ বিডন ষ্ট্রীট। দুই একটা ঘটনা এমনি আশ্চর্য্য যে, রমা Romance, রসিকতা, অমিত্রাক্ষর ছন্দ; স্বদেশহিতৈষিতা, বক্ষে ছুরিকাঘাত ও কান্তে অকান্তে গীত প্রভৃতি থিয়েটরে অভিনীত খাসা খাসা নাটক গুলির সকল গুণে ভূষিত হইলেও নাটক নহে! বস্তুতঃ গ্রন্থকার কাব্য ছাড়িয়া আর কিছু ধরিলে আমরা দুঃখিত হইব না।

সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র। (২)

স্মারকাঙ্কনের সর্ব্বাদ্যস্তর—পদার্থগত নিদর্শন—অত্যন্ত আদিম ও অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট। ইহার ভগ্নাবশেষ আজও কোনও কোনও স্থলে, কিছু কিছু, বিদ্যমান আছে। যেমন, বস্ত্রে গ্রন্থি বন্ধন দ্বারা, কোনও কথার বা বিষয়ের স্মৃতি আকর্ষণ। পরন্তু ডোর বা সূত্রে, বিবিধ বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গ্রন্থি দ্বারা, গণিতাঙ্কের সংস্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ের বিজ্ঞাপনার্থে, লিপিকরণ। পুনশ্চ, দণ্ডে দাগ কাটিয়া, হিসাবাদির রক্ষণ প্রথাও এই প্রথম স্তরের স্মারক লিপি। বহুকালের কথা নয়, এ প্রথা বৃটিশ পার্লীমেণ্টে প্রচলিত ছিল। অস্মদ্দেশের পল্লী গ্রামাঞ্চলে, অদ্যাবধি, এই দাগ-কাটা-প্রথা, দুগ্ধ ও তৈলাদির হিসাব রক্ষণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে, পেরু রাজ্যে, এই প্রকার পদার্থ-লিপি প্রবল প্রচলিত ছিল। রাজ কার্য্যের যাবতীয় ব্যাপার এবং পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধি-পত্র প্রভৃতি, সূত্র-গ্রন্থির লিপি এবং তদনুরূপ কড়ি-ছড়া, পলাকাটি ও স্ফাটিক মালার স্মারক লিপিতে, সম্পাদিত হইয়া, রক্ষিত হইত। অন্যান্য পদার্থ, ও পদার্থের প্রতিরূপও এবম্বিধ লিপি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। বহুকালের কথা নয়, পেরু প্রভৃতি রাজ্যের দপ্তর খানায় এইরূপ গ্রন্থি ও পদার্থাদি রূপ, অক্ষরে লিখিত, পুরাতন সন্ধি পত্রাদি, প্রাপ্ত হইয়া রহস্যাভিজ্ঞ লোক দ্বারা পঠিতও হইয়াছিল।

তৃতীয় স্তরের সাঙ্কেতিক চিত্র বা চিহ্নের লিপি, দ্বিতীয় স্তরের চিত্র-লিপি হইতে উদ্ভূত বা বিকাশ প্রাপ্ত বলিয়া, কথিত হইলেও প্রথমোক্ত শেষোক্তের উন্নতি বলিয়া বিবেচিত হয় না। কারণ, সঙ্কেত অজ্ঞাত হইলে, সাঙ্কেতিক চিত্রে বা চিহ্নে অঙ্কিত লিপি আদৌ অস্পষ্ট, অপাঠ্য ও অবোধ্য হয়। পক্ষান্তরে, চিত্র-লিপি স্বভাবতই সুস্পষ্ট এবং সাধারণতঃ প্রায় সকলেরই সহজ পাঠ্য ও সহজ বোধ্য বটে। এমন কি, অজ্ঞ নিরক্ষরদিগের পক্ষে, বা বিশেষ বিশেষ অক্ষরাবলীতে অপরিচিত ব্যক্তিদের পক্ষে, শব্দ-লিপি অপঠনীয়; কিন্তু, চিত্র লিপি অনায়াসে বা অল্পায়াসে পাঠ্য। চীন ও জাপানী প্রভৃতি ভাষায়, শব্দাত্মক অক্ষরের সহিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন-লিপি এবং চিত্র-লিপি, অদ্যাবধি একত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মনুষ্যের মনোভাবের বিশিষ্ট ও বিচিত্র ব্যক্তাবস্থাই সাহিত্য। সাহিত্যকে সপ্রকাশ, ধারণ ও রক্ষণ কল্পে, শব্দাত্মক ভাষা ও বর্ণই, সর্ব্বপ্রধান উপায় বা একমাত্র উপযুক্ত উপায়। উপরি উক্ত অন্যান্যবিধ ভাষা ও স্মারক-লিপি, তাহার কথঞ্চিৎ উপায় হইতে পারিলেও, সে উপায় সকল অপ্রচুর, অস্পষ্ট, অনুপোযোগী ও একান্ত অসুবিধাকর। তথাচ, শব্দাত্মক ভাষা ও ধ্বন্যাত্মক বর্ণের অবিদ্যমানে, মনুষ্যের চিন্তা ও মনোভব ও তাহাদের অভিব্যক্তি বন্ধ থাকিতে পারে না। অতএব তদর্থে অপরাপর উপায় অবলম্বন করে।

সুসভ্য জাতি নিচয়ের মধ্যে, সাহিত্যের ন্যায়, চিত্র-শিল্পও চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু, উহার বহু পূর্ব্বেও, অসভ্য অরণ্য-বাসীদের মধ্যে, চিত্র-শিল্পের অনুশীলন

ছিল। সে চিত্র—সে শিল্প, তাহার অনুশীলনকারিদের মতই, অবশ্য আদিম অবস্থাপন্ন, ও নিপুণতায় নিকৃষ্ট রকমেরই ছিল। তা, যেরূপই হউক, চিত্র চিত্রই বটে। তাহাদের মধ্যে, চিত্র কেবল শোভন-শিল্প মাত্র ছিল না; তাহা অপেক্ষাও অধিকতর আবশ্যকীয় বিষয়—চাক্ষুষ ভাষা ও ভাষার স্মারক লিপি স্বরূপ চিত্র-লিপি ব্যবহৃত হইত। অরণ্য-চারী, গুহাবাসী মনুষ্যগণ তাহাদের মনের কঠিন, কোমল ভাব নিচয়, তাহাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, বীরত্বের উৎসাহ, প্রাণের কাব্য-কলা, চিত্র-পটে প্রকাশিত করিত এবং চিত্র লিপিতে অঙ্কিত করিয়া রাখিত। তাহার ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ এখনও পর্য্যটকদিগের নয়ন-পথে পতিত হইয়া থাকে। জাতীয় ইতিহাস, জীবনচরিত, যুদ্ধকাহিনী, যুদ্ধ-যাত্রার বিবরণ, মৃগয়া-বৃত্তান্ত, প্রণয়-কাহিনী, প্রণয়-পত্র, প্রণয়-সঙ্গীত প্রভৃতি আদিম মনুষ্য-জীবনের বিবিধ বিষয়ক বৃত্তান্ত, চিত্র লিপিতে, প্রকাশিত হইত। এই প্রকৃতির চিত্রের আদর্শ, আহরিত হইয়া, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ নিচয়ে সময়ে সময়ে, প্রকাশিতও হইয়া থাকে।

এখন কথা এই যে, মনুষ্যের মনোভাবের ব্যক্তাবস্থা বা ব্যক্তাবস্থার বিশিষ্টতা ও বিচিত্রতাই যদি সাহিত্য হয়, তবে এই চিত্রাদিকেও সাহিত্য বলি না কেন? চিত্রাদিতেও ত মনুষ্যের মনোগত ভাব সময়ে সময়ে, বিশিষ্টরূপে ও বিচিত্র ভাবে বিকৃত হয়। বিশেষতঃ উৎকৃষ্ট চিত্রে, মনোভাবের অশরীরী মূর্ত্তি, যখন সশরীরে, সজীব ভাবে, অঙ্কিত হয়, এবং সে মূর্ত্তি নিরক্ষরেও নিতে পারে, তখন উৎকৃষ্ট চিত্রই ত উত্তম ।

না, তাহা নয়। তাহা হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট চিত্র,—উত্তম শিল্প;—সাহিত্য নয়। মনুষ্যের মনোভাব-ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ন্যায়, ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম শিল্পও কার্য্য করে। এবং তাহাদের সে কার্য্য, বিশিষ্ট, বিচিত্র এবং সুন্দরও বটে, পরন্তু, সে কার্য্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যও বটে। তথাচ, শিল্প শিল্প ভিন্ন সাহিত্য নয়। কেন? সে বিচার আর এখানে করিতে বসিব না। ইঙ্গিতে, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শিল্প সাহিত্য নয় এবং সাহিত্য শিল্প নয় বলিয়াই,শিল্পের নাম শিল্প ও সাহিত্যের নাম সাহিত্য হইয়াছে। এই এক মাত্র নামকরণেই, উহাদের স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা ও স্বভাব সূচিত হইতেছে।

সূক্ষ্ম শিল্পের কার্য্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি এবং কার্য্য-ক্ষেত্র, মনুষ্যের ভাব-রাজ্য। সাহিত্য বিশেষের কার্য্য এবং কার্য্য-ক্ষেত্রও তাই। অতএব শিল্পের এবং সাহিত্যের কার্য্য এক হইতে পারে; কার্য্যক্ষেত্রও এক হইতে পারে। শিল্প এবং সাহিত্য একই সাধারণ ভূমিতে, একই সাধারণ কার্য্যে, নিযুক্ত থাকিতে পারে। কিন্তু, সে কার্য্যের উপাদান, উপকরণ, ও উপায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। পুনশ্চ, সে কার্য্যের প্রকৃতি ও নীতিও ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই শিল্পে ও সাহিত্যে সবিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। কেবল তাহাই নয়; কার্য্যের উপাদান উপায়াদি ভেদে শিল্পে শিল্পেও পার্থক্য রহিয়াছে।

সাতিত্যের বাহ্য উপকরণ শব্দাত্মক ভাষা ও ধ্বন্যাত্মক বর্ণ। সাহিত্য শিল্প নহে,—শিল্প অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত। তবে, সাহিত্যের অন্যতর উপকরণ অক্ষর—অক্ষরের অবয়ব শিল্পজাত বটে। এ হিসাবে,

শিল্প সাহিত্যের সহায়তাকারী। কেননা, ভাষার ন্যায়, বর্ণের বিরহেও সাহিত্য—বিশেষতঃ সাহিত্যের সংবর্দ্ধন ও সংস্থিতি অসম্ভব।

সাহিত্যে, শব্দাত্মক ভাষা যেমন, ভাষায় ধ্বন্যাত্মক অক্ষর তেমনি, অবশ্যম্ভাবী। পুনশ্চ সাহিত্যকে ধারণার্থেই, ভাষার অক্ষর বাহন অনিবার্য্য। অতএব,সাহিত্য-সংগঠন কার্য্যে, অক্ষরের অংশ অত্যল্প নহে, উপেক্ষনীয়ও নহে।

অক্ষর সাহিত্য-শরীরের এক প্রধান উপাদান। সঙ্কেতাক্ষর বা চিত্রাক্ষর উপযুক্ত উপাদান নহে। ধ্বন্যাত্মক বর্ণাক্ষরই সাহিত্যের শরীরোপযোগী-উপাদান। এবং সে উপাদান ব্যতীত সাহিত্যের শরীর সম্যক সংগঠিত হইতে এবং সম্যক সচল থাকিতে পারে না।

সাহিত্যের ইংরেজী নাম "লিটারেচার" (Literature)। এই নামটীই অক্ষর মূলক এবং বক্তব্য বস্তুর বাহ্যাবয়বের সবিশেষ উপযোগী-ভাবে নির্ব্বাচিত। Literature শব্দ Letter শব্দ হইতে উদ্ভূত। Letter অর্থে অক্ষর এবং ধ্বন্যাত্মক অক্ষর। (Letter) "লেটার বিরহিত "লিটারেচার"—বর্ণাক্ষর বিহীন সাহিত্য স্বভাবতই অসম্ভব।

ইংরাজী Letter শব্দ, ফরাশী Letter হইতে আগত। উহার মূল ধাতু লাটিন Litum; অর্থ—অঙ্কিত করা;—to daub, to besmear. অতএব Letter অর্থে অক্ষর, —অঙ্কন বা আলেখ্য। অঙ্ক বা আলেখ্য কিসের? না, শব্দের বা শব্দাংশের।

শব্দ কি?

শব্দই সব। শব্দে ভাব। শব্দে ভাষা। শব্দেই সাহিত্যে। ভৈতিক প্রদার্থের ও মানসিক চিন্তার—যুগপৎ দুয়েরই প্রতিনিধি শব্দ। শব্দ 'কর্ণ-চিত্র'। শব্দ বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নিচয় বুঝাইয়া, অন্তরেন্দ্রিয়গত ভাব-পুঞ্জের ব্যাখ্যা করে। শব্দ প্রকৃতির আলেখ্য;—স্বভাবের সহিত এক সূত্রের গাঁথা। মনুষ্য জাতির ক্রম-বিকাশ ও অতীত ইতিহাস, তাহার শব্দাভিধানে—প্রত্যেক শব্দের অভ্যন্তরে, অঙ্কিত রহিরাছে। শব্দে অতীতের সাক্ষী, বর্ত্তমানের উপদেষ্টা ও উত্তেজক,ভবিষ্যতের পরিচালক। শব্দে অতীতের ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত, বর্ত্তমানের বিভূতি বিখোদিত; শব্দের ভবিষ্য সম্প্রসারণ ও সম্পদ অপরিমেয়। শব্দ বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সংযোগ-সূত্র; অতীতকে বর্ত্তমানের সম্মুখে, শব্দেই আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। শব্দ অজর অমর রূপে, জীবিত থাকিয়া, সুদূর য়ুরোপ আমেরিকার সহিত আসিয়ার ইণ্ডিয়ার ভগ্নী সম্বন্ধের "শাফাই সাক্ষ্য" দিতেছেন। শব্দ, হাসিয়া, হাসিয়া হাততালি দিয়া, ধনবন্ত, শক্তিমন্ত শ্বেতাঙ্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"ছি! শ্বেতাঙ্গ, রঙ্‌টা আজও শাদা আছে বলে কি এতই হাঁদা হ'তে হয়! তোমার শাদা রঙটা কেবল শীতের দরুণই বজায় আছে। নহিলে ঐ কৃষ্ণাঙ্গ কাঙ্গাল এবং তুমি একই পিতামহের পৌত্র। তোমরা একই জাতি, একই গোষ্টি;—এই দেখ আমার গায়ে, তাহা লেখা আছে। আমি, তোমাদের আদি পুরুষের গৃহে, বহুকাল বাস করেছিলুম; আজও বেঁচে থেকে, তোমাদের বাড়ী বাড়ী বেড়াচ্ছি,আর তোমাদের বিকৃতির আর বিস্মৃতির বীভৎস ব্যাপার গুলা, স্বচক্ষে দেখে দেখে কখনও কেঁদে, কখনও হেসে মোর্‌ছি। তা বাপু, ধলো! ঐ কালোটীকে, আর "নিগার" বলে নাথি মেরো না। ও যে তোমার জ্ঞাতি ভাই হয়। ও যদি নিগার হয়, তুমিও যে নিগার হও। আমি ত তোমাদের দুটীরই নাড়ী নক্ষত্রের, গোষ্টি গোত্রের সব খবরই রাখি। আমার অগোচর ত

কিছুই নাই। আমি যে তোমাদের উর্দ্ধতন শত পুরুষের সূতিকা গৃহের ফেরত। আমার কাছে ত বাপু, বড় একটা বাহাদুরি আর জারিজুরি খাট্‌বে না। খবরদার! মুখ সাম্‌লে কথা কও। নহিলে মুখের উপর এখনি মুখের মত, একাল সে কালের সব গান গুলো গেয়ে দেবো।"

পুনশ্চ সেই সাংঘাতিক সাক্ষী শব্দ কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিতেছেন ;—

"দেখ বাপু! বামুন ঠাকুর, একটু ঠাণ্ডর করে দেখ্‌লেই ভাল হয়। উহার কেহই ম্লেচ্ছ নয়, অশুচি, অস্পৃশ্য শক যবন নয়,—ঐ শাদা শাদা মানুষ মানুষী গুলি ;—বুট পায় কোট গায়, টোপ মাথায় লোক গুলি। উহারা তোমাদের জ্ঞাতি জ্ঞাতি জ্ঞাতি—শৌচাশৌচ সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। উহারা, তোমাদেরই ঋষি বংশ ;—কেহ কাশ্যপ গোত্র, কেহ শাণ্ডিল্য, কেহ বা ভরদ্বাজ গোত্র সম্ভূত। আমি ত্রিকালজ্ঞ শব্দ, তাহার শাফাই সাক্ষী আছি। আমি স্বচক্ষে সেই ঋষি ও ঋষি-পত্নীগণকে দেখেছি। সকর্ণে, তাঁদের নাম গান শুনেছি। তাঁদের হোমের হবিপ্রদান কালে, আমি সশরীরে তথায় উপস্থিত ছিলাম। স্বহা, স্বধা, সাবিত্রী, গায়ত্রীকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলাম। তাঁদের দুহিতা বৃন্দের হস্তে আমি স্বহস্ত দ্বারা দোহন ভাণ্ড দিয়া দুগ্ধ দোহন করাইয়াছি। তাই বলি বাপু বট্‌, ক্ষান্ত হও। চুপে চুপে ভয়ে ভয়ে করিলেও ঐ মহদ্বংশাবতংস মহৎ ব্যক্তিদিগকে "ম্লেচ্ছ ম্লেচ্ছ" বলে আর ঘৃণা করিও না। তা'তে তোমাদের মর্য্যাদাটাও বড় বেশি বাড়বে না। কেন না, তা হলে তোমরা নিজেও ম্লেচ্ছ জাতীয় বটে। তোমাদের আর্কফলার ভিতর যদি আর্য্যত্ব থাকে, তবে ওদের ঐ আলবার্ট টেড়ীর ভেতরেও সে বস্তুটা আজও থাকিতে পারে। একেই অধঃপাতে গিয়াছ। আরও বা-পু কেন যাও। আমি শব্দ কাকভুষণ্ডী। আমার সমুখে অতটা ভট্টাচার্য্যিগিরি ত ভাল দেখায় না। এখনি যে সব ভুর ভেঙ্গে দিতে পারি।"

ফলতঃ অতীতের অতীব সাঙ্ঘাতিক সাক্ষী শব্দ এবং ধাতু এবং ধ্বনি। বৃদ্ধ ব্যাকরণ, বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষার বক্ষে এবং কক্ষে, আজও ইহাদের একতা রক্ষা করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জাতির আদিম এক জাতীয়তা স্পষ্ট প্রতিপন্ন ও প্রত্যক্ষ করিয়া দিতেছে।

অপিচ, শব্দ এবং কর্ম্ম, একই প্রবাহে প্রবাহিত,—একই অর্থবোধক ; উভয়ই এক ,—দুই নহে। যে কর্ম্ম-বোধক শব্দ নাই, সে কার্য্যই নাই ;—সে কর্ম্ম কৃত হয় নাই ; অকৃতই রহিয়াছে। শব্দ ব্যতীত ক্রিয়া নাস্তি, ভাব নাস্তি, ভাবনা নাস্তি। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সংযোগ সাধনার্থে কার্য্য অপেক্ষা শব্দই অধিকতর শক্তিশালী, অধিকতর সক্ষম। কর্ম্ম ধ্বংস হইবার পরেও কার্য্যের চিহ্ন মাত্র না থাকিবার পরেও শব্দ থাকিতেও পারে।—

শব্দ সঙ্কেত মাত্র নহে। শব্দের শক্তি অপরিমেয়। শব্দ স্বভাবের সজীব আলেখ্য। আর্য্য ঋষি যথার্থই বলিয়াছেন, শব্দ ব্রহ্ম ;—ওঙ্কার রূপে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

শব্দ—শব্দাভিধান, সভ্য জাতির সমগ্র অনুশীলনের লিপি-চিত্র। সাহিত্য তাহার এক বিরাট রেজিষ্টার।

ভারতীয় আর্য্য জাতির এখন আর কিছুই নাই। শৌর্য্য বীর্য্য রাজ্য নাই, কার্য্য নাই, কীর্ত্তি নাই—কিছুই নাই। তথাচ তাহারা মনুষ্য সমাজে হেয় নহে। তাহার কারণ এই যে, তাহাদের সাহিত্য আছে। পূর্ব্ব পিতামহগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট, সঙ্কলিত, বহু-পূর্ব্ব সঞ্চিত সাহিত্যই, আজ জগতে, পরিচয় দিয়া দিতেছে যে, আমরা মনুষ্য-সন্তান আর্য্য সন্তান। নহিলে লোকে এত দিন-আমাদিগকে পশু পর্য্যায়েই গণনা করিত।

অতঃপর বিবেচনা করুন, প্রভৃত প্রস্তাবে ভাষার কোন অবস্থা সাহিত্য।

যে অবস্থায় ভাষা,অপেক্ষাকৃত অধিকতর পূর্ণতা প্রাপ্তা ;—যে অবস্থায় ভাষা স্বাভাবিক সরলতায় ও শিল্পজাত অলঙ্কারে ভূষিত, শব্দ-সম্পদ ভাব বৈভবের অধিকারিণী,—যে অবস্থায় ভাষা, প্রকৃতির রত্ন-ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিয়া, নানা জাতীয় মণি-রত্নে, অঙ্গে অঙ্গে, শোভাশালিনী ; পুনশ্চ যে অবস্থায় ভাষা বেদ, বেদাঙ্গ, ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, বিবিধ বিজ্ঞান, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, নাটক, প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার ও সৌন্দর্য্য-কলার জননী,—সত্যের, তথ্যের, কার্য্যের এবং কল্পনার নিবাস ভূমি ; ভাষার সেই অবস্থা বা অবস্থা সমষ্টিকে—সেই সৌর্য্য,বীর্য্য, ও ঐশ্বর্য্য সমষ্টিকেই, সাহিত্য বলে ;—প্রকৃত প্রস্তাবে এবং সাধারণ ভাবে, ভাষার সেই বিবিধ ও বিচিত্র সম্পদ সমষ্টিই সাহিত্য। ভাষা সাহিত্যে পরিণত হওয়া সময় সাপেক্ষ—বহু উন্নতি, বহুকালের শান্তি,বহু বহু সংগ্রাম, আলোড়ন বিলোড়ন, বহু বিপ্লব বিপর্য্যয়, বহু যুগব্যাপিনী, বহুপুরুষব্যাপিনী, সভ্যতা ও স্বাধীনতা সাপেক্ষ,—অনুশীলন ও তপস্যা-সাপেক্ষ। ধীরে ধীরে বহুকালের ও বহু স্তরের বিবর্ত্তনে, জগতে সর্ব্বাঙ্গীন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যের বংশ পরম্পরার, জাতি প্রবাহের ধারাবাহিক যত্ন, চেষ্টা, উদ্যম, বুদ্ধি বৃত্তি, চিন্তা-শক্তি, কল্পনা, কার্য্যপরায়ণতা, আশা, নিরাশা, আবেগ অবসাদ, সুখ দুঃখ, পুরুষার্থ বীরত্ব, ভীরুতা, লঘুত্ব, বৈভব বিলাস, দুর্ব্বলতা, কুটিলতা, নীতি-নিষ্ঠা, নৈতিক পতন, সরলতা ও সাধুতা ও প্রেম,সংযম এবং অসংযম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, উত্থান এবং পতন—ভাল মন্দ যত কিছু সমস্তই,তাহার সাহিত্যে। এবং এই সকলের শক্তি ও আসক্তি দ্বারা সাহিত্য গঠিত—এই সকলের সামাজিক, নৈতিক, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব সমষ্টি হইতে, সাহিত্য উদ্ভূত ;—সাহিত্যের এবং ভাষার বিস্তীর্ণ বিরাট অট্টালিকা স্তরে স্তরে উত্থিত। অন্তঃ প্রকৃতি ও বহিঃ প্রকৃতি সম্বন্ধে, মনুষ্য যে কিছু জ্ঞান লাভ করে—করিতে পারিয়াছে, তাহার সাহিত্যই তাহা প্রকাশ করে। এবং সেই সাহিত্য হইতেই সে জ্ঞানের প্রচার ও বিস্তার হয় এবং নিরাকরণ হয়। সাহিত্য ও ভাষা নির্জ্জীব জড় পদার্থ নহে ;—কৌশলের ও নৈপুণ্যের নির্ম্মিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন রাশিও নহে। সাহিত্য ও ভাষা স্বভাবের সজীব শক্তি ;—সজীব দেহের সচল যন্ত্রবৎ উহারা গঠিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং সর্ব্বথা সজীব ভাবেই কার্য্য করে।

মনুষ্য, অবিশ্রান্ত ভাবে,প্রকৃতির সাহিত্য-সংগ্রামে নিযুক্ত, সেই সংগ্রামের ফল সাহিত্য। মনুষ্য, অবিরত প্রকৃতির সেবায় নিযুক্ত, সেই সেবার ফল সাহিত্য। মনুষ্য অবিশ্রান্ত ভাবে প্রকৃতির উপাসনায় ও অনুকরণে নিযুক্ত, সে উপাসনা ও অনুকরণের ফল সাহিত্য। সাহিত্য, মনুষ্য জাতির মানস-বিকাশ ;—মানস-বিকাশের ইতিহাস ;—চিন্তা-প্রবাহের বিরাট সমষ্টি ;—ভাব-বৈচিত্র্যের বিরাট অট্টালিকা। সাহিত্য, জড় প্রকৃতির সহিত জড় প্রকৃতির এবং জীব প্রকৃতির সহিত জীব প্রকৃতির এবং জড় প্রকৃতির সহিত জীব প্রকৃতির সংঘর্ষের, সম্বন্ধের ও সম্মিলনের জীবন্ত বাক্য-চিত্র ;—সাহিত্য উভয় প্রকৃতির সজীব সপ্রকাশ-কাহিনী।

ইহা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ, বিশাল সর্ব্বদিকস্পর্শী সাধারণ অধিকার। শ্রুতি স্মৃতি,

সংহিতা পুরাণ, ধর্ম্মতত্ত্ব, বিবিধ দর্শন ও বিজ্ঞান, ইতিহাস, উপাখ্যান, কাব্য নাটক এবং সুকুমার শিল্প কলা ইত্যাদি সমস্ত ও যাবতীয় রচনারাশি সাহিত্যের এই সাধারণ অধিকার ভুক্ত।

সাহিত্যের এই সাধারণ অধিকার, উহার বিশেষ বিশেষ অধিকারের সমষ্টি ও বিশেষ বিশেষ অধিকারের এক সুমহান সুবিশাল কেন্দ্রভূমি। বিশেষ বিশেষ অধিকারের মধ্যে, সাহিত্যের এক সবিশেষ অধিকার সূচিত আছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণের নির্দ্ধারণে, তথা পরবর্ত্তী সমালোচকগণের শ্রেণী-নির্ব্বাচনে, সাহিত্যের সবিশেষ ও সুনির্দ্দিষ্ট অধিকার কাব্য কবিতা নাটকাদি নানাবিধ বিচিত্র রস সৃজিনী ও হৃদয়স্পর্শিনী কমনীয়া বিদ্যায়। এই বিদ্যাই সচরাচর সাহিত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং ইহারই সরস ক্ষেত্রে আর্য্য আলঙ্কারিকগণের ন্যায় ইদানীন্তন প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য পাহিত্য-সমালোচকগণ বিচরণ করিয়া থাকেন।

সাহিত্যের এই সবিশেষ ও সুনির্দ্দিষ্ট অধিকারও এক সুবৃহৎ রাজ্য। এই রাজ্য আদৌ অসীম। ইহার ব্যাস পরিধি, ইহার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ এবং গভীরত্ব অপরিমেয়। এই রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য্য—ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্য, শিল্পের সান্ত ও সাময়িক নিয়মাবলী দ্বারা, শৃঙ্খলিত ও শাসিত হইলেও, তাহার স্বাভাবিক সীমান্ত রেখা, অনন্তের সহিত সংমিশ্রিত। সমগ্র জীব ও জড় জগৎ ও অন্তঃজগতের এবং তদতিরিক্ত ও তদাদর্শে পবিকল্পিত কবি ও শিল্পী-সৃষ্ট অভিনব কাব্য-জগত নিচয়ের, বিবিধ ও বহুল ও বিপুল ভঙ্গিপুঞ্জ, বর্ণরাগ, লাবণ্য-সম্ভার—তাহাদের শরভাগ সমস্তই; —রস বৈভব ও ছন্দ, সুগন্ধ ও স্বর সম্পদ সমস্তই, এই রাজ্যের অধিকারাধীন। মনুষ্য-হৃদয়ের অগণিত ও অসংখ্য ভাব-প্রবাহে, চিন্তার উত্তাল তরঙ্গ-রঙ্গে, অনুভবের ঘাত-প্রতিঘাত-পারাবারে, তথা, কল্পনার কমনীয়, কান্ত, অকৃত্রিম নীলোজ্জ্বল অম্বরে, সাহিত্যের এই স্বচ্ছ, সুবর্ণ রশ্মি-রাগ-রঞ্জিত, সুললিত রমণীয় রাজ্য উদ্ভাসিত ও অভিব্যক্ত।

সাহিত্যের এই সবিশেষ বিভাগ পুনঃ বহু বিশিষ্ট ভাগে বিভক্ত। তাহাদেরও প্রত্যেক বিভাগ আবার এক একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য;—মনুষ্যের মানস-কুসুম-সৌরভের অত্যুন্নত অমর কীর্ত্তি-স্তম্ভে বিখচিত। সভ্যতার যুগে যুগে, মনুষ্য জাতির মানসিক বিকাশে ও বিবর্ত্তনে, সাহিত্যের এই সকল খণ্ড রাজ্যের বিপুল বিস্তার হইয়া, সমগ্র সাম্রাজ্য পরিবর্দ্ধিত ও প্রতাপান্বিত করিতেছে। যুগে যুগে, যুগ-শক্তি-প্রভাবে, নবীন প্রতিভায়, নব উপাদানে, সাহিত্যের স্বাধীন, সাধারণ তন্ত্র, যুক্ত রাজ্যে নূতন নূতন স্বারস্বত মন্দির পুনঃ পুনঃ উত্থিত, গঠিত, সজ্জিত হইয়া সমগ্র সাম্রাজ্যের রাজৈশ্বর্য্য, গৌরবশ্রী, অধিক হইতে অধিকতর, উচ্চ হইতে উচ্চতর অগ্রসর করিতেছে। উন্নতির ইয়ত্তা নাই,—অন্ত হইবে না। উন্নতি অনন্তের পথে, অবিরত চলিতেছে—চলিয়া আসিয়াছে—চলিবে। পথে চলিতে চলিতে, কত জাতি পতিত হইতেছেন, পরিম্লান হইতেছেন; আবার কত জাতি উত্থিত ও উৎকর্ষিত হইয়া উন্নতির পুরাতন পথে বা স্ব স্ব খাদিত নূতন পথে চলিতে চলিতে, স্ব স্ব সৃষ্ট ও উপার্জ্জিত বৈভব রাশি দ্বারা

সাহিত্যের সাবারণ তন্ত্র সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন।

জগতের পুরাতন এবং নূতন বহু দেশ, বহু জাতি, বহু প্রণালী প্রকৃতি ও পন্থা দ্বারা এবং বহু ভিন্ন ভিন্ন ভাষা দ্বারা সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র সাম্রাজ্য সংগঠিত ও সংযুক্ত। এই সংগঠন ও সংযোজন স্বভাবের স্বহস্ত-নিয়ন্ত্রিত জাতি নিচয়ের বা ব্যক্তি ও লোকবর্গের নির্ব্বাচনের ফল নহে—এই সাধারণ তন্ত্র। ইহা যদি নির্ব্বাচন-সম্ভূত হয়, তবে তাহা আদৌ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। অতএব, রাজনৈতিক ও প্রজা-নৈতিক সাধারণ তন্ত্রের সহিত, সাহিত্যের সাধারণ-তন্ত্র, আদৌ তুলনীয় নহে। তাহা হইতে,ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাহা অপেক্ষা ইহা সমূহ সমুন্নত। সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ সম্মুক্ত স্বাধীনতা। প্রতিপদ বিক্ষেপে, পরাধীন পার্থিব মৃত্তিকার উপরে,যদি আদৌ কোথায়ও পূর্ণ,অবাধ,অথচ সুনিয়ন্ত্রিত প্রকৃত স্বাধীনতা থাকে, তবে তাহা আছে—পরিপূর্ণভাবে আছে কেবল সাহিত্যের এই সাধারণ তন্ত্র সাম্রাজ্যে। স্বাধীনতা এবং সম অধিকাব এবং সার্ব্বজনিকতা কেবল এই খানেই সম্পূর্ণ ও সুতীক্ষ্ণ স্বানুবর্ত্তিতার সহিত সংমিলিত।

এই সুন্দর,সুপবিত্র সাধারণতন্ত্র স্বারস্বত রাজ্যে, স্বাধীনতা সনাতন ধর্ম্ম, স্বানুবর্ত্তিতা মূলধন এবং সম অধিকার অবাধ রাজ্যবিধি। এ রাজ্যে, স্বানুবর্ত্তিতার ও অনন্যতন্ত্রতার সমধিক সম্মান অথচ তদুৎপাদিত দ্রব্যজাতে —দ্রব্যজাতের সার ও শরভাগে, সকলেরই সমান অধিকার। সে অধিকার,অতীব উন্নত আধ্যাত্মিক অধিকার, যাহার অপেক্ষা সুদৃঢ় অবিসংবাদিত ও অবিচ্ছেদ্য সত্বাধিকার মনুষ্য জীবনের আর কোনও অংশে আর কোনও আইনেই বিদ্যমান নাই, কখনও পরিকল্পিতও হয় নাই।

সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র রাজ্যে, স্বানুবর্ত্তিতা, কার্য্য করে, সর্ব্ব সাধারণেরই সেবার্থে, সাম্রাজ্যের সাধারণ রাজকোষেরই বৈভব বৃদ্ধির উদ্দেশে। অতএব, অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় এরাজ্যে, স্বানুবর্ত্তিতার সার্ব্বজনিকতায় কখনও সংঘর্ষ ও সংক্ষোভ উপস্থিত হয় না। প্রত্যুত, স্বানুবর্ত্তিতা সার্ব্বজনিকতার জন্যই জীবিত থাকে। তাহারই শ্রদ্ধাদি প্রণোদিত হইয়া বা উৎসাহাদি উত্তেজিত হইয়া বা তাহারই অভাব আবশ্যকাদির অনুভব করিয়া, স্বানুবর্ত্তিতা, উদ্যমশীলা ও কার্য্যশীলা হয় এবং তদ্দ্বারা প্রতিভার পরিপুষ্টি ও বিকাশ করে। অন্য ক্ষেত্রে, স্বানুবর্ত্তিতা সংকীর্ণা ও স্বার্থপরায়ণা হইতে পারে; কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে, উহা স্বভাবতঃ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাহিত্যের সাম্রাজ্যে, স্বানুবর্ত্তিতা উদার ও পরার্থপরায়ণা। সাহিত্য-রাজ্যে স্বানুবর্ত্তিতার সোপার্জ্জিত ধন উৎপন্ন হইবা মাত্রই তাহা সর্ব্ব সাধারণের, সর্ব্বজনের ও সর্ব্ব ভূমির হয়। স্বারস্বত রাজ্যের ব্যবস্থাই এই,—সনাতনাগত নিয়মই এই; স্বাভাবিক লক্ষণই এই। রাজনীতির বা বাণিজ্য নীতির সংকীর্ণতার বশবর্ত্তী হইয়া তুমি শর্কর বা শরাপ সংরক্ষণ আইনের ন্যায়, সাহিত্য বিকার সংরক্ষণ আইন, বিধিবদ্ধ করিতে পার এবং সেই বাণিজ্য নৈতিক বিধির বলে সাহিত্যকে বাণিজ্য পণ্যে পরিণত করিয়া সাহিত্য শুল্ক সংস্থাপন করিতে পার। কিন্তু, সাহিত্য আদৌ বাণিজ্য পণ্য নহে,

স্বভাবতই বাণিজ্য পণ্য হইতে পারেনা। সাহিত্য-নীতি তোমার বাণিজ্য বিধিকে উপেক্ষা করে, অন্তরের সহিত অশ্রদ্ধা করে। সাহিত্য, তোমার অবৈধ বিধিবদ্ধ শুল্ক সত্বেও, স্বকীয় স্বাভাবিক স্বরূপে ও শক্তিতে সাধারণের সম্পত্তি হয়। সে সম্পত্তির সুমহৎ ও সুন্দর সত্বা চিত্তের চিরানন্দ, চিত্তশুদ্ধির অনুপম উপকরণ, আত্মার অবিরাম উপভোগ্য এবং সচ্চিদানন্দের সামীপ্যানুভবের মধুর উত্তেজক। সাহিত্য সৌন্দর্য্য, সর্ব্ব সৌন্দর্য্যেশ্বর সুন্দর ঈশ্বরের এক অনির্ব্বচনীয় প্রসাদ।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

নারীজাতির উচ্চ শিক্ষা।

এক সময়ে এদেশের লোক স্ত্রীশিক্ষার অতিশয় বিরোধী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার নামে খড়্গহস্ত হইতেন। স্ত্রীশিক্ষা সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া সর্ব্বত্র গণ্য হইত। প্রথম যখন বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বালিকা পাওয়া সুকঠিন হইয়াছিল। হিন্দু দলপতিগণের মধ্যে অনেকে বলিয়াছিলেন যে,যে ব্যক্তি বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করিবে, তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। বংশবাটী (বাঁশ বেড়িয়া) নিবাসী স্বর্গীয় হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং বিল্বগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় সাহস পূর্ব্বক প্রথমে বেথুন বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় এই জন্য নিজ গ্রামে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন।

এখন সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি নিজে বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে লোকের ঘোরতর বিরুদ্ধ ভাব ছিল। যে পরিবারে আমার জন্ম, সেখানে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এখন স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লোকের বিরুদ্ধ ভাব যে একেবারে গিয়াছে, এমন নহে; তবে অনেক পরিমাণে পথ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

বালিকাদের সামান্য শিক্ষায় অনেকের এখন মত হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষার নামে এখনও অনেকের গায়ে জ্বর আসে। এখনও অনেক শিক্ষিত লোক পর্য্যন্ত উহার আবশ্যকতা দেখেন না। বঙ্কিম বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, পুত্র এম, এ, পাস করিতে না পারিলে, যিনি বিষ খাইয়া মরিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার কন্যা কথামালা পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই তিনি যথেষ্ট মনে করেন।

নারীজাতির উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি শুনা যায়। তন্মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান আপত্তির সমালোচন করা যাউক।

প্রথম আপত্তি এই যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের শক্তির অনেক প্রভেদ। পুরুষ যাহা পারে, স্ত্রীলোক কি তাহাই পারে? একথার উত্তর এই, কেমন করিয়া জানিলে যে, পুরুষ যাহা পারে, স্ত্রীলোক তাহা পারে না? বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারেন যে, ফল দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, পুরুষ যাহা পারে, স্ত্রীলোক তাহা পারে না। সমগ্র মানবজাতির ইতিবৃত্ত কি সাক্ষ্য দিতেছে? শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন সকল বিভাগে পুরুষের কার্য্যের সহিত স্ত্রীলোকের কার্য্যের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তুলনায় স্ত্রীলোকের কার্য্য অতি সামান্য।

কিন্তু এ কথার উত্তর আছে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিকে সুশিক্ষা সম্বন্ধে কখন কি সমান অধিকার ও সুবিধা দেওয়া হইয়াছে?- প্রাচীন কি আধুনিক, কোন কালেই নহে। তথাচ দেখ, প্রাচীন কালে, ইয়োরোপে, স্যাফো প্রভৃতি। বর্ত্তমান কালে, শ্রীমতী সমরভিল্, কুমারী মার্টিনো, কুমারী কব, জর্জ্জ ইলিয়ট, অর্থাৎ শ্রীমতী লুইস্, জোয়ান অব আর্ক, শ্রীমতী ষ্টো, শ্রীমতী ফসেট প্রভৃতি ইয়োরোপীয় মহিলা, তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও শক্তির প্রভাবে সুসভ্য জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাহার পর স্ত্রীলোক এম, এ, এম, ডি তো সভ্য জগতে আজ কাল ছড়াছড়ি যাইতেছে। স্ত্রীলোক যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিয়াছে। জোয়ান অব আর্কের নাম করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গ্যারিবলডির সহধর্ম্মিনী, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতেন।

এ সকল ইয়োরোপীয় স্ত্রীলোক। আমাদের দেশেও প্রতিভাশালিনী ও অসাধারণ গুণসম্পন্না নারীর দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। অতি প্রাচীন কালে অত্রি বংশীয়া বিশ্ববারা ঋগ্বেদের একটি সূক্তের রচয়িত্রী। "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং এয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" এই বচনটী অবলম্বন করিয়া যাঁহারা মনে করেন যে, স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই, তাঁহাদের জানা উচিত যে, বেদের একটী বিশেষ অংশের রচয়িত্রী একটী স্ত্রীলোক। এতদ্ভিন্ন,খনা, লীলাবতী, অহল্যা বাই,রাণীভবানী, মীরা বাই,তরুদত্ত প্রভৃতি প্রতিভাশালিনী ও অসাধারণ সদ্‌গুণসম্পন্না নারী এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দুর্গাবতী এবং ঝান্‌সির রাণী যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। হটু বিদ্যালঙ্কারের কথা অনেকেই জানেন। ইনি বীরভূম জিলার কোন অধ্যাপকের কন্যা। পিতার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ করিয়া সুপণ্ডিতা হইয়াছিলেন। পরে কাশীতে গিয়া চতুষ্পাঠী খুলিয়া তথায় ছাত্র পড়াইতেন। ক্রিয়াকাণ্ডে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের সাহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিতেন ও 'বিদায়' পাইতেন।

স্ত্রী ও পুরুষের শক্তি সমান কি না, সে বিষয়ে পণ্ডিত লোকের মধ্যেও মতভেদ আছে। মিল্ বলেন, স্ত্রীলোকের বুদ্ধিশক্তি যে পুরুষ অপেক্ষা অল্প, তাহার কোন প্রমাণ নাই। তবে যে পুরুষ অধিকতর উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, শিক্ষা সম্বন্ধে কি প্রাচীন, কি বর্ত্তমান কালে, পুরুষজাতি যেরূপ অধিকার ও সুবিধা পাইয়া আসিয়াছে, স্ত্রীজাতি সেরূপ কখনই পায় নাই। কিন্তু অনেক বড় বড় পণ্ডিতের মত অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, হৃদয় সম্বন্ধে, কোমল ভাব নিচয় সম্বন্ধে, স্ত্রীজাতি শ্রেষ্ঠ হইলেও, বিচারশক্তি বিষয়ে সাধারণতঃ পুরুষ শ্রেষ্ঠ। মার্কিন দেশীয় একজন মহাজ্ঞানী বলেন যে, বিশেষ বিশেষ শক্তি সম্বন্ধে স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতির মধ্যে প্রভেদ আছে। হৃদয়ের ভাব নিচয় ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিষয়ে সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিচারশক্তি সম্বন্ধে সাধারণতঃ পুরুষজাতি শ্রেষ্ঠ। স্ত্রী জাতি ও পুরুষজাতির মধ্যে বুদ্ধি ও হৃদয়গত পার্থক্য থাকিলেও, 'হরে দরে হাঁটু জল'; অর্থাৎ গড়ের উপর সমান, ইহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়!

যাহা হউক, স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির মধ্যে বুদ্ধি শক্তি সম্বন্ধে তারতম্য আছে কি না, সে বিষয় লইয়া এস্থলে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক, যদি পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির বুদ্ধি সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অল্প হয়, তজ্জন্য কি তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখা কর্ত্তব্য? স্ত্রীজাতির মধ্যে অনেকে জ্ঞানের উচ্চ শেখরে আরোহণ করিয়া আপনাদের উচ্চ শিক্ষার অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছেন।

নারীজাতিকে উচ্চশিক্ষার অধিকার দেও, যিনি যতদূর পারেন, জ্ঞানের পথে অগ্রসর হউন। পুরুষের মধ্যে সকলেই কি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারে? কেহ কেহ যে পাঁচবারেও এণ্ট্রান্সটা পাস করিতে পারে না! স্ত্রীলোকে সকলেই যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে, এরূপ বলিতেছি না। অধিকার দেও, যিনি যতদূর পারেন, শিক্ষালাভ করুন।

ইহারই নাম সাম্যবাদ। অধিকার দেও, যে যতদূর পারে, করিয়া লউক। সাম্যবাদ অর্থ ইহা নহে যে, সকলে ঠিক্ সমান হইবে। বড় ছোট থাকিবে না, এরূপ কখন হইতে পারে না। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, শক্তিশালী, অশক্ত, ইত্যাদি প্রভেদ জগতে চিরকালই আছে, চিরকালই থাকিবে। এরণ্ড বৃক্ষ ও বটবৃক্ষ কখন সমান হয় না।

সাম্যবাদের অর্থ সমান হওয়া নয়, সমান অধিকার। সাম্যবাদ আর কিছুই নহে, উহা বাস্তবিক ন্যায়বাদ। ন্যায় কি বলে? সকলকে সমান অধিকার দেও, যে যতদূর পারে, করিয়া লউক,—কাহাকেও বলপূর্ব্বক বঞ্চিত করিও না। ইহাই ন্যায়ের আদেশ।

একথা বলিওনা যে, শ্রীজাতির বুদ্ধি নাই, অতএব তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষার অধিকার নাই। যখন অধিকার দেওয়া হয় নাই, তাঁহারা উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত ছিলেন। যখন অধিকার দেওয়া হইল, তাঁহারা কার্য্যের দ্বারা দেখাইলেন যে, তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং এই প্রথম আপত্তি যে সম্পূর্ণ অযুক্ত, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, উচ্চশিক্ষাদ্বারা নারীজাতীর স্বভাবতঃ কোমল হৃদয় কঠিন হইয়া যায়। একথা অমূলক। জ্ঞান, হৃদয়কে নষ্ট করে না, হৃদয়কে উন্নত করে। জগতের সকল জ্ঞানীগণ একথার সাক্ষ্য দান করিতেছেন। জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের স্বাভাবিক যোগ। ভাব, জ্ঞানকে মধুময় করে। আবার জ্ঞান, ভাবকে বর্দ্ধিত করে, উন্নত ও নির্ম্মল করে। জ্ঞান দ্বারা হৃদয় নষ্ট হয়, ইহা অমূলক কথা।

জ্ঞান কাহাকে বলে? সত্যের ধারণা। জ্ঞান বলিলে যখন সত্যের ধারণা বুঝায়, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, জ্ঞানদ্বারা হৃদয় নষ্ট হয়? সত্য কি হৃদয়কে নষ্ট করে? জ্ঞানী মাত্রেই বলিবেন যে, সত্য হৃদয়কে কোমল, প্রশস্ত, গভীর ও উন্নত করে।

এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, প্রকৃত জ্ঞান হৃদয়কে উন্নত করে বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, উহাতে কি প্রকৃত জ্ঞান হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে কি হৃদয়কে উন্নত করে? কয়েকটি পরীক্ষায় পাস করিয়া দিবার জন্য যে বিদ্যা গিলাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে কি প্রকৃত শিক্ষা হয়?

কেবল গিলাইয়া দিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, হৃদয়ের উন্নতি হয় না, একথা সত্য। কিন্তু সেই জন্য কি করিতে হইবে? শিক্ষা প্রণালী ভাল করা আবশ্যক। যাহাতে গিলাইয়া দেওয়া না হয়, যাহাতে ছাত্র ও ছাত্রীগণ চিবাইয়া খাইতে শিখে, এবং যাহা খায়, তাহা পরিপাক হয়, এরূপ সুব্যবস্থা করা বিধেয়।

কিন্তু স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়ের পক্ষে এ কথা কি সমভাবে খাটিতেছে না? শিক্ষা প্রণালীর দোষ আছে বলিয়া, যদি বল যে, স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা চাই না, তবে সেই কারণে কেন বলনা যে, পুরুষেরও উচ্চশিক্ষা উঠিয়া যাউক। আমাদের স্কুল ও কালেজে, যে পরিমাণে শিক্ষা প্রণালীর দোষ আছে, সেই পরিমাণে উহার মন্দ ফল স্ত্রীজাতির পক্ষেও যেমন, পুরুষজাতির পক্ষেও সেই রূপ।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, শিক্ষা প্রণালীর দোষ থাকিলেও পুরুষের উচ্চশিক্ষা বন্ধ হইতে পারে না। কেননা পুরুষ চাকুরি করিয়া টাকা আনিবে, স্ত্রীলোক তো চাকুরী করিবে না?

কে বলিল স্ত্রীলোক চাকুরি করিবে না? আর সেকাল নাই। অনেক দিন হইতে তো স্ত্রীলোক চাকুরী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইয়োরোপ, আমেরিকার তো কথাই নাই। আমাদের দেশেও স্ত্রীলোক চাকুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীলোক মাষ্টার, স্ত্রীলোক ডাক্তার, এখন আর ভবিষ্যতের বিষয় নহে। স্ত্রীশিক্ষা যতই বৃদ্ধি পাইবে, স্ত্রীলোকের চাকুরির সংখ্যা ততই দিন দিন বাড়িতে থাকিবে।

কেবল চাকুরি কেন? উচ্চশিক্ষা, সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, শিল্প সাহিত্যের সাহায্যে স্ত্রীলোক নানা প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। ইয়োরোপ, আমেরিকায় তাহাই হইয়াছে। আমাদের দেশেও ইহা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে দোষ থাকিলেও, ইহাতে উপকার হইতেছে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ উভয় জাতির পক্ষেই উপকার হইতেছে।

প্রণালীর দোষ থাকে, সংশোধন কর। দোষ আছে বলিয়া একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় কেহ কি ত্যাগ করে? আহারের দোষে অনেক সময় উদরাময় উপস্থিত হয়। সেই জন্য, কে আহার বন্ধ করিয়া দেয়? কে আহার না করিয়া করিতে যায়? যাহাতে পীড়া না হয়, এমন আহার কর।

আর এক কথা। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে স্ত্রীজাতির হৃদয়ের বিশেষ উন্নতি হইতেছে না, ইহা এক কথা, আর হৃদয় বিকৃত হইয়া যাইতেছে, ইহা আর এককথা। যে সকল মহিলা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় যে, বিকৃত হইয়া যাইতেছে, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। একথা সম্পূর্ণ অমূলক। যে সকল মহিলা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককে আমি জানি। সেই জন্য বলিতে পারি যে, উচ্চশিক্ষাদ্বারা যে, তাঁহাদের স্ত্রীজাতিসুলভ হৃদয়ের অবনতি হইয়াছে, এ কথার কোন মূল নাই। তবে আমাদের দেশের অনেক স্ত্রীলোকের এমন এক প্রকার অতিরিক্ত কোমলতা আছে, যাহা কখনই প্রার্থনীয় নহে। সেরূপ কোমলতায় মানুষকে অপদার্থ করিয়া ফেলে। উহা এক প্রকার দুর্ব্বলতা।

স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে আর

এক আপত্তি এই যে, উচ্চশিক্ষা পাইলে তাঁহাদের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়। বাস্তবিক তাঁহাদের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয় কি না, সে কথার বিবেচনা পরে করিব। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, এমন এক সময় কি ছিল না, যখন উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া পুরুষজাতির মধ্যে অনেকে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিতেন? প্রথম, প্রথম, যাঁহারা কোন একটা উচ্চ উপাধি বা উচ্চপদ লাভ করেন, সংখ্যায় অল্প বলিয়া, তখন তাঁহাদের মধ্যে কাহার মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ এমন মনে হইতে রারে, "আমি কি হইলাম গো!" স্ত্রীলোক কি পুরুষ, উভয় জাতি সম্বন্ধেই কাহার কাহার পক্ষে, ইহা সম্ভব হইতে পারে। প্রথম, প্রথম বি, এ, এম, এ, উপাধি লাভ করিলে কাহারও কাহারও ঐ প্রকার মনের ভাব হওয়া সম্ভব। শেষে যখন বি, এ, এম, এর ছড়াছড়ি হয়, তখন আর ঐ প্রকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। যেখানে সেখানে বি, এ, এম, এ পাওয়া গেলে, ২৫।৩০ টাকায় বি, এ; এম,এ পাওয়া গেলে, বি,এ; এম,এ; উপাধি পাইয়াছি বলিয়া কে অহঙ্কার করিতে পারে? প্রথম, প্রথম যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহার কাহারও লাঙ্গুল স্ফীত হইয়া গগনমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছিল।

এখন যে সকল উপাধিধারিণী স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহারা কি তাঁহাদের উপাধির জন্য অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছেন? এরূপ কথা কখনই বলিতে পারি না। সকলের সহিত আমার পরিচয় নাই। কিন্তু যাঁহাদের সহিত পরিচয় আছে, তাঁহাদের সরল ও নিরহঙ্কার ভাব দেখিয়া আমি অনেক সময় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। যাঁহাদের সহিত পরিচয় নাই, তাঁহাদের বিষয়ও বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, তাঁহাদের প্রকৃতি সরল ও বিনীত। যদি এমন কেহ থাকেন, যিনি উপাধি লাভ করিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছেন, তাহা হইলে উহা উপাধিলাভের দোষ নহে। যে স্ত্রীলোক বি এ, এম, এ, পাশ করিয়া ফুলিয়া উঠেন, তিনি মূর্খ থাকিলে হয় তো ভাল চড়্‌চড়ি রন্ধন করিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেন। উহা স্বভাবের দোষ, উচ্চশিক্ষার দোষ নহে।

স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে আর একটী আপত্তি এই যে, উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলে স্ত্রীলোক গৃহকর্ম্মের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। একথা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথমতঃ যাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত, জ্ঞান উন্নত, তিনি সংসারের বিষয় যেমন বুঝিবেন, অশিক্ষিতা, অবোধ নারী কি কখন তেমন বুঝিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ শিক্ষিতা নারীগণ যে সংসারের কার্য্যে অপটু, প্রত্যক্ষ একথার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিতেছে। এমন হইতে পারে, কেহ কেহ সংসারের কার্য্যে উদাসীন। কিন্তু তাহা তাঁহাদের শিক্ষার দোষ নহে, নিজের দোষ। অনেক অশিক্ষিতা নারীও তো অলস ও সাংসারিক কার্য্যে উদাসীন। তাহাদের ঐ প্রকার স্বভাব কেন হইল?

কোন কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ হইতে পারে যে, বিদ্যাচর্চ্চা এত ভাল লাগে যে, সেই জন্য সংসারের কাজ কর্ম্ম ভাল লাগেনা। ইহা যদি লেখাপড়ার দোষ হয়, তবে এরূপ দোষ কেবল লেখাপড়ারই আছে, এমন নহে, সকল ভাল বিষয়েরই এ দোষ আছে। ধর্ম্মচর্চ্চা, পরমেশ্বরের ভজন সাধনেও এ

দোষ আছে। স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয় জাতির মধ্যে এমন মানুষ দেখিয়াছি যে, ধর্ম্মচর্চ্চা, পরমেশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি তাঁহাদের এত ভাল লাগে যে, জগতের কাজকর্ম্ম ভাল লাগে না। এরূপ হওয়া ধর্ম্মচর্চ্চার দোষ নহে, মানুষের নিজের দোষ। যাঁহাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধির উপযুক্ত রূপ বিকাশ হয় নাই, যাঁহারা কেবল মনের আবেগে চলেন, তাঁহাদের এপ্রকার হইয়া থাকে।

আমি একবার এক জন বি, এ, উপাধিধারিণী শিক্ষিতা মহিলাকে বলিয়াছিলাম যে, লোকে বলে যে, যে সকল স্ত্রীলোক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে অপটু। উক্ত মহিলা উত্তর করিলেন, একথা অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে খাটে না। আমি সাংসারিক কার্য্য কি না করি, কিনা জানি? আমি মুড়ি ভাজিতে পর্য্যন্ত জানি।

যাঁহাদের অবস্থা ভাল, তাঁহাদিগকে যে নিজের হাতেই সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, এমন নহে। তাঁহারা সংসারের তত্ত্বাবধান করিবেন। কিন্তু যিনি সুশিক্ষিতা, যাঁহার বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে, তিনি সে কার্য্যের যেরূপ যোগ্য, একজন অশিক্ষিতা কিম্বা নিতান্ত সামান্য শিক্ষিতা নারী কি কখন সেরূপ হইতে পারে? অশিক্ষিতা অবোধ নারীদিগের দ্বারা কত অনিষ্ট হয়, তাহাদের বুদ্ধির দোষে কত অকল্যাণ ঘটে, কে তাহা না জানেন?

সন্তানপালন একটি অতি গুরুতর কার্য্য। ইহা কি মূর্খ নিরক্ষর ব্যক্তির কর্ম্ম? বিশেষতঃ মাতা সুশিক্ষিতা হইলে, সন্তানের শিক্ষা, মাতাদ্বারা যেমন সুসম্পন্ন হইতে পারে, এমন কি অন্য প্রকারে হওয়া সম্ভব? এই সন্তানপালন ও সন্তানদিগের শিক্ষা কি গৃহকর্ম্ম নহে?

অনেকের মনের ভাব এই যে, স্ত্রীলোকে সংসারের নিকৃষ্ট কার্য্য লইয়াই জীবন কাটাইবে। জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি প্রার্থনীয়? মানবজীবনের প্রধান কার্য্য জ্ঞান ও ধর্ম্মসাধন। সে বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে সাহায্য করা, যাহাতে তাঁহারা সাংসারিক কার্য্য করিয়াও জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার জন্য অবকাশ পান, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া কি পুরুষজাতির কর্ত্তব্য নহে?

যে সকল পুরুষকে বাহিরের কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয় না, গৃহকর্ম্মের ভার অধিক হইলে, তাঁহাদের উচিত স্ত্রীলোকদিগকে সাহায্য করা। অনেক সৎপুরুষ ইহা করিয়াও থাকেন। কিন্তু এমন অনেককে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের কিছুই করিবার নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া তাম্রকূট ফুঁকিতেছেন, তথাচ একগাছি কুটাও সরাইয়া দিতে প্রস্তুত নহেন।

স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রকৃতি ভিন্ন, কার্য্য ভিন্ন, জীবন ভিন্ন প্রকার। সুতরাং একরূপ শিক্ষা হইতে পারে না। স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয় জাতিই কেমন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইবে? উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র ভিন্ন অথবা ভিন্ন হওয়া উচিত। সুতরাং উভয় জাতির শিক্ষাও ভিন্নরূপ হওয়া আবশ্যক।

এ কথার উত্তর এই যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির কতক্ পরিমাণে ভিন্নতা অবশ্য আছে।

কিন্তু নরনারী উভয়েই মানুষ। স্ত্রীলোকেরাও মনুষ্য এ বিষয়ে বোধ হয়, উচ্চশিক্ষাবিরোধী মহাশয়গণের কোন সংশয় নাই। জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতিসাধন মনুষ্যজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। তবে স্ত্রীলোকেরা কেন উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত থাকিবে? স্ত্রীলোকের কি আত্মা নাই?

স্ত্রীলোকের বিষয়ে অনেকের এমনি একটা হীন ভাব আছে যে, সংসার সম্বন্ধে যেমন ঘটি, বাটি, কুলো, ধুচনি, প্রভৃতি, সেইরূপ স্ত্রীলোক। যেমন সংসার করিতে ঘটি চাই, বাটি চাই, কুলো চাই, ধুচনি চাই, সেইরূপ স্ত্রীলোক চাই। ঘটি চাই জল খাইতে, বাটি চাই দুগ্ধ প্রভৃতি পান করিতে, কুলো চাই চাউল প্রভৃতি ঝাড়িতে,ইত্যাদি। সেইরূপ, স্ত্রীলোক চাই রন্ধন করিতে, সংসারের বন্দোবস্ত করিতে, সন্তানপ্রসব ও পালন করিতে। ইত্যাদি। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কার্য্য কি কিছু নাই?

স্ত্রীলোকেরা যখন মানুষ, যখন তাঁহাদের আত্মা আছে, তখন জ্ঞানোপার্জ্জন,—রীতিমত জ্ঞানশিক্ষা, তাঁহাদের জীবনের অবশ্য প্রধান কার্য্য, পরমেশ্বরের অভিপ্রায়। তাহাতে বাধা দেওয়া কি পাপ নয়?

স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হউন বা না হউন, তাহাতে তত আসিয়া যায় না। কিন্তু এমন বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

তবে স্ত্রীলোক যদি উপাধিধারিণী হয়, তাহাতে এত আপত্তি কেন? স্ত্রীলোক উপাধিধারিণী হইলে একটা উপকার স্পষ্ট দেখিতে পাই। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি হইয়া অধিকতর উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। যদি কামিনী, সৌদামিনী, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিতে থাকেন, তাহা হইলে গোপাল,রাখাল, বিপিন,প্রভৃতি সে বিষয়ে অধিকতর উৎসাহী হইবার সম্ভাবনা। ভাই ভগিনীর মধ্যে, ভগিনী যদি উপাধিধারিণী হন, তাহা হইলে ভ্রাতার পক্ষে, উপাধি লাভের জন্য, অধিকতর উৎসাহী হইবার সম্ভাবনা। উহা না পাইলে লজ্জিত হইবার সম্ভাবনা।

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই মনুষ্য। সুতরাং উভয়েই উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী। সে বিষয়ে পার্থক্য করিলে চলিবে না। সে বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে বঞ্চিত করা অন্যায়। তবে প্রকৃতির প্রভেদ ও তন্নিবন্ধন জীবনের কার্য্যের প্রভেদ কতক্ পরিমাণে আছে। যে টুকু প্রভেদ, তদনুযায়ী শিক্ষার প্রভেদ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

কতকগুলি বিষয় আছে, যাহাতে জ্ঞান লাভ করিয়া পারদর্শী হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। ঐ সকল বিষয় স্ত্রীলোকের বিশেষ উপযোগী। যেমন, সন্তানপালন ও শিশুদিগের শিক্ষা,ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা, গৃহকর্ম্ম, রোগীর সেবা ইত্যাদি।

পুরুষছাত্রগণ সকলেই তো এক বিষয় শিক্ষা করেন না। জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিভাগে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। কেহ দর্শনশাস্ত্র, কেহ গণিত, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিভাগে শিক্ষা লাভ করেন। বিশেষ বিশেষ বিভাগে শিক্ষা লাভ করিয়া কেহ ডাক্তার, কেহ উকীল, কেহ ইঞ্জিনিয়ার, ইত্যাদি হইয়া থাকেন। সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও, তাঁহাদের উপযোগী

বিশেষ বিশেষ বিভাগে শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক।

কিন্তু উচ্চ জ্ঞান লাভে সকলেই অধিকারী। কোন স্ত্রীলোকের যদি জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকে, এবং তিনি উহা শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে, উহা উচ্চ জ্ঞান বলিয়া কি তাঁহাকে জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিখিতে দেওয়া হইবে না? খনা, লীলাবতী ও শ্রীমতী সমরভিলের স্বজাতীয়া যিনি, তাঁহাকে কি জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিখিতে দেওয়া হইবে না? সকলকেই অধিকার দেও। যাহার যেরূপ ক্ষমতা, সে সেইরূপ জ্ঞান লাভ করুক।

স্ত্রীলোকের সুশিক্ষার অভাবে এ দেশে দুইটী গুরুতর অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে। প্রথম, পারিবারিক অশান্তি। সুশিক্ষিত স্বামীর মনের ভাব যে প্রকার, অশিক্ষিতা স্ত্রীর মনের ভাব সে প্রকার হওয়া কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং সকল বিষয়ে উভয়ের মিল হওয়া, সকল কার্য্যে উভয়ের মতের ঐক্য হওয়া কখনই সম্ভব নহে। সেই জন্যই পারিবারিক অশান্তির সম্ভাবনা। ইহা নিশ্চয় কথা যে, এ প্রকার অশান্তি সংঘটিত হইতেছে। পুরুষ যেখানে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতেছে,সেখানে স্ত্রীলোকে তদনুরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, সমাজাঙ্গের একাংশ শিক্ষা লাভ করিলে এবং আর একাংশ সুশিক্ষায় বঞ্চিত থাকিলে, সামাজিক বিশেষ অকল্যাণ ও অশান্তির সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় অনিষ্ট, সামাজিক উন্নতির ব্যাঘাত। কুসংস্কারবন্ধন ছিন্ন করিয়া শিক্ষিত যুবা উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে, অশিক্ষিতা মাতা ও স্ত্রী তাহার প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠেন। নিজের উন্নতি বা স্বদেশের কল্যাণের জন্য কেহ বিলাত যাত্রা করিবেন সংকল্প করিলে, অশিক্ষিতা মাতা ও স্ত্রী সে বিষয়ে গুরুতর বাধা ও বিঘ্ন উপস্থিত করিতে থাকেন। কেবল কথামালা পর্য্যন্ত পড়িয়াই যতটুকু বিদ্যা হয়, তাহাতে অধিকাংশ স্থলে এ প্রকার অনিষ্ট নিবারণের সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীজাতির উপযুক্তরূপ শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, একান্ত প্রয়োজন।

উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে আর একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা এস্থলে বলা আবশ্যক। কেবল বি, এ, এম, এ, পাস করিলেই চলিবে না; সেই সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষা যারপর নাই আবশ্যক। পুরুষের ধর্ম্মশিক্ষা অবশ্য চাই। কিন্তু এস্থলে স্ত্রীলোকের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি। এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাদ্বারা অনেক উপকার হইয়াছে সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন কোন বিষয়ে অনিষ্টও হইয়াছে। তন্মধ্যে এই একটী অনিষ্ট হইয়াছে যে, উচ্চশিক্ষা যেমন প্রচলিত উপধর্ম্মে বিশ্বাস নষ্ট করিয়া দিয়াছে, সেইরূপে অনেক স্থলে তাহার স্থানে কোন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। ইহা দ্বারা প্রচুর অকল্যাণ উৎপন্ন হইয়াছে। স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষাদ্বারা যদি তাঁহাদের মধ্যে সেইরূপ এক ধর্ম্মবিশ্বাসবর্জ্জিত দলের সৃষ্টি হয়, তাহাতে বহুল পরিমাণে অধিকতর অনিষ্ট সংঘটিত হইবে। যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষাদ্বারা এক দল ধর্ম্ম বিশ্বাসহীন Young Bengal হওয়াতে অনেক অমঙ্গল ঘটিতেছে, সেই প্রকার এক-দল Female Young Bengal সৃষ্টি হইলে সর্ব্বনাশ! ভগবান্ এই বিপদ হইতে সমাজকে রক্ষা করুন। স্ত্রীজাতির পবিত্র প্রকৃতি, কতক পরিমাণে, এ অনিষ্ট নিবারণ করিবে।

কিন্তু উহাই যথেষ্ট নহে। ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত আবশ্যক।

এ স্থলে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশিক্ষার কথা বলিতেছি না। যে ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সাধারণ অংশ, সকল ধর্ম্মের সার, সেই ধর্ম্মের কথা বলিতেছি। যাহাতে ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি হয়, পরকালে বিশ্বাস দৃঢ় হয়, পাপের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ও পবিত্রতার প্রতি অনুরাগ উজ্জ্বল হয়, এরূপ ধর্ম্মশিক্ষা হওয়া আবশ্যক। নতুবা সকল স্থলে প্রার্থনীয় ফললাভের আশা করা যাইতে পারে না। ধর্ম্ম চাই! ধর্ম্ম চাই! নতুবা প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নহে। ধর্ম্মহীন শিক্ষা হইলে, উচ্চ শিক্ষা হইতে সকল স্থলে, শুভ ফললাভের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমন্বয় ভাষ্যের সমালোচনা। (৩)

সমন্বয় ভাষ্য সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা গত দুই সংখ্যায় একরূপ সংক্ষেপে বলিয়াছি। এই সমন্বয় ভাষ্য যে অতি উপাদেয় সামগ্রী হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় সকলেই একমত হইবেন। কিন্তু এ ভাষ্যের সমুদয় মতই যে সকলের সহিত মিলিবে, তাহাও বোধ হয় সকলে আশা করিতে পারেন না। এই ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের মত সম্বন্ধে যেরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে, আমরা তাহার কোন কোন অংশ দেখাইয়াছি। তাহাতে সমন্বয় ভাষ্যকারের কৃতকার্য্যতা কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের স্থল-বিশেষের সমালোচনা করিতে গিয়া, তাঁহার সঙ্গে যে বিরোধ উপস্থিত করিয়াছেন, আমরা গতসংখ্যার শেষ অংশে তাহার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলাম। অদ্য আমরা সেইরূপ আর দুই একটী বিরুদ্ধ-অংশের কথা দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু এ স্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি। আমরা বহুদিন হইতে শঙ্করকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া, যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, আমরা তাহাই দেখাইব। আমরা বুঝিতে ভুল করিয়া থাকিতে পারি। আমরা আশা করি, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ মহোদয়, আমাদের ভুল থাকিলে, তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া বাধিত করিবেন।

পরকালে গতি সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যে যেরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে ইহলোকে পুনরাবর্ত্তন হয় না, এরূপ মত শঙ্করের নিতান্ত বিরোধী বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে, একথা আমরা গত সংখ্যায় বলিয়াছি। আবশ্যক হইলে, আমরা শঙ্করের সেই স্থল উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়া দেখাইব। আর একটী স্থলে, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ শঙ্করাচার্য্যের একটী সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা অতি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তাহাতেও আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। ষষ্ঠ অধ্যায়ের দশম শ্লোকের ব্যাখ্যায়, পণ্ডিত উপাধ্যায় মহোদয়, শঙ্করাচার্য্যের সেই স্থলের ভাষ্যের সহিত এবং তৎকৃত ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যের সহিত সম্পূর্ণ বিরোধ প্রদর্শ করিয়া দেখাইয়াছেন। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস অন্যরূপ। আমাদেয় বোধ হয় শঙ্কর ঐ দুই স্থলে দুই প্রকার মতের উল্লেখ করিয়া কোনরূপ বিরোধী সিদ্ধান্ত করেন

নাই। শঙ্করাচার্য্যের দুই স্থলের তাৎপর্য্য ও লক্ষ্য দুই প্রকার; তাহাতেই আপাততঃ অংশদ্বয় বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে গৃহীর মধ্যে নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ ছিল। মনুতেও এই শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের সময়ে ও গীতার সময়েও গৃহীর মধ্যে এইরূপ কয়েকটী শ্রেণীবিভাগ ছিল, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। শঙ্কর ছান্দোগ্যের ভাষ্যে গৃহীর সেই এক বিশেষ শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। গীতাভাষ্যে সাধারণ গৃহীর ধ্যানযোগে অধিকার নাই এইমাত্র বলিয়াছেন। গৃহস্থের মধ্যে শ্রেণী বিশেষের যে উহাতে অধিকার নাই, এ কথা বলা শঙ্করের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ঐ স্থলে নিকৃষ্ট গৃহীই তাঁহার লক্ষ্য। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রাচীন কাল হইতেই, গৃহস্থাশ্রমীর মধ্যে চারি প্রকারের শ্রেণীবিভাগ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানকারী গৃহস্থই গৃহীর সাধারণ লক্ষণ ছিল। তদ্ব্যতীত, গৃহীর মধ্যে চারিটী শ্রেণী ছিল। মনুর চতুর্থ অধ্যায়ে সেই চারিটী শ্রেণীর এইরূপে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) "এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্র-বিদো জনাঃ। অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি"। এই সকল গৃহস্থ বাহিরে কোন রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চযজ্ঞ করিতেন। (২) "বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা। বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্বৃতি মক্ষয়াং"। এরূপ গৃহীরা বাক্যেতে নিঃশ্বাসের বহন ও নিঃশ্বাসে বাক্যের বহন করিয়া ব্রহ্মধ্যান করিতেন। "জ্ঞানেনৈবা পরে বিপ্রা যজন্তে তৈর্মখৈঃ সদা। জ্ঞান মূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা।" ইঁহারা আর একটু উন্নত গৃহস্থ। এই তিন শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট বলেন যে, "শ্লোকত্রয়েন ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদ-সংন্যাসিনাং গৃহস্থানা মমী-বিধয়ঃ,"—অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগী অথচ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহীর প্রতি এই সকল বিধি। এই তিন শ্রেণী ব্যতীত, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত আর এক রূপ গৃহীর উল্লেখও মনুতে দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) "যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।" গীতাতেও ঠিক্ এই রূপে গৃহস্থের চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ আছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, শঙ্করাচার্য্য গীতা ভাষ্যে কেবল মাত্র সাধারণ-গৃহীর ধ্যানহোগে অধিকার মাত্র বলিয়াছেন। নতুবা গৃহীর সকল শ্রেণীর পক্ষেই যে ধ্যানযোগ নিষিদ্ধ,—এরূপ বলা শঙ্করের অভিপ্রায় হইতে পারে না। এইজন্যই আমাদের বোধ হয় যে, বাস্তবিক পক্ষে ভাষ্যদ্বয়ে কোনরূপ বিরোধ হয় নাই।

এখন আমরা অতি সংক্ষেপে, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ মহোদয়ের আর একটী স্থলের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ আছে কিনা? এই বিষয়ের বিচার স্থলে, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ বলেন যে, "এ উভয়ের অত্যন্ত সাম্য করিতে গিয়া শঙ্কর সত্যের অপলাপ করিয়াছেন।" আমাদের বিবেচনায়, একথা ঠিক্ নহে। শঙ্কর সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, একথা প্রমাণ করা সহজ হইবে বলিয়া, আমাদের মনে হয় না। রামানুজাদি

বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের ন্যায় শঙ্কর দ্বৈতবাদী ছিলেন না। তিনি বিশেষ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বেদান্ত ভাষ্যে জীবাত্মা পরমাত্মার একান্ত-অভেদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই রূপ মত ভাল কি মন্দ, সে বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই; এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, শঙ্কর এইরূপ ঘোরতর অভেদই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নিরতিশয় সূক্ষ্ম এবং অবিভাগাবস্থায় শক্তিরূপে বিলীন থাকা প্রযুক্ত, যেমন শঙ্কর, প্রকৃতিকে অভিন্ন বলিয়া অদ্বৈতবাদ খ্যাপন করিয়াছেন, জীবাত্মা-সম্বন্ধে সেরূপ নহে। যাহাকে স্থূল-শরীর বলিয়া স্থাবর-জঙ্গমে দেখা যাইতেছে, তাহারই নিতান্ত সূক্ষ্ম ও আকাশাদিভাবে অবিভাজিত অবস্থাকেই যখন তিনি,প্রকৃতি-শক্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং প্রকৃতি ও ব্রহ্মকে এক ধরিয়া লইয়া, প্রকৃতিরই বিবর্ত্ত (বেদান্তপরিভাষার কৃষ্ণনাথ ন্যায়-পঞ্চাননের টীকা দ্রষ্টব্য) হয়,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে আর জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার সম্ভবে না। প্রকৃতিজাত খণ্ডদেহালিঙ্গিত অবস্থার নামই তাঁহার মতে জীবাত্মা। নতুবা জীবাত্মা সেই পরমাত্মাই। পণ্ডিত গৌর-গোবিন্দ দুইটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেনঃ—(১) "নিত্যত্বাদীশ্বরস্য তৎ প্রকৃত্যোরপি যুক্তং নিত্যত্বেন ভবিতুং;" এবং (২) "সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ন চ ন সমুদ্রস্তরঙ্গো ভবতি।" এই দুই শঙ্করোক্তির বলে, তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্যের মনোভাব জীবাত্মা সম্বন্ধে একরূপ দ্বৈতগ্রাহী। আমরা কিন্তু সম্ভ্রম ও বিনয়ের সহিত বলিতেছি যে, এস্থলেও আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। শঙ্করের উক্তির তাৎপর্য্য আমাদের নিকটে অন্যরূপ বোধ হয়। "প্রকৃতি দ্বয় নিত্য" কি হিসাবে? আমাদের বোধ হয়, শঙ্করের ঈশ্বর যে হিসাবে নিত্য, প্রকৃতিদ্বয়ও কেবল সেই হিসাবেই নিত্য। শঙ্করের অভিপ্রায় এইরূপ। ব্রহ্মের সংকল্পবশতঃ যে মুহূর্ত্তে বিলীন-শক্তিপুঞ্জের স্ফূর্ত্তির আরম্ভ, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ব্রহ্ম ঈশ্বর-পদবাচ্য এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতেই প্রকৃতিদ্বয়েরও নিত্যতা। নতুবা নির্গুণ ব্রহ্মে, ঈশ্বরেরও স্থান নাই এবং প্রকৃতিদ্বয়েরও স্থান নাই। শঙ্কর যে অন্যত্র জীবাত্মার জগৎস্রষ্টৃত্বরূপ কর্তৃত্ব থাকিবে না, বলিয়াছেন, সেও এই হিসাবে এবং এই অভিপ্রায়ে। ব্রহ্মেরই যখন সগুণ অবস্থা "ঈশ্বর," তখন বিলোমভাবে জীবের যখন মুক্তি আরম্ভ হয়, তখন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে যাইতে যাইতে, জীবাত্মারও অবশ্য "ঈশ্বরে" লয় হইতে থাকিবে। তার পরে, ঈশ্বর যখন ব্রহ্মই, তখন জীবাত্মাকে ও আবার গিয়া নির্গুণ ব্রহ্মেও পড়িতে হইবে। অতএব যখন জীবাত্মা ঈশ্বরে লীনাবস্থায় অবস্থিত, সেই অবস্থাতেই কেবল তাহার স্রষ্টৃত্ব শক্তি থাকিবে না। অর্থাৎ কথাটা এই যে, সে অবস্থাতেও কিঞ্চিৎ দ্বৈতভাব না থাকিয়া পারে না। কেন না, তখনও কিঞ্চিৎ গুণ ও ক্রিয়ার Conception থাকিবেই। কিন্তু নির্গুণে পড়িলে, জীবাত্মা সেই সামান্য ভেদটুকুও থাকে না। শঙ্করের গূঢ়ঃঅভিপ্রায় এইরূপ। একথাটা পণ্ডিত Max-muller কতকটা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি এইরূপ—

"Phenomenal God does not mean what is unreal and false. It is the most real God only as conceived by "*human understanding*," which can never form an adequate idea of impersonal self. Phenomenal Brahma is therefore nothing but real Brahma. Human mind cannot conceive God except behind the veil of human thought."

আমরা সংক্ষেপে যে তত্ত্বের আভাস মাত্র প্রদর্শন করিলাম, এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, শঙ্করের সহিত বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের সমস্ত বিরোধ ভঞ্জন হইয়া যায়। বোধ হয়, এই ভাবে শঙ্করকে বুঝিলে, সাংখ্যের বহু পুরুষবাদেরও সঙ্গতি হইয়া যায়। প্রকৃতির দ্রষ্টৃত্ব রূপেই সাংখ্য-পুরুষের "পুরুষত্ব" সংজ্ঞা। যতদিন প্রকৃতির কার্য্যদর্শন, ততদিনই পুরুষ। প্রকৃতির আদিম-বিকারের স্ফূর্ত্তি এই পুরুষের দ্রষ্টৃত্ব-নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতির আলিঙ্গন যতদিন, ততদিন প্রত্যেক বিকারের উপাধিযোগে পুরুষের মধ্যেও ভেদ। ততদিন পুরুষ নানা। প্রকৃতির আলিঙ্গন বিচ্যুত কর, তখন আর পুরুষের নানাত্ব নাই। তখন সকলেই এক পুরুষমাত্র। বিজ্ঞানভিক্ষু একথা বুঝিয়াছিলেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর পদানুসরণ করিয়া একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতও এ কথার আভাষ দিয়াছেন।

"Kapil did not differ so much from Badarayan, because if "*Purushas*' were supposed to be many, they would not be "*Purushas*,," and being Purush, they would by necessity cease to be many. By admitting Purush, he admitted a belief in something transcendant."—

এই জন্যই ত কপিল আর ঈশ্বর স্বীকারের স্বতন্ত্র আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই। গীতার পঞ্চদশাধ্যায়ের ১৬ ও ১৭ শ্লোকের লিখিত "ক্ষর" অর্থ প্রকৃতি, "অক্ষর" অর্থ প্রকৃত্যধিষ্ঠিত নানা পুরুষ এবং "উত্তম পুরুষ" অর্থ প্রকৃতি-বিনির্ম্মুক্ত পুরুষ, অতএব স্বরূপৈক্য বশতঃ ব্রহ্ম—এইরূপ অর্থ করিলেই, আমরা যাহা বলিলাম, গীতারও সেই মত সুস্পষ্ট হইয়া পড়িবে।

তবে এখন এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, অদ্বৈত-তত্ত্বের হানি হয় না কেন? শঙ্করাচার্য্য তৎকৃত ভাষ্যে এই প্রশ্নের ৪ প্রকারের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। (১) ব্রহ্মে তখন শক্তি বা মায়া "অবিভাগাবস্থায়" থাকে। যাহার বিভাগ হয় নাই, তাহা বস্তুন্তর হইয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া বলা যাইবে? যেমন বীজ-মধ্যবর্ত্তী অঙ্কুর পত্র পুষ্পাদি। (২) বাহ্যবিষয়ের অন্তরালবর্ত্তী Substratum এবং আন্তরিক বৃত্তিনিচয়ের অন্তরালবর্ত্তী Substratum উভয়ই একই ব্রহ্মবস্তু। "স" এবং "অহং" একই পদার্থ। The thing that holds them (perceptions) and the soul that receives them are the same." শঙ্করের (৩) উত্তর এই যে, জ্ঞান জন্মিলে যখন এ গুলি আত্মাতে কিছুই প্রতিভাত হয় না, তখন মায়াকে ব্রহ্মের ন্যায় সৎপদার্থ বলা যায় না। বিশেষতঃ অন্তঃকরণ বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি আছে বলিয়াই যখন শব্দ স্পর্শাদিময় জড়রূপে সমস্ত প্রতিভাত হইতেছে, এবং ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তিগুলি নিজেও যখন অসৎ, অর্থাৎ উহারাও যখন থাকিবে না, তখন, অদ্বৈত তত্ত্বের হানি হইল কৈ? এ স্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। পাশ্চাত্য দর্শন কেবলমাত্র বাহ্য পদার্থের মাত্র সত্তা উড়াইয়া দিয়া, উহাকে phenomenal বলিয়াছেন,কিন্তু কেহই সাহস পূর্ব্বক অন্তঃকরণাদি বৃত্তিগুলিকে অসৎ বা phenomenal বলেন নাই। শঙ্কর কিন্তু তাহাও করিয়াছেন। শঙ্করের মতে ইহারাও ঠিক্ তদ্রূপ অসৎ বা phenomenal মাত্র। শঙ্করের (৪) উত্তর এইরূপ :—যদিও অবি-

ভাগ ভাবে ও সূক্ষ্মরূপে শক্তি তাঁহাতে থাকে, তথাপি স্থূলাবস্থার ন্যায় সেই অতি সূক্ষ্মাবস্থাতেও, ব্রহ্ম সেই শক্তির মধ্যগত হইয়াও, তদতীত থাকেন। তিনি "শক্তি" হইতে সেইরূপে পৃথক্। নতুবা শক্তিকে তিনি নিয়মিত করিবেন কি প্রকারে? তাঁহাতে গুণ ক্রিয়াদি অবিভাজিত অবস্থায় লীন থাকিলেও, সর্ব্বাতীত বলিয়া, তাঁহার নির্গুণত্বের ক্ষতি হইতেছে না। "জীবো হি অবিদ্যাবশাৎ দেহাত্মভাবমিব গত্বা অবিদ্যাকৃতং সুখদুঃখোপভোগমভিমন্যতে, × × × নৈবং পরমেশ্বরস্য"। এ অবস্থায় তিনি ঈশ্বর হইয়াও নির্গুণ। আর এক স্থলে—"পরমাত্মনঃ স্বরূপ ব্যপাশ্রয় মৌদাসীন্যং, মায়াব্যপাশ্রয়স্তু প্রবর্ত্তকত্বং"। সুতরা দেখা যাইতেছে যে, অদ্বৈতবাদের হানি হইতে পারিল না। অবিভাগাবস্থায় একত্ব বিনষ্ট হয় না। একটী নর-বীজে—যেখানে কিছুরই বিভাগ নাই—তাহার এমনি শক্তি নিহিত থাকে যে, সেই শক্তির বিকাশ স্বরূপ, চল্লিশবৎসর পরে, সন্তানে সেই রোগের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়,—ষষ্ঠাঙ্গুলিটী পর্য্যন্ত সন্তানের হস্তে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। পরে প্রকাশিত ঐ বিভাগগুলি, বীজে বহুপূর্ব্বে শক্তিরূপে লীন থাকিয়া যায়। জ্ঞানের স্ফূর্ত্তির নামই ক্রিয়া। সংকল্প ব্যতীত জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। সুতরাং যে মুহূর্ত্তে ব্রহ্মের সৃষ্টিবিষয়ক সংকল্পের অভ্যুদয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ক্রিয়ার আরম্ভ। কিন্তু সংকল্প প্রকাশের অবস্থাই, শঙ্করের মতে, ব্রহ্মের সগুণ ভাবাবলম্বন। অতএব ঈশ্বর হইতেই ক্রিয়ার আরম্ভ। ব্রহ্মে যাহা শক্তিরূপে একাকার ছিল, তাহারই ঈশ্বরে বিভাগ আরম্ভ হইল। কাজেই অবিভাগাবস্থায় অদ্বৈততত্ত্বের হানি হইতে পারিল না। এই জন্যই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ"—উক্ত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই "ক্রিয়া" শব্দটীর সর্ব্বশেষে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বল বা শক্তি, জ্ঞানেরই অবস্থাভেদ। অবিভাগাবস্থাপন্ন "বলই" জ্ঞান। সেই একাবার ব্রহ্ম-শক্তির বিভাগাবস্থার স্ফূর্ত্তির আরম্ভই "ক্রিয়া" পদ বাচ্য। সেই ক্রিয়া হইতেই সংসার-প্রাদুর্ভাব। শঙ্কর এই অবস্থাদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ব্রহ্মকে নির্গুণ ও সগুণ বলিয়াছেন। আমাদের অন্তঃকরণ বৃত্তি যতদিন আছে, ততদিন আমাদের নিকটে সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ সগুণ ভাবেই প্রতীত থাকিবে। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। সুতরাং সগুণ ব্রহ্মও সত্যপদার্থ। মনোবৃত্তিগুলি যে ভাবে সত্য, এই ঈশ্বরও সেই ভাবে সত্য। শঙ্কর-মতে এইরূপে অদ্বৈততত্ত্বের হানি হয় নাই। কিন্তু এতদ্ব্যতীত, শঙ্কর অন্য কোন রূপে, কোথাও জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলেন নাই। এমতে তাঁহার পক্ষে, ভিন্ন বলাও অসম্ভব।

প্রবন্ধ বড় হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বক্তব্য আমরা এই স্থলেই শেষ করিলাম। এই সমন্বয়ভাষ্যের নামকরণ সম্বন্ধেও আমাদের কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে। অনুগীতা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া গীতোক্ত মতের সমন্বয় হইতে যেরূপ উত্তম সতর্কতা ও দক্ষতার সহিত সাধিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারদিগের সঙ্গতির চেষ্টা ইহাতে সেরূপ ভাবে করা হয় নাই। পরন্তু শিশুপালবধ মহাকাব্যের টীকায় মল্লিনাথ, "ভাষ্য" শব্দের যেরূপ শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, এ ভাষ্যটী সেই সংজ্ঞানুরূপ হয় নাই। যাহা হউক, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দের ন্যায় একজন ঋষিকল্প, চিন্তাশীল, মহাজ্ঞানী পণ্ডিত, এই ভাষ্যের রচয়িতা বলিয়া, আমরা ইহার স্থান বিশেষের সম্বন্ধে আপত্তি দেখাইলাম। এতদ্ভিন্ন তৎকৃত ভাষ্য একটী অমূল্যরত্ন স্বরূপ হইয়াছে। এদেশে ইঁহার মত সারগ্রাহী মীমাংসক বর্ত্তমান রহিয়াছেন, একথা স্মরণ করিতেও আমাদের অন্তঃকরণ হর্ষ ও গৌরবে আপ্লুত হয়। আশা করি, পণ্ডিত মহোদয় আমাদের এই পতিত দেশের রত্নোদ্ধার কার্য্যে এইরূপে ব্রতী থাকিয়া, দরিদ্র ও বিলুপ্ত-গৌরব এই জন্মভূমির মুখ উজ্জল করুন্। পরিশেষে, বিনীত নিবেদন এই যে, যদি কোথাও আমরা তাঁহার উপরে অশিষ্টতাসূচক শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি, তবে উপাধ্যায় মহাশয় তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

চৌধুরীর লড়াই। (শেষ)

রঙ্গমালা রাজচন্দ্রকে লাথি মারিতে চাহিল। চৌধুরী অমনি অগ্নির "হুলকা যেন গর্জ্জিয়া উঠিয়া" রঙ্গ-মালাকে যে পাঁচশ টাকার গহনা দিয়াছিল,তাহা কাড়িয়া লইয়া গামছায় বান্ধিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল। পরদিন খুড়ার নিকট উপস্থিত হইয়া "আগের পাও পাছে নামাই সেলাম করিয়া" বলিল আত্মারাম নড়ের (রঙ্গমালার বাপের) ১৪ বৎসরের খাজানা বাকী, আমাকে ৪ জন পেয়াদা দিন্, তাহাকে "মুগইরে ঠেঙ্গাইয়া" খাজানা আদায় করিয়া লই। খুড়া বলিলেন 'আচ্ছা বাপু'। তখন সেই পেয়াদারা গোলাপ রায়কে রঙ্গমালার সম্মুখে বান্ধিয়া আনিয়া চৌধুরীর নিকট হাজির করিল। চারি দিন অতীত হইল, তবু গোলাপ রায় খালাস হইল না, রাজচন্দ্রও রঙ্গমালার বাটীতে গেল না। তখন রঙ্গমালা "হেকমত"করিয়া চৌধুরীকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া এক প্রেমলিপি লিখিয়া পাঠাইল।

* * * * *

ওহে বন্ধু প্রাণ সিন্ধু নয়নের তারা।
ক্ষণকাল না দেখিলে হই মতিহারা॥
তোমার বিহনে মম প্রাণ উচাটন।
সত্বর আসিয়া প্রিয় করহ মিলন॥
শিশিরে না ভিজে মাটি বিনা বরিষণে।
সংবাদে না জুড়ায় আঁখি বিনা দরশনে॥
তবে যদি ছাড় বন্ধু আমি না ছাড়িব।
চরণে নপুর হই চরণে মজিব॥
পত্রেতে লিখিল কন্যা পরম সমাচার।
ঘাইট (১) গুণা অপরাধ দোষ ক্ষেমিবার॥ ইত্যাদি

পত্র পড়িয়া চৌধুরী"মুখের মধ্যে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল" ও খুড়ার বাক্স হইতে তিনশ টাকা বাহির করিয়া নিয়া গোলাপের বাকী খাজানা শোধ করিয়া তাহাকে খালাস করিয়া দিল। খুড়া আবার সেই টাকা গণিয়া বাক্সে রাখিলেন।

একদিন সোণামালার মনে সাধ হইল, রঙ্গমালা কি রকম সুন্দরী দেখিব। তিনি হীরা দাসীকে সঙ্গে করিয়া রাত্রে রঙ্গমালার বাড়ীতে গেলেন। তিনি কি দেখিলেন?—

"রঙ্গমালার ছুরত (২)যখন নয়নে দেখিল।
রূপে মগ্ন হইয়া কন্যা ঢলিয়া পড়িল॥
ষোল আনা রূপ ছিল প্রভুর দরবারে।

(১) ঘাইট গুণা—দোষ, অপরাধ।
(২) ছুরত—চেহারা, রূপ।

রতিমাসা করি রূপ বাটিল সবারে ॥
দুই গুণ রূপ ছিল রঙ্গমালার গায়।
ভুবনমোহন কন্যা হইল উদয় ॥
এমন মোহন রূপ দিছে বিধাতায়।
থাকরে মনুষ্য যেন দেবতা পলায় ॥"

এইরূপে সোণামালা দ্বারা রঙ্গমালার রূপের প্রশংসা করাইয়া কবি বেশ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, রঙ্গমালাকে রাজচন্দ্রের সহিত একত্র ভোজন করিতে দেখিয়া সোণামালার ভয়ানক রাগ হইল। তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সদর দরজার উপরে একটা ঝাঁটা, ও তাহার নিজের ঘরের দরজার উপরে একখান জুতা বাঁধিয়া রাখিলেন। রাত্রিশেষে রাজচন্দ্র ঘরে আসিবার সময় ঝাঁটা ও জুতা উভয়ের সহিতই তাহার মস্তকের পরিচয় হইল, কিন্তু তাহার ফলে সোণামালার কপালে কিঞ্চিৎ প্রহার ঘটিল।

রঙ্গমালা একদিন বাহানা ধরিল—আমাকে তীর্থ দর্শনে লইয়া চল ও আমার আগ দরজার উপরে একটা বড় দীঘি কাট। কি করেন, উপায় নাই; রঙ্গমালাকে লইয়া রাজচন্দ্র চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করিয়া আসিলেন। সেই তীর্থ-যাত্রার বিবরণে আমাদের কাজ নাই। এই দীঘি কাটা লইয়াই আমাদের কাজ। কি কুক্ষণে এই দীঘি কাটার প্রস্তাব উঠিয়াছিল—এই দীঘি কাটা ব্যাপারই চৌধুরী বংশের সর্ব্বনাশের মূল কারণ। সেই রঙ্গমালার দীঘি এখনও বর্ত্তমান আছে।

রাজচন্দ্র চন্দ্রনাথ হইতে ফিরিয়া আসিলেই রঙ্গমালা আবার দীঘি কাটার আবদার করিল। তখন রাজচন্দ্র টান দিয়া চিনের কাগজ বাহির করিয়া হিঙ্গলী পর্ব্বতে মগের সর্দ্দার রামা মগের নিকট চিঠি লিখিলেন। পত্র পাঠ মাত্র নয় শত মগ ধামা ও কোদাল হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজচন্দ্র হুকুম দিলেন, সাত দিনের মধ্যে দীঘি কাটা শেষ করিতে হইবে; দীঘিটা দেড় দ্রোণ (১) জমি লইয়া হইবে। আজ্ঞা মাত্রে মগেরা দীঘি কাটা আরম্ভ করিল। তখন রাজচন্দ্রের চিন্তা হইল, টাকা পাই কোথায়? আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, রাজচন্দ্রের এক রাম ভাড়ালী ছিল, ইনি চাঁদ ভাড়ালীর জুড়ীদার (দ্বিতীয় সংস্করণ)। তিনি পরামর্শ দিলেন, কেন টাকার ভাবনা কি? আমি বউ ঠাকুরাণীর (সোণামালার) নিকট হইতে টাকা আনিয়া দিতেছি। তখন রাম ভাড়ালী বউ ঠাকুরাণীর কাছে গিয়া খুব হাসিখুসী হইয়া বলিতে লাগিল "আজ্ঞে, আর কোন পরোয়া নাই; আমি কর্ত্তাকে রঙ্গমালার নিকট হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিয়াছি। এখন আপনার নামে একটী খুব বড় দীঘি কাটা হইবে, আপনার টাকাগুলি চাই।"

ইহা শুনিয়া সোণামালা খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, (এবার কবিবর অগ্নির হুলকার উপমাটা ভুলিয়া গিয়াছেন), বলিলেন, "আমার দীঘি পুষ্করিণীর কাজ নাই। রসো,দাঁড়াও একবার তোমাকে মজা দেখাইতেছি।" ইহা বলিয়া "পিছা" (ইনি শতমুখীরই রাজকীয় সংস্করণ) হস্তে রাম ভাড়ালীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; তখন—

"ধায় আর রাম ভাড়ালী পিছের দিকে চায়।
আর নি বউ ঠারাইনে আমার লাগ পায় ॥"

(১) ১৬ কানিতে এক দ্রোণ; ৪ বিঘা ১৬ কাঠায় এক কাণি। দেড় দ্রোণে ১১৪ বিঘা, প্রায় ৩৮ একর।

এখন যে দীঘিটা রঙ্গমালার দীঘি বলিয়া পরিচিত, তাহার ক্ষেত্রফল অনুমান ১০ কানি হইবে।

রাজচন্দ্র সেই রাম ভাড়ালী ভগ্ন দূতের বাচনিক সরেওয়ার অবগত হইলেন, এবং অনন্যোপায় হইয়া "প্রাণের খুড়ার" সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া দুই তোড়া টাকা লইয়া রঙ্গমালার বাড়ীতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মঙ্গলবারে দীঘির জলতোলা হইবে, সেই উপলক্ষে চিড়া খাওয়ার জন্য রঙ্গমালার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণের পত্র পাঠান হইল। তখন "আবুদ্ধিয়া মহারাজেরে কুবুদ্ধিয়ে পাইল," তিনি সেই নড় বংশকে ত নিমন্ত্রণ করিলেনই, অধিকন্তু দত্তপাড়া, খিলপাড়া,লামচর মাইজদী প্রভৃতি স্থানের রাজবংশকেও সেই চিড়া খাওয়ার নিমন্ত্রণের পত্র পাঠাইলেন। এমন কি, আপন খুড়া রাজনারায়ণকে ও রঙ্গমালার নামে এক চিঠি পাঠাইলেন। ইহাই সকল অনর্থের মূল হইল।

খুড়া রাজনারায়ণ যখন সেই নিমন্ত্রণের পত্র পাইলেন, তখন তাঁহার "আসমান ভাঙ্গিয়া যেমন মস্তকে পড়িল।" তখন তিনি সুমিত্রাকে ডাকাইয়া সেই দুরন্ত আসমানের কথা বলিলেন। সুমিত্রা বলিলেন, রাজচন্দ্র আমার কাল পুত্র, তাহাকে কাটিয়া ফেল। শেষে চাঁদ ভাড়ালীর পরামর্শে রাজচন্দ্রকে রঙ্গমালার বাটী হইতে কৌশল ক্রমে ডাকিয়া আনিয়া সেই নড়ের বংশ কাটিয়া ফেলা স্থির হইল। চাঁদ বীরের এবারত অনুসারে রাজনারায়ণ প্রাণের ভাতিজাকে শীঘ্র আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন;—

"বাইশ মুলুকের জমীদার করিছ বর্ত্তন (১)।
কি কি জিনিস তুমি করাইবা ভোজন ॥
জানিতে বাসনা অতি হইয়াছে মনে।
পত্র পাই বাছাধন আইস তুরমানে (২) ॥"

(১) নিমন্ত্রণ। (২) শীঘ্র।

সেই চিঠি পাইয়া রাজচন্দ্র অনেক কষ্টে রঙ্গমালার নিকট বিদায় নিয়া বাড়ী আসিল। রঙ্গমালা কোন মতে ছাড়ে না; সে মনে বুঝিয়াছিল—

সকালেতে মহারাজ লৈ যায় ডাকিয়া।
কাইল বেয়ানে দুঃখিনীরে ফেলিবে কাটিয়া ॥

রাজচন্দ্র বাড়ী আসিয়া খুড়ার সঙ্গে দেখা করিলেন। সেই দিন রাত্রে চাঁদ ভাড়ালীর পরামর্শে সোণামালা স্বামীকে "বদরঙ্গের গাঁজা" দিয়া শরবত বানাইয়া খাইতেদিলেন। রাজচন্দ্র অচেতন হইয়া রহিল। এদিকে চাঁদ ভাড়ালী একুশ হাজার সৈন্য লইয়া গিয়া রঙ্গমালার বাড়ী ঘেরাও করিল। (এত সৈন্যের কি প্রয়োজন ছিল, তাহা বুঝা যায় না, এটা বোধ হয় কবির হস্ত কণ্ডুতি)। চাঁদ গোলাপ রায়কে বান্ধিল, রঙ্গমালার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকেও বান্ধিয়া আনিল। তাহাদের বাড়ীতে আগুন লাগাইল। মনুষ্যের রক্ত দিয়া তাহাদিগকে স্নান করাইল, এবং জয়কালীর কাছে প্রথমে রঙ্গমালাকে ও পরে তাহার ভাইকে বলি দিয়া তাহাদের মুণ্ড রুমালে বান্ধিয়া রাজনারায়ণের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। রঙ্গমালার মুণ্ড দেখিয়া রাজনারায়ণ আক্ষেপ করিলেন—

কিরূপে বধিলী চাঁদ কন্যার পরাণ।
সুরতের বাখান দেখি বিদরে পরাণ ॥
এমন সুন্দর রঙ্গে মাল্লি কিসের লাই।
ভাতিজা হইবে পাগল রঙ্গমালার লাই ॥ ইত্যাদি

পরদিন প্রভাতে যখন রাজচন্দ্র রঙ্গমালার কাটা ধড় দেখিল, তখন যথার্থই পাগল হইল। সোণার বান্ধা তলোয়ার নিয়া খুড়াকে কাটিবে বলিয়া চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু পাইল না। এ দিকে অলক্ষিতে থাকিয়া চাঁদবীর

তাহাকে বজ্রমুষ্টি প্রহার দিল। তখন রাজচন্দ্র খুড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে বলিয়া, বরিশালে ইংরেজের নিকট গিয়া নালিশ করিল ও পাঁচ শত সিপাই লইয়া আসিল। এদিকে রাজনারায়ণ চৌধুরী ও যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। বক্তিয়ার সিং নামক এক ব্যক্তিকে তিনি সেনাপতি করিয়া ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করিতে পাঠাইলেন, কিন্তু সে লোকটা নিতান্ত বেকুব; সে ইংরেজ সেনার সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া হরিশ্চন্দ্র দীঘির নিকটে গিয়া রাজচন্দ্রের ভাই রাজকিশোরের মুণ্ড কাটিয়া আনিল। সেই কাটামুণ্ড দেখিয়া রাজনারায়ণ ও সুমিত্রা অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। রাজগঞ্জে ইংরেজ সৈন্য রাত্রে অবস্থান করিতেছিল; চাঁদ ভাড়ালী অতর্কিতে কামানে আগুন দিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল। প্রাণ বাঁচাইতে সুবাদার দীঘিতে ঝাঁপ দিল; চাঁদ ভাড়ালী বাঁশ দিয়া তাহাকে টানিয়া উপরে উঠাইয়া তাহার গলা কাটিয়া ফেলিল।

ইংরেজ সৈন্য এইরূপে বিনষ্ট হইলে, রাজচন্দ্র নিরুপায় হইয়া, গোপালপুরের জমিদার ইঙ্গা চৌধুরীর শরণাপন্ন হইয়া বলিল—

শুন শুন মহারাজ কহি তোমার ঠাই।
ধরমের পিতা আমি তোমারে বোলাই॥
চারি আনা জমিদারী দিলাম লিখিয়া।
প্রাণের খুড়া রাজিনারাণ আনহে বান্ধিয়া॥

ইঙ্গা চৌধুরী, তাহার ভাই মহম্মদ রাজার নিষেধ সত্ত্বেও সেই জমিদারীর প্রলোভন ছাড়িতে পারিল না। রাজচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হইল। রাজনারায়ণ যখন একথা শুনিলেন, তখন কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইলেন। চাঁদ ভাড়ালীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তখন সময় পাইয়া বাঁকিয়া বসিল। সে বলিল, যদি মোহন মালাকে(১)বাঞ্ছারামের (২) সঙ্গে বিয়ে দেও, তবে ইঙ্গা চৌধুরীর গলা কাটিয়া ফেলিব। মহারাজ একথা শুনিয়া আপমানে ও দুঃখে কিছুই বলিলেন না। তিন দিন কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে ইঙ্গা চৌধুরী রছুলপুর গ্রাম পোড়াইয়া চলিয়া গেল। অগত্যা মহারাজ মোহনমালাকে বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। তখন চাঁদ ভাড়ালী আবার তাহার বুদ্ধির "চোঙ্গা খুলিল"। তাহার পরামর্শে ইঙ্গা চৌধুরীর সহিত সন্ধি স্থাপন হইল। কিন্তু সে কৃত্রিম সন্ধি। একদিন চাঁদ ভাড়ালী বৈষ্ণবী সাজিয়া ইঙ্গার বাড়ীতে রাত্রিযোগে গিয়া উঠানে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। কীর্ত্তন শুনিয়া ইঙ্গা চৌধুরী ঘরের বাহির হইলে, চাঁদবীর খঞ্জরী ফেলিয়া তলোয়ার ধরিল ও এক কোবে ইঙ্গার মাথা কাটিয়া ফেলিল। পরে একে ২ তাহার দুই ভাই ও স্ত্রী নুর বিবি যুদ্ধ করিতে আসিল, চাঁদবীর তাহাদেরও গলা কাটিয়া ফেলিল। তখন মহম্মদ রাজাকে ধরিল—সে পলাইয়া গিয়া ওম্মাবাদে মনোহর গাজীকে সংবাদ দিল।

মনোহর গাজী ইঙ্গার শ্যালক, একজন ক্ষমতাশালী জমিদার। ইনি পর্ব্বতের কুকীদিগকে ও আপন জাগীর্দ্দারদিগকে লইয়া রাজচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলেন। এবার কিন্তু চাঁদ ভাড়ালীর ফিকির খাটিল না। চাঁদ ভাড়ালীর সৈন্যগণ মনোহরের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া মারা পড়িল।

(১) (২) ইহারা কে, জানা যায় না।

তখন চাঁদ ভাড়ালীর পরামর্শে রাজনারায়ণ পুত্র কন্যা লইয়া জঙ্গলে পলাইলেন। মনোহর গাজী আসিয়া তাঁহার বাড়ী দখল করিয়া বসিল, ও অনেক রকম অত্যাচার করিল।

রাজনারায়ণ টিপারায় পলাইয়া গেলেন। সেখানে মগের রাজা তাঁহার দুইটী সুন্দরী কন্যা উদয় তারা ও নয়ন-তারাকে দেখিয়া বলিল, ইহার একটী আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেও। রাজনারায়ণ অসম্মত হইলেন; তখন মগের রাজা ঢাকার ইংরেজের নিকট পত্র পাঠাইয়া রাজনারায়ণকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল। সিপাহীরা রাজনারায়ণের পায়ে দড়ী বেড়ী বান্ধিয়া নিয়া চলিল; চাঁদ ভাড়ালী তাঁহার কন্যা দুইটী সঙ্গে করিয়া নিয়া চলিল। চৌধুরী বাবুপুরে আসিয়া ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করিলেন। রাজনারায়ণের পায়ে সেই দড়ী বেড়ী দেখিয়া ঠাকুরাণীর সহ্য হইল না। তিনি চাঁদ ভাড়ালীকে সোণারী বাড়ীতে পাঠাইয়া সোণা রূপার বেড়ী বানাইয়া আনিয়া মহারাজের পায়ে পরাইয়া দিলেন! (১)

রাজনারায়ণ ঢাকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব হুকুম দিলেন, ইহাকে হাতি দিয়া মার। রাজনারায়ণ কালীভক্ত ছিলেন; হাতী তাহার গায়ে পা তুলিল না। তখন সাহেব জল্লাদকে হুকুম দিলেন, ইহাকে তোপ দিয়া উড়াইয়া দেও। এবার জয়কালী আসিয়া তোপের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; কামান ভাঙ্গিয়া তেরজন খালাসী মারা পড়িল, রাজনারায়ণের কিছুই হইল না। তখন বড় সাহেব ও ছোট সাহেব মিলিয়া পরামর্শ করিয়া রাজনারায়ণকে বলিলেন, "এখনও আমাদের ফরাশডাঙ্গা দখল হয় নাই, তুমি এই যাদু বিদ্যা দ্বারা যদি সেই ফরাশডাঙ্গাটা আমল করিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।" রাজনারায়ণ বলিলেন, "সাহেব তোমরা আমার ধর্ম্মের বাপ, আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি বাড়ী যাই। আমি সে সব বিদ্যা কিছুই জানি না।"

বড় সাহেব ভাবিলেন, এত ভাল কথা। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—সেই পুত্র যদি অনায়াসে মিলিয়া গেল, তবে কোর্টসিপের হাঙ্গামা ও পরে মেম সাহেবের শ্রীচরণে দাসখত লেখার মধ্যে আমি কেন যাব। বলিলেন "আচ্ছা বাপু, তুমি আমার বেটা, তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, তুমি বাড়ী চলিয়া যাও।" রাজনারায়ণ চৌধুরী সাহেবকে সেলাম করিয়া বাবুপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এইখানে গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া গ্রন্থকার সকলকে আল্লা রছুল বলিতে উপদেশ দিয়াছেন।

পাঠকবর্গ এই লম্বা কেচ্ছা পড়িতে পড়িতে বোধ হয় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছেন। ইহার উপর আর আমার গবেষণা করিয়া বিদ্যা প্রকাশের কোন প্রয়োজন দেখি না। মোটের উপর এই গল্পটী যতদূর অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে সত্য বলিয়া বোধ হয়। গল্পের মধ্যস্থ ব্যক্তিগুলি সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ঘটনাটাও এই রকম ঘটিয়াছিল। তবে স্থানে স্থানে কবি-স্বভাব-সুলভ অতি-রঞ্জিত, অতি-প্রাকৃত, ঘটনারও সমাবেশ হইয়াছে। তাহা সুবুদ্ধি পাঠক সহজেই ধরিতে পারিয়াছেন। এই গল্পের মধ্যে যে কয়েকটী স্থান কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে কবির কবিত্বের পরিচয়ও কতক কতক পাইয়াছেন। আরও কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) ইহা ঠিক শ্যামা বৈষ্ণবীকে ভিক্ষা করিবার জন্য রূপার ঘটী গড়াইয়া দেওয়ার মত।

কবির কবিত্ব।

গ্রন্থারম্ভে কবি রঙ্গমালার রূপের বর্ণনা করিয়াছেন—

"কতবা কহিব কন্যার সুরতের বাখান।
চন্দ্রের রূপে কন্যার রূপে একই সমান॥
বেলইনে বেলিছে কন্যার হস্ত বাহু মূল।
চাম্পার কলিকা যেন এ পঞ্চ অঙ্গুল॥
হাত দুখানি রঙ্গের বেলুনে বেলিছে।
পদ দুখানি রঙ্গমালার কুন্দে তুলি লইছে॥
গিরপি নিশি হইছে কন্যার হরিব গলায়। (১)
তাম্বুলের (২) রসাপিতে লাল দেখা যায়॥
নারঙ্গী কমলা যেন দুই পাও ধার।
কালন্ত ভোমরা রঙ্গের চক্ষের উপর॥
কলিকার উপরে যেন বসেছে ভ্রমর।
বুকের উপরে জোড় কমলা দেখিতে বাহার॥
যদিস্যাৎ রঙ্গমালা কার দিগে চায়।
নয় হল্লিয়া (৩) কোঁচে যেন প্রাণ কাড়ি লয়॥"

শেষের দুই পংক্তির "নয় হল্লিয়া কোচের" উপমাটী ঠিক সেই কবির উপযুক্ত হইয়াছে। এ রকম আরও কত আছে।

এহেন রঙ্গমালার স্বামী রামগতিয়া গুজার (কুজার) বর্ণনাটাও একবার দেখুন—

মেরু (৪) দাড়া ভাঙ্গি গুজার বুক হইছে খাচা।
মুখের দিগে দেখিতে লাগে চোক খোরলিয়া পেঁচা।
এই মতে গুজার দাউদে খাইছে সর্ব্ব অঙ্গ।
দেখিতে গুজার রূপ আনন্দ হয় ভঙ্গ॥

রঙ্গমালার বেশ ভূষার বর্ণনাটা বেশ হইয়াছে।—

মেঘ ডোম্বরের সাড়ি জরির অঞ্চল।
কাচাসোণা খোপায় যেন করে ঝলমল॥
বান্ধিল মোহন চুড়া জাদের খোচনী। (৫)
মস্তকের চূড়া বেড়ি রয়েছে নাগিনী॥

(১) এই লাইনের অর্থ বুঝা গেল না।
(২) রসাপিতে—রস পান করিতে।
(৩) নয় হল্লিয়া—নয়টা লোহার শলাকা বিশিষ্ট কোঁচ অর্থাৎ মাছ মারিবার অস্ত্র।
(৪) মেরুদণ্ড।
(৫) মুসলমানদিগের বিবাহ কালে চুল বান্ধিবার ভোর বিশেষ।

ইহাতে তখনকার স্ত্রীলোকের বেশ ভূষার পরিচয় পাওয়া যায়।

যখন রাজচন্দ্র খুড়ার পত্র পাইয়া রঙ্গমালার নিকট বিদায় নিতে গেল, তখন রঙ্গমালার উক্তি ঃ—

খেলি করে অলি-রাজ পুষ্পেতে বসিয়া।
যাইবার কালে যায় বন্ধু সেই ডাল ভাঙ্গিয়া॥
খেলি করে হংসরাজে জলে হাসি বসি।
যাইবার কালে যায় বন্ধু সেইজল দুষি॥
বেপারি পলাইয়া যদি চৈলা যায় ঘরে।
ডুবাইয়া সোণার ডিঙ্গা গভীর সাগরে॥

ইঙ্গা চৌধুরী রাজনারায়ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া এক বীরত্বসূচক পত্র লিখিয়াছিল—

মন ভয়ে যাও যদি কুপথের বন।
পক্ষীরূপ ধরি তথায় করিব গমন॥
মন ভয়ে যাও যদি দরিয়া মাঝার।
কুমির হইয়া যাব তোমার গোচর॥
পাতালে যাওরে যদি পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
ছলে বলে সৈন্য লই তথায় কর্ব্বো গতি॥

রাজকিশোর হত হইলে তাহার শোকে সকলে কি রকম কাঁদিয়াছিল দেখুন—

মরিল মরিল বলি সবেধ (১) হইল ধুল।
ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে বাগিচার ফুল॥
কান্দনের রোল শুনি কান্দে পশুগণ।
এই মতে বৃক্ষ আদি করয়ে রোদন॥
মাতা কান্দে পুত পুত ভৈন (২) কান্দে ভাই।
ঘরের রমণী কান্দে হারাইয়া গোসাই॥
হাতি কান্দে হাতি ঘরে আর কান্দে ঘোড়া॥
পেট্‌রাতে গড়াইয়া কান্দে গায়ের খাসা ঘোড়া॥
জলে কান্দে জল কুম্ভীর স্থলে কান্দে হাস।
পেটরাতে গড়াইয়া কান্দে হাতের(৩)গোলইন বাঁশ॥
জলে কান্দে জল কামড়ী (৪) গর্ত্তে কান্দে উদ। (৫)
উদয়পুরের গোয়ালা কান্দে ক্ষারে দিব দুধ॥

(১) সাদা। (২) ভগিনী। (৩) অস্ত্র বিশেষ।
(৪) জল পক্ষি-বিশেষ। (৫) জন্তু-বিশেষ।

স্থানে স্থানে কবির উপমাগুলির নূতনত্ব আছে ঃ—

যদিস্যাৎ রঙ্গমালা কার দিকে চায়।
নয় হল্লিয়া কোঁচে যেন প্রাণ কেড়ে লয়॥
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
অগ্নির হুলকা যেন গর্জ্জিয়া উঠিল॥
বাঁশ বিলে (৬) আগুন দিলে গিরা ফুটি যায়।
সে মতে গর্জ্জি উঠে চান্দাবীরের গায়॥
(৭)বগুলার ঝাঁকে যেন থাবা দিল বাজে।
এই মতে পড়ে চান্দা সৈন্যগণের মাঝে॥

পুস্তকের ভাষা।

এখন এই পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই অঞ্চলের প্রচলিত ভাষাতে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই প্রাচীন (archaic) বঙ্গভাষা এখনও এই জেলার প্রচলিত। পশ্চিম বঙ্গের বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার সহিত তুলনা করিলে এই ভাষাকে বাঙ্গলা বলিয়া চেনা কঠিন। ইংরাজী আর ফরাসী ভাষায় যতটা প্রভেদ, কলিকাতার ভাষা ও নোয়াখালীর ভাষার মধ্যে তদপেক্ষা কম প্রভেদ নহে। আরও প্রভেদ হয় উচ্চারণের দোষে। পশ্চিম বঙ্গের প্রচলিত ভাষার সহিত, এই অঞ্চলের ভাষার যে যে বিষয়ে পার্থক্য, নিম্নে তাহার কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি।

প্রথমতঃ ব্যাকরণগত পার্থক্য।

(১) অসমাপিকা ক্রিয়া। করিয়া, খাইয়া, দেখিয়া শব্দের অপভ্রংশ কোরে, খেয়ে, দেখে। কিন্তু এই অঞ্চলে-করি, খাই, দেখি। উড়িয়া ভাষাতেও করি, খাই, দেখি; তবে সেখানে আবার সময় সময় এই সকল শব্দের উপরে একটা "কিরি" ব্যবহৃত হয়, যেমন খাইকিরি, যাইকিরি।

(৬) বাঁশের ঝাড়। (৭) বকের।

তুম্ প্রত্যয় দ্বারা যে সকল অসমাপিকা ক্রিয়া সিদ্ধ হয়, তাহাতেও প্রভেদ আছে। করিতে, খাইতে, দেখিতে, এখানে কর্ত্তাম, খাইতাম, দেখতাম, আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। "আমি করিতে পারিব না" এই দেশের ভাষায় হইবে, "আমি কর্ত্তাম পার্ত্তাম না।" বলা বাহুল্য তুম্ প্রত্যয়টা "করিতে" অপেক্ষা "কর্ত্তাম" শব্দে সহজে ধরা পড়ে।

(২) ভবিষ্যৎ কাল। করিব, খাইব, দেখিব—এই সকল ভবিষ্যৎকাল বোধক ক্রিয়া কর্ত্তাম, খাইতাম, দেখতাম্ এইরূপে ব্যবহৃত হয়।

(৩) সতৃ প্রত্যয়। এই অঞ্চলের ভাষায় সতৃ প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াতে সেই প্রত্যয়টী স্পষ্ট দেখা যায়। উঠৎ, বসৎ, খাড়ায়াৎ, শোয়াৎ। বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় এক কথায় এইভাব প্রকাশ করা যায় না। "তাহাকে শোয়াৎ দেখিলাম"—ইহার অর্থ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় হইবে "তাহাকে শুইয়া থাকিতে দেখিলাম।" "শয়ান দেখিলাম" বলিলে সংস্কৃত হইল।

(৪) 'লাঠি ধরে যে', কিম্বা 'লঠি ধরা স্বভাব যার' এই অর্থ বিশিষ্ট একটী বিশেষণ সংস্কৃত 'শীল' প্রত্যয় দিয়া সিদ্ধ হইতে পারে, যেমন মরণশীল, গমনশীল।

বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় দুই একটী ভিন্ন এরূপ এক কথার বিশেষণ নাই; কিন্তু এখনাকার ভাষায় আছে। "লাঠি ধরে যে" এক কথায় হইবে লাঠি-ধরণীয়া। এই পুস্তকের একস্থানে এই রকম কতকগুলি বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—

"আর এক কথা চৌধুরী কহি তোমার ঠাই।
বাপুরিয়ার (১) লাইন (২) লড়াইকরণিয়া, ফাচ্ছদ কর-

(১) বাবু পুরিয়া
(২) লাইন মত।

নিয়া, তীর-ধরণিয়া, বাঁশ-ধরণিয়া, গোলন—(৩) মারনিয়া, ছেল—(৪) মারনিয়া, বর্শা মারনিয়া, বন্দুক-ধরনিয়া, মহারাজ ত্রিজগতে নাই।"

পাঠকগণ দেখিবেন, এটী কিন্তু পয়ার-ছন্দের মিলযুক্ত দুইটী লাইন। উদ্ধৃত অংশে সেই সময়ে কি কি যুদ্ধের অস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহাও দেখিবেন। যাহা হউক, এই রকম ক্রিয়া যুক্ত বিশেষণ ইংরাজী ভাষায়ও আছে যথা। bone splitting labour, bread-winning, ear-cutting ইত্যাদি।

(৫) কর্ত্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি এদেশে এটার বড় ছড়াছড়ী। কর্ত্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি এই অঞ্চলের ভাষায় এক রকম নাই বলিলেও চলে। রামচন্দ্র কহিল না বলিয়া ইহারা বলে "রামচন্দ্রে কহিল" সেই রকম আলিমদ্দীয়ে কহিল, সোণাউল্লায় কহিল, ইত্যাদি। এই গ্রন্থেও ইহার যথেষ্ট উদাহরণ আছে—

"আবুদ্ধিয়া মহারাজেরে কুবুদ্ধিয়ে পাইল ইত্যাদি। ঠিক এই রকম উড়িয়া ভাষায়, সম্বোধনে সপ্তমী বিভক্তি হয়—হে দাসে মিশ্রে, চৌধুরীয়ে, গোমস্তারে ইত্যাদি।

(৬) বহুবচন। 'আমাদের' 'তাহাদের' প্রভৃতি বহুবচনান্ত শব্দ, আমার গো, তাহার গো, এই রকম আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাগো এই কথা আবার উচ্চারণ দোষে 'আঙ্গো' হইয়া পড়ে।

(৭) সপ্তমী বিভক্তি। বাড়ীতে, নদীতে, প্রভৃতি সপ্তম্যন্ত শব্দ, 'বাড়ীৎ' 'নদীৎ' এই আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৮) "তুমি গিয়াছ নাকি?" এস্থলে নাকি শব্দ স্থলে 'নি' ব্যবহৃত হয়। যাই পুনি, খাই ছনি, দেখছনি ইত্যাদি।

(৯) 'সে যাবেনা' এখানে না শব্দের পরিবর্ত্তে ঠিক মূল সংস্কৃত 'ন' ব্যবহৃত হয়। উড়িয়া ভাষায়ও এই রকম 'ন' অর্থে 'না,' তবে তাহা ক্রিয়ার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন মু ন-যিমি—আমি যাব না।

(১০) 'বাড়ী হইতে আসিল'—এই 'হইতে" বা থেকে স্থলে 'তুন' শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাড়ী 'তুন' ঘরর তুন, ইত্যাদি। বিক্রমপুরে আবার এই 'তুন' 'তুনে' বা থনে এই আকার প্রাপ্ত হয়।

(১১)'তবেত রাজিন্দ্রেরে দিবাম ছাড়িয়া।' এস্থলে দিবাম অর্থে দিব। ঠিক সংস্কৃতের 'আনি, আব আম' প্রত্যয়ের আম। চলিত কথায় সচরাচর দিবাম স্থলে দিবাঁ এই চন্দ্র বিন্দু যুক্ত পদ দেখা যায়।

(১২) তুই ভাত খাস "এখানে" খাস শব্দ খাইস শব্দের সংক্ষেপ। সংস্কৃত 'সি-অস্ থ'এর 'সি' প্রত্যয়ান্ত। এখানকার ভাষায় খা'স না হইয়া 'খাছ' ব্যবহৃত হয়। যেমন সোণামালা তাঁহার দাসীকে বলিতেছেন—

"বান্দী দাসীর জাতি তোরা সদায় পিছা খাছ।
কিল ঘুষা পাইলে তোরা আগে আগে ধাছ॥"

খাছ—খাস; ধাছ—ধাস, দৌড়াইয়া যা'স।

(১৩) 'তুমি আমার একটা কথা রাখ দেখি' কিম্বা 'রাখত'। এস্থলে দেখি বা ত' স্থলে চাই বসে। যেমন—

"থোড়া একটী কথা মোর তুমি রাখা চাই।
বদরঙ্গের গাঁজা দিয়া শরবত বানাও চাই।"

(১৪) খাইবার জন্য এস্থলে খাইবার 'লাগি' কিম্বা "খাইবার লাই" ব্যবহৃত হয়।

(৩) গোলইন—যুদ্ধের অস্ত্র বিশেষ। লেষ মাটির গুলী ছোড়ার জন্য বাঁশের বন্দুক বিশেষ।
(৪) ছেল—অস্ত্র বিশেষ।

(১৫) "সে সেখাতে গিয়া কি করিল? না এই কাজ করিল, এই কি করিল? স্থলে 'কোন কাম করিল' ব্যবহৃত হয় যথা—

এইমতে দাসীগণ কোন কাম করিল।
স্নান করাইয়া কন্যায় সাজাইতে লাগিল॥

উড়িয়া ভাষাতেও ঠিক এই রকম প্রয়োগ আছে।

অনেকগুলি বিশুদ্ধ শব্দ কেবল উচ্চারণের দোষে অন্য রকম বোধ হয়। নিম্নে তাহার কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি—

(১) বর্ণের প্রথম বর্ণ দ্বিতীয় বর্ণের ন্যায়, দ্বিতীয় বর্ণ প্রথম বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়। আবার তৃতীয় বর্ণ চতুর্থ বর্ণের ন্যায়, ও চতুর্থ বর্ণ তৃতীয় বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

একদিন একটী বালক "কাল—কেশ, ভাল—বেশ" কে "খাল খেশ, বাল ভেশ" বলিয়া পড়িতেছিল।

(২) ক, খ, প, ফ, শ, ষ, স এই সকল বর্ণগুলি অনেক সময়ে 'হ' বলিয়া উচ্চারিত হয়।

পাঁচ টাকা—"হাঁছ ঠেহা" এই আকার প্রাপ্ত হয়।

একটী স্ত্রীলোকের নাম হাতেমা। এখন সেই হাতেমা প্রকৃতই হাতেমা, কিম্বা ফাতেমা, সাতেমা, খাতেমা, ইহার কোন-টার অপভ্রংশ তাহা ঠিক করা কঠিন।

বঙ্গদেশের এক প্রান্ত উড়িষ্যা হইতে, অন্যপ্রান্ত নোয়াখালী জেলা পর্য্যন্ত রজত মুদ্রার কিরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা আলোচনা করা বড়ই কৌতুকজনক।

উড়িষ্যায়—টঙ্কা।
মেদিনীপুরে—তঙ্কা, টাঁকা।
কলিকাতায়—টাকা।
ফরিদপুরে—টাকা, টাহা।
ঢাকায়—টেকা, টেহা।
নোয়াখালীতে—ঠেহা।

কতকগুলি শব্দ।

এখন এই অঞ্চলের প্রচলিত কতকগুলি শব্দ ও তাহার অর্থ উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।—

টাঙ্গন—ঘোড়া।
ধৈল্লা—ধবল, সাদা।
জাদ—মুসলমানের বিবাহকালীন কেশ বাঁধিবার ডোরা।
থোবানী—গুচ্ছ।
কেওয়াড়—কপাট।
মেঘডোম্বর—শাড়ী বিশেষ।
ছোলাঠার—কটাক্ষ, ইঙ্গিত।
ভৈন—ভগিনী।
লগে—সঙ্গে।
জরপ—আঘাত।
টবরু—উল্লম্ফন দেওয়া।
ধাড়ী কাটা—হোগলার অংশ যাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।
দায়াড়—উপরে উঠিবার ধাপ বা সিঁড়ি।
ফুকী মারা—peep উকি দিয়া দেখা।
পটপটীয়া কথা বলা—তাড়া তাড়ি কথা বলা।
নাটা—দুষ্ট।
খটখাইয়া হাসা—উচ্চ হাস্য।
গলার খাওর—কণ্ঠদ্বারা অস্পষ্ট শব্দ করা।
কায়লানী—কাল, ভীষণ মৃত্যু।
নাসরা মসারা কথা—অপ্রিয় ভাষ।
ফালাই—ফেলিয়া।
ফাল—লাফ।
পাতি—পত্র।

খোয়াখাই—শিশির ভোগ করি।
বর্ত্তন—নিমন্ত্রণ।
তুরমান—শীঘ্র, সত্বর।
উরু ধরা—কোমর ভিড়া।
কল্লা—মুণ্ড।
চাই চাকরিয়া—চাকর বাকর।
কিসের লাই—কি জন্য।
তার্গ—তাদের—
কোল—অঙ্গীকার।
আপনা জাগাত—নিজ জায়গায়।
চঙ্গ—মই।
ছোলান—টানিয়া বাহির করা।
ঘরের পিছাড়া-ঘরের পশ্চাৎ।
হাঁ জর—কম্প জ্বর।
মাতিল না—কোন উত্তর দিল না।
আউলাইয়া—এলো মেলো করিয়া।
পোলা পান—ছেলে পেলে।
তৈনাত—শীঘ্র তলব তাগাদা করা।
ভাবইয়া—নর্ত্তক বিশেষ।
বেয়ানে—প্রাতে।
মতে মতে—গোপনে গোপনে।
হুলকা—শিখা।
হামইল—তাঁত বাঁধিবার খুটি বিশেষ।
বাইন দুয়ার—পাছের ছোট দুয়ার।
পিলাইয়া—যাহার প্লীহা রোগ হইয়াছে।
খাছিয়াত—স্বভাব।
বুরা—খারাপ, মন্দ।
হাউসে—সখে, আহ্লাদে।
জোনা—জাতিটাকা—মেয়ে মানুষ ও শিশুদিগের সঞ্চিত টাকা।
কল্লা—মাথা।
সোটান—তালাস করা।
জরপ—ব্যথা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বীর কি বঙ্গে অসম্ভব?

পঞ্জাব-কেশরী মহাবীর রণজিৎ সিংহ তখনকার ভারতবর্ষের মানচিত্র মধ্যে ইংরাজ কোম্পানির অধিকৃত প্রদেশ সমূহকে রক্ত-রঞ্জিত দেখিয়া বলিয়াছেলেন, "সব লাল হো যায়েগা"। বাস্তবিক তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী এখন আমরা কার্য্যে পরিণত দেখিতেছি। সে সময়ে শুধু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, এখন সমগ্র এসিয়া মহাদেশের প্রতি তদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিনা, অনেকেরই চিন্তা ও ভাবনার বিষয় হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের এসিয়ার মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে, উত্তর ও উত্তর পূর্ব্ব হইতে রুশিয়া, দক্ষিণ হইতে ইংরাজ এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব হইতে ফরাসী জাতি যে ভাবে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে অনতিদূর ভবিষ্যতে সমগ্র এসিয়াখণ্ড যে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের পদানত না হইবে, এ কথা কে বলিতে পারে?

অধুনা চীন সাম্রাজ্যের যে একটা বিষম বিভ্রাট উপস্থিত, তাহার পরিণাম যে কি হইবে, বলা যায় না। অনেকেই দেখিতেছেন যে,উহা এখন যে আকারেই আপনাকে প্রকাশ করুক না, আসলে উহা এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে জীবন-সংগ্রাম। এসিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা বিধাতার অভিপ্রেত কি না, সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যই যেন এই চীন-বিপ্লবের অবতারণা। ইউরোপ বলিতে

এখানে আমেরিকাকেও উহার সঙ্গে বুঝিতে হইবে, কারণ আধুনিক আমেরিকা ইউরোপেরই এক অভিনব সংস্করণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাধারণ ভাবে আমেরিকা অর্থে উক্ত মহাদেশের যুক্ত রাজ্যটীকে মাত্র বুঝাইয়া থাকে।

ইউরোপীয় জাতিগুলি যে চীন সম্রাটের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধারহেতু বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এ কথা অবশ্য কেহ বিশ্বাস করেন না। চীনের অধিবাসীগণ যে বিদেশীয়গণকে পরমশত্রু বোধে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তৎপ্রতিরোধই ইউরোপীয় শক্তি সমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তাহারই জন্য এই বিপুল শোণিতপাতের আয়োজন। চীনরাজ্যে মোড়োলী করিবার অধিকার থাকিলে ইউরোপের কি লাভ যে এত ছুটাছুটি, মারামারি, কাটাকাটির প্রয়োজন, তাহা দেখা যাউক। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক শত চারি কোটী টাকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে চীনে আমদানি হইয়া থাকে। এই বিপুল অর্থের মধ্যে কিঞ্চিদধিক এক কোটী টাকা জাপানী জিনিসে যায়, বাকী সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে চালান্ হয়। তন্মধ্যে ইংরাজ প্রায় ছয়ষট্টি কোটী টাকার জিনিস বিক্রয় করেন, আমেরিকায় প্রায় সাড়ে দশ কোটীর, রুষ পাঁচ কোটির কিছু উপায় মূল্যের, এবং জর্ম্মন, ফরাসী, ইটালী প্রভৃতি আর আর সকলে মিলিয়া প্রায় সাড়ে দশ কোটী টাকার মাল বেচিয়া থাকেন। চীন সাম্রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইলে ইউরোপকে এই লোকসানটী সহ্য করিতে হইবে। তাহা ইউরোপ পারে না, বরং আরও বেশী মালের কাট্‌তি যাহাতে হয়, সে বিষয়ে সমূহ চেষ্টা ইউরোপের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইয়াছে। এই হেতু সমগ্র ইউরোপ এক হইয়া চীনের বিদ্রোহাদলকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই তুমুল ব্যাপার সম্মুখে দেখিয়া শ্বেতাঙ্গ জাতিগণের মনে কত প্রকার ভয় ভাবনা উদয় হইতেছে।

ইদানীং লণ্ডনের স্পেক্‌টেটর (Spectator) নামক পত্রিকা উক্ত বিষয়ের প্রস্তাবনা করিতে গিয়া বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তিনি এক স্থলে এসিয়াবাসীগণের শৌর্য্য, বীর্য্য, উদ্যম, সাহসের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন:—

"There is one race in Asia—the Bengalee—which openly acknowledges that it has not the heart to fight, though when in expectation of any form of non-contentious death it is more serene than the European."

অর্থাৎ এসিয়ার মধ্যে কেবল একমাত্র বাঙ্গালী জাতি প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করিয়া থাকে যে, তাহাদের যুদ্ধ করিবার সাহস নাই। যদিও অন্য প্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে তাহারা ইউরোপীয় অপেক্ষা ধৈর্য্য ধারণে সক্ষম।

এখন দেখা যাউক, বাঙ্গালী জাতি যুদ্ধ করিতে পারে কি না? পূর্ব্বকার কথা থাকুক, বর্ত্তমান শতাব্দীতে এ বিষয়ে তাহার কিরূপ প্রমাণ দিয়াছে, তাহাই বিবেচ্য। এখানে বাঙ্গালী মানে কেবল সুখের-পায়রা, ফিন্ ফিনে-ধুতি চাদর পরা বাবুদিগকে মাত্র ধরিলে চলিবে না। পৃথিবীর সকল দেশে যে শ্রেণীর লোক চিরকাল লড়াই করিয়া থাকে, তাহাদের বিষয় বিচার

করিতে হইবে। যুক্তি তর্কাদি দ্বারা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা পাইব না, কেবল একটী মাত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা দেখাইতেছি যে,বাঙ্গালা মুলুকের ছোট লোকেরা যুদ্ধের কষ্টসহিষ্ণুতা, উদ্যম, সাহস, উৎসাহ ইত্যাদিতে কোন জাতীয় ঐ শ্রেণীর লোক অপেক্ষা কিছুতেই কম নহে।

বহুকাল হইতে শান্তিপুরের সম্মুখস্থ গঙ্গার চড়াতে প্রতি বৎসর সমস্ত বৈশাখ মাসে দুই দল যোদ্ধাতে তুমুল সংগ্রাম হইত, এ কথা অনেকেই জানেন। সেই লড়াই যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনা গিয়াছে যে, দুই দিকে ২০।২৫।৩০ হাজার লোক জমা হইয়া যে প্রকার ঘোরতর যুদ্ধ হইত, তাহা দেখিলে ভয় হয়। মাথা ফটিয়া গিয়াছে, তখনই গাছগাছড়ার পটি বাঁধিয়া আবার সম্মুখ সমরে উপস্থিত।

এই যুদ্ধ ১লা বৈশাখ আরম্ভ হইয়া সংক্রান্তিতে শেষ হইত। কোম্পানির আমল হইলে উহা নিবারণের অনেক চেষ্টা হয়। কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করিতে পারা যায় নাই। শেষে নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কলিকাতা হইতে একদল সিপাহী লইয়া একবার উপস্থিত হন—তাহার ফল এই হয় যে, সাহেব ও সিপাহীগণ বিলক্ষণ প্রহার খাইয়া পলায়ন করত প্রাণ রক্ষা করেন।

ব্লাকিয়ার (Blackier) সাহেব ঐ সময়ে ঠগীর কমিশনর ছিলেন। তিনি বাল্যকালে শান্তিপুরের কোন ব্রাহ্মণের গৃহে পালিত হন *। কোম্পানি বাহাদুর তাঁহাকেই এই বার্ষিক রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। ব্লাকিয়ার সাহেব এক মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ চৈত্র মাসের প্রারম্ভে শান্তিপুরে গিয়া তাঁবু ফেলিয়া থাকেন, এবং শান্তিপুর ও তাহার চারিদিকের সমস্ত ষণ্ডা গোয়ারদিগকে ক্রমে ক্রমে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় চালান দেন। বৈশাখ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কয়েদ রাখিয়া পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই বৎসর হইতে ঐ লড়াই বন্ধ হইয়া যায়; সে আজ ৭০।৭৫ বৎসরের কথা।

এখন পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, কেবল মাত্র একটা সখের জন্য যে দেশের লোক এই প্রকারে প্রতি বৎসর আপোশের মধ্যে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ করিতে পারে; তাহারা যে বিশেষ কারণে উত্তেজিত হইলে প্রাণকে অতি তুচ্ছ বোধ করিয়া বীরের ন্যায় সম্মুখ সমরে উপস্থিত হইবে, ইহা আর বেশী কথা কি?

* ব্লাকিয়ার সাহেবের বৃত্তান্ত এক অদ্ভুত কাহিনী। তাঁহার পিতা কোম্পানি বাহাদুরের শান্তিপুরস্থ রেশমের কুঠির একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। লোকটা খুব উদার, সুতরাং বাঙ্গালী ঘেঁসা ছিলেন। তখনকার সাহেবদের মধ্যে অনেককেই ঐরূপ দেখা যাইত। পেন্সন লইয়া কেহ কেহ দেশে ফিরিয়া না গিয়া এইখানেই অবস্থিতি করিতেন। এখনকার মত বিলাত যাত্রা এত সস্তা,সহজ ও সুবিধার ব্যাপার ছিল না। পালের জাহাজে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাইতে সময়ে সময়ে কুবাতাসে পড়িয়া ৮।১০ মাস পর্য্যন্ত পথেই কাটিয়া যাইত। সুতরাং এদেশে দীর্ঘকাল বাস করিতে বাধ্য হইয়া দেশীয় লোকের সহিত বেশী মেশামিশি ভিন্ন গত্যন্তর কোথায়? স্বদেশীয়ের সংখ্যাও অতি অল্প ছিল, কাজেই বাঙ্গালী ভদ্র লোকের সহিত বন্ধুতা না করিয়া উপায় ছিল না। বৃদ্ধ ব্লাকিয়ারের মৃত্যুকালে তিনি পুত্রকে কোন বাঙ্গালী বন্ধুর জিম্মা দিয়া যান। বালক ডাল ভাত খাইয়া তাঁহারই গৃহে প্রতিপালিত হন। পরে শ্বেত চর্ম্মের গুণে কোম্পানির সরকারে নিযুক্ত হইয়া উচ্চপদারূঢ় হয়েন। তিনি বাঙ্গালীদের, বিশেষ শান্তিপুর ও তন্নিকটস্থ লোক সমূহের, নাড়ী-নক্ষত্র খুব জানিতেন। কাজেই তাঁহার দ্বারা এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

বাঙ্গালীর অপবাদ, বিলাসী বাঙ্গালী বাবুদের জন্য; নতুবা এ প্রদেশের বাগ্‌দী, ছলে, কাওরা প্রভৃতি লাঠিয়াল জাতিগণকে যদি উত্তমরূপ শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহারা অনেক স্থলে শিখ, গুর্খা অপেক্ষা গৌরবের সহিত কাজ করিতে পারে; এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

আর ঐ কোমল প্রকৃতি বাবুদলের মধ্যে যে বীর জন্মিতে পারে না, সুরেশ বিশ্বাসকে দেখিয়া সে কথা কি প্রকারে বলি? তবে এক কথা যে, সকল কাজেই উৎকর্ষতা লাভ করিতে গেলে অভ্যাস চাই। ক্রমে বাঙ্গালা মুলুক হইতে অস্ত্র শস্ত্রাদির ব্যবহার রাজাজ্ঞায় উঠিয়া যাইতেছে। এ ক্ষেত্রে কালে যে বাঙ্গালা প্রদেশে আর মোটেই বীর দেখিতে পাওয়া যাইবে না, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? যে সময়ে বাঙ্গালায় বাঙ্গালীরা সর্ব্বদা লড়াই করিত, বিখ্যাত বীর আশানন্দ ঢেঁকি প্রভৃতি সেই সময়কার লোক।

সেকালে যখন ভয়ঙ্কর ডাকাতী হইত, তখনকার কথা শুনা গিয়াছে যে, ডাকাইতগণ বড় বড় মশাল জ্বালিয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে; গৃহস্থগণ সবাই পলাইয়াছেন, বৃদ্ধ কর্ত্তা পাছে পড়িয়া আটক্ হইয়া হাহাকার করিতেছেন; বাড়ীর পাইক কর্ত্তাকে পৃষ্ঠে লইয়া বামহস্তে দশ বার থানা পিতলের থালা সহ তেতোলার ছাদ হইতে লম্ফপ্রদান করতঃ নীচে পড়িয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর উপর এক একখানা থালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে অনায়াসে ডাকাতের ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়ন করিল। ইহাদের প্রত্যুৎপন্নমতি ও শৌর্য্যবীর্য্যাদি কি শিখ, গুর্খা, ফরাসী, হাইলাণ্ডার প্রভৃতি কাহারও অপেক্ষা কোন্ অংশে কম? বেশী দিনের কথা নয়, পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বেও শুনা-গিয়াছে যে, ঐ রূপ ডাকাইতদিগের দলের সর্দ্দারী কার্য্যে অনেক ভদ্রলোকও যাইতেন। দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতিতে যাহাকে আমরা ক্ষুদ্র সংগ্রাম বলিতে দ্বিধা করিব না, ভদ্রলোক অস্ত্রাদি ব্যবহারে ধরা পড়িয়া মেয়াদ খাটিয়াছেন, এরূপ অতি অল্পকাল পূর্ব্বেও শুনা গিয়াছে।

এ সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত অপবাদ সম্বন্ধে সত্যাসত্যতা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য এস্থলে এ কথাও স্বীকার্য্য যে, দুঃখ অভাবে পড়িয়া কি ইতর কি ভদ্র বিস্তর বাঙ্গালী অন্নবস্ত্রাভাবে পিতার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া বসিয়াছেন, বীরভাব বিস্মৃত হওয়াত অল্প কথা। জমিতে ভাল ফসল হয় না, গোধনাভাবে ঘৃত দুগ্ধের অনাটন, আমরা খাই কি? যাহা কিছু উত্তম উত্তম দ্রব্য, পল্লিগ্রামাদি হইতে সহর বাজারে উপস্থিত হয়, সাহেব-সুবা বড় বড় বাবুরা দ্বিগুণ মূল্যে আত্মসাৎ করেন। তাঁহাদের পরিত্যক্ত সামগ্রীমাত্র মধ্যবিৎ ভদ্রলোক ও নিম্নশ্রেণীর লোকের ভাগ্যে জুটে। ধান,গম শস্যাদি প্রচুর হইলেও রপ্তানীর জ্বালায় চিরকালই মহার্ঘ্য। দরিদ্র লোকের দুর্দ্দশার সীমা নাই, তাহাদের পক্ষে বারমাস দুর্ভিক্ষ। অর্থাভাবে কদর্য্য আহার, কদর্য্য পরিচ্ছদ, গৃহাদির কদর্য্য ব্যবস্থা জন্য দেশব্যাপী জ্বরাদি রোগ। এ ক্ষেত্রে বীর প্রসব ত দূরের কথা, কেবল নরাকার কঙ্কালমাত্র প্রসব করিয়াই বঙ্গমাতা ক্ষান্ত হইতেছেন

এ ভাবে চলিলে দুই এক শতাব্দী মধ্যে বাঙ্গালীবংশ একেবারে লোপ পাইবে কি না,সে বিষয়ে অনেকের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। দেশের ক্ষমবান পুরুষগণ সম্পূর্ণ উদাসীন, রাজা বেশী কি করিতে পারেন, তাঁহারা ত এদেশে রথ দেখিতে আসেন নাই, কলা বিক্রয়ই উদ্দেশ্য; কাজেই আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। মধ্যবিৎ ভদ্রলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা ভাল অবস্থার লোক, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার অবশ্য অনেকাংশে সুফল বলিবার সম্ভাবনা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের আদৌ অবকাশ নাই। হাকিমী, ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী কার্য্যে প্রায় সমস্ত দিন কাটিয়া যায়; দিনান্তে যে টুকু ছুটি পান, গৃহিণীর মন যোগাইতে, কোম্পানির কাগজ অলঙ্কারাদির সংবাদ রাখিতেও কুলায় না। ইহার মধ্যে কাহারও কাহারও মিউনিসিপাল কার্য্য, রায় বাহাদুরী, রাজা বাহাদুরীর চেষ্টা, সাহেবদিগের দরবার, কন্‌গ্রেসাদি নানা জাতীয় সভাসমিতির পাণ্ডাগিরী ইত্যাদি বহুতর না-করিলেই-নয় কর্ত্তব্য আছে। সুতরাং গরিবের দুঃখের কথা, দেশের দুরবস্থার কথা ভাবিবার অবকাশ কোথা? রামসিংহ জমিদারের * ন্যায় ইঁহাদের দুই হাত যোড়া, কাজেই কিছু করিবার উপায় নাই। আমরাও সেজন্য কোন প্রকার অনুযোগ করিতে পারিনা।

যাহা হউক, এখানে ও কান্না কাঁদিয়া আর ফল কি? এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া উচিত যে, ভাল খাইতে পরিতে পাইলে উপযুক্ত শিক্ষার অধীনে ভদ্রেতর বাঙ্গালীও যুদ্ধকার্য্যে বীরত্ব প্রদর্শন করিতে অক্ষম নন। তবে স্ত্রীর আঁচল-ধরা অপদার্থ, হীনবীর্য্য জীবগণকে যে কোন কালে সংশোধন করিতে পারা যাইবে না, এ কথাও সত্য। কিন্তু ইহাও এস্থলে বক্তব্য যে,ঐ শ্রেণীর সুমন্দ-সমীরণে দোদুল্যমান ফটিক চাঁদ বাবুর সংখ্যা কলিকাতা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ জনপদ সমূহে যেরূপ অধিক, বঙ্গ দেশের অভ্যন্তরে সেরূপ নয়। আশৈশব প্রকৃতির সঙ্গে যে জাতি যে পরিমাণে সংগ্রাম করিতে বাধ্য হয়,সেই পরিমাণে সে জাতির মধ্যে বীরভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যে সকল নগরবাসীর চক্ষে পর্ব্বতের বন্ধুর উচ্চতা, সমুদ্রের তরঙ্গ বা নদ নদীর তুফানের ন্যায় কোন দৃশ্য কখন পড়ে নাই, তাহারা ভীরু হীনমতি হইতে বাধ্য। অপর দিকে প্রকৃতির মৃদুমন্দ কোমলতা যাহারা কদাচিৎ অনুভব করিতে অবকাশ পায়, এরূপ পর্ব্বত, প্রান্তর, সমুদ্রতটবাসী লোক বলিষ্ঠ-হৃদয় দৃঢ়কায়, সহিষ্ণু হইবেই হইবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

* কোন ধনবানের গৃহে রাত্রিতে ডাকাইত পড়িয়া সব লুটিয়া লইয়া গেল, অথচ সে সময়ে রাম সিংহ জমাদার ঢাল তরওয়াল হাতে দেউড়ি পাহারা দিতেছিলেন। বাড়ীর বিধবা কর্ত্রী প্রাতঃকালে জমাদারকে ডাকিয়া অনুযোগ করাতে তিনি কৈফিয়ত দিলেন, "মা ঠাকুরুণ। আমি কি করি? আমার এক হাতে ঢাল, এক হাতে তরওয়াল, আমার দুই হাত যোড়া, কাজেই আমি নিরুপায়; দেউড়িতে উপস্থিত থাকিয়াও কিছু করিতে পারিলাম না। আমার ইহাতে দোষ কি?" সাফ্‌কথা!!! বেকসুর খালাশ।

বর্ণসাম্য ও ধর্ম্মসাম্য।

দ্বিজত্ব নিবন্ধন অর্থাৎ আর্য্যানার্য্য সংশ্রবোৎপত্তি বশতঃ বর্ত্তমান হিন্দুর গাত্র চর্ম্ম কিরূপ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা ভাল। ঋগ্বেদে আর্য্যবর্ণের যে বর্ণনা পাই, তাহা শ্বেতবর্ণ; অনার্য্য বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। বর্ত্তমান ইংরেজের বর্ণ আর্য্যবর্ণ—শ্বেতবর্ণ। সাঁওতালদিগের বর্ণ অনার্য্য বর্ণ—কৃষ্ণবর্ণ। এক্ষণ যদি ইংরেজের বর্ণবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ ব্যক্তির শরীরে শত ফোটার শত ফোটাই আর্য্যরক্ত আছে, বিবেচনা করা যায় এবং সাঁওতালের বর্ণানুরূপ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির শরীরের শত ফোটার এক ফোটাও আর্য্যরক্ত নাই ধরা যায়, তবে হিন্দুজাতি (caste) সকলের মধ্যে আর্য্যানার্য্য রক্তের অনুপাত কি, তাহা স্থিরীকৃত হইতে পারে। আমরা একটী সবডিবিসনের প্রায় ২০০ স্কুলের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ছাত্রগণের গাত্রবর্ণের যে অনুপাত এই প্রণালীতে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিম্নে তালিকাবদ্ধ করিলাম।

জাতি			শতকরা যত ফোটা আর্য্যরক্ত আছে।
১।	ব্রাহ্মণ	...	২৩.৫
২।	কায়স্থ	...	২১.৬
৩।	ভূমিজ বা ভূমিহর ব্রাহ্মণ		২০.৬
৪।	কুর্ম্মী	...	২০.৬
৫।	ছত্রী	...	২০.৫
৬।	সুবর্ণবণিক	...	২০.৫
৭।	ময়রা (মোদক)		২০.২
৮।	সদ্গোপ	...	১৯.৭
৯।	বারুই (পর্ণজীবী		১১.৫
১০।	তাঁতী	...	১৮.৭
১১।	কংশবণিক	...	১৮
১২।	রাজপুত	...	১৭
১৩।	বৈদ্য	...	১৬.৮
১৪।	কুম্ভকার	...	১৬.৫
১৫।	গোয়ালা	...	১৬.১
১৬।	গাড়ুড়ী	...	১৬
১৭।	সো (শুঁরী)	...	১৬
১৮।	কোরাণিকহিন্দু	...	১৫.৮
১৯।	পুণ্ডরীক	...	১৫.৮
২০।	কর্ম্মকার	...	১৫.৬
২১।	নাপিত	...	১৫.৬
২২।	নাগর	...	১৫.৫
২৩।	শংখবণিক	...	১৫.
২৪।	কুরী	...	১৫
২৫।	কুঙার গোয়ালা	...	১৫
২৬।	চাষত	...	১৫
২৬।	মালাকর	...	১৪
২৭।	তিলি	...	১৩.৩
২৮।	সোণার	...	১৩.২
২৯।	বৈষ্ণব	...	১২.২
৩০।	ধানুক	...	১২.
৩১।	তেলী	...	১১.৫
৩২।	লেট	...	১১
৩৩।	কৈবর্ত্ত	...	১০.৮
৩৪।	ডোম	...	১০.৫
৩৫।	মুচী	...	১০.২
৩৬।	রাজবংশী	...	১০
৩৭।	কাহার	...	৯
৩৮।	চাঁই	...	৮.৫
৩৯।	মেহানা	...	৮.৩

৪০।	কোনাই (কুড়ুন)		৮.১
৪১।	মহাতা	...	৮
৪২।	রজক	...	৮
৪৩।	মালো, শুঁড়ী, পারোয়ান		৮
৪৪।	মাল	...	৭.৯
৪৫।	দোসাদ	...	৭.১
৪৬।	বিন্দ	...	৭
৪৭।	কেওট	...	৬.২
৪৮।	হাড়ী	...	৫.৭
৪৯।	সাঁওতাল	...	৪.৩
৫০।	বুনো	...	২.
৫১।	বাদ্দী	...	১
৫২।	ভর	...	০

ইহাদের মধ্যে ভুমিজ বা ভূমিহর, কুর্ম্মী, ডোম, লেট, চাষত,মহাতা, পারওয়ান, বিন্দ, বাদ্দী ও ভরের ছাত্র অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় নাই। তবে ঐ সকল জাতির চেহারা আমি যতদূর পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, উঁহাদের অধিক সংখ্যক লোক লইয়া পরীক্ষা করিলেও ফল বড় ভিন্নরূপ হইবে না।

পক্ষান্তরে কোরাণিক হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ের ছাত্র অন্য প্রত্যেক বর্ণের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় পরীক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আর্য্যরক্ত শতকরা ১৫.৮ ফোটা দেখা যায়। কোরাণিক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কাজি মোল্লা ইত্যাদির শরীরে উক্ত অনুপাত ২০র কম হইবে না, কৃষক সম্প্রদায়ের অনুপাত ১০র কম হইবে। কোরাণিক বৈশ্য যথা জোলা, কাগজী প্রভৃতি জাতির গাত্রবর্ণ প্রায় তাঁতীর গাত্রবর্ণের তুল্য অর্থাৎ শতকরা ১৮.৭ ফোটা আর্য্যরক্ত প্রদর্শক।

ব্রাহ্মণ সংখ্যার মধ্যে অবশ্য বর্ণ-ব্রাহ্মণ ভুক্ত হইয়াছে। কায়স্থ সংখ্যায় উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থই অধিক ছিল। সো শ্রেণীর মধ্যে বঙ্গদেশীয় সো শ্রেণীকে একত্রে ধরা হইয়াছে।

যে মহকুমার স্কুলের ছাত্রের গাত্রবর্ণানুসারে এই তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, সে মহাকুমাটি বঙ্গ বিহারের সন্ধিস্থলে, রাঢ় ও বাগড়ী উভয়ত্র বিস্তৃত এবং বরেন্দ্রের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী। ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, বঙ্গ বিহারের জনসংখ্যা লইয়া বিস্তৃতাকারে পরীক্ষা করিলেও ফল বড় বিভিন্ন হইবে না।

উপরোক্ত তালিকানুসারে দেখা যায় যে, বঙ্গের ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির জাতীয় দেহেও সিকি মাত্রায় আর্য্যরক্ত নাই। হইতে পারে, কোন ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ অত্যুৎকৃষ্ট গৌরবর্ণ বিশিষ্ট, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ২।৪ জন ছাপ বর্ণের লোক নাই কোন্ জাতিতে? আমি চামারের মধ্যে অতি পরিষ্কার বর্ণের লোক দেখিয়াছি। ব্রাহ্মণের মধ্যে শশধর তর্কচূড়ামণি, কায়স্থের মধ্যে দ্বারকানাথ মিত্র, বৈদ্যের মধ্যে দীননাথ সেন এবং তিলির মধ্যে যে অনেক কৃষ্ণদাস পাল আছেন, ইহাই বা কে অস্বীকার করিতে পারিবেন?

তাহার পর, যাঁহার গাত্রচর্ম্ম আর্য্যবর্ণের সমতুল্য আছে, তাঁহার রক্তও যে কোন পূর্ব্বতন পুরুষে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের রক্তসংশ্রবের ভিতর হইতে আইসে নাই, ইহা বলাও বড় স্পর্দ্ধার কথা। ফলে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ দ্বিজত্ব বা সঙ্করত্ব বশতঃ ভারতীয় জাতি বৃন্দের মধ্যে যে কোন একটী বিশেষ জাতি নিব্বচ্ছিন্ন আর্য্য রক্ত বিশিষ্ট বা অনার্য্য রক্ত বিশিষ্ট আছে, এ কথা আমরা বলিতে পারিব না। এজন্য আমরা পূর্ব্বাপর

বলিয়া আসিতেছি যে অনার্য্য সংশ্রব মধ্যবর্ত্তী কালে নিন্দনীয় বিবেচিত হইলেও, এক্ষণ যখন সকল বর্ণের শরীরে অনার্য্য রক্ত প্রবহমান দেখা যায়, তখন একবর্ণ অপর বর্ণের অস্পৃশ্য এক বর্ণের অন্ন অপর বর্ণের অখাদ্য, একের কন্যা অপরের অগ্রাহ্য এ অলীক সংস্কার যত শীঘ্র বিদূরিত হয়, ততই ভাল।

অনেকে বলেন,দীর্ঘকাল হইতে আর্য্যগণ ভারতে উপনিবিশিত হইয়াছেন বলিয়া, রৌদ্রাতপ বশতঃ তাঁহাদের গাত্রবর্ণ-মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্বেতবর্ণ মলিনত্ব প্রাপ্ত হওয়া এক কথা, কৃষ্ণবর্ণ আর এক কথা। তার পর, পরিষ্কার বর্ণের-ব্রাহ্মণ কায়স্থ যে একেবারেই নাই, এমত নহে। যদি জল বায়ু বশতঃ (Climaatic influence) বশতঃ এই বর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিত, তবে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কৃষ্ণবর্ণ হইল না কেন? বিশেষতঃ এমন ঘটনা অনেক পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, যেখানে পিতা মাতা যথাক্রমে গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ, সেখানে প্রথম সন্তান কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিতীয় গৌর বর্ণ, তৃতীয় কৃষ্ণ বর্ণ, এবং চতুর্থ গৌরবর্ণের হইয়াছে। একই ভাই বোনের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের লোক এদেশে বিরল? এই সকল স্থলে কি বুঝিতে হইবে, কোন একটী সন্তানের উপর জল বায়ুর প্রভাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, অপরের উপর হয় নাই? প্রথম সন্তানের উপর জল বায়ুর প্রভাব বর্ত্তিল, দ্বিতীয়ের উপর বর্ত্তিল না, ইহাই বা কি প্রকার কথা? এক পাড়ায়, এমন কি এক চতুঃশালের ভিতরে বাস করিয়া এক ব্রাহ্মণ গৌর বর্ণ রহিলেন, অপর ব্রাহ্মণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে কি কোন বোধগম্য জল বায়ুর কারণ অনুভূত হয়? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতীয় জনসংখ্যার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণত্বের এত আধিক্যের কারণ অনার্য্য সংশ্রব ভিন্ন আর কিছুই নহে; জল বায়ুর আধিপত্য অত্যল্প বলিয়াই বোধ হইতেছে।

আবার নাসিকার উচ্চত্ব ও পরিসরের অল্পত্ব অবলম্বন করিয়াও আর্য্যোৎপত্তির কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমি ব্রাহ্মণের মধ্যেও চৈনিক নাসিকা দেখিয়াছি এবং মেথরের মধ্যে অল্প পরিসরের নাসিকার সংখ্যা কম নহে। কৈবর্ত্তের নাসিকার মত যে কোন ব্রাহ্মণের নাসিকা নাই, এই কথা কি কেহ বলিতে পারেন? কায়স্থগণের অত্যুচ্চ নাসিকা স্থির হইয়াছে। কিন্তু অনাচরণীয় পুণ্ডরীকগণের মধ্যেও অনেক উচ্চ নাসিকাবিশিষ্ট লোক দেখা যায়। ফলে যে দিক্ দিয়াই দেখা যায়, ভারতীয় জাতিবৃন্দ কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল, কি কায়স্থ, কি দোসাদ, কি বৈদ্য, কি বাগ্দী, সকল বর্ণেই আর্য্যানার্য্য রক্তের মিশ্রণ অনুভূত হইতেছে। অবিকৃত আর্য্যরক্ত কোথাও নাই।

আমরা যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতেও এই কথাই সমর্থন করে। তবে যাঁহারা আমাদের প্রদত্ত তালিকায় বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, তাঁহারা আমাদের প্রদর্শিত পন্থানুসারে অথবা বৃহৎ বৃহৎ নিমন্ত্রণকালে কিম্বা অন্যরূপ জনসমারোহের সময়ে জাতি সকলকে পৃথক করিয়া প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সংখ্যাপাত করত গড় স্থির করুন। তার পর বলুন, অবিমিশ্রিত আর্য্যরক্ত কোন্ জাতির শরীরে আছে?

ফলতঃ এক্ষণ যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে

প্রায় বর্ণ-সাম্য ঘটিয়াছে। সবর্ণ বিবাহ প্রথা তুলিয়া দিলে বর্ণ সাম্য সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। যে জাতি যত নিম্ন স্তরে, সবর্ণ প্রথার তিরোধানে তাহার তত ইষ্ট ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা। এক্ষণে যে প্রকার বিবাহ শঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে উচ্চবর্ণের জাতিগণের মধ্যেও অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলনের চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য। সুখের বিষয়, ব্রাহ্মণেরাই এই চেষ্টায় অগ্রগামী হইয়াছেন। বোধ হয়, একথা কাহার অবিদিত নাই যে, বিবিধ বর্ণের কন্যা সংগ্রহ করিয়া এক শ্রেণী ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ স্থানে স্থানে উহাদিগকে দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্রাহ্মণদিগের নিকট অল্পপণে বিক্রয় করে এবং এই সকল ব্রাহ্মণেরাও অক্লেশে গৃহিণী পায়। এই রূপ জীবন্ত পণ্যকে "ভরার মেয়ে" বলে। 'ভরার ছেলের' কথাও বাজারে উঠিয়াছে। কায়স্থ প্রভৃতি জাতি হইতে ছেলে লইয়া ব্রাহ্মণ কুমারীগণের পাণিপীড়নের চেষ্টা হইয়াছে, এমন কথাও শুনিয়াছি। তবে ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। "ভরার মেয়ের" যত প্রচলন বৃদ্ধি হইবে, তদ্দৃষ্টে "ভরার ছেলে" প্রচলনের আবশ্যকতা তত হৃদয়সঙ্গম ও সহজ বোধ হইবে। বর্ণ-ভেদ ও তৎশাখা কৌলিন্য প্রথার ইহা একটী বিষময় ফল। এই বিষের কথঞ্চিৎ নিবারণই উক্তবিধ ঔষধের প্রয়োজন হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের গৃহে দিন দিন যেরূপ কন্যাদায় বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে গোপনে অসবর্ণ বিবাহের উক্ত প্রকার প্রচলন বৃদ্ধির বিলক্ষণ কারণই আছে। ব্রাহ্মণগণই এই কার্য্যে অগ্রগামী হইয়াছেন, সুতরাং অসবর্ণ বিবাহ প্রথার মূলে কীট প্রবেশ করিয়াছে।

কায়স্থের মধ্যে যে অসবর্ণ বিবাহ নাই, এ কথা বলা যায় না। কোন কোন স্থানের কায়স্থ, বৈদ্য ও শৌণ্ডিকের কন্যা বিবাহ করে। অনেক স্থানে কায়স্থ ও শূদ্র একীভূত হইয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গে কায়স্থ ও শূদ্রে অদ্যাপি কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, কিন্তু এই পার্থক্যও দ্রুতবেগে বিলুপ্ত হইতেছে। উপবীত গ্রহণে সাহস করিয়া কোন কোন বৈদ্য শূদ্র হইতে যত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, ব্রাহ্মণের নিকট তত অগ্রসর হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের পক্ষে একটী প্রশংসার কথা। এক্ষণ দেবার্চ্চন স্বহস্তে গ্রহণ করিলেই উপবীতের কতক সার্থকতা জন্মে এবং ব্রাহ্মণের মধ্যেও অপর একটী দ্বিজত্বের স্তরে উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মণের গাত্রবর্ণ ২৫.৩ এ অবনত করত আকাঙ্ক্ষিত সাম্যতার দিকে লইয়া যাইতে পারে।

বঙ্গের কায়স্থকে বঙ্গের nation বলিলেও বলা যায়। কায়স্থ শব্দের অর্থও কতক nation শব্দের অর্থানুরূপ। কায়স্থ ও কায়স্থের ব্যবসায় সকল জাতির আশ্রয়স্থল ও আকাঙ্ক্ষার চরম সীমা। এজন্য কায়স্থের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়া যেমন ব্রাহ্মণগণ আচারে ব্যবহারে বহুসংখ্যায় কায়স্থভাবাপন্ন হইয়াছেন, তেমন নিম্ন বর্ণের বহুলোকও, যেমন ব্যবসায়ে প্রকাশ্যে, তেমন রক্তসংশ্রবে গোপনে, কায়স্থভাব ধারণ করিয়াছেন। ফলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ যে প্রণালীতে আমাদের প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন, অন্যান্য জাতির তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। অনেকেরই মত এই যে, বর্ণব্রাহ্মণ মধ্যে তত্তৎ বর্ণের লোকই অধিক, কিন্তু তাঁহারা ফলে ক্রমে ব্রাহ্মণের সীমায় অধিবাসী হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা উচ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে

আদান প্রদান ও পানাহার করিতে না পারেন, তথাচ তাঁহারা যজন যাজন প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্মণ্য ভাব আশ্রয় করিয়া আছেন। স্পর্শদোষ প্রথা উঠাইয়া দিলে এই সকল ব্রাহ্মণ উচ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিশিয়া যাইবেন, সন্দেহ নাই। কায়স্থের প্রসার প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহানুভূতিমূলক। বঙ্গের আচরণীয় জাতির মধ্যে এমন জাতি নাই, যাহার কেহ না কেহ কায়স্থের সহিত রক্ত-সংশ্রবে না আসিয়াছেন। অনাচরণীয় জাতির মধ্য হইতেও যে কেহ এই আকাঙ্ক্ষিত জাতির সহিত রক্ত সংশ্রবে আসিতে কখন চেষ্টা করেন নাই, এমন কথাও আমরা বলিতে পারি না। ফলে ব্যবসায় ক্ষেত্র উন্মোচিত করিয়া দিয়া, নবদুর্ব্বাদল শ্যামবর্ণ দাশরথি রামচন্দ্রের ন্যায় কায়স্থ সাম্যের প্রকৃত ক্ষেত্রে কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, কি আচারণীয়, কি অনাচরণীয় সকল হিন্দুকেই আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই প্রণালীতে যদি বৈদ্য শূদ্র, কামার কুমার, রাজপুত সৎগোপ, তিলি তেলী, সোপুণ্ডরীক, চাঁই ধানুক প্রভৃতি জাতিবৃন্দ স্ব স্ব বর্ণের প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, তাহা হইলে জাতি সমূহের মধ্যে কি নব তরঙ্গ লীলার উদ্ভব হইবে, তাহার মধুরিমা ভাবিতেও হৃদয় পুলকিত হয়। তবে গতি কেবল নিম্নাভিমুখী হইলে চলিবে না। কায়স্থ ব্রাহ্মণের, বৈদ্য কায়স্থের, শূদ্র বৈদ্যের, তেরশাক নবশাকের, তেলি তিলির ইত্যাদি প্রকারে কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এবং এই চেষ্টা গোপনে হওয়া নিন্দনীয়। এইরূপ করিতে পারিলেই আমরা কোরাণিক হিন্দুর গাত্রবর্ণে গিয়া উপস্থিত হইব। বোধ হয়, উহা আদর্শ চরিত্র কৃষ্ণ ও রামের গাত্রবর্ণের মধ্যবর্ত্তী বর্ণ অর্থাৎ শতকরা ১৫.৮ ফোটা আর্য্য রক্তের জ্ঞাপক। ইহাই হিন্দুত্বের পূর্ণ বিকাশাবস্থা। ইহাতে দেশীয়তার প্রভাব যথোচিত স্বীকৃত হইয়া বৈদেশিতাকে করায়ত্ত ও পরাজিত অবস্থায় রাখিবে। কবে এই দিন ভারতে আসিবে, তাহাই এক্ষণ হিন্দুর চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

কেবল বর্ণেই আর্য্যভাব সিকি মাত্রায় কম, তাহা নহে, ধর্ম্মাচরণেও আর্য্যভাব সেইরূপ কম হইবে, সন্দেহ নাই। আজ কি কাহার গৃহে ইন্দ্র, মিত্রাবরুণ, অশ্বিদ্বয়, অর্য্যমা, পুষা প্রভৃতি আর্য্যদেবের পূজা প্রাপ্ত হন? কোন্ গৃহিণী আজ অদিতি দেবী, ইলা বা রমণীয়া ঊষাদেবীর অর্চ্চনা করেন? যদিও পূজাগ্রন্থ গুলির মধ্যে স্থানে স্থানে ইন্দ্র, অগ্নি, প্রজাপতি প্রভৃতি বৈদিক দেব নামের উল্লেখ দেখা যায়, তথায় সেই মন্ত্রের অর্থে ও লোকের বিশ্বাসে সেই প্রাচীন আর্য্যভাব কত টুকু? বরঞ্চ অর্চ্চনা গ্রন্থগুলির আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আর্য্যভাবের মধ্যে বহুল অনার্য্যভাব, ক্রিয়াকলাপ ও বিশ্বাসের মিশ্রণ সম্পাদনই এই গ্রন্থগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্মাচরণের মধ্যেও সিকি মাত্রায় আর্য্যভাব নাই। যে চতুর্দ্দশ প্রকার শ্রৌতযজ্ঞ, সপ্ত প্রকার পাকযজ্ঞ, পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞ এবং ষোড়শ প্রকার সংস্কারযজ্ঞ—এই দ্বিচত্বারিংশৎ কর্ম্ম আর্য্যদিগের সম্পাদনীয় বলিয়া সূত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন" * তাহারই বা কয়টী আজ অনুষ্ঠিত

* বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের হিন্দু শাস্ত্র, ৩য় ভাগ, ৩ পৃষ্ঠা।

হয়? ইহা বিবেচনা করিলেই হিন্দুর আনুষ্ঠানিক জীবনে আর্য্যানার্য্য ভাবের অনুপাত নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কাহার গৃহে আজ অগ্ন্যাধান, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, নিরূঢ় পশুবন্ধ, সৌত্রামণি প্রভৃতি হবির্যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে? কেই বা উক্থ্য, বাজপেয়, অতিরাত্র বা আপ্তোর্যাম প্রভৃতি সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন? যদিচ শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ, শ্রাবণী প্রভৃতি পাকযজ্ঞগুলি কোন না কোন প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়, তথায় এ গুলিও যে বহুল পরিমাণে পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? কে ইহা জানেন যে, আশ্বযুজী যজ্ঞই এক্ষণ লক্ষ্মী পূজা? সেই প্রকারে পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞ এবং ষোড়শ প্রকার সংস্কার যজ্ঞও সিকি পরিমাণে সেই প্রাচীন আর্য্যভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

পক্ষান্তরে কৃষ্ণ, কালীও মনসার রঙ্গময়ী অর্চ্চনা, শিলাশ্রিত বিষ্ণুপূজা, প্রস্তরাশ্রিত বিষ্ণুপূজা, বৃক্ষাশ্রিত বহু দেবদেবীর পূজায় এবং এই সকল পূজার মন্ত্রাভ্যন্তরে অনার্য্য ভাবের এত আধিক্য অনুভূত হয় যে, অনার্য্য রক্তের প্রবাহের সহিত অনার্য্য ধর্ম্মকর্ম্ম ভাবের মিশ্রণ করিয়া লওয়া একদা হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজনীতির মূলসূত্র ছিল। আর হতভাগ্য আমরা এই মূলনীতি বিস্মৃত হইয়া কেবল বর্ণপ্রাধান্য রক্ষা করার মানসে সংহারিণী ভেদশালিনী নীতিমূলে আমাদের পরম মুক্তির সংযোগ স্থল ভাবিয়া বসিয়া আছি। অহঙ্কারের উপর অহঙ্কারের স্তূপ সঞ্চিত হইতেছে, মৃত্যুর ছায়া সর্ব্বগ্রাসিনী রূপে চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া আসিতেছে, আর আমরা নির্ব্বোধের স্বর্গবাসের ন্যায় বর্ণভেদ সমর্থন করিয়া আনন্দভোগ করিতেছি। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ হিন্দুর জাতীয় দেহে তাহাদের স্বীয় রক্তের প্রবাহ এবং ধর্ম্মে ও আচরণে তাহাদের স্বীয় বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপের আধিক্য অনুভব করিয়া অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিবেন, মাত্র এই একটী আশা বিদ্যমান আছে। এ আশা কি পূর্ণ হইবে?

শ্রীমধুসূদন সরকার।

পৌনঃপুনিক অভিনয়।

যে ঊনবিংশ শতাব্দীকে লোকেরা স্বাধীনতার শতাব্দী বলিত, সেই ঊনবিংশ শতাব্দী সেদিন অনন্ত কালগর্ভে, অতীতের নির্ব্বাণ-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছে। বিংশের নব দুন্দুভিধ্বনিতে পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, ঊনবিংশ শতাব্দী কি বাস্তবিকই স্বাধীনতার শতাব্দী ছিল?

ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি, গারফিল্ড, থিওডোর পার্কার, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, উইলবারফোর্স, ব্রাইট এবং গ্লাডোষ্টোনের আবির্ভাব-শতাব্দী এক হিসাবে যে স্বাধীনতার শতাব্দী, সে কথা সত্য; কিন্তু অনাবিল সত্য কি না, সে সম্বন্ধে এখন গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতালি স্বাধীনতা পাইয়াছে, দাসপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে পৌরহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে, এবং স্ত্রীলোকেরা অধিক অধিকার পাইয়াছেন, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু এই শতাব্দীতেই মিসর সমর, ফিলিপাইন সমর, বুয়র সমর, বলিতে কি, চীনের সর্ব্বনাশ সাধনে সপ্তরথীর সমবেত চেষ্টার অভিনয় হইতেছে, এ কথা যখন ভাবি, তখন, নেপোলিয়ন বা সিজর, আলেকজান্দর বা তৈমুরকে পরিম্লান বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীকে আর স্বাধীনতার শতাব্দী বলিতে ইচ্ছা হয় না। যে শতাব্দীতে ষোড়শ সহস্র নির্দ্দোষী দরবেশ বধ করিয়া ও মেহেদীর মৃত দেহের অবমাননা করিয়া কিচনার মহা সম্মান "লর্ড" উপাধিতে এবং স্বাধীনতা-লোলুপ সহস্র সহস্র লোকের শোণিতপাত করিয়া রবার্টস্ মহা গৌরবান্বিত "আরল" উপাধিতে ভূষিত হইলেন, সেটা কি আসুরিক শতাব্দী নয়? হায়, নিরপরাধ ফিলিফাইনবাসীদিগকে অধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে সচেষ্ট ম্যাকিন্‌লি আজ কত সম্মানে ভূষিত, এবং মানব জাতির চিরবন্ধু ব্রায়াণ্ট ম্লানমুখে নির্ব্বাচন-মঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণের পথে নীরবে প্রস্থান করিতেছেন! জাপানকে—নবোত্থিত জাপানকে কতরূপে কতজনে প্রশংসা করে, কিন্তু হায়, এই জাপানই কি চীনের সর্ব্বনাশের মূল কারণ নয়? জাপান, প্রকারান্তরে, আজ সপ্তরথীর দ্বারা চীনের সর্ব্বনাশ সাধনের পথে যে লীলা প্রকট করিলেন, সে লীলার যুগকে অধীনতার করাল মূর্ত্তি না বলিয়া থাকা কষ্টকর। আর হতভাগ্য বুয়রগণ যে শতাব্দীতে স্বাধীনতা হারাইয়া ধনে প্রাণে ধ্বংসের মুখে প্রবেশ করিতেছে, সে শতাব্দীর কথা ভাবিতেও কষ্ট পাই। সকল দিকেই দেখিতেছি, আভিজাত্যের, ক্ষমতা-প্রিয়তার, সাম্রাজ্য ও প্রভুত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা। মহামতি গ্লাডোষ্টোনের চেষ্টাতেও এই শতাব্দীতে আইরিশগণ স্বায়ত্তশাসন পান নাই, ইহা ভাবিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাদৃত বিষয়ের কিছু আলোচনা করি। রাজনীতির কথা বা রাজার কথার আলোচনা করিবার অধিকার হইতে আমরা এক প্রকার বঞ্চিত। যে শতাব্দীতে ভারতে সিডিসন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সে শতাব্দীর ন্যায় স্বাধীনতা-অপলাপকারী শতাব্দী এদেশে আর হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি বিদ্যাসাগর এবং রামমোহন। একজন বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়া স্ত্রী জাতির মহদুপকার সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; অন্য জন, নানা উপধর্ম্ম, ত্রিত্ববাদ বা তেত্রিশকোটীবাদের স্থলে, আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ সংস্থাপনে চেষ্টা করিয়া, সর্ব্বপ্রকার পরাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। উভয়েই, এজন্য, ঘোরতর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। উভয়েই স্ত্রীজাতির মহদুপকারের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং সতীদাহ নিবারণ এই শতাব্দীর বিশেষ ঘটনা। সর্ব্বপ্রধান ঘটনা রামমোহনের একেশ্বরবাদ প্রচার। ব্রাহ্মধর্ম্মের উত্থান যে পৃথিবীর মধ্যে এই শতাব্দীর কি মহাব্যাপার, কালে তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। সকল বিচ্ছেদ, সকল দুর্নীতি, সকল উপধর্ম্মের স্থলে—মধুর মিলনের, শান্তি ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠা এই শতাব্দীতে হইয়াছে। আত্মার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা,—বিলাতে ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্ম প্রচার, ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার—এই শতাব্দীর

কি সুমঙ্গল ঘটনা। অন্তরে ডুবিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। এমারসন, কার্লাইল, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, পার্কার, ম্যাট্‌সিনি, সকলের হৃদয় এই মহা ধর্ম্মাণুপ্রাণনে পবিত্র। আত্মা মুক্ত বায়ুর ন্যায় মুক্ত—কাহারও অধীন নয়, একমাত্র পরমাত্মার অধীন,—পরবর্ত্তী কালে মহাত্মা কেশবচন্দ্র এই ভারতে এই কথাটী বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া সকল ধর্ম্ম, সকল শাস্ত্র, সকল তত্ত্বের সমন্বয় করিয়া জগতের কল্যাণকর অতি সুন্দর ধর্ম্ম-বিধান-তত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। এক ঈশ্বর, এক ধর্ম্ম, এক নীতি—এক তত্ত্ব—সকল মানব এক পিতার সন্তান,সকল পরিবার এক,—ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ—সকলেই ভাই ভাই। বিচ্ছেদ নাই, কেবল মিলন; বিদ্বেষ নাই, কেবল শান্তি; পাপ সন্তাপ নাই, কেবল পবিত্রতা। কি সুন্দর এবং কি পবিত্র তত্ত্ব। দল থাকিবে না—সকল দল ভাঙ্গিয়া একাকার হইবে—মহানের সিংহাসন তলে সকল জাতিত্ব, সকল বৈষম্য, সকল ভেদবোধ তিরোহিত—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সম আসনে সমভাবে উপবিষ্ট হইবে। এই মধুর সংবাদ পাইয়া জগৎ নাচিয়া উঠিল। কত কি বিচিত্র লীলা প্রকটিত হইল, ভাবিতে এবং লিখিতেও শরীর মন পুলকে পূর্ণ হয়। কিন্তু কালের কি দুর্জ্জয় প্রভাব! বিদ্যাসাগরের স্বর্গারোহণের পর হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের কথা দিন দিন ঘৃণার কথা হইতেছে—আর ৬০।৭০ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে, রূপান্তরে দলাদলি, জাতিভেদ, ধনী-দরিদ্র-ভেদ ইত্যাদি কত কি দেখা যাইতেছে। যত দিন যাইতেছে, ততই ব্রাহ্মসমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। কোন দল ধর্ম্মকে পোষাকরূপে ব্যবহার করিতে চাহেন, কোন দল ধর্ম্মকেই সার করিতে চাহেন। কোন দল, বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর, কোন দল উশৃঙ্খলতার পথে স্বাধীনভাবে চলিতে সচেষ্ট। সে সকল মর্ম্মভেদী কথার বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, তবে কেবল এই মাত্র বক্তব্য—একতা ও মিলনের ধর্ম্মে যে মহা বিচ্ছেদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, এ কথা এখন আর কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

মিলন ও একতার আর এক মধুর বাণী শুনাইয়াছিলেন, মহাত্মা হিউম। জাতীয় মহাসমিতি ভারতের মিলনের অতি পবিত্র ক্ষেত্র। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এখানেও, অতি অল্প কালের মধ্যেই দলাদলি ও বিদ্বেষবহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছে।

এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজ আত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া কি স্বর্গীয় তেজেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। গুরু মানি না, নেতা মানি না, পুরোহিত মানি না, উপধর্ম্ম মানি না, জাতিভেদ মানি না,—কেবল মানি বিধাতাকে,—তাঁহার পুত্র সব মানুষ ভাই ভাই,—ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, বিধাতার চরণ-সিংহাসন-তলে সব ভাই ভাই। কি সুন্দর বাণী! স্বর্গ যেন এই ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অভেদ-সিংহাসন-তলে শত শত নরনারীর মধুর সম্মিলন—কি মধুর চিত্র! কিন্তু হায়, ক্ষমতাপ্রিয়তা, আভিজাত্য, পৌরোহিত্য,ধনের গরিমা কি সংসারকে স্বর্গে পরিণত হইতে দিবে—দরিদ্রকে সদ্ভাবের মালা উপহার দিয়া একতা ও সাম্যের সিংহাসনতলে বসাইয়া স্বর্গের মহিমা-গীতি কি গাইতে দিবে? না—তাহা সুদূর-পরাহত।

ব্রাহ্ম-সমাজ, সমাজ-সংস্কারের মেরুদণ্ড। আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়া শেষে নূতন ঐশ্বর্য্যের ভিত্তিতে প্রোথিত জাতিত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হইতেছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নূতন পৌরোহিত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছেন;—অনুষ্ঠান পূজা প্রণালীর জাল ছিন্ন করিয়া নানারূপ নব নব অনুষ্ঠান ও পূজা প্রণালীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা, বিবাহ-সমস্যা। হিন্দু সমাজ যে কন্যাপণে অবসন্ন, ব্রাহ্মসমাজ সেই কন্যাপণের হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবেন, আশা ছিল। কিন্তু হায়, অল্পে অল্পে, জাতিভেদের সঙ্গে সঙ্গে, কন্যাপণও, রূপান্তরে, প্রকারান্তরে, এই সমাজে দেখা দিতেছে। পূর্ব্বে কাহাকে কাহাকে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে দেখিতাম, এখন ক্রমে ক্রমে প্রতিবাদও লোপ পাইতেছে। পূর্ব্বে বংশগত মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি ছিল, এখন ধনগত মর্য্যাদার দিকে অধিক আকর্ষণ দেখা যাইতেছে। চরিত্র তুচ্ছ, ধর্ম্ম তুচ্ছ, নীতি তুচ্ছ, পবিত্রতা তুচ্ছ—সার বস্তু ঐশ্বর্য্য এবং অর্থ। পদ ও ঐশ্বর্য্যের খাতিরে বিশিষ্ট ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণও, যাহারা ধর্ম্ম বা নীতির কোন ধার ধারে না, তাহাদিগের হস্তে কন্যার্পণ করিতেছেন; এবং অন্য দিকে যে ছেলেরা ধার্ম্মিক, তাঁহারাও পদ ও ঐশ্বর্য্যের খাতিরে সুযোগ্যা পাত্রী উপেক্ষা করিয়া অযোগ্যা গ্রহণ করিতেছেন। চরিত্রের বিশুদ্ধি এবং ধর্ম্মানুরাগ এখন আর যেন তেমন গুণের মধ্যে ধর্ত্তব্য নয়, পদ হইলেই হইল। ঐশ্বর্য্যের ভেল্কিতে চতুর্দ্দিকের লোক আকৃষ্ট। দেখিতেছি, এইরূপে, অনেক ব্যক্তিই, এখন, কালের দুর্জ্জয় পরাক্রমে আত্ম সমর্পণ করিতেছেন। বড় বড় মহারথী আকর্ষণ করিতেছেন, অসহায় ব্যক্তিগণ আকৃষ্ট হইতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে বিবাহিত, অনেক বিলাত-প্রত্যাগতের গৃহ ধর্ম্মানুষ্ঠান-বর্জ্জিত—ব্রাহ্মসমাজের সহিত যেন কোন সংশ্রবই নাই। ঐ সকল বিষয় প্রতি ধার্ম্মিক ব্যক্তির গভীর চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। কারণ,ধর্ম্ম না থাকিলে মানুষ পশুত্বে উপনীত হইবে;—ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা রূপ মহা অধীনতার মহালীলা আরম্ভ হইবে।

আর একটী সমস্যা—ধনী দরিদ্র সমস্যা। সম্ভ্রান্ত বংশের একজন দরিদ্র ব্যক্তি একজন ধনী ব্রাহ্মের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। দৈব দুর্ব্বিপাকে তাঁহার কাশীর উদ্বেগ হইলে তিনি ধনীর গৃহে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি উঠিয়া গেলে, ধনী অন্যের সমক্ষেই অকথ্য ভাষায় ঘৃণা বর্ষণ করিলেন,ও শেষে যথারীতি ফেনাইল ইত্যাদি দিয়া ঘর সংশোধন করিলেন। আর একদিন, আর একজন সম্ভ্রান্ত দরিদ্র ব্যক্তি জুতা পায়ে দিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, রাস্তার জুতা ঘরে নিবার জন্য তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। এই রূপ ঘৃণার দৃষ্টান্তের কথা পূর্ব্বে অনেক শোনা যাইত। লাটভবনে জুতার অসম্মানের কথা বিদ্রূপগল্পের মোহিনী ভাষায় এখন ঘোষিত হইয়া থাকে। এখনও বড় বড় রাজা রাজড়ার ঘরে এরূপ অসম্মানের কথা শুনা গিয়া থাকে। কিন্তু সাম্যের ক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এরূপ হইতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। এই জন্যই বুঝিবা, ব্রহ্মমন্দিরের মধ্যে রেল চিহ্নিত বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপবেশন করেন। ফরাসিদেশে,

বর্ত্তমান যুগে, ব্যাসিলাস্ থিওরির প্রাবল্যে কত যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য লীলার অভিনয় হইতেছে, শুনিলে হাসি পায়। কিছু দিন পূর্ব্বে ইলেক-ট্রিসিটির সংস্পর্শের কথা তর্কচূড়ামণির বক্তৃতায় বিশেষ রূপ শুনা যাইত। দরিদ্রের মলিন বস্ত্র বা জুতার সংস্পর্শে, কি ব্যাসিলাস্ বা কি ইলেক-ট্রিসিটি দেহে প্রবেশ করিবে, এই ভয়েই কি বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিগণ সতর্ক হইতেছেন? অথবা আভিজাত্য এবং ধন-গৌরবের মত্ততায় উন্মত্ত হইতেছেন, আমরা ভাবিয়া ঠিক পাইতেছি না। দরিদ্রের প্রতি এইরূপ ঘৃণা ও উপেক্ষা-সমাজে বদ্ধমূল হইলে, সমাজের মঙ্গল নাই। একদিন একজন ব্রাহ্ম সিবিল সার্জ্জন বলিয়াছিলেন, "একথা এখন প্রকাশ্য ভাবে বলিতেও সঙ্কোচের কোন কারণ নাই যে, ব্রাহ্মসমাজ উচ্চ এবং নীচ—দুই বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে।" আর একদিন কয়েকজন সুশিক্ষিত চরিত্রবান উপাধিধারী যুবক বলিতেছিলেন—"বিলাত-প্রত্যাগতদিগের এক শ্রেণীর মধ্যে মদ্যপান অল্পে অল্পে প্রবেশ করিতেছে; ইহাতে আশ্চর্য্য হন কেন? ধর্ম্ম ও নীতি কি সকলেই মানিয়া চলিবে?" সত্য হইলে, ইহা অতি শোচনীয় অবস্থা। হিন্দু সমাজের যে সকল দুর্নীতিকে এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজ বর্জ্জন করিয়াছিলেন, আভিজাত্যের প্রভাবে এখন ক্রমে ক্রমে সেই সকল দুর্নীতি কি অল্পে অল্পে প্রবেশ করিবে? এবং অর্থের মোহিনী শক্তি মন্ত্রে, ঔষধ-মুগ্ধ অহির ন্যায়, দরিদ্র-প্রতিবাদকারীদিগকে স্তব্ধ করিয়া যা-তার অভিনয় চলিবে। বড় বড় ধার্ম্মিক নাকি এখন দশ বিশ টাকার খাতিরে, মদ্যপান চলিতেছে বা কন্যাপণ প্রশ্রয় পাইতেছে দেখিয়াও, নির্ব্বাক থাকেন। যদি তাহা সত্য হয়, তবে আর আশা কোথায়?

পৌরোহিত্যের সমস্যা দিন দিন আরো কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এখন অনেক স্থলে উপাসনার প্রারম্ভে শুনা যাইয়া থাকে, উপাসনা করিবেন কে? এ সমাজের লোকেরা ও সমাজের লোকের নাম শুনিলে ভ্রূকুঞ্চিত করেন, ও সমাজের লোকেরা এ সমাজের লোকের নাম শুনিলে বিরক্ত হন? ঈশ্বরের উপাসনা যে ভক্তই করুন, তাহাতেই যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য নয় কি? ভক্ত মাত্রই আদরের পাত্র নন কি? ইনি বেদিতে বসিবেন, কি তিনি বসিবেন, সে সংবাদে প্রয়োজন কি? এত আর বক্তৃতা বা প্রবন্ধ নয় যে, ক্ষমতা অনুসারে বিচার চলিবে? প্রকৃত সরল উপাসনা যিনিই করুন, তাহাতেই প্রকৃত উপাসকের মন আকৃষ্ট হওয়া উচিত। তুমি ভাল কি তিনি ভাল, সে বিচার করিতে বসিলে, বিসপ বা পোপ বা গুরু পুরোহিত মানার আর বাকী রহিল কি? একজন মহাত্মা এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "যদি গাড়ীর নীচেই পড়িতে হয়, তবে ছ্যাকড়া গাড়ীর নীচে পড়িব কেন, চেরিয়টের নীচেই পড়িব। অবতার বা গুরু পুরোহিত মানিতে হইলে যাকে তাকে মানিব কেন, বড় জনকেই ধরিব।" নানা গুরু পুরোহিতের অভ্যুদয়ে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। একটু ভক্তির পথে যিনি অগ্রসর হন, তাঁহারই একটা কিছু হইয়া পড়িতে ইচ্ছা! এইরূপে বিজয়কৃষ্ণ গেলেন, রামকুমার গেলেন, শিবনারায়ণ গেলেন, ভিতরে ভিতরে আরো কত জন কিছু হইবার চেষ্টায় আছেন। কতক লোক কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা করিবে, অন্য লোক সাংসারিক কাজ করিবে, এরূপ হইলে পৌরোহিত্য এবং সমাজে পশুত্ব না জাগিয়াই পারে না। ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধন ভিন্ন সমাজের মঙ্গল নাই;—এবং আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ ভিন্ন পশুত্ব বিনাশের আর উপায় নাই।

আশা করা বৃথা। পৃথিবীর গতি অবিরাম প্রভুত্বপরায়ণতা এবং আভিজাত্যের দিকে চলিয়াছে। বৃথা ক্রন্দন, বৃথা আন্দোলন, বৃথা চীৎকার। কালের ধর্ম্মই যেন এই—ঐশ্বর্য্য এবং অর্থবল, প্রভুত্ব এবং শারীর বল সকলকে পরাজয় করিয়া প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেই করিবে। ধর্ম্মকথা—পোষাক পরিচ্ছদের ন্যায় একটা রাখিতে হয়, তাই রাখা; মর্ম্মস্পর্শী অভেদবাদের কথা, বা অনাবিল স্বাধীনতার কথা বলিতে চেষ্টা করাই বুঝি বা ভ্রান্তি!! ভাই, তুমি বল কি?

বলিবার কথা অনেক, কিন্তু বলিবার স্থান নাই, অধিকার নাই। বলিতে ইচ্ছাও হয় না। এখন একাকীত্বের গহন বনে যাইতে ইচ্ছা। সত্য কথা বলিলে, রাজ আইন ভ্রূকুটী দেখায়, সমাজের বিধি ব্যবস্থা ভয় দেখায়, বন্ধুদের ভালবাসা বিরক্তিতে পরিণত হয়। তাহাদের মতে মত দিয়া, প্রশংসায় প্রশংসা ঢালিয়া, মদ্যপায়ীর মদ্যপান, অত্যাচারীর অত্যাচার, এবং ব্যভিচারীর ব্যভিচারের পোষকতা করিতে পারিলেই লাভ আছে, সম্মান আছে, প্রশংসা আছে! তাহাতে উপাধি মিলে, সমাজের উপরকার দশজনের সঙ্গে আসনে স্থান পাওয়া যায়—আর শুনিয়াছি, টাকাও নাকি অনেক মিলে। আর স্বাধীন ভাবে সত্য ঘোষণা করিলে হয় জেল, নয় নিষ্পেষণ, নয় বন্ধুবিচ্ছেদ—অপরিহার্য্য লিখন। কাগজ চালান, এদেশে খোসামুদীর একটী ব্যবসা হইয়া উঠিতেছে। এরূপ অবস্থায়, এরূপ সময়ে, গত শতাব্দীর সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে কে অগ্রসর হইবে? অগ্রসর হইলেই বা শুনিবে কে? কঠোর এবং সত্য শ্রবণে, হায়, অনেকেই আজ কাল অনিচ্ছুক।

আমি ভাবিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম এবং প্রার্থনা করিতেছিলাম, এ ধরার অত্যাচার এবং অবিচার, অসত্য এবং অধর্ম্ম নিত্যই যখন নূতন ভাবে পুনরভিনীত হইতেছে, তখন এ সকল দেখিতে আর বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ কি? বয়স বাড়িতেছে, কিন্তু জ্ঞান বাড়ে না; মস্তকের কাল কেশ শ্বেত হইল, কিন্তু ভক্তিতে নত হয় না; দাঁত পড়ে, মাংস শিথিল হয়, কিন্তু আসক্তি কমে না, বিশ্বপ্রেমের উদয় হয় না, রিপুর নিষ্পেষণ দূর হয় না,—পাপের বন্ধন ছিন্ন হয় না;—মহাপরাধীনতার রাজ্য যেন চির অসমাপ্ত। হাটিয়া হাটিয়া কতদূর আসিলাম—কিন্তু কেবলই পরাধীনতা! রাজা বলেন, তুমি আমার আইনের অধীন, ধনী বলেন তুমি আমার ক্ষমতার অধীন, সমাজ বলেন, তুমি আমার বিধির অধীন, পরিবার বলেন, তুমি আমার ভালবাসার অধীন, আমার রিপুরা বলে, তুমি আমাদের শাসনের অধীন। মুক্ত হইতে না পারিলে, সকল আসক্তির জাল কাটিতে না পারিলে, অতীন্দ্রিয়, অকথিত, অদৃষ্ট পরমাত্মার পথে চলিব কিরূপে? হাটিয়া হাটিয়া, খাটিয়া খাটিয়া পরিশ্রান্ত, পরিম্লান হইলাম, কিন্তু অধীনতার রাজ্য শেষ হইল না—যেন চির অসমাপ্ত। আমার চক্ষু কেবল কুদৃষ্টিপাতই করে, লেখনী কেবল কুকথাই লেখে, হাত

কেবল কুকার্য্যেই রত থাকে, পা কেবল কুপথেই চলিতে চায়। কু-য়ের রাজ্য যেন চির অসমাপ্ত। মহাপরাধীনতার মহান্ধকারে ডুবিয়াছি, যাই কোথা? আলো কই? একাকীত্বের গহন বনে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ কই? পাপ মোহের ত্রাসে প্রাণমন মলিন ও নিষ্প্রভ। আমি করি কি, যাই কোথা? জীবন শেষ হইয়াও হয় না কেন? যদি "সু"য়ের রাজ্যে পৌঁছিতে পারিতাম, তবে বুঝি বা আমার দাসত্ব ঘুচিত—আমি মুক্ত হইতে পারিতাম। "সু"য়ের প্রতিষ্ঠার জন্য কত চেষ্টা, কত আয়োজন করিলাম, কিন্তু তিনি ত ফিরিয়াও এ দীনের প্রতি চাহিলেন না। যদি বা কখনও চাহিলেন, আমাকে ধরিলেন না; যদি বা ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া এই অস্পৃশ্যকে ধরিলেন, আমাকে মজাইলেন না;—যদি বা কখনও একটু একটু মজাইলেন, আমাকে একেবারে বিশ্ব প্রেমসাগরে ডুবাইলেন না। যদি ডুবাইতেন, তবে বুঝি "কু"য়ের অসমাপ্ত রাজ্যে আমাকে আর আসিতে হইত না। বুঝি বা, আমাকে চাপিতে চাপিতে, আমার আমিত্বকে নিষ্পেষিত করিয়া "তিনিত্বে"র অপরাজিত সিংহাসন চির প্রতিষ্ঠিত করিতেন। আমিত্বের বিনাশ না হইলে অধীনতার অসমাপ্ত রাজ্য হইতে চিরবিদায় লাভের আর উপায় নাই, সেই জন্য "সু"-মহানের নিকট নিত্য প্রার্থনা, বয়স যেমন আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, তিনিও যেন সেইরূপ আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে করিতে, আমাকে চাপিতে চাপিতে—আমিত্বের বিনাশ সাধন করিয়া তিনিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ভবের নিত্য অবিচার ও অত্যাচারময় অধীনতার অসমাপ্ত রাজ্য হইতে নচেৎ আর উদ্ধারের উপায় নাই। হায়, তিনি কি এ দীনকে কৃপা করিবেন না?

১লা মাঘ, ১৩০৭।

সাবিত্রীতত্ত্ব সমালোচনার প্রতিবাদ।*

সবিনয় নিবেদন—

কার্ত্তিকের নব্যভারতে আমার সাবিত্রী তত্ত্বের আলোচনা করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আপনার আলোচনা সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আপনার গুটিকত কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয়, আমার বুঝিবার অক্ষমতাই ইহার কারণ।

দেহের শক্তিতে যাহা না হয়, মনের শক্তিতে তাহা হয়।

দেহের শক্তিতে যাহা না হয়, মনের শক্তিতে তাহা হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা—ইহার সত্যতা সকলেই স্বীকার করেন—সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং এ কথা বলিয়া আমি কেমন করিয়া অপরাধী হইলাম, বুঝিতে পারিতেছি না। মানসিক শক্তি বা একাগ্রতায় কুকর্ম্মও সাধিত হয়, ইহা অস্বীকার করি না। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন—"ঠগ, ডাকাইত প্রভৃতিরও একাগ্র বিশ্বাস আছে।" কিন্তু আমিত কোথায়ও এমন কথা বলি নাই যে, মানসিক একাগ্রতায় দুষ্কর্ম্ম সাধন করা কর্ত্তব্য; কেহ যদি বলে যে, দেহের শক্তিতে যাহা হয় না, মনের শক্তিতে তাহা হয়, তাহা হইলে সে মানসিক শক্তি দ্বারা দুষ্কর্ম্ম সাধনে প্রশ্রয় দিতেছে, বোধ হয় এমন কথা বলা ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত হয় না। আমি কি এমনি দুর্নীতিপরায়ণ বা কুনীতিপ্রচারক যে, ঠগ, ডাকাতি, বাভিচার প্রভৃতির ন্যায় দুষ্কর্ম্মে প্রশ্রয় দিব?

সাবিত্রী তত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ে আমি কেবল সুসন্তান উৎপাদনের কথায় মানসিক শক্তি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছি—কুসন্তান উৎপাদনের ঘোর বিরোধী বলিয়াই আমি এইরূপ করিয়াছি। আমরা এখন ধর্ম্মভ্রষ্ট, অসংযমী ও অমিতাচারী হইয়া যে সকল দুর্ব্বল, রুগ্ন, মানসিক শক্তিহীন সন্তান উৎপাদন করিতেছি, আমার স্বজাতীয়দিগকে বিদ্রূপ ও তিরস্কারের অভিপ্রায়েই তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছি যে, তাহাদিগকে দেখিয়া

সমস্ত ইউরোপ মহা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বিদ্রূপ বাক্য।

সমস্ত ইউরোপ মহা-শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে।" আপনি কেমন করিয়া একথার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ করিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিলে বাধিত ও উপকৃত হইব। আমাকে দেহ অপেক্ষা মনের শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা করিতে দেখিয়া আপনি কেমন করিয়া সমাজ সংহারক রূপে কল্পনা করিলেন, কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিলে বাধিত হইব।

সমাজসংস্কারক বা সমাজ সংহারক?

সন্তান লাভার্থ এখন কার্ত্তিক পূজা প্রভৃতি কি প্রকারে করা হয়, তাহার আলোচনা আমি করি নাই। যথোচিত প্রণালীতে

* সাবিত্রীতত্ত্বের সমালোচনা সম্বন্ধে এই পত্রখানি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বাবু আমাকে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে ইহা ছাপাইলাম। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। কারণ এখন আমাদের ধর্ম্মভাব ধর্ম্মচর্য্যাদি সমস্তেরই বিকৃতি ও অবনতি হইয়াছে। আমি

আমি গোড়া হিন্দু নহি—নহি, আর্য্যামি দোষ আমার নাই।

আর্য্যামি যদি দোষ হয়, সে দোষ আমার নাই। সন্তান লাভার্থ মানসিক শক্তির প্রয়োগ যে এ দেশের চিরন্তন প্রথা, ইহারই বর্ত্তমান প্রমাণ স্বরূপ এখনকার কার্ত্তিক পূজা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইহার পর বক্তব্য এই যে, এখন বারবনিতারাই যে কেবল পূজা করে, তাহা নয়। দুই চারি জন গৃহস্থও সন্তানলাভার্থ সংযমী হইয়া সাত্ত্বিক ভাবে ব্রত স্বরূপ কার্ত্তিক পূজা করে। বোধ হয়, আপনি এপ্রকার কার্ত্তিক পূজার নিন্দা করিবেন না। কারণ আপনিই বলিয়াছেন, 'কার্ত্তিক পূজা, যমপুকুর কি পুণ্য পুকুর করায় বা পুরাণ কথা শোনায় ভাবের উৎকর্ষ হয়। ভাবের উৎকর্ষ সাধনে এরকম কার্য্য প্রয়োজনীয়।" সংযমী হইয়া সাত্ত্বিক ভাবে ব্রতস্বরূপ দেবদেবী পূজা করিলেই অন্তর প্রকৃতির উন্নতি ও বিশুদ্ধি বা ভাবের উৎকর্ষ সাধন হয়। আমি বিদেশীয় নহি; এ দেশীয়, আমি জানি, কতকগুলি হিন্দু গৃহস্থ এই ভাবে কার্ত্তিক পূজা করেন, তবে কেন আপনি লিখিয়াছেন—"কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু ভাবের উৎকর্ষের জন্য কার্ত্তিক পূজা করিবেন না?" চন্দ্রনাথ বাবু কি এতই নীতিহীন বা দুর্নীতিপরায়ণ যে, যে পূজা সংযম, চিত্তশুদ্ধি ও দেবভক্তি ব্যতীত হইতেই পারে না, সে পূজা হইতে তিনি ঐ সকল উৎকৃষ্ট-গুণ সরাইয়া না দিয়া, সে পূজার কল্পনা করিতে বা উল্লেখ করিতে পারেন না? কোন বন্ধ্যা সন্তান লাভের জন্য কার্ত্তিক

সাবিত্রী-তত্ত্ব ও ক্ষীরোদ বাবু।

গত কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সাবিত্রী-তত্ত্ব পুস্তকের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

ক্ষীরোদ বাবু একজন বিজ্ঞ চিন্তাশীল লেখক ও প্রবীণ সমালোচক। বাঙ্গালীর মধ্যে তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি অতি অল্পই আছেন। এই সকল গুণে তিনি বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম নেতা বলিয়া উপযুক্ত রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং সাবিত্রী-তত্ত্বের সমালোচনায় তাঁহার এই সকল গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাইব, এরূপ আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহার সমালোচনা পাঠ করিয়া হতাশ হইয়াছি।

গ্রন্থকার ও সমালোচক উভয়ে এক-মতাবলম্বী না হইতে পারেন। উভয়ের মধ্যে মতভেদ ঘটিলেও, সমালোচককে অবশ্যই গ্রন্থকার যে ভাবে যে কথা বলিয়াছেন, সে কথা সেইভাবে ঠিক রাখিয়াই তাহার সমালোচনা করিতে হইবে। সমালোচক অবশ্যই নিজের ইচ্ছানুসারে গ্রন্থকারের কথা ও মতের পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার সমালোচনা করিতে পারেন না। যে সমালোচক তাহা করেন, তাঁহার ন্যায়-পরতা ও সততা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় নহে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, ক্ষীরোদ বাবুর সমালোচনা এ সম্বন্ধে দোষশূন্য হয় নাই। আমি দেখাইব, তিনি সাবিত্রী-তত্ত্বের সমালোচনা প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর দ্বারা অনেক কথা বলাইয়াছেন যাহা তিনি আদৌ বলেন নাই এবং চন্দ্রনাথ বাবুকে সাধারণের চক্ষে উপহাসাস্পদ করিবার জন্য, তিনি যে অর্থে যে কথা বলিয়াছেন, ক্ষীরোদ বাবু তাহার বিপরীত অর্থ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

ক্ষীরোদ বাবু বিপরীত অর্থ করিয়াছেন।

সাবিত্রী-তত্ত্বের সপ্তম পৃষ্ঠায় চন্দ্রনাথ বাবু লিখিয়াছেন।—

"কিন্তু যাঁহারা সন্তান লাভার্থে এইরূপ অনুষ্ঠান করেন, দেবতারা তুষ্ট হইলে সন্তান দিয়া থাকেন এ বিশ্বাস তাঁহাদের মনে বড়ই দৃঢ়, বড় গভীর। সাধারণ উপায়ে যাহা হয় না, এইরূপ বিশ্বাসের গভীরতায় তাহা হওয়া অসম্ভব নহে। শুদ্ধ শারীরিক সামর্থ্যে বা শরীরের ধর্ম্মে যাহা অসাধ্য, মানসিক সামর্থ্যে বা ধর্ম্মবলে—চিত্তের একাগ্রতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, সাত্ত্বিকতা প্রভৃতির ফলে,—তাহা সধিত হওয়া সম্ভব, অনেক স্থলে সাধিত হইয়া থাকে।"

উদ্ধৃতাংশে আমি পাঠকবর্গের দৃষ্টি নিম্নলিখিত বিষয়টীর প্রতি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছি।

(১) "এ বিশ্বাস" অর্থে অবশ্যই "দেবতারা তুষ্ট হইলে সন্তান দিয়া থাকেন" এই রূপ বিশ্বাস; অন্য কোন রকম বিশ্বাস নহে। "এইরূপ বিশ্বাসের" অর্থও তাহাই, অন্য কোন রূপ বিশ্বাস নহে। বাঙ্গালা-ভাষাজ্ঞ পাঠকমাত্রেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন।

ক্ষীরোদ বাবু কিন্তু "এ বিশ্বাস" অর্থ অন্যরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি উদ্ধৃতাংশ হইতে "এ" ও "এইরূপ" কথাগুলি একবারে উড়াইয়া দিয়া কেবল বিশ্বাস কথাটী

ধরিয়া তাহার নানা রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন "বিশ্বাস গভীর হইলে অসম্ভব সম্ভাবনা হইতে পারে,—চন্দ্রনাথ বাবু এ কথা বলিয়াছেন" ইত্যাদি।

"বন্ধ্যার সন্তান হয়, মৃতব্যক্তি পুনঃর্জ্জীবন লাভ করে, মরা মানুষ ফিরে আসে ইত্যাদি। পরকালে সদ্গতি লাভ হইবে বিশ্বাস করিয়া খন্দ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিরা বৃদ্ধ জরাজীর্ণ পিতামাতাকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে।"

চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন, এক কথা; ক্ষীরোদ বাবু বলাইলেন আর এককথা।

পাঠকগণ অবশ্য দেখিলেন, চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন এক কথা; ক্ষীরোদ বাবু তাঁহাকে দিয়া বলাইলেন অন্য কথা। চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন, দেবতারা তুষ্ট হইলে সন্তান দিয়া থাকেন, এই বিশ্বাসের গভীরতায় সাধারণ উপায়ে যাহা হয় না, তাহা হওয়া অসম্ভব না। ক্ষীরোদ বাবু দেবতার প্রতি বিশ্বাসের কথা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া শুধু কেবল বিশ্বাসের গভীরতা ধরিয়া বসিলেন। আর তাহা হইতে নানা রকম অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। পাঠক অবশ্যই দেখিবেন, দেবতার প্রতি বিশ্বাসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন না করিয়া যদি কেবল বিশ্বাসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা চন্দ্রনাথ বাবুর উদ্দেশ্য হইত, তবে তিনি "এইরূপ বিশ্বাসের গভীরতায়" না লিখিয়া "বিশ্বাসের এইরূপ গভীরতায়" লিখিতেন। ক্ষীরোদ বাবু যে এই ভাষার পার্থক্যটুকু না বুঝিতে পারেন, তাহা কখন কল্পনাও করিতে পারি না।

চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, দেবতাদের প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকিলে দেবতারা তুষ্ট হইয়া সন্তান দিতে পারেন। ক্ষীরোদ বাবু হয়ত তাহা স্বীকার করেন না। এক্ষণে চন্দ্রনাথ বাবুর মত ঠিক, কি ক্ষীরোদ বাবুর মত ঠিক, তাহা বিচার করা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। সেরূপ বিচারের দ্বারা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু আমার বোধ হয়, চন্দ্রনাথ বাবুর উক্ত মত হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া ক্ষীরোদ বাবু ঈশ্বর বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন।

(২) উদ্ধৃতাংশে চন্দ্রনাথ বাবু বলেন—"শুদ্ধ শারীরিক সামর্থ্যে বা শরীরের ধর্ম্মে যাহা অসাধ্য, মানসিক সামর্থ্য এবং ধর্ম্মবলে চিত্তের একাগ্রতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, সাত্ত্বিকতা প্রভৃতির ফলে—তাহা সাধিত হওয়া সম্ভব—অনেক স্থলে সাধিত হইয়া থাকে।"

পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিলেন, চন্দ্রনাথ বাবু এস্থলে শুদ্ধ শারীরিক সামর্থ্য অপেক্ষা মানসিক সামর্থ্য এবং ধর্ম্মবলের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিতেছেন। মানসিক সামর্থ্য দুই না এক? আর ধর্ম্মবল, এই দুই বস্তুর একত্র সংযোগ দ্বারা শারীরিক সামর্থ্যে বা শারীরিক ধর্ম্মে যাহা অসাধ্য, তাহা সাধন হইতে পারে। আবার ধর্ম্মবল কাহাকে বলে, চন্দ্রনাথ বাবু তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যেমন চিত্তের একাগ্রতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, সাত্ত্বিকতা প্রভৃতি। চন্দ্রনাথ বাবুর মতে ধর্ম্মবল বলিতে কেবল একাগ্রতা নহে বা কেবল দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা নহে, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

এখন উদ্ধৃতাংশকে ক্ষীরোদ বাবু বিকৃত করিয়া তুলিয়া দিয়া তাহার কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি। ক্ষীরোদ বাবু বলেন,—

শুদ্ধ শারীরিক সামর্থ্যে বা শরীরের ধর্ম্মে যাহা অসাধ্য, মানসিক সামর্থ্যে বা ধর্ম্মবলে তাহা সাধিত হওয়া সম্ভব। ক্ষীরোদ বাবু "এবং" কে "বা" করিয়া

নিয়া "মানসিক সামর্থ্য" ও "ধর্ম্মবল" এই দুইটী স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারে; চন্দ্রনাথ বাবুর মত এইরূপে দেখাইতে চাহেন।

চন্দ্রনাথ বাবুর মতের এবং চন্দ্রনাথ বাবুর বিকৃত আলোচনা।

মত এইরূপ বিকৃত ভাবে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলেন,—

"চীনেরা মৃত কুমার কুমারীর বিবাহ দিবার জন্য কাগজে দুই জনের ছবি আঁকিয়া একত্র করিয়া পোড়ায়। তাহাদের চিত্তের একাগ্রতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, সাত্ত্বিকতা থাকে। "অনেক স্থলে" তাহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয় কি না? প্রশ্নটী গুরুতর। কাপালিক কর্ত্তাভজা প্রভৃতির বিশ্বাসের একাগ্রতা যথেষ্ট আছে। যে বিশ্বাসে একাগ্রতা থাকিবে, তাহাই মঙ্গলপ্রদ কিনা, একথার মীমাংসা হওয়া উচিত। বিশ্বাস করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই ভাল, এরূপ মতের প্রচার হইলে হিন্দুসমাজ কেন, কোন সমাজ একদিন বাঁচিতে পারে না। ঠগ ডাকাইত তাহাদেরও একাগ্র বিশ্বাস আছে।" ইত্যাদি।

পাঠক অবশ্যই দেখিলেন, ক্ষীরোদ বাবু নিজের সুবিধার জন্য চন্দ্রনাথ বাবুর কথা ছাটিয়া ছুটিয়া দিয়াছেন। চীনেরা মৃত কুমার কুমারীর বিবাহ দেওয়ার জন্য কাগজে দুই জনের ছবি আঁকিয়া পোড়ায়, হিন্দু ভিন্ন অন্য ইহাতে চন্দ্রনাথ বাবুর কাহারও ধর্ম্মবল নাই। কথিত ধর্ম্মবল কোথায়? ইহাতে চিত্তের একাগ্রতা থাকিতে পারে, কিন্তু কেবল মাত্র চিত্তের একাগ্রতাকেই চন্দ্রনাথ বাবু ধর্ম্মবল বলেন না। ইহাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা থাকিতে পারে, কিন্তু কেবল চিত্তের একাগ্রতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাকেও চন্দ্রনাথ বাবু ধর্ম্মবল বলেন না। ক্ষীরোদ বাবু বলেন, ইহাতে সাত্ত্বিকতাও থাকিতে পারে। হইতে পারে তাহা চীন দেশীয় সাত্ত্বিকতা; কিন্তু তাহা হিন্দু ধর্ম্মের সাত্ত্বিকতা নহে। ক্ষীরোদ বাবু একজন অসাধারণ পণ্ডিত, তিনি সাত্ত্বিকতার অর্থ জানেন না ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। সাত্ত্বিকতার অর্থ জানিয়াও তিনি এই চীন জাতির কুসংস্কারের মধ্য হইতে যে সাত্ত্বিকতা বাহির করিয়াছেন, ইহা কেবল চন্দ্রনাথ বাবুর বিরুদ্ধে হাস্যরস সৃষ্টি করার কৌশল মাত্র। আর কাপালিক, কর্ত্তাভজা, ঠগ, ডাকাইতদিগের "বিশ্বাসের একাগ্রতা" ই কি চন্দ্রনাথ বাবুর কাপালিক, কর্ত্তাভজার বিশ্বাসে ধর্ম্মবল নাই। কথিত ধর্ম্মবল? এইরূপ অসংযত ভাবে লেখনী চালনা দ্বারা অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্য পাঠকবর্গের চক্ষে ধাঁধা জন্মাইয়া, তাঁহাদের মনে কৌতুকের অবতারণা করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই, কিন্তু এতদ্দ্বারা সততা ও ন্যায়পরতার গৌরব বর্দ্ধিত হয় কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়।

ক্ষীরোদ বাবু আবার বলেন—

"চন্দ্রনাথ বাবু বলিতেছেন যে, সন্তানোৎপাদন ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া হিন্দুরা জানে এবং ধর্ম্মকার্য্য করিতে তাহারা যেরূপ সংযত হয়, সন্তনোৎপাদন কার্য্য সেইরূপ সাধু ও সংযত চিত্তে করিয়া থাকে। তাই হিন্দুরা এমন সাধু ও মনিষী সন্তান উৎপাদন করিতেছেন যে, আমাদের সন্তান দেখিয়া সমস্ত ইউরোপ মহা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। আর ইউরোপের লোকে অসংস্কৃত ভাবে শারীরিক শক্তি নিয়োগ করিয়া সন্তান উৎপাদন করে, তাই ইউরোপে কেবল যণ্ডামার্ক জন্মিতেছে।"

এখানেও চন্দ্রনাথ বাবু যাহা বলেন নাই, ক্ষীরোদ বাবু তাঁহার মুখ দিয়া সেই কথা বাহির করিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবু কোথায়ও একথা বলেন নাই যে, এক্ষণকার হিন্দুরা সন্তানোৎপাদনকে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া জানে, এক্ষণকার হিন্দুরা

চন্দ্রনাথ বাবু এক্ষণকার কথা বলেন নাই।

সন্তানোৎপাদন কার্য্য সাধু ও সংযত চিত্তে করিয়া থাকে। তিনি বলেন, প্রাচীন কালে হিন্দুরা সন্তানোৎপাদনকে ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া জানিত, এবং সেইজন্য তাহাদের সাবিত্রী রামচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় মহা যশস্বী সন্তান জন্মিয়াছিল। (সাবিত্রী-তত্ত্ব ২১—২২ পৃষ্ঠা) পরন্তু চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, আমরা এক্ষণকার নব্যবাঙ্গালীগণ এবিষয়ে "অসংযম অমিতাচার, অসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তস্থল হইয়া পড়িয়াছি * * * * * আর এই জন্য আমরা আজিকার দিনের বাঙ্গালীর স্ত্রী ও পুরুষ শারীরিক ও মানসিক বলে পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যে সকল সন্তান উৎপাদন করিতেছি, তাহাদিগকে দেখিয়া সমস্ত ইউরোপ মহা শঙ্কিত হইয়াছে।" (২৫ পৃষ্ঠা)।

ব্যঙ্গোক্তি মাত্র।

এই শেষোক্ত উদ্ধৃত বাক্য টীকে ব্যঙ্গোক্তি বলিয়া কে না বুঝিতে পারে?

ইহা কি কখনও সম্ভবপর যে ক্ষীরোদ বাবুর ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিত ইহাকে ব্যাঙ্গোক্তি বলিয়া বুঝিতে ভুল করিয়াছেন? তাহা কখনই না, তিনি নিশ্চয়ই ইহাকে ব্যঙ্গোক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়া থাকিলেও বুঝাইয়াছেন অন্য রকম। এই রকম অতীত কালকে বর্ত্তমান বলিয়া প্রতিপাদন করা ও ব্যঙ্গোক্তিকে বিপরীত ভাবে প্রতিপাদন করা কেবল চন্দ্রনাথ বাবুকে সকলের নিকট অপদস্থ করিবার চেষ্টা নহে কি? ক্ষীরোদ বাবুর মতে "চন্দ্রনাথ বাবু ইউরোপে পরিভ্রমণ করিয়া তথাকার বিভিন্ন জাতির সামাজিক রীতি, নীতি, চর্চ্চা" করেন নাই, সেজন্য পাশ্চাত্য সমাজের দোষ গুণের আলোচনা করিবার অধিকারী নহেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ক্ষীরোদ বাবু যে চীন জাতির সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি কি চীনদেশে পরিভ্রমণ করিয়া সে দেশের রীতি নীতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? মোক্ষমূলর সাহেব যে হিন্দুজাতি সম্বন্ধে কত সত্য কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তিনি কি একবারও ভারতে আসিয়াছিলেন? কোন দেশে পরিভ্রমণ না করিলেও যে সে দেশের সাহিত্য চর্চ্চা দ্বারা তথাকার রীতি নীতির সম্যক জ্ঞান জন্মিতে পারে, ক্ষীরোদ বাবু চন্দ্রনাথ বাবুর বেলায় একথা স্বীকার কহিতে রাজি নহেন কেন? মোক্ষমূলর সাহেব ভারতে একবারও আসেন নাই, আবার বিলাতের Daily Telegraph পত্রিকার লেখক পরলোকগত ষ্টিভেন্‌স (Steevens) সাহেব ত ভারতে আসিয়াও এদেশবাসীদিগের সম্বন্ধে তাঁহার সেই সুপ্রসিদ্ধ মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। এখন মোক্ষমূলর সাহেবের মত অপেক্ষা ষ্টিভেন্‌স সাহেবের মত ক্ষীরোদ বাবুর নিকট অধিকতর আদরনীয় হইবে কি? আর ইউরোপের মহিলার পতিপ্রেম সাবিত্রীর পতিপ্রেমের আদর্শে যে নিতান্ত হীন, তিনি যে একজনকে ভালবাসিতে বাসিতে আর একজনকে ভাল বাসিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলেন, একথা জানিতে হইলে ইউরোপে কেন যাইতে হইবে, বুঝিতে পারি না। বিলাতী নভেল সকলে বিলাতী রমণীগণের যে সকল পতিপ্রেমের চিত্র অজস্র অঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, ক্ষীরোদ বাবু সে সকল মিথ্যা মনে করেন কি?

ক্ষীরোদ বাবু বুঝিয়া সুজিয়া প্রতারণা করিয়াছেন।

কোন জাতি চিনিতে হইলে তাহাদের নভেল পড়াই যথেষ্ট, দেশ দেখার প্রয়োজন নাই।

মোটকথা ক্ষীরোদ বাবু যে চন্দ্রনাথ বাবুর উপর চটা, তাহা তিনি তাঁহার প্রবন্ধে গোপন করিবার চেষ্টা করেন নাই। চন্দ্রনাথ বাবুর "আর্য্যামি" বাড়িয়াছে, "চন্দ্রনাথ বাবু হিন্দু আচার পদ্ধতির' পক্ষপাতী" ও তাহা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল বোধ হয় ক্ষীরোদ বাবুর রাগের কারণ। সেই

রাগের বশে সমালোচনা।

রাগের বশীভূত হইয়া তিনি সাবিত্রী তত্ত্বের সমালোচনা করিতে বসিয়াছিলেন। কাজেই সমালোচকের কার্য্যে যতদূর ধীরতা, গাম্ভীর্য্য ও সত্যানুসন্ধিৎসার প্রয়োজন, ক্ষীরোদ বাবু তাহা ঠিক রাখিতে পারেন নাই। ক্ষীরোদ বাবুর সমালোচনা পড়িয়া একজন বিচারকের কথা মনে পড়িল। তিনি সাক্ষিগণের জবানবন্দী শুনিলেন এবং আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। আসামীর উকীল বলিলেন,—

"আসামী দোষী তাহার প্রমাণ কই? সাক্ষীরা ত সকলেই তাহাকে নির্দ্দোষী বলিল?"

বিচারক। সাক্ষীরা তাহাকে দোষী নাই বা বলিল, তাহাতে কি! তাহাদের জবানবন্দীতে যে টুকু অভাব আছে, তাহা আমি নিজেই পূরণ করিয়া দিয়াছি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

আমার কৈফিয়ৎ।

ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তি অপেক্ষা গা চাটাচাটির প্রবৃত্তিটা আমাদের মধ্যে সামান্য প্রবল নহে। বেঙ্গলী বলিলেন, "ইজাবৎ হোসেন খারাপ লোক," অমনি অমৃতবাজার বলিলেন "ইজাবৎ হোসেন দেবতা বিশেষ।" হিতবাদী বলিলেন, "শাস্ত্রী অধ্যক্ষ পদের অনুপযুক্ত," বঙ্গবাসী বলিলেন, "শাস্ত্রী সাতরাজার ধন এক মাণিক।" এত গেল শত্রুতা। ঘোষজা বক্তৃতা করিলেন "আমাদের দেখিয়া য়ুরোপীয়েরা মানুষ হইতেছে," বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "ধন্য ধন্য!" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভুলিয়া গেলেন যে, তাঁহাকে সময়ান্তরে বিচার করিতে হয়, অথবা বিচারকতা তিনি পোষাকের সঙ্গে খুলিয়া ফেলিতে পারেন। প্রকাশ্য সভায় বসুজা বলিলেন, "বাঙ্গালেরা বাঙ্গালা ভাষাটা মাটী করিতেছে," (কালীপ্রসন্ন ঘোষ এখনও মরেন নাই) অমনি মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন, "ঠিক ঠিক, তাহাদের গায়ে বড় দাদ।" পাঠক, ইহার একটী কথা অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না।

মৌলিক রচনার যেমন সময় হয় নাই, বোধ হয়, সত্য সমালোচনারও তেমনি সময় হয় নাই। এখন পুস্তকের সঙ্গে গ্রন্থকার সমালোচকের দ্বারে উপস্থিত হন। বই সম্পূর্ণ না করিয়া, কোথায় বা না ছাপাইয়া, সমালোচনা সংগ্রহ করা হয়। সমালোচক হয় শত্রু না হয় গা চাটা। সত্যের অনুরোধে সত্য কথা বলিতে পারে, শত্রু না হইয়া ভুল দেখাইতে পারে, ইহাতে সাধারণের বিশ্বাস নাই। দুঃখের বিষয় যতীন্দ্র বাবুর মত লোকেরও এইরূপ ধারণা। যতীন্দ্র বাবু বুঝিয়াছেন যে, শত্রুতা করিয়াই আমি চন্দ্রনাথ বাবুর নিন্দা করিয়াছি, ইচ্ছা করিয়া ভুল বুঝিয়াছি, যতীন্দ্র বাবু বালক।

চন্দ্রনাথ বাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু শ্রদ্ধা করি বলিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর দোষ দেখাইব না, এমন অন্ধ ভক্তি আমার নহে। তবে সমালোচনা যত তীব্র হইয়াছে, তত তীব্র না হইলে পারিত। আমার ধারণা, ইহা অপেক্ষাও তীব্র সমালোচনা চন্দ্রনাথ বাবুর পক্ষে যথেষ্ট নহে। যিনি বলিতে পারেন, কাম "এমনই দুর্দ্দমনীয় উগ্র প্রবৃত্তি যে, শারীরিক বিকাশে ইহার উন্মেষ হইলে উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া রাখিতে পারে, এমন স্ত্রী কি পুরুষ নাই বলিলেই হয়" তাঁহাকে কেবল উপহাস করাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। স্পষ্টই বুঝা যায়, সমস্ত হিন্দুবিধবা ও বিরহিণী, কুমার ও বিপত্নীক, ব্রহ্মচারী, সাধু, সন্ন্যাসী সকলকেই চন্দ্রনাথ বাবু কামাতুর বলিয়া বিবেচনা করেন। এই দুর্দ্দাম প্রবৃত্তির অত্যাচার নিবারণ করিতে তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। বিধবাকে স্বৈরিণী ও একজন স্ত্রীর বহুপতিত্ব ব্যবস্থা করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন, কি স্বামীদিগকে আপিসে যাইবার সময় স্ত্রীকে লোহ পেটিকায় বদ্ধ করিবার ব্যবস্থা দিবেন বুঝা যায় না। যাহারা বলে, রূপবান পুত্র দেখিলে মায়েরও কামের উদ্রেক হয়, চন্দ্রনাথ বাবু সেই শ্রেণীর লোক। তাঁহার সাবিত্রী তত্ত্বে এ কথা গুলি নাই। তবে সাবিত্রী-তত্ত্বের এত তীব্র সমালোচনা কেন করিলাম, বলা কর্ত্তব্য। গা চাটাচাটি এত প্রশ্রয় পাইয়াছে এবং বাজারের লোকের বাহবা পাইবার সাধ মনস্বিদিগের মধ্যেও কাহার কাহারও এত অধিক হইয়াছে যে, শত্রুতা কেন, তাঁহাদের হিতৈষী হইয়াই লোকে সত্য কথা তীব্রভাবে বলিতে পারে। রোগের উপযুক্ত ঔষধ না দিলে ফল হয় না। যতীন্দ্র বাবুকে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন হইতেছে না। যে ছাপের আড়ালে চন্দ্রনাথ বাবুকে দাঁড় করাইয়া যতীন্দ্র বাবু আমার গুলি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার মকেল প্রকৃত বীরের ন্যায় সেরূপ আবডাল অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মক্কেল উকিলকে বিদায় দিয়া বুক ফুলাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছেন।

যতীন্দ্র বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবু উভয়েই বলিয়াছেন যে, "আমরা এমন সন্তান উৎপাদন করিতেছি, যাহা দেখিয়া ইউরোপ মহাশঙ্কিত হইয়াছে" ইত্যাদি কথাগুলি হিন্দুদিগকে বিদ্রূপ ও তিরস্কারের অভিপ্রায়েই লেখা হইয়াছে। সম্প্রতি কুচবিহারের গরিবপত্রিকার মোকদ্দমায় "নব্যবাঙ্গালীর" অর্থ লইয়া একটা গোলমাল বাঁধিয়াছিল। চন্দ্রনাথ বাবু ব্রাহ্ম ও সাহেবিয়ানা প্রিয় লোকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া, তিনি যাহাদিগকে ধর্ম্মশাসন, সমাজিক শাসন ও পারিবারিক শাসন উপেক্ষা করিবার, উড়াইয়া দিবার লোক মনে করেন, যাহারা বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালীর পরিবর্ত্তে অধিক বয়সে বিবাহ দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিতে চান, তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিতেছেন যে, এত অধোগত হইয়াও আমরা যে সকল সন্তান উৎপাদন করিতেছি, তাহাদিগকে দেখিয়া ইউরোপ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে, এইরূপ অর্থই বুঝিয়াছিলাম। তিনি স্বজাতীয়দিগকে বিদ্রূপ করিতেছেন, এ কথা

একবারও মনে হয় নাই। কোন প্রকার চিহ্ন বা লক্ষণে(তিনি না বলিয়া দিলে)এখনও আমি বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, তিনি যখন এই অর্থ লইতে বলিতেছেন, তখন তাহা লইতে আমি বাধ্য। কিন্তু তাহাতে কি? ইয়ুরোপীয়েরা পাশব সংসর্গে ষণ্ডামার্ক উৎপাদন করিতেছে এবং প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কেবল মহাপুরুষের জন্ম হইত, প্রত্যেক হলহস্ত কৃষক এক একটী সিনসিনেটস, অপরাধী পাষণ্ড ছিল না, অপরাধ নিবারণের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় নাই, ইত্যাদি কথাগুলি চন্দ্রনাথ বাবু প্রত্যাহার করিতে পারিলেন না।

যে আপনাকে শ্রেষ্ঠ লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে করে, তাহাকে জেটা বলে। যে দর্পিত স্বল্পজ্ঞান বিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করে, তাহাকে জেটামি বলে। স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিপ্রিয়তা স্বধর্ম্মে একাগ্রতা অতি আদরের জিনিস, কিন্তু যে স্বদেশানুরাগ দেশীয় শর্ষপকে বিদেশীয় পর্ব্বত অপেক্ষা বৃহত্তর মনে করে, যে স্বজাতিপ্রিয়তা স্বজাতির কুসংস্কারকে অমূল্যায়মান করে, অজ্ঞতাকে প্রজ্ঞা দৃষ্টি বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাকে আর্য্যামি বলে। আর্য্যামি একটী রোগ। এই আর্য্যামির দোষে যতীন্দ্র বাবু অন্য জাতির মধ্যে স্বাস্থিকতা দেখিতে পান না,চন্দ্রনাথ বাবু ইউরোপে কেবল ষণ্ডামার্ক দেখিতে পান,আরো দেখেন যে, ইউরোপীয় মহিলার পতিপ্রেম নাই। এবং সিদ্ধান্ত করেন, যেখানে বাল্য বিবাহ নাই, সেখানে কেবল ব্যভিচার দেখিতে পান। পঁচিশ বৎসরের পুরুষের সহিত আট বৎসরের বালিকার বিবাহ দিলেই ব্যভিচার দেশ হইতে নির্ম্মূল হয়। হিন্দু সমাজে ব্যভিচার নাই। হয় ত চন্দ্রনাথ বাবু প্রাচীন আর্য্য-সমাজের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। সুতরাং অপ্রিয় হইলেও, নিজের কুৎসা নিজে করা নিন্দনীয় হইলেও, আমাকে বাধ্য হইয়া দু চারিটী কথা বলিতে হইতেছে। বৈদিক যুগ হইতে বরাবর আমরা নগরে বারবনিতার দর্শন পাই। ইহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল? অশ্বমেধ যজ্ঞে যজ্ঞকর্ত্রীকে যে বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় করিতে হইত, তাহা কোন্ সুরুচিসঙ্গত? নিয়োগ প্রথা বা স্বামী অক্ষম হইলে অন্য পুরুষ ধরিয়া স্ত্রীর ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করিয়া লওয়া কোন্ সুনীতি অনুমোদিত?

অনেকে অল্প বয়সে দেশীয় বালিকার পূর্ণতা প্রাপ্তির কারণ কেবল দেশের উত্তাপাধিক্য অনুমান করেন। বস্তুতঃ অল্প বয়সে হিন্দু বালিকার মনোভাবের বিকৃতি একটী প্রধান কারণ। বালিকার চক্ষু হইতে যুবক যুবতীর লীলা চাতুরি প্রচ্ছন্ন না থাকাতে অকালপক্বতার এত বৃদ্ধি হইয়াছে। যে ইউরোপীয় সমাজ চন্দ্রনাথ বাবুর এত ঘৃণিত, সেই সমাজের নিকট এই সকল বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট শিখিবার আছে।

ইউরোপীয় সমাজ আদর্শ সমাজ নহে। আমাদের সমাজে যাহা দূষণীয়, তাহা অন্য সমাজের আদর্শে সংশোধন করিতে হইবে, আমাদের সমাজে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা অন্য সমাজের দৃষ্টান্তে পরিত্যাগ করিতে হইবে না। নতুবা সন্তানের বিষ্ঠা বলিয়া বিষ্ঠাকে পোষণ করা স্নেহশীলতার তাদৃশ পরিচয় দেয় না, অহম্মুখতার যত পরিচয় দেয়। আর্য্যামি এই জন্য নিন্দনীয়।

চন্দ্রনাথ বাবু আমার অপেক্ষা শতগুণে

পণ্ডিত ও বিচক্ষণ। এ সকল জানা কথা তাঁহাকে বলিবার কোন আবশ্যক নাই। আমার বিশ্বাস তিনি এ সকল জানেন ও বুঝেন, কেবল বাজারের লোকের হাততালি পাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না বলিয়া, যশপ্রিয়তার নিকট আত্মমর্য্যাদার বলিদান করেন। সেই রোগ সারাইবার জন্য তাঁহাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিবার আবশ্যক হয়।

চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, তিনি ইয়ুরোপ না দেখিয়া থাকিলেও ইউরোপীয় নাটক নবেলে ইউরোপীয় সমাজের চিত্র দেখিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবুও বলেন, দেশের সাহিত্য হইতে দেশীয় সমাজের তথ্য সম্যক নিরূপণ করা যাইতে পারে, দেশ পরিভ্রমণের বা দেশীয়দিগের সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়া তাহাদের আচার ব্যবহার চর্চ্চা করিবার আবশ্যক নাই। এ মতটী এত অসার যে, ইহার অসারতা প্রতিপাদন অনাবশ্যক। "তুই কাণা—তুই কাণা" এই রকমের একটা উত্তর দেওয়া যাউক। "হরিদাসের গুপ্ত কথা" বা "ঠাকুর বাড়ীর দপ্তর" প্রভৃতি পুস্তক পড়িয়া যদি কোন ইংরাজ সিদ্ধান্ত করেন যে, হিন্দুগৃহে সতীত্ব নাই—সধবা বিধবা সকলেই ব্যভিচারিণী, আপ্তরঙ্গ বাছ বিচার নাই—চন্দ্রনাথ বাবু ও যতীন্দ্র বাবু এইরূপ সিদ্ধান্ত কেমন সম্মান করিবেন? বস্তুতঃ জাতি বিশেষের মধ্যে বহুকাল বাস করিয়া যাহা জানা যায় না, কেবল সাহিত্য গ্রন্থ হইতে তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব।

কল্পনাপ্রধান আখ্যায়িকার চরিত্র চিত্রাঙ্কন উদ্দেশ্যানুসারে সত্য হইতে বিভিন্ন। আদর্শপ্রধান আখ্যায়িকা অতিরঞ্জিত, লাঞ্ছনার অভিপ্রায়ে শৃঙ্গ ও লাঙ্গুল সংযোজিত হয় বা দুপোঁচ রঙ্গ চড়াইয়া দিতে হয়। আখ্যায়িকা হইতে একটা আবছাওয়া মাত্র পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত নিরূপণ করা যেমন কঠিন, আখ্যায়িকা হইতে সমাজের প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা তেমনি কঠিন। বিশেষ ভাবে যাহাদিগকে জানিনা, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে হইলে সংযমের সহিত বলা নিতান্ত আবশ্যক।

আর একটী কথার বিচার করিতে হইবে। মানসিক শক্তিতে অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায় কি না? দেহের শক্তিতে যা না হয় (যেমন বন্ধ্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন) মনের শক্তিতে তাহা হয়, (এখানে মনের শক্তি বলিতে কেবল একাগ্রতা বুঝিতে হইবে) চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। একাগ্রতায় কার্য্যের পূর্ণতা সাধন করে। যে কোন শক্তি শতাগ্র না হইয়া একাগ্র হইলে তাহার শক্তিমত্তা অধিক হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। আমার মানসিক শক্তিতে আমার দৈহিক শক্তিও কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত করিতে পারে, যে বোঝা এমনি তুলিতে পারিনা, রাগ হইলে তাহা তুলিতে পারি। হিপনটিজম্ সত্য হইলে, একজনের মানসিক শক্তি অন্য এক জনের কোন কোন মানসিক ও কোন কোন দৈহিক শক্তিকেও প্রভাবিত করিতে পারে। কিন্তু "বিশ্বাস গভীর হইলে অসম্ভব সম্ভব করিতে পারে" বা দেহের শক্তিতে যাহা হয় না, মনের শক্তিতে তাহা হয়" একথা সর্ব্ববাদিসম্মত হওয়া দূরে থাকুক, আদৌ সত্য নহে। দেবতার দৃঢ় বিশ্বাস বালিকাকে যুবতী করিয়া লইতে পারে,বন্ধ্যার সন্তান উৎপাদন করিতে পারে

তেঁতুলগাছে আম ফলাইতে পারে, মরা মানুষ বাঁচাইতে পারে, এ সকল কথা এত অসত্য যে, আমি কোন দরিদ্র-শালায় পাঁচশত মুদ্রা উপহার দিতে প্রস্তুত আছি, যদি চন্দ্রনাথ বাবু ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন। বস্তুতঃ কার্ত্তিক ও বারইয়ারী পূজার এইরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া বিশ্বাসের গভীরতা বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা হইতেছে এবং পাহাড়ের ভিত্তির পরিবর্ত্তে বালুর বাঁধের উপর হিন্দুধর্ম্ম স্থাপন করিতে চেষ্টা করা হইতেছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গ্রীক পৌত্তলিকগণ এইরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া গ্রীক পৌত্তলিকতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ফলে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচার শীঘ্রতর সম্পাদিত হইয়াছিল।

ইউরোপীয় সমাজ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর ধারণা যে, বাজারে লোকের ধারণার মত কুৎসিৎ, চন্দ্রনাথ বাবু স্বীকার করিয়াছেন। অধিকন্তু সকল দেশের নারী জাতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে কুৎসিত, এ পত্রে তাহারও পরিচয় দিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজ, কি খ্রীষ্টসমাজ কি অন্য কোন বিশেষ সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই! কিন্তু যে কোন সমাজে অধিক বয়সে বিবাহনিয়ম প্রচলিত আছে, সেই সকল সমাজের রমণীমাত্র যে ব্যভিচারিণী, তাহাও বলিয়াছেন—তাঁহার সাবিত্রী, সীতা ও শকুন্তলা, দ্রৌপদী ও দময়ন্তী সকলেরই বেশী বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং তাহারাও যে অসতী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যিনি মা, ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যার চরিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, তিনি যাহাদিগের সহিত কখন ওঠাবসা করেন নাই, চাপরাশী বা খানসামার কাছে যাহাদের ঘরের পরিচয় লন, তাঁহার ধারণা তাহাদের সম্বন্ধে কত সত্য বা উচ্চ হইতে পারে, সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ যখন সাবিত্রী-তত্ত্বের সমালোচনা করিয়াছিলাম, জানিতাম না যে, চন্দ্রনাথ বাবুর অধোগতি এত অগ্রসর হইয়াছে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

অধিকারী অনধিকারী।

পারমার্থিক বিষয়ে কাহারও অধিকার, কাহারও অনধিকার কল্পিত হওয়ায় নানা অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ এক নামে পরমেশ্বরকে ডাকিতেছেন, কেহ অপর নামে; কেহ এক প্রকার রূপ কল্পনা করিতেছেন, কেহ অপর প্রকার। যিনি যে নাম রূপ অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন, তিনি অন্য নাম রূপ নির্দ্দেশকের সহিত একমত হইতে পারিতেছেন না। উভয়েই বিবাদ অশান্তিতে কালাতিপাত করিতেছেন। যাঁহার যে ক্রিয়াতে সংস্কার পড়িতেছে, তিনি সেই ক্রিয়াতে যাহাদের অধিকার কল্পিত হয় নাই, তাহাদিগকে নাস্তিক, অধার্ম্মিক প্রভৃতি বোধ করিতেছেন। ফলে পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশতঃ সকলেই ইষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতেছেন। ইহার মূল কারণ অধিকারী অনধিকারী কল্পনা। কিন্তু সকলেরই সৎপথে অর্থাৎ পরমার্থ প্রাপ্তির পথে অধিকার আছে এবং সৎপথ এক ভিন্ন বহু নহে।

এরূপ ধারণা করিলে বা সৎপথে চলিলে সকলেই সুখ শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

অতএব বিচার করিয়া দেখুন যে, পারমার্থিক বিষয়ে অধিকার অনধিকার, স্বার্থ ও পক্ষপাতপরায়ণ মনুষ্যের কল্পিত, কি, ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট। পরমেশ্বর যে জীবকে যে অধিকার দিয়াছেন, তাহার কোন মতে কেহ অন্যথা করিতে পারে না। যেমন জল জন্তুর জলে বাস করিবার অধিকার ও খেচর জীবের আকাশে বিচরণ করিবার অধিকার। সহস্র চেষ্টা করিলেও খেচর জীব জলচর হইবে না। এইরূপ বিচার পূর্ব্বক সকল বিষয়ে ঈশ্বর দত্ত অধিকার বুঝিবে।

পরমেশ্বর যাহাকে যে বিষয়ে অনধিকারী করিয়াছেন, তাহার সে বিষয়ের কোন প্রয়োজন থাকে না। যেমন খেচর জীবের জলে বাস করা অনধিকারও বটে এবং নিষ্প্রয়োজনও বটে। এবং সে অনধিকার বশতঃ তাহার কোন হানি লাভ নাই। ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট অধিকার বা অনাধিকার সম্বন্ধে মনুষ্যের বিধি নিষেধের স্থল নাই। বিধি দিলেও অনধিকার অধিকার হইবে না, নিষেধ করিলেও অধিকার অনধিকার হইবে না। ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট অগ্নির যে প্রকাশ গুণ, মনুষ্যের বিধি নিষেধের দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিবে।

কিন্তু ধর্ম্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে অধিকার অনধিকার থাকিতে পারে না। কেন না তাহাতে সকলেরই প্রয়োজন। তাঁহাকে ত্যাগ করিলে কাহারও হিত হয় না। এ নিমিত্ত তাঁহার সম্বন্ধে সকলেরই অধিকার আছে! আর একটী কথা স্থির ভাবে বুঝিবে। তোমাদের মনুষ্য ব্যবহারে অধিকার অনধিকার কিসে ঘটে? তোমাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই অধিকার ও অনধিকার বোধ হয়। তুমি মনে কর যে, এই ক্ষেত্র বা বাগান তোমার নিজের, পরমাত্মা বা অপর কাহারও নহে। ইহার ফলভোগ করিতে তোমারই অধিকার; অপরের নাই। কিন্তু এই জগতের মধ্যে কে এমন আছে যে, তাহার ঈশ্বরে সত্বাধিকার জন্মিতে পারে? তাঁহাকে কি কেহ ঠিকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে যে, তাহার বিনা অনুমতিতে অপর কেহ ঈশ্বরের নিকট আসিতে পারিবে না?

এইরূপ স্বার্থ বশতঃ তোমরা যে ক্ষেত্র বা বাগান আপনার বলিয়া জান, তাহাতেই জল দাও। কিন্তু ঈশ্বরে আত্ম-পর ভেদ নাই। তিনি যখন জল বর্ষণ করেন, তখন সর্ব্ব স্থানেই করেন। সেইরূপ যাহাতে সকলেরই পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবানের তাহা উদ্দেশ্য। স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রকেই আপনার বা পরমাত্মারস্বরূপ জানিয়া তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে সৎপথে লইতে যত্ন করেন, কাহাকেও সৎ হইতে বিমুখ করেন না। তিনি জানেন যে, বেদ বা ধর্ম্ম বা ওঁকার মন্ত্র অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সকলেরই সমান। তিনি সকলেরই আত্মা ও প্রিয়, তাঁহাতে কাহারও অনধিকার নাই।

ঈশ্বর বা জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণের হিতের জন্য শাস্ত্র রচনা করেন ও সদুপদেশ দেন, বিশেষ কাহারও জন্য নহে। যে শাস্ত্রে বা উপদেশে ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিবে, তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর বা সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী নহেন—স্বার্থপর মনুষ্য হইতে তাহার উৎপত্তি। ইহা ধ্রুব সত্য।

হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, ওঁকার মন্ত্র জপ করিতে ও বেদ পাঠে সকলের অধিকার নাই। যে জীবের সম্বন্ধে সামাজিক সংস্কার অনুসারে স্ত্রী বা শূদ্র নাম কল্পিত হইয়াছে, ওঁকার উচ্চারণ ও বেদ পাঠ করিলে তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট,এইরূপ বিশ্বাস অনেকের মনে বদ্ধমূল। ইহার ফলে নানা কষ্ট ও অশান্তি ভোগ ঘটিতেছে। অতএব বিচার পূর্ব্বক দেখ যে, এই স্বতঃ-প্রকাশ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিত্য বিরাজমান। ইহাঁরই দেশ কাল ও ভাষা ভেদে নানা নাম বা মন্ত্র কল্পিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটী নাম বা মন্ত্র ওঁকার। যেমন তোমাদের মধ্যে কাহারও নাম হরি, যদু বা রাম, তেমনি জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের নাম ওঁকার। যাঁহার নাম ওঁকার, তাঁহা হইতে সমুদয় চরাচরের উৎপত্তি হইয়া তাঁহাতেই তাহার লয় ও পুনরুদয় ঘটিতেছে, অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ জীবের জন্ম মৃত্যু বোধ হইতেছে। সমস্ত জীবই ওঁকারের রূপ। স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্র আপনার বা বিরাট পুরুষ মাতা পিতার নাম যে ওঁকার, তাহা উচ্চারণ করে বা না করে, তাহাতে স্বরূপতঃ জীবের কি আসে যায়? যেমন, হরি যদু বা রামের সহিত যে প্রয়োজন, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য সেই সেই নাম ধরিয়া ডাকিতে হয়, তেমনই ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য সিদ্ধির জন্য ওঁকার নাম ধরিয়া পূর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতাকে ডাকিতে হয়। যখন তিনি দয়া করিয়া জ্ঞান দিবেন, তখন তুমি দেখিবে যে,তোমারই নাম ওঁকার। এই ওঁকার বিরাট পুরুষ অ, উ, ম, অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ বা অগ্নি চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ। এক ওঁকার হইতে এই তিন এবং এই তিনই এক ওঁকার। এই এক ওঁকার বিরাট পুরুষ দৃশ্যমান সাত অঙ্গ ধাতু বা তত্ত্ব লইয়া এক। এই ভাবে তাঁহার নাম সপ্ত ব্যাহৃতি বলিয়া শাস্ত্রে কল্পিত। যথাঃ—ওঁ ভূঃ অর্থাৎ পৃথিবী, ওঁ ভুবঃ অর্থাৎ জল, ওঁ স্বঃ অর্থাৎ আগ্নি,ওঁ মহঃ অর্থাৎ বায়ু, ওঁ জনঃ অর্থাৎ আকাশ,ওঁ তপঃ অর্থাৎ চন্দ্রমা,ওঁ সত্যং অর্থাৎ সূর্য্য নারায়ণ। এই সপ্ত ব্যাহৃতিকেই শাস্ত্রে দেবতা বলে। এতদ্ভিন্ন দেবতা হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই।

শাস্ত্রে বলে, তোমার দেহেই সমস্ত দেবতা রহিয়াছেন। এক এক ইন্দ্রিয়ের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা তত্ত্ব কল্পিত হইয়াছেন। যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মল নিঃসারক ইন্দ্রিয়ের পৃথিবী তত্ত্ব বা দেবতা। মূত্র নিঃসারক ইন্দ্রিয়ের জল তত্ত্ব বা দেবতা। অন্ন পরিপাক ইন্দ্রিয়ের অগ্নিতত্ত্ব বা দেবতা। শ্বাসবাহী ইন্দ্রিয়ের বায়ু তত্ত্ব বা দেবতা। শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের আকাশ তত্ত্ব বা দেবতা। মনের চন্দ্রমা তত্ত্ব বা দেবতা। জীববুদ্ধি বা জ্ঞানের অর্থাৎ অন্তর ও বহির্দৃষ্টির অথবা জ্ঞান নেত্রের তত্ত্ব বা দেবতা সূর্য্য নারায়ণ। এই সকল তত্ত্ব বা দেবতা সূক্ষ্মতার পরিমাণ অনুসারে দেহের নিম্ন স্থান হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে রহিয়াছেন—ইহারই নাম ষটচক্র, যাহাকে জ্ঞানের দ্বারা ভেদ করিলে অর্থাৎ যথার্থ রূপে চিনিলে অখণ্ড জ্যোতিরূপে সহস্রসার পদ্মে জীব আপনাকে ও পরমাত্মাকে অভেদে চিনিয়া কারণে স্থিত হন। যাহা ভিতরে তাহাই বাহিরে। ভিতর বাহিরকে লইয়া একই ওঁকার সাকার নিরাকার

পরমাত্মা বিরাট পুরুষ অসীম অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান। ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া পবিত্র অপবিত্র, উত্তমাধম কোন জীবই ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না এবং কোন জীবকে ক্ষণমাত্র ত্যাগ করিয়া ইনি নাই। অতএব ইহাঁর কল্পিত নাম যে ওঁকার শব্দ, তাহা উচ্চারণ করিতে কিরূপে কোনও জীবের পক্ষে অনধিকার হইতে পারে? যথার্থতঃ জীবেরই নাম ওঁকার। আপনার নাম আপনি উচ্চারণ করিতে বিধি নিষেধ অসম্ভব। গড্, আল্লা খোদা ঈশ্বর ব্রহ্ম পরমাত্মা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ গণেশ, সাবিত্রী গায়ত্রী মাতা ইহাঁরই নাম। অথচ ইনি সকল নামের অতীত যাহা তাহাই। অতএব ঈহাঁর যে নাম ব্রহ্ম গায়ত্রী তাহার জপ বা ওঁকার ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার যে মন্ত্র, তাহাতে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে। মনুষ্য মাত্রেই তাঁহাকে ভক্তি-পূর্ব্বক ওঁকার বা ব্রহ্মগায়ত্রী নামে ডাকিবে অর্থাৎ ঐ মন্ত্র জপিবে। এবং "ওঁ বরদে দেবী জ্যোতিঃ পরম ব্রহ্মণে স্বাহা" "ওঁ পূর্ণপর-ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপায় স্বাহা," "ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা" এই তিন বা ইহার মধ্যে কোন এক অথবা তদধিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কিম্বা বিনা মন্ত্রে জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মার নামে অগ্নিতে আহুতি দিবে। ইহাতে কোন ভয় বা সংশয় নাই। বরঞ্চ সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলই আছে।

আরও তোমরা মনুষ্য মাত্রেই বিচার করিয়া দেখ, যাহাকে বেদমাতা গায়ত্রী বা ওঁকার প্রভৃতি অথবা যাহাকে অধিকারী অনধিকারী বলে, তাহা কি বস্তু—সত্য না মিথ্যা? অধিকারী ও অনধিকারীর মধ্যে মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কি বস্তুর প্রভেদ, না, গুণ ক্রিয়া রূপের প্রভেদ? সেই যে প্রভেদ তাহা কি সাকার না নিরাকার—সত্য, না মিথ্যা? শাস্ত্রে ও লোকে সত্য ও মিথ্যা এই দুইটী শব্দ সংস্কার প্রচলিত। তাহার মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্যা দৃশ্যেও নাই, অদৃশ্যেও নাই। মিথ্যা উপাস্য উপাসক, অধিকারী অনধিকারী প্রভৃতি কোন পদার্থই হইতে পারে না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। যদি তোমরা মনে কর যে, বেদমাতা গায়ত্রী বা ওঁকার অথবা অধিকারী অনধিকারী তোমরা মিথ্যা অর্থাৎ মিথ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া মিথ্যারই রূপ মাত্র রহিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ যে, যখন জগৎ ও জগতের অন্তঃপাতী তোমরা মিথ্যা, তখন তোমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম জ্ঞান-বিশ্বাস ও তোমাদের ইষ্টদেবতা গায়ত্রী ওঁকার ঈশ্বর গড্, আল্লা খোদা প্রভৃতি সকলেই মিথ্যা। কেন না মিথ্যা হইতে কখনও সত্যের উপলব্ধি হয় না। এরূপ বলিলে বা ভাবিলে আরও বুঝিয়া দেখ যে, কে কাহার অধিকারী বা অনধিকারী হইবেন এবং বেদমাতা গায়ত্রী বা ওঁকারই বা কি পদার্থ হইবেন। যদি বল বা ভাব যে সত্য, তাহা হইলে গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখ যে, এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। সত্য কখনও মিথ্যা হন না। সত্য সর্ব্বকালে সকলের নিকট সত্য। এক সত্যের মধ্যে দ্বিতীয় সত্য অধিকারী অনধিকারী, বেদমাতা সাবিত্রী গায়ত্রী, ওঁকার, ঈশ্বর গড্, আল্লা খোদা পরমেশ্বর প্রভৃতির দ্বিতীয় সত্য কোথা হইতে আসিবেন?

রূপান্তর ভেদে একই সত্য নিরাকার সাকার বা কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ নাম রূপ লইয়া অসীম অখণ্ডাকার নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। এই পূর্ণ রূপের মধ্যে সাকার নিরাকার এই দুইটী ভাব বা শব্দ কল্পিত হইয়াছে। নিরাকার নির্গুণ শব্দাতীত জ্ঞানাতীত তাঁহার মধ্যে অধিকারী অনধিকারী বেদমাতা ওঁকার পূজ্য পূজক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব বা পদার্থ হইতেই পারে না। কেন না সেই নিরাকার এক নির্গুণ, গুণাতীত। তাঁহাতে কোন প্রকার ভেদ বা বিকার নাই। যেমন, জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় তোমাদের কোন প্রকার জ্ঞান বিকার বা ভেদ থাকে না। পুনরায় জাগ্রত অবস্থা বা প্রকাশ হইলে জ্ঞান হয় যে, "আমি সুখে শুইয়াছিলাম; আমি আছি বা আমার মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা আছেন।" সেইরূপ একই সত্য সাকার দৃশ্যমান জ্ঞানময় বিরাট জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ বিরাজমান। সাকার ব্রহ্মেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, উপাধি, অধিকারী অনধিকারী, বেদমাতা সাবিত্রী গায়ত্রী, ওঁকার প্রভৃতি সম্ভবে। এই সাকার প্রকাশমান ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপী শক্তি বা দেবতা দেবী "সহস্রশীর্ষা" ও „চন্দ্রমা মনসো জায়তে" ইত্যাদি বেদ মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। সকলেই জানেন যে, এই সকল মন্ত্র সন্ধ্যাহ্নিকের অন্তর্গত। ইহার নিষ্কৃষ্ট অর্থ এই যে, বিরাট বিষ্ণু ভগবানের জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী পৃথিবী চরণ। এই বিরাট বিশ্বনাথ বা বিষ্ণু ভগবান ব্যতীত সাকার বেদমাতা সাবিত্রী গায়ত্রী মাতা ওঁকার বা অধিকারী অনধিকারী দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনা ও নাই। এই বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গ্রহ দেবতা দেবী বলে, এবং অহঙ্কার লইয়া সেই পদার্থকেই শিবের অষ্ট মূর্ত্তি বলে, যাহাকে উল্লেখ করিয়া "ক্ষিতিমূর্ত্তায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হয়। অষ্ট প্রকৃতি, অষ্ট বিভূতি, ও অষ্ট সিদ্ধি প্রভৃতি তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন নাম। অহঙ্কারকে ত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ইহাঁকেই সাত বস্তু, সাত ধাতু, ব্যাকরণের সাত বিভক্তি ও ব্রহ্মগায়ত্রীর সাত ব্যাহৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এই মঙ্গলকারী বিরাট ভগবানের কোন্ অঙ্গ বেদমাতা সাবিত্রী, গায়ত্রী মাতা ওঁকার ও অধিকারী অনধিকারী হন, আর কোন্ অঙ্গ না হন, অথবা ইহারা কি সমষ্টিরই ভিন্ন ভিন্ন নাম? যদি এক অঙ্গকে অধিকারী ও অপর অঙ্গকে অনধিকারী বল, তাহা হইলে দেখাইয়া দাও, কোন্ অঙ্গ অধিকারী ও কোন্ অঙ্গ অনধিকারী, আর যিনি অধিকারী, তিনি কোন অঙ্গের অধিকারী বা সমষ্টির অধিকারী। যদি বল, এক অঙ্গ অধিকারী হইয়া অপর অঙ্গকে অধিকার করিতেছে, তাহা হইলে তুমি অধিকারী হইয়া তাঁহার কোন্ অঙ্গকে অধিকার করিতে চাহ, আর কোন্ অঙ্গকে অনধিকারী বলিয়া ত্যাগ করিতে চাহ? প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, একই মঙ্গলকারী বিরাট পুরুষের অঙ্গরূপী শক্তি বা দেব দেবী হইতে সমস্ত চরাচর জগৎ, স্ত্রী পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়াদি গঠিত হইতেছে। ওঁকার পুরুষের চরণ পৃথিবী গ্রন্থ, শক্তি

বা দেবতা হইতে স্ত্রী পুরুষের হাড় মাংস গঠিত। নাড়ী জলরূপী গ্রহ-শক্তি বা দেবতা হইতে জীব সমূহের রক্ত রস নাড়ী গঠিত। মুখ অগ্নিরূপী গ্রহ-শক্তি বা দেবতা হইতে জীব মাত্ররেই ক্ষুধা, পিপাসা, পরিপাক, ও বাক্য উচ্চারণ, রন্ধন, অন্ধকার নিবারণ প্রভৃতি ভিতরে বাহিরে নানা প্রকার কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। বায়ু প্রাণরূপী গ্রহ-শক্তি বা দেবতা হইতে জীবের নাসিকা-দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। মস্তক আকাশ গ্রহ-শক্তি বা দেবতা হইতে জীব মাত্রেই কর্ণ দ্বারা শব্দ গ্রহণ করিতেছে। চন্দ্রমা গ্রহ-শক্তি বা দেবতা দ্বারা জীবের "ইহা আমার, উহা তাহার" ইত্যাকার জ্ঞান ও দিবা রাত্র সংকল্প বিকল্প ঘটিতেছে। বিরাট ব্রহ্মের বুদ্ধি বা জ্ঞান নেত্র সূর্য্যনারায়ণ গ্রহ, শক্তি বা দেবতা মস্তকে সহস্র দলে বিন্দুরূপে স্থিত হইয়া জীবমাত্রকে চেতন করিয়া নেত্র দ্বারে রূপব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছেন ও করাইতেছেন এবং তাঁহার দ্বারা জীব সত্যাসত্যের বিচার করিতে সক্ষম হইতেছেন। যখন সূর্য্যনারায়ণ তেজোরূপ জ্ঞানশক্তি সঙ্কুচিত করিয়া জ্ঞানাতীত কারণ ভাবে স্থিত হন, তখন জীবের জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থা ঘটে ও জ্ঞানের সমস্ত কার্য্যের সমাপ্তি হয়। যখন পুনশ্চ তেজোরূপে নেত্রে, মস্তকে প্রকাশমান হন, তখন তিনি জীব বা চেতন ভাবে রূপ দর্শন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করেন। এইত মঙ্গলকারী ওঁকার পুরুষ বিরাট ব্রহ্ম সাকার নিরাকার চরারকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইহাঁর কোন্ অঙ্গ অধিকারী ও কোন্ অঙ্গ অনধিকারী হন বুঝিয়া প্রকাশ করুন।

যদি বল হাড় মাংসের পুত্তলি স্থূলশরীর অধিকারী ও ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্মশরীর অনধিকারী, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ, ওঁকার পুরুষের চরণরূপী যে পৃথিবী, তাহারই অংশ জীবমাত্রেরই হাড় মাংসের পুত্তলি স্থূল শরীর। তবে সকলেরই হাড় মাংস সমান ভাবে অধিকারী হইবে। যদি বল ইন্দ্রিয়াদি অধিকারী ও হাড় মাংস অনধিকারী, তাহা হইলে দেখ যে, ওঁকার বিরাট পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জীব মাত্ররেই জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় গঠিত হইয়াছে। যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা ধর্ম্ম, তাহা প্রত্যেক জীবেই সমান ভাবে বর্ত্তাইতেছে। যথা, চক্ষের দ্বারা দেখা, নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ ইত্যাদি। যখন একইরূপে জীব মাত্রেই সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে, তবে জীবমাত্রেরই ইন্দ্রিয়গণ অধিকারী। যদি বল, জীব যে চেতন তিনি অধিকারী, তবে দেখ, এক চেতনা ব্যতীত দ্বিতীয় চেতনা নাই। সমগ্র জীব একই ওঁকার চৈতন্যময় বিরাট পুরুষের অংশ, তবে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই সমান ভাবে বেদ গায়ত্রী সাবিত্রী মাতা ওঁকার অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের অধিকারী। এই রূপ বিচার করিলে স্পষ্টই দেখিবে যে, স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ কার্য্যের অধিকারী। অধিকারী অনধিকারী সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিবে যে, যাঁহার যে অভাব বোধ হইতেছে, তিনি সেই অভাব মোচনের অধিকারী। যিনি অন্ধকারে আছেন, তিনি অন্ধকার নিবারণের জন্য আলোকের অধিকারী। যিনি অজ্ঞান অবস্থায় আছেন, তাঁহার জ্ঞানের বা ভগবানের প্রয়োজন ও তিনি জ্ঞান বা ভগবানের অধিকারী। যাঁহার পিপাসা পাইয়াছে বা পাইবার সম্ভা-

বনা আছে, সেই ব্যক্তি পিপাসা নিবারণের নিমিত্ত জলের অধিকারী। যিনি ক্ষুধাতুর, তিনি অন্নের অধিকারী। যাঁহার অভাব আছে,তিনিই দান প্রাপ্তির প্রকৃত অধিকারী। যিনি রোগী, তিনি ঔষধের অধিকারী। নিরোগীর ঔষধের প্রয়োজন নাই, তিনি অনধিকারী। যাঁহার জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাঁহার জ্ঞানের প্রয়োজন নাই তিনি অনধিকারী। এইরূপ সকল বিষয়ে অধিকারী অনধিকারীর যথার্থ ভাব গ্রহণ করিবে।

একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়া দেখ। যদি এক মাতা পিতার দশটী পুত্র কন্যা হয় এবং সকলেই ভক্তি ও প্রীতি পূর্ব্বক আপন মাতা পিতাকে মাতা পিতা বলিয়া ডাকে ও উত্তম রূপে বুঝিয়া মাতা পিতার প্রিয়কার্য্য সাধন করে, তাহা হইলে মাতা পিতা ক্রোধান্বিত হইয়া পুত্র কন্যার অমঙ্গল চেষ্টা করেন, এমন নহে। বরং প্রসন্ন হইয়া মঙ্গল চেষ্টা করেন। সমদৃষ্টি সম্পন্ন সুপাত্র পুত্র কন্যা ইহাতে আনন্দিত হন যে, "আমরা দশজন ভাই ভগ্নী মিলিয়া ভক্তি পূর্ব্বক আপন মাতা পিতাকে ডাকিতেছি ও মাতা পিতার প্রিয়কার্য্যসাধন করিতেছি।" পুত্র কন্যা মাত্রেই মাতা পিতা নামের ও মাতা পিতা বস্তুর অধিকারী। কুপাত্র পুত্র কন্যার স্বভাব ইহার বিপরীত। তাহারা নিজে ভক্তি ও প্রীতি পূর্ব্বক মাতা পিতার নাম উচ্চারণ বা প্রিয়কার্য্য সাধন করে না ও অপরকে করিতে বাধা দেয়। এবং তাহার ফলে সর্ব্বদা অজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া অশান্তি অনুভব করে।

হিন্দু মুসলমান ইংরেজ স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি তোমরা সকলেই পুত্র কন্যারূপী। মাতা পিতারূপী মঙ্গলকারী নিরাকার সাকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের একমাত্র গুরু মাতা পিতা আত্মা। ইহাঁরই নাম ওঁকার। এই ওঁকার পুরুষ হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে। ওঁকার হইতে সমস্ত জীব উৎপন্ন হইয়া ওঁকার স্বরূপই রহিয়াছেন। ওঁকার জীব মাত্রেরই আত্মা মাতা পিতা গুরু। স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই বেদ, সাবিত্রী গায়ত্রী মাতা বা ওঁকার পুরুষের অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যের অধিকারী। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

জ্ঞানবান ব্যক্তি বা ওঁকার পুরুষ ঈশ্বর একজনকে সত্যের অধিকারী অপরকে অনধিকারী করেন নাই ও করিবেন না। সুপাত্র পুত্র কন্যা নিজে উত্তম কার্য্য করিবেন ও অপরের দ্বারা করাইবেন। তিনি জানেন যে, ওঁকার পুরুষ বা ব্রহ্মকে কেহ খরিদ বা ঠিকা গ্রহণ করেন নাই। কেবল সামাজিক স্বার্থবশতঃ লোকে অধিকারী অনধিকারী কল্পনা করিয়াছেন।

সমস্ত রাজা জমিদারগণ অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে উত্তমরূপে বিচার করিয়া মিথ্যাকে ত্যাগ ও সত্যকে ধারণ ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য কি, বুঝিয়া সম্পন্ন কর। অবস্থা ও শক্তি অনুসারে যে ব্যক্তি যে কার্য্যের উপযুক্ত, সে ব্যক্তি সেই কার্য্যের যথার্থ অধিকারী। যাহারা না বুঝিয়া অধিকারী অনধিকারী কল্পনা দ্বারা অপরকে সত্য ভ্রষ্ট করে ও আপনার অধঃপাত ঘটায়, তাহাদিগকে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ এরূপে দণ্ড দিবেন যে, তদ্দ্বারা শিক্ষা পাইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের মঙ্গল চেষ্টায় যত্নশীল

হয় ও সৎপথে চলিতে পারে। এরূপ আচরণে প্রসন্ন হইয়া পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মঙ্গলবিধান করিবেন।

যদি মনুষ্যের মধ্যে একজনও অধিকারী হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে জীবের এরূপ কষ্ট হইত না, সমস্ত অমঙ্গল দূর হইত। এখন কেবল মুখেই অধিকারী অনধিকারী বলা সার হইয়াছে!

আর একটী কথা বুঝিতে হইবে। পরমাত্মা যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কার্য্য হইবার নিয়ম স্থাপনা করিয়াছেন; কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। কাহারও এমন ক্ষমতা নাই যে, তাহার পরিবর্ত্তন করে। সে নিয়ম কি, বলিলেও যে কার্য্য হইবে, না বলিলেও সেই কার্য্য হইবে। সে কথা মুখে বলা আর না বলা দুই সমান। বল আর না বল, চক্ষের দ্বারা দেখিতে হইবে, কর্ণের দ্বারা হইবে না ইত্যাদি। পরমাত্মার নিয়ম অনুসারে যাহার যেরূপ স্বভাব হইয়াছে, তাহার সেইরূপ গুণ বর্ত্তাইবে ও ক্রিয়া ঘটিবে। অধিকারীকে অনধিকারী বা অনধিকারীকে অধিকারী করিতে মনুষ্যের সামর্থ্য নাই। হস্তীকে মনুষ্য বা মনুষ্যকে হস্তী করা অসম্ভব। জীবের মধ্যে যাহাকে যেরূপ ক্রিয়া শক্তি বা গুণ, অধিকার অনধিকার পরমাত্মা দিয়াছেন, কোন মতে তাহার অন্যথা হইবে না। স্বভাবতঃ তদনুসারে কার্য্য হইবে। মুখে বলিয়া বা অন্যবিধ চেষ্টা করিয়া কাহাকেও অধিকারী অনধিকারী করিতে হয় না। করিবার চেষ্টায় সত্যভ্রষ্ট হইয়া আপনার পরের কষ্টভোগ মাত্র ঘটে ও শ্রেষ্ঠ কার্য্য হইতে বিমুখ হইতে হয়। অধিকার অনধিকার যাহা কিছু পরমাত্মা করিয়াছেন ও করিবেন, ও তিনিই জ্ঞান বা মুক্তি দিবেন। যেখানে তোমার অধিকার নাই, সেখানে তুমি আগে নিজে অধিকারী হও, তবে অপরকে অধিকারী বা অনধিকারী করিবে। ইহা নিশ্চিৎ জানিও যে, কেবল পরমাত্মাই অধিকারী বা অনধিকারী করিতে পারেন, ইহাতে মনুষ্যের কোন হাত নাই। তিনি যখন অন্ধকার করেন বা সুষুপ্তি ঘটান, তখন জ্ঞানী অজ্ঞান, পণ্ডিত মূর্খ প্রভৃতি সকলেরই সুষুপ্তি ঘটে বা অন্ধকার বোধ হয়। এমন নহে যে, জ্ঞানী পণ্ডিত আলোকের সাহায্য বিনা শাস্ত্রাদি পাঠ করেন এবং মূর্খই কেবল আলোকের সাহায্যে কার্য্য করে।

অতএব মনুষ্যমাত্রেই অধিকারী অনধিকারী এরূপ সংস্কার অভিমান ও মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া জগতের হিতসাধনে যত্নশীল হও ও পরমাত্মাতে নিষ্ঠা স্থাপন কর। তিনি মঙ্গলময়, সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গলবিধান করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী।

পূর্ণ বাবুর নূতন চিন্তা।*

কাব্যচিন্তা সাহিত্যচিন্তারই পরিশিষ্ট। প্রথমে দ্বিতীয়েরই অনুরণন শুনিতেছি। দুয়েরই উদ্দেশ্য এক। শেকস্পিয়ারের ট্রাজিডি এবং, বোধ হয়, বঙ্কিমের উপন্যাস

* কাব্য-চিন্তা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। কলিকাতা; ডন্ প্রেস। মূল্য ১৲ টাকা।

পড়িয়া পড়িয়া আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়াছে—"সমাজে অসুরের সৃষ্টি হইয়াছে" —"আত্মঘাতী ও পরঘাতী খুনীদলের সৃষ্টি হইতেছে।" ব্যাপার সাঙ্ঘাতিক। অবিলম্বে রামায়ণ, মহাভারত, এবং আঠার পুরাণ দিয়া সমাজদেহে এ বিষবীসর্পের রোধ করিতে হইবে। কাব্যসুন্দরীর পর তাই কাব্যচিন্তারও প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রয়োজন তো হইয়াছে, কিন্তু পূর্ণবাবু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন—আমরা কথাটা বুঝিতে পারি নাই। "বিলাতী শেক্সপিয়ারের ভাল ভাল ট্রাজিডি-দ্বারা সমাজে অসুরের সৃষ্টি হইয়াছে, বটে"—"বটে"দ্বারা বুঝিতেছি, পূর্ণবাবুর আর একছিটা সংশয়ও নাই। কিন্তু তিনি তো সংশয়ের পারে পৌঁছিলেন, আমাদিগকে বড় খট্‌কায় রাখিয়া গেলেন। প্রতিজ্ঞাটী কি স্বতঃসিদ্ধ? যদি নিতান্তই স্বতঃসিদ্ধ না হয়, তবে পূর্ণবাবুর কাছে তার একটু প্রমাণ চাহিতে ইচ্ছা হয়। সমাজশরীরে সাহিত্যের প্রভাব নাই, এমত বলিতেছি না। সমাজে সাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম। বোঝাই কামানে চক্‌মকি লাগাইয়া একটা ডিক্‌শনারি ফরাসি বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সাহিত্য দুয়েরই রসায়ন হইতে পারে। কেন সমাজে পাপ বিদ্যমান, দেশভেদে কালভেদে কিসে তার পরিপুষ্টি হয়, সমাজতত্ত্বে এতদপেক্ষা গুরুতর সমস্যা আর নাই। পূর্ণবাবুর প্রতিজ্ঞা সেই কার্য্যকারণসম্বন্ধগর্ভা। সে সম্বন্ধ অনুমানগম্য। অনুমানে অব্যভিচারী হেতু আবশ্যক। ইংলণ্ডের সকল পুলিশ কোর্ট, সকল Assizeএর মোহাফেজখানা মন্থন করিয়া, পূর্ণবাবুই হউন আর যিনিই হউন, যদি কেহ সেইরূপ হেতু উদ্ধার করিতে পারিতেন, তবে এ প্রতিজ্ঞা বাহাল থাকিত। প্রতিজ্ঞাটা আগে ইংলণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত হউক, তারপর এ দেশে হইতে পারিবে। এ দেশের সহিত শেকস্পিয়ারের আজও তেমন মাখামাখি প্রণয় হয় নাই। প্রতিজ্ঞা-প্রমাণের ভার পূর্ণ বাবুর উপর। যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন আমরা তাঁহার প্রভূত লোকহিতৈষণায় মোহিত আছি, কিন্তু প্রভূত তথ্যবাদিতার প্রশংসা করিতে পারিতেছি না।

পূর্ণ বাবুর দেখাইতে হইবে যে, শেকস্পিয়ারের ট্রাজিডিরাজি প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে সমাজে অসুর ছিল না বা কম ছিল এবং তাহার পর, তাহারই ফলে, সমাজে অসুরবংশের সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহারই ফলে—বিশেষণটা যেন পূর্ণ বাবুর স্মরণ থাকে। আর এক কথা। যতদূর বুঝিয়াছি, পূর্ণ বাবুর প্রতিজ্ঞা সঙ্কুচিতা নহে—প্রসারিণী। তিনি এমত বিবেচনা করেন না যে, ট্রাজিডিগুলি রামে রহীম্ বুঝাইয়া বা এমনই একটা কিছু দিয়া দৈবাৎ এখানে সেখানে দুই চারিটা নরপশুর এক আধটুকু ঘাসজল যোগাইতে পারে মাত্র। তাঁহার ধারণা, সেকস্পিয়ারের ট্রাজিডিগুলির রজস্তমোবৃংহিনী একটা নিত্যশক্তিই আছে; তাহারা স্বভাবতঃই চিত্তের ক্রূর ভাবগুলিকে শাণাইয়া তুলে; তাহাদের হাওয়ায় চড়িয়া খালি ডাইন ফিরে, আর হাতের কাছে যাহাকে পায়, তাহারই গলা ভাঙ্গিয়া রক্ত খায়; এক কথায়, "তাহাদের অধ্যয়ন-ফল অতি অপকৃষ্ট"। অতএব যদি কদাচিৎ ঐ সকল ট্রাজিডিদ্বারা দুই চারিটা কাণা রাক্ষসের উদরপূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাহাতেও পূর্ণ বাবুর ইষ্টলাভ নাই; কেন না কাদাচিৎক সাধনে ঐরূপ ব্যাপক প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি হয় না। অধিকন্তু, সেরূপে ইষ্টলাভ করিতে গেলে বেদব্যাসের বিপদ্ ঘটে। সুপ্তপাঞ্চাল-হত্যার মনন করিয়া অশ্বত্থামা মাতুল কৃপাচার্য্যকে তাহা জানাইলেন। শুনিয়া কৃপাচার্য্য কত সান্ত্বনা, কত ভৎর্সনা করিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা সঙ্কল্প পাকা করিয়াছিলেন, ফিরিলেন না; আপনার অনুকূলে পাণ্ডবগণের বিবিধ কপটযুদ্ধের নজীর দেখাইলেন।* ধর্ম্মপক্ষও অধর্ম্মেরে উৎসাহ দিল; লোমহর্ষণ সৌপ্তিকপর্ব্ব কর্ম্মে অভিনীত হইল। খণ্ড প্রমাণে শেকস্পিয়ারকে গুনাহ্‌গার করিলে এখানে বলিতে হয়, পাণ্ডবচরিতের অধ্যয়ন-ফল আরও জঘন্য; কেন না সে চরিত ধর্ম্মচরিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াও অসুর সৃষ্টির মশলা যোগাইয়াছে বা যোগাইতে পারে। তাহাতে বেদব্যাসের বিপদ্ ঘটে।

যে যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করে নাই, তাহাকে তার স্রষ্টা বলিতে পারি না। যে যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পোষণ করে নাই, তাহাকেও তাহার পোষক বলিতে পারি না। এইজন্য আমি শেকস্পিয়ারকে অসুরের স্রষ্টা বা পোষ্টা বলিতে রাজি হই নাই। তবে অসুরে শেকস্পিয়ারের ট্রাজিডির মধ্যেও আপনার খোরাক্ খুঁজিয়া লইতে পারে, আমি সে কথা অস্বীকার করি নাই। জিঘাংসাজ্বলিত দ্রৌণায়ন পাণ্ডবের যুদ্ধনীতিতে সেইরূপ খোরাক্‌ই পাইয়াছিল, দেখাইয়াছি। ফলে যার যেমন ভাবনা তার তেমনই সিদ্ধি হইয়া থাকে। কাব্যার্থের পরিশীলনেও তাই। ডেল্‌ফির দৈববাণীর মত প্রৌঢ়কাব্যবাণীও দ্বিজিহ্বা। যে যেমন বাসনায় চিত্ত মাজিয়া আসি, সে তেমনই উত্তর চিত্তনিকষে কষিয়া লইয়া যাই। সেইটীই সোনালী রেখার ফুটিয়া উঠে, আর কিছুর দাগ পড়িতে দেখি না। এক আওয়াজই তার শুনিতে পাই, আর একটা আওয়াজ আর বড় শুনি না—শুনিলেও বুঝি না—বুঝিলেও বা বুঝিতে চাই না। "জ্ঞাতির বিষয়—তা, সংসারে থাকিতে হইলে সে-টু-কু করিতে হয়। তাতে দোষ কি?" "দোষ বেশী কিছু না—দুর্য্যোধনের যাহা হইয়াছিল।" "কি, মরণ? মানুষ আবার অমর হয় নাই কি? দুর্য্যোধন রাজ্যলাভ করিল, ঐশ্বর্য্যভোগ করিল—আর চাই কি? সব করিল, তার পর তবে মরিল—ক্ষত্রিয় যেমন মরে, তেমনই মরিল। সে মরণেও মুমূর্ষু বীরের শিরে অমরপুষ্প-বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। আর যুদ্ধের নামে জুয়াচুরি ধরিলে সেও মারিত বই মরিত না।" "মরণের কথা নাই বা বলিলাম, কিন্তু অধর্ম্ম?" "অধর্ম্ম কি? শাবালগ্ পাণ্ডুপুত্রগণকে তো কৌরবেরা রাজ্য প্রত্যর্পণই করিয়াছিল। তার পর পাণ্ডব আপন খোশীতে রাজ্য পণ করিয়াছে। সে তো Contract*—চুক্তি। চুক্তির শর্ত্তে পাণ্ডব রাজ্য হারিয়াছে, দুর্য্যোধনের অপরাধ কি? জিত রাজ্য ছাড়িয়া দিলে দুর্য্যোধনের ঔদার্য্য প্রকাশ পাইত, কিন্তু না ছাড়িবায় অধর্ম্ম হয় নাই।" "তাই কি?" "তাই না তো কি? এত যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া মর, কই, তোমার ধর্ম্মরাজেরও তো বনরাজ্যটী ছাড়া আর কোনও রাজ্য বড় একটা জুটিতে দেখিলাম না—জুটিল তো বেশী দিন কপালে লাগিল না! জয়ন্মানের পরেই যে দেখি মহাপ্রস্থানেরও

* মহাভারত, সৌপ্তিকপর্ব্ব, ৫ অঃ।

* ব্যবহারবিদেরা বলিবেন, wagering-contract।

ডাক পড়িয়াছে!” সবালজবাবে বেদব্যাস বোকা বনিয়া যান; আমরা ঠিক্ হইয়া জ্ঞাতির সঙ্গে পাশা খেলিতে বসি যে যেমন ভাবিয়া আসি, সে তেমনই বুঝিয়া যাই। কাব্যবাণী হাসিয়া বলে—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

একবার যদি সাফাই হইয়া গেল, তার পর আর তথ্যতে বসাইতে দেরি লাগে না দুর্য্যোধন যদি মঞ্জুর হইল, তবে সুতরাং পাশাখেলা, বস্ত্রহরণ, বনবাস, অভিমন্যুবধ —কিছু আর নামঞ্জুর থাকে না। মহাভারত কণ্ঠস্থ করিয়াও জ্ঞাতির সর্ব্বনাশ করিবার বাধা হয় না। বঙ্গসমাজে বাল্মীকি-ব্যাসের প্রভাব বর্ণন করিতে করিতে পূর্ণ বাবু যে মনোমোহন চিত্র আঁকিয়াছেন, সে চিত্রে নিসর্গের আলোটুকু ফুটিয়াছে, অন্ধকারটুকু ফুটে নাই। বুঝি বা পূর্ণ বাবু ইচ্ছা করিয়াই অন্ধকারটুকুকে আর ফুটিতে দেন নাই। লোকশিক্ষাকল্পে এইরূপ কেবলজ্যোতির্ম্ময় চিত্রই উপযোগী বটে, কিন্তু তত্ত্ববিচারস্থলে ইহাকে সত্যের অপলাপী না বলিলেও সত্যের দেশমাত্রদর্শী বলিতে হয়। চিত্রে অন্ধকার উঠে নাই, কিন্তু আদর্শে তো অন্ধকারও আছে। এক দিকে যেমন রামায়ণ, মহাভারত কত পুণ্যবান্‌কে আশীর্ব্বাদ করিয়া কত পাপীকে পুণ্যপথে লইয়া আসিয়াছে, আর এক দিকে তেমনই কত যে পাপিষ্ঠ তাহা হইতেই পাপের বীজ খালি খুঁটিয়া খাইয়াছে—তার কি সংখ্যা আছে? কিরূপে খুঁটিয়া খায়, উপরে আমি তাহারই একটা নক্‌শা দিয়াছি। ফলে যে দুর্ব্বাসনার শিকড় আত্মার স্তরে স্তরে বিঁধিয়া গিয়া কামড়াইয়া ধরিয়াছে, শাস্ত্র বল, ইতিহাস বল, কাব্য বল, তার উচ্ছেদ কেহ করিতে পারে না। সর্ব্বত্রই সে আপনার অনুলোম ধাতুটী শুষিয়া আত্মসাৎ করে, প্রতিলোমটী যেমন ছিল তেমনই রাখিয়া যায়। যেখানে আইন নাই বা থাকিয়াও অস্পষ্ট, সেইখানেই নজীরের প্রয়োজন হয়। দুষ্কর্ম্মের আইন নাই। তাই বুঝি তারও নজীর খুঁজিতে হয়। নজীরের যেটুকু নোক্‌শানী থাকে, সেটুকু রিফু করিয়া লই; আমাদের যেটুকু খুঁত ছিল, নজীর পাইবার পর সেটুকুও পরিষ্কার হইয়া যায়। নজীর না পাইলে লোকে পাপ করিত না, এরূপ বলি না। কিন্তু নজীরে পাপের বড় উপকার করে। অনেক সময়েই তো দেখিতে পাই, যে পাপ বাসনা ক্ষণস্থা হইত, নজীর পাইলে সে চিরজীবিনী হয়; যে লোলা ছিল, সে বিলোলা হয়; যে বিলোলা ছিল, সে কর্ম্মোন্মুখী হয়। পক্ষান্তরে, পাপের অনুষ্ঠান করিয়া যে একটু কেমন কেমন ভাবিতেছে, নজীর পাইলে সে খাতিরজমা হয়। রামায়ণ মহাভারতে এরূপ নজীরের অভাব নাই। যে চায়, সেই পায়। কত পাষণ্ড পাইয়াছে, তার ঠিকানা কি? পাপের তেমন বাছা বাছা বিচিত্র নজীর শেকস্পিয়ারেও নাই। এক মহাভারতে পাপের যত ইতিহাস, যত উপাখ্যানে, যত সংবাদ, যত গাথা আছে, শেকস্পিয়ারের সপ্তত্রিংশন্নাটকীর সঙ্কলিত পাপরাশি তার কলার কলামাত্র। শেকস্পিয়ারের ট্রাজিডিদ্বারা যদি অসুরের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে রামায়ণমহাভারতদ্বারাও যে অসুরের সৃষ্টি হয় নাই, কে বলিবে? অথচ বাল্মীকি ব্যাস ধর্ম্ম ছাড়া অধর্ম্মের উপদেশ দেন নাই। তবে আর শেকস্পিয়ারেরই বা অপরাধ কি? তিনিও তো মানুষকে অসুর হইতে বলেন নাই।

সকল প্রশ্নেরই উত্তর থাকে, এ প্রশ্নেরও একটা উত্তর আছে। উত্তর কাব্যচিন্তায় নাই, সাহিত্যচিন্তায় আছে। উত্তরটার দুই বুনিয়াদ্। একটা অলঙ্কারশাস্ত্রের কাছাকাছি, আর একটা ধর্ম্মশাস্ত্রে। প্রথমতঃ, মাকবেথপ্রভৃতি ট্রাজিডিগুলিতে খালি ছুরী, খালি খুন! যেন এক একটা “কশাইখানা!” কেবল ভয়ানকরস, কেবল বীভৎসরস; শান্তরসের একটু গন্ধও নাই। এরূপ খাঁটি রস পান করিতে করিতে চিত্ত তার রজোগুণে তমোগুণে নিষিক্ত হয়; তার পর তাহাতে দুষ্প্রবৃত্তির অঙ্কুরোদ্গম হইতে থাকে। অতএব সেগুলির অধ্যয়নফল অতিগর্হিত। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয় সকল কাব্যেই থাকা উচিত। রামায়ণ মহাভারতে তাহাই আছে। শেকস্পিয়ারের ট্রাজিডিতেও তাহা নাই, এমন নহে। কিন্তু রামায়ণমহাভারতে ধর্ম্মই জাজ্বল্যমান, অধর্ম্ম নিষ্প্রভ; শেকস্পিয়ারে যেন অধর্ম্মই ভাস্বর, ধর্ম্ম নিষ্প্রভ। এজন্যও ট্রাজিডিগুলি অপকৃষ্ট। এই উত্তরই পূর্ণ বাবুর রক্ষাকবচ। কবচটা একটু হাতে লইয়া দেখি।

পূর্ণ বাবুর প্রথম আক্ষেপটা মিথ্যা নহে। শেকস্পিয়ারের ট্রাজিডিতে এত রস আছে, কিন্তু শান্তরস নাই। শান্তরসের লক্ষণটী পূর্ণ বাবুর একবার স্মরণ করিতে হইবে। শান্তরস রসই কি না, সে বিচার এখানে তুলিব না। কিন্তু এইটুকু বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয় যে, অলঙ্কার যাহাকে শান্তরস বলিতেছে, তাহা সেই “রসো বৈ সঃ” মাত্র। সে সামগ্রীটী কিছু দুষ্পচ; তার পিপাসা কাব্যে পরিতৃপ্ত হইবার আমি কোনও সম্ভাবনা দেখি না। আর শান্তরস না থাকিলেই কাব্য অস্পৃশ্য হয় না। ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ নাই বলিয়াই যেমন কর্ম্মকাণ্ড নিষ্ফল হয়না, শান্তরস নাই বলিয়াই তেমনই তদ্বিহিত কাব্যও নিষ্ফল হয় না। রামায়ণ শান্তরসাত্মক নহে। এমন যে মহাভারত, শান্তরসের দুই চারিটা মীড় গিটকারী তাহাতে থাকিতে পারে, কিন্তু শান্তরস তারও জান্ নহে। কুরুক্ষেত্র যার উপায়, হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার যার ঔপয়িক, তার জান্ শান্তরস হইতে পারে না। যাহাকে পূর্ণ বাবু মহাভারতের “প্রধান আখ্যায়িকা” বা “প্রধান কাব্যকল্পনা” * বলিয়াছেন, তাহাতে শান্তরস নাই, অথচ তাহাতেই নিখিল মহাভারত চরিতার্থ হইতেছে। বস্তুতঃ যে উপদেশযোগকে মম্মটভট্ট কাব্যের অন্যতম ফল বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা অন্যান্য রসেরই অবতারণায় সিদ্ধ হয়। তবে তারা শান্তেরই দিকে ফিরিয়া চায়, তার আর সংশয় কি? সৎকাব্যের পরিশীলনে তাই আমরা অধর্ম্মের আস্ফালনে ভীত, ক্রুদ্ধ হইতে শিখি; অধর্ম্মের উচ্ছেদে উৎসাহিত হই। যাহা সুন্দর তাহাকে ভালবাসিয়া, যাহা কুৎসিত তাহাতে ঘৃণা করিতে শিখি। মাকবেথপ্রভৃতি ট্রাজিডির অধ্যয়নফলও তাই। মাকবেথের আসুর সংরম্ভে আমাদের ভয় হয়, ক্রোধ হয়; অজস্র নরশোণিতপাতে আমাদের ঘৃণা হয়। মাকবেথের সর্ব্বনাশে আমরা উৎসাহিত হই। ভয় বা ঘৃণা রাজস বা তামস হইতে পারে, কিন্তু এ রজস্তমঃ সত্ত্বেরই অনুগামী। তবে

* কাব্যচিন্তা; ৫৪, ৫৫ পৃঃ।

এ ভয়ানকে, এ বীভৎসে পূর্ণবাবু এত বিভীষিকা দেখিলেন কেন? রামায়ণ মহাভারতেও ভয়ানকবীভৎসের অভাব নাই। মহাভারতের সভাপর্ব্বে যে বীভৎসের সৃষ্টি আছে, রমণীর শিরশ্ছেদ তার চেয়ে বেশী নয়। তেমন জঘন্য বীভৎসে ফরাসি নবেলও কলুষিত হইয়াছে কি না, আমার সংশয় হয়। তার পর, যাহা বলিতেছিলাম। মাকবেথপ্রভৃতি ট্রাজিডির ভয়ানক বা বীভৎসে কেন যে চিত্ত দূষিত হইবে, বুঝিতে পারি না। যে Addisonএর উক্তি পূর্ণবাবু এত আহ্লাদে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনিও তো শেকস্পিয়ারের নিন্দা করেন নাই। তবে ভয় খাইতে খাইতে ভয় যায়, ঘৃণা করিতে করিতে ঘৃণা দূর হয় বটে। কিন্তু পাপে ভয় বা পাপে ঘৃণার পুনঃপুনরনুশীলনেও সে ভয়, সে ঘৃণা ঘুচিয়া যায়—এমন খবর পূর্ণবাবু রাখেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমি রাখি না। তা যার ঘুচিয়াছে, তার ঔষধ শেকস্পিয়ারে নাই বটে। সেজন্য শেকস্পিয়ারকে ফাঁসি দিলে আমিও দুঃখিত হইব না।

তার পর, সেই কথা—বাল্মীকিব্যাসে ধর্ম্ম প্রোজ্জ্বল, শেকস্পিয়ারে অধর্ম্ম প্রোজ্জ্বল। কিন্তু আপত্তিটার জোর সাহিত্যচিন্তায় যেমন ছিল, কাব্যচিন্তায় আর তেমন দেখিতে পাই না। কাব্যচিন্তায় পূর্ণবাবু স্বীকার করিয়াছেন, রাবণ বা দুর্য্যোধনও নিষ্প্রভ নহে। না হইবারই তো কথা। পূর্ণিমা না হইলে গ্রহণ লাগিবে কেন? তাই "দশানন মহাকালের সহায়তা লাভ করিয়া একেবারে বিশ্ববিজয়ী রূপে সদর্পে সংসারধামে বিচরণ করিতেছে"। "দুর্য্যোধনও শত ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া মহাবলদর্পে কুরুক্ষেত্রের রণে আসিয়াছে।" * তাই সে রাজঘাতী বন্ধুঘাতী শিশুঘাতী মাকবেথকে স্কটলণ্ডের সিংহাসনে অধিরূঢ় দেখিয়াছি। দেবপীড়নে ব্রহ্মপীড়নে যার আরম্ভ, সীতাহরণে তার পূর্ণিমা; নহিলে পাষাণ জলে ভাসিবে কেন? ইস্তক বারণাবত, লাগায়েৎ উত্তরগোগৃহ—সব চাই; সব সাঙ্গ না হইলে কি লক্ষ্মীপতি রথের সারথি হয়? অতিথিরক্ত, বন্ধুরক্ত, শিশুরক্ত—এত রক্ত না মিশিলে অরণ্যানী সঞ্চারিণী হয়? চারি অঙ্কে মাকবেথের পূর্ণিমা; তবে পঞ্চমে গ্রহণ লাগিয়াছে। ঐ আসে! ঐ আসে!—পঞ্চমে আর অন্য শব্দ নাই। পঞ্চমে গ্রহণ লাগিয়াছে। ডন্‌কানের অযুত রক্তবীজ ইংরেজবাহিনী সাজিয়া ছিন্ধি ছিন্ধি রবে মাকবেথকে ঘিরিতেছে। ডাক্তার! এ জঞ্জাল দূর হয়, এমন জোল্লাব্ তোমার শাস্ত্রে নাই? মাকবেথের শক্তিব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। যে দৃপ্ত সামন্তমণ্ডল মাকবেথের করচুম্বন করিয়া অনন্ত সাহায্য শপথ করিয়াছিল, আজ তারা মাকবেথকে ছাড়িয়া যাইতেছে। "ডাক্তার, সামন্তেরা আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে!" শুধু কি তাই? রক্তপানে যে তোমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিল, কই—মাকবেথ। রক্তদানে আজ সে তোমার সহধর্ম্মিণী হইল কই? গলফাঁস কষিয়া আসিতেছে। সহস্রাব্দীর পার হইতে নরঘাতীর শুষ্ক নিঃশ্বাস শুনিতেছি—

They have tied me to a stake; I cannot fly.

শুনিতেছি, আজও তাই শেকস্পিয়ারকে বিদায় দিই নাই। মাকবেথে ধর্ম্মপক্ষ নাম দিয়া একটা পক্ষ খাড়া করা হয় নাই বটে; নারায়ণও অবতীর্ণ হইয়া তার সাহায্য করেন নাই। তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। রামায়ণেও "ধর্ম্মের দৈবসহায় নারায়ণ বিলুপ্ত ভাবে আছেন," পূর্ণবাবুই দেখাইয়া দিয়াছেন। তবে মাকবেথে ধর্ম্ম নিষ্প্রভ বল কেন? যে দেবতা পার্থসারথি হইয়া কুরুক্ষেত্রে কুরুবংশধ্বংস করিয়াছিলেন, তিনিই আজ মাকডফের খড়্গে থাকিয়া ডন্‌সিনেনে মাকবেথের মুণ্ডচ্ছেদ করিতেছেন। যে ডাকিনীরা মাকবেথকে ভুলাইল, তারাই আর এক দিন দুর্য্যোধনকেও ভুলাইয়াছিল। মাকবেথে আর মহাভারতে, আমি তো কোনও প্রভেদ দেখি না।

আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা হইল। আমি কাব্যচিন্তার প্রয়োজনেরই সমালোচনা করিয়াছি, তদ্‌গ্রথিত বস্তুর সমালোচনা করি নাই। প্রয়োজন সমালোচনা করিয়া আমি ইহাই পাইয়াছি যে, নিতান্ত বিষে বিষক্ষয় না মানিলে পূর্ণবাবুর দ্রব্যগুণে একটু সংশয় থাকিয়া যায়। কেন না, শেকস্পিয়ারের দল উৎখাত করিয়া বাল্মীকিব্যাসকে তার স্থানে বসাইলেই যে বঙ্গসমাজে কাব্যদ্বারা অসুরসৃষ্টির সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে, এমত কোনও গারাণ্টী পূর্ণবাবুর কাছে পাই নাই। কাব্যচিন্তার বস্তুপরীক্ষা আমার উদ্দেশ্য নহে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

* কাব্যচিন্তা; ৭৪—৭৫, ৭৬ পৃঃ।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান। *

বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছায় আবার এক বৎসর অতীত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ নব বর্ষের প্রারম্ভে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঘোৎসব ব্রাহ্মের অতি শুভদিন; পরাধীন ভারতবর্ষেরও সৌভাগ্যের দিন। যে দিন ভারতবর্ষে মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মকে নববেশে পুনরায় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই দিন নরনারী সকলের প্রিয় দিন হওয়া উচিত। এই শুভদিন উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্ম বিষয়ে মৌখিক বক্তৃতা করিবার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। এবার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা কয়েকটী লিখিত রচনা পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী বিষয়ের ভার আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

কোন জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠে আপনাদের জ্ঞান-পিপাসা ও ধর্ম্ম-পিপাসা কিয়ৎ পরিমাণে চরিতার্থ করিতে পারিলে আমার পরিশ্রমকে সার্থক মনে করিতাম। কিন্তু অন্ধের চিত্রপট দর্শন বাসনা মনে উদয় হইয়া মনেই বিলীন হইয়া যায়, আমারও এই প্রথম উদ্যমে সিদ্ধলাভের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তবে কেবল কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে এইরূপ গুরুতর বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই।

আমার নিজের এমন কোন বিদ্যা বুদ্ধি নাই যে, আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারি; অন্য জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পুস্তক হইতে যৎকিঞ্চিৎ সারসংগ্রহ করিয়া আপনাদের চিন্তার উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য উপস্থিত হইলাম। অপরের কথা লইয়া যদি আপনাদের মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট করি, তাহা হইলে আশা করি, বিষয়ের গুরুত্ব ভাবিয়া আপনাদের ঔদার্য্য গুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান অদ্যকার আলোচ্য

* এই প্রবন্ধটী ২ মাঘ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পঠিত হইয়াছিল।

বিষয়। বিষয়টী যে অতিশয় গুরুতর, সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতে সভ্য, অসভ্য সকল সমাজেরই চিন্তার বিষয় হইয়া আসিতেছে। বিষয়টী পুরাতন হইলেও ইহা এখনও শৈশব অবস্থায় আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহার গতি অনন্ত উন্নতির দিকে। ইহা আমাদের জীবনের ও মরণের সহিত এইরূপ জড়িত যে, বার বার ইহার আলোচনা করিলেও ইহার আদর আমাদের নিকট হইতে কখন হ্রাস হইবে না। আর অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া অদ্যকার বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ধর্ম্ম কি, বিজ্ঞান কাহাকে বলে, ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহারই অনুসন্ধানে এখন প্রবৃত্ত হই।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ইহার উত্তর দেওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। "নানা মুনির নানা মত"। এই বাক্যটী যদি কোন বিষয়ে ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার এই ধর্ম্ম অর্থ লইয়াই এবং যুগে যুগে ধর্ম্মের মত, বিশ্বাস, যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ লইয়া মনুষ্য মধ্যে পার্থক্য চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই নানা মুনির নানা মত, এই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ধর্ম্ম শব্দ ও ইংরাজি Religion শব্দের যৌগিক অর্থ প্রায় একই রূপ। Re and ligare অর্থাৎ বন্ধন। সিসিরো বলেন, উহা Re and legere হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ পুনরাহরণ বা সংগ্রহ। ধর্ম্মশব্দ ধৃ+মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (ধৃয়তে লোকো অনেন ধরতি লোকং বা) Martineau তাঁহার Study of Religion এ ধর্ম্মের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"ধর্ম্ম বলিতে আমরা এই বুঝি যে, এক জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরে বিশ্বাস করা ও তাঁহার পূজা করা। তিনি পরমাত্মা ও ইচ্ছাময়, তিনি জগত শাসন করিতেছেন, এবং তিনি মনুষ্যের সহিত নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ রহিয়াছেন"—

Understanding by religion. Belief and worship in an Everliving God that is a divine mind and will, ruling the universe and holding moral relation with mankind.

উপনিষদ বলিতেছেন—

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময় পুরুষ সর্ব্বানুভূঃ।

যশ্চায়মস্মিন আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময় পুরুষ সর্ব্বানুভূঃ।

তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতিনান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

অর্থ—এই যে তেজময় অমৃতময় সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ আকাশে বিদ্যমান রহিয়াছেন, এই যে তেজময় অমৃতময় পুরুষ আত্মার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইঁহাকে জানিয়া এবং ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। যাইবার অন্য পথ নাই।

Martineau বলিতেছেন, জীবন্ত ঈশ্বর, উপনিষদ বলিতেছেন অমৃতময় পুরুষ। Martineau বলিতেছেন, তিনি আমাদের সহিত নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; উপনিষদ বলিতেছেন—তিনি আত্মার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন। Martineau বলিতেছেন, ইঁহার প্রতি বিশ্বাস ও ইঁহার উপাসনাই ধর্ম্ম। উপনিষদ বলিতেছেন, যে ইঁহাকে জানিয়া ও ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। যাইবার অন্য পথ নাই, ইহা ভিন্ন ধর্ম্মেরও অন্য পথ নাই।

যদিও আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইউরোপীয়

অন্য অন্য ঋষিদের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তথাচ Martineau ও উপনিষদের মতই আমরা প্রধানত অবলম্বন করিব।

Kant এর মতে ধর্ম্ম, নীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন আমাদের নৈতিক কর্ত্তব্য কার্য্য সকল ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া আমরা পালন করি, তখনই উহা ধর্ম্মে পরিণত হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিতে ধর্ম্মপুস্তক, যথা বেদ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতিতে লিখিত কোন নির্দ্দিষ্ট আদেশ বলিয়া তিনি স্বীকার করেন না। কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের যে জ্ঞান হয়, অর্থাৎ বিবেকের দ্বারা চালিত হইয়া আমরা যে কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করি, তাহা ঈশ্বরের আদেশ।

Fichte (ফিক্তে) বলেন, "Religion is knowledge" "জ্ঞানই ধর্ম্ম।" এই জ্ঞান দ্বারা মানুষ নিজকে বিশেষ রূপে জানিতে পারে; গুরুতর মহৎ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে, আমাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে এবং আমাদের মনকে পবিত্র করে।

It gives to a man a clear insight into himself, answers the highest questions and thus imparts to us a complete harmony with ourselves and a thorough sanctification of our mind.

সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত, কেবল শব্দ প্রয়োগ ভিন্ন প্রকার।

Schelmacher বলেন, কোন একটী বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরই ধর্ম্ম। সেই বস্তু আমাদিগকে চালাইতেছে, আমাদের তাহার উপরে কোন হাত নাই।

Religion consists in our consciousness of absolute dependence on something which though determines us we cannot determine in our turn.

মহাত্মা থিওডোরপার্কার বলিয়াছেন, ধর্ম্মের মূলে নির্ভরের ভাব (Sense of dependence), আমি ক্ষুদ্র ও পরিমিত, আমি আপনার উপর নির্ভর করিতে পারি না, তবে কাহার উপর নির্ভর করি। এই নির্ভরের ভাব হইতেই ঈশ্বরের ভাব মানব হৃদয়ে প্রতিভাত হয়।

Hægel বলিয়াছেন, ধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত। কারণ পরমাত্মা ক্ষুদ্র মানবাত্মায় স্বয়ং স্বপ্রকাশ ও জ্ঞাত হন।

Religion is or ought to be perfect freedom, for it is neither more or less than the divine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit.

Maxmuller বলেন, ধর্ম্ম সেই মানসিক বৃত্তি, যাহার দ্বারা আমাদের অনন্তপুরুষের জ্ঞান হয়।

Religion is a subjective faculty for the apprehension of the infinite.

Taylor বলেন, যেখানে আত্মার (Spiritual Being) স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে, সেই খানেই ধর্ম্ম। Spiritual Being অর্থে কেবল ভূত প্রেত নহে, লোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত। দেব দেবী ও ঈশ্বর তদন্তর্গত।

John stuart Mill বলেন, একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বস্তুর প্রতি আমাদের ভাব ও ইচ্ছা সকলকে প্রবল বেগে ব্যাকুলতার সহিত পরিচালন করাই ধর্ম্ম। এই বস্তু আমাদের বাসনা ও স্বার্থ সিদ্ধির পদার্থ হইতে উচ্চ।

The sense of Religion is the strong and earnest direction of the Emotion and desires towards an ideal object recognized as the highest excellence and is rightfully paramount over all selfish objects of desires.

সিলিং বলেন, ধর্ম্ম স্থায়ী ভক্তি। Habitual and premanent admiration.

তিনি ইহার ব্যাখা এইরূপ করিয়াছেন—ঈশ্বরের প্রতি আমাদের হৃদয়ের ভাব

সকল উত্থিত হইলে আমরা তাঁহার উপাসনা করি। প্রেম ভক্তি ও প্রীতি উপাসনার অঙ্গ। এই সকল ভাব মনুষ্যের প্রতি, এমন কি অচেতন পদার্থের প্রতি উত্থিত হইতে পারে। কিন্তু যখনই এসকল ভাব ঈশ্বরের প্রতি নিয়োজিত হয়, তখনই ইহা ধর্ম্ম নামে আখ্যাত হয়। যখন ভক্তি স্থায়ী ও প্রবল হয়, তখনই উহা কার্য্যে ফুটিয়া পড়ে। সেই জন্যই যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। সিলিং আরও বলিয়াছেন, Substance of Religion is culture.

ধর্ম্মের মূলে অনুশীলন। পার্শ্ববর্ত্তী জড় প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি সেই অনুশীলনের উপায় ও সীমা। অতএব বহির্জ্জগতের ও অন্তর্জ্জগতের প্রকৃতি আমাদের জানা চাই। বৈজ্ঞানিক সত্য ইহার অন্তর্গত। মিলের Ideal object of the highest excellence ও তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে পাই। ইহাই উপাস্য। ইহার কোথাও ঈশ্বর, কোথাও দেব দেবী, কোথাও গাছ পাথর, কোথাও Humanity বা মনুষ্য প্রেম। ঈদৃশ পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের মানসিক অবস্থা Habitual and permanent admiration বা ভক্তিই উপাসনা। ইহা ধর্ম্মের দ্বিতীয় উপাদান।

আমাদের বৃত্তি গুলির সম্যক অনুশীলন ও চরিতার্থতার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। যে যে নিয়মে উহার অনুশীলন ও তৃপ্তি সাধন করিতে হইবে, সেই সকল ঐ জ্ঞান হইতে অনুমিত করিয়া লই। সেই নিয়ম নীতি বা ধর্ম্ম শাস্ত্র। ইহা ধর্ম্মের তৃতীয় উপাদান।

এক্ষণে দেখা যাক, ধর্ম্মের সার কথা কি? ঈশ্বরকে জানিতে হইবে, তিনি আমাদের জীবনদাতা, আমাদের সঙ্গে নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ আছেন। তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রেম ও ভক্তির উপহারে তাঁহার উপাসনা করাই ধর্ম্ম। উপনিষদে উক্ত আছে, তাঁহার প্রতি প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ঈশ্বর ও তাঁহার উপাসকের সঙ্গে এবং বিশ্বের সঙ্গে কি সম্বন্ধ, তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বিজ্ঞান এ বিষয়ে আমাদিগকে কত দূর সহায়তা করিতে পারে, তাহারই আলোচনায় অদ্য আমরা প্রবৃত্ত হইব। বিস্ময়, ভীতি, প্রীতি, ও ভক্তি এবং অনন্তের ভাব, বিজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে কতদূর উৎপন্ন করিতে পারে, একবার দেখা যাক।

বিজ্ঞান বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদের অন্তর্জ্জগতে ও বহির্জ্জগতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ঘটনাপুঞ্জ বা কার্য্যস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদিগকে বস্তু হইতে পৃথক করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা ও তাহাদের অর্থ সকল হৃদয়ঙ্গম করাই বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথম ঘটনা ও বিষয় সকল নিরীক্ষণ বা পর্য্যবেক্ষণ করা ও সংগ্রহ করা, তৎপরে পরীক্ষা দ্বারা উহাদের অর্থ ও সম্বন্ধ স্থির করা; অবশেষে উহা হইতে অনুমিতি প্রক্রিয়া দ্বারা কোন সাধারণ সত্য বা নিয়মে উপনীত হওয়াই বিজ্ঞানের কার্য্য। বিজ্ঞান কার্য্য সকলের কারণ নির্দ্ধারণ করে। সাধারণ নিয়ম সকল আবিষ্কার করে। কোন্ নিয়মে কোন্ ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা স্থির করে। ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে বা কয়েকটী নিয়ম সংযোগে নূতন কি কার্য্য হইতে পারে,

তাহাও প্রকাশ করে। এই ভবিষ্যৎ বাণী প্রচার করা বিজ্ঞানের বিশেষ শক্তি। ততদিন বিজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না, যতদিন উহার কারণ সকলের জ্ঞাত নিয়ম হইতে ভবিষ্যৎ ফল স্থির করিতে না পারে। জগতে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি। বাহ্য ঘটনার প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা বিজ্ঞানের কার্য্য। যে বস্তু হইতে বাহ্য ঘটনা সকল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করা Metaphysics এর কার্য্য। বিজ্ঞান ও Metaphysics এর ফল দর্শন (Philosophy) গ্রহণ করিয়া উহা বুঝাইতে চেষ্টা করে, পরস্পরের বিবাদ ভঞ্জন করে এবং সকল জ্ঞানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া একাধারে সমগ্র জগতের ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে চেষ্টা করে। সুতরাং বাহ্য দৃশ্যের জ্ঞান এবং বস্তুর জ্ঞান অবশেষে দর্শনে পরিণত হয়। বিজ্ঞান ও দর্শন ধর্ম্মেরই কার্য্য করে। ঈশ্বরের জ্ঞান আমরা কোথা হইতে পাই? বহির্জ্জগত ও অন্তর্জ্জগতই সেই জ্ঞানের মূল। তাঁহার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, বিস্ময় প্রভৃতি সকলই সেই জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সহিত চিরবিচ্ছেদ আছে, এই সংস্কার অনেকেই পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহা যে সত্য নহে, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ও ধর্ম্ম অনুশীলনকারীরা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যথার্থ বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে সদ্ভাব থাকাই যুক্তিসঙ্গত। উভয়ই এক প্রভুর সেবায় নিযুক্ত। সত্যের সেবাই উভয়ের লক্ষ্য। ধর্ম্মের কার্য্যক্ষেত্র সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। দর্শন যেরূপ, বিজ্ঞানও সেইরূপ ধর্ম্মের পোষক ও সহকারী ভৃত্য। সকল বিজ্ঞানই দিন দিন ধর্ম্মের কার্য্যে অধিক হইতে অধিকতর আবশ্যক হইতেছে। বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের অচ্ছেদ্য যোগ চিরকালই রহিয়াছে। শরীরের সহিত মনের যোগ নাই বলাও যাহা, আর ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের যোগ নাই বলাও তাহা। বিজ্ঞান শাস্ত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, সমস্ত বিশ্ব কার্য্যের মধ্যে কোথাও একটু মিথ্যা নাই। এই অগণ্য বস্তুপুঞ্জের মধ্যে যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, সে একই উত্তর দেয়।

এই চরাচরের মধ্যে কোথাও অনিয়ম নাই, খেয়াল নাই, অসত্য নাই। পদার্থ সমূহের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, কালও যেমন আজও তেমন, চিরকালই সেইরূপ। এই সত্য বিজ্ঞানতত্ত্বান্বেষীর মনে এমনই দৃঢ় হয় যে, তিনি নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে তৎক্ষণাৎ নূতন কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন।

ইউরেনস্ উপগ্রহের গতিতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যতিক্রম দেখিয়া, গণিতের অঙ্কপাতের সহিত মিল না দেখিয়া জ্যোতিঃবেত্তারা অন্য একটী উপগ্রহ ইউরেনসের সন্নিকটে থাকা সম্ভব মনে করিলেন। ইহার ফলে এডামস্ ও লভিয়ার দ্বারা নেপচুনের আবিষ্কার হইল।

এরূপ স্থলে যাহার হৃদয়ে কিছুমাত্র ধর্ম্মবোধ আছে, সে অসীম বিশ্ব চরাচরের প্রত্যেক পরমাণু হইতে নিশিদিন সমস্বরে যে এক মহান সত্য প্রচার হইতেছে, তাহা অন্তরে ও আচরণে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। বিজ্ঞান আর একটী কথা প্রচার করিতেছেঃ—শক্তির চিরস্থায়িত্ব।

কেবল মাত্র যে পরমাণুর বিনাশ নাই, তাহা নহে। প্রত্যেক পরমাণু অনন্ত জগতের সহিত এমনই ঘনিষ্ট ভাবে সম্বন্ধ যে, তাহাদের কোন একটীর মধ্যে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহা অনন্ত দেশে অনন্তকালে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

অন্তরের নিগূঢ় নিভৃত প্রদেশে এমন কোন চিন্তা, এমন কোন বেদনার উদয় হইতে পারে না, ব্যথিত, পীড়িত হৃদয় হইতে এমন একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস উত্থিত হইতে পারে না, মনে এমন কোন তুচ্ছ বাক্য উচ্চারিত হইতে পারে না, এমন কোন ক্ষুদ্র কার্য্য গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, জগতের আদ্যন্ত মধ্যে যাহার ইতিহাস চিরদিনের মত লিপিবদ্ধ না হইয়া যায়। এ তত্ত্ব স্মরণ করিলে গর্হিত আচরণে কি আর প্রবৃত্তি হয়?

জগতের সর্ব্বত্রই বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য এবং এবং সাধনের উপায় পরম্পরা এমনই সুশৃঙ্খলা সহকারে নিবিষ্ট যে, সেই আশ্চর্য্য কৌশল বহু প্রাচীনকাল হইতে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি মানবের বিস্ময় ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে। বিজ্ঞান বিশ্বকার্য্যে সেই সুশৃঙ্খলা, সেই কৌশল প্রতিদিন নূতন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছে। বিজ্ঞান এক নক্ষত্রের সহিত অন্য নক্ষত্রের, এই পৃথিবীর সহিত সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর, মানবের সহিত অতীত বর্ত্তমানের সমুদয় জীব পরম্পরায় এক অচ্ছেদ্য গোত্রবন্ধন দেখাইয়া দিয়াছে। বিজ্ঞান অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এই মহান ঐক্য আবিষ্কার করিতেছে। এই ঐক্য, কি পরম একের দিকেই ধ্রুব অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে না? এই জগতে, অণুতে পরমাণুতে, জড়ে, জীবনে সম্মিলিত এক বিরাট ঐক্য, এক অসীম বিশ্ব যখন বিজ্ঞানের আলোকে, তত্ত্বান্বেষীর চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখন কি অভিভূত, বিহ্বলচিত্ত, ভক্তিভরে পরম পুরুষের নিকট একান্ত নত হয়ে পড়ে না?

অনন্তকাল সমুদ্রের মধ্যে সময় দ্বীপের উপর দণ্ডায়মান হইয়া অতীত কালের তরঙ্গ ভঙ্গের শব্দ শুনিতে শুনিতে, ভবিষ্যৎ কালের ঊর্ম্মিরাশি দেখিতে দেখিতে মনুষ্য মনে তিনটী অতি গুরুতর প্রশ্ন উত্থিত হয়।

কোথা হইতে এ জগত আসিল, কেনই বা আমরা ইহার উপরে আছি, আমাদের গম্য স্থানই বা কোথায়? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা প্রবৃত্ত হই।

এই জগত কি? কেই বা ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে? অনন্ত আকাশের বক্ষে ইহা কেমন করিয়াই বা ভাসিতেছে? কে ইহাকে তুর্ব্বাদলে আচ্ছাদন করিয়াছে? কেই বা ইহার বৃক্ষ লতা, ফুল ফল, বন উপবন, প্রান্তর ও ভূধর, মরু ও জলধি প্রভৃতি সৃজন করিয়াছে?

কোথা হইতে কোটী কোটী জীব এখানে আসিল? কোথা হইতেই বা সমুদ্রে অসংখ্য মৎস্য উৎপন্ন হইল? সরীসৃপ, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণী সকল, কীট পতঙ্গ বিহঙ্গকুল কোথা হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল? মনুষ্যই বা এখানে কোথা হইতে আসিল? মনুষ্যের চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা, বিশ্বাস ও সন্দেহ, আশা ও ভয়, প্রেম ও ভক্তি কে তাহাকে প্রদান করিল? এই সকল প্রশ্ন মনুষ্য আদিম কাল হইতে করিয়া আসিতেছে। ইতিহাসের প্রারম্ভে তাহার প্রথম পৃষ্ঠাতেই

এই পুরাতন প্রশ্ন দেখা যায়। মনুষ্য যতই চিন্তাশীল হয়, ততই এ প্রশ্ন প্রবলবেগে তাহার মনে উত্থিত হয় এবং তাহার জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নের সদুত্তরের জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠে। কেবল হস্ত সঞ্চালন করিয়া, অথবা জানি না, এই কথা বলিয়া তাহাকে নিস্তব্ধ করিতে পারা যায় না। এই বিশ্ব জগতের আদি এবং মনুষ্যের নিজের আদি কারণ জানিবার যে বলবতী স্পৃহা, তাহা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও নিবারণ করা যায় না। এই বিষয়ে মনুষ্যকে কি চিরদিনই সন্দেহজালে জড়িত হইয়া থাকিতে হইবে? না—তাহা কখনই হইতে পারে না। এ বিশ্বতেই ইহার আদি কারণের চিহ্ন দেখা যায়; তাহা অনুসরণ করিলেই আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। আইস আমরা এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই। কেবল নিস্তব্ধ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলিয়া ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। অজ্ঞেয়তাবাদী বা বিশ্বাসশূন্য হইয়া নিস্তব্ধ না থাকিয়া, যাহাতে স্থির বিশ্বাসে উপনীত হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করা যাউক। আইস আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ইহার দিকে প্রয়োগ করি। কোথা হইতে এই বিশ্ব আসিল?

ইহার দুইটী সম্ভবপর উত্তর হইতে পারে।

প্রথমতঃ—হয় ইহা দৈবঘটনা বশতঃ অকস্মাৎ স্বতঃউৎপন্ন হইয়াছে, অথবা ইহা কোন বুদ্ধি ও ইচ্ছা-প্রসূত।

জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর কোন মত দেখা যায় না।

এখন দেখা যাক, কোন্ মত দ্বারা জগতের ক্রিয়াকলাপ সুন্দররূপে বুঝা যায়।

এই বিশ্ব যে আকস্মিক ঘটনা, তাহার অর্থ এই, সকল বস্তু যেমন সেইরূপই আছে। অতি পুরাকালে একটী কিম্বা অনেকগুলি পরমাণু অবস্থিতি করিতেছিল, ইহারা কোন গতিকে ক্রমে একত্রিত হইয়া জগতের আকার প্রকার ধারণ করিল। ইহার গতি চালাইবার জন্য অন্য কোন কর্ত্তা নাই কিম্বা এমন কোন আত্মা নাই যে, ইহার পদার্থ সকলকে প্রণালীবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করে। পরমাণু সকলই, তাহাদের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারাই এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছে। কিয়ৎকাল চিন্তা করিলে এবং অনুসন্ধান করিলে এই মতের অসারতা ও ভ্রান্তি উপলব্ধি করা যায়। যদি আমি কোন ছাপাখানা হইতে এক থলি সিশার অক্ষর আনয়ন করি এবং কোন পুস্তকাগার হইতে কালিদাসের গ্রন্থাবলী আনয়ন করি এবং আপনাদিগকে বলি যে, ঐ থলিটী পুনঃ পুনঃ নাড়িয়া এবং ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া আমি কালিদাসের শকুন্তলা বা অন্য কোন গ্রন্থ উৎপন্ন করিয়াছি, তাহা হইলে আপনারা কি বলেন? আপনারা কি বলেন না যে, "ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে? আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।" তথাচ ইহাও একদিন সম্ভব হইতে পারে, কেন না এখানে আপনারা একজনকে কার্য্য করিতে দেখিতেছেন। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে এইরূপ কোন আকস্মিক ঘটনাদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। কোন সুবিখ্যাত গণিত শাস্ত্রের পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, আজ অবধি পৃথিবীতে যত কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে, ভবিষ্যতে যত কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা যদি অঙ্কের সংখ্যার দ্বারা পূর্ণ করা যায়, সেই সংখ্যা অপেক্ষা, জগত যে

আকস্মিক ঘটনা নহে, তাহার প্রমাণ অধিক।

কোন বিষয় সম্বন্ধে যদি কেবল একটী মাত্র মত (Hypothesis) থাকে, তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে অনেক বলিবার থাকিলেও উহাকে একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু যেখানে দুইটী মত বিদ্যমান আছে, তথায় অল্প সম্ভবপর মতটী পরিত্যজ্য। সুতরাং চিন্তাশীল মনুষ্য মাত্রেই বিশ্বউৎপত্তির আকস্মিক ঘটনা সম্বন্ধীয় মত পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি প্রসূত মতটীই গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানও বুদ্ধি প্রসূত, এই মতাবলম্বীরা বলেন যে, জগতের প্রত্যেক পদার্থই জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একটী মহান মনের ইহা ভাব এবং সেই মনই ইহাকে সৃজন করিয়াছে, ইহার তত্ত্বাবধারণ করিতেছে এবং ইহার গতি সকল পরিচালন করিতেছে।

এই মতই যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত। কেমন করিয়া অসংখ্য স্তূপাকার অসংলগ্ন পরমাণু সকল এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ জগত উৎপন্ন করিতে পারে,তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা তাহা ধারণা করিতে পারি না। ইহা আরো আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যিনি বা যাহা মনুষ্য মধ্যে মনের সংযোগ করিল, তাহা মন-বিবর্জ্জিত, তাহাতে কোন জ্ঞান নাই, ভাব নাই, ইচ্ছা নাই। কোন কার্য্যই কারণ অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না এবং সাধারণত প্রত্যেক কার্য্যের কারণের সহিত সাদৃশ্য থাকে। সুতরাং জগতে প্রেমের ও চিন্তার অস্তিত্ব হইতে তাহাই অনুমিত হয় যে, ইহার স্রষ্টা প্রেমময় ও জ্ঞানময়।

জগত জ্ঞান-প্রসূত মতটী কেবল সম্ভবপর বলিয়া গ্রহণ করিলে চলিবে না, ইহা কতদূর সত্য, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। এই সত্য নির্ণয় করিতে অন্তর্জগতে ও বহির্জগতের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে। বিজ্ঞান এ বিষয়ে কি বলে দেখা যাউক।

প্রথমত বিজ্ঞান দেখাইয়াছে যে, জগত সৃষ্ট পদার্থ ইহা অনাদি অনন্ত নহে। এমন এক সময় ছিল, যখন ইহা এভাবে অবস্থিতি করিত না। বিজ্ঞানবিৎ সকলে একমত হইয়া বলেন যে, জগত একটী কার্য্য।

দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান ইহা একরূপ দেখাইয়াছে যে, জগত ক্রমশ বিকশিত হইয়াছে। ইহা সমগ্র বা আংশিক ভাবে একেবারে সৃষ্ট হয় নাই। এই বিশ্বজগত পুষ্পের ন্যায় ক্রমশ বিকশিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা ঘড়ির ন্যায় নির্ম্মিত হয় নাই, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের ন্যায় বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম এক্ষণে একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং ইহা সমস্ত বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয়ত বিজ্ঞান দেখাইয়াছে যে, বিশ্বজগৎ গতির অবস্থান্তর। সকল বস্তুই তিন প্রকার অবস্থার কোন না কোন অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তু সকল কঠিন, তরল অথবা বাষ্পাকার এই সকল অবস্থা নানা প্রকার গতি হইতে উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক বস্তু যেমন গতির প্রকাশক,তেমনি প্রত্যেক বস্তুকে গতিতে পরিণত করা যায়। এক খণ্ড কয়লাকে অবস্থা বিশেষে উত্তাপে পরিণত হয়। উত্তাপ ন্যূনাধিক পরিমাণে এক প্রকার গতি বলিলেই হয়।

চতুর্থত বিজ্ঞান দেখাইয়াছে যে, এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিভিন্ন প্রকার হইলেও ইহা একই।

বৈজ্ঞানিককে বিশ্বের আদি কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহার আদি কারণ গতি বা শক্তি। অনন্ত শক্তি হইতেই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে।

দার্শনিক সত্য অন্বেষণে ব্যস্ত। ধার্ম্মিক ঈশ্বর অন্বেষণে ব্যস্ত। উভয়ই বিজ্ঞানাবিষ্কৃত ঘটনাবলী ও সত্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া উহার গূঢ় মর্ম্ম জ্ঞাত হইতে চেষ্টা করেন। যদি জগত কার্য্য হইল, ইহার কারণ অবশ্য থাকিবে। যদি কার্য্যের মধ্যে ঐক্য থাকে, তাহা হইলে কারণের মধ্যেও ঐক্য থাকিবে সুতরাং ইহার স্রষ্টা একই। যদি এই বিশ্বগতির ফল হয়, তবে নিশ্চয়ই একজন গতি উৎপন্ন করিতেছে; কেন না, গতি আপনা আপনি স্বতঃ উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপ বিজ্ঞানের সত্য হইতে ধর্ম্মের মূল যে ঈশ্বর, তাহাতে উপনীত হয়। বিজ্ঞানীরা যাহাকে আদি কারণ বলে এবং যাহাকে শেষ কারণ বলে, সেই গতিরূপ সেতুর উপর দিয়াই ধার্ম্মিকেরা গমন করেন।

ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী পুরুষেরা এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন—মনুষ্যের ভূয়োদর্শন আজ অবধি যতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আমরা এই দেখিতে পাই যে, আমাদের ঐচ্ছিক কার্য্যসকল ইচ্ছা-শক্তি-প্রসূত। যদি আমি আমার হস্ত উত্তোলন করি, তাহা আমি আমার ইচ্ছা শক্তিতেই করি। এই রূপ আমাদের ভিতরে ও বাহিরে আমরা যে সকল গতি উৎপন্ন করি, সে সকলই আমাদের ইচ্ছা দ্বারাই করি। যদি মনুষ্যের কার্য্য সমূহে এই নিয়ম দেখিতে পাই, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গতিবিধিতে কেন না এই নিয়ম থাকিবে? অনন্ত ইচ্ছা ভিন্ন জগতের গতিবিধি কিসে উৎপন্ন হয়? যে অসীম অনন্ত শক্তির দ্বারা সকল বস্তু উৎপন্ন হইতেছে, তাহার মূলে এই ইচ্ছা। কিন্তু কেবল ইচ্ছাই এ জগতের কারণ নহে। আমরা এই ইচ্ছার সহিত জ্ঞান, চিন্তা, ভাব ও প্রেম একাধারে দেখিতে পাই। সুতরাং এ বিশ্বে চিন্তাশীলতা, ভাবুকতা ও প্রেমের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই কি না, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই অনুসন্ধানে অধিক দূর যাইতে হইবে না, আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাই যে, আমাদের চিন্তা আছে—ভাব আছে,—প্রেম আছে, কিন্তু এ সকল কোথা হইতে আসিল? সেই অসীম অনন্ত প্রেম ও চিন্তার উৎস ভিন্ন আর কোথা হইতে এই ভাব ও চিন্তা আমরা পাইতে পারি? একবার আমরা বহির্জ্জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেখানেও জ্ঞান, চিন্তা ও প্রেমের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

শীত প্রধান দেশের রজনীতে গৃহের বাহির হইয়া দেখুন, পৃথিবী তুষারাবৃত, পুষ্করিণী সকল বরফে কঠিন হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির এই অবস্থান্তর মধ্যে যে বিধি রহিয়াছে, তাই সেই বিধাতার জ্ঞান ও প্রেমের পরিচয় দিতেছে। জল যে উত্তাপে জমিয়া বরফ হয়, তাহার অপেক্ষা শীতলতায় জল সঙ্কুচিত না হইয়া প্রসারিত হয়। সকল বস্তুই শীতলতায় ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু জল সম্বন্ধে ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বা বিশেষ বিধি। ফারণহিট তাপমান যন্ত্রের ৪০ ডিগ্রি

উত্তাপ পর্য্যন্ত জল সাধারণ নিয়মের অধীন। কোন জলাশয়ের উপরিভাগ শীতল হইলে উপরিস্থিত শীতল জল সঙ্কুচিত হওয়ায় গুরু ভার বশতঃ জলাশয়ের নিম্নে অধঃস্থ হয়। নিম্নস্থিত লঘু জল উপরিভাগে উত্থিত হয়। যে পর্য্যন্ত না সমস্ত জল ৪০ ডিগ্রি উত্তাপ প্রাপ্ত হয়, সমস্ত জলে ঐ রূপ প্রবাহ চলিতে থাকে। ৪০ ডিগ্রির নিম্নে শীতল জল অপেক্ষাকৃত লঘু হয়, সুতরাং উহা উপরিভাগেই থাকে, তথায় ৩২ ডিগ্রি ফারণহিটে উহা জমাট বাঁধিয়া বরফ হয়।

আবার দেখুন, অধিকাংশ পদার্থ তরল অপেক্ষা কঠিন অবস্থায় গুরুতর। কিন্তু বরফ জল অপেক্ষা লঘু। সুতরাং ইহা জলের উপর ভাসিতে থাকে। বরফের উত্তাপ সঞ্চারণ শক্তি অল্প, সুতরাং যদিও শীতকালে চতুর্দ্দিকের উত্তাপ সপ্তাহের পর সপ্তাহ থাকে, তথাপি জলাশয়ের কয়েক হস্ত নিম্নে জলের উত্তাপ ৪০ডিগ্রি হইতে অল্প হয় না। সুতরাং জলাশয়কে বরফ একরূপ আবরণ করিয়া রাখে। জল সম্বন্ধে শৈত্যউষ্ণের এইরূপ স্বতন্ত্র নিয়ম না থাকিলে এ জগতে কিনা বিপর্য্যয় ঘটিত? জল সাধারণ নিয়মের অধীন হইলে সমস্ত জলাশয়ের জল জমিয়া বরফ হইত। বরফ প্রথমে তলদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া উপরিভাগে আসিত। এই বিস্তৃত তুষাররাশি গ্রীষ্মকালের কোন উত্তাপই ২।৪ হস্ত ভিন্ন দ্রব করিতে সক্ষম হইত না। হ্রদ,.পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দিকে কেবল স্তূপাকার বরফ দেখিতাম। এরূপ অবস্থায় জলজীবি-প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব সমূলে লোপ পাইত। কেবল তাহা নহে, প্রত্যেক স্থানেই জীবন বিনাশ প্রাপ্ত হইত। কেন না, জগতের কোন অংশই স্বতন্ত্র নহে। পরস্পর পরস্পরের সহিত বাঁধা আছে। কোটী কোটী যোজন দূরে যে সূর্য্য আছে, তাহার সহিত ঐ যে পৃথিবীর কোন্ কোণে কোন্ ক্ষুদ্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, তাহার সহিত কেমন সম্বন্ধ রহিয়াছে। সূর্য্যরশ্মি হইতেই উহার জীবন, উহার বর্ণ, উহার শোভা। ভূমি নূন্যাধিক পরিমাণে জল দ্বারা পূর্ণ। বর্ত্তমান অবস্থায় অধিক দূর সে জল জমাট বাঁধে না। কিন্তু জল সাধারণ নিয়মের অধীন হইলে, ভূগর্ভে যে মূল ও বীজ সকল নিহিত রহিয়াছে এবং যে সকল কীটাণু ও ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ প্রভৃতি উহার মধ্যে বাস করিতেছে, তাহাদের কাহারও জীবন সম্ভব হইত না। এই তত্ত্ব বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তার চিন্তা-শীলতা ও অভিপ্রায় এই জগতের এইরূপ নিয়মে কি প্রকাশ পায় না?

ইহা কি তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা ও প্রেমের পরিচায়ক নহে? বিশ্বগ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি ছত্রে, প্রতি বর্ণে তাঁহার জ্ঞান ও জীবের প্রতি প্রেমের দৃষ্টান্ত রাশি রাশি রহিয়াছে।

Darwin তাঁহার "Fertilisation of orchids" নামক গ্রন্থে orchid উৎপত্তির এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন—পতঙ্গগণ যখন মধুপান করিবার জন্যে পুষ্পে আসে, তখন দেখা যায় যে, পুষ্পের গঠনের এমন চাতুরী আছে যে, তাহারা সহসা মধুপান করিতে পারে না। মধুর নিকট পঁহুছিতে বিলম্ব হয়।

ইত্যবসরে তাহাদের চরণস্থ পরাগরেণু গর্ভরেণুর সহিত মিশিয়া যায়। মধুপানে যে

বিলম্ব হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া Darwin বলিয়াছেন:—

"If this is accidental it is a fortunate accident for the plant. If this be not accidental and I cannot believe it to be accidental, what a singular case of adaptation!"

অর্থ—এই ঘটনাকে যদি আকস্মিক বল, তবে এমন আকস্মিক ঘটনা যাহা উক্ত পুষ্পের পক্ষে কল্যাণকর। আর যদি আকস্মিক না হয়—আমি ইহাকে আকস্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না—তাহা হইলে ইহাতে কি আশ্চর্য্য কৌশলের পরিচয় পাইতেছে।

মনুষ্যও এই পতঙ্গের অনুকরণ করিয়া অন্তত একটী লাভকর ব্যবসা চালাইতেছে, আমি তাহা জানি। সম্প্রতি (বিগত সেপ্টেম্বর মাসে) আমি যখন সিসেল দ্বীপে যাই, তথায় শুনিলাম, Vanillaর চাষ হয়। Vanilla একটী সুগন্ধ দ্রব্য। ইউরোপীয়েরা প্রচুর পরিমাণে ইহা ব্যবহার করেন। সাবান ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য ব্যবহার ব্যতীত পুডিং প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ্যেতেও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর সিসেল দ্বীপ হইত প্রায় ৫।৭ কোটী টাকার Vanilla রপ্তানি হয়। আমরা যে জাহাজে আসিয়াছিলাম, তাহাতে প্রায় ৭০ হাজার টাকার Vanilla আনিয়াছিলাম। পতঙ্গের উপর নির্ভর করিয়া রাখিলে এত টাকার Vanilla উৎপন্ন হইত না। মনুষ্যই Vanillaর পরাগরেণুর সহিত গর্ভরেণু মিশাইয়া দেয়।

যে John Stuart Mill কে কেহ কেহ নাস্তিক বা অজ্ঞেয়তাবাদী বলিয়া থাকেন, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব লিখিত গ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন;—"আমার বোধ হয়, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জ্ঞান যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি-কৌশল দেখিয়া ইহা খুব সম্ভব বোধ হয় যে, জ্ঞান দ্বারাই ইহা সৃষ্ট হইয়াছে।"

"I think it must be allowed that in the present state of our knowledge the adaptations in nature, afford a large balance of probability in favour of creation by intelligence."

একবার নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করি, বিশ্ব সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করি। উন্নত আকাশে ভ্রমণ করি, কোটী কোটী তারকমণ্ডলীর বিষয় ক্ষণকাল চিন্তা করি। বসন্ত কালের প্রদোষ হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত গ্রামের বাহিরে বন, উপবন, প্রান্তর, মাঠ, জলাশয় প্রভৃতি স্থানে একবার ভ্রমণ করিয়া আসি। প্রাতঃকালের নবোদিত সূর্য্যালোকে যখন দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করে, সাগরবক্ষ বা পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে যখন তরুণ অরুণ প্রকাশ পায়, তাহার দিকে একবার লক্ষ্য করি। চতুর্দ্দিকের প্রেম, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, চমৎকারিত্ব একবার হৃদয়ে অনুভব করি। দেখি, কত অসংখ্য অসংখ্য পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, জলচর, খেচর, ভূচর, প্রাণী সকল জলে, স্থলে, ব্যোমে প্রফুল্ল অন্তরে ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদের স্বরলহরীতে প্রাণমন মুগ্ধ করিতেছে। উদ্ভিজ্জ রাজ্যের দিকে একবার মনকে নিযুক্ত করি। তাহাদের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও বিকাশ অনুধাবন করি। এই সকলের মধ্যে সেই অনন্ত অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান ও প্রেমের পরিচয় কি পাই না? এই যে উপরে যে কয়েকটী বাক্য লিখিলাম, তাহার মধ্যে যদি দু-চারটী বাক্য কোন মরুভূমিতে অথবা পর্ব্বত কন্দরে বা অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে কোন প্রস্তর খণ্ডের উপর খোদিত দেখিতে পান, তাহা হইলে কি আপনারা বলেন না যে, ইহা কোন বুদ্ধিমান জীবের কার্য্য। বিশ্বসংসারে কি এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় নাই?

জগৎ যে কোন জ্ঞানবান বুদ্ধিশালী আত্মার সৃষ্ট, তাহা এইরূপ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করি। সেই স্রষ্টাকে আমরা ঈশ্বর বলিয়া জানি। মনুষ্য যে অকস্মাৎ উৎপন্ন জীব নহে, এবং বৃথা দুরাশার দাস নহে, এই শুভ সংবাদ বিজ্ঞানী ও ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী পুরুষেরা সুসভ্য ও অসভ্য সকলের নিকটই প্রচার করিতেছেন।

জগৎ ও মনুষ্য সকলেই যে ঈশ্বর

হইতে আসিয়াছে, তাহা বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকল একবাক্যে বলিতেছে।

যাঁহার জ্ঞান আছে, যিনি শৃঙ্খলাময় এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন, তিনি পুরুষ কি না, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। পুরুষ অর্থে আমরা কি বুঝি, প্রথমে তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক। শরীর, বা শারীরিক যন্ত্র থাকিলে পুরুষ হয় না, পুরুষ কোন বস্তু নহে। কোন কীটকে আমরা পুরুষ বলি না—কুকুরকে আমরা পুরুষ বলি না উন্মাদ-গ্রস্ত ব্যক্তি বা বুদ্ধিহীন মনুষ্যকে আমরা পুরুষ বলিনা। পুরুষের নিজ অস্তিত্বের জ্ঞান আছে,—বুদ্ধি আছে—ভাব আছে,—স্বাধীন ইচ্ছা আছে। সকল সুস্থ আত্মারই এই ধর্ম্ম। ঈশ্বর যদি মন বা আত্মা হয়েন, এই সকল শক্তি তাঁহার আছে, সুতরাং তিনি পুরুষ। কিন্তু পুরুষ বলিলে, ঈশ্বর দেখিতে যে মনুষ্যের মতন হইবেন বা মনুষ্যকল্পিত অন্য কোন বস্তু হইবেন, তাহার কোন অর্থ নাই। যখন আমাদের বা অন্য কোন ব্যক্তির মন যে কিরূপ, তাহা ধারণা করিতে পারিনা, তখন যিনি আমার মনের মন—যিনি অনন্ত অসীম আত্মা—তাঁহাকে কেমন করিয়া বা ধারণা করিব, স্বপ্নেও তাঁহাকে কল্পনা করিতে পারিনা। যদি ঈশ্বর পুরুষ না হয়েন, তাহা হইলে তিনি অন্ধশক্তি, উদাসীন দেবতা। কিন্তু তিনি যে অন্ধ শক্তি নহেন—উদাসীনও নহেন, জীবের ও জগতের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেখিতে পাই।

যখন দেখিতেছি, এই জগত এক অসীম মনের সৃষ্টি, তখনই বলিতে হইবে, ইহার কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য আছে। কেননা, আমরা দেখিতেছি যে উচ্চ শ্রেণীর মন সকলের কার্য্যের মধ্যে কোন না কোন উদ্দেশ্য রহিয়াছে। সুতরাং তুমি আমি সকলে জানিতে চাই, এই বিশ্ব কেনই বা সৃষ্ট হইয়াছে, আমরা কেনই বা এখানে আসিয়াছি? আমাদের কোন চরমগতি বা গম্য স্থান আছে কি? না—আমরা কেবল একটী বৃত্তের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি? এ বিশ্বের স্রষ্টা কি ইহাকে সৃজন করিয়া পরিত্যাগ করতঃ কোন দেশ দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, না—তিনি ইহার মধ্যে থাকিয়া তাহার কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন? এই জগৎ কি একটী বৃহৎ ঘড়ি, যাহাকে দম দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—টিক্ টিক্ করিয়া চলিতেছে, শেষে এক দিন বন্ধ হইয়া যাইবে? না—ইহা কোন বুদ্ধিশালী জ্ঞানসম্পন্ন মনের কৌশলপূর্ণ সৃষ্টি, তাহার মধ্যে স্রষ্টা স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া জীবন-স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন এবং তাহার চিন্তা ও প্রেম প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের শরীরের যন্ত্র সকলের সহিত আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর যে সম্বন্ধ, তাহার সঙ্গে কি এই বিশ্বের সেই সম্বন্ধ নহে? আমরা একবার দেখি, বিজ্ঞান কি বলে। বিজ্ঞান যে বিবর্ত্তনবাদের মত স্থীরিকৃত করিয়াছে, তাহা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, অতি দূরে একটী ঐশ্বরিক কার্য্য রহিয়াছে, তাহার দিকে সমগ্র জগতের গতি চলিতেছে। বস্তুসকল অর্থশূন্য বৃত্তের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে না, কিন্তু নদীর ঘূর্ণজলের ন্যায় স্রোতের সহিত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। কেহ কেহ ভয় করিতেছেন, এই বিবর্ত্তনবাদ বুঝি ঈশ্বরের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দেয়। ভ্রান্তমতি, বৃথা ভয়। পূর্ব্বকালে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারকে লোকে মনে করিয়াছিল যে, উহা জগৎ হইতে ঈশ্বরকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, বিবর্ত্তনবাদ কোন বস্তুরই কারণ নহে, উহা আদি কারণের হস্তের যন্ত্র, উহা কেবল মাত্র একটী উপায়—যাহার দ্বারা তিনি কার্য্য করিতেছেন। যিনি এই উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহাকে ইহা কেমন করিয়া অপসারিত করিবে।

বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম সম্বন্ধে বিজ্ঞান আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়? ভূতত্ত্ব (Geology) আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, এই বহির্জ্জগত, জীব উৎপত্তি ও তাহার

পুষ্টির জন্য অনেক দিন হইতে চেষ্টা ও শ্রম করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছে। উদ্ভিদ তত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ব (Biology) দেখাইয়াছে যে, বহু দিবস একগ্রতার সহিত কার্য্য করিয়া মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে। মনোবিজ্ঞান বলিয়া দিতেছে যে, বুদ্ধিজীবী মনুষ্য হইতে ক্রমে ধর্ম্ম ও নীতি সম্পন্ন মনুষ্যের বিকাশ হইয়াছে। বিজ্ঞান এইরূপে দেখাইতেছে যে, সৃষ্টির সকলের গতি যেন ক্রমোন্নতির পথে চলিতেছে। অসম্পূর্ণ মনুষ্যকে যেন সম্পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে। ইহাই বিবর্ত্তনবাদের শিক্ষা। ইহার নিয়ম কি আমরা অবিশ্বাস বা অস্বীকার করিতে পারি? এই বিবর্ত্তনবাদের ফল বিষময় না অমৃতময়? ইহা আমাদের ঈশ্বরের চরণকে আরো সুন্দর করিতেছে। ইহা উচ্চৈঃস্বরে এক মহা অমর জীবনপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিতেছে। বিবর্ত্তনবাদের ইতিহাস এই বলিয়া দিতেছে যে, সকল বস্তু একত্রে অসংখ্য অসংখ্য বৎসর ধরিয়া কষ্ট ও শ্রমের মধ্য দিয়া এক মহা সুন্দর উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে। জীবরাজ্য এক সম্পূর্ণ উচ্চ দৈহিক ও মানসিক মনুষ্য জীবন লাভের উপযুক্ত করিতেছে।

মনুষ্যকে সম্পূর্ণ উন্নতির দিকে ক্রমশঃ লইয়া যাওয়াই যেন সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞানও মুক্তকণ্ঠে বলিয়া দিতেছে, ক্রমোন্নতিই আমাদের গম্য স্থান।

আমরা দেখিলাম, মনুষ্য উৎপন্ন করা জগৎ সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য এবং আমাদের গম্য স্থান অনন্ত উন্নতির দিকে। এখন আমরা বুঝিতে পারি, মনুষ্যের মূল্য কত এবং ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ কি এবং ক্ষুদ্র মনুষ্যের প্রতি তাঁহার কিরূপ ভাব।

তোমার জন্য, আমার জন্য এই বিশ্বের সৃষ্টি। জগদীশ্বর ইহার নিয়ম সকলকে এরূপ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, ইহার শক্তি সকলকে এইরূপ চালিত করিতেছেন, যদ্দ্বারা মনুষ্য আত্মার জন্য বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং পূর্ণতা লাভ হয়। ইহা যখন আমরা ভাবি, তখন কি আমরা তাঁহার দয়ার ভারে অবনত হই না? তখন কি একথা বলিতে হয় না, "তোমার করুণা ভার বহিতে পারি না আর।" মনুষ্য তুমি কে, যে তোমার জন্য এত আয়োজন, তুমি কে, যে সেই সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত অসীম সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণব্রহ্ম তোমার প্রার্থনা শুনেন। তোমাকে এই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব করিয়া সৃজন করিয়াছেন। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব ও শাস্ত্র সকলেই একবাক্যে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। তুমি সৌভাগ্য ক্রমে তাহার চিন্তার বস্তু হইয়াছ। তোমার সঙ্গে তিনি নিজকে যেমন করিয়া বাঁধিয়াছেন, সেরূপ সম্বন্ধ তিনি আর কাহার সহিত রাখেন নাই। তোমাকে যে জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, ভাব, স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন, এরূপ আর কাহাকেও দেন নাই। তুমি তাহার চরণতলে বসিবার উপযুক্ত। তোমাকে তিনি তাঁহার স্বরূপের কিছু কিছু দিয়া সৃজন করিয়াছেন। এবং তোমাকে শক্তি দিয়াছেন—যাহা তুমি ক্রমশঃ বিকাশ করিতে পার এবং তাঁহার অনুরূপ হইতে পার। আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান, সুতরাং তিনি যে তোমার ও আমার কল্যাণের জন্য—উন্নতির জন্য চিন্তিত, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে।

এইবার জড়জগৎ ছাড়িয়া একবার অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া দেখি, সেখানে জগদীশ্বরের লীলা কিরূপ, তাহার কার্য্যকলাপ সেখানে কিরূপ হইতেছে, একবার দেখা যাউক।

আমাদের মধ্যে কি কি ভাব আধিপত্য করিতেছে? জড়জগতের তত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া বিজ্ঞান আমাদের মনে যে ঈশ্বরের জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দিয়াছে, তাহা অতি মহৎ ও উচ্চ। এক অনন্ত সর্ব্বব্যাপী চিৎ শক্তি আমাদের ক্ষুদ্রত্ব বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। আমরা যে সম্পূর্ণ এই শক্তির অধীন, তাহা আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি। এ শক্তির উপর আর আপীল নাই। আমরা কত করিতে ইচ্ছা

করি, কিন্তু কত অল্প করিতে পারি, আমরা যেন পঞ্চ ভূতের খেলার পুতুল মাত্র, কেহ যেন সদর্পে আমাদের ইচ্ছাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে। ঝড়,বৃষ্টি, বন্যা, বজ্রাঘাত, মহামারী বা প্লেগ, ক্ষুদ্র উদ্ভিদাণু বা ব্যাকটিরিয়া পর্য্যন্ত সকলেই যেন পদে পদে আমাদিগকে অপদস্থ করিতেছে।

আলেকজাণ্ডারই হউন, আর নেপোলিয়ন্ হউন; যাজ্ঞবল্ক্যই হউন আর মনুই হউন; শেক্সপিয়রই হউন আর কালিদাসই হউন; রামই হউন আর রাবণই হউক, ক্ষুদ্র কীটাণু হউক আর হস্তীই হউক; সকলকেই সেই বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। আমরা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারি না, তাঁহার উপর নির্ভর করা ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই।

এই নির্ভরের ভাবকেই থিওডোর-পার্কার ধর্ম্মভাবের মূল বলিয়াছেন। কোন প্রবল পাপ প্রলোভনে পতিত হইবার পরক্ষণে, আমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হয়, আমরা সকলেই একদিন না একদিন অনুভব করিয়াছি। ইহা কি সুখের অবস্থা, লাভের অবস্থা বা সন্তোষের অবস্থা? না, তাহার কিছুই নহে।

পূর্ব্বক্ষণে যে সুখ বা লাভের জন্য অন্যায় কার্য্য করিলাম, তাহা পরক্ষণে অন্তর্হিত হইয়া হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। এমন কি, এই পাপের স্মৃতি মনুষ্যের মনে যখনই উদয় হয়, তখনই তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। আমাদের অনুপযুক্ততা স্মরণ করিয়া দেয়। কে দেয়? আমরা স্বয়ং আপনা হইতে চিন্তা করিয়া বা জ্ঞান, বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কি ভাল হইতে চাই? না, ইহার মধ্যে সেই অজ্ঞাত পুরুষের হস্ত রহিয়াছে? আবার যখন আমরা প্রলোভনের হস্ত হইতে মুক্ত হই, যিশুর মতন যখন বলিতে পারি, "দূর হও সয়তান, আমাকে প্রলোভন দেখাইও না।" তখন আমরা যে আনন্দ পাই, যে পবিত্রতার স্পর্শলাভ করি, নিজের উপযুক্ততা ও বল অনুভব করি, তাহার মধ্যেও সেই দেব দেব পরমদেব রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা আমাদের মধ্যে কথা কহিতেছেন, অন্য লোকে ইহাকে বিবেকের বাণী বলে, থিওডোর পার্কারের জননী, ইহাকে মানব হৃদয়ে ঈশ্বরের বাণী বলিয়াছেন।

St. Paul রোমানদের পত্রে এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—

"Not that what I would that I do practise but what I hate that I do." The good which I would I do not but the evil which I would not, that I practise."

আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করি না, কিন্তু যে কার্য্য করিতে আমি ঘৃণা করি, তাহা আমি করি। যে সৎ আমি ইচ্ছা করি, তাহা আমি করি না, কিন্তু যে অসৎ আমি ইচ্ছা করি না, তাহাই করি, ইহাই পরিতাপের বিষয়। আমাদের জীবনের সম্মুখে শেষ চারিটী বিষয় উপস্থিত হইতে দেখিতে পাই।

প্রথম—পাপের প্রলোভন, দ্বিতীয়—সৎকার্য্যের সুযোগ, তৃতীয়—অন্যায় কার্য্য করা, চতুর্থ—সৎকার্য্য করা। এই সকলের মধ্যে একটী স্বর সর্ব্বদাই উত্থিত হইতেছে। সৎকার্য্যে উৎসাহ দান, অসৎ কার্য্যে সতর্ক করা ও তিরস্কার করা। কিন্তু সময়ে সময়ে আমরা দেখি, অনেকের মধ্যে এই বিবেকের বাণী অতি অল্পই শুনা যায়। ইহার কারণও আছে। আমরা দেখি, যে বৃত্তি আমরা চালনা না করি, তাহা অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; আমাদের শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনাভাবে এইরূপ দশা প্রাপ্ত হয়।

আমরা সকল কার্য্যের উপর ন্যায় কি অন্যায়, এই মত সর্ব্বদা প্রকাশ করি, সুতরাং ন্যায় যাহা, তাহা করিতে বাধ্য, নতুবা ন্যায়-অন্যায় শব্দের কোন অর্থ থাকে না। এখন দেখা যাউক, কাহার কাছে আমরা বাধ্য? নিজের কাছে নহে, সমাজের কাছেও নহে, রাজার কাছেও নহে—কেননা, এমন অনেক অন্যায় কার্য্য আমি করিতে পারি, যাহা ইহারা জানিতে পারে না। এবং তজ্জন্য আমাকে কোন শাস্তি দিতে পারে না। সুতরাং অন্য একজনের নিকট আমরা দায়ী।

তিনি আমাদিগের অন্তর দেখেন, এবং তিনি যে আমাদের পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কাররূপ শাসন রাখিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি আমাদিগের জন্য চিন্তিত আছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

অনেকে এই প্রশ্ন করিতে পারেন, বিবেক যদি ঈশ্বরের বাণী হয়, তাহা হইলে সকল মনুষ্যের বিবেক একরূপ কার্য্যে সকলকে নীত করেনা কেন? ন্যায়ান্যায় কার্য্য সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় কেন? অসভ্যেরা যাহাকে ন্যায় বলে, সুসভ্যেরা তাহাকে অন্যায় বলে। ইতিহাসে দেখা যায়, এক জাতিতেই বংশ পরম্পরা ভেদে নীতির আদর্শ ভিন্ন হইয়াছে। স্পার্টানেরা চুরি করাকে সাহসের কার্য্য চলিত। কিন্তু চুরি করিতে যাইয়া ধৃত হওয়া লজ্জাস্কর বলিত। অদ্যকার অনেক রাজনৈতিক পুরুষেরা ব্যক্তিগত জীবনে মিথ্যা বা প্রতারণা করাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে অন্য জাতির সহিত ব্যবহারে ছলে বলে, কলে কৌশলে, যে প্রকারে হউক, ইষ্ট সিদ্ধি করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। উহাতে যে কোন দোষ আছে, তাহাও মনে করেন না। ইহার কারণ কি? কোন্ কার্য্য ন্যায় আর কোন্ কার্য্য অন্যায়, তাহা বিবেক বলিয়া দেয় না। বিবেক বলে, যে কার্য্য তুমি তোমার সমাজের অবস্থা ও তোমার মানসিক বিকাশানুসারে ন্যায় বল, তাহা তোমার করা উচিত এবং যাহা অন্যায় বল, তাহা করা অনুচিত। দয়া, পবিত্রতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণ সুসভ্য জগতে সৎ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহা লোকের নিকট সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে আদিম কাল হইতে অনেক বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। যখনই আমরা কোন কার্য্যকে সৎ ও কোন কার্য্যকে অসৎ বলিয়া বুঝিতে পারি, তখনই বিবেক আসিয়া আমাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ও অসৎকার্য্যে নিবৃত্ত হইতে বলে। ভগবান এইরূপ বহির্জ্জগতে ও আমাদের অন্তর্জ্জগতে থাকিয়া তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতেছেন। আমাদের আত্মা কি তাহার সম্বন্ধে কোন সাক্ষী দিতে পারে না? যদি না পারে, তবে সে ধর্ম্ম লইয়া আমরা কি করিব? মহিয়সী মৈত্রেয়ীর সহিত একবাক্যে বলি—যেনাহং না মৃতাস্যাম্ কি মহং তেন কুর্য্যাম্" যাহার দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব? আমি বলি, যদি সেই অমৃতময় পুরুষকে আমার হৃদয় না দেখিল, তাহা হইলে আমি ধর্ম্ম লইয়া কি করিব? আবার বলি, "রবি শশি তারা শোভে না আমার কাছে। যদি হারাই তাঁহারে। কিসের সে জীবন যৌবন, তিনি বিহনে কি হবে সে জ্ঞানে—যাতে তাঁহারে না পাই।" আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি পাপভারে ভারাক্রান্ত হইয়া, শোকে আকুল হইয়া, দুঃখে অবনত হইয়া সেই পরমদেবের স্মরণাপন্ন হইলে হৃদয়ে শান্তি পান নাই। জগাই মাধাই হইতে হীন হইয়া কি আমরা অনেক পরিমাণে পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার পাই নাই? এমন ঈশ্বরোপাসক কে আছেন, যিনি একথা অস্বীকার করিতে পারেন?

একবার স্মরণ করুন, এক প্রবল ভয়ানক প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত, কোন একটী রিপু কাম, ক্রোধ বা লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়াছে। ঐ রিপু আমাদিগকে এমন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহার হস্ত হইতে কোন মতেই অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। এই সময়ে যদি একবার পরমেশ্বরকে স্মরণ করি, তাঁহার দিকে মুখ তুলে চাই, করযোড়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তাহার নিকট বল ভিক্ষা করি, তাহা হইলে আমরা কি ফল পাই না? রিপু সকল সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইয়া কি অপসারিত হয় না? যদি না হয়, আমার ঈশ্বরোপাসনা সকলই কল্পনা ও বৃথা। আমরা দেখিয়াছি, এক অদৃশ্য মহাশক্তি আমাদের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করে এবং আমরা ঐ জীবন মরণ সংগ্রামে জয়লাভ করি। এরূপ স্থলে

আমরা বুঝিতে পারি যে, ভগবান আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন—আমাদের ক্রন্দন ধ্বনি তিনি শুনিয়া আমাদের সহায় হইয়াছেন। বিজ্ঞান বা দর্শন কখনই ইহা অস্বীকার করিতে পারে না। মনুষ্য জগত ও তাহার নিয়ম সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। জড় জগতে যেমন নিয়ম আছে, আধ্যাত্মিক জগতেরও সেইরূপ নিয়ম আছে। জড় জগতে দেখি, একটী চুম্বুকের যতনিকটে একটী সূচকে লইয়া যাই, ততই প্রবল বেগে উহা আকর্ষণ করে। সেই রূপ আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম এই যে, যতই ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্নিকটস্থ হই, ততই, তাঁহার শক্তি আমাদের মধ্যে প্রবৃষ্ট হয়। প্রার্থনার দ্বারা সূচকে চুম্বুকের নিকট আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা এবং চুম্বুক দ্বারা আত্মাতে ঈশ্বরের বল লাভ করিবার চেষ্টা উভয়ই দুরাশা! দারুণ শোকের সময় হৃদয়ে শান্তি প্রদান করে। অনুতাপে যখন হৃদয়কে দগ্ধ করে,তখন ঈশ্বরের ক্ষমা আমরা অনুভব করিতে পারি। প্রলোভনের সময় তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া হৃদয়ে বল লাভ করি, পাপকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হই। এই সকল আধ্যাত্মিক ব্যাপারে জগতের কোন নিয়মই ভঙ্গ হয় না, বরং ইহা নিয়ম সকলের সুন্দর দৃষ্টান্ত। বৃষ্টিধারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা ভূমিতে পতিত হয়, চন্দ্রের গতিতে যেমন জোয়ার ভাটা হয়, ইহাও সেইরূপ নিয়মের অন্তর্গত। শস্য উৎপন্ন ও অধিক ধনলাভ করা যেমন কেবল প্রার্থনার দ্বারা সম্ভব নহে, তাহার অন্য উপায় আছে; সেইরূপ সাধু চরিত্র এবং হৃদয়ে শান্তি লাভ করা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ভিন্ন সম্ভব নহে।

ঈশ্বরের নিকট যে কেবল অনবরত দরখাস্তের পর দরখাস্ত পেশ করিব আর বলিব, এই দাও, ঐ দাও, কেবল দাও দাঁও করিব, তাহা নহে। তিনি আমাদের বন্ধু, তাহার সহিত দুদণ্ড আলাপ করিব, কথা-বার্ত্তা করিব, তাহাই আমাদের সুখ। উপনিষদ সেই অমৃতময়পুরুষকে জানিতে বলিয়াছেন, মার্টিনো তাঁহার উপাসনা করিতে বলিতেছেন। আমরা দেখাইয়াছি, ঈশ্বর মঙ্গলময়, পূর্ণময়, শান্তিস্বরূপ, তাঁহাকে জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? জগতের বন্ধুর সহিত কথোপকথনে লাভ কি, এ প্রশ্ন কি আমরা কখন করি? তবে সেই পরম বন্ধুর সহিত কথোপকথনে ফল কি, এ প্রশ্ন কেন হয়? বন্ধুর সহিত আলাপেই সুখ,আর বন্ধু যদি আমাদের অপেক্ষা জ্ঞানী, সৎ ও শ্রেষ্ঠ হয়েন, তাহা হইলে কি আমরা মনে করি না, তাহার সহবাসেই আমাদের মঙ্গল। উপাসনার প্রকৃত ভাবই আত্মা পরমাত্মার সন্নিকটস্থ হইবে, তাহারাই সন্নিধানে বসিবে, Enoch Arden যখন প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইতেছেন,তখন Tennyson প্রার্থনা যে কি, তাহা এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন

"Yet Enoch as a brave Godfearing man
Bowed himself down, and in that mystery
Where God-in-man is one with man-in-God
Prayed for a blessing in his wife and babes
Whatever came to him."

একধারে দেব ও মানব।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

শোক-গাথা।

ভারতসম্রাজ্ঞী আলেকজ্যান্দ্রিণা ভিক্টোরিয়া মাতার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত।

(জন্ম—১৮১৯, ২৪শে মে, মৃত্যু—১৯০১, ২২শে জানুয়ারি, মঙ্গলবার ৬॥ ঘটিকা।)

১

অভাগী ভারত! আজি শুনিলি কি করি—
শূন্য রাজ-সিংহাসন
কোটি কোটি প্রাণ মন,
স্বরগে চলিলা তোর রাজ-রাজেশ্বরী!
ছুটিছে শোকাগ্নি-শিখা,
হিমাচল কুমারিকা,
ছুটিছে সিন্ধুর বক্ষে আগ্নেয় লহরী!
এত জ্বালা অভাগিনি! সহিছ কি করি!

২

এ জ্বালা বিষম জ্বালা, নহে সহিবার—
যে দেবীরে পেয়ে "রাণী"
ভুলেছিলে অভাগিনি!
পোড়া কপালের ব্যথা পরাধীনতার!
যাঁর-প্রজা-বৎসলতা
স্মরায় অতীত কথা
হিন্দুর রাজত্বে—সেই গৌরব তোমার,
তোর সেই মহারাণী আজ নাই আর।

৩

সত্য কি গো! অস্তগামী তপনের বেশে,
সমাপি কর্ত্তব্য যত,
সাধি-জীবনের ব্রত,
গেলে মা ভারতেশ্বরি! দেবতার দেশে?
ঊষা যে আবার হবে,
তুমি মা! আসিবে কবে,
রবি যে আসিবে কালি নিশা-অবশেষে,
তুমি কি গো আসিবেনা দয়াময়ী-বেশে?

৪

পুণ্যময়ী স্নেহময়ী করুণার খনি
তোমার তুলনা দিতে,
কি আছে মা! পৃথিবীতে,
মানসে গড়িল বিধি তোমারে আপনি!
দেবের বাঞ্ছিত মেয়ে,
শুভক্ষণে কোলে পেয়ে,
শিহরি উঠিল মরি আনন্দে অবনী!
বাসন্তী-কুসুম-রূপ
অপরূপ অপরূপ!
পবিত্র হইল ছুঁয়ে জনক জননী!
তোমারি মিলনে সতি!
কৃতার্থ হইল পতি,
মণি কাঞ্চনের যোগ হেরিল ধরণী!
দয়া, মায়া, সুদক্ষতা,
বিদ্যা, বুদ্ধি, পবিত্রতা,
সকলি লভিলে তুমি নারীকুল-মণি!
শত পুণ্যে ছেলে মেয়ে,
মাতৃরূপে তোমা পেয়ে,
জীবনের সার্থকতা লভিল জননি!
পরিজন, দাস দাসী,
জ্ঞাতি বন্ধু, প্রতিবাসী
সবে জানে দেবী তুমি সংসার-পালনী,
ধন্য ধন্য মহারাণি নারী-কুলমণি!

৫

তব রাজ্যে দিনকর অস্ত নাহি যায়,
শত্রু মিত্র সমভাবে তব যশ গায়;
তোমারি মহত্ত্বে সতি!
সসাগরা বসুমতী
তোমার চরণ-ছায়ে ঘুমাইতে চায়—
কোটি কোটি প্রজাগণে,
সন্তান জানিয়া মনে,
পালিয়াছ ন্যায় সহ স্নেহ-করুণায়!
ও হৃদি অমৃত-সিন্ধু,
মানে নি খ্রীষ্টান হিন্দু,
চাঁদের আলোক কোথা ছোট বড় চায়!
এমনি উদার প্রীতি
বিপক্ষের যশোগীতি,
গাহিয়াছ প্রাণ খুলি ভুলি আপনায়!
অনাথ, অধম-দুখে,
কত ব্যথা লাগে বুকে,
স্বরগ বাতাস যথা সবারে যুড়ায়!
কি আছে ভাষার শক্তি,
ক্ষুদ্র বুকে কই ভক্তি

বর্ণিতে তোমার গুণ ক্ষমতা কোথায়!
মরতে "আদর্শ" বিধি গড়িলা তোমায়!

৬

আজি মা! ভারত তব কায় তুষ চায়?
হারা সে সম্রাজ্ঞী-রত্ন
কে করে সান্ত্বনা যত্ন,
তুমি যে করুণাময়ী নাহি এ ধরায়!
ভীষণ কামান-শব্দ,
জগত হতেছে স্তব্ধ,
শত বজ্র পড়িতেছে ভারত-হিয়ায়।
বিশ্ব যেন কালি-মাখা,
সকলি আঁধারে ঢাকা,
শোকভরা ধরাখানি, কি দেখিনু হায়!
লেখনী খসিয়া পড়ে,
নয়ন আপনি ঝরে,
আগুন লেগেছে যেন হৃদি-কলিজায়,
আজি মা! ভারত তব কার মুখ চায়!

৭

তবে,
পুণ্যময় জীবনের লীলা পরিহরি,
যাও মা! স্বরগ-ধামে ভারত-ঈশ্বরি!
যাও দেবতার দেশে
রাজ-রাজেন্দ্রাণী-বেশে,
পাতিয়াছে রত্নাসন অমর অমরী;
গাঁথিয়া মন্দার-মালা,
ডাকে তোমা দেব-বালা,
গাহিছে ও গুণ-গাথা কিন্নর কিন্নরী!
তুচ্ছ মণি কোহিনুরে
ফেলিয়া মরতপুরে,
পরগে ত্রিদিব-রত্ন মহানন্দ করি!
তোমারি লাগিয়া সতি!
তব প্রিয়তম পতি,
পুত্র পৌত্র সনে আছে প্রতীক্ষায় মরি!
সাঙ্গ জীবনের কার্য্য,
যাও যথা দেব-রাজ্য,
যাও ভবিষ্যৎ-ভূপে আশীর্ব্বাদ করি।
আমরা মরম-স্তরে
পূজিব মা! চির তরে
দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরী!
জীবন হইল ধন্য
হইনু কৃতার্থমন্য,
তোমারে পাইয়া রাণী তব গুণ স্মরি!
কোটি কণ্ঠ মিশাইয়া,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপাইয়া,
ডাকরে ভারতবাসি! ডাক হরি হরি!!
স্বর্গে চলে যায় মাতা রাজ-রাজেশ্বরী!

শ্রীমা——— সাগরদাঁড়ী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৬। মালতী-মালা।—গীতি কাব্য। শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা। ভিক্টোরিয়া প্রেস, বঙ্গ নারীর তুলনা দিতে ভয় হয়, অসভ্য আদিম নরনারীর মত নিকৃষ্ট কবিদিগের সরস্বতীও বড় অলঙ্কারপ্রিয়া। যে স্বতঃসুন্দর, অলঙ্কারে তার সৌন্দর্য্য বড় বেশী বাড়ায় না; কিন্তু যে সুন্দর নহে, অলঙ্কার তাহাকে সুন্দর করিতে গিয়া অনেক সময়ে আমাদের হৃৎকম্পের সঞ্চার করে মাত্র। এইরূপ কতকগুলি বিকট শব্দালঙ্কার হরিশ্চন্দ্রের স্বরস্বতীর গলা চাপিয়া শ্বাসরোধ করিতেছে। তাই তার কণ্ঠস্বর দুই চারিবার বই শুনিতে পাই নাই। যেখানে শুনিয়াছি, সে খানে বড় মধুর—

কত আশা ছিল মনে পোহাইবে প্রেম-নিশি
চুম্বনে মিলনে কত মরমে মরমে মিশি।

বড় স্নিগ্ধ—

শ্বেতরূপে আলো করি এলান কুন্তল-ভার,
ঝর অঙ্গে পদ্মগন্ধ ঝরিতেছে অনিবার।

পদটী পড়িতে পড়িতে বিহারী লালের সারদামঙ্গল মনে পড়ে। কিন্তু মালতী মালায় এরূপ রচনা বেশী নাই।

৩৭। গঙ্গা স্তোত্রাদি সংগ্রহঃ—শ্রীকুঞ্জলাল মল্লিকেন সঙ্কলিতোঽনুবাদিতঃ প্রকাশিতশ্চ। কলিকাতা যন্ত্র। এই পুস্তকে কতকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গঙ্গাস্তোত্র সংগৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত স্তোত্রগুলি আবার সেই সেই স্তোত্রের ছন্দেই বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদে তারা কুমারের পয়ারের সে মাধুর্য্য কই?

বিরুদ্ধমতের সামঞ্জস্য।*

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এমন অনেক মত ও ভাব আছে, লোকে যে সকলকে পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে করে। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে, সেই সকল মত ও ভাবের মধ্যে এক দিকে যেমন বিরোধ দেখা যায়, সেইরূপ আবার সামঞ্জস্যও দেখা যায়।

আমরা অনেক সময়ে, কোন একটী বিষয়ের কেবল এক দিক্ দেখি বলিয়া সে সম্বন্ধে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি না। সত্য কেমন? অনেক বিষয় সম্বন্ধেই মনে হয়, সত্য যেন একটী গোলাকার বস্তুর ন্যায়। একটী বল বা কমলালেবুর ন্যায়। এক সময়ে এক দৃষ্টিতে গোল বস্তুর সকল দিক্ দেখা যায় না। উহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে হয়। নতুবা সকল দিক্ দেখা যায় না। সত্য সেইরূপ। এক দিক্ দেখিলে প্রকৃত ভাবে সত্যের জ্ঞান লাভ হয় না। সকল দিক্ দেখা চাই। তাহা হইলেই উহার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়।

একদেশদর্শিতার জন্য আমরা অনেক সময়, অনেক বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হই না। বালকদের পুস্তকে যে বহুরূপীর গল্প আছে, তাহা আপনারা জানেন। কয়েকজন যুবা একটী উদ্যানে গিয়া বহুরূপী নামক একটী জন্তু দেখিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহাদের মধ্যে এই কথা উঠিল যে, বহুরূপীর বর্ণ কিরূপ? কেহ বলিলেন, বহুরূপীর বর্ণ সাদা, কেহ বলিলেন, কাল, কেহ বলিলেন, সবুজ, এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে বিরুদ্ধ মত উপস্থিত হইল। বিরুদ্ধ মতের জন্য তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। তখন সেই বাগানের মালী আসিয়া এই বিরুদ্ধমতের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাইয়া দিল। মালী বলিল, বহুরূপী যখন যে পদার্থের উপর বসে, তখন সেই পদার্থের অনুরূপ বর্ণ সে ধারণ করে। যখন কৃষ্ণবর্ণ কোন পদার্থের উপর বসে, তখন তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। যখন সে কোন হরিদ্বর্ণ পদার্থের উপর বসে, তখন তাহাকে হরিদ্বর্ণ দেখায়। এই বিভিন্ন অবস্থায় তাহাকে বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। মালী এইরূপে বুঝাইয়া দিলে, যুবকগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেন।

এই প্রকার আর একটী প্রাচীন গল্প আছে। কোন স্থানে চারি পাঁচজন জন্মান্ধ বসিয়াছিল। তাহারা হঠাৎ শুনিল যে, নিকটে এক হস্তী আসিয়াছে। তাহাদের হস্তী দেখিতে ইচ্ছা হইল। তাহারা হস্তী দর্শনের জন্য হস্তীর নিকট গমন করিল। চক্ষু নাই, হস্তী কেমন করিয়া দেখিবে? তাহারা হাত বুলাইয়া হস্তী দেখিতে লাগিল। ঐ রূপে হস্তীদর্শন করিয়া, স্ব স্ব স্থানে আসিয়া তাহারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিল, হস্তী কেমন দেখিলে ভাই? কেহ বলিল, হস্তী থামের মত। আর এক জন বলিল, কখনই না; হাতী ঠিক্ চামরের মত। আর একজন বলিল, কখন না; হাতী একটা ঢাকাই জালার মত। তখন আর এক ব্যক্তি প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তোমরা

* এই বক্তৃতাটী ১৩ই মাঘ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে প্রদত্ত হইয়াছিল।

যাহা দেখিয়াছ, সকলই ভুল। বাস্তবিক আমি বলিব, হাতী কিরূপ? হাতী ঠিক কুলার মত। এইরূপে সেই জন্মান্ধদিগের মধ্যে ঘোরতর বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। তখন একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সেখানে আসিয়া তাহাদের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন যে, "তোমারা যে যাহা বলিতেছ, সকলই মিথ্যা অথচ সত্য। যিনি বলিতেছেন যে, হাতী থামের মত, তিনি হাতীর পা দেখিয়াছেন। যিনি বলিতেছেন যে, হাতী চামরের মত, তিনি হাতীর পুচ্ছ দেখিয়াছেন। যিনি বলিতেছেন যে, হাতী ঢাকাই জালার মত, তিনি হাতীর উদর দেখিয়াছেন। আবার যিনি বলিতেছেন যে, হাতী কুলার মত, তিনি হাতীর কর্ণ দেখিয়াছেন। সকলেরই ভ্রান্তি হইয়াছে। ভ্রান্তি আংশিক দর্শনের ফল। ভ্রান্তি হইয়াছে, অথচ ভ্রান্তির মধ্যেই সত্য রহিয়াছে। এইরূপে, সেই চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তাহাদের বিরুদ্ধ মতের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিলেন।

সত্যের সঙ্গে সত্যের সামঞ্জস্য আছেই আছে। যদি না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটা মিথ্যা, ও অপরটী সত্য। আলোকে ও অন্ধকারে কি মিলন সম্ভব? কখনই না। সত্যের সঙ্গে সত্যের মিলন, সত্যের সঙ্গে সত্যের সামঞ্জস্য সম্ভব। কেন না, সকল সত্য একই মূল হইতে আসিতেছে। সেই এক সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে সকল সত্য আসিতেছে।

অদ্য যে কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিব, তন্মধ্যে, প্রথম সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ। এ দুয়েতেই সত্য আছে। সুতরাং দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। নিরাকার উপাসক! ভয় পাইবেন না। আমি সাকার উপাসনা সমর্থন করিতে যাইতেছি না। আমি চিরদিনই সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে গুলি গোলা বর্ষণ করিয়াছি, এখনও করিতেছি।

সাকার বিষয়ে যাহাই কেন বলিনা, মূর্ত্তিপূজা মানি না। অনন্তের মূর্ত্তি অসম্ভব। গণিত শাস্ত্রানুসারে অসম্ভব। সোণার পাথর বাটী, তেঁতুলের আমসত্ত্ব যেমন, অনন্তের মূর্ত্তিও সেইরূপ। মূর্ত্তি হইলেই পরিমিত হইবে, সুতরাং অনন্তের মূর্ত্তি অসম্ভব কথা।

এই বহির্জ্জগৎ কি? পরব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তির প্রকাশ। না হইতে হাঁ হয় না। কিছুই ছিল না, তাহা হইতে কিছু হইল, ইহা অসম্ভব। সাংখ্যদর্শন বলিতেছেন, 'নাসদসজ্জায়তে।' মহিষের শৃঙ্গ হয়, মানুষের হয় না কেন? মহিষের দেহে এমন কিছু শক্তি আছে, যাহা শৃঙ্গরূপে পরিণত হয়। মনুষ্যদেহে তাহা নাই, সেইজন্য মানুষের শৃঙ্গ হয় না।

ঐ বৃক্ষটীর বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন। উহার উৎপত্তি কিরূপে হইল? ছিল, ব্রহ্মশক্তি, হইল বৃক্ষ। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা বলেন, মায়ার বিকার। অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ।

লোকে বলে, নিরাকার ব্রহ্ম কেমন করিয়া ভাবিব? আমি বলি, প্রথমাবস্থায় সাকার পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সেই নিরাকার ব্রহ্মকে চিন্তা কর। একদিন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনিও সেই কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, প্রাচীনকালের ঋষিদের ঐ প্রকার হইয়াছিল। তাঁহারা

প্রথমে বহির্জ্জগতে ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলেন; পরে তাঁহারা আত্মাতে পরমাত্মার দর্শনলাভ করিলেন। ঐ বৃক্ষকে ভাব। ঐ বৃক্ষে পরমেশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, দয়া, প্রেম সকলই প্রকাশিত। কেবল তাঁহার গুণ সকল নহে, তিনি স্বয়ং ঐ বৃক্ষে প্রকাশিত। ঐ বৃক্ষকে প্রকৃত ভাবে দেখিলে ব্রহ্মকে দেখা হয়। ঐ বৃক্ষ সম্বন্ধে যাহা, সমস্ত বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে তাহাই। এ জগৎ সাকার ও নিরাকারে জড়িত।

দ্বিতীয় কথা, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদ কি? অদ্বৈতবাদই বা কি? আমরা বলি 'সত্যং'। তিনি একমাত্র সত্যস্বরূপ। তিনি ভিন্ন আর কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যেমন আমার চিন্তা সকলের উৎপত্তি ও স্থিতি আমার মধ্যেই, আমাকে ছাড়িয়া সে সকলের স্বতন্ত্র সত্তা অসম্ভব, সেইরূপ এক পরব্রহ্মে সকল জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি, তাঁহাকে ছাড়িয়া এ সকলের স্বতন্ত্র সত্তা-সম্ভব নহে। এ সকল তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন তরঙ্গসকলের উৎপত্তি ও স্থিতি, নদী ও সমুদ্রে, সেইরূপ এই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি পরব্রহ্মরূপ অকূল সমুদ্রে। যেমন নদী ও সমুদ্রকে ছাড়িয়া তরঙ্গ সকলের স্বতন্ত্র সত্তা সম্ভব নহে, সেইরূপ পরব্রহ্মকে ছাড়িয়া এই বহির্জ্জগতের স্বতন্ত্র সত্তা অসম্ভব। এ জগতে তাঁহারই শক্তি, তাঁহারই জ্ঞান, তাঁহারই মঙ্গলভাব প্রকাশিত। তাঁহার শক্তি, জ্ঞান ও মঙ্গলভাবকে ছাড়িয়া তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব নহে, সুতরাং বলিতে হইবে, এ সকল তাঁহারই প্রকাশ। এ সকল সেই অনন্তের পরিমিত প্রকাশ। সেই অনন্ত ব্রহ্ম দেশ-কালে অবতীর্ণ। অদ্বৈতবাদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহা তাহাই।

আবার দেখুন, জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয়; জগৎ অসত্য, জগৎ অসার, ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম সার; জগৎ অনিত্য, ব্রহ্ম নিত্য; জগতের সকল পদার্থই ক্ষণভঙ্গুর, ব্রহ্ম ধ্রুব পদার্থ। জগৎ পরিমিত, ক্ষুদ্র; ব্রহ্ম অনন্ত, পূর্ণ। সুতরাং জগৎ কেমন করিয়া ব্রহ্ম হইবে? পূর্ব্বের দৃষ্টান্ত এ স্থলেও গ্রহণ করুন। যেমন আমার চিন্তা ও ভাব সকল আমি নহি, সেইরূপ এই জগৎ ও ইহার অন্তর্গত পদার্থ সকল ব্রহ্ম নহে। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ সকল সমুদ্র নহে, সেইরূপ এই জগৎ সকল, ব্রহ্ম নহে। জগৎ পরিমিত, অসার, অনিত্য ও অধ্রুব পদার্থ। ব্রহ্ম অনন্ত, সার, নিত্য ও ধ্রুব পদার্থ। সুতরাং জগৎ কেমন করিয়া ব্রহ্ম হইবে? দ্বৈতবাদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহা ইহাই।

পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষিগণ এই তত্ত্বটী কেমন পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছিলেন! মহর্ষি উপনিষদে বলিতেছেন যে, সকলই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সকল পদার্থের সহিত এক। আবার বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম এ সকলের কিছুই নহেন। আবার বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম যেমন জগতের অন্তরে, সেইরূপ, তিনি জগতের বাহিরে। উপনিষদের মধ্যে এই তিন প্রকারের শ্লোকই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(ক) সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম। মাণ্ডুক্য ২

এই সমুদয়ই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম।

(খ) ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্। মুণ্ডক ২।২।১১

এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই এই জগৎ।

(গ) হংসঃ শুচিষদ্‌বসুরন্তরিক্ষসদ্‌ধোতা বেদিষদতিথি দুরোণসৎ। নৃষদ্ বরসদৃতসদ্ ব্যোম সদজ্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্ বৃহৎ॥ কঠ, ৫।২

তিনি আকাশবাসী সূর্য্য, অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, বেদীবাসী অগ্নি, ও কলসবাসী সোমরস। তিনি মনুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ও আকাশে আছেন। তিনি জলে উৎপন্ন হয়েন, পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েন, যজ্ঞে উৎপন্ন হয়েন, এবং পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়েন। তিনি সত্য ও মহান্।

আবার সেই উপনিষদে মহর্ষি বলিতেছেন, এ সকলের কিছুই ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্ম সমুদয় পদার্থ হইতে ভিন্ন।

(ক) যদ্বাচা নভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
কেন, ৪

যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হন না, যাঁহা কর্ত্তৃক বাক্য প্রকাশিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে এই যে, (পরিমিত) বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

(খ) অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
কেন, ৩

তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তাবৎ বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন।

তিনি জগতের অন্তর্ভুত হইয়া আছেন, অথচ তিনি জগতের অতীত, এরূপ ভাবের শ্লোকও উপনিষদে রহিয়াছে।

(ক) অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
কঠ, ৫।৯

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপ ভেদে তত্তদ্রূপ হইয়াছেন, এবং (সমুদয় পদার্থের) বাহিরেও আছেন।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥
শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৭

সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তির প্রকাশক, সমুদয় ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের মহৎ শরণকে ব্রহ্মবাদিগণ কীর্ত্তন করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই সকল জগৎ ব্রহ্মের শক্তি, জ্ঞান ও মঙ্গলভাবের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং এ সকল তাঁহা হইতে অভিন্ন। তাঁহাকে ছাড়িয়া এ সকলের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সকলই তাঁহার সত্তায় সত্তাবান। সুতরাং এ স্থলে অদ্বৈতবাদের সত্য দেখিতেছি। অদ্বৈততত্ত্ব বুঝিতেছি।

আবার দেখিতেছি যে, এ সকল ব্রহ্মশক্তির সাময়িক, ও পরিমিত প্রকাশ মাত্র। এ সকল সসীম, জন্মমরণধর্ম্মশীল। সুতরাং ইহার কিছুই ব্রহ্ম হইতে পারে না। সুতরাং এস্থলে দ্বৈতবাদের তত্ত্ব দেখিতেছি। অদ্বৈততত্ত্ব ও দ্বৈততত্ত্ব এক সঙ্গেই দেখিতেছি। উভয়েরই সামঞ্জস্য সুস্পষ্টরূপে বুঝিতেছি।

কিন্তু এ সকল কথা বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে বলা হইল। অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য কিরূপ? এ বিষয়টী বুঝিতে হইলে আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি বুঝা আবশ্যক। আমাদের জ্ঞান যে পরিমিত, তাহা বলা অনাবশ্যক। আমাদের জ্ঞান এতই সংকীর্ণ যে, ঐ প্রাচীরের ওদিকে কি আছে, বলিতে পারি না। পর মুহূর্ত্তে কি হইবে বলিতে পারি না। এইত ক্ষুদ্র আমাদের জ্ঞান। স্পষ্টই দেখিতেছি, আমাদের জ্ঞান সসীম, এবং সেই জন্য আমরা সর্ব্বদাই ভ্রমপ্রমাদে পতিত হই।

আবার দেখুন, জ্ঞানের আর একটা দিক্ আছে। সে দিকে জ্ঞান অসীম। আমাদের দেশ কাল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের স্বরূপ,

যখন আলোচনা করি, তখন সসীমের মধ্যে অসীম দেখিতে পাই। আমাদের সসীমের জ্ঞান আছে। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত, সহজ সত্য। কিন্তু সসীমের জ্ঞানের মধ্যেই অসীমের জ্ঞান বর্ত্তমান। আমাদের সীমার জ্ঞান আছে, ইহা নিশ্চয়। সীমার জ্ঞান যখন আছে, তখন সীমার অতীত যাহা, তাহারও জ্ঞান নিশ্চয় আছে। দেশ ও কাল সম্বন্ধে, সীমা এবং সীমাতীত, এই এই উভয়েরই জ্ঞান আমাদের রহিয়াছে।

পরিমিত দেশখণ্ড ভাবুন। উহার সীমার ওপারে দেশ নাই, ইহা আমরা ভাবিতেও পারি না। তোমার মনকে বামে, দক্ষিণে, অধঃ ঊর্দ্ধে, যে দিকে কেন প্রেরণ কর না, কোন দিকেই আকাশের সীমা পাইবে না। অনন্তদেশে আমাদের জ্ঞান ছড়াইয়া পড়িবে। ঐ যে বৃক্ষটী দেখিতেছি, উহা পরিমিত দেশখণ্ডে রহিয়াছে। কিন্তু আমরা কি ঐ পরিমিত দেশখণ্ডকে অনন্তদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি? ঐ পরিমিত দেশখণ্ডকে অনন্তদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবিতে পারি? কখনই না।

আমরা দেশকে সীমাবদ্ধ বলিয়া ভাবিতে পারি। কিন্তু যখনই সীমা ভাবি, তখনই বাস্তবিক আমি সীমার অতীত হইয়া যাই। সীমার জ্ঞান যাহার আছে, সীমাতীতের জ্ঞানও তাহার নিশ্চয়ই আছে। সসীমের জ্ঞান যাহার আছে, অসীমের জ্ঞান তাহার নিশ্চয়ই আছে। সসীমের জ্ঞান ভিন্ন অসীমের জ্ঞান সম্ভব নহে, আবার অসীমের জ্ঞান ভিন্ন সসীমের জ্ঞান সম্ভব নহে। সীমাকে যখন জানিতেছি, তখন সীমার অতীতকেও জানিতেছি।

ইহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না সসীম ও অসীম, এ দুই আপেক্ষিক জ্ঞান। সসীমের জ্ঞানের মধ্যে অসীম, আবার অসীমের জ্ঞানের মধ্যে সসীম। যেমন, দীর্ঘ বলিলেই হ্রস্ব বুঝায়, এবং হ্রস্ব বলিলেই দীর্ঘ বুঝায়, সেইরূপ সসীম বলিলেই অসীম বুঝায়, এবং অসীম বলিলেই সসীম বুঝায়।

দেশ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কাল সম্বন্ধেও তাহাই। কাল আছে, ঘটনা নাই; ঘটনা আছে, কাল নাই, এ দুই অসম্ভব। কাল আছে, কিন্তু কিছু ঘটিতেছে না; ঘটনা ঘটিতেছে, অথচ কালে নয়, ইহা কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং বর্ত্তমান কাল বলিলে, বর্ত্তমান ঘটনা বুঝিতে হয়। আবার দেখুন, বর্ত্তমান ঘটনার পূর্ব্বে অবশ্য কাল আছে। কাল আছে; সুতরাং মনে করিতে হয় যে, ঘটনা আছে। আবার সে ঘটনার পূর্ব্বে অবশ্য কাল আছে; কাল আছে, সুতরাং ঘটনা আছে। আবার সে ঘটনার পূর্ব্বেও কাল আছে। সুতরাং ঘটনা আছে। এই রূপে কালের শেষ এবং ঘটনার শেষ পাইবেন না। অনাদি কাল ও অনাদি ঘটনাশ্রেণীর মধ্যে আমাদের জ্ঞান বিস্তারিত হইয়া পড়ে।

ভূতকাল সম্বন্ধে যেরূপ, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ। বর্ত্তমান ঘটনার পরে অবশ্য কাল আছে। কাল আছে, সুতরাং ঘটনা আছে। আবার সে ঘটনার পরেও অবশ্য কাল আছে। সুতরাং ঘটনাও আছে। এইরূপে কালের শেষ এবং সর্ব্ব শেষ ঘটনার নাগাল পাওয়া যায় না। অনন্ত কাল ও অনন্ত ঘটনার মধ্যে আমাদের জ্ঞান ছড়াইয়া পড়ে।

অনন্ত বা অসীম কাহাকে বলে? যাহা সীমাকে অতিক্রম করে, তাহাই অনন্ত বা

অসীম। অথবা এরূপ বলিলেও হয় যে, যাহা সমীম অপেক্ষা বড়, তাহাই অসীম বা অনন্ত। আমাদের জ্ঞান, দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে, ছাড়াইয়া যায়, সীমাতীত দেশ ও কালে বিস্তারিত হইয়া পড়ে, সুতরাং আমাদের জ্ঞান, দেশ ও কাল সম্বন্ধে, এক ভাবে, অনন্ত ও অসীম।

কেবল তাহাই নহে। জ্ঞান, অনাদি, অনন্ত দেশ ও কালকে সম্ভব করিতেছে। একটী দেশখণ্ড মনে কর। তাহার অবশ্য অংশ আছে। সেই দেশখণ্ডকে যতই ক্ষুদ্র অংশে কেন বিভক্ত কর না, তাহার অবশ্য অংশ থাকিবে। ঐ ক্ষুদ্র অংশকে খণ্ড খণ্ড কর, তথাচ অংশ থাকিবে। খণ্ড করার শেষ হইবে না। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রত্যেক দেশখণ্ড অনন্ত অংশের সংযোগ।

আবার যত বড় দেশখণ্ডকে মনে করনা কেন, তাহার সহিত আরও দেশখণ্ডের যোগ রহিয়াছে। আকাশের পর আকাশ, তাহার পর আকাশ—সীমা নাই। দেশ কেবল অনন্তের যোগ।

দেশের ন্যায় কালও কেবল অনন্ত সংযোগ। কাল কেবল পূর্ব্ব ও পরের সম্বন্ধ বা যোগ। কালের পর কাল, ঘটনার পর ঘটনা। কাল, কেবল এইরূপ অনাদি ও অনন্ত সংযোগ।

দেশ ও কাল কেবল অনন্ত সংযোগ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কে সংযোগকারী? কাহার দ্বারা সংযোগ হইতেছে? সংযোগকারী জ্ঞান। সংযোগ ভিন্ন দেশ ও কাল সম্ভব নহে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞান, দেশ ও কালকে সম্ভব করিতেছে। জ্ঞান, কেবল আপনার মধ্যে অনাদি অনন্ত দেশ ও কালকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এমন নহে; জ্ঞান অনাদি অনন্ত দেশ ও কালকে সম্ভব করিতেছে।

এখন দেখুন, আমরা সৃষ্ট জীব। যাহা সৃষ্ট, তাহা অবশ্য সসীম। তাহা সসীম, তাহা সসীমকেই জানিতে পারে। সমীম হইয়া অসীমকে জানা অসম্ভব। যাহাতে যাহা নাই, সে তাহা কেমন করিয়া জানিবে? সসীম যে, সে অসীমকে জানিতে পারে না। সসীম, সসীমকেই জানিতে পারে। কিন্তু সসীম, সসীমকে সমীমরূপে জানিতে পারে না। কেননা সসীমকে, সসীমরূপে জানিলেই অসীকে জানা হইল। কেননা, সসীম ও অসীম আপেক্ষিক জ্ঞান। একই জ্ঞানের দুই দিক্। একটীকে জানিলেই আর একটীকে জানা হয়।

আমরা যখন সসীম, তখন অসীমকে কেমন করিয়া জানিব? কিন্তু আমরা অসীমকে জানিতেছি। সসীমকে জানিলেই অসীমকে জানা হয়। আমরা অসীমকে জানিতেছি। এই অসীমের জ্ঞান আমাদের মধ্যে কেমন করিয়া সম্ভব হইল? ইহা বলিতেই হইবে যে, যিনি অসীম, অনন্ত, তাঁহারই জ্ঞান আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে।

এখন দেখুন, যে জ্ঞান অনাদি, অনন্ত দেশ ও কালকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, যে জ্ঞান অনাদি ও অনন্ত দেশ কালকে সম্ভব করিতেছে, তাহা আমাদের অন্তরে। যিনি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' তিনি স্বয়ং আমাদের অন্তরে আপনার আভাষ প্রকাশ করিতেছেন।

আবার দেখুন, জ্ঞান সম্বন্ধে যেমন, প্রেম সম্বন্ধেও সেইরূপ। একটী পুরাতন

ব্রহ্ম সঙ্গীতে কেমন একটী সুন্দর কথা রহিয়াছে!

এক ভানু অযুত কিরণে,
উজলে যেমতি, সকল ভুবন,
তোমার প্রেম হইয়া শতধা
বিরচয়ে সতীর প্রেম,
জননীহৃদয়ে করে বসতি।"

কি সুন্দর কথা! ইহা কেবল কবিত্ব নয়, সত্য। কবিত্বের আকারে সত্য প্রকাশ হইয়াছে।

মানবের প্রেম কি তাহার নিজের? প্রেমময়ের প্রেম মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই প্রেমসিন্ধুর এক বিন্দু, মাতৃহৃদয়ে পতিত হইয়াছে, সেই জন্য মাতৃস্নেহ এমন অপূর্ব্ব, এমন নিষ্কাম, এমন পবিত্র পদার্থ। তাঁহারই প্রেম মাতৃহৃদয়ে মাতৃস্নেহ; তাঁহারই প্রেম, দয়ালুর হৃদয়ে দয়া; তাঁহারই প্রেম, বন্ধুর হৃদয়ে, বন্ধুতা। তাঁহারই প্রেম, সাধ্বী সতীর অন্তরে, পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের আকার ধারণ করিয়াছে। যিনি প্রেমময়, তিনি আর তাঁহার প্রেম, কি স্বতন্ত্র থাকিতে পারে? যেখানে তাঁহার প্রেম, সেখানেই তিনি। তিনি মাতৃহৃদয়ে পরমমাতা, পিতৃহৃদয়ে পরমপিতা, বন্ধুর হৃদয়ে পরমবন্ধু, দয়ালুর হৃদয়ে পরম দয়াল রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এখন দেখুন, যেমন জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া, মানব অন্তরে সেই অনন্ত জ্ঞানের আভাষ দেখিলাম, সেইরূপ সেই প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর প্রেমরূপেও সেখানে অবতীর্ণ।

"কারে বল্‌বো কে কর্‌বে রে প্রত্যয়।
এই মানুষে আছে সত্য নিত্য চিদানন্দময়॥

এ স্থলে আর একটী প্রয়োজনীয় কথা বলি। ব্রাহ্মসমাজ বহু কাল হইতে বিশ্বাস করিতেছেন ও প্রচার করিতেছেন যে, বিবেক পরমেশ্বরের বাণী। এ কথা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে রহিয়াছে। বিবেক পরমেশ্বরের বাণী, বহু দিন হইতে ইহা ব্রাহ্মসমাজের মত।

এস্থলে দেখুন, বিবেক, যেমন এক দিকে পরমেশ্বরের বাণী, সেইরূপ, আবার উহা আমাদের মনের বা জ্ঞানের একটা অবস্থা। এক দিকে যেমন উহা পরমেশ্বরের বাণী, সেইরূপ আবার উহা আমাদের মনোবৃত্তি বা মনের ভাব। এক দিকে উহা পরমেশ্বরের বাণী, আর একদিকে উহা আমাদের নৈতিক বৃত্তি। সুতরাং দেখুন, আমাদের অন্তরে দ্বৈত ও অদ্বৈতের কি আশ্চর্য্য সমাবেশ! যাহা পরমেশ্বরের বাণী, তাহাই আবার আমাদের মনের ভাব!

দ্বৈতবাদ কি? জগৎ ও ব্রহ্মের ভিন্নতা। অদ্বৈতবাদ কি? জগৎ ও ব্রহ্মের একত্ব। স্থূল ভাবে ও সংক্ষেপে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের এইরূপ লক্ষণা করা যাইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই দুই বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য কি? যাহা বলা হইয়াছে, তাহতেই বুঝা যাইতেছে যে, এ দুই মতের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে।

যাঁহারা বলেন যে, জগৎ ও ব্রহ্ম ভিন্ন, তাঁহারা দ্বৈতবাদী। তাঁহাদের কথা কি অমূলক? বাস্তবিক কি জগৎ ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহে? জগৎ অসার, ব্রহ্ম সার; জগৎ অসত্য, ব্রহ্ম সত্য; জগৎ অনিত্য, ব্রহ্ম নিত্য; ইহাই যখন হইল, তখন জগৎ ও ব্রহ্ম ভিন্ন নয় তো কি? দ্বৈতবাদী যাহা বলেন, সে কথা অমূলক বলিয়া কেমন করিয়া অস্বীকার করিব?

তবে কি দ্বৈতবাদই সত্য, অদ্বৈতবাদ

অসত্য? না, তাহা কি করিয়া বলিব? অদ্বৈতবাদের মধ্যে অমূল্য সত্য দেখিতে পাইতেছি। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এ জগৎ ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ। তদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু গুণকে ছাড়িয়া পদার্থ, শক্তিকে ছাড়িয়া শক্তিমান কি কখন থাকিতে পারে? কখনই না। সুতরাং বলিতেই হইবে, ইহা ব্রহ্মেরই প্রকাশ। এ জগতে তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার দয়া, তাঁহার প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, শক্তিরূপে, জ্ঞানরূপে, দয়ারূপে, প্রেমরূপে ব্রহ্ম প্রকাশ পাইতেছেন। ভারতের প্রাচীন মহর্ষি বলিতেছেন;—"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ঐ বৃক্ষটীকে প্রকৃত ভাবে দেখিলে ব্রহ্মকে দেখা হয়। কেননা উহা তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, দয়া ও প্রেমের প্রকাশ। ইহাই অদ্বৈতবাদের সত্য।

আবার দ্বৈতবাদের সত্য উহার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষ এক সময় ছিল না, এক সময় থাকিবে না, উহা ব্রহ্মশক্তির সাময়িক ও পরিমিত প্রকাশ মাত্র, উহা অনিত্য পদার্থ, সুতরাং উহা ব্রহ্ম নহে। জগতের প্রত্যেক পদার্থ ও সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে এ কথা সত্য। সর্ব্বত্রই দ্বৈত ও অদ্বৈতের সত্য বর্ত্তমান।

বাহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে যাহা, অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধেও তাহাই। এই পরিমিত জীবের মধ্যে, আমাদের পরিমিত জ্ঞানের মধ্যে, সেই অনন্ত জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছেন। ইহা অখণ্ডনীয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা এক দিকে যেমন অল্পবুদ্ধি, ভ্রমপ্রমাদ বিশিষ্ট জীব, আবার আমাদেরই মধ্যে, আমাদেরই জ্ঞানরূপে সেই অনন্ত জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছেন! সেই জন্য মানুষের ভিতরে, দ্বৈত অদ্বৈত উভয়ই বর্ত্তমান।

আবার নৈতিক প্রকৃতি, ধর্ম্ম প্রকৃতির মধ্যে দেখিতেছি যে, যাহা আমার বিবেক, বা ধর্ম্মবুদ্ধি, তাহাই পরমেশ্বরের বাণী। এক দিকে আমি দুর্ব্বল, পাপী, অপরাধী জীব, অন্যদিকে আমারই অন্তরে, আমারই ধর্ম্মবুদ্ধিরূপে, সেই ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর অবতীর্ণ। এখানে দ্বৈত ও অদ্বৈতের কি আশ্চর্য্য সমাবেশ! ইহাই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য। বহির্জ্জগতে দ্বৈত ও অদ্বৈতের সামঞ্জস্য, অন্তর্জ্জগতেও দ্বৈত ও অদ্বৈতের সামঞ্জস্য।

তাহার পর তৃতীয় কথা, অবতার মানিনা ও অবতার মানি। অবতার মানি না, তাহা কিরূপে? দেশকালে বদ্ধ অবতার মানি না। ব্রহ্ম স্বয়ং আসিয়া পৃথিবীতে দেহ ধারণ করেন, ইহা মানি না। এমত ব্রহ্ম স্বরূপের বিরুদ্ধ। অযোধ্যা, বা মথুরা বা বেথেল হেমে মনুষ্যরূপে পূর্ণব্রহ্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা মানি না।

তবে কি মানি? ইহাই মানি যে, তিনি সকল ভুবনে অবতীর্ণ। তিনি মানবের অন্তরে অবতীর্ণ। শক্তিরূপে, জ্ঞানরূপে, আনন্দরূপে, দয়ারূপে, প্রেমরূপে, পবিত্রতা রূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ। তিনি অন্তরে শুদ্ধ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ। এই মহা বিশ্বজনীন অবতার স্বীকার করি ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণাম করি।

লোকে বিশ্বাস করেন যে, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে, বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রহিয়াছেন। অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় কি বিশ্বাস করি? করি না, অথচ করি। আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইত্যাদি বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু বিশ্বাস করি যে, এক দেবতা আকাশে, পৃথিবীতে, জলে, বায়ুমণ্ডলে, পর্ব্বতে, নদীতে, সর্ব্বত্র অধিষ্ঠাত্রী হইয়া রহিয়াছেন।

দুই কথাই সত্য। অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মত সত্য, অথচ অসত্য। ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নাই। এক পূর্ণব্রহ্ম, জগতের প্রত্যেক বিভাগে অধিষ্ঠাত্রী হইয়া রহিয়াছেন।

পৌত্তলিকতা অখণ্ড পরমেশ্বরকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, শিব সংহারকর্ত্তা, গণেশ সিদ্ধিদাতা, ষষ্ঠি শিশুদিগের কল্যাণকারিণী, এই রূপ বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন কার্য্য। তাঁহারা বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তা। তাঁহাদের Jurisdiction ভিন্ন ভিন্ন। ইহা মহাভ্রম। ব্রহ্মের বিশ্বজনীন অধিষ্ঠান হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, মানুষ ঐ প্রকার কল্পনা করিয়াছে। অজ্ঞানপ্রসূত কল্পনা, ব্রহ্মের বিবিধ গুণ ও শক্তিকে, ব্যক্তিত্ব দিয়া, বিভিন্ন দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে। অখণ্ডকে বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিয়াছে। ইহাই দেশপ্রচলিত ধর্ম্মের মহাভ্রম।

ইহা যেমন ভ্রম, সেইরূপ আবার প্রচলিত উপধর্ম্মের মূলে ঐ টুকু সত্য বীজরূপে স্থিতি করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর তাঁহার First Principles নামক গভীর গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন;—"There is a soul of truth in things erroneous." ভ্রমসঙ্কুল বিষয়ের মধ্যেও সত্যের আত্মা স্থিতি করিতেছে।

ঐ শীশক্তিকে, খণ্ড খণ্ডরূপে দেখাই ভ্রান্তি। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই পালনকর্ত্তা, তিনিই সংহারকর্ত্তা, তিনিই সিদ্ধিদাতা, তিনিই শিশুগণের কল্যাণকারী, তিনি যুবা, বৃদ্ধ, নর নারী সকলের কল্যাণকারী। বহু নয়, এক।

এখন সেই মূল কথায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। এক পূর্ণব্রহ্ম, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ। এইরূপ অবতার মানি। আমি বলিয়াছি যে, পরমেশ্বর মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে অবতার হন, এ মত মানিনা। দেশ কালে বদ্ধ অবতার মানি না। কিন্তু এ মতের মূলেও সত্য আছে।

ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তিরূপে লিখিত আছে, "সম্ভবামি যুগে যুগে।"

ঐ বাক্যের অর্থ এ প্রকার নহে যে, পরমেশ্বর মনুষ্যরূপে, যুগে যুগে, পৃথিবীতে অবতার হন। উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর পৃথিবীর কল্যাণের জন্য বিশেষ বিশেষ মানবে তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম প্রেরণ করেন। এই সকল ব্যক্তিদ্বারা জগতের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। বুদ্ধদেব, সক্রেটিস, যীশু, সেণ্টপল, মার্টিন লুথর, বাবা নানক, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন রায়, থিওডোর পার্কার প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক। মানুষের কি শক্তি আছে? এই সকল মহাপুরুষ এ জগতে যে মহা কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূলে ঐশীশক্তি। এই সকল মহা পুরুষকে এক ভাবে অবতার বলা হয়। কেননা, তাঁহাদের মধ্যে পরমেশ্বরের শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম অবতীর্ণ হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করে। "সম্ভবামি যুগে যুগে" এ বাক্যের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। ভাগবতে আছে, "অবতারাহ্যসংখ্যয়া।" ঈশ্বরানুপ্রাণিত মহাজনগণকে এক ভাবে

অবতার বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে।

চতুর্থ কথা, সাধারণ বিধান ও বিশেষ বিধান। অনেকে বলেন, পরমেশ্বর সাধারণ নিয়মে জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। বিশেষ কিছু নাই। সকলই সাধারণ। সকল জগতের পক্ষে, সমগ্র মনুষ্যজাতির পক্ষে বিশেষ কিছু নাই। বিশ্বজনীন প্রণালীতে, সাধারণ নিয়মে সর্ব্বত্র কার্য্য হইতেছে। যাঁহারা এই সাধারণ বিধানবাদী, তাঁহারা বিজ্ঞানের সাক্ষ্যদ্বারা আপনাদের মত সমর্থন করেন। যাহা প্রকৃতির নিয়ম, তাহা সকলের পক্ষে সমান। তোমার, আমার জন্য বা কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য ভগবানের কোন বিশেষ নিয়ম নাই। সাধারণ বিধানবাদীগণ, কোন বিশেষ নিয়ম বা বিশেষ বিধানে বিশ্বাস করেন না। সাধারণ নিয়মে ভূমি হইতে বৃক্ষ লতা, ফল শস্য উৎপন্ন হইতেছে, সাধারণ নিয়মে নদী সকল সাগরসঙ্গমে ধাবমান হইতেছে, সাধারণ নিয়মে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সাধারণ নিয়মে অগ্নি দগ্ধ করিতেছে, সাধারণ নিয়মে সূর্য্য চন্দ্রের উদয়াস্ত হইতেছে। সকলই সাধারণ নিয়ম। সময়ে সময়ে যে সকল প্রাকৃতিক উৎপাত উপস্থিত হয়, তাহাও সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। ঝঞ্ঝা ঝটিকা, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সকলই সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। বিশেষ কিছু নাই।

যাঁহারা বিশেষ বিধানবাদী, তাঁহারা যে সাধারণ নিয়ম অস্বীকার করেন, এমন নহে। কিন্তু তাঁহারা ব্যক্তিগত জীবনে বা জাতীয় জীবনে পরমেশ্বরের বিশেষ বিধান স্বীকার করেন।

এই সাধারণ বিধান ও বিশেষ বিধানের মতকে অনেকে পরস্পরবিরুদ্ধ মত বলিয়া মনে করেন। বাস্তবিক কি এ দুই বিরুদ্ধ মত? বিরুদ্ধ বটে, অথচ নয়। যদি বল যে, পরমেশ্বর সাধারণ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া বিশেষ বিধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিশেষ বিধান ও সাধারণ বিধান অবশ্য পরস্পর বিরুদ্ধ। এরূপ স্থলে বিশেষ বিধান, অবশ্য, সাধারণ বিধানের বিরুদ্ধ। কেবল তাহাই নহে, উহা যুক্তিবিরুদ্ধ। প্রাকৃতিক নিয়ম, বিশ্বজীনন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পরমেশ্বর কোন কার্য্য করেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। উহা একান্ত অযুক্ত কথা বলিয়া মনে করি। অপ্রাকৃতিক ক্রিয়া, (Miracle) আমরা মানিনা। যাঁহারা বলেন যে, বিশ্বজনীন নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া পরমেশ্বর বিশেষ বিধান করেন, তাঁহাদের মত মানি না। সেরূপ বিশেষ বিধান মানি না।

কিন্তু বিশেষ বিধানের মত কি সকল স্থলেই যুক্তিবিরুদ্ধ? কখনই না। যদি এমন বলা যে, সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ভগবান্ বিশেষ বিধান করেন, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই অযুক্ত কথা। কিন্তু বিশেষ বিধান হইলেই কি উহা সকল স্থলেই সাধারণ বিধানের বিরুদ্ধ হইবে? কখনই না। এ উভয়ের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

সে সামঞ্জস্য কিরূপ? সাধারণ নিয়মের যখন কোন বিশেষ প্রয়োগ হয়, সাধারণ নিয়মদ্বারা যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়, তখনই বিশেষ বিধান। এরূপ বিশেষ বিধানের সহিত, সাধারণ বিধানের কোন বিরোধ নাই। এরূপ স্থলে, বিশেষ বিধান, সাধারণ বিধানেরই অন্তর্গত।

কোন ব্যক্তির পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসক বলিলেন, রোগীকে যে ঔষধ দেওয়া হইবে, তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য পাতি লেবুর বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু সে সময়ে, ও সে প্রদেশে পাতি লেবু দুর্লভ। অথচ পাতি লেবুর দ্বারা যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে, তাহা না হইলে, সেই পীড়িত ব্যক্তির জীবন রক্ষা হওয়া সুকঠিন। এমন সময়ে, দূরদেশ হইতে কতকগুলি পাতি লেবু আসিয়া উপস্থিত। পীড়িত ব্যক্তির কোন আত্মীয় উহা পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পীড়ার বিষয় এবং উক্ত পীড়ায় যে পাতি লেবু একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা তিনি জানিতেন না। লেবু পাইবা মাত্র পীড়িত ব্যক্তি বলিলেন, পরমেশ্বর কৃপা করিয়া উহা পাঠাইয়া দিয়াছেন। পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করিলেন।

পীড়িত ব্যক্তির ঐ কথাটী কি অযুক্ত কথা? কৃপাময় বিধাতার উপর যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনি ঐ প্রকার অবস্থায়, ঐ রূপ কথাতো বলিবেনই। এই যে দূর স্থান হইতে লেবু আসাতে ঐ ব্যক্তির আরোগ্য লাভের উপায় হইল, ইহাই ভগবানের বিশেষ কৃপা বা বিশেষ বিধান। ইহাতে কি কোন সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ হইল? কিছুই না। সাধারণ নিয়মদ্বারাই ব্যক্তিগত জীবনে এই বিশেষ বিধান সম্ভব হইল। সাধারণ নিয়ম দ্বারা বৃক্ষে লেবু ফল উৎপন্ন হইয়াছে, সাধারণ নিয়ম দ্বারা উহা প্রেরিত হইল, এবং সাধারণ নিয়ম দ্বারাই উহা রোগ আরোগ্যের উপায় হইল।

কোন ব্যক্তি মাঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। তিনি কোন কারণে পথ ছাড়িয়া বিপথে চলিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রের আইলের উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। যেমন একটা আইল হইতে অপর একটা আইলে পা দিবেন, অমনি তাঁহার দুই পায়ের মধ্যে সাক্ষাৎ যমোপম এক ভীষণ কেউটিয়া সর্প ফণা তুলিয়া উঠিল। সেই ব্যক্তি উহা দেখিবামাত্র ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। হঠাৎ তাঁহার পরিহিত বস্ত্র খুলিয়া গিয়া সর্পের মস্তকের উপর পড়িল। সর্প চাপা পড়িল। তখন সেই ব্যক্তি বিবস্ত্র অবস্থায় ধাবমান হইয়া, দূরে গিয়া, আত্ম রক্ষা করিল।

এই ঘটনাটী আমার কল্পিত নহে। আমি শুনিয়াছি, ইহা একটী বাস্তব ঘটনা। সর্পদংশন হইতে রক্ষা পাইয়া সেই ব্যক্তির মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, আমি জানি না। কিন্তু সে ব্যক্তি ঈশ্বরভক্ত লোক হইলে, তিনি অবশ্য বলিয়াছিলেন;—"জগদীশ্বর রক্ষা করিলেন!"

ইহাই বিশেষ বিধান। ভগবানের বিশেষ কৃপা। কোন সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কি এই ঘটনা হইল? কিছুই না।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, সামাজিক বা জাতীয় জীবনেও সেইরূপ। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন বিশেষ কৃপা বা বিধান, সামাজিক বা জাতীয় জীবনেও সেইরূপ। অতীত-সাক্ষী ইতিহাস, দেশে দেশে, যুগে যুগে, বিধাতার বিশেষ বিধানের স্বপক্ষে, কোটি কণ্ঠে সাক্ষ্য দান করিতেছে।

সকল দেশের ইতিহাস হইতে এ বিষয়ে শত শত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমি একটীর অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব না। একাধিক সপ্ততি বৎসর পূর্ব্বে যখন এ দেশের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল, যখন কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে

একান্ত শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যুত্থান হইল। তিনি পবিত্র ব্রহ্ম নামের জয় ডঙ্কা বাজাইলেন। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। কুসংস্কারের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্ঞান ধর্ম্মের নির্ম্মল আলোক প্রবেশ করিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও সমাজিক উন্নতি প্রবাহ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। সহস্র প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পৌত্তলিকতার দুর্গের মধ্যে, 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মনামের, জয়পতাকা উড্ডীন হইল। এ দেশের চিরকল্যাণের উৎসস্বরূপ, পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ মন্দির ভাগীরথী তীরে প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সকল ঘটনার মধ্যে আমি কি দেখি? করুণাময় বিধাতার হস্ত। এ জাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা। এ দেশের দুর্দ্দশা বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ বিধান। যখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় ভাবি, তখন তাঁহার সুমহৎ জীবনের মধ্য দিয়া মঙ্গলময়, করুণাময় বিধাতাকেই দেখি। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা, এ দেশের কল্যাণের জন্য বিধাতার বিশেষ বিধান। কিন্তু এই বিশেষ বিধান, কি সাধারণ বিধানকে ভঙ্গ করিয়া হইয়াছে? কখনই না। কোন অপ্রাকৃতিক ক্রিয়া (Miracle) সংঘটিত হয় নাই। সাধারণ নিয়মানুসারেই ভারতের, জগতের মঙ্গলের জন্য ভগবানের এই বিশেষ বিধান।

পঞ্চম কথা, সম্প্রদায় ও অসম্প্রদায়। ইয়োরোপে ও আমাদের দেশে, এমন অনেক শিক্ষিত লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া উচিত নহে। সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে হৃদয় সংকীর্ণ হইয়া যায়, স্বাধীন চিন্তা নষ্ট হইয়া যায়! আপনার দলের মধ্যেই লোকের প্রেম বদ্ধ হইয়া পড়ে, লোকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে প্রেমালিঙ্গন দিতে পারে না। তাঁহারা এই প্রকার মনে করেন। বিলাতে এই প্রকার লোক অনেক আছেন।

কিন্তু এই সকল লোকের কথা কি যুক্তি যুক্ত? তাঁহাদের কথা যে একেবারেই অসার, এমন মনে করি না। সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া অনেক লোক নিতান্তই সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে। তাহাদের হৃদয় ও চিন্তাশক্তি সম্প্রদায়ের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে ঐ প্রকার হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী, সকলকেই যে ঐরূপ হইতে হইবে, এমন কোন কথা নহে। এমন অনেক লোক দেখা যায়, তাঁহারা সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেও তাঁহাদের হৃদয় উদার ও অসাম্প্রদায়িক।

সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কোন কোন দোষের কথা অনেকে বলেন বটে, কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কি প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা নাই? সম্প্রদায় একান্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী। সম্প্রদায়ের উৎপত্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক। মানুষে মানুষে মতের ও ভাবের একতা হইলে তাহারা একত্র হইবে, ইহার তুল্য স্বাভাবিক আর কি আছে? মত ও ভাবের একতা হইতে সহানুভূতির উৎপন্ন হয়, এবং সেই সহানুভূতি মানুষকে মিলিত করে। মত ও ভাবের সহানুভূতি, বহু মনুষ্যকে এক করে। এই রূপে স্বাভাবিক প্রণালীতে সম্প্রদায় সমূহের উৎপত্তি হয়।

সম্প্রদায়সংগঠন স্বাভাবিক ও উপকারী। প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে একটী সংস্কৃত বচন প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ এই যে, সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রে সিদ্ধি হয় না। এ বাক্যের তাৎপর্য্য, বোধ হয়, এই যে, সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে পরস্পরের সাহায্য পাওয়া যায়, সুতরাং সিদ্ধি সহজ হয়। একাকী মানুষ কি করিতে পারে? তাহার শক্তি, তাহার জ্ঞান, তাহার ধর্ম্মভাব কতটুকু? সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিলে, পরস্পরের উপদেশ, পরামর্শ, ধর্ম্মভাব ও চরিত্রের দৃষ্টান্তে, আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার সুবিধা হয়। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, অনেক লোক ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে থাকাতে শুকাইয়া মরিয়াছে। একটা বড় নদীর সহিত যোগ না থাকিলে, খালের জল শুকাইয়া যায়, নষ্ট হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে যে সকল দোষ ঘটিবার কথা অনেকে বলেন, তাহা একবারেই অমূলক নহে। অনেকে দলো হইয়া যায়। উহা ভাল নহে। মিছরি হওয়াই আবশ্যক। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে গিয়া বলিতেন, "দেখিস্, যেন দলে জড়াইয়া মরিস্ না।"

সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে দোষ ঘটে বলিয়া সম্প্রদায় ত্যাগ করা বিধেয় নহে। ত্যাগ করিলে অধিকতর দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। সংসারে অনেক ভাল জিনিস আছে, যাহা মানুষের দোষে মন্দ হয়। মন্দ হয় বলিয়া কি ভাল জিনিস পরিত্যাগ করিব? অগ্নিদ্বারা কত গ্রাম নগর বিনষ্ট হয়। তাহা বলিয়া কি অগ্নির ব্যবহার ত্যাগ করিব? অগ্নি ব্যতীত আমাদের দৈনিক আহার যুটে না। অগ্নি না হইলে জগতের শত শত হিতকর কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। প্রেমের অপব্যবহারে, মানুষের কত অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। তাহা বলিয়া কি নির্ম্মল প্রেম পরিত্যজ্য?

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সাম্প্রদায়িকতা ও অসাম্প্রদায়িকতার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য এই যে, অসাম্প্রদায়িক ভাবে, সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিতে হইবে। সম্প্রদায়ের যাহা উপকার, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, অথচ যে সকল দোষের সম্ভাবনা, তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে হইবে। সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিব, অথচ আমার হৃদয় সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিবে, ইহাই আমার সকল সাধন ভজনের উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। মতভেদ হইলেই হৃদয়ভেদ হয়। ধর্ম্মজগতে ইহা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। পরিতাপের কথা কি বলিব, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও মতভেদের জন্য হৃদয়ভেদ বিরল নহে। এমন উদার, অসাম্প্রদায়িক, প্রেমের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও যদি আমাদের মধ্যে কেবল মতভেদের জন্য হৃদয়ভেদ হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর কি আছে? ইহাতে কেবল আমাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতাই প্রকাশ পায়। মতভেদে হৃদয়ভেদ, ইহাই নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন করে যে, আমরা যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি বলিয়া জগতের নিকট প্রকাশ করিতেছি, বাস্তবিক, আমরা সে পরম ধর্ম্মের যোগ্য নহি।

ষষ্ঠ কথা এই যে, জাতীয়তা ও সার্ব্বভৌমিকতা। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা জাতীয়তার অতিরিক্ত পক্ষপাতী। তাঁহারা মনে করেন যে,

বিজ্ঞান ও শিল্পবাণিজ্য বিষয়ে যাহাই হউক, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে বিদেশীয়দিগের নিকট আমাদের কিছুই শিক্ষা করিবার নাই। যাহার ঘরে প্রচুর অন্ন আছে, সে পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে কেন যাইবে? আমাদের সমাজের তুল্য কি আর সমাজ আছে? আমাদের ধর্ম্মের তুল্য কি ধর্ম্ম আছে? আমাদের প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র সকলের তুল্য কি আর শাস্ত্র আছে? আমরা এ সকল বিষয়ে ভিখারীর ন্যায় কেন পরের দ্বারে যাইব? সমাজ কি ধর্ম্মসম্বন্ধে, বিদেশীয়দের নিকট হইতে আমাদের কিছুই গ্রহণ করিবার নাই। বিদেশীয়েরা এখন আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষা করিতেছেন, আমাদের শাস্ত্রের সমাদর করিতেছেন। ইংলণ্ড, জার্ম্মেনি ও আমেরিকায় আমাদের ধর্ম্ম ও আমাদের শাস্ত্রের চর্চ্চা হইতেছে। আমাদের কিসের অভাব আছে? পরের শাস্ত্র ও পরের ধর্ম্ম হইতে আমাদের কি লইবার আছে? কিছুই না।

এই সকল কথা কি যুক্তিযুক্ত? কখনই না। যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু, উপকারী, যাহা কিছু সত্য, তাহা জাতীয় বা বিজাতীয় কি? তাহা মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। যাহা কিছু আমাদের পক্ষে ভাল, তাহা স্বজাতীয় হউক বা বিজাতীয় হউক, অবশ্য গ্রহণ করিব। কেন না, উহা ভাল। যাহা কিছু আমাদের পক্ষে উপকারী, তাহা অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা বিদেশীয় বা বিজাতীয় হইল, তাহাতে কি? বিদেশীয় বা বিজাতীয় বলিয়া যাহা ভাল ও উপকারী, তাহাও গ্রহণ করিব না, ইহার তুল্য অযুক্ত ও অবিবেচনাসিদ্ধ কথা আর কি আছে? আমাদের দেশের অনেক লোকের এইরূপ একটা ভাব দেখিতে পাই যে, দেশের যাহা মন্দ, তাহাও রক্ষা করিতে হইবে, অথচ বিদেশের যাহা ভাল, তাহা লওয়া হইবে না। এ প্রকার অন্ধ রক্ষণশীলতা, দেশের উন্নতিপক্ষে মহা অন্তরায়।

জাতীয় সত্য ও বিজাতীয় সত্য, সত্যের মধ্যে এরূপ পার্থক্য কখন সম্ভব নহে। সত্যের মধ্যে এরূপ জাতিভেদ নাই। যাহা সত্য, তাহা সকল দেশের জন্য, সকল জাতির জন্য। সত্য, হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খ্রীষ্টিয়ানের নয়, তোমার নয়, আমারও নয়, অথচ সকলেরই। যাহা সত্য, তাহা সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম হইতে আসিয়াছে। সকল সত্যই পরমেশ্বরের সত্য। সমগ্র মানবজাতি তাঁহারই সন্তান। সুতরাং সকল সত্য, মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। সকল সত্য, মানবজাতির পিতৃসম্পত্তি। যেমন, এক সূর্য্য সকল জাতিকে আলোক ও উত্তাপ দিতেছে, সেইরূপ সেই এক সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর, জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে, তাঁহার সকল সন্তানকে সত্যরত্ন বিতরণ করিতেছেন। সত্য কাহারও একচেটিয়া নহে। ইয়োরোপীয় সত্য, মার্কিন সত্য, ভারতবর্ষীয় সত্য, সত্যের এ প্রকার বিভেদ নাই। সত্য, সকল দেশ ও সকল জাতির জন্য। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, কোরাণ, জেন্দ আবেস্তা, বাইবেল, যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে কোন শাস্ত্রে, যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা সমগ্র মানবজাতির জন্য।

রাজা রামমোহন রায় বহু জাতির ভাষা ও বহু সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এই মহা সত্য সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, কোন বিশেষ দেশে, বিশেষ

জাতির মধ্যে, বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ে, বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রে সত্য বদ্ধ নহে। সেই জন্য, তিনি যেমন হিন্দুশাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃত তাঁহার স্বদেশবাসীগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ, আবার যীশুর অমূল্য উপদেশ নিচয় সংগ্রহ করিয়া "Precepts of Jesus, guide to peace and happiness" নামক পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যে এক, বিশ্বজনীন, অসাম্প্রদয়িক ধর্ম্মের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পারসি ভাষায় রচিত, ও আরবি ভাষায় লিখিত এক ভূমিকা সম্বলিত, 'তোহফতুল মোহদীন' নামক গ্রন্থে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন তাঁহার শিষ্যগণকে এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের উপদেশ দিতেন, তখন ভাবাবেশে, তাঁহার গণ্ডস্থল সিক্ত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত।

বিশ্বজনীন সত্য, বিশ্বজনীন ধর্ম্মে বিশ্বাস, ব্রাহ্মসমাজে চিরদিনই রহিয়াছে। যে দেশে, যে শাস্ত্রে, কেন সত্য থাকুক না, তাহাই যে গ্রহণ করা আবশ্যক, সকল সম্প্রদায়ের সাধু মহাত্মাদের চরণতলে বসিয়া যে আমাদিগকে সত্য শিক্ষা করিতে হইবে, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার বহু পূর্ব্বে, ভক্তিভাজন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। দেশ, কাল, পাত্রনির্ব্বিশেষে যে সত্য সংগ্রহ করিতে হইবে, অক্ষয় বাবু কেমন সুস্পষ্ট ও সুন্দররূপে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। ১৭৭৭ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে অক্ষয় বাবুর লেখার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের নিকট পাঠ করিতেছি।

"অখিল সংসারই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস, যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কমট্; যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ ও জলবকার, মুষা ও মহম্মদ এবং যীশু ও চৈতন্য, পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইবে, এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উত্তরোত্তর অনির্ব্বচনীয় রূপ উৎপন্ন হইবে।"

বিশ্বজনীনতা সমর্থন করিয়া অনেক কথা বলিলাম। তবে কি জাতীয়তার প্রয়োজন নাই? তবে কি জাতীয়ভাব কিছুই নয়? এ কথা কে বলে? চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জাতীয় ভাবের একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করেন। তবে, ইহাও বলি যে, যে জাতীয় ভাব, বিশ্বজনীন সত্য ও ভাবের বিরোধী, এমন জাতীয়ভাব চাই না। কিন্তু যে জাতীয় ভাব বিশ্বজনীন ভাবকে বর্দ্ধন ও পোষণ করে, সেরূপ জাতীয় ভাব চাই। বাস্তবিক, প্রকৃত জাতীয় ভাবের সহিত বিশ্বজনীন ভাবের কোন বিরোধ নাই।

বিকাশের (evolution) নিয়মানুসারে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হইতেছে। মানবজাতির সকল বিভাগেই বিকাশের নিয়ম কার্য্য করিতেছে। ধর্ম্ম, বিকাশের নিয়মের বহির্ভূত নহে। সকল বিষয়ে যেমন, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ বিকাশ; (evolution)

সমগ্র মানবজাতির বিকাশ বা ক্রমোন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক জাতির বিকাশ, ঠিক্ যে এক প্রকার, এমন নহে। বিকাশ যে সর্ব্বত্র

একই রূপ আকার ধারণ করিতেছে, এমন নহে। প্রত্যেক জাতির বিশেষত্ব আছে।

ইয়োরোপে দেখুন। জর্ম্মানদিগের চিন্তাশীলতা ও দর্শনশাস্ত্রপ্রিয়তা, আয়ারলণ্ডবাসীদিগের রসিকতা, ফরাসিদিগের ভদ্রতা ও ভব্যতা, স্কটলণ্ডবাসীদিগের দৃঢ়তা, ইংলণ্ডীয়দিগের বাণিজ্যপ্রিয়তা, উদ্যমশীলতা ও রাজভক্তি, ইটালিয়ানদিগের সঙ্গীতপ্রিয়তা ও শিল্পকুশলতা, এই সকল ইয়োরোপীয় বিশেষ বিশেষ জাতির বিশেষত্ব। আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে, "হুজুরে চীন, হুজুগে বাঙ্গালী" জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্বের জন্যই এই প্রকার প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হইয়াছে।

নানা কারণে এক এক বংশের ও এক এক জাতির বিশেষত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। সকল বিষয়ে যেমন, ধর্ম্ম বিষয়েও সেই রূপ। এক এক ধর্ম্মের, এক এক বিশেষ ভাব। খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশেষত্ব কি? নৈতিক বুদ্ধির প্রাধান্য ও পাপবোধ। মুসলমান ধর্ম্মের বিশেষত্ব কি? কঠোর একেশ্বরবাদ ও সকল প্রকার পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ। বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব কি? নির্ব্বাণ ও মৈত্রী। হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব কি? ধ্যান ধারণা ও ব্রহ্মের সহিত তন্ময়ত্ব। প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ভাব, বিশেষ বিকাশ রহিয়াছে। এই প্রকার বিশেষ বিশেষ ভাবাপন্ন প্রত্যেক জাতি ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে লইয়া সমগ্র মানবজাতি, বিশ্বজনীন, অসীম, উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। জাতিগত বিশেষত্ব, সাধারণ ও বিশ্বজনীন উন্নতির বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, ঐ সকল বিশেষত্ব সাধারণ ও বিশ্বজনীন বিকাশকে পোষণ ও বর্দ্ধন করিতেছে।

মানবজাতির সৃষ্টি হইতে এইরূপ বিকাশ ও ক্রমোন্নতি চলিয়াছে। কিন্তু মানবজাতির অন্তর্গত বিভিন্ন বংশে ও জাতিতে, সকল বিষয়ের বিকাশ সমভাবে হয় নাই। প্রত্যেক জাতি, বিশেষ বিশেষ ভাবে, সেই বিশ্বজনীন উন্নতির সাহায্য করিতেছে।

প্রত্যেক সভ্যজাতি তাহাদের বিশেষ ভাবে, জগতের কার্য্য করিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের কি কিছু বিশেষ কার্য্য নাই? উন্নতি পথে, মানব জাতির এই মহাযাত্রার সাহায্য করিবার জন্য আমাদের কি বিশেষ কিছু করিবার নাই? অতি প্রাচীনকাল হইতে, পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ, আমাদের ভক্তিভাজন পিতৃপুরুষ গণ, আমাদের দেহে, বৈজিক নিয়ম (Law of heridity) অনুসারে যাহা কিছু মঙ্গলকর পদার্থ রাখিয়া গিয়াছেন, সমাজে ও শাস্ত্রে যাহা কিছু সার ও সত্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা অবলম্বন করিব, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিব, তাহাই আমাদের বিশেষত্ব। পিতৃপুরুষদের জ্ঞান ও ধর্ম্ম আমরা শিক্ষা করিব। তাঁহারা যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই মূলধন করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিব। উহাই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব। উহাই আমরা জগৎকে দিব।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, জাতীয় ভাবকে ভিত্তি করিয়াই এদেশে ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি নিজে কি বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন।

"The ground which I took in all my controversies was, not that of opposition to Brahminism, but to a perversion of it; and I endeavoured to show that, the idolatry of the Brahmins was contrary to the practice of their ancestors, and the principles of the ancient books and authorities, which they profess to revere and obey." *Autobiographcial Sketch.*

রাজার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া কার্য্য করিয়াছেন।

তৎপরে মহাত্মা কেশবচন্দ্র। কেশব চন্দ্র বিশ্বজনীন ভাবের প্রধান প্রচারক। তথাচ, জাতীয় ভাবকে ভিত্তি করিয়া আমাদের উন্নতি সাধন করিতে হইবে, তিনি তাহা সুস্পষ্ট ও সুন্দর রূপে, বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখা হইতে কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের নিকট পাঠ করিতেছি।

"But the future Church of India must be thoroughly national; it must be essentially an Indian Church. The future religion of the world I have described, will be the common religion of all nations, but in each nation it will have an indigenous growth, and assume a distinctive and peculiar character * * *. No country will borrow or mechanically imitate the religion of another country; but from the depths of the life of each nation its future church will naturally grow up * * * Neither will Germany adopt the religious life of China, nor will India accept blindly that of England or of any other European country. India has, religious traditions and associations, tastes and customs, peculiarly sacred and dear to her, just as every other country has, and it is idle to expect that, she will forego these; nay she cannot do so, as they are interwoven with her very life. In common with all other nations and communities we shall embrace the Theistic worship, creed and gospel of the Future Church,—we shall acknowledge and adore the Holy One, and accept the love and service of God and man as our creed, and put our firm faith in God's almighty grace as the only means of redemption. But we shall do all this in a strictly national and Indian style. We shall see that, the Future Church is not thrust upon us, but that we independently and naturally grow into it; that it does not come to us as foreign plant but that it strikes its roots deep in the national heart of India, draws its sap from our national resources, and develops itself with all the freshness and vigour of indigenous growth." Lecture on *The Future Church.*

এখন সেবকের নিবেদন নামক পুস্তকে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি আপনারা শ্রবণ করুন।

"আমরা আর্য্য ঋষিদিগের নিকট ঋণী। আর্য্য রক্ত যতদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকিবে, ততদিন আমরা প্রাণপণে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিব এবং বিজাতীয় হইব না। আমি এ কথা বলিতেছিনা যে, স্বজাতির পক্ষপাতী হইয়া আমরা স্বজাতীয় ভ্রম, কুসংস্কার, অধর্ম্ম, দুর্নীতি পোষণ করিব।" * *

"আমরা ঈশা, মুষা, মহম্মদ সকলেরই প্রণত ভক্ত, কিন্তু জাতিতে আমরা চিরদিন হিন্দু থাকিব। * * * ব্রাহ্মদিগকে হিন্দু বিরোধী; জাতিচ্যুত, বিধর্ম্মী বলিয়া নিন্দা করা সঙ্গত নহে—সত্য নহে। বাস্তবিক ব্রাহ্মেরাই প্রকৃত হিন্দু।"

এখন দেখুন, ব্রাহ্মসমাজের তিন জন মহাপুরুষই বিশ্বজনীন সত্য ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাঁহারা জাতীয়তার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। প্রকৃত জাতীয়তা ও প্রকৃত বিশ্বজনীন ভাবের মধ্যে যে বিরোধ আছে, ইহা তাঁহারা কখনই মনে করেন নাই।

পিতৃপুরুষদিগের পথে অগ্রসর হইতে গেলে, বৈজিক তত্ত্ব (Law of heridity) অনুসারে উহা আমাদের সহজ হয়। পিতৃপুরুষদিগের পথ ছাড়িয়া দিলে "ইতঃভ্রষ্টস্ততনষ্ট।" যে সকল বিষয়ে আমাদের জাতীয় অভাব আছে, তাহা অন্য সুসভ্য জাতির নিকটে অবশ্য শিক্ষা করিতে হইবে, অন্য সুসভ্য জাতির সাহায্যে সেই সকল অভাব পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু পিতৃপুরুষদিগের সহস্র সহস্র বৎসরের চেষ্টা, যত্ন ও সাধনের ফল আমরা যেন না হারাই। পিতৃপুরুষদিগের ধনে যেন বঞ্চিত না হই।

পিতৃপুরুষদিগের ধ্যান ও ধারণা, ব্রহ্মের সন্নিকর্ষের অনুভূতি, ব্রহ্মের সহিত তন্ময়ত্ব, ধর্ম্মের এই সকল গভীর ভাব আমরা যেন না হারাই। ভারতের প্রাচীন মহর্ষি, আপনার অন্তরে এতই উজ্জ্বল ও সুস্পষ্টরূপে ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিয়াছিলেন যে বলিলেন যে, ব্রহ্ম করতলন্যস্ত আমলকবৎ। ইহা কি সহজ কথা! উপনিষদে মহর্ষি বলিতেছেন ;—

"ত্বমাত্মস্থং যেনুপরিপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং-শাশ্বতী নেত রেষাং।"

যে ধীর সকল তাঁহাকে আত্মাস্তে দর্শন করেন, তাঁহাদের নিত্য সুখ হয়, অপরের হয় না।

পরমাত্মাকে আত্মাতে দর্শন করা, ভারতবর্ষীয় আর্য্য শাস্ত্র সকলের একটী বিশেষ ভাব। উপনিষদাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্র এই প্রকার গভীর ভাবের শ্লোকে পরিপূর্ণ। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরে, সে দেশবাসীগণের অনেক বিষয়ে অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের নিকট ইহাও বলিয়াছিলেন যে, সেখানে অন্যান্য বিষয়ে ধর্ম্মভাব যথেষ্ট থাকিলেও, ধ্যান ও আরাধনার ভাব বড়ই অল্প।

আমরা যতই কেন বিলাতি ভাবাপন্ন হইনা, তথাচ স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ভাব আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী দেখুন, ইহার মধ্যে আমাদের হিন্দুত্বের প্রমাণ রহিয়াছে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি উচ্চারণ করিয়া যে আরাধনা ও তৎপরে ধ্যান, উহা আমাদের হিন্দু ভাবই প্রকাশ করে। ধ্যান ও আরাধনা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। প্রার্থনা, খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশেষত্ব। কিন্তু এ কথায় কেহ এমন বুঝিবেন না যে, হিন্দু ধর্ম্মে বা হিন্দুশাস্ত্রে প্রার্থনা নাই, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মে আরাধনা নাই। আমাদের উপাসনাপ্রণালীতে যে সাধারণ প্রার্থনা রহিয়াছে, উহা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া হিন্দুশাস্ত্র হইতে গৃহীত। এ স্থলে কেবল বিশেষ ভাবের কথা বলা হইতেছে।

তাহার পর আরও দেখুন। এই বেদী কেন? উহা কি আমাদের হিন্দু ভাব প্রকাশ করিতেছে না? সমাজমন্দিরে, আমরা কেন গির্জা ঘরের অনুকরণে পুলপিট্ খাড়া করিলাম না? তাহার পর, আরও দেখুন, দেশীয় রাগ রাগিণীতে, দেশীয় সুরে সঙ্গীত কেন? দেশীয় খোল করতাল সহকারে কীর্ত্তন কেন? বিলাতী সুরে কেন এখানে গান হয় না? এ সকলে প্রমাণ হইতেছে, দেশীয় ভাব আমাদের মজ্জাগত হইয়া আছে। আমরা উহা একেবারে ছাড়িতে পারি না।

পূর্ব্বপুরুষেরা যে সকল অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি যত্নপূর্ব্বক আমাদের রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। কোন গৃহস্থ ব্যক্তি তাঁহার পিতাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। পিতার পরলোক হইলে, তিনি পিতার স্মরণচিহ্নস্বরূপ, তাঁহার পাদুকা একান্ত যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন নিকটবর্ত্তী নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া বন্যা আসিল। তিনি ভয়ে, সপরিবারে গৃহের বাহির হইলেন। প্রবল বেগবান বন্যায় তাঁহার গৃহের সামগ্রী সকল কোথায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল, তিনি ধরিয়া রাখিতে পারেন না। তখন তাঁহার হঠাৎ

মনে পড়িল যে, তাঁহার বড় যত্নের পিতৃপাদুকা ঐ গৃহের মধ্যে রহিয়াছে। তিনি তখন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"আমার শাল, দোশালা, অন্যান্য সকল মূল্যবান সামগ্রী, এই মহা বন্যায় ভাসিয়া যায়, যাউক, কিন্তু আমার বড় যত্নের সামগ্রী, পিতৃদেবের ব্যবহৃত পাদুকা আমি কোন ক্রমেই নষ্ট হইতে, ভাসিয়া যাইতে দিবনা। এই বলিয়া তিনি অতি কষ্টে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতৃপাদুকা বাহির করিয়া আনিলেন।

ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের সংশ্রব হওয়াতে এ দেশে ঘোরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। এই মহাবন্যায় আমাদের কি থাকিবে আর কি যাইবে, জানিনা। এ সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি? একটী বিশেষ কর্ত্তব্য এই যে, ঐ পিতৃভক্ত পুত্র যেমন বন্যার সময় অতি যত্নপূর্ব্বক পিতৃপাদুকা রক্ষা করিল, সেইরূপ যেন আমরাও, এই মহা সামাজিক বন্যার সময়ে, আমাদের পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষদিগের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করি। পিতৃপুরুষগণ শাস্ত্রে ও সমাজে যাহা কিছু কল্যাণকর বিষয় আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন তাহাতে বঞ্চিত না হই।

উপনিষদাদি আর্য্যশাস্ত্ররূপ মহা ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করিয়া দেখ, তাহাতে আমাদের জন্য কি অমূল্য পারমার্থিক জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত রহিয়াছে। আমাদের প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্ররূপ পবিত্র মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখ, কি অপূর্ব্ব, মধুর, অহেতুকী ভক্তিতত্ত্ব তথায় বর্ত্তমান। ভ্রাতৃগণ! ভক্তিভাজন পিতৃপুরুষগণের এই সব মহামূল্য ধনে বঞ্চিত হইও না।

সমুদ্রমধ্যস্থ অনেক দ্বীপে অনেক বর্ব্বর পশুতুল্য জাতি আছে। ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টিয়ান সভ্যজাতীয় লোক সকল তথায় গিয়া তাহাদিগকে সভ্য করিতেছেন। নূতন করিয়া তাহাদের সমাজ, তাহাদের ধর্ম্ম গঠিত হইতেছে। ভালই হইতেছে। তাহাদের কিছুই ছিলনা, সুতরাং তাহাদের সকলই নূতন করিয়া সংগঠন করিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা খাটিবে না। আমরা জুলু নহি। আমরা বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার অধীকারী। আমাদের সমাজে, শাস্ত্রে, অনেক ভাল জিনিস আছে। আমরা পূর্ব্বপুরুষপ্রদত্ত অনেক ভাল জিনিসের উত্তরাধিকারী। আমাদের শাস্ত্রে ও সমাজে কি অসত্য ও মন্দ কিছু নাই? আছে বই কি? যাহা মন্দ, তাহা এই মহাবন্যায় ভাসিয়া যাক্। কিন্তু যাহা ভাল, যাহা পিতৃপুরুষপ্রদত্ত মূল্যবান সামগ্রী, তাহা একান্ত যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেও।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য কথায় কি বুঝাইব? ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন দেখ। তাঁহার মহৎ জীবনে জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতার সামঞ্জস্য দেখ। এক দিকে দেখ, তাঁহার জীবনে কেমন উদার, অসাম্প্রদায়িক, বিশ্বজনীন ভাব! সমগ্র মানবজাতি, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত কেমন সহানুভূতি! সকল সম্প্রদায়ের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে সারসংগ্রহ করিতেছেন। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র ভাল করিয়া শিক্ষা করিবার জন্য, ইংরেজী অনুবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া মূল ভাষায় অর্থাৎ হিব্রু-

ভাষায় বাইবেলের পূর্ব্বভাগ এবং গ্রীক ভাষায় উহার উত্তর ভাগ যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিলেন। বাইবেল শাস্ত্র ও খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও প্রশস্ততা দেখিয়া ইংলণ্ডের লোক আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তিনি যীশুখ্রীষ্টকে একান্তচিত্তে ভক্তি করিতেন। যীশুর উপদেশ সংগ্রহ করিয়া Precepts of Jesus, guide to peace and happiness, নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। জগতের সকল শাস্ত্র, সকল সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সহানুভূতি। তাঁহার হৃদয় এমনই প্রশস্ত ছিল যে, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোক স্থান পাইত। তাঁহার উদার হৃদয়, সকল সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিয়াছিল।

এই তাঁহার বিশ্বজনীন ভাব। আবার দেখুন, তাঁহার জাতীয় ভাব কেমন প্রবল। তিনি হিন্দুশাস্ত্রে একজন মহাপণ্ডিত। তিনি তাঁহার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণকে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিবার জন্য কতই যত্ন, কতই পরিশ্রম করিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্ররূপ মহাসিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃত উদ্ধার করিয়া তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিলেন। উদার, অসাম্প্রদায়িক, বিশ্বজনীন সত্য প্রচারের জন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহাকে জাতীয় আকার দিলেন। তাঁহার সমাজে তিনি পুল্‌পিট আনিলেন না, বেদী করিলেন। তথায় উপনিষদাদি জাতীয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। দেশীয় রাগরাগিণীতে, দেশীয় বাদ্যযন্ত্র সহকারে তথায় মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। তিনি বিশ্বজনীন সত্যকে জাতীয় আকারে প্রচার করিলেন। বিশ্বজনীন সত্যকে ভিত্তি করিয়া যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহাকেও জাতীয় আকার দিলেন। তাঁহার স্বজাতীয়দিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার জন্য তিনি যাহা কিছু করিলেন, সকলই জাতীয় ভাব ও জাতীয় রুচির সহিত মিলাইয়া করিলেন। তিনি বলিতেন "আমার ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিতেছি। হিন্দুশাস্ত্রের যাহা প্রকৃত তাৎপর্য্য, আমি তাহাই আমার স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছি।" বিশ্বজনীন সত্য ও বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাবকে আপনার হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বিদেশীয় ধর্ম্ম ও বিদেশীয় শাস্ত্র সকলের সারগ্রাহী হইয়াও, তিনি চিরদিন হিন্দুশাস্ত্রকে সম্মান করিয়াছেন, চিরদিন আপনার হিন্দুত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনে বিশ্বজনীনতা ও জাতীয়তার কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়!

এই একটী প্রশ্ন লোকের মনে উত্থিত হইতে পারে যে, ধর্ম্ম যদি বিশ্বজনীন হইল, তবে আবার উহা জাতীয় কেমন করিয়া হইবে? বিশ্বজনীন অথচ জাতীয় ধর্ম্ম, এই কথাটা কি অসঙ্গতি দোষপূর্ণ হইল না? কখনই না।

দুইটী বিষয় বুঝিলেই ইহা বুঝা যায় যে, জাতীয় ধর্ম্ম ও বিশ্বজনীন ধর্ম্ম যে পরস্পর বিরোধী হইবেই হইবে, এমন কখনই হইতে পারে না। প্রথম, মানবজাতির উৎপত্তি হইতে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ হইতেছে। সেই ক্রমবিকাশ, সমগ্র মানব

জাতির সম্বন্ধে যেমন সাধারণ, সেইরূপ আবার বিশেষ বিশেষ জাতির পক্ষে বিশেষ বিকাশ। কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে যে সকল বিশেষ বিকাশ, তাহাও আবার সমগ্র মানবজাতির জন্য। যাহা বিশেষ, তাহাও সকলের জন্য। জাতিগত বিশেষ উন্নতির স্রোত, সমগ্র মানবজাতির সাধারণ উন্নতিরূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। যাহার যাহা, তাহা সকলের। ইংরেজ, ফরাসি, জর্ম্মান, ইটালিয়ান, আমেরিকান, হিন্দু, যাহার যাহা বিশেষ বিকাশ, কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক, কি শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধীয়, কি সামাজিক কি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, যাহার যাহা বিশেষ বিকাশ, তাহা সমগ্র মানব জাতির উন্নতি স্রোতকে পোষিত ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য। সকলেই সকলের জন্য। সকলেই পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে, এবং এইরূপে এক অসীম উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে।

দ্বিতীয়, বিশ্বজনীন; সত্যের সাধন ও প্রচার জাতীয় আকারে হওয়া আবশ্যক। তাহা স্বাভাবিক। তাহা ভিন্ন হয় না। সত্য, বিশ্বজনীন, কিন্তু জাতিগত জীবনে উহার সাধন যেরূপ হয়, তাহা বিশেষ। ভাব, বিশ্বজনীন; কিন্তু জাতিগত জীবনে উহা যে আকার ধারণ করে, তাহা বিশেষ। এই বিশেষ ও বিশ্বজনীন ভাবের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই। ইহাই বিশ্বজনীন ও জাতীয় ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য।

আমাদের বাঙ্গালীর দেহ। আমরা কাবুলি মেওয়া খাইতেছি, বিলাতি বিস্‌কুট খাইতেছি। কিন্তু ঐ সকল খাদ্য আমাদের বাঙ্গালী দেহই পুষ্ট করিতেছে। দেহ সম্বন্ধে আমরা কাবুলির ন্যায় অথবা ইংরেজের ন্যায় হইতেছি না। সেইরূপ বিদেশ হইতে যে সত্য, যে ভাব আমরা লাভ করিব, উহা জাতীয় আকারই ধারণ করিবে। এইরূপেই স্বদেশীয় ও বিদেশীয়ের সামঞ্জস্য হয়।

বিধাতার বিধানে আমরা পাশ্চাত্য জগতের সহিত সংশ্রবে আসিয়াছি। ইহাতে আমাদের বিশেষ কল্যাণ হইতেছে ও হইবে। আমাদের দেশেও যাহা কিছু ভাল আছে, তাহাও ইয়োরোপ ও আমেরিকা স্বীকার করিতে ও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিধাতার বিধানে, এই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম্মিলনে, আমাদের জাতিগত উন্নতিস্রোত, সার্ব্বভৌমিক উন্নতিরূপ মহা সমুদ্রের দিকে চলিতে থাকিবে। করুণাময় বিধাতার ইহাই ইচ্ছা।

হে জ্ঞানময়, মঙ্গলময় বিধাতা! তুমি আমাদের নিকটে তোমার সত্য প্রকাশ কর। হে প্রভো! প্রকৃত ভাবে সত্যকে দেখিতে শিক্ষা দেও। আমরা যেন একদেশদর্শী হইয়া না যাই। পূর্ণভাবে আমাদের নিকট তুমি সত্য প্রকাশ কর। এই সাকার জগতে তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই, আবার অন্তরে চৈতন্য রূপে তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জন্ম সার্থক করি। হে অদ্বৈত ব্রহ্ম! এক দিকে নেতি নেতি করিয়া আমরা যেন বুঝিতে পারি যে, তুমি এ সকলের কিছুই নও, এ সকলের অতীত, আবার যেন তোমাকে শক্তিরূপে, জ্ঞানরূপে, দয়ারূপে, প্রেমরূপে, আনন্দরূপে, "সত্যং শিবং সুন্দরং" রূপে নিখিল বিশ্বে সর্ব্বভূতে দেখিতে পাই। তুমি বাহিরে, তুমি অন্তরে। তুমি অন্তরে জ্ঞানরূপে, প্রেমরূপে, গুরুরূপে বর্ত্তমান। অন্তরে তোমার বাণী শ্রবণ করিয়া যেন জীবন

পথে চলিতে পারি। জীবনে ও জগতের সকল ঘটনায়, হে বিধাতঃ তোমার হস্ত দেখিতে শিক্ষা দেও। তুমি জগতের সাধারণ পিতা, সাধারণ মাতা, সাধারণ গুরু হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছ, সকলকে শিক্ষা দিতেছ, আবার বিশেষ ভাবে, প্রত্যেক ব্যক্তি, ও প্রত্যেক জাতিকে তোমার অনন্ত উন্নতিপথে লইয়া যাইতেছ। আমাদের এই প্রিয় ব্রাহ্মসমাজ তোমারই বিশেষ কৃপা, বিশেষ বিধান। তুমি আমাদের নেতা, তুমি আমাদের গুরু। হে গুরু কল্পতরু! তুমি আমাদিগকে সংকীর্ণতা ও অনুদারতা হইতে রক্ষা কর। আমরা একদিকে যেমন স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভালবাসিব, সেইরূপ তোমার কৃপায় যেন উদার, অসাম্প্রদায়িক, প্রশস্ত হৃদয়ে সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিতে পারি। তোমার কৃপায় আমাদের জ্ঞানের নিকট সত্য ও ধর্ম্মের সমন্বয় হউক; তোমার কৃপায়, আমাদের হৃদয় সকল সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করুক, এবং আমাদের জীবন তোমার সহিত মিলিত হইয়া সকল মানবজাতির সহিত একীভূত হউক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ
ঊনবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে।
(অগ্রহায়ণ সংখ্যার পর)
নরেন্দ্রভবনাথাদিভক্ত সম্মিলন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মাষ্টারের প্রথম দর্শন কথা বিবৃত আছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিলেন, ও যাহা যাহা আদেশ করিলেন, ঐ সংখ্যার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেই সকল কথা আছে। এইবার ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রথম সমাধি দর্শন ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র ও ভবনাথের সহিত প্রথম দেখা।

মাষ্টার তখন বরাহনগরে দিদির বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্ব্বক্ষণ তাঁহারি চিন্তা করেন। সর্ব্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন। আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে মাষ্টার এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন, এই কথা রাত্রিদিন ভাবিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপাল বাবুর সঙ্গে বেলা ৩টার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পৌঁছিলেন। দেখিলেন, সেই পূর্ব্ব পরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে এক ঘর লোক। রবিবারে অবসর হইয়াছে, তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাষ্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই। মাষ্টারও সভামধ্যে এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, ভক্তদের সঙ্গে সহাস্য বদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন। একটী ঊনবিংশতি বর্ষ বয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ্য করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া অনেক কথা যেন কত আনন্দিত হইয়া বলিতেছিলেন। ছেলেটীর নাম নরেন্দ্র,* কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃ পরিপূর্ণ, চক্ষু দুটী সাতিশয় উজ্জ্বল।

ভক্তের চেহারা।

মাষ্টার অনুমানে বুঝিলেন যে, কথাটী বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে ও ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, তাদের ঐ সকল ব্যক্তিরা নিন্দা করে। আর সংসারে কত দুষ্ট লোক আছে, তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই সব কথা হইতেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। নরেন্দ্র তুই কি বলিস্? সংসারী লোকেরা কত কি বলে? কিন্তু দেখ্—হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে, কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?

নরেন্দ্র। আমি মনে করবো কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। নারে অতো দূর নয়। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয়। বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন। তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। বাঘনারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করবে।

"একটা গল্প শোন। কোন এক বনে একটী সাধু থাকেন, তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটী জেনে সকলকে নমস্কার করবে। এক দিন একটী শিষ্য হোমের জন্য কাট আনতে বনের মধ্যে গিয়েছিলো। এমন সময় একটা রব উঠলো কে কোথায় আছ পালাও, একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে।" সব্বাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটী পালালো না, সে জানে হাতীও নারায়ণ, তবে কেন পালাব। এই বলে দাঁড়িয়ে রহিল; আর নমস্কার করে স্তব স্তুতি করতে লাগলো। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে 'পালাও' 'পালাও'। শিষ্যটী তবুও নড়লো না। শেষে হাতীটা শুড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষত বিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাঁকে আশ্রমে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হলে ওকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তুমি কেন হাতী আসছে শুনেও চলে গেলে না? সে বল্লে, গুরুদেব যে আমায় বলে দিলেন যে, নারায়ণই মানুষ, জীব, জন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতী নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই। গুরু তখন বল্লেন যে, হাতী নারায়ণ আসছিলেন বটে তা সত্য, কিন্তু বাবা! মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন! যদি সবই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও মানতে হয়।

"শাস্ত্রে আছে আপোনারায়ণঃ—জল নারায়ণ। কিন্তু কোন জল ঠাকুরসেবায় চলে আবার কোন জল আঁচান, বাসন মাজা,

* নরেন্দ্র—শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ।

কাপড় কাচা কেবল চলে। কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুর সেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন, কিন্তু অসাধু, অভক্ত দুষ্টলোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না, মাখামাখি চলে না। কাহারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে; আবার কাহারও সঙ্গে তাহাও চলে-না। এরূপ লোকদের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।

একজন ভক্ত। মহাশয়, যদি দুষ্টলোক অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে তা হলে কি চুপ করে থাকা উচিত।

[গৃহস্থ ও তমোগুণের প্রয়োজন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্টলোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করতে আস্‌ছে বলে উল্‌টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

"একমাঠে রাখালরা গরু চরাত। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকতো। একদিন একটী ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বল্লে, ঠাকুর মহাশয়, ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা বিষাক্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী বল্লেন, বাবা তা হউক, আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি। এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেই দিকে চলে গেল। রাখালরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেলনা। এ দিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে। কিন্তু কাছে না আসতে আসতে ব্রহ্মচারী যেই একটী মন্ত্র পড়লেন, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বল্লেন, ওরে তুই কেন পরের হিংসা করে করে বেড়াস, আয় তোকে মন্ত্র দিব; এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে। আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না। এই বলে সাপকে মন্ত্র দিলেন। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে, আর জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর কি করে সাধনা করব বলুন। গুরু বল্লেন, এই মন্ত্র জপ কোরো, আর কাহারও হিংসা কোরোনা। ব্রহ্মচারী যাবার সময় বল্লেন, আমি আবার আসবো।

"এই রকমে কিছু দিন যায়। রাখালরা দেখে যে সাপটা আর কামড়াতে আসে না। ড্যালা মারে তবুও রাগ হয় না। যেন কেঁচোর মত হয়ে গেছে। এক দিন এক জন রাখাল তার কাছে গিয়ে লেজ ধরে ঘুরপাক দিয়ে, সাপটাকে আছড়ে ফেলে দিল। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো আর সে অচেতন হয়ে পড়লো—নড়েনা চড়েনা। রাখালরা মনে করলে যে সাপটা মরে গেছে। এই মনে করে তারা সব চলে গেল।

"অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হলো। তখন সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্ত্তের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নড়বার শক্তি নাই। অনেক দিনের পর যখন অস্থিচর্ম্মসার হয়ে গেছে, বাহিরে আহারের চেষ্টায় রোজ রাত্রে এক একবার চরতে আসতো, রাখালদের ভয়ে দিনের বেলায় আসত না। মন্ত্র লওয়া অবধি আর জীবহিংসা করে না; মাটি, পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে এমন ফল, খেয়ে প্রাণধারণ করতো।

"প্রায় এক বৎসরের পর ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলেন। এসেই সাপের সন্ধান

করলেন। রাখালরা বল্লে সে সাপটা মরে গেছে। ব্রহ্মচারীর কিন্তু ও কথা বিশ্বাস হলোনা। তিনি জানেন, যে মন্ত্র সে নিয়েছে, তাহা সাধন না হলে দেহ ত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই দিকে গিয়ে, তাঁর দেওয়া নাম ধরে, ডাকতে লাগলেন। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে, গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এলো; ও খুব ভক্তিভাবে, প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কেমন আছিস?' সে বল্লে, আজ্ঞে ভাল আছি। ব্রহ্মচারী বল্লেন, 'তবে তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন।' সাপ বল্লে 'ঠাকুর! আপনি আদেশ করেছেন, 'কাহারও হিংসা করোনা'। তাই পাতাটা, ফলটা খাই বলে বোধ হয় রোগা হয়ে গিয়েছি।' ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কিনা; তাই কাহারও উপর ক্রোধ নাই। সে একেবারেই ভুলেই গিছলো, যে রাখালরা তাকে মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল। ব্রহ্মচারী বল্লেন, শুধু না খাওয়ার দরুণ এরূপ অবস্থা হয় না। অবশ্য আরও কোন কারণ আছে, তুই ভেবে দেখ। সাপটার তখন মনে পড়লো যে রাখালরা তাকে আছাড় মেরেছিল। তখন সে বল্লে 'ঠাকুর এখন মনে পড়েছে বটে, রাখালরা আমায় একদিন আছাড় মেরেছিল। তা তারা অজ্ঞান, তারা তো জানে না, আমার মনের কি অবস্থা, আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট করব না, তা তারা কেমন করে জানবে।' ব্রহ্মচারী বল্লেন, "ছি! তুই এত বোকা? তুই আপনাকে রক্ষা করতে জানিস না? আমি তোকে কামড়াতে বারণ করেছি; তোকে তো ফোঁস করতে বারণ করি নাই! তুই ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস্‌ নাই কেন?"

"তাই বলছি, দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, তাদের ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। কিন্তু তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, তাদের উল্‌টে অনিষ্ট করতে নাই।

"ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানারকম জীব-জন্তু, গাছ, পালা, ধাতু এই সব আছে। জানয়ারের মধ্যে ভালও আছে মন্দও আছে। বাঘের মতন হিংস্র জানয়ারও আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয়, এমন গাছও আছে; আবার বিষ ফল হয়, এমন গাছও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে, সাধুও আছে, অসাধুও আছে, সংসারী জীবও আছে, আবার ভক্তও আছে।

(DOCTRINE OF EQUALITY.)

"জীব চারি প্রকার—বদ্ধ জীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্ত জীব ও নিত্য জীব। নিত্যজীব যেমন নারদাদি। এঁরা সংসারে আসেন জীবের মঙ্গলের জন্য, জীবদের শিক্ষা দিবার জন্য। বদ্ধ জীব বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। মুমুক্ষু জীব; যাঁরা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ পারে না। মুক্ত জীব; যাঁরা সংসারের কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ ন'ন—যেমন সাধু মহাত্মারা, যাদের মনে বিষয় বুদ্ধি নাই। আর যাঁরা সর্ব্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করেন।

"যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দু চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে, কখনও জালে পড়ে না। এরা নিত্য জীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা

করে, এরাই মুমুক্ষু জীবের উপমাস্থল। কিন্তু সকলে পালাতে পারে না। দু চারটা ধপাঙ্ ধপাঙ্ করে জাল থেকে পালিয়ে যায়। তখন জেলেরা বলে, ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল। কিন্তু যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশ মাছ পালাতেও পারে না, আর পালাবার চেষ্টাও করে না, বরং জাল মুখে করে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ করে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে। মনে করে বুঝি আর কোন ভয় নাই, আর আমরা বেশ আছি। কিন্তু জানে না জেলে হড়্ হড়্ করে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।"

"বদ্ধজীবেরা সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, আবার মনে করে যে, ঐ সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। কিন্তু জানে না যে, ঐতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধ জীব যখন মরে, তখন তার পরিবার বলে, তুমি ত চল্লে, আমার কি করে গেলে। আবার এমনি মায়া যে প্রদীপে বেশী সল্‌তে জ্বললে বলে, 'তেল পুড়ে যাবে, সল্‌তে কমিয়ে দাও'। এ দিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে।

"বদ্ধজীবেরা ঈশ্বর চিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তা হলে হয় আবোল তাবোল ফাল্‌তো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা কল্লে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না; তাই বেড়া বাঁধছি। হয়ত সময় কাটে না দেখে তাস্ খেল্‌তে আরম্ভ করলে।

[পঞ্চম পরিচ্ছেদ।]

একজন ভক্ত। মহাশয়! এরূপ সংসারী জীবের কি কোন উপায় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধু সঙ্গ করতে হয়। আর মাঝে মাঝে নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয়, আর বিচার করতে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।

(বিশ্বাসের ফল)

"বিশ্বাস হয়ে গেলেই হোলো। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।

(কেদারের প্রতি) "বিশ্বাসের যে কত জোর তাতো শুনেছ।

"পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হোলো। কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ্ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়লো। তার আর সেতুর দরকার হয় নাই।

"বিভীষণ একটী পাতায় রাম নাম লিখে একটী লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিয়েছিল। সে লোকটী সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বল্‌লে, তোমার ভয় নাই তুমি বিশ্বাস করে জলের উপর দিয়ে চলে যাও, কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে। লোকটী বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হলো যে, কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে, একবার দেখি। খুলে দ্যাখে যে কেবল রাম নাম লেখা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, 'একি! শুদ্ধ রাম নাম একটী লেখা রয়েছে!' যাই অবিশ্বাস হলো অমনি ডুবে গেল।

"যার বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে, গো ব্রাহ্মণ, স্ত্রী এসব হত্যা করে, তবুও ভগবানের এই বিশ্বাসের বলে সে

সব ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হয়। সে যদি বলে, আর আমি এমন কাজ কখনও করব না; তার কিছুতেই ভয় হয় না।"

(নামের মাহাত্ম্য)

এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ গান গাইতে লাগিলেন—

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি,
আখেরে, এ দীনে না তার কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপান আদি, বিনাশি নারী;
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক,
আমি ব্রহ্মপদ নিতে পারি।"

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের কথা পড়িল। ভক্তদের সম্বোধন করে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন—

"এই ছেলেটীকে দেখছো, এখানে একরকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুটী। আবার চাঁদনীতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়; আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে, জীব শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না।

"বেদে আছে, হোমা পাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়্‌লেই ডিম নীচে পড়তে থাকে। কিন্তু এত উচ্চ যে, অনেক দিন ধরে ডিম পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়্‌তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোক ফোটে আর ডানা বেরোয়। চোক ফুটে দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে আর মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সেই পাখী একেবারে মার দিকে চোঁচা দৌড় দেয়। আর উঁচুতে উঠে যায়।

[ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।]

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন। সভা মধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। দেখ নরেন্দ্র গাইতে বাজাতে পড়া শুনায় সব তাতেই ভাল। সে দিন কেদারের সঙ্গে তর্ক কর্‌ছিল। তার কথা গুলো কচ্‌কচ করে কেটে দিতে লাগল।

(মাষ্টারের প্রতি) "ইংরাজীতে কি কোন তর্কের বই আছে?

মাষ্টার। হাঁ ইংরাজীতে (Logic) ন্যায় শাস্ত্র আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা কি রকম একটু বল দেখি।

মাষ্টার এইবার মুস্কিলে পড়িলেন। বলিলেন,—

এক রকম আছে, সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্ত;

যেমন; সব মানুষ মরে যাবে।
পণ্ডিতেরা মানুষ।
অতএব পণ্ডিতেরা মরে যাবে।

আর এক রকম আছে বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পোঁছান। যেমন, কাকটাও কাল, (আবার) যত কাক দেখছি সবই কাল;" অতএব সব কাকই কাল। কিন্তু এ রকমে সিদ্ধান্ত করলে ভুল হতে পারে, কেন না, হয়ত খুঁজতে খুঁজতে আর এক দেশে সাদা কাক দেখা গেল। আর এক দৃষ্টান্ত—যেখানে বৃষ্টি দেখছি, সেই খানেই মেঘ ছিল

রা আছে। অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হল যে, মেঘ থেকেই বৃষ্টি হয়। আর এক দৃষ্টান্ত,—এই মানুষটীর ৩২টী দাঁত আছে। ও মানুষটীরও ৩২টী দাঁত আছে। আবার যে কোন মানুষ দেখছি তারই ৩২টী দাঁত আছে। অতএব সব মানুষেরি ৩২টী দাঁত আছে। এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরাজী ন্যায় শাস্ত্রে আছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথা গুলি শুনিলেন মাত্র। শুনিতে শুনিতেই অন্যমনস্ক হইলেন। কাজে কাজেই আর এ বিষয়ে বেশী প্রসঙ্গ হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[সমাধি মন্দিরে।]

সভা ভঙ্গ হইল। ভক্তেরা এ দিক ওদিক পাদচারণ করিতে লাগিলেন। মাষ্টারও পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন। তখন বেলা আন্দাজ পাঁচটা। কিয়ৎক্ষণ পরেই মাষ্টার ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তর দিকের ছোট বারাণ্ডার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, নরেন্দ্র গান গাইতেছেন। দু চার জন ভক্তও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মাষ্টার আসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের গান ছাড়া এমন মধুর গান কখনও শুনেন নাই। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন! দেখিলেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষের পাতা পড়িতেছে না! নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে।

ভক্তদের মধ্যে কাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, এর নাম সমাধি। মাষ্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শোনেন নাই। অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়? না জানি কতদূর বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে এরূপ হয়।

গানটী এই—

চিন্তয় মন মানুষ হরি চিদঘন নিরঞ্জন;
কিবা অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত
হৃদয় রঞ্জন।
নব রাগে রঞ্জিত, কোটি শশীবিনিন্দিত,
কিবা বিজলী চমকে, সেরূপ আলোকে,
পুলকে শিহরে জীবন।

গানের এই চরণটী গাইবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল; মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। না জানি "কোটীশশীবিনিন্দিত" কি অনুপম রূপ দর্শন করিতেছিলেন। এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কত খানি ভক্তি বিশ্বাসের বলে এরূপ ঈশ্বর দর্শন হয়?

আবার গান চলিতে লাগিল—

হৃদি কমলাসনে দেখ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ
প্রিয় দর্শন;

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য! শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ ও স্তিমিত লোচন! কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন! আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন!

এই বারে গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন—

প্রেমানন্দ রসে হওরে চির মগন
(চিদানন্দ রসে) (হরি প্রেমানন্দ রসে)

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি

হৃদয় মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাষ্টার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হৃদয় মধ্যে সেই হৃদয়োন্মত্তকরী মধুর সঙ্গীতের ফুট উঠিতে লাগিল—

প্রেমানন্দ রসে, হওরে চির মগন——
(হরি প্রেমে মত্ত হয়ে)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[নরেন্দ্র, ভবনাথাদি ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ]

তাহার পর দিনেও ছুটী ছিল। বেলা তিনটার সময় মাষ্টার আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই পূর্ব্ব পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। মেজেতে মাদুর পাতা, সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ আর দুই এক জন বসিয়া আছেন। কয়টী ছোকরা ১৯।২০ বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাস্য বদন, ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়াছেন। ছোক্‌রাদের সঙ্গে আনন্দের কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। মাষ্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই, ঠাকুর উচ্চ হাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, 'ঐরে। আবার এসেছে!' বলিয়াই হাস্য।

মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। আগে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন—ইংরাজী পড়া লোকেরা যেমন করে। কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতে শিখিয়াছেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ কেন হাসিতেছিলেন, তাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—

"দেখ একটা ময়ূরকে বেলা চারিটার সময় আফিম খাইয়ে দিয়েছিলো। তার পর দিন ঠিক চারিটার সময় এসে সেই ময়ূরটা উপস্থিত। আফিমের নেশা লেগেছিল, মৌতাত ধরেছিল, তাই আবার ঠিক সময় আফিম খেতে এসেছে" (হাস্য)।

মাষ্টার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনিতো ঠিকই কথা বলিতেছেন। বাড়ীতে যাই, কিন্তু দিবানিশি এঁর দিকে মন পড়িয়া থাকে—কখন্ দেখিব, কখন্ দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আন্‌লে। মনে করলে অন্য জায়গায় যাবার যো নাই, এখানে আসতেই হবে।'

এরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এদিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফস্‌টি নাষ্টি করিতে লাগিলেন। যেন তারা সমবয়স্ক। হাসির লহরী উঠিতে লাগিল, যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে। মাষ্টার অবাক হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এঁরই কি পূর্ব্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম! সেই ব্যক্তিই কি আজ প্রকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। ইনিই কি আমার প্রথম দিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার করিয়াছিলেন? ইনি কি আমায় 'তুমি কি জ্ঞানী!' বলেছিলেন! ইনিই কি সাকার, নিরাকার দুই সত্য বলেছিলেন। ইনিই কি আমায় বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরই সত্য আর সংসারের সমস্তই অনিত্য! ইনিই কি আমায় সংসারে দাসীর মত থাকিতে বলিয়াছেন!

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাষ্টারকে এক এক বার দেখিতেছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক্ হইয়া বসিয়া আছেন, তখন রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্ এর একটু উমের বেশী কি না, তাই একটু গম্ভীর। এরা এত

হাসি খুসি করছে, কিন্তু এ চুপ করে বসে আছে।" মাষ্টারের বয়স তখন ২৬।২৭ হইবে।

কথা কহিতে কহিতে পরম ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল। হনুমানের পট একখানি ঘরের দেওয়ালে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, "দেখ হনুমানের কি ভাব! ধন মান, দেহ সুখ, কিছুই চায় না! কেবল ভগবানকে চায়। যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে, তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়। কিন্তু হনুমান ভোলবার ছেলে নয়, সে বললে—

গান।

আমার কি ফলের অভাব,
পেয়েছি যে ফল. জনম সফল,
মোক্ষ ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে।
শ্রীরামচন্দ্র কল্পতরু মূলে রই,
যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই (ধনীগো) ও ফল গ্রাহক নাই,
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে।

গান গাইতে গাইতেই আবার সেই সমাধি অবস্থা—আবার নিস্পন্দ দেহ, স্তিমিতলোচন, দেহস্থির বসিয়া আছেন—ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়। ভক্তেরা—যাহারা এই মাত্র এত হাসি খুসি করিতেছিল—সকলেই একদৃষ্টি হইয়া সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সমাধি অবস্থা মাষ্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ঐ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। দেহ শিথিল হইল, মুখ সহাস্য হইল, ইন্দ্রিয়গণ যেন আবার নিজের নিজের কার্য্য করিতে ফিরিতে লাগিল। ঠাকুর চক্ষের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে 'রাম' 'রাম' এই নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে ফচকেমি করিতেছিলেন? তখন ঠিক যেন পাঁচবছরের বালক! ঠাকুর পূর্ব্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মাষ্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বল্লেন—"তোমরা দুজনে ইংরাজিতে কথা কও ও তর্ক বিচার করো আমি শুনবো।" মাষ্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। দুজনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন কিন্তু বাঙ্গালাতে। ঠাকুরের সামনে মাষ্টারের তর্ক বিচার আর সম্ভব নয়—তাঁর তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় এক রকম বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অতএব তিনি আর কিরূপে তর্ক বিচার করিবেন? ঠাকুর আর একবার জীদ করিলেন, কিন্তু ইংরাজিতে তর্ক আর হইল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

(অন্তরঙ্গ সঙ্গে)

পাঁচটা বাজিয়াছে, ভক্ত কয়টি যে যার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কেবল মাষ্টার ও নরেন্দ্র রহিলেন। নরেন্দ্র গাড়ু লইয়া হাঁস পুকুরে ও ঝাউতলার দিকে মুখ ধুইতে গেলেন। মাষ্টারও ঠাকুর বাড়ীর এদিক ওদিক পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠীর কাছ দিয়া হাঁস পুকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুকুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের উপর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আর নরেন্দ্র গাড়ু হাতে করিয়া মুখ ধুইয়া

দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 'দেখ্ এখন একটু বেশী বেশী আসবি। সবে নূতন আসছিস কিনা। প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে—যেমন নূতন—পতি। কেমন আসবি ত? নরেন্দ্র বলিলেন, হাঁ চেষ্টা করবো। আবার সকলেই কুঠীর পথ দিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিতে লাগিলেন। কুঠীর কাছে মাষ্টারকে ঠাকুর বলিলেন, দেখ চাষারা হাটে গরু কিনিতে যায়। তারা ভাল গরু মন্দ গরু বেশ চেনে। লেজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু লেজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না। কিন্তু যে গরু লেজে হাত দিলে তিড়িং মিড়িং করে লাফিয়ে উঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে। এই যে নরেন্দ্রকে দেখছ, এ সেই গরুর জাত্। ভিতরে খুব তেজ আছে। এই বলিয়া ঠাকুর হাঁসিতে লাগিলেন।

"আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিঁড়ের ফলার। আঁট নেই, জোর নাই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ করছে।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঘরে বসিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন ও মাষ্টারকে বলিলেন, তুমি নরেন্দ্রর সঙ্গে আলাপ করতে যাও; আমায় বলবে, কি রকম ছেলে। মাষ্টার অনেকক্ষণ পরে যখন আরুতি হইয়া গেল, চাঁদনির কাছে বেড়াইতে বেড়াইতে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। তারপর পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের। কালেজে পড়িতেছি ইত্যাদি।

রাত হইয়াছে—মাষ্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না, তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয় মন মুগ্ধ হইয়াছে। আবার বড় সাধ যে, তাঁর মুখের গান শুনিতে পান। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাট মন্দিরের মধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মার মন্দিরে মার দুই পার্শ্বে আলো জ্বলিতেছিল। বৃহৎ নাট মন্দিরে একটী আলো জ্বলিতেছিল। আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেই রূপ দেখাইতেছিল। মাষ্টার সঙ্কুচিত ভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ আর কি গান হবে? ঠাকুর বলিলেন, না আজ আর গান হবে না। এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনি বলিলেন, তবে এক কর্ম্ম করো আমি বলরামের বাড়ী কাল কলিকাতায় যাব। তুমি যেও, সেখানে গান হবে। মাষ্টার বলিলেন, যে আজ্ঞে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার সঙ্গে নাট মন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে)। আচ্ছা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমাকে তোমার কি বোধ হয়?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, "তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে?'

মাষ্টার। "আনা" এ কথা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে এরূপ জ্ঞান বা ভক্তি, বৈরাগ্য বা বিশ্বাস কখনও কোথায়ও দেখি নাই। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর প্রণাম করিয়া মাষ্টার বিদায়গ্রহণ করিলেন। সদর ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনি ফিরিলেন। আবার নাট মন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) আবার যে ফিরে এলে?

মাষ্টার। আজ্ঞে বড় মানুষের বাড়ী যেতে দেবে কিনা, তাই সেখানে যাব না ভাবছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নাগো—তা কেন? তুমি আমার নাম করবে। বলবে, তাঁর কাছে যাব,তাহলেই—কেউ আমার কাছে তোমায় নিয়ে আসবে।

মাষ্টার "যে আজ্ঞা" বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ভারত মাতার আক্ষেপ।

কে তোরা ডাকিলি ওরে আজিকে আমায়?
কেন হায়! এই আবাহন?
নিদ্রাকোলে আছি সুখে,
দহিবারে মনোদুখে
কেন সবে বৃথা মোরে কর সচেতন?

জাগিলে তো শুধু জ্বালা শুধু হা হুতাশ!
তার চেয়ে এই নিদ্রা ভাল;
জাগায়ে কাঁদায়ে মায়
কোন ফল নাহি তায়;
কেন এ ব্যথিত বুকে শোকানল জ্বাল'?

আমি কি ঘুমাই সুখে ধূলি-শয্যা' পরে!
ঘুম নহে এ যে বিস্মরণ!
কি ছিনু কি হইয়াছি,
কি জীবন ধ'রে বাঁচি!
স্মরিলে সে কথা বুকে জ্বলে হুতাশন!

'অসভ্য সুসভ্য আজি, পতিত উন্নত;
নগ্ন আজি মণ্ডিত ভূষণে;
আমি চির রাজরাণী,
আজি বিশ্বে ভিখারিণী!
হেন ভাগ্য বিপর্য্যয় সহে কি জীবনে?

তোমরা কাঁদিছ আজি; বৃথা সে রোদন!
রোদনে কি সাধিবে উদ্ধার।
আমার মলিন বেশ,
আমার এ রুক্ষ কেশ,
রোদনে কি দূর হবে পুঞ্জ'শোকভার?

হা অবোধ! উন্নতি কি মুখের বচন?
বৃথা কেঁদে তারে পাওয়া যায়?
সে যে ধন সাধনার,
নহে সভা বক্তৃতার,
মৌখিক চীৎকারে কেবা পেয়েছে তাহায়?

উন্নতি সাধিবে যদি ভোল স্বার্থজ্ঞান,
ভোল নিজ সুবিধা বিচার;
পরার্থে বরণ করি
লও তুলে শিরোপরি
অকাতরে বলি দাও সুখ আপনার।

প্রেমমন্ত্রে আপনারে কররে দীক্ষিত,
ভুলে যাও অপ্রেম বিদ্বেষ;
ভাই ব'লে সর্ব্বজনে
বাধ প্রীতি আলিঙ্গনে,
পুষিও না হৃদয়েতে অভিমান লেশ।

যবনে ব্রাহ্মণে মিলে কর কোলাকুলি,
এক লক্ষ্যে বাঁধ সব প্রাণ;
ভুলি শত ভিন্ন মতে,
মাতৃ-সেবা পুণ্য ব্রতে,
আনন্দে মিলিত হও সকল সন্তান।

সত্যেরে ঢেকোনা বৃথা মিথ্যা আবরণে,
বাড়াইওনা তর্কের জঞ্জাল;
নির্ম্মল বিশুদ্ধ জ্ঞানে
চাহিয়ে হৃদয় পানে,
আপন কর্ত্তব্য ধরি চল চিরকাল।

স্বার্থ লাগি ধর্ম্মবুদ্ধি করোনা কুটিল,
রচিওনা ব্যাখ্যা অলৌকিক;
বিবেক-নির্দ্দেশ যাহা—
প্রাণপণে সাধ তাহা,
নৈতিক সাহসে নাশি ভ্রুকুটী অলীক।

বাক্য নহে,—রক্ত চাই আত্ম-বলিদান;
চাই—মৃত্যু, কঠোর সাধন;
সভা নহে, প্রেম চাই;
পারিবে কি দিতে তাই?
পারিবে কি হেসে প্রাণ সঁপিতে আপন?

উন্নতি কি শুধু কথা-আত্ম গুণগান?
সভাগৃহে শূন্য করতালি?
কত কৃচ্ছ তপস্যায়
সে রতনে পাওয়া যায়;
সাধনায় দিতে হয় প্রিয় প্রাণ ডালি।

পারিবে কি এই ব্রতে সঁপিতে জীবন?
ভেবে দেখ আপনার মনে;
নতুবা এ আবাহন
সব বৃথা অকারণ;
জীবন না দিলে কোথা পাইবে জীবনে;

ওই শুন কাঁপাইয়ে আকাশ অবনী
"প্রাণ চাই" উঠে এই স্বর;
পারিবে কি দিতে প্রাণ?
দিতে স্বার্থে বলিদান?
স্থির চিত্তে দেখ খুঁজে আপন অন্তর।

তা যদি না পার তবে মিছে আবাহন;
কালনিদ্রা—এই নিদ্রা ভাল;
জাগায়ে কাঁদায়ে মায়
কোন ফল নাহি হায়!
কেন এ ব্যথিত বুকে শোকানল জ্বাল?

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

দেব-দূত।

পালি ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। উহাদের সাধারণ নাম ত্রিপিটক। বুদ্ধদেব স্বয়ং যে সকল উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, উহা লইয়া সূত্র-পিটক বিরচিত হইয়াছে। সূত্রপিটকে যে সকল গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে অঙ্গুত্তর-নিকায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ডাক্তার রিচার্ড মরিস্ (Dr. Richard Morris M. A, LL. D, D. C. L) উক্ত গ্রন্থ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া লণ্ডন পালিটেক্সট্ সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি এই অঙ্গুত্তর-নিকায় গ্রন্থের দেবদূত নামক পরিচ্ছেদের ভাবার্থ নিম্নে প্রকাশিত করিলাম। দেবশব্দের অর্থ মৃত্যুরাজ বা যম। জরা, ব্যাধি ও মরণ এই তিনটী যমের দূত।

এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরীতে কোন পর্ণাবৃত শিংশপা বনে বিহার করিতেছিলেন। অনন্তর হস্তক নামক একজন জঙ্ঘাবিহারী ভিক্ষু তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবন! আপনার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় নাই ত?" ভগবান্ উত্তর করিলেন, "হে বৎস! আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, সংসারে যে সকল লোক সুখে নিদ্রালাভ করে, আমি তাহাদিগের অন্যতম।' তখন হস্তক ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভদন্ত! এখন শীতকাল, রাত্রিতে হিমপাত হইয়াছে ও অবিরত শীতল বাতাস প্রবাহিত

হইতেছে; আপনি যে ভূমিতে শায়িত ছিলেন, উহা বন্ধুর ও গোখুর দ্বারা আহত; বিরল-নিবিষ্ট পত্রসমূহ দ্বারা আপনার শয্যা বিরচিত হইয়াছে; আপনার পরিধেয় বস্ত্র কাষায়রাগরঞ্জিত, অথচ আপনি বলিতেছেন, আপনার সুখে নিদ্রা লাভ হইয়াছে ও যে সকল লোক সুখে নিদ্রালাভ করে, আপনি তাহাদিগের অন্যতম, ইহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

তখন ভগবান বলিলেন,"হে বৎস! মনে কর, কোন গৃহপতির গৃহ চতুর্দ্দিকে সুরক্ষিত; উহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না এবং উহার অভ্যন্তরে সুন্দর পর্য্যঙ্ক সংস্থাপিত আছে। পর্য্যঙ্কের উপরে মসৃণ উত্তরচ্ছদ এবং পর্য্যঙ্কের উভয় দিকে লোহিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত উপধান রহিয়াছে এবং গৃহের অভ্যন্তরে তৈলপ্রদীপ জ্বলিতেছে। হে বৎস! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি উক্ত গৃহপতি সেই গৃহে শয়িত হন, তাহা হইলে তিনি সুখে নিদ্রালাভ করিবেন কিনা?" হস্তক উত্তর করিল, "হে ভদন্ত! উক্ত গৃহপতি অবশ্য সুখে নিদ্রা যাইবেন।"

তখন ভগবান্ বলিলেন, "হে বৎস! মনে কর, উক্ত গৃহপতির কায়িক, বাচিক বা মানসিক কোন উৎকট পরিদাহ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি কাম বা ক্রোধ দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন; তাহা হইলে তিনি সুখে নিদ্রা যাইবেন কিনা?" হস্তক উত্তর করিল, "ভগবন্! সেই গৃহপতি কামক্রোধাদি দ্বারা দহ্যমান হইয়া কখনই সুখে নিদ্রালাভ করিতে পারিবেন না।"

তখন ভগবান্ বলিলেন, "হে বৎস! যে কামক্রোধাদি দ্বারা দগ্ধ হইয়া লোক সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না, আমার সেই কামক্রোধাদি সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন হইয়াছে। রাগ, দ্বেষ ও মোহ সম্পূর্ণভাবে উন্মূলিত হওয়ায় আমার অসুখের কিছু মাত্র কারণ নাই। হে বৎস! এই জন্যই বলিয়াছি, শীত রাত্রিতে, বন্ধুর ভূমিতে, পর্ণাবৃত শয্যায়, অনাবৃত দেহে সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।"

তদনন্তর ভগবান্ অন্যান্য ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ! লোক কায়িক, বাচিক ও মানসিক দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ইহজন্মে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না এবং পরকালে নিরয়গামী হয়।" এক সময়ে নিরয়পালগণ কোন পাপীলোককে মৃত্যুরাজের নিকট লইয়া বলিল "হে দেব! এই লোক জীবনে পিতা, মাতা, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কাহারও কোন উপকার করে নাই; কুলাঙ্গারকে আপনি সমুচিত দণ্ডবিধান করুন।"

মৃত্যুরাজ যম উক্ত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পুরুষ! তুমি জীবনে বহু পাপ করিয়াছ, তোমাকে পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য তোমার নিকট যে প্রথম দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহা দেখিতে পাও নাই? পুরুষ উত্তর করিল "হে ধর্ম্মরাজ! আমি সেই দূত দেখিতে পাই নাই, আমার নিকট কোন দূত যায় নাই।"

যমরাজ বলিলেন, "হে পুরুষ! তুমি কি সংসারে জরা দেখিতে পাও নাই? সংসারে জীর্ণদেহ, দণ্ডপরায়ণ, খণ্ডদন্ত ও পলিতকেশ কোন স্ত্রী বা পুরুষ কি কখন ও তোমার নয়নপথে উপস্থিত হয় নাই?"

পুরুষ উত্তর করিল "হে মাননীয় যমরাজ! আমি এবংবিধ অনেক লোক দেখিয়াছি।" তখন যমরাজ বলিলেন,

"তুমি এবংবিধ জরাগ্রস্ত লোক দেখিয়াও কায়িক, বাচিক ও মানসিক কল্যাণ কর্ম্মে রত হও নাই?" পুরুষ উত্তর করিল "হে ধর্ম্মরাজ! আমি কল্যাণকর্ম্ম করি নাই, আমার ভ্রম হইয়াছিল।" যমরাজ বলিলেন, "হে পুরুষ! ভ্রমবশতঃ পুণ্যকর্ম্ম কর নাই, অথচ অনেক পাপ করিয়াছ। তোমার পাপের ফল তোমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, মিত্র, অমিত্র, জ্ঞাতি ইত্যাদি কেহই ভোগ করিবে না; তোমার পাপের পরিণাম তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে।"

অনন্তর যমরাজ বলিলেন, "হে পুরুষ! তুমি ব্যাধি নামক দ্বিতীয় দূত এবং মরণ নামক তৃতীয় দূতকেও কি দেখিতে পাও নাই?" পুরুষ বলিল, "হে ধর্ম্মরাজ! আমি ব্যাধি ও মৃত্যু দ্বারা গ্রস্ত অনেক লোক দেখিয়াছি, কিন্তু উহাদের দেখিয়া কখনও মনে ভাবি নাই, আমারও ঐ প্রকার অবস্থা ঘটিবে। আমি অহংকারমত্ত হইয়া সৎকার্য্য করি নাই, আমার ভ্রম হইয়াছিল।"

এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। নিরয়পালগণ উক্ত ব্যক্তির দুই হস্ত, দুই পাদ, ও উরঃস্থল লৌহশৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধ করিল। সে তথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল, কিন্তু কর্ম্মের ক্ষয় না হওয়ায় তাহার জীবন বহির্গত হইল না। তখন নিরয়পালগণ তাহাকে ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশির করিয়া তাহাকে কুঠার দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। পরে তাহারা উহাকে প্রজ্বলিত অঙ্গার পর্ব্বতের উপর সংস্থাপন করিল। অনন্তর তাহারা উহাকে মহানিরয়ে নিক্ষেপ করিল। মহানিরয় অতি ভয়ানক:—

চতুকণ্ণো চতুদ্বারো বিভত্তো ভাগসো মিতো।
অয়োপাকার পরিয়ন্তো অয়সা পটিকুজ্জিতো।
তস্সঅয়োময়া ভূমি জলিতা তেজসা যুতা
সমন্তা যোজনসতং করিত্বা তিট্ঠতি সর্ব্বদা।

মহানিরয় চতুঃকর্ণ ও চতুর্দ্বার। উহা বহু ভাগে বিভক্ত ও অয়ঃপ্রাকার দ্বারা পরিরক্ষিত। উহা আয়োময় ভূমি শত যোজন পরিমাণ ও উহাতে সর্ব্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে।

যমরাজ বলিলেন, বহুলোক দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই প্রকার উৎকট যন্ত্রণা অনুভব করে ও উহারা নিরয়ে অবস্থান কালে বলিয়া থাকে, "অহো আমাদের পুনরায় মানবজন্ম-লাভ হউক, ভগবান্ বুদ্ধ সংসারে আবির্ভূত হইয়াছেন, আমরা তাহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পাপের ক্ষয় করি; ভগবানের ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া আমরা জন্ম, জরা, মরণ, ব্যাধি ইত্যাদির প্রশমন করি।"

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

শিক্ষিত শ্রেণীর বর্ত্তমান অভাব।

শিক্ষা পূর্ব্বে উচ্চ জাতিতে নিবদ্ধ ছিল। এখনও উচ্চ জাতীয়েরা শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য লালায়িত ও প্রয়াসবান্ সত্য, কিন্তু সকল জাতীয় লোকই এখন শিক্ষা প্রাপ্তির অধিকারী। ইহা ইংরাজ রাজত্বের প্রকৃতি। শিক্ষিত শ্রেণী বলিলেও পর্য্যাপ্ত হয় না। উচ্চ জাতীয় লোক ও নিম্ন জাতীয় ধনশালী শিক্ষিত লোক লইয়া একটী শ্রেণী। এই

শ্রেণীর আখ্যা ভদ্র। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য এই ভদ্র শ্রেণী। জমীদারগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইলেও তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য নহেন। মধ্যম শ্রেণীর কথা বলাই উদ্দেশ্য। এই মধ্যম শ্রেণী সমাজের প্রধান অবলম্বন। ইঁহাদের সংখ্যা উচ্চ শ্রেণীর সংখ্যা হইতে অনেক অধিক। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা সামাজিক ব্যবস্থা ঠিক থাকে। ইঁহাদের হাতেই সমাজের গঠন হয়। ইংরাজি শিক্ষার গুণে এই শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে। ঐ শিক্ষার প্রভাবে এই শ্রেণীর চিন্তা-স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইতিহাস, জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রভূত আলোচনায় বুদ্ধিও শাণিত হইয়াছে। সুতরাং জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার ও তাহার মীমাংসা বুঝিয়া লইবার শক্তি জন্মিয়াছে।

পূর্ব্বে জীবনের উদ্দেশ্য কিরূপ বর্ণিত হইত, তাহার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। সংক্ষেপেত বলিতে পারা যায় যে, ইহ-লোক মায়াময় ও পরলোক মাত্র সত্য, এই উপদেশ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীকেই ব্যাপিয়া ফেলিয়াছিল। হয় আত্মপরিবার প্রতিপালন, না হয় পরলোকে সদ্গতি লাভ, এই দুয়ের একটী চেষ্টা লইয়া সকল শ্রেণীর লোক ব্যাপৃত থাকিত। এই দুইটীর কোনটী যে কিছুমাত্র দোষাবহ, তাহা কখনই বলি না। পরিবার প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; এবং পরলোকে সদ্গতি লাভের চেষ্টাও সর্ব্ব প্রকারে প্রশংসিত। কিন্তু আমার বলিবার কথা এই যে, এই দুইটী মাত্র পর্য্যাপ্ত নহে। এই দুয়ের অন্যতর লক্ষ্যে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকায় অনেক ক্ষতি হইয়াছে। একটী ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত, এবং তাহার নিরসন লেখকের প্রার্থনা।

ঈশ্বরে ভক্তি ও জীবে দয়া, এই দুইটী উপাসকের লক্ষণ। সামাজিক লোক মাত্রেরই এই লক্ষ্য হওয়া উচিত। জীবে দয়া, এই কথাটীর অর্থ কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলিবার ইচ্ছা আছে। অতিথিকে এক মুষ্টি চাউল কি একটী পয়সা দিলে জীবে দয়া প্রকাশ হইল বটে, কিন্তু ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে। এই দয়া সমাজ বন্ধনের রজ্জু, জাতি গঠনের মশলা। যে প্রকার জীবে দয়াগুণে জাতি (Nation) হয়, তাহারই উন্মেষ হইয়াছে; ইংরাজি শিক্ষার সহায়ে এই গুণের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। এক্ষণে তাহা ক্রমশ বর্দ্ধমান হওয়া আকাঙ্ক্ষিত।

যাহারা পারিবারিক কার্য্যে ব্যাপৃত, তাহারা সংসারী। আর যাহারা পরলোকে সদ্গতি লাভের চেষ্টায় চেষ্টিত ও যাঁহারা তদ্বিষয়ে উপদেষ্টা, তাঁহারা উদাসীন। আমাদের দেশে এই দুই শ্রেণী মাত্র বর্ত্তমান। সংসারীর চেষ্টিতের সীমা আত্ম পরিবার, সুতরাং জাতি বা (Nation) এর কথা তাহার বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইত না। উদাসীন সংসার প্রত্যাখ্যান করিতেন। আমরা সংসারকে আরও কিছু বিস্তৃতভাবে বুঝিতে চাই। যেমন আত্মপরিবার, আপনার জাতি (Caste), আপনার ধর্ম্ম (Religious Sect) প্রভৃতি থাক আছে, সেইরূপ নেশন (Nation) রূপ একটী থাক আছে, তাহার উন্নতি অবনতি আছে, তাহার লক্ষ্য চেষ্টা আছে, তাহার জন্ম উৎসর্গ আছে, তাহার পূজা আছে, পূজায় সুফল আছে, তাহাতে সৎকর্ম্ম দ্বারা সদ্গতি হইয়া থাকে। পরলোকরূপ লক্ষ্যভ্রষ্ট না

হইয়া নেশন (Nation) রূপ সংসারের উপকার করা যাইতে পারে। এই জাতি (Nation) কি উপাদানে গড়ে, কি প্রকারে তাহার উন্নতি হয়, তাহার উন্নতিতে কি সুখ, তাহার উন্নতিকল্পে উৎসর্গ কিরূপ ও পূজায় কি ফল, এ সকল কথা বিস্তৃত করিয়া বলিবার ইচ্ছা নাই। সম্প্রতি জাতীয় জীবনের যেটী প্রয়োজন, তাহারই উল্লেখ করা উদ্দেশ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় হইতে পাশ্চাত্য প্রণালীর শিক্ষা বহু বিস্তৃত হইয়াছে। এক্ষণে শিক্ষিত শ্রেণীর লোক কি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, এই সমস্যা কঠিন হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সাহেবগণ বলিয়া থাকেন যে, এ দেশীয় শিক্ষিত লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া অবধি চাকুরীর অন্বেষণে ফিরে। এক হস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস, ও অপর হস্তে চাকুরীর দরখাস্ত লইয়া এ দেশীয় লোক রাজদ্বারে উপনীত হয়। ইহা তাঁহাদের মতে অন্যায়। আমরাও বুঝি যে ইহা অন্যায়। কিন্তু রাজপুরুষ ও আমাদের মতের যে টুকু পার্থক্য, তাহাই এস্থলে বক্তব্য। লর্ড কার্জ্জন পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া মহীসুর রাজ্যে উপনীত হইলে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী কথা উদ্ধৃত করিতেছি। বেঙ্গলী সংবাদপত্রে ঐ কথার আলোচনা পড়িয়াছি। লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন যে, আপনার রাজ্যে রাজকর্ম্ম পাইবার প্রত্যাশা দেশীয় লোকের পক্ষে অসঙ্গত নয়। আবাদের বক্তব্য এই যে, এ কথা যদি মহীসুরে বলিলে অর্থযুক্ত হয়, তবে বাঙ্গালা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ইহা অর্থশূন্য হইবে কেন? যাহা হউক, রাজপুরুষগণ, অধিক কি, রাজপ্রতিনিধি যখন বলিতেছেন যে, রাজ সরকারে কর্ম্ম পাইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অন্য জীবনোপায় দেখিতে হইবে, তখন আর যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বিচার করিতে যাওয়া নিষ্ফল। অন্য অন্য প্রকারে শিক্ষিত শ্রেণীর লোককে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার উপায় দেখিতেই হইবে।

কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণী শিক্ষারই বেগ-ধারণে অসমর্থ; অর্থাৎ ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়া, ঐ ভাষায় লিখিত জ্ঞান বিজ্ঞানে অধিকার লাভ করিতে এ দেশীয়ের শক্তিতে কুলাইতেছে না। এ দেশীয়ের মধ্যে বাঙ্গালীর কথাই জানি। উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রথম বিঘ্ন এই যে, তাঁহার স্বাস্থ্য হানি হইতেছে। উচ্চশিক্ষার ধকল এই হীনশক্তি বাঙ্গালী দেহ সহ্য করিতে পারিতেছে না। দ্বারকানাথ মিত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় দেশের ও তাঁহার নিজ পরিবারের অনিষ্ট ঘটিয়াছে। রমেশচন্দ্র মিত্র কিঞ্চিৎ অধিক দিন বাঁচিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষভাগে শরীরের অসুস্থতা প্রযুক্ত তিনি একপ্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। অধিক দিন বাঁচিয়া থাকায়, পারিবারিক অনিষ্ট নিবারিত হইয়াছে, কিন্তু দেশের বড় কিছু উপকার করিবার অবসর তিনি পান নাই। অথচ ধরিতে গেলে উভয়েই আত্মজীবনে নির্দ্দিষ্ট দৈনন্দিন কার্য্য (office business) ব্যতীত অধিক কিছুই করিতে পারেন নাই। দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা কেবল নির্দ্দিষ্ট দৈনন্দিন কার্য্য করিয়া গিয়াছেন,

তাহারাও দেশের দুরাদৃষ্ট বশত দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন নাই। এরূপ স্থলে কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, ইঁহারা যে অর্দ্ধপথে বিচ্ছিন্ন হইবেন, ইহাতে বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু এই অবস্থায় দেশের কি অনিষ্টপাত হইতেছে, ভাবিলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। রাজকার্য্যে যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামশঙ্কর সেন, কালীচরণ ঘোষ প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণনীয়। কালীচরণ ঘোষ চাকুরী হইতে অবসর লইবার পর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। রামশঙ্কর ঘোষ পীড়িত হওয়ায় শেষে অকর্ম্মণ্য হইয়াছিলেন। কে জানিত যে, রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয় কর্ম্মচারী রজনীনাথ রায় রোগগ্রস্ত হইয়া আমাদের আশালতার মূল ছিন্ন করিবেন! বঙ্কিমচন্দ্র চাকুরী হইতে অবসর লইয়া দুই বৎসরের মধ্যে নীরব হইলেন! আইন-ব্যবসায়ীগণের মধ্যে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রোগগ্রস্ত বলিয়া শুনিয়াছি। মনোমোহন ঘোষ অর্দ্ধ বয়সে কালের কবলে পতিত হইয়াছেন। যাঁহাদের স্বাস্থ্যহানি হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা বলিলাম। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বসু, গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, প্রভৃতি আরও অনেকের নাম করা যাইতে পারে। এক্ষণে যাঁহারা কোনও রকমে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন বলবান কর্ম্মক্ষম পুরুষ ছিলেন। বিধবা বিবাহের আন্দোলন ও চেষ্টা তাঁহার চিন্তাশক্তির পরিচায়ক প্রমাণ। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি সে চেষ্টার বাহ্যিক কোনও নিদর্শন রাখিয়া যান নাই। বোধ করি, স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ইহার কারণ মধ্যে গণিত হওয়া উচিত। প্যারীচরণ সরকার ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন; তিনি শেষ বয়সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইঁহাদিগের বৃদ্ধ বয়সেও শারীরিক মানসিক তেজস্বিতা রক্ষা হইয়াছে। কি প্রণালীতে ইঁহারা বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যহানির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে বর্ত্তমান সময়ের একটী অভাব নিরাকরণের পন্থা হয়।

সাধারণ ভাবে বিবেচনা করিলে, অর্থাৎ কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনের ঘটনা না লইয়া মোটের উপর বিবেচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইলে এইরূপ বুঝা যায় যে, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করিয়া, নিরামিষোপম খাদ্য আহার করিয়া, ব্যায়ামের অভাবে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনটী কারণের এক একটী স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য।

শিক্ষিত শ্রেণীকে অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করিতে হয় কিনা, আমরা অপর দেশের সহিত তুলনা করিবার সুবিধা পাই না। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, একটী বিদেশীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়া তাহার পর আমাদিগকে শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে হয়। এই বিদেশীয় ভাষা শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া পুস্তক পাঠ দ্বারা অভ্যাস করিতে হয়। মুখে মুখে শিক্ষা করিবার কোনই সুবিধা নাই। এই ভাষার ব্যাকরণ অতি অসম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে ভাষা কহিবার ও লিখিবার ভুল হইলে ব্যঙ্গোক্তি করিবার লোক অনেক। এই জন্য ছাত্র জীবনের প্রধান লক্ষ্য থাকে

ভাষা শিক্ষা। তৎপরেও সেই চর্চ্চা চলিতে থাকে। ইহাতে জীবনের সর্ব্বোত্তম ভাগ বৃথা কাটিয়া যায়। ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও তজ্জন্য যে পরিমাণ প্রয়াস পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মণি প্রভৃতি জাতিগণের সঙ্গে তুলনা করিলে আমাদের বড় অধিক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল, সে বিষয়েও সন্দেহ মাত্র নাই। আবার ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা আমরা কম পুষ্টিকর ও অল্প পরিমিত আহার করি, তাহাও নিশ্চিত। ইহার উপর শিক্ষা করিবার অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার বিষয় অনেকগুলি করিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকে। অনেক বিষয়ের মধ্যে একটী বা দুইটী বাছিয়া লইবার ব্যবস্থা পূর্ব্বে একবারেই ছিল না, তাহাতে প্রথমাবস্থায় বাঙ্গালী জাতির অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। একটী বা দুইটী বিষয় বাছিয়া লইবার অবকাশ যত অধিক পরিমাণে দেওয়া হয়, ততই মঙ্গল। ইংরাজি ভাষা ত একটী থাকিবেই, তাহার উপর আর একটী মাত্র বিষয় বাছিয়া লইবার অবকাশ না দেওয়াই প্রয়োজন। যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক অধিক বিষয় বাছিয়া লইতে চাহে, তাহাতে উৎসাহ দিবার প্রয়োজন তাদৃশ নাই। কেবল বিষয় বাছিয়া লওয়া ঠিক হইতেছে কিনা, সেইটুক মাত্র জানিবার জন্য একটু অবসর দিলেই যথেষ্ট।

পাসের পড়ায় বড় ভয়ঙ্কর শ্রম। কয়েক মাস ধরিয়া ছাত্রগণ আহার নিদ্রা বর্জ্জন করিয়া সাধনায় ব্যাপৃত হয়। পাস না পাইলে লজ্জা অপমান আছে, আবার পূর্ণ এক বৎসর পড়িতে হয়; যে বিষয়ে ভাল করিয়া শিক্ষা লাভ হইয়াছে ও পাস পাওয়া গিয়াছে, বিষয়ান্তরে পাস না পাওয়াতে তাহাতেও পাস না পাওয়া গণিত হয়। এই শেষোক্ত নিয়ম বড় কঠোর। আমরা জানি, গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র এ নিয়ম মানিয়া চলেন না। রাজ কর্ম্মচারীগণের মধ্যে কোনও কোনও শ্রেণীর কর্ম্মচারীকে অনেক বিষয়ে পাস পাইতে হয়। এমন নিয়ম আছে যে, পাস না পাইলে বেতন বৃদ্ধি হইবে না; কোনও কোনও স্থলে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই পাসের একটী নিয়ম এই যে, কেহ একবার যে বিষয়ে পাস পাইলেন, আর সে বিষয়ে তাঁহাকে পাস পাইতে হইবে না। শুদ্ধ ইহাই নহে, কর্ম্মচারীর ইচ্ছানুসারে একটী বিষয় মাত্র এক এক বারে বাছিয়া লইয়া তাহাতে পাস পাইবার প্রথা প্রচলিত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এতটা করিবার প্রার্থনা কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সুনয়নে না দেখিতে পারেন। কিন্তু বোধ করি, নিম্নলিখিত নিয়ম প্রচলনে বিশেষ বাধা বা অনিষ্ট না হইতে পারে। অর্থাৎ যে ছাত্র একবার পরীক্ষায় একটীমাত্র বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাকে আর একবার সেই বিষয়টীতে মাত্র পরীক্ষা দিয়া পাস পাইতে হইবে, অন্য বিষয়ে নহে; এরূপ নিয়ম করায় প্রভূত উপকার দর্শিতে পারে। বোধ হয়, ইংলণ্ডে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করিতে হয়, এই দুরূহ ব্যাপার স্মরণ করিলে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কঠোরতা পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন,

ইহা আমরা মনে করি না। যদি এই নিয়মের অপব্যবহারও হয়, তথাপি তাহা, ইহা প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে বাধা বলিয়া অনুমিত হইতে পারে না।

এ ত গেল কর্ত্তৃপক্ষীয়ের কাজ, সুতরাং পরায়ত্ত! যাহা ছাত্রগণের নিজায়ত্ত, তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলিতেছি। কেন যে ছাত্রগণ পরীক্ষার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই তিন বা ছয় মাসের জন্য এক বা দুই বৎসরের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ফেলিয়া রাখে, ও পরীক্ষার সম সম কালে দিশাহারা হইয়া অনিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা স্বাস্থ্য-হানি ডাকিয়া আনে, তাহা বুঝিতে পারি না। স্কুল কলেজে অধ্যাপকগণ এ বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী নন। ছাত্রেরা নিজেও এ বিষয়ে মনোযোগী নহে। যাহা নিজায়ত্ত কার্য্য, তাহা যদি এ ছাত্র জীবনে শিক্ষাকালে শিক্ষা না করিলে, তবে আর তাহা কবে শিখিবে? যখন স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, এবং হায় কেন পূর্ব্বে ভাবি নাই, বুঝি নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে উচ্চশিক্ষার প্রতি নিজের, পিতা-মাতার ও জাতিসাধারণের অননুরাগ উদ্ভব করিবার জীবন্ত ফুটন্ত দৃষ্টান্ত পড়িয়া রহিবে, তখন আর কিসে আত্মাদর ও সমাজ-সম্মান রক্ষা হইবে, আপনার ও দেশের উপকার হইবে?

দ্বিতীয় কারণ নিরামিষোপম আহার। বাঙ্গালীর আহার বড় পুষ্টিকর নহে। বাঙ্গালীর কার্য্যও শক্তিমান পুরুষের কার্য্যের অনুরূপ নহে। আহার ও কর্ম্ম, এই দুইটী কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। বাঙ্গালীর আহারের নিমিত্ত Ministerial অর্থাৎ সেবা কার্য্যই তাহাকে সাজে; Excutive অর্থাৎ নেতৃত্ব ও বল সাপেক্ষ কার্য্যে বাঙ্গালীকে অপটু বলিয়া রাজপুরুষেরা অবজ্ঞা করেন। ছাত্র জীবনের পক্ষেও এই আহার পর্য্যাপ্ত নহে। পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা আলোচনার সময় ছাত্রগণের যেরূপ আহার নিয়মিত ছিল, এক্ষণে তাহারও ব্যবস্থা নাই। সুতরাং পূর্ব্বের সে বুদ্ধিমত্তা এক্ষণে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। বুদ্ধিমত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু এই আহার শরীরকে সুস্থ রাখিতে পারিতেছে না, ইহা অস্বীকার করিবেন কেমন করিয়া? মাংসবহুল আহার আমাদের দেশে চলিবে না; অর্থের অভাব, ইচ্ছার বিরোধ, এবং বোধ হয়, অনভ্যাসের নিমিত্ত উপযোগীও নহে। অধিক মাংস ভোজন করায় দুর্ঘটনা হইয়াছে, এরূপ দুই একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মাংসবহুল আহার কর্ত্তব্য না হইলেও, মাংসবর্জ্জিত আহারও স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রচুর নহে; কিন্তু বাঙ্গালীর খাদ্য প্রায়ই মাংসবর্জ্জিত। কেহ কেহ রোগগ্রস্ত হইয়া মাংস মাত্র আহার করিয়া কাটাইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও জানি। যাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় মাংস ভোজনেব বিরোধী বলিয়া জানিতে পারি, তাঁহারা যে প্রয়োজনমত পরিমাণে দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ক্ষীর ব্যবহার করিয়া থাকেন, এরূপও অনুমান হয় না; কথায় তর্ক করিবার নিমিত্ত বলেন মাত্র, এইরূপ অনেক স্থলে বোধ জন্মাইয়াছে। যাহা হউক, প্রয়োজনানুরূপ মাংস ও দুগ্ধ ব্যবহার করিতে না পাওয়াতে হীন স্বাস্থ্য আরও হীন হইয়া যাইতেছে। দুগ্ধ প্রয়োজনীয়, মাংসও প্রয়োজনীয়। দুগ্ধের অভাব মাংস দ্বারা পূর্ণ করা যায় না, মাংসের অভাব

দুগ্ধের দ্বারা পূর্ণ করা যায় না। বিশেষত যে বহুমূত্র রোগের বাহুল্য বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে ডাক্তারেরা মাংসই পথ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। রোগ হইবার পূর্ব্ব হইতে মাংস ভোজনের ব্যবস্থা থাকিলে রোগবাহুল্য না হওয়ারই সম্ভাবনা। সুতরাং মাংস ভোজন বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। মাংস ভোজন পরিমিত চাই, অর্থাৎ যেমন বাঙ্গালী দুই বেলা দুগ্ধপানে অভ্যস্ত, মাংস ভোজনে ঝটিতি সেরূপ অভ্যস্ত হইতে পারে না।

তাহার পর আর একটী কথা হইতেছে, ভাল হউক, মন্দ হউক, আমরা যাহা কিছু আহার করি, তাহা সুজীর্ণ হইতে পায় না; কাজেই তাহাতে সম্যক উপকার হয় না। একেত পুষ্টিকর আহার সমস্ত দিন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়া উঠে না; তাহার উপর আবার ভুক্ত ভোজ্য সম্পূর্ণ কার্য্যকারিতা পায় না; এজন্য আহার হইতে শরীর পোষণের ব্যাঘাত জন্মে ও রোগোৎপত্তি হয়। কি প্রকারে ভুক্ত ভোজ্য জীর্ণ হইতে না পাইয়া রোগ উৎপাদন করে, তাহার বিবরণ স্বর্গীয় ডাক্তার কে, ডি, ঘোষের বক্তৃতায় শুনিয়াছিলাম। ডাক্তার এইরূপ বলিয়াছিলেন:—নিম্নতর বিচার বিভাগের কর্ম্মচারীরা (মুনসেফ ও সবজজগণ) প্রায় বহুমূত্র রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের কেহই সরকারী বাসস্থান বিনা ভাড়ায় বা ভাড়া দিয়াও পান না; এজন্য তাঁহাদের বাসস্থান, অনেক জায়গায়, স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী হয় না। কোন্ দিন বদলি হইবেন, একস্থানে দীর্ঘকাল থাকিবার কথা নহে, ইত্যাদি কারণে কেহ আপন ব্যয়ে ভাল বাস-গৃহ করিতেও পারেন না। কিন্তু বাসগৃহের কষ্ট অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট ও ক্ষতি হয়, সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত সমস্ত দিনের মধ্যে বিশ্রাম করিবার অবসর থাকে না। আদালতে বসিয়া অনবরত সাক্ষীর জমানবন্দী লিখিতে হয়। মোকদ্দমার রায় লিখিতে হয় বাটীতে আসিয়া। সুতরাং সকাল সন্ধ্যা কোনও সময়ে অবসর থাকে না। যে কথা উপস্থিত প্রবন্ধে বিশেষ প্রাসঙ্গিক, তাহা এখনও বলা হয় নাই। স্বর্গীয় ডাক্তার বলিয়াছিলেন, আহার করিয়াই এই সকল কর্ম্মচারী (Brain work) মানসিক পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হন। পাকস্থলী ও মস্তিষ্ক উভয়কে এক সময়েই কার্য্য করিতে হয়। পাকস্থলী ও মস্তিষ্ক বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র (organ)। একটী এইরূপ, কেহ ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, যন্ত্রের কার্য্য আপনি হইতে থাকিবে। অপরটী সেরূপ নহে, অর্থাৎ ইচ্ছা না করিলেও মনঃসংযোগ না থাকিলে তাহার কার্য্য চলে না। (Voluntary ও involuntary organ) আহারান্তে মানসিক পরিশ্রম করিতে থাকিলে মস্তিষ্কের কার্য্যের জন্য মনঃসংযোগ হেতু শক্তি (energy) সেই কার্য্যেই নিয়োজিত থাকে; পাকাশয় হইতে শক্তি অপকর্ষিত হইয়া আইসে, এজন্য পাকাশয়ের কার্য্য ভালরূপে হয় না, অর্থাৎ ভুক্ত খাদ্য ভালরূপে জীর্ণ হয় না। প্রথম প্রথম মাথা ধরিতে আরম্ভ হয়; ইহাই রোগ আরম্ভের প্রথম স্ফুট লক্ষণ। যিনি ইহা দেখিয়া সাবধান হইতে পারিলেন, তাঁহারই মঙ্গল। আর যিনি এই লক্ষণ উপেক্ষা করিলেন, রোগ তাহাকে ক্রমশ জিনিয়া বসিতে লাগিল। জীর্ণশক্তি উত্তরোত্তর হীয়মান হইয়া আসিয়া অবশেষে

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে উড়িয়া রমণী মোটা সুতার দেশী কাপড় পরিত। আজ কাল দেশী কাপড় অল্প, পাছা পেড়ে বিলাতী সাড়ী ধনী দরিদ্রের ঘরে ঘরে।

তখন স্ত্রীলোকে কাছা দিয়া কাপড় পরিত। অকচ্ছ স্ত্রীলোকের পর্য্যুপাসিত অন্নজল আচরণীয় বলিয়া গণ্য হইত না।

কাছাদিয়া কাপড় পরা যেরূপ কদর্য্য ভাবে সাধিত হইত, তাহাতে লজ্জা নিবারণ হইত না। তথাপি দেশীয় প্রাচীন প্রথা বলিয়া অবাধে চলিত। এবার আসিয়া কাছা দেওয়া স্ত্রীলোক একটীও দেখিতে পাইতেছি না। কাপড়ও পরিবার ধরণ ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ের মত হইয়াছে।

উড়িয়ানীর সে অলঙ্কার কোথায় গেল? হাত পায়ের অলঙ্কারের ভারে কত সময় স্বামীকে আদর করিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইয়া উড়িয়ানী তাহাকে স্বর্গে পাঠাইত। সে খড়ু তাড় বিদ ও পাউড়ের বোঝা কখন কখন পনর কুড়ী সের হইত শুনিয়াছি। আজ কাল তাহার একটী দেখিতে পাই না। এয়োৎ রাখিবার জন্য সীমন্তে সিন্দূর ও হাতে বালা, বাহি কি শাঁখা পরে। ভদ্র গৃহের উড়িয়া রমণী ও ভদ্র গৃহের বাঙ্গালী বেশ ভূষায় কোন পার্থক্য নাই। বারাঙ্গনাদেরও বেশ ভূষা এইরূপ। দরিদ্র গৃহে খড়ু ও তাড় স্থানে বাহি ও শাঁখা ব্যবহার হয়। পাউড় পল্লিগ্রামে চলিয়া গিয়াছে।

তখন নদীর ধারে বসিয়া স্ত্রীলোকেরা এক হাত দেড় হাত লম্বা একটা খেজুর ডাল লইয়া দাঁত ঘসিত। একটা দাঁতন দু চারি বৎসর চলিত! মুখ ধোয়া হইলে একতাল হলুদ ও এক বাটী তেল পায়ে মাখিত। এখন মুখ ধোয়া ও তেল মাখা গৃহে সমাধা হয়। হলুদ মাখা উঠিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধেরা এ পরিবর্ত্তন রোধ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, এখনও করিতেছেন, কিন্তু নারী-বিদ্রোহ নিবারণ করিতে সম্রাট লুই যখন অক্ষম হইয়াছিলেন, উড়িয়া বৃদ্ধেরা অক্ষম হইবেন, আশ্চর্য্য কি?

বেশ ভূষায় উড়িয়ানী বাঙ্গালীর প্রতিকৃতি। কিন্তু পিকা চুয়া ও গুণ্ডী ব্যবহার ছাড়েন নাই, কখন ছাড়িবেন বলিয়া বোধ হয় না। বরং বাঙ্গালিনীকে উহাদের ব্যবহারে অভ্যস্ত করিয়াছেন। গুণ্ডী ও চুয়ার চালান এখন অনেক বাড়িয়াছে। উড়িয়া পুরুষদের বেশ ভূষার পরিবর্ত্তন সামান্য হয় নাই, তখন ঘাড় কামান ও লম্বা টিকি সকলের দেখিতাম। এখন শতকরা কুড়ি জনের দেখা যায় না। যাহারা কিছু মাত্র লেখা পড়া শিখে নাই, তাহারাও টিক রাখে না বা ঘাড় কামায় না। দেখিলে বাঙ্গালী কি উড়িয়া, বুঝা যায় না।

গায়ে সাদা চাদর কি একটা জামা দেখিলে তখন বাঙ্গালী বলিয়া চিনিয়া লইতাম। বিদ্যালয়ের বালকদের মধ্যে তখন শতকরা কুড়ি জনে জামা পরিত, এখন জামা গায় নাই, এখন একটী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তখন তিন শত ছাত্রে দশ জনের পায় জুতা দেখিতাম, এখন দশ জনের পায় জুতা না থাকিতে পারে। তখন উড়িশ্যার ব্রাহ্মণ পান খাইতেন না, পানে যে চূণ আছে। আজ সম্মাননীয় সুপণ্ডিত আশী বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পান খাইতে দেখিলাম।

বাহিরে বাহিরে এই কয়দিনে যাহা দেখিলাম, তাহাই লিখিলাম। ঘরের ভিতরে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। বাড়ী গুলিতে এখন জানালা রাখা হয়, বাঙ্গালীর বাড়ীর মত আলোক ও বাতাস প্রবেশ করে, বোধ হয় গৃহসজ্জা ও অন্যান্য বিষয়েও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যদি চুয়া গুণ্ডী বিদায় লইত!

সহরে যত পরিবর্ত্তন, পল্লীগ্রামে তত হইয়া থাকিবে সম্ভব নহে। কিন্তু কিছুই যে হয় নাই, তাহাও নহে। তখন সহরে পরিবার আনা নিষিদ্ধ ছিল। কোন ভদ্র লোক সহরে পরিবার আনিতেন না। এখন সে দোষ কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং সহরের সভ্যতা পল্লিগ্রামেও যে কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, অনুমান করা যাইতে পারে।

পরিবর্ত্তন যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গালী উড়িয়ার আদর্শ। পূর্ব্বকালে উড়িশ্যা দক্ষিণাপথ হইতে সভ্যতার আমদানী করিয়াছিল। উড়িশ্যার প্রধান রাজ

বংশ মাদ্রাজ অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন, নাগপুর হইতে মারহাট্টারা গত শতাব্দীতে উড়িশ্যা প্রভাবিত করিয়াছিল। বাঙ্গালী রাজা নহে, তথাপি বাঙ্গালী এক প্রান্তে আসাম ও অন্য প্রান্তে উড়িশ্যার আদর্শ হইয়াছে। পূর্ব্বে আসাম ও উড়িশ্যায় বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত ছিল। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর তাহা উঠিয়া গিয়াছে। আচার ব্যবহারের সঙ্গে যদি এই দুই প্রদেশে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিত, তবে একীকরণ কত অগ্রসর হইত? ভাষা ভিন্ন হইলেও, ভাবে আসামী, বাঙ্গালী ও উড়িয়া এক হইয়া উঠিতেছে। কি করিয়া বাঙ্গালী, উড়িয়া ও আসামীর আদর্শ হইল, চিন্তার বিষয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

হেম-কলস।

'কিনি' 'কিনি' কিঙ্কিনি বোলত মধুর,
রূপ গাথা 'কঙ্কণ' ঘোষয়ে প্রভুর,
কানাড়া ছাদনে গুম্ফিত কবরী,
মালতী মালিকা তাহার উপরি,
তনুরুচি, পঙ্কজ—মৃদুল বিকাশ,
প্রেমভরা অন্তরে, চামেলী সুবাস;
নবীন যৌবনে প্রফুল্ল গুরুয়া,
সুনীল নিচোলে আবরি তনুয়া,
বনি বনি রঙ্গিনী, কুঞ্জর গমনে,
একু একু ভ্রমিছে নিকুঞ্জ ভবনে।
পুষ্পিত কাননে মলয় সমীর,
হরষে কম্পিত, বিকল অধীর,
শাখী শাখে, কোকিল পঞ্চম তানে,
ঢালি দেয় মরন্দ, জন্তু সব প্রাণে;
উগারে মাধুরী শ্যামল লতিকা
ঢালিছে সুরভি, নবীন যূথিকা,
বিচকিত 'সম্বর,' নয়ন প্রসারি
রসবতী অম্বর যতনে নেহারি
প্রেম মাখা অপঘন, অপঘন প্রেম
রাধা নহে সুধুরাধা, সুধা ভরা হেম।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

বিদেশিনী।

কলস্বরা মন্দাকিনী আনন্দ-সলিলে
বেষ্টিত কনক-কান্তি অমর-নন্দনে
পুষ্প-বিরচিত পথে ভ্রমিবার কালে,
উদাসিনী স্মৃতি, তথা কহিল কি তোমা
সুদূর মর্ত্ত্যের বার্ত্তা? ভাসিল কি মনে,
নির্ম্মল শারদাকাশে পূর্ণচন্দ্র সম,
অতীত সুখের স্বপ্ন, অভিনব সাজে?
নিষ্পেষিত হৃদয়ের অনল-যাতনা
স্মরিয়ে কেঁদেছে প্রাণ, কুসুম কোমল,
নীরব নিশীথে তাই দাঁড়ায়ে শিয়রে
মনোরমা শান্ত বেশে, স্থির, অচঞ্চল,
ঢালিতে আশ্বাস বাণী, অমৃত নিঝরে
"অচির বিচ্ছেদ এই—অনন্ত অপার
প্রণয়ের পুণ্য রাজ্যে মিলিব আবার"।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

নদী।

অবিরত শুধু কল কল,
কোন্ সমাচার ল'য়ে কোথা যাস বল?
কত বিরহীর ব্যথা,
নিরাশার আকুলতা,
তোর ওই কল গানে যেন উছলায়!
তোর—উন্মাদিনী প্রাণ কারে চায়!

তালে তালে নাচিয়া মোহন!
কত ভূত ভবিষ্যৎ করাও স্মরণ।
কখনো বালিকা বেশে,
মৃদুল মধুর হেসে,
তারাবধূ-সহ খেল কি খেলা মহান্।
শত আঁখি ল'য়ে করি পান।

যৌবনের তীব্র সম্মিলনে,
কি খেলা খেলাও সতি! বীরাঙ্গনা সনে।
হৃদয়ের শশধরে,
আছাড়ি গরব ভরে,

কি কারণে বলিতে পারি না, এই মহান্ যোগের সাধনায় বাধা অনেক ও ইহার উৎপাতকারী অসুর দুর্দ্ধর্ষ। এজন্য এই যোগসাধনা দুঃসাধ্য। শ্রীমন্মথনাথ বসু।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (২০)

মায়াবাদ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ মত এবং আমরা মায়াবাদ যেরূপ ভাবে বুঝিয়াছি, তাহা আমরা সংক্ষেপে পূর্ব্ব তিন সংখ্যায় বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অনেকে শঙ্করকে বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। আমরা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ও অন্যান্য লেখা হইতে, তাঁহার মায়াবাদটী কিরূপ, তাহা ক্রমে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব। এ সংখ্যায় নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে আরো গুটীকতক কথা বলিতে হইতেছে; নতুবা আমরা পূর্ব্ব তিন সংখ্যায় যে কথা বলিয়াছি, তাহা বিশদ হইবে না।

জ্ঞেয় (object) ভিন্ন জ্ঞানের স্থিতি সম্ভবে না। জ্ঞেয়, জ্ঞান হইতে পৃথক্ নহে; উহা জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। কেবল কার্য্যকালে উহার পৃথক্ত্ব সূচিত হয় মাত্র। জ্ঞেয়, অভিন্নভাবে ;জ্ঞানেতেই লুক্কায়িত থাকে ;—জ্ঞানের স্বরূপই এইরূপ। বেদান্তে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্রহ্ম যদি জ্ঞানস্বরূপই হইলেন, তবে জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই জ্ঞানে, জ্ঞেয়-পদার্থরাশি নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয়াছিল। কেন না, জ্ঞেয় ছাড়া, জ্ঞানের স্থিতি কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, যদি জ্ঞেয়-পদার্থরাশি, জ্ঞানেরই আত্মভূত হয় এবং জ্ঞানেতেই উদ্ভূত হওয়া নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যে সৃষ্টির প্রাক্‌কালে "সর্ব্বজ্ঞ" রূপে বর্ণিত হইবেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় কি? সেই লুক্কায়িত জ্ঞেয় বহিঃপ্রকাশিত হইলে, জ্ঞানের নিজের স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটিতে পারে না। তাহাতে জ্ঞান সাকার হইয়া যায় না। এ কথা শঙ্করাচার্য্য উত্তম যুক্তি সহকারে প্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এইরূপ :—

"আত্মনঃ স্বরূপংজ্ঞপ্তি র্ন ততো ব্যতিরিচ্যতে, অতো নিত্যৈব। তথাপি বুদ্ধে রূপাবিলক্ষণায়াশ্চক্ষুরাদিদ্বারৈর্বিষয়াকারপরিণামিন্যা যে শব্দাদ্যাকারাব ভাসাস্তে আত্মবিজ্ঞানস্য বিষয়ভূত। উৎপদ্যমানা এবাত্মবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তা উপপদ্যন্তে। তস্মাৎ * * তে আত্মন এব ধর্ম্মাবিক্রিয়ারূপা ইত্যবিবেকিভিঃ পরিকল্প্যন্তে। যত্তু ব্রহ্মণো বিজ্ঞানং তৎ সবিতৃ প্রকাশবদপ্যুঞ্চচ্চ ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তং স্বরূপমেব তৎ। সর্ব্বভাবানাঞ্চ তেনাবিভক্ত দেশকালাকাশাদি কারণত্বাচ্চ নিরতিশয় সূক্ষ্মত্বাচ্চ ন তস্মাদন্যদবিজ্ঞেয়ং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবিষ্যচ্চবাস্তি, তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞংতদ্ব্রহ্ম।"

এই সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যের ভাবার্থ এই যে, জ্ঞান আত্মারই স্বরূপ; জ্ঞান আত্মা হইতে পৃথক্ নহে; উহা নিত্য। বুদ্ধি বিষয়াকারে পরিণত হইয়া, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত বৈষয়িক ঘট পটাদির জ্ঞান উৎপাদন করে, সে জ্ঞান আত্ম-জ্ঞানেরই ক্রিয়া বা বিকাশ হইলেও, মুর্খ লোকে সেই জ্ঞানকে বিকারী বা পরিণামী জ্ঞান মনে করে। কিন্তু তাহা ভুল। ব্রহ্মের জ্ঞান, ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত;—ব্রহ্মস্বরূপ ছাড়া উহা আর কিছুই নহে। জ্ঞেয় মাত্রেই, সেই জ্ঞানে অবিভক্তরূপে থাকায় এবং উহা অত্যন্ত সূক্ষ্মবিধায়,কোন জ্ঞেয় বস্তুই,সেই জ্ঞান হইতে

দূরে থাকিতে পারে না;—সমস্ত জ্ঞেয়ই সেই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া যায়। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকারণ,ইহা সিদ্ধ হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য এই জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া, অন্য এক স্থলে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত হইল। ডাক্তার থিব এই অনুবাদ করিয়াছেন :—

"To maintain that he who possesses eternal knowledge (নিত্যজ্ঞানং) capable to throw light on all objects is not all-knowing (সর্ব্বজ্ঞ) is contradictory. If his knowledge were considered non-permanent (অনিত্য), he would know sometimes and sometimes he would not know ; from which it would follow indeed that he is not all-knowing. This fault is avoided is we admit Brahma's knowledge to be permanent. But it may be obejected on this latter alternative the knower cannot be designated as independent with reference to the act of knowing.—Why not? we reply. The sun also, although his heat and light are permanent, is nevertheless designated as independent, when we say 'he burns,' 'he gives light.' But it will again be objected that we say the sun burns or gives light with reference to some *object* to be heated or illuminated ; Brahma stands before the creation, in no relation to any object of knowledge. This objection too, we reply, is not valid, for as a matter of fact we speak of the sun as an *agent*, saying,—'the sun shines,' even without reference to any object. Hence Brahma may be spoken of as an agent even without reference to any *object* of knowledge. If however an object is supposed to be required, the texts ascribing *thought* to Brahma will fit all the better. What then is that object to which the knowledge of the Lord can refer previously of the origin of the world? Name and Form (নামরূপ), we reply,—unevolved but about to be evolved."

বিষয়টী অতীব গুরুতর এবং শঙ্করের মত প্রকাশক বলিয়া, আমরা কিছু দীর্ঘ অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক ক্ষমা করিবেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাষ্য এবং এই ভাষ্যানুবাদ হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জ্ঞেয়—জ্ঞানেরই স্বরূপভূত; জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিয়া জ্ঞেয়ের স্থিতি সিদ্ধ হইতে পারে না। সূক্ষ্ম ও অবিভক্তরূপে সমুদয় জ্ঞেয়, জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ,সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বেশ্বর বলা যাইতে পারে। তাহাতে ব্রহ্মের (জ্ঞানের) স্বরূপ বিচ্যুতি ঘটিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মে সৃষ্টিস্থিতির জ্ঞান নিত্য নিয়ত বিদ্যমান আছে। এই ভাবে দেখিতে গেলে ব্রহ্মকে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম বলা যায়; কেননা সে জ্ঞানে সমুদয় জ্ঞেয় যুগপৎ অবিভক্ত রূপে সর্ব্বদা উপস্থিত আছে। এইরূপে, বেদান্তে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সগুণ সর্ব্বজ্ঞ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই সগুণ ব্রহ্মই গীতাতে "পরম পুরুষ" শব্দে নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। কাজেই, ব্রহ্ম জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট অথচ সর্ব্বাতীত রূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। ইনি সগুণরূপে জগতে প্রবিষ্ট না থাকিলে, জগতে আত্মার (Life) উদ্ভব হইতে পারিত না। অতএব কেবল কারণ রূপে দেখিতে গেলে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় (Absolute) হইলেও,-যখন তাঁহাকে জগতের সঙ্গে সম্বন্ধরূপে (Related) দেখা যায়, যখন তাঁহাকে কার্য্যরাশির কারণ রূপে দেখা যায়, তখনই ব্রহ্মকে "ঈশ্বর" বলা যায়। তাঁহাতে কার্য্য সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও, তাঁহার স্বরূপের কোন ক্ষতি বা বিচ্যুতি ঘটে না। কেননা তিনি সর্ব্বাতীত ও কেবল চৈতন্য স্বরূপ। তাঁহাকে কার্য্যের "কারণ" রূপে স্বীকার করিলেই, কারণে কার্য্যের ও স্থিতি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কারণে, কার্য্য—সূক্ষ্মরূপে, অবিভক্তরূপে,—বর্ত্তমান থাকে। অতএব কারণ রূপে তাঁহাকে স্বীকার করিলেই, সেই কারণের ধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তি-

মত্বাদি এবং সেই কারণে কার্য্যেরও নিত্য-বিদ্যমানতা—অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। নতুবা তাঁহাকে কারণই বলা যাইতে পারে না। অতএব কার্য্যের কারণ রূপে বা জ্ঞেয়ের জ্ঞাতারূপে, তিনি আদি পুরুষ বা সগুণ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপ স্বীকার করিতে হইলে, তাঁহাকে সগুণ না বলিয়াও পারা যায় না। অতএব নির্গুণ ব্রহ্ম হইতেই জগৎ ও জীবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, একথা এখন বুঝা গেল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যখন কার্য্যরাশি সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে অবিভক্তরূপে — শক্তিরূপে — বর্ত্তমান থাকে, তখনই তাহা মায়া বা প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম, অবিভক্ত প্রকৃতিকে ঈশ্বর ক্রমে প্রকাশিত করেন। ক্রমে ইহাই স্থূলরূপে দেখা দেয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

দ্বৈতাদ্বৈত চিন্তার অনুশীলন।

সকল কথা, সকল সত্য, সকল শাস্ত্রের মূল আমি। আমিত্বের বিকাশ হইতে কথা, সত্য ও শাস্ত্র। আমিত্বের প্রসার, বিকাশ ও বিস্তৃতি ভিন্ন কিছুরই অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। আমি না থাকিলে আমার নিকট কিছুই নাই—সব শূন্য। আমি আছি বলিয়াই আমার নিকট সব অস্তিত্ববান।

আমি কি, আমি কে? আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় যাইব? কত দর্শন কত ভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছে,—কিন্তু অকূলের কূল নির্ণয় করিতে পারে নাই। আমিত্বের উদয় এবং তিরোধান কেহ জানে না, বুঝে না—কেহ দেখে নাই, কেহ স্পর্শ করে নাই, কেহ অনুভব করে নাই। সকল ইন্দ্রিয় এখানে পরাস্ত। পড়িবামাত্র মানব-শিশুর যে শ্বাস চলিতে আরম্ভ হইল—মৃত্যুর সময় সেই শ্বাস বন্ধ হইল—কে আসিল, কে যাইল—চিরকাল মহা সমস্যাময়। কোথা হইতে আসিল, কোথায় গেল—চিরকাল মহা সমস্যাময়। কোন ব্যাখ্যা সমীচীন? কোন্ টীকা প্রত্যক্ষ সত্যমূলক? অকূলের কূল নির্ণীত হয় নাই—হইবে না,—হইবার নয়। আমিত্বের মহাবীজে অনন্তেরই মহা আভাস। তুমি বল সান্ত, সান্ত, সবই সান্ত; কিন্তু আমি অণু পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া এই চৈতন্যময় মানব বীজের মূলে সর্ব্বত্রই কেবল অনন্তেরই আভাস পাই। আমি বলি—সবই অনন্ত,—সান্ত বা পরিমিত কিছুই নাই।

জড় বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছে জড় অবিনশ্বর;—মনোবিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছে, চৈতন্যও অবিনশ্বর। মানুষ জড় ও চৈতন্যের সংমিশ্রণ; সুতরাং মানুষও অবিনশ্বর। পঞ্চভৌতিক দেহ মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে বিলীন, কিন্তু চৈতন্য কোথায় লুকাইল? পাখী কোন্ অদৃশ্য জগত হইতে আসিয়াছিল, কোথায় গেল, কেহই জানে না। অবিনশ্বর চৈতন্য কোন্ রাজ্যে প্রস্থান করিল, কল্পনার কথা বাদে দিলে, কেহই ঠিক বলিতে পারে না। মহাসমস্যা, মহা প্রহেলিকা। যদি বলিতে পারিত, তবে আমিত্বের সোপান অবলম্বন করিয়া অনন্তের আভাস পাওয়া যাইত না। সান্ত মানুষে, অনন্তের মহামিলন।

সান্ত মানুষে যেমন অনন্তের মহামিলন; এই সান্ত মানুষেই, তেমনি, দ্বৈতাদ্বৈতের মহা ব্যাখ্যা। আমি মাটীর পুতুল, আমি সোণার পরী। আমি যখন পাপের পথে ঘুরি, পাপ চিন্তা, পাপ আহার, পাপ পান করি, তখন আমি মাটী তুল্য,—অথবা মাটী অপেক্ষাও হীন এবং নীচ। মানুষের অকার্য্য কি আছে? পাপের সংসারে মানুষকে অন্বেষণ কর, দেখিবে, পশুর পশুত্বেও তুলনায় ভাল বলিয়া বোধ হইবে। আমি সে সকল পাপের কাহিনী আর বিবৃত করিব না। পাপের সংসার —মোহের মহান্ধকারে আচ্ছন্ন, সৎ, চিৎ আনন্দ-সূর্য্যের প্রকাশ সেখানে নাই। সেখানে কেবল অসুর, পিশাচ, নররূপী সয়তান বাস করে। সে দ্বৈতপুরী। আমি যখন নররূপী সয়তান, তখন শ্রেয় বা বিবেক আমার নিকট প্রকাশিত হয় কি? ডুবিতে ডুবিতে এমন অন্ধকারময় প্রদেশে আসিয়াছি, যখন আর দেবধামের কোন কিছুর সাক্ষাৎ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়; তখন আমি পৃথক, তখন আমি নরক, তখন আমি দ্বিত্বে বিহার করিতেছি। স্বর্গের বাণী ক্বচিৎ শুনিলেও তাহা গ্রাহ্য করি না, আমি তখন অহংময়। আমি বলি, আমি চলি, আমি করি—তখন আমি সর্ব্বেসর্ব্বা। আমার প্রতি কথায় গরল, প্রতি পদনিক্ষেপে নরক, প্রতি কার্য্যে পাপ। এ হেন অবস্থায় আমি দ্বিত্বের রাজ্যে স্বামিত্বের বিজয় নিশান উড়াইতেছি। কিন্তু দৈব কোন ঘটনায়, কোন প্রক্রিয়ায়, কোন লীলায় এই আমিত্বের কখন কখন আবার রূপান্তর হয়। যে নরহত্যায় লিপ্ত ছিল, সে কখনও আবার নরসেবায় প্রবৃত্ত; যে ইন্দ্রিয়াসক্তিতে ডুবিতেছিল, সে কখনও আবার সংযমের পথে ফিরিতেছে;—যে নরকের পথে মরিতেছিল, সে কখনও আবার স্বর্গের অন্বেষণ করিতেছে। মৃত্যু সদা এই সংসারে বিচরণ করিয়া মোহের জাল ছিন্ন করিতেছে—মানুষকে যেন সদা সতর্ক করিতেছে। মানুষ একদিন, দশ দিন, এক বৎসর, বা দশ বিশ বৎসর ভুলিতে পারে, কিন্তু চিরকাল ভুলিয়া থাকিতে পারে না। ভুলিতে চায় সে, কিন্তু তবুও পারে না। কে যেন সদা তাহাকে জাগাইতে চেষ্টা করিতেছে। পতনের পর উত্থান হইবেই হইবে,—কেহ চিরপতিত থাকিতে পারে না। দ্বৈতের ভিতরে অদ্বৈতের মহাপ্রকাশ।

দ্বিজত্ব পায় নাই, পুনর্জন্ম হয় নাই, এই সংসারে এমন মানুষের কল্পনা করা যায় না। জগাই মাধাই নবদ্বীপের জঙ্গলে দস্যুগিরি করিয়া ফিরিত, হঠাৎ অদ্বৈতের প্রকাশে রূপান্তরিত; বাল্মীকি নরহত্যা করিয়া অরণ্যে জীবন কাটাইতেন, অদ্বৈতের আবির্ভাবে তিনি হঠাৎ মহা কবি। এক সময়ের সল, পল হইলেন; এক সময়ের আগষ্টাইন, সেণ্ট হইলেন। এক সময়ের গর্ব্বিত নিমাই পণ্ডিত, সময়ান্তরে প্রেম ভক্তিতে নমিত শ্রীচৈতন্য; এক সময়ে যিনি সূত্রধরের পুত্র যিশু, অন্য সময়ে তিনি মানবের উদ্ধারকর্ত্তা খ্রীষ্ট। মহম্মদ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, স্বর্গের আলোক হঠাৎ তাঁহার মস্তকে অবতীর্ণ হইল। শ্রীচৈতন্য কখনও কখনও বলিতেন, "মুই সেই;" খ্রীষ্ট বলিতেন, "I and my father are one,—" এ কোন্ অবস্থায়? দ্বৈতের রাজ্যে চৈতন্য এবং খ্রীষ্ট শচী ও মেরীনন্দন; কিন্তু অদ্বৈতের রাজ্যে উভয়েই আত্মহারা আর

একটা কিছু। আমি, আমি, আমি—মাটীর পুতুল, পাপের কীট; সময়ান্তরে এই আমি, স্বর্গের পরী, সোণার চাঁদ। আমি কখন শুধু আমিই; আবার কখনও যেন আর এক রাজ্যের জীব। আমি দ্বৈত, পাপের পথে; আমি অদ্বৈত—পুণ্য বা স্বর্গের পথে। আমি কে? আমার ভিতরে যখন পাপ কিলবিল করিতেছে,—ইন্দ্রিয় বা রিপুর তাড়নায় যখন আমি অস্থির, তখন আমি স্বর্গভ্রষ্ট, দেবত্বভ্রষ্ট, অসুর; আমি তখন পৃথক। এই আমার ভিতরে যখন পুণ্যের আবির্ভাব, সংযমের কশাঘাতে যখন মোহাসক্তির বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন, আমি যখন ধীর এবং স্থির—যখন দয়া, প্রেম, পুণ্য, জ্ঞান ও সেবায় নিষ্কাম মহাযোগী, তখন আমি কে? তখন আমি চিতের অংশ; অংশ নই, আমিত্ব তখন চিন্ময়ত্বে বিসর্জ্জিত হইয়াছে—তখন অদ্বৈত শক্তি-সিন্ধুতে তরঙ্গ উঠিতেছে; পৃথিবীর দ্বৈত অসুরের বিনাশ সাধন হইয়াছে।

কাল অনবরত মানুষের মস্তকে কিছু চাপাইয়া যাইতেছে। সময় কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কেহ জানে না; কিন্তু ইহা সকলেই জানে, সময় কিছু না কিছু মানুষকে দিয়া যাইতেছে। সময় দিয়া যাইতেছে বলিয়াই মানুষ অতীত বংশের সঞ্চিত সত্য জ্ঞান পুণ্য রাশির উত্তরাধিকারী। বংশ পরম্পরায়, কত জ্ঞান, কত ভাব, কত শিক্ষা, কত অভিজ্ঞতা মানুষের মস্তকে চাপিতেছে। কালের সংগ্রাম বড় ভীষণ সংগ্রাম। মানুষ মায়া মোহের অধীন হইয়া মজিয়া থাকিতে চাহিলেও, সময় তাহা দিতেছে না। সময়—বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ের পর বার্দ্ধক্য আনিতেছে। মানুষ ইচ্ছা বা চেষ্টা না করিলেও, সময় তাহার মস্তকে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা চাপাইয়া দিতেছে। সময়ের পীড়নে মানুষের জ্ঞান, পুণ্য ভাব, অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও রিপু নিস্তেজ হইতেছে, মস্তিষ্ক শিথিল হইতেছে, স্মৃতিশক্তি হ্রাস হইতেছে, সে ক্রমে ক্রমে বলবীর্য্য, ক্রমে ক্রমে শক্তি ঔসৌন্দর্য্য, ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি সংসারাসক্তি হারাইতেছে—সে যেন দিন দিন কেমন হইতেছে। মানুষের সাধ ও ইচ্ছা ছিল অনেক—কিন্তু হায়, সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে না হইতে, সে সাধ মিটিতে না মিটিতেই চিত্ত নিস্তেজ, ইন্দ্রিয় শ্লথ, অঙ্গ পরিম্লান হইয়া আসিতেছে। ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে, তাহার বাসনা, তাহার কামনা, তাহার আসক্তি, তাহার পাপানুরাগ,—কি জানি কেন, কমিয়া আসিতেছে। অপূর্ণ পিপাসা, কি জানি কেন, অপনা আপনি হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সে আগে কত বাক্‌যুদ্ধ করিত, এখন সহস্রবার উত্তেজনা করিলেও একটী কথাও বলিতে চায় না; পরনিন্দায় তাহার কত উল্লাস ছিল, এখন হাজার উত্তেজনা করিলেও কাহারও নিন্দা করিতে সে চায় না; সে আগে কোন মানুষের ভাল দেখিতে পারিত না, হিংসা বিদ্বেষে জর্জ্জরিত ছিল, এখন সে সকলের উন্নতি দেখিলে কত উল্লসিত হয়;—সে আগে কাম ক্রোধ লোভের জন্য না করিত, এমন কাজ নাই; এখন সব ঝটিকা যেন থামিয়া আসিতেছে,—দিন দিন সে আসক্তিহীন, কামনাহীন, বাসনা-রহিত—কি জানি কেমন এক প্রকার কোন্ রাজ্যের লোক হইয়াছে। তুমি তাহার সহস্র নিন্দা কর, সে ফিরিয়াও চাহে না, তুমি তাহার কত অনিষ্ট করিতেছ,

সে একবারও তাকায় না;—সে দিন দিন যেন কেমন হইতেছে। দেবদূত সময়, মানুষকে, ঘটনা, অবস্থা, শোক দুঃখের ভিতর ফেলিয়া নিষ্পেষিত করিয়া এমন একটা অবস্থায় শেষে উপস্থিত করে, পূর্ব্বের মানুষ যেন আর নাই। পূর্ব্বের মানুষকে অন্বেষণ কর, আর এ সংসারে খুঁজিয়া পাইবে না। বাল্যে যে ছিল, যৌবনে সে নাই; যৌবনে যে ছিল, বার্দ্ধক্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এক অবস্থায় মৃত্যু, অন্য অবস্থায় পুনর্জন্ম, সংসারের নিত্য ঘটনা। নবজীবন লাভ করিতে করিতে, শেষে, বার্দ্ধক্যে আমিত্বের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইতেছে,—ইচ্ছায় ইচ্ছার মিলন হইতেছে—এক মহতী ইচ্ছা তাঁহাকে যেন পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। স্বতন্ত্র মানুষ মরিয়া গিয়াছে, চিৎরাজ্যে অদ্বৈতের উদয় হইয়াছে। বন্ধু, তুমি কি বল?

বয়স করে কি?—বয়স শোক দুঃখের শীতল বারি সিঞ্চনে আসক্তির প্রজ্বলিত আগুন নির্ব্বাণ করে। এই সংসার যেন শিক্ষালয়। কর্ম্মবন্ধনে ফেলিয়া, খাটাইয়া, কোন্ মহামায়া যেন মানুষকে নির্ব্বাণের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এই সময়ে কেবল কাজ, কেবল কর্ম্ম। মানুষ অবিরত খাটিতেছে, ছুটিতেছে, একটুও বিরাম নাই। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কত খাটুনী, ঘর বাড়ী পরিবারের জন্য কত খাটুনী, সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য কত খাটুনী। খাটিতে খাটিতে মানুষ পরিশ্রান্ত; তবুও খাটুনির বিরাম নাই। দ্বৈত অবস্থায় কর্ম্ম বন্ধন মহা বন্ধন,—এই বন্ধন-মুক্তি না হইলে আসক্তির রজ্জু ছিন্ন হয় না। অমুক্ত অবস্থায়, এইরূপে—একটু ভালবাসিলাম, তৃপ্তি নাই; আরো বাসিলাম, তবুও তৃপ্তি নাই। একটু জ্ঞান চর্চ্চা করিলাম, তৃপ্তি নাই। আর একটু চর্চ্চা করিলাম, তৃপ্তি কিছুতেই মিলিল না। ক্রমাগত হাটিতে, ছুটিতে খাটিতে, লাগিলাম। অনন্তের পথে অনন্ত খাটুনি। যাইতে যাইতে, খাটিতে খাটিতে—শেষে, অবশেষে, হায় একি তত্ত্বে আসিয়া পৌঁছিলাম? পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, ভাই বন্ধুর ভালবাসার পথে হাটিতে হাটিতে, শেষে, এক অনন্ত প্রেমের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত। জ্ঞানের চর্চ্চা করিতে করিতে, শেষে, এক অকূল জ্ঞান-সাগরে আসিয়া উপনীত। মনুষ্যত্বের পথে হাটিতে হাটিতে, শেষে, মানুষ দেবত্বে উপনীত। বয়সের পরিপক্কতার সহিত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের পরিপক্কতা উপস্থিত। অসম্পূর্ণতা—পাপ, মোহ, আবিলতা ঘুচিতে ঘুচিতে, শেষে পূর্ণত্বের দিকে অভিযান। তবুও যদি তুমি এহেন মানুষকে দ্বৈত পদবীতে বসাইতে চাও, আমি নাচার। বৃদ্ধের স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়াছে,—চিন্ময়ত্বে তাহার সকল স্বাতন্ত্র্য, সকল রিপু, সকল ইন্দ্রিয় নির্ব্বাপিত;—সে এখন অদ্বৈতের ভিতরে সুষুপ্ত। ইহাকে মানুষেরা না বুঝিয়া মৃত্যু নামে অভিহিত করে! হায়, না বুঝিয়া কত ক্রন্দন, কত হাহাকার করে!! আমি বলি, দ্বৈত মানুষ এখন অদ্বৈত সিন্ধুতে নিমগ্ন। মহা যোগ, মহা সমাধি, মহামিলন। পিতা পৃথক, পুত্রও পৃথক,—পিতার রাজ্য, সৎসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া কত বিপথে ঘুরিল, এখন আবার পুত্র পিতার চরণতলে উপস্থিত,—এখন পিতা পুত্রের মিলন হইয়াছে; এক ইচ্ছা, এক জ্ঞান, এক তত্ত্ব, এক সত্য, এক ধর্ম্মে একাকার। এখন, এহেন অবস্থায়ও, যে পার্থক্য দেখে, সে গভীর সৃষ্টি-রহস্য মোটেই বুঝে নাই।

দ্বিত্ব-বোধ, ভোজের বাজি, লীলার বুদ্বুদ, চক্ষের ভেল্কি, উহা কিছুই নয়, উহা কিছুই নয়। পাপ-বোধের পরও আমি পাপের পথে চিরকাল ঘুরিব, মরিব, পচিব, এ অধিকার আমার মোটেই নাই। দশ বৎসর, নয় বিশ ত্রিশ বৎসর। একজন আমার পশ্চাতে লাগিয়া আছেন, যিনি অনবরত লাগাম টানিয়া ধরিতেছেন। সাধ্য কি আমার যে আমি ক্রমাগত মরণের পথে চলিব? আমার শোণিত অবিরত শিরায় শিরায় চলিতেছে, আমার সাধ্য নাই, রোধ; করি আমার চক্ষের পলক নিমেষে নিমেষে পড়িতেছে,আমার সাধ্য নাই থামাই; পাকস্থলীতে ভুক্ত আহারের হজম হইতেছে, সাধ্য নাই, কর্ত্তৃত্ব করি; আমার স্নায়ু সকল অবিরত বিদ্যুতের ন্যায় নানা বার্ত্তা মস্তিষ্কে বহন করিতেছে, সাধ্য নাই, আমি রোধ করি। কাহারও দুঃখ কষ্ট দেখিলে আমার কান্না পায়, বিপদ দেখিলে ভয় আসে, সাধ্য নাই আমি রোধ করি। আমি কি পারি, আমি কি বা করি? দেখিতে চাই একটা, দেখি আর একটা; করিতে চাই একটা, করিয়া বসি আর একটা। আমার বুকের ভিতরে কে যেন অনবরত কেমন একটা স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, আমি ত কিছুতেই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিলাম না। সংসার আমাকে কিনিতে চাহিল, আমি বিক্রীত হইলাম না। পাপ চিরদাসত্বে আমাকে উৎসর্গ করিতে চাহিল, আমি অনুৎসর্গই রহিলাম;—ভাই বন্ধু, স্ত্রী পুত্র, আমাকে এটা সেটা ধরাইয়া মজাইয়া রাখিতে চাহিল, আমি মজিতে পারিলাম কই? কে যেন আমাকে সদা কেমন একরূপ করিতে চাহিতেছে। তোমরা, সমস্ত সংসার, চাও একরূপ করিতে, তিনি চান আর একরূপ করিতে! আমি কি করিব বল, আমার ক্ষমতা কোথায় যে ফিরি? আমার অসার আমিত্ব, অক্ষম স্বামিত্ব। যিনি আমাকে ধরিয়াছেন, তিনি তোমাকে বা তাঁহাকে কি ভুলিয়া রহিয়াছেন? না—তাহা অসম্ভব। তিনি তোমাকে তুমিত্বে, আমাকে আমিত্বে, তাহাকে তিনিত্বেই লইয়া যাইতেছেন। মানুষ কত কোটী বৎসর চেষ্টা করিল, দশ জনকেও মিলাইতে পারিল কি?—একরূপ করিতে পারিল কি? বিধানই তাহা নয়। প্রতি বৃক্ষের সহস্র পাতা সহস্র প্রকার, মানব পরিবারের কোটী সন্তান, কোটী প্রকার। প্রতি বস্তু বা জীবই বিশেষত্বে পূর্ণ; কাহাকে কে উপেক্ষা করিবে? এইরূপ যদি না হইত, অনন্তের আভাস কেহ পাইত না। অনন্তের আভাস দিবার জন্য কে যেন এইরূপ বিধান করিতেছেন। আমি অনন্তের ছেলে, অনন্তের বিন্দু ধরিয়াই, অনন্তের আদেশে অনন্তের পথে চলিলাম; কাহারও সাধ্য হইল না, আমাকে বাঁধিয়া রাখে? তুমি বল, এটা কর, সেটা কর;—আমি তোমার প্রচারিত পথে যাইতে চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না;—কেননা, আমার শক্তি নাই, আমি শক্তিহারা জড়ভরত। বৃথা আমাকে তিরস্কার কেন কর ভাই? কত চিকিৎসক এ জগতে আছে, কিন্তু প্রতিদিন কোটী কোটী লোকের শরীরান্ত হইতেছে, কে রাখিতে পারে? ঈশার ঘাতকের হাতের মৃত্যু,শ্রীচৈতন্যের সমুদ্রে পতন—অপরিহার্য্য ঘটনা। রাজা মরিতেছেন,প্রজা মরিতেছেন,মহাধনী মরিতেছেন, নিতান্ত দরিদ্র যে, সেও মরিতেছে। বিধান স্বতন্ত্র কি? এক সূর্য্য এক চন্দ্র সকলকে আলোক প্রদান করে, এক বায়ু সকলকে রক্ষা করে, একজল সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করে;—বিধান স্বতন্ত্র কি? কেহ স্বর্ণপাত্রে, কেহ বা গণ্ডুষে জল পান করে, তৃষ্ণা নিবারণ দুয়েরই হয়। বিধান, এক ভিন্ন দুই নয়, গতি এক ভিন্ন বহু নয়;—পাত্রানুসারে- আলোক, বায়ু ও জলকে পৃথকরূপ দেখাইলেও, তাহা একই আলো, বায়ু ও জল। ভেল্কি বা ভোজের বাজি দেখিয়া যে ভোলে, বৃথা যে অহঙ্কারে ফোলে, প্রকৃতি-তত্ত্ব সে মোটেই বুঝে নাই।

মূল কথা, আমি, তুমি, তিনি—সকলেই এক স্থানে পৃথক পৃথক, আবার আর এক স্থানে একাকার। জীবনে রূপান্তর, মরণে একাকার; অথবা সীমায় রূপান্তর, অসীমে একাকার। কত নদী হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া কত নামে পরিচিত হইল, কিন্তু যখন বঙ্গ উপসাগরে মিলিল, তখন সব একাকার। ভেদ কোথায়, বন্ধু বলত? আমার জীবন-ইতিহাসেও আমার কতরূপ, কত বিভিন্ন প্রকৃতি,—কখন আমি অসুর, কখনও সুর, কখন দস্যু, কখনও দেবতা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে—যখন মরণের পথে পাপ সকল নির্ব্বাণ, ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয় বা রিপু সকল নিস্তেজ, তখন ক্রমে ক্রমে স্বামিত্ব ও আমিত্বের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমাকে পূর্ণ রূপে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। একটী, একটী, একটী করিয়া যখন পাপ বলিদান হইতে লাগিল,তখন শত দিক হইতে শত প্রকারে পুণ্যের অভ্যুদয় হইতে লাগিল; শেষে একদিন জগত বিস্ময়ে দেখিল, "আমিত্ব" বলিয়া যে একটা দিগ্বিজয়ী অসুর ছিল, সেটা কোন্ নির্ব্বাণ-পুরে বিলীন হইয়া গিয়াছে,সেখানে এক পুণ্যময় দেবতার লীলা প্রকটিত হইয়াছে; দেখিল, দেবাসুর সংগ্রামে এক মহাশক্তির জয় হইয়াছে। তখন বহু লোকে কেবল সেই শক্তিরই জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। হায়, আত্মপ্রশংসা ভুলিয়া কবে সব মানুষ সেই মহা শক্তির—সেই অদ্বৈত শক্তির জয় ঘোষণা করিতে রত হইবে! শক্তি কি আর আছে? এক শক্তি—পূর্ণ শক্তি—সকল,সর্ব্বস্বগ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ভাই ভক্তির সহিত, আকাশ কাঁপাইয়া বল—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" দ্বৈতজ্ঞান কেবল ভোজের বাজি—অদ্বৈতের প্রকট লীলা মাত্র, ভাই বল, এক শক্তি, এক ধর্ম্ম, এক জ্ঞান;—বল—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

কর্ম্মফল ও করুণাবাদ।

আজকাল যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতমিত লইয়া উদার ভাবে আলোচনা করিতে লোকের যেন একটু প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এ অবস্থা ছিল না; সে সময়ে একমাত্র ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন অন্য কোথাও ধর্ম্ম চর্চ্চা বড় একটা দেখা যাইত না। তখনকার ব্রাহ্মসমাজও কতকগুলি সংকীর্ণ মত বিশ্বাস লইয়া নাড়া চাড়া করিতেন; সুতরাং দেশের বা বিদেশের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের কথাবার্ত্তা, মত বিশ্বাসে দৃক্‌পাত করিতেন না।

বাল্যকালে দেখিয়াছি, পিতা ঠাকুরকে হাতের লেখা একখানি ভগবদ্গীতা সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হইয়াছিল। এখন সেই গীতা-গ্রন্থ হাটে মাঠে ছড়াছড়ি

দেখিতে পাওয়া যায়, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতীয় সমস্ত ভাষায় ব্যাখ্যাদি সহ-ত বিস্তর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেই, তদ্ভিন্ন ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সুদূর পাশ্চাত্য রাজ্য সমূহেও বহুতর সংস্করণ প্রচারিত; শুধু প্রচারিত নয়, ঐ সকল দেশের লোক নিয়মিতরূপে গীতা অধ্যয়ন করতঃ উহার সম্যক মর্য্যাদা করিতে শিখিয়াছেন। হলণ্ডের রাজধানী আমষ্টার্ডাম নগরে গীতানুশীলনের জন্য রীতিমত একটী সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে,তাহার নাম"গীতা সমাজ''।

উক্ত প্রকারে ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রের আলোচনা করিতে আরম্ভ করায় খ্রীষ্টান জগতের এতকালের পোষিত ধর্ম্মমত যেন টল্‌টলায়মান বলিয়া বোধ হয়। জন্মজন্মান্তর ও কর্ম্মফলবাদ ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে শিকড় গাড়িবার উপক্রম করিতেছে বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। * বাস্তবিক জন্মজন্মান্তর বাদ গীতার ভিত্তি; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে গীতার ভিতর প্রবেশ করিতে গেলে কর্ম্মফলের দ্বারা জন্ম জন্মান্তরে দণ্ড-পুরস্কার ভোগ সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া থাকা যায় না। আমাদের দেশে একজন মাত্র ঐ মতটী বাদ দিয়া গীতার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ব্রাহ্ম-সমাজের নববিধান শাখার বিখ্যাত উপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্গৌরগোবিন্দ রায় মহোদয় যে সংস্করণ বাহির করিয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র, তাহাতেই জন্মান্তর সম্বন্ধীয় মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ পণ্ডিত, তাঁহার যেরূপ শাস্ত্র জ্ঞান ও গবেষণা, তাহাতে তাঁহার কথার উপর কথা কহা আমাদের মত মূর্খের কিছুতেই সাজে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিলে বোধ হয় কোন দোষ হয় না যে, শঙ্কর, শ্রীধরাদি মহামহোপাধ্যায় ধর্ম্ম-বীরগণের মধ্যে কেহই উক্ত মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান নাই; বরং সর্ব্বতোভাবে উহার পোষকতা করিয়াই গিয়াছেন।

বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ভারতে ছোট বড় যে কত প্রকারের ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই, ঐ সমস্ত দলের লোকসমূহ প্রায়ই শিক্ষিত ভদ্র লোক। কতকগুলি পুরাতন মুমূর্ষু সম্প্রদায়, যাহা এ যাবৎ নিম্নশ্রেণীর লোকে পূর্ণ ছিল, তাহাও, কতক ভদ্র লোকদিগের দ্বারা পুনর্জীবিত হইয়া নূতন উদ্যমের

* জন্মজন্মান্তরবাদ যে পাশ্চাত্য ভূমে এই প্রথম উপস্থিত, একথা বলা যায় না; বহুপূর্ব্বে পিথাগোরাস্ কর্ত্তৃক উহা প্রচারিত হয়। তদনন্তর প্রাথমিক খ্রীষ্টানগণও উহা স্বীকার করিতেন। বাইবেলের স্থানে স্থানে উহার প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে, যথা যোব্ এক স্থলে বলিতেছেন,—"উলঙ্গ মাতৃগর্ভ হইতে আসিয়াছি, পুনরায় উলঙ্গ তথায় গমন করিব।' (Naked have I come out of my mother's womb, and naked shall I return thereto' —Job)যিশু নিজের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি ইলাইয়াস নহি, ইলাইয়াস জন-দি বাপতিস্ত্ রূপে এবার আসিয়াছেন।" জনৈক জন্মান্ধের বিষয়ে প্রশ্ন করাতেও তিনি এ প্রকার উত্তর দিয়াছিলেন, যাহাতে সহজে বুঝা যায় যে,পূর্ব্ব জন্মকৃত অপরাধ জন্য অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ অসম্ভব নয়। আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, উচ্চ শ্রেণীর সাধুগণ ভগবানের আদেশে তাঁহার বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বিধান প্রচারার্থ বারম্বার পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন। কেবল সাধুগণই আসেন, অসাধুগণকে একেবারেই আসিতে হয় না, এ কথাটা যেন কেমন কেমন বোধ হয়।

সহিত জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহা বড় আশ্চর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত সকল সম্প্রদায়ের জন্মজন্মান্তর সম্বন্ধে এক মত। ঐ পুরাতন পরিত্যক্ত বিশ্বাসটী স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতেছেন। যাঁহারা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নন, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত বিশ্বাস লইয়া মাথা ঘামাইতে আদবেই চাহেন না, এরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চোপাধিধারী ঘোর দুনিয়াদার ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারাও জন্মজন্মান্তর বাদ সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া উহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুমাত্র আপত্তি করেন না।

এরূপ ক্ষেত্রে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের প্রচারিত কর্ম্মফল ও জন্মজন্মান্তর সম্বন্ধীয় মত বিশ্বাসটুকু যে নেহাত পোড়াইয়া ফেলিবার জিনিস, এ প্রকার বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। নব্যভারতে ইহার বিরুদ্ধে দুই একটী প্রবন্ধ পাঠ করা হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন আলোক পাওয়া যায় নাই। আমাদের মত লোকের বিদ্যাবুদ্ধি তত বেশী নয় যে, অত বড় একটা গুরুতর বিষয়ে ওরূপ দুই চারিটা ভাসা-ভাসা কথাতে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হই। দুর্ভাগ্যের বিষয় ও সম্বন্ধে আর কোন বিজ্ঞ ভ্রাতা স্বপক্ষতা বা বিপক্ষতা অবলম্বন করতঃ কোন রূপ আলোচনা করিলেন না। যাহা হউক, মতটী বিজ্ঞানের ছুরিকায় ব্যবচ্ছিন্ন হইলে কিরূপ দাঁড়ায়, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। স্বপক্ষীয় পণ্ডিতবর্গ * যে সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন, এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করেন, তাহাতে ত আমাদের বিলক্ষণ ধাঁদা লাগিবারই কথা। এজন্য কোন প্রকার তর্কের কথা তুলিতে ভয় হয়। তবে উক্ত ধীমান ব্যক্তিগণের মধ্যে, যাঁহারা কর্ম্মফলকে চূড়ান্ত সাব্যস্ত করিয়া দয়াময়ের করুণাবাদকে অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের সঙ্গে দুই একটা কথা কহিবার ইচ্ছায় নিজের জিজ্ঞাস্য নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

বাল্যকালে একদল পণ্ডিতের কথা শুনিতাম, যাঁহাদের মতে ঘড়ি নির্ম্মাতার ঘড়ির মত, বহুকাল হইল, ঈশ্বর এই বিশ্ব-সৃষ্টি করিয়া ছাড়িয়া দিয়া এখন নিশ্চিন্ত, নিষ্কর্ম্মা হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, ইহার সহিত আর তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই, এখন ইহা তাঁহার নির্দ্ধারিত নিয়মে চলিতেছে, কাহাকেও কিছু দেখিতে হয় না। উক্তরূপ পণ্ডিত কোথাও দেখিতে পাইলাম না। সুতরাং ঐ মত সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের আর মীমাংসা হইল না। কিন্তু আধুনিক কর্ম্মফলবাদিগণের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, উপরোক্ত শ্রেণীর বিশ্বাসী দলের সঙ্গে তাঁহাদের ত কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা জগদীশ্বর সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়াই অবসর গ্রহণ করিয়াছেন? কি কিছুদিন দাপটের সহিত শাসনকার্য্য সম্পাদন করিয়া ক্লান্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন? কিম্বা

* পূজ্যপাদ প্রাতঃস্মরণীয় ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে একবার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হন যে, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা বেশী প্রমাণ আর কি চাই? পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবও উহা স্পষ্ট প্রচার করিতেন।

বার্দ্ধক্য বশতঃ অকর্ম্মণ্য হওয়াতে পদচ্যুত হইয়াছেন, না কর্ম্মক্ষম থাকা সত্ত্বেও ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের নিয়ম জারি করতঃ তাঁহাকে পেন্‌সেন লইতে বাধ্য করা হইয়াছে ? ইহাই এ অধীনের জিজ্ঞাস্য।

অনেক সাধু মহাত্মার মুখে শুনিয়াছি, ঈশ্বর প্রত্যেক অণুর প্রাণ হইয়া রহিয়াছেন, তিনি প্রাণের প্রাণ হইয়া না থাকিলে বিশ্ব এখনই লোপ পাইত। তিনি দয়াময়, তাঁহার করুণাতেই বিশ্ব সংসার চলিতেছে, তাঁহার দয়া ব্যতীত কোন জীব তিলেকের জন্য তিষ্ঠিতে পারে না। নানা দেশের নানা মহাপুরুষ এবং নানা শাস্ত্রে একমুখে তাঁহার দয়া, প্রেম প্রভৃতি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এখন কি বুঝিতে হইবে যে, সে সকল বাতুলের প্রলাপ মাত্র ? আমাদিগকে এতকাল পরে কি এই বিশ্বাস করিতে হইবে যে, নিরেট কাজ ভিন্ন ভগবানে ভক্তি শ্রদ্ধা বা তাঁহার উপাসনা প্রার্থনাতে কোন ফল হইবে না ? ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন কালের ধর্ম্ম গ্রন্থাদিতে বিপন্ন, পাপাচ্ছন্ন, অনুতপ্ত জীবনের সান্ত্বনার জন্য যে সকল ভগবৎকৃপার দৃষ্টান্ত উদাহরণ লিপিবদ্ধ দেখা যায়, সে গুলি কি কেবল কল্পনা-প্রসূত স্তোক বাক্য মাত্র ?

কর্ম্মফলবাদীদিগের পুরাণাদি হইতে দুইটী আখ্যায়িকা এখানে দিতেছি, পাঠক দেখুন, এগুলি কেমন মিষ্ট ও আশাপ্রদ। এ সব কি নিতান্তই ছেলে ভুলান গল্প ?—কোন ব্রাহ্মণ নিয়ত ভগবানের ধ্যানে রত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করেন, কিন্তু তাঁহার অন্ন কষ্ট অতীব তীব্র। দুই এক দিন উপবাসের পর এক দিন আহার জুটিয়া থাকে। একদা নারদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, ব্রাহ্মণ তাঁহার দ্বারা বিধাতাপুরুষের নিকট এজন্য আবেদন পাঠাইলেন। উত্তর এই আসিল যে, পূর্ব্বজন্মেও তিনি কেবল তপস্যাই করিয়াছিলেন, দান খয়রাত বড় কিছু করেন নাই, কাজেই তাঁহার জমা পুঁজি বেশী নাই ; সামান্য যাহা কিছু আছে, তাহাই হিসাব করিয়া কেবল মাত্র প্রাণধারণ জন্য দুই এক দিন অন্তর দেওয়া হইতেছে। যতদিন তাঁহার আয়ু, তাহাতে প্রত্যহ দিলে কুলাইতে পারা যাইবে না। উত্তর শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া ভগবানকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, ওরূপ কিস্তিবন্দির আর প্রয়োজন নাই, যাহা কিছু জমা পুঁজি বাকী আছে, একেবারে দেওয়া হউক ; তার পর তাঁহার অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে। ভগবান তাহাতেই সম্মত হইয়া একেবারে সমস্ত পাঠাইয়া দিলেন। সেই প্রচুর আহার্য্য দ্রব্যাদি পাইয়া সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ আনন্দের সহিত নিরন্ন দীন দুঃখীদিগকে এক দিন পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের দ্বারা হঠাৎ এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায়, তদ্বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা সমস্ত শুনিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে, তাহার রাজ্যে এরূপ সাধু ব্রাহ্মণকে ঐ প্রকারে উপবাসী থাকিতে হয় ; এবং সেই দিন হইতে রাজভাণ্ডার হইতে তাঁহার ভরণ পোষণের জন্য রীতিমত বন্দোবস্ত হইল। এখন এখানে দেখিতে হইবে যে, কর্ম্মফলবাদীদের মতে এ জন্মের কর্ম্মফল এজন্মে পাওয়া যায় না, খাতায় জমা খরচ হইয়া জন্মান্তরে দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভগবান দয়া করিয়া বিশেষ কারণে যে নিয়মের ব্যভিচার করিয়া নগদ নগদ

হিসাব মিটাইলেন। তাহা হইলে আর তিনি পেন্‌শন প্রাপ্ত বা বার্দ্ধক্য বশতঃ অন্ধ পঙ্গু হইয়া কাজের বাহির হইলেন কি প্রকারে ? তাঁহার দয়া ত বিশেষ কাজ করিল। এটীত গেল জড় জগতের প্রয়োজনাভাব মোচন সম্বন্ধে ; দ্বিতীয়টী দেখুন।—কোন বেশ্যা আজীবন নিজের অসদ্‌বৃত্তি দ্বারা দিন কাটাইয়া যমালয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে দেখা গেল যে, তাহার সমস্তই অসৎ কার্য্য ; একটী মাত্র সৎকার্য্য এই যে, তাহার ফুলবাগানের সুন্দর সুন্দর ফুলগুলি সে কাহাকেও তুলিতে দিত না, কেবল একটী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের প্রতি আদেশ ছিল যে, তিনি দেবপূজার্থ সমস্ত ফুল লইয়া যাইবেন। সেই ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ বল উহার ছিল। বেশ্যা প্রথমেই সুকৃতির ফল ভোগের অভিলাষিণী হওয়ায় তাহাকে অতি মনোরম পুষ্প সমূহ শোভিত একটী প্রশস্ত উদ্যান তিন মাসের জন্য ভোগ করিতে দেওয়া হইল। উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই চতুর্দ্দিকের পবিত্র ভাবে বেশ্যার চিত্তে ভয়ানক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হওয়ায় সে ভগবানের চরণে ক্রমাগত অনুতাপাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। অনবরত তিন মাস কাল এক ভাবে এবম্প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত করা হেতু তাহার সমস্ত পাপ বিধৌত হইয়া পূর্ব্বকৃত যাবদীয় অপরাধের মার্জ্জনা হইল।—ইহা কি করুণাবাদ নহে ? বিশেষ ক্ষেত্রে এরূপ দয়া করিলে কি তাঁহার ন্যায়পরায়ণতায় ত্রুটি ঘটিয়া তাঁহাতে পক্ষপাতিতার দোষ স্পর্শে ? আমাদের ন্যায় কৃপাভিখারী জীবের মতে ত এরূপ স্থলে কোন প্রকার অন্যায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দয়াময় নামের সার্থকতা ত এই শ্রেণীর ঘটনাতেই জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আর একটী আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করা যাউক। এটী বিদেশীয়, কিন্তু বড়ই মধুর। খ্রীষ্টানেরা এইটী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের মত সংস্থাপনে যত্ন পাইয়া থাকেন।—গ্রীস দেশীয় কোন নরপতি অতি সাধু চরিত্র ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তিনি রাজ্য মধ্যে ব্যভিচার নিবারণার্থ এ প্রকার বিধান ঘোষিত করেন যে, যে কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি মন্দ অভিপ্রায়ে কটাক্ষপাত করিবে, তাহার দুই চক্ষু উৎপাটন করা হইবে। রাজার একমাত্র পুত্র অতি সজ্জন, সর্ব্বলোকপ্রিয়, কোমল প্রকৃতির যুবক দৈবাৎ উক্ত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইতে পারে না, নরপতি আদেশ করিলেন যে, কোন দিকে না তাকাইয়া সাধারণ প্রজার ন্যায় রাজকুমারের প্রতি দণ্ড বিধান হইবে, ইহাতে কোন প্রকারে অন্যথা হইতে পারে না। দেশশুদ্ধ প্রজা যুবরাজের পক্ষে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল, রাজা কিছুতেই কর্ণপাত করেন না। অবশেষে অনেক উপরোধ অনুরোধ, কাকুতি মিনতির পর কৃপালু নরপতি এই মীমাংসা করিলেন যে, দুই চক্ষুই নষ্ট করা হইবে, তবে এই পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে যে, উহার এক চক্ষু ও উহার পরিবর্ত্তে আমার নিজের এক চক্ষু উৎপাটিত হউক। শেষে তাহাই হইল—আইনের মর্য্যাদাও রক্ষিত হইল, যথাসাধ্য কৃপা প্রদর্শনেও ত্রুটি করা গেল না। খ্রীষ্টানগণ এই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে চাহেন যে, পরম পিতা দুর্ব্বল মানবপুত্রগণকে তাহা-

দের পাপের সম্যক দণ্ড ভোগ করিতে অশক্ত দেখিয়া কৃপাপরবশ হইয়া নিজে মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া পুত্রগণের পাপ-ভার বহন করতঃ ক্রমে রক্তদান করিয়া গেলেন। কথটা যেমন হউক, বড় শক্ত কথা। দীন,হীন ক্ষীণ অসহায় মানবগণের প্রতি দয়াল পিতার এত করুণাই বটে। ভাবিলে চক্ষে জল ধরে না। এ হেন কৃপা-নিধি সন্তানবৎসল জগৎপিতাকে সিংহা-সনচ্যুত করিতে কি প্রাণ ফাটিয়া যায় না! জানি না কোন্ প্রাণে উল্লিখিত শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতেরা একমাত্র কঠোর কর্ম্ম-বাদের আইনকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন? দয়াময়ের দয়া বিশ্ব-রাজ্য হইতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে কি তাঁহাদের প্রাণে একটুও ব্যথা লাগে না?

প্রেমময়ী মা জগদম্বা জগদ্ধাত্রীরূপে আমাদিগকে কোলে করিয়া স্তনপান করা-ইতেছেন; তাঁহার সুকোমল ক্রোড়ে বসিয়া আমরা কত না উৎপাত করিতেছি; তন্মধ্যে অনেকগুলি স্নেহ পরবশ হইয়া উপেক্ষা করি-তেছেন; বিশেষ দোষগুলি হইতে আমা-দিগকে টানিয়া আনিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ তিরস্কার করিতেছেন, গুরুতর অপরাধগুলির জন্য বেত্রাঘাত সহ্য করি-তেছি; আবার ব্যাকুল ভাবে রোদন দ্বারা অনুতাপ করিলে বহুতর পাপ মার্জ্জিতও হই-তেছে। এই ত আমাদের বিশ্বাস। হস্তি পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র পিপীলিকা লম্ফ ঝম্প করিলে মাতাঙ্গ-রাজ কি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদদলিত করতঃ দণ্ড বিধান করিয়া থাকে? জগন্মাতা কি তাঁহার ভীষণ কঠোরতা প্রদর্শন জন্য এই বিশ্বসংসার পাতিয়া দুর্ব্বল মানবের উপর নানাবিধ কঠিন শাস্তি দিয়া সুখ বোধ করি-তেছেন? কেবল তাঁহার অলঙ্ঘনীয় বিধি ব্যবস্থাদির মর্য্যাদা রক্ষা করাই এই ভব-লীলার একমাত্র উদ্দেশ্য? এ কথা ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে যে, অসংখ্য প্রকারের অগণ্য প্রলোভনের মধ্যে এই হীনবল জীবকে আইনের কলে নিক্ষেপ করিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া তামাসা দেখিতে-ছেন। মূঢ় অর্ব্বাচীন অসহায় মানব সমূহ তাঁহার আইনের খেলার সামগ্রী কখনই হইতে পারে না। দয়াময়ীর অনন্ত করুণার নিকট আমাদের পাপাদি কিছুই নয়; হাজার হইলেও পাপরাশির অবশ্য একটা সীমা আছে, মায়ের করুণার সীমা নাই। ভাই, ভয় নাই "জয় মা করুণাময়ীর জয়" বলিয়া প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে চীৎ-কার করতঃ মায়ের অপার করুণার দোহাই দিতে দিতে অবাধে এই দুস্তর ভবসাগর পার হইয়া যাইব। বড় বড় জাহাজ সমূহ তুমুল তুফানে ডুবিয়া যাইতে পারে,কিন্তু মাতৃচরণ-ভেলা অনায়াসে তোমাকে আমাকে উত্তীর্ণ করিতে সক্ষম হইবে। শ্রীপদের কৃপা-ভেলায় ভর করিয়া নির্ভয়ে বসিয়া থাক, চকিতের ন্যায় অপর পারে উপনীত হইবে। জয় বিশ্বমাতার জয়। জয় মায়ের স্নেহ দয়ার জয়!!

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

নারী বিষয়ক কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অযথা নানা প্রকার পীড়ন হইতেছে। তাহার ফলে জগৎবাসীর মহাপীড়ন উপস্থিত, ইহা দেখিয়াও কেহ দেখিতেছেন না। যাহাতে স্ত্রী-পীড়ন নিবারণ হয়, তাহা মনুষ্যমাত্রেরই বিশেষ কর্ত্তব্য জানিবে।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরমাত্মার স্বরূপ। ইহা না বুঝিয়া লোকের বদ্ধমূল সংস্কার যে, পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও স্ত্রী নিকৃষ্ট। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক দেখা উচিত যে, স্ত্রী ও পুরুষ কি বস্তু—সত্য বা মিথ্যা। এইরূপ বিচার করিয়া মিথ্যা ত্যাগ ও সত্য গ্রহণ করিলে মনের সমস্ত অশান্তি বিলুপ্ত হইয়া শান্তি-বিধান হইবে। শাস্ত্রে ও লোকে দুইটী শব্দ সংস্কার প্রচলিত। এক সত্য ও আর এক মিথ্যা। এখন বুঝিয়া দেখ যে, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কোনটী বা উভয়েই সত্য বা মিথ্যা। যদি বল মিথ্যা, তাহা হইলে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্যা দৃশ্যে নাই, অদৃশ্যে নাই। মিথ্যা হইতে স্ত্রী পুরুষ, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট প্রভৃতি কিছুরই সৃষ্টি হইতে পারে না—হওয়া অস-ম্ভব। এবং সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। সত্যতে উৎ-কৃষ্ট নিকৃষ্ট, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি নাম বা সংজ্ঞা হইতেই পারে না—হওয়া অসম্ভব। তবে যে একই সত্যের মধ্যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও স্ত্রী নিকৃষ্ট, এই প্রকার যে দুইটী ভাব ভাসি-তেছে, ইহা কি জ্ঞানের কার্য্য বা অজ্ঞানের কার্য্য? মিথ্যা হইতে নিকৃষ্ট যে স্ত্রী তিনি হইয়াছেন, এরূপ বলিলে বুঝিয়া দেখ,মিথ্যাত কোন পদার্থ নহে, যাহা নাই, তাহারই এক নাম মিথ্যা। যদি স্ত্রী সত্য হইতে হইয়া থাকেন ও সত্যেরই রূপ হন, তাহা হইলে যখন এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই,তখন সেই একই সত্য হইতে একটী স্ত্রী নিকৃষ্ট ও অপর একটী পুরুষশ্রেষ্ঠ কোথা হইতে বাহির হইলেন? যদি কোন পুরুষ বলেন, আমরা স্ত্রী পুরুষ উভয়েই এক সত্য হইতে হইয়াছি বটে, কিন্তু তথাচ বস্তুতঃ পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও স্ত্রী নিকৃষ্ট; তাহা হইলে সেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন পুরুষের মুখে চূণ কালী দেওয়া কর্ত্তব্য। পুরুষ যদি বোধ করেন যে, আমি এক অদ্বিতীয় সত্য হইতে হইয়াছি ও তদ্ভিন্ন অপর কোন বস্তু হইতে স্ত্রী হইয়াছেন,তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে, স্ত্রীর কারণ সেই অপর বস্তু বা ব্যক্তির অস্তিত্ব কোথায়, তাহার কি রূপ? আর যে সত্য হইতে পুরুষ হইয়াছেন, সেই সত্যের রূপ, পূর্ণত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তার অস্তিত্ব কোথায়? "শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং" কেবল মুখেই বলাই সার, কার্য্যে কিছুই নহে। যদি হাড় মাস বিষ্ঠার পুত্তলিকে পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ বল, তাহা হইলে যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়ের স্থূল শরীর সেই একই পদার্থে গঠিত তখন উভয়ই সমভাবে নিকৃষ্ট ও হেয়। যদি দশ ইন্দ্রিয়কে পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ বল, তাহা হইলে যখন স্ত্রীগণের ইন্দ্রিয়াদি সেই একই পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত, তখন স্ত্রীগণের ইন্দ্রিয়াদিও পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ কিম্বা উভয়েই স্ত্রীও নিকৃষ্ট। অতএব স্ত্রীকে হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইলে পুরুষগণ আপন আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কাটিয়া

কাটিয়া ফেলিয়া দিউন। যদি বল ইন্দ্রিয়াদির গুণ ও ধর্ম্মে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখ যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা ধর্ম্ম, তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমান ভাবে বর্ত্তাইতেছে ও তদনুসারে দুঃখ সুখ অনুভব হইতেছে। জাগ্রণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি বা অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান ও স্বরূপ অবস্থা, দুঃখ সুখ, লজ্জা ভয়, মান অপমান, ক্ষুধা পিপাসা, জীবন মরণ প্রভৃতি উভয়ের একই রূপে ঘটিতেছে। তবে উভয়ই সমান ভাবে পুরুষ বা স্ত্রী শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট হইবেন। যদি চেতন জীবাত্মাকে পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ বল, তাহা হইলে যখন একই সত্য পরমাত্মার অংশ স্ত্রী পুরুষ জীবমাত্রেই জীবাত্মা ভাবে বর্ত্তমান, তখন উভয়ই সমানরূপে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট হইবেন। এ অবস্থায় স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে হইলে আপনাকে ত্যাগ করিতে অর্থাৎ আপনার মৃত্যু ঘটাইতে হইবে। যখন একই কারণ পরব্রহ্ম হইতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত বা উৎপন্ন হইয়াছে, তখন স্ত্রী ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইবে। সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীর পক্ষে ইহাই উচিত। নতুবা পরমাত্মার এক অংশকে স্ত্রী বলিয়া ত্যাগ ও অপর অংশকে পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করা মূর্খের কার্য্য—সমদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। স্ত্রী পুরুষ সংজ্ঞা বিশেষণ, পরমাত্মা বিশেষ্য। তাঁহারই জ্ঞানময়ী, মঙ্গলময়ী, সৃষ্টিপালন লয়কারিণী শক্তির নাম প্রকৃতি বা স্ত্রী সংজ্ঞা জানিবে। স্ত্রী পুরুষ উভয় সংজ্ঞা লইয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ সর্ব্বকালে বিরাজমান। এই বোধ হওয়ার নাম যথার্থ ত্যাগ। পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পদার্থ নাই, এই জ্ঞানই জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট ত্যাগ। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই প্রতি জ্ঞানীর প্রেম ও সম্মান সমান।

মূল কথা, একই সত্য স্বতঃপ্রকাশ পরমাত্মা আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে সাকার প্রকাশমান অর্থাৎ কারণ হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান। পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির নাম মায়া আদ্যাশক্তি কালী দুর্গা সরস্বতী সাবিত্রী গায়ত্রী বিদ্যা অবিদ্যা প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে। ইনি পরব্রহ্ম হইতে পৃথক নহেন, পরব্রহ্ম স্বরূপই। এই মঙ্গলকারিণী শক্তি হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের উৎপত্তি হইয়া তাঁহাতেই স্থিতি ও লয় হইতেছে। এই মঙ্গলকারিণী জগৎজননী মহাশক্তি স্ত্রী হইতে পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইয়া মহা মহা অবতার, ঋষি মুনি, রাজা বাদসাহ, পণ্ডিত সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতি পদ পাইয়া তাঁহাতেই লয় পাইতেছে। পুরুষ মাত্রকেই ধিক যে, তাহারা স্ত্রী রূপিনী জগৎ জননীর ক্লেদ মূত্র বিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার উত্তম গুণ গ্রহণ করিতেছে না, স্ত্রী সংজ্ঞকমাত্রকে সেবা ভক্তি মান্য প্রতিষ্ঠা না করিয়া তাঁহাকে নীচ শূদ্র অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছে। ইহার অপেক্ষা অধিক বলবীর্য্য জ্ঞানহীন আর কি হইতে পারে? শুধু মস্তক মুণ্ডন করিয়া 'শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং" বলিলে কি হইবে? শুনিয়াছেন, পার্ব্বতী পরমাসুন্দরী। অনবরত "শিবোহং" বলিবার ফলে পার্ব্বতীপতি শিব হইয়া কৈলাসবাসের বাসনা। ধিক্ তোমার জ্ঞানে, ধিক্ তোমার "শিবোহং" বলায়।

কাহার কাছে প্রকাশ কর যে, শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং? যাহার কাছে প্রকাশ কর সে কে? এ আকাশের মধ্যে কয়টা সত্য বা শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং আছেন বা হইবেন? শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া মঙ্গলকারী নিরাকার সাকার বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ জগতের গুরু মাতা পিতা আত্মার শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নশীল হও। সম্মান পূর্ব্বক স্ত্রী পুরুষ জীবমাত্রকে উত্তমরূপে পরিপালন কর। স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রকে জান যে, আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ। যে কার্য্যের যে উপযোগী, তাহার দ্বারা সেই কার্য্য কর ও করাও। হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া ইহাঁর শরণ লও, যাহাতে ইনি সদয় হইয়া তোমার অন্তরে শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং রূপ যে অজ্ঞান ভাসিতেছে, তাহার নিবৃত্তি করেন। ইনি দয়াময়। তোমাদের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গলবিধান করিবেন। তখন তুমি স্ত্রী পুরুষ শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং কাহাকে বলে, বুঝিয়া শান্তি পাইবে। তখন তুমি বুঝিবে যে, একই পরব্রহ্ম হইতে স্ত্রীও প্রকাশ পাইতেছেন, পুরুষও প্রকাশ পাইতেছেন। উভয়েই পরব্রহ্মের রূপ মাত্র। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মাতা পিতা গুরু আত্মা পতি পরব্রহ্ম। দুয়ের মধ্যে কেহই উচ্চ নহেন—কেহ নীচ নহেন—উভয়েই সমান। কেবল রূপান্তর উপাধি ভেদে স্ত্রী পুরুষ নাম বা সংজ্ঞা—যেমন বিশেষ্য বিশেষণ। পুরুষ বিশেষ্য সংজ্ঞক, স্ত্রী বা শক্তি বা জ্ঞান বিশেষণ সংজ্ঞক। বিশেষ্য বিশেষণ একই বস্তু। যেমন, অগ্নি ও অগ্নির প্রকাশ উভয়ই একই অগ্নি। অগ্নি সংজ্ঞক পুরুষ ও প্রকাশ সংজ্ঞক স্ত্রী। পরব্রহ্ম বিশেষ্য, পরব্রহ্মের সৃষ্টিপালন সংহারকারিণী বিদ্যা বা জ্ঞানময়ী ইচ্ছা শক্তির নাম বিশেষণ। বিশেষ্য অপ্রকাশ নিরাকার নির্গুণ ভাব। বিশেষণ প্রকাশমান জগৎস্বরূপ। পরমাত্মা আপন ইচ্ছায় জগৎরূপে প্রকাশমান হইয়া অনন্তশক্তি দ্বারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক অনন্ত প্রকার কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। জীবের মঙ্গলকারিণী মহাশক্তি পরব্রহ্ম হইতে পৃথক বস্তু নহে—পরব্রহ্মের রূপই। যেরূপ জাগরিত অবস্থায় তুমি ও তোমার নানা শক্তি দ্বারা নানা কার্য্য হয়—আমি তুমি তিনি, স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি। এবং সুষুপ্তির অবস্থায় সমস্তেরই কারণে লয় ঘটে। আমি তুমি তিনি, স্ত্রী পুরুষ প্রকৃতি পুরুষ কোন ভাব থাকেনা। অগ্নির প্রকাশে অগ্নির সমস্ত গুণের প্রকাশ থাকে। অগ্নির নির্ব্বাণে সমস্তেরই কারণে লয় হয়। এইরূপ, সর্ব্ব বিষয়ে শান্ত চিত্তে বিচার পূর্ব্বক সারভাগ গ্রহণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে বিরোধ হইতে নিবৃত্ত হও এবং উভয়েই পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া পরমানন্দে আনন্দ রূপে অবস্থিতি কর।

অল্পাধিক পরিমাণে পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই স্ত্রীজাতির প্রতি অন্যায় আচরণ হইতেছে। স্ত্রী পুরুষের তুল্যাধিকার কোথাও দেখা যায় না। অবলা স্ত্রীগণ অনর্থক নানা প্রকার কষ্ট পাইতেছেন। পুরুষগণ তাহার মোচন করা দূরে থাকুক, দেখিয়াও তাহা দেখিতেছেন না। পুরুষেরা আপনার কষ্ট নিবারণ করিয়া সুখ বা স্বাধীনতা চাহেন, কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সুখ বা স্বাধীনতা চাহেন না। এ বোধ নাই যে, যিনি

সকলকে স্বাধীন করিতে ইচ্ছা করেন,কেবল তিনিই নিজে স্বাধীন হইতে পারেন। পরমাত্মার মূল উদ্দেশ্য এই যে, পরমাত্মার নিয়ম অনুসারে যাহার দ্বারা ব্যবহারিক বা পারমার্থিক যে কার্য্য সুখে সম্পন্ন হয়,তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমান ভাবে পরমানন্দে অবস্থিতি করেন। যে সকল ন্যায়বান বীরপুরুষগণ স্ত্রীজাতির সহায় হইয়া পরমাত্মার সেই উদ্দেশ্য সাধনে যত্নশীল, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে পরমাত্মার প্রিয়। যাহারা স্ত্রী পীড়নের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য বিফল করিবার চেষ্টা করে, তাহারা পরমাত্মা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতেছেন ও হইবেন। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

এদেশের স্ত্রীজাতির যে কষ্ট, তাহার সীমা নাই। কন্যা ভাবে, পত্নী ভাবে ও বৈধব্যে স্ত্রীগণ ঘরে ঘরে যেরূপ কষ্ট পাইতেছেন, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু বৃথা মান্যের ভয়ে তাহা জানিয়াও সকলে সকল সময় স্বীকার করেন না! অজ্ঞতাবশতঃ অনেকেরই সংস্কার যে, পরমাত্মার ইচ্ছায় স্বভাবতঃ পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রী হীন। পুরুষের জন্যই যেন স্ত্রীর সৃষ্টি হইয়াছে; স্ত্রীর জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয় নাই। এ বোধ নাই যে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ে উভয়েরই কল্যাণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন। এমন নহে যে, পুরুষ যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন, আর স্ত্রীগণ পুরুষের ইচ্ছামত চলিবার জন্য জন্মিয়াছেন। যাঁহারা হিন্দু বা আর্য্য নামধারী, তাঁহারা শাস্ত্রীয় সংস্কার অনুসারে মুখে বলেন যে, স্ত্রী মাত্রেই দেবী মাতা মহাশক্তির অংশ, পুরুষ মাত্রেই শিব। উভয়েই পরমাত্মার স্বরূপ। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য ঠিক বিপরীত। আপনার বৃথা সম্মান রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা অবিচারে কতরূপে সেই মহাশক্তিস্বরূপিণীকে সত্য হইতে বিমুখ ও সর্ব্ববিষয়ে বঞ্চিত করিতেছেন, তাহার সীমা নাই। ইহা হইতে আক্ষেপের বিষয় আর অধিক কি হইতে পারে? এরূপ অসদাচরণের ফলে স্বয়ং মহাশক্তি যে হিন্দুদিগকে জ্ঞানহীন, শক্তিহীন করিয়া পীড়িত করিতেছেন,তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। তথাপি চৈতন্য হইতেছে না। যতদিন হিন্দুগণ কালী, দুর্গা, স্বরস্বতী, লক্ষ্মী, বেদমাতা সাবিত্রী, গায়ত্রী, প্রকৃতি পুরুষ, যুগলরূপ প্রভৃতি নাম দিয়া মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতের গুরু মাতা পিতা আত্মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তত দিন তাঁহারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোন বিষয়েই শ্রীভ্রষ্ট হন নাই। কিন্তু এক্ষণে ইহাঁ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মঙ্গলকারিণী মহাশক্তি স্বরূপিণী স্ত্রীগণের প্রীতি ও সম্মান পূর্ব্বক সৎকারে বিরত হইয়াছেন। যদি তাঁহাদের কিছুমাত্র সমদৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে এরূপ ঘটিত না। সমদর্শী ব্যক্তিই পরের সুখে সুখী ও পরের দুঃখ দুঃখী হন।

নারীরূপিণী মহাশক্তি হইতে ইহাঁরা যে কিরূপে বিমুখ হইয়াছেন, একটী ব্যবহারের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ রূপে দেখা যায়। হিন্দুদিগের মধ্যে নিয়ম যে, পুরুষ দক্ষিণ ভাগের অধিকারী ও স্ত্রী বামভাগের অধিকারিণী। এই ব্যবহারে স্ত্রীগণের প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা সূচিত হয়, তাহা সর্ব্ব ব্যবহারের মূল হইয়াছে। হিন্দু পুরুষগণ সম্মানের চিহ্ন বলিয়া দক্ষিণভাগ গ্রহণ করিতেছেন বটে, কিন্তু অন্তরে বাহিরে নানা রিপু কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা থাকিতেছে না। বিচারশীল সমদর্শী

ব্যক্তিমাত্রেই বুঝেন যে, দক্ষিণ ভাগ যদি সম্মানের হয়, তাহা হইলে মনুষ্য মাত্রেরই জগৎর্জননী নারীকে সেই দক্ষিণ ভাগ দেওয়া কর্ত্তব্য। লোকাচার ক্রমে বাম বা দক্ষিণ ভাগ দাও,তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই জানিও যে, স্ত্রী পুরুষের সম্মান সমভাবে রক্ষা করিলে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মঙ্গলকারী রাজা সর্ব্ববিষয়ে সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। যাহাতে জগতের সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত হয়,তাহা লৌকিক রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথাচরণে রাজ্যের নাশ হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

মূল কথা, দায়াধিকার প্রভৃতি সর্ব্বত্রেই স্ত্রী ও পুরুষের সমান ক্ষমতা পরমাত্মা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও তাহার অন্যথা না করা জ্ঞানবানের কর্ত্তব্য। তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, ব্রহ্মাণ্ডের নানা রূপ আমোদ প্রমোদ কেবল পুরুষেই দর্শন করিবে, স্ত্রী লোকে করিবে না। যথার্থ পক্ষে যাহা পুরুষের পক্ষে নির্দ্দোষ, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষেও নির্দ্দোষ। যাহা স্ত্রীর পক্ষে দোষ, তাহা পুরুষের পক্ষেও দোষ। ঈশ্বর এরূপ নিয়ম করেন নাই যে, বিবাহ না করিলে নারীর অন্য গতি নাই ও পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা না করা ইচ্ছাধীন। স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবে, ইচ্ছা না হয় করিবে না, তাহাতে ঈশ্বরের নিকট কোন দোষ বা গুণ হয় না। তিনি এরূপ নিয়ম করেন নাই যে, পুরুষ পুনঃ পুনঃ বা একাধিক বিবাহ করিয়া নির্দ্দোষী থাকিবেন ও স্ত্রী সেইরূপ আচরণে দোষী ও দণ্ডিত হইবেন। এবং তিনি এরূপ আজ্ঞা দেন নাই যে,বিধবা বেশ ভূষা ও সুখাদ্য ত্যাগ করিবে ও বিপত্নীক ভোগ বিলাসে রত থাকিবে। তিনি পূর্ণ... কেহই তাঁহার পর নহেন। তাঁহাতে পক্ষপাত বা ইতর বিশেষ নাই। জীবমাত্রেই তাঁহার নিকট সমান।

বিধবা স্ত্রী অলঙ্কারাদি ধারণ করে বা না করে কিম্বা উত্তম দ্রব্য খায় বা না খায়, তাহাতে দোষই বা কি গুণই বা কি? দোষ গুণ আসক্তি অনাসক্তি মনে, অসন বসনের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? পরমাত্মা ভগবান যদি দয়া করিয়া জীবের মনোবৃত্তি আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করেন, তবেই ইন্দ্রিয়াদি শান্ত ও সৎপথে গতি হয়। নতুবা কি গৃহস্থ,কি সন্ন্যাসী, কি স্ত্রী,কি পুরুষ কাহারও সামর্থ্য নাই যে, কোন ইন্দ্রিয়ের কোন গুণ বা ধর্ম্মের কোন পরিবর্ত্তন বা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ঘটাইতে পারেন। যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা ধর্ম্ম, তাহা যথা সময়ে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে বর্ত্তাইবে, তাহাতে কাহারও কোন নিন্দা বা দোষের লেশ মাত্র নাই। তোমরা নিজে কেহ কষ্ট করিও না ও অপরকেও কষ্ট দিও না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরমাত্মার স্বরূপ। যাহাতে উভয়ে পরস্পরের মঙ্গল চেষ্টা করে, ইহাই পরমাত্মার উদ্দেশ্য ও জ্ঞানের ইহাই লক্ষণ।

যদি স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই বাল্যাবস্থা হইতে জুতা ও পোষাক পরা, বিদ্যাভ্যাস, অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহার, কুস্তি, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি সৎ শিক্ষা দেওয়া হয়, তবেই মনুষ্য ঈশ্বরের নিকট প্রিয়, নতুবা সর্ব্বপ্রকারে দোষী দণ্ডার্হ। নারীকে সৎ শিক্ষা না দিয়া কেবল পুরুষকে দেওয়া নিষ্ফল ও জ্ঞানীর অকর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে যদি কোন স্ত্রী

বন্ধ্যা হন তাহা হইলে অজ্ঞান বশতঃ পরমাত্মা বিমুখ লোকে তাঁহাকে নিন্দা ও ঘৃণা করে। ইহা পশুতুল্য ব্যবহার। স্ত্রী বেচারির কি দোষ? তাহার ত নিজের কোন শক্তি নাই যে, গর্ভধারণ করিবে বা করিবে না। যাহার সন্তান হয়; তাহার ঈশ্বরের নিয়মানুসারে হয়। যাহার না হয়, তাহারও ঈশ্বরের নিয়মানুসারেই হয় না। তিনি যে গাছে ফল হইবার নিয়ম করিয়াছেন, সেই গাছে ফল হয়। পাণ প্রভৃতি যে গাছে তিনি ফল হইবার নিয়ম করেন নাই, তাহাতে ফল হয় না। গাছের কি দোষ? পরমাত্মার ইচ্ছা। কাহাকেও কাহারও দোষ দেওয়া উচিত নহে। সকল বিষয়ে বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিতে হয়। নিজ নিজ দোষের প্রতি দৃষ্টি কর, সকল দোষের শান্তি হইবে।

সকলে সকলের সকল অপরাধ ক্ষমা করিবে। তাহা হইলে পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানও সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। বুঝিয়া দেখ, তোমরা তাঁহার নিকট শত অপরাধে অপরাধী। তিনি ক্ষমা না করিলে তোমাদের দুঃখের সীমা থাকে না। অথচ তোমরা মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী প্রভৃতির সামান্য দোষও ক্ষমা করিতে অপরাগ। তাহার জন্য সর্ব্বদা নিজে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ ও অপরকে করাইতেছ। ইহার অপেক্ষা অকৃতজ্ঞতা ও মূঢ়তা অধিক আর কি হইতে পারে? যে অপরকে ক্ষমা করিতে পারে না, সে কিরূপে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা পাইবে? যে অপরকে ক্ষমা করে, ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা করেন। ক্ষমা পরম তপস্যা। ক্ষমা বলীর ভূষণ। এজন্য দুর্ব্বলা স্ত্রীগণ পুরুষের নিকট বিশেষ রূপে ক্ষমার পাত্রী। সধবা, বিধবা, কুমারী, সচ্চরিত্রা, অসচ্চরিত্রা, নারীমাত্রেরই যাহাতে কোন প্রকার অভাব বা কষ্ট না থাকে, তৎপ্রতি রাজা পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেই যাহাতে পরস্পরকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া পরস্পরের হিতসাধন করিতে পারে, তাহার জন্য সর্ব্বদা জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি নিজ গুণে তোমাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেরই সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে রাখিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য।

মনুষ্যের মধ্যে বিবাহ একটী প্রধান অনুষ্ঠান। উপস্থিত ব্যক্তিদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য ও ভবিষ্যতে সন্তান সন্ততির হিতের জন্য বিবাহ। যাহাতে মনুষ্যগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারে, তাহাই পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের উদ্দেশ্য। বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন যে, তাহাতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটে। বরঞ্চ সেই উদ্দেশ্যের অনুকূলে কার্য্য হয়। ইহা না বুঝিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবাহের প্রণালী ও পদ্ধতি কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল না হইয়া তাহার বিপরীত ঘটিতেছে। প্রত্যক্ষ দেখ, যদি প্রচলিত বিবাহের ব্যবস্থা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহা হইলে বিবাহ সত্ত্বেও ব্যভিচার ও সন্তানের অকাল মৃত্যু প্রভৃতি অনিষ্ট ঘটিতেছে কেন? বিবাহ নানা স্থানে মঙ্গলের আকর না হইয়া

অনিষ্টের হেতু কেন হইতেছে? যদি বিবাহের প্রথা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে গঠিত হইত, তাহা হইলে কেন এরূপ ভ্রমের প্রচার হইবে যে, বিবাহ মাত্রেই পরমার্থ সিদ্ধির বিরোধী। বিবাহ সম্বন্ধে পরমাত্মার কি নিয়ম বা উদ্দেশ্য, তাহা না জানায় ও পক্ষপাত এবং স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হইয়া বিবাহের ব্যবস্থা করায়, এরূপ উৎপাত ঘটিতেছে। অজ্ঞতা বশতঃ লোকে বুঝিতেছে না যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদ মিলন, তাহাই প্রকৃত বিবাহ।

পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রীপুরুষকে লইয়া নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সংস্কারানুসারে তাঁহাতেই সাকার নিরাকার এই দুইটী ভাব ভাসিতেছে। নিরাকার নির্গুণ জ্ঞানাতীত। সেই নিরাকার ব্রহ্মে স্ত্রী পুরুষ বিবাহ ব্যভিচার ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি কিছুই নাই। সাকার বিরাট ভগবানের পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ এই সাত অঙ্গ ধাতু বা শক্তি। এতদ্ভিন্ন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আকাশের মধ্যে দ্বিতীয় কেহ বা কিছু হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এখন বিচার করিয়া দেখ যে, বিবাহ কাহার নাম—নিরাকার ব্রহ্মের নাম বিবাহ, না, সাকার বিরাট ভগবানের নাম বিবাহ; অথবা বিরাট ভগবানের পৃথিব্যাদি কোন অঙ্গ বিশেষের নাম বিবাহ? যদি ইহার মধ্যে কাহাকেও বিবাহ বল, তাহা হইলে পৃথিবীতে যত প্রকারের বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা মনুষ্যের কল্পনায় বহু হইলেও যথার্থ পক্ষে একই। তাহা হইলে এক সমাজে প্রচলিত প্রথা উৎকৃষ্ট ও অপর সমাজের প্রথা নিকৃষ্ট, এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ জনিত দ্বেষ হিংসা অশান্তির মূল থাকে না। আর যদি বল যে, বিবাহ এতদ্ভিন্ন অপর কিছু, তাহা হইলে বিবাহ বলিয়া কোন পদার্থই নাই। যাহা নাই, তাহারই নাম বিবাহ।

যাহা নাই তাহারই অন্য নাম মিথ্যা। যাহা বা যিনি আছেন, তাঁহারই নাম সত্য। তবে বুঝিয়া দেখ, বিবাহ সত্য কি মিথ্যা। যদি বল মিথ্যা, তাহা হইলে বিবাহ এই শব্দ মাত্র আছে। শব্দের অনুরূপ কোন বস্তুই নাই। যদি বল সত্য, তাহা হইলে সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সেই সত্যের নাম যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলেও বিবাহের প্রথাভেদ লইয়া হিংসা দ্বেষ বশতঃ অশান্তি ভোগ করিবার কোন কারণ নাই।

মূল কথা এই যে, অজ্ঞতা বশতঃ জগৎ, জীব, মায়া, ব্রহ্ম প্রভৃতি যে ভিন্ন ভিন্ন ভাসিতেছেন, তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাসা সত্ত্বেও একই। এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদে মিলনের নামই বিবাহ। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া জগতের হিতার্থে যে মিলিত হয়েন, তাহাই প্রকৃত বিবাহ। ইহাতে শাস্ত্র, শ্লোক, পুরোহিত প্রভৃতি কোন আড়ম্বরেরই প্রয়োজন থাকে না। পরস্পরকে ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করিয়া অভিন্ন হৃদয়ে প্রীতি পূর্ব্বক জগতের হিতানুষ্ঠানরূপ যে পরস্পরের প্রিয় কার্য্য সাধন, তাহাই প্রকৃত বিবাহ। ব্যবহার কার্য্যের সুবিধার জন্য বিবাহের যে অনুষ্ঠান, তাহা বাহ্য বিবাহ মাত্র। যেরূপ পূর্ব্বে বলা হইল, তাহাই অন্তর্বিবাহ।

যেখানে অন্তর্বিবাহ হয় নাই, সেখানে

বাহ্য বিবাহ ঈশ্বরের নিকট ব্যভিচার ও দণ্ডার্হ। এইরূপ ব্যভিচারের জন্য তোমাদের দুর্দ্দশা লাঞ্ছনার সীমা থাকিতেছে না। তত্রাচ তোমরা মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিতেছ না যে, কেন আমাদের এত দুঃখ। শান্ত ও গম্ভীর ভাবে নিজ নিজ দুরবস্থার বিষয়ে চিন্তা কর। ভাবিয়া দেখ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেহ বা কিছু কি নাই যে, তিনি তোমাদের দুঃখ মোচন করেন বা তদ্দ্বারা তোমাদের যন্ত্রণার শান্তি হয়। যদি থাকেনত তিনি কোথায়? সরল অন্তঃকরণে এইরূপ অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে দেখিতে পাইবে যে, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার নিরাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষ তোমাদিগকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে নিত্য স্বতঃ প্রকাশ বিরাজমান। শরণার্থী হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর। তিনি মঙ্গলময় তোমাদের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

মনুষ্যের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধভাব বা সংস্কার দেখা যায়। কেহ বলেন, বিবাহ সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। বিবাহিত ব্যক্তির কোন ক্রমে মুক্তি হইবে না। সন্ন্যাসই উৎকৃষ্ট পদ, গার্হস্থ্য ঘৃণ্য হীন অবস্থা। আবার কেহ বলেন, সন্ন্যাস ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। বিবাহ করা মনুষ্যের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। করিলে পরমাত্মা সন্তুষ্ট হন, না করিলে তাঁহার অপ্রসন্নতা। কেহ বলেন, অবিবাহিত ব্যক্তি পরমার্থের অনধিকারী, আর কেহ বলেন, তিনিই কেবল অধিকারী। এইরূপ বিবাদ বিসম্বাদ বশতঃ কেহই শান্তি বা দৃঢ় নিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছেন না।

এস্থলে মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ করা উচিত। বিচার না করিলে জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞান বিনা শান্তি নাই। অতএব তোমরা সকলে বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখ যে, বিবাহ করিলেই বা কি ফল, আর না করিলেই বা কি ফল? পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, যাহাতে মনুষ্য ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করিতে পারে, ইহাই পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের সৃষ্টি কার্য্যের চরম উদ্দেশ্য। তেজ বা শক্তি বিনা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। যাহার শরীরে বল নাই, মনে তেজ নাই, সে ব্যবহার ও পরমার্থ উভয় ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য দেহ ধারণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে। এজন্য সকলেরই পক্ষে মিথুন ভাবাক্রান্ত হইয়া অযথা তেজোক্ষয় করা অবিধেয়। কিন্তু মিথুন ভাব ত্যাগ করিলেই যে তেজোরক্ষা হয়, পরমাত্মার এরূপ কোন নিয়ম নাই। বিচার পূর্ব্বক মিথুন আচরণেও তেজোরক্ষা হয় এবং অবিচারে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানেও তেজোক্ষয় হয়। মূল কথা, জীবের বিবাহে বা ব্রহ্মচর্য্যে কোন হানি লাভ নাই। তেজোরক্ষার প্রয়োজন। বিবাহ করিলে যাহার তেজোরক্ষা হয়, তিনি বিবাহ করিবেন। ইহা ভগবান পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের আজ্ঞা। বিবাহ না করিলে যাঁহার তেজোরক্ষা হয়, তিনি বিবাহ করিবেন না। ইহাও ভগবান জ্যোতিস্বরূপের আজ্ঞা। যিনি বিবাহ না করেন ও যিনি বিবাহ করেন, ইহাঁদের মধ্যে কেহ অপরজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহেন। উভয়েই পরমাত্মার আজ্ঞানুগত হইয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য

সুনিষ্পন্ন করিলে তাঁহার কৃপায় মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে নিত্য অবস্থিতি করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। যিনি পরমাত্মা-বিমুখ ও তাঁহার আজ্ঞা পালনে যত্নহীন, তিনি বিবাহ করিলেও যন্ত্রণা ভোগ করিবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সকলই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি তেজোহীনের নিকটেও আবির্ভূত হইতে পারেন, তেজস্বীর নিকটেও প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারেন।

কুমার কুমারী ও বিধবার মধ্যে যাঁহার ভোগ বাসনা নাই, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সুখে শান্ত, সুখের সন্ধানে বিরত, যাঁহার কেবল জ্ঞান মুক্তিতে অনুরাগ, যিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপকে একমাত্র পতি বা পত্নী জানিয়া তাঁহাতে নিষ্ঠাযুক্ত, এরূপ স্ত্রী বা পুরুষকে কদাচ বিবাহের জন্য জেদ করিবে না, তাঁহাকে পূর্ণ পরমাত্মারূপে নমস্কার। তিনি ইচ্ছা হইলে বিবাহ করিবেন, ইচ্ছা না হইলে না করিবেন; তাহাতে ঈশ্বরের কোন বিধি নিষেধ নাই। তিনি বিবাহ করিলেও ঈশ্বরের নিকট নির্দ্দোষী ও প্রিয়, না করিলেও নির্দ্দোষী ও প্রিয়।

স্ত্রী বা পুরুষ যাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাকে কোনরূপ ভয় বা ফলের লোভ দেখাইয়া বিবাহে বিরত করিবে না। বিবাহ অভিলাষী স্ত্রী বা পুরুষের পক্ষে যে রাজ্যে বিবাহ করিবার সুবিধা নাই, সে রাজ্য শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা তিনি বিবাহ করিতে যাহাতে সক্ষম হন, তাহা রাজা প্রভৃতি ক্ষমতাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে আপন আত্মা, পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া বিবাহের দ্বারা যে মিলিত হন, ইহা পরম কল্যাণের হেতু। মনুষ্য একজনের সহিত অভেদে মিলিতে পারিলে সকলের সহিত অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত অভেদে মিলিতে পারেন। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

আরও দেখ, যাঁহার নাম স্ত্রী পুরুষ জীব শব্দ কল্পিত হইয়াছে, তাঁহার কোটী কোটী বিবাহ হইলেও তিনি স্বরূপে অনাদি শুদ্ধ কুমাররূপে বিরাজমান। কোন কালে অশুদ্ধ অপবিত্র হন না। যেমন সোণার স্ত্রী ও পুরুষ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাদের বিবাহ দিলেও উভয়ই পূর্ব্ববৎ শুদ্ধ সোণা থাকিয়া যায়, তেমনই জীব বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে একইরূপ শুদ্ধ। কেবল অজ্ঞতাবশতঃ বুঝিবার ভেদ।

অতএব যাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা, তিনি নির্ভয়ে বিবাহ করিয়া পরমাত্মার উপাসনাদি প্রিয় কার্য্য সাধন করিবেন। যাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, তিনি না করিবেন। পরমাত্মা উভয়ের প্রতি সমভাবে প্রসন্ন হইয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। পরমাত্মার প্রকাশ তেজোময় জ্যোতিকে ধারণ কর, সর্ব্বদা পূর্ণতেজে তেজস্বী থাকিবে। যাঁহার বিবাহ করিতে ইচ্ছা, তিনি বিবাহের যথার্থ পাত্র বা পাত্রী। এবিষয়ে লৌকিক সংস্কার বশতঃ কোনরূপ চিন্তিত বা ভীত হইবে না। জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে নিষ্ঠা রাখিয়া অল্পে সন্তুষ্ট ও পরোপকারে রত থাক। জগতের মঙ্গলে আপনার মঙ্গল। আপনার মঙ্গলে জগৎ মঙ্গলময়। কেন না, সমগ্র জগৎ আপনার আত্মা, পরমাত্মার স্বরূপ। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

হিন্দু নামক কল্পিত সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত। শাস্ত্র সংস্কার বশতঃ হিন্দুদিগের ধারণা যে, আট বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ পুণ্যের কার্য্য। কেহ কেহ ইহা অপেক্ষাও অল্প বয়সের কন্যাকে বিবাহিত করিয়া থাকেন। এবং সকলেরই ধারণা যে, অবিবাহিতা কন্যা রজস্বলা হইলে পিতা প্রভৃতি গুরুজনের অধঃপাতের হেতু ও স্বয়ং অপবিত্রা হয়েন। এস্থলে মনুষ্য মাত্রেই শান্ত গম্ভীর ভাবে পূর্ব্বের প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে বিচার করিলে সহজেই বুঝিবেন যে, বিরাট পরব্রহ্মের সপ্তাঙ্গ হইতে সমভাবে স্ত্রী ও পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে। এবং স্ত্রী পুরুষ একই সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই সত্যেরই রূপ মাত্র। স্ত্রী ও পুরুষ একই পদার্থে নির্ম্মিত, বস্তুগত ভেদ শূন্য। অর্শাদি রোগে পুরুষের বিবাহের পূর্ব্বে রক্তস্রাব হইলে অধঃপতন ও অপবিত্রতা ঘটে না কেন? স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধে এইরূপ ভিন্ন নিয়ম কখনই জ্ঞানবান ব্যক্তি বা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যাহাতে বাল্যাবস্থায় কন্যার বিবাহ হয়, এজন্য কল্পিত শাস্ত্রে অধঃপাত ও অপবিত্রতার ভয় দেখান হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নহে যে, স্ত্রী পুরুষ শরীর ধারণ করিয়া কেবল মাত্র মিথুন ধর্ম্ম পালন করিবে। জীব মাত্রেই যাহাতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন; যথার্থপক্ষে পরমাত্মার সৃষ্টির এই এক উদ্দেশ্য। কিন্তু তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে, কত স্ত্রী শৈশবে বিবাহিতা ও বিধবা হইয়া যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। কেহ বা বন্ধ্যা, কেহ বা মৃতবৎসা, কেহ বা রুগ্ন সন্তান প্রসব করিতেছেন। কেহ বা যাবজ্জীবন নানা প্রকার রোগে ভুগিতেছেন। পরমাত্মার যথার্থ যাহা নিয়ম, তাহার প্রতিপালনে কখন এরূপ কুফল উৎপন্ন হয় না। নিয়মের বিপরীত কার্য্য করিলেই এরূপ ঘটে।

জগতের সর্ব্বত্র দেখ, অপরিপক্কাবস্থায় কোন পদার্থই সুব্যবহার্য্য হয় না। আম্র ফল পরিপক্ক হইলে সুস্বাদু ও বলবর্দ্ধক হয়। তাহার বীজে বৃক্ষ জন্মে। কিন্তু সেই আম্রকে কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করিলে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয় ও কাঁচা আম্রের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। হইলেও অচিরস্থায়ী, ফলবিহীন হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের নিয়মানুসারে পরিপক্ক অবস্থাতেই সকল বস্তু কার্য্যের উপযোগী। যাঁহারা বাল্য বিবাহের বিধি দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাঁহারা কিরূপে জানিলেন যে, মনুষ্যের সম্বন্ধে ঈশ্বর পরমাত্মার নিয়ম অন্যরূপ? স্বার্থপরতা ও মিথ্যা সংস্কার বশতঃ বাল্য বিবাহের বিধির প্রবর্ত্তনা হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, বিবাহ হইলেই দান দক্ষিণা লাভ। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ হইলে যে সকল পুত্র কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে মৃত হয়, তাহাদের বিবাহ না হওয়ায় উপার্জ্জনের হ্রাস ঘটে। বিবাহের পর মৃত্যু হইলে তাঁহাদের কোন হানি লাভ নাই। এবিষয়ে পরমাত্মার নিয়ম ভঙ্গরূপ অপরাধের জন্য বিধিকর্ত্তা ও বিধিপালকগণের জীবনে মরণে নরক ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

বাল্য বিবাহের প্রবর্ত্তকগণ বলেন যে, যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বে বা প্রারম্ভে বিবাহ হইলে নরনারী ব্যভিচার সম্পর্ক শূন্য পবিত্র থাকেন। কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ ও পরিচিত ব্যক্তিগণের জীবন বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখিবেন, একথা সত্য কি মিথ্যা। মিথ্যা হইলে তাঁহার এরূপ প্রবর্ত্তনার জন্য ঈশ্বরের নিকট দণ্ডার্হ কিনা?

পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠাবান বিচারশীল স্ত্রী পুরুষ যখন ইচ্ছা বিবাহ করিবেন। তাহাতে কাহারও বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করা অকর্ত্তব্য। করিলে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার নিকট দোষী ও দণ্ডার্হ হইতে হইবে। বার বৎসরের পূর্ব্বে পুত্র কন্যার কখনই বিবাহ দিবে না। তাহার পর বিশ বৎসর বা ততোধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ হইতে পারে। যৌবন বিয়োগের পূর্ব্বে যত পরিপক্কাবস্থায় বিবাহ হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। পুত্র হউক, কন্যা হউক, যাহার বিবাহে অনিচ্ছা, তাহাকে জেদ করিয়া বিবাহ দিবে না। পুত্র কন্যাকে শিশুকাল হইতে যথোপযুক্তরূপে সৎশিক্ষা দিবে। সরল শৈশবে পুত্র কন্যাকে সুন্দরী কন্যা ও সুন্দর বর পাইলেই ইষ্টসিদ্ধি হয়, এইরূপ উপদেশ দিবে না।

রাজা প্রজাগণ, আপনারা কোন বিষয়ে চিন্তিত, ভীত বা নিস্তেজ হইবেন না। পরমাত্মার যে নিয়ম কথিত হইল, তদনুসারে কার্য্য করিবেন। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা রাখিবেন। তিনি মঙ্গলময়, সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিবেন, ইহা ধ্রুব সত্য সত্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী।

পাষাণী।

গীতি নাটিকা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায় প্রণীত।

জানিনা, আমি স্নেহে অন্ধ কি না? দ্বিজুকে ভালবাসি, তাই বা তাঁহার পাষাণী এত ভাল লাগিয়াছে। আজি দেব দর্শন ঘটিয়াছে। একদিন একটী মহিলা আমাকে বলিয়াছিলেন, ক্ষীরোদ বাবু, আমার পরম সৌভাগ্য আজ ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়াছি। সে দিন সে মহিলার উৎসাহ ও আনন্দ বুঝি নাই, সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। আজ সেই কথা মনে পড়িল।

হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মহত্ত্ব, জাতিভেদের প্রয়োজনীয়তা, ঢেঁকির কচকচি অনেক শুনিয়াছি, কাণ জ্বালাতন হইয়াছে। মাথায় কোন কথা প্রবেশ করে নাই। আজি অন্ধকার গহ্বরে একখানি ছবি দেখিলাম, অপূর্ব্ব সুন্দর মহান, ফিডিয়াসের ভাস্কর কর্ম্ম, র‍্যাফেলের চিত্র। অতি সুন্দর অতি সুন্দর। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব যাহা দর্শন বিজ্ঞান বক্তৃতায় বুঝি নাই, আজি চিত্রপটে তাহা বুঝাইল। সুকুমার তুলিকার আঘাতে চিত্রকর যাহা বুঝাইল, দার্শনিক ও শাস্ত্রকারের তাহা বুঝাইবার শক্তি নাই। হাঁসির ভিতর শক্তি থাকে "ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়" শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু সে শক্তি এত অধিক, তখন বুঝি নাই। মহর্ষি গৌতমের চিত্র গেটে ও সেক্সপিয়ারের নিন্দার বিষয় নহে।

এই অপূর্ব্ব চিত্র, এই অপূর্ব্ব কবিতা, বাসী রঙ্গের ও বাসী ফুলের রচনা। পুরাণ জিনিসকে নূতন করিয়া সাজাইতে একটু

বেশী রকম ওস্তাদির প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্র লাল বাসীফুলে মনোহর মালা গাঁথিয়াছেন। এই মালার তারটী কণক তার।

সাধনাসিদ্ধ ও স্বভাবসিদ্ধ শক্তির প্রভেদ অনেক। বিশ্বামিত্র সাধনায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। সহজেই মনে একটু অহমিকা জন্মিয়াছে। বন্ধু জনকের নিকট একটু ব্রাহ্মণত্বের পসার করিতে গিয়াছিলেন। জনক স্বয়ং রাজর্ষি, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও আপনাকে কখন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন নাই। তিনি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,

"যদিও ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার আসন ব্রাহ্মণের বহু নিম্নে।"

বিশ্বামিত্র প্রমাণ চাহিলেন। জনক তাঁহাকে বলিলেন, গৌতমের আশ্রমে যাইয়া চাক্ষুষ দেখিয়া আইস। অগ্নিতে স্বর্ণের পরীক্ষা। ইসাই ও ইসলাম, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ বিবিধ আখ্যায়িকা রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃত গুণ পরীক্ষায় উজ্জ্বলতর হয়। অহল্যা গৌতমের প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ব্রাহ্মণের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র স্বয়ং ব্রাহ্মণ বলিয়া কি প্রাণের ভাষায় গ্রন্থখানি রচনা করিতে পারিয়াছেন?

ভাষা যেমন মিষ্ট, ছন্দ তেমনি মধুর, আর ভাব সেত অনুপম। অনেক ভাষার অনেক উৎকৃষ্ট কবির ছায়া প্রতিমার পার্শ্বদিয়া চলিয়া যাইতে দেখিলাম, সকলেই হাঁসি মুখে উঁকি মারিয়া ছবিখানি দেখিয়া যাইলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরস উদ্দীপনে অদ্বিতীয়। এমন একটা মহা ব্যাপারে হাসির উচ্ছ্বাস দেখিয়া প্রথমটা বড় আশঙ্কা হইয়াছিল যে, বালকপণা করিয়া বুঝি চিরপ্রণম্য মহাপুরুষকে লাঞ্ছনার ভাগী করিবেন। শেষে দেখিলাম, ভাবের উচ্চতা ধারণে মস্তক অসমর্থ, হৃদয় ত্রাসিত হইত, যদি সে ঘোর অন্ধকারের পার্শ্বে এ বিজলির খেলা না থাকিত।

সমালোচকের অভিসম্পাৎ আছে, একটা না একটা দোষ ধরিতেই হইবে। গৌতমের তপোবন মিথিলায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভারত ইতিহাসে অনেকগুলি গৌতম, ন্যায়কার, সাংখ্যকার গৌতম, শাক্য সিংহের পূর্ব্ব পুরুষ গৌতম, আবার অহল্যা পাষাণীর প্রাণেশ্বরও গৌতম। অহল্যা পাষাণীর প্রতিমূর্ত্তি সরযূতটে গোদনা বা গৌতমাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। একজন মহোপাধ্যায় ন্যায়কার গৌতমের আশ্রম এক দিন এখানে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাড়ায় পড়িয়া টোলটী এখান হইতে উঠাইয়া মিথিলায় লইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইহার ঠিক বিপরীত আচরণ করিয়াছেন। তিনি ন্যায়কার গৌতম ও অহল্যার স্বামী গৌতমকে একই ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং মিথিলায় তাঁহার আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এবং মিথিলায় অহল্যার স্বামীর আশ্রম নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া রামায়ণের কাহিনীর একটু উলট পালট ঘটাইয়াছেন। এরূপ করিবার কোন আবশ্যক ছিল না।

একটী চিত্র উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছিনা। প্রভাতে গৌতম কৈলাসে উপস্থিত হইয়াছেন, দূরে যোগিগণ গাইতেছেন।

প্রতিমা দিয়ে কি পুজিব তোমারে,
এ বিশ্বনিখিল তোমারি প্রতিমা;
মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো?
মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা।
তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নিঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জ ভবন, বসন্ত পবন
তরু, লতা ফল, ফুলমধুরিমা।
গৌতম! কি মহান দৃশ্য! দূরে নিশ্চল নীরব
শুভ্র তুষারের স্তূপ; উপরে অসীম
নীলিমা প্রসার—নিম্নে নিশ্চল কঠিন
ধূম্র পর্ব্বতের স্তর—দিগন্ত বিস্তৃত
দৃঢ় প্রস্তরের ঢেউ। দৃশ্য—কি মহান্
কি নিস্তব্ধ, কি উদার সুন্দর গম্ভীর।

পুনরায় গীত।

সতীর চরিত্র প্রণয় মধু—মা?
শিশুর হাসিটী জননীর চুমা
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,
তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা
যে দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
শতরূপে মা গো বিরাজিত তুমি
বসন্তে, কি শীতে, দিবসে নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব গরিমা।

গৌতম। হেন স্তব্ধ রম্য মহা গভীর নির্জ্জনে,
মনুষ্যের সন্ধি হয় প্রকৃতির সনে,
লঘু হয় চিত্ত; সর্ব্ব বিবাদ ভঞ্জন
হয়, জীবন সার্থক হয়, দূরে যায়
ক্ষোভ, পরিতাপ; ঘুচে যায় মৃত্যুর ভয়।

পুনরায়—গীত।

তথাপি মাটীর এ প্রতিমা গড়ি।
তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরী
অমর কবির হৃদয় গভীর
ভাগায় যাহার দিতে নারে সীমা;
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা
দেখিনা আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটী বাড়ায়ে
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা।
গৌতম। আর দুঃখ নাই, আর চিন্তা নাই,
লিপ্সা নাই—ঈর্ষা নাই, দ্বেষ নাই, আমি
পিতার নয়ন তলে, জননীর ক্রোড়ে
লভিয়াছি অনন্ত বিরাম। বসি আজি
সমুচ্চ শৃঙ্গোপরি, দেখিতেছি চাহি
পদতলে, পৃথিবীর দ্বন্দ্ব, কোলাহল,
ক্ষুদ্র লোভ ঘৃণ্য হিংসা—অনন্ত বিস্ময়ে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। (৪)

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে দর্শন শাস্ত্র কাহাকে বলে, সহজেই এ প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতে পারে। মানুষ দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক, প্রমাণ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে সকল প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সিদ্ধান্ত করে, সেই সকল তত্ত্ব ও তৎপ্রতিপাদক প্রমাণ যে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই দর্শন শাস্ত্র। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অবস্থা বিশেষে চিত্ত নির্ম্মল হইলে, সে অবস্থায় বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তির দৃষ্টিতে বাহ্য ও আন্তর তত্ত্ব সকল প্রতিভাত হইতে পারে। সাধারণ লোকের পক্ষে সেরূপ অতীন্দ্রিয়ের বিষয় প্রত্যক্ষ হয় না। প্রতিভার এই স্বঃতসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত, আরও এক প্রকার অন্তর্দৃষ্টি লাভ হইতে পারে। তাহা যোগলভ্য। চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করিয়া সবিচার বা সবিতর্ক রূপ সম্প্রজ্ঞাত যোগে অবস্থান করিতে পারিলেও এই সকল সত্য অন্তঃকরণে প্রতিভাত হইতে পারে। সে তত্ত্ব এস্থলে উল্লেখ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

যে সকল মহাপুরুষের চিত্তে এইরূপে সত্য সকল স্বতঃ প্রতিভাত হয়, তিনি নিজে কাজেই সেই সকল সত্য বিশ্বাস

করেন—তাহাতে আস্থাবান হন। কিন্তু যে সকল লোকের এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ বা যোগ অথবা সাধনাজাত দৃষ্টি লাভ হয় নাই, তাহার পক্ষে এ সকল সত্য স্বীকার করিবার বা সেই সকল সত্য বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ থাকে না। তবে যত দিন তাহারা ঐ সকল সত্য দ্রষ্টা ঋষি বা মহাপুরুষদের উপর আস্থাবান থাকে, যত দিন তাঁহাদের বাক্য আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি থাকে, তত দিন কোন গোলযোগ হয় না।

এইরূপ গোলযোগ হইবার প্রধান কারণ কি, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। লোকে যখন নানা মুনির নানা মত, ইহা দেখিতে পায়, যখন জানিতে পারে যে, "বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন" যখন বুঝিতে পারে না, কাহার মত অনুসরণ করিবে, তখন লোকের মনে সংশয় উদয় হয়। তখন জ্ঞানার্থীর মনে সত্য অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মে—তখন জিজ্ঞাসার উদয় হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই জিজ্ঞাসা বা সত্যানুসন্ধান জন্য আপ্তপ্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা সত্য স্থাপনার চেষ্টা হয়। কেহ বা শাস্ত্রের বিভিন্ন মত যুক্তি দ্বারা সামঞ্জস্য করিয়া একরূপ মত স্থাপনা করিয়া গোলযোগ মিটাইতে চেষ্টা করেন। * এইরূপ চেষ্টার ফল যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে, তাহাই দর্শন গ্রন্থ। মানুষে কর্ত্তা বা ভোক্তা ভাব পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্থী হয়। সেই দ্রষ্টা অবস্থায় প্রমাণ ও যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তত্ত্ব দর্শন করিতে চেষ্টা করে। এই জন্য এই সকল গ্রন্থের নাম দর্শন গ্রন্থ।

ইহার মধ্যে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন বা আপাতবিরোধী মত সমন্বয় জন্য যে দর্শন শাস্ত্র, তাহাকে মীমাংসা বলে। আর যে তত্ত্বের স্পষ্ট আভাষ বেদে নাই, তাহা আপ্ত প্রভৃতি প্রমাণ অবলম্বনে যাহাতে সিদ্ধান্ত হয়, তাহাও দর্শন শাস্ত্র। শাঙ্খ্য, ন্যায় প্রভৃতি 'মীমাংসা গ্রন্থ নহে। তাহাদের স্মৃতি বা প্রমাণ সিদ্ধ শাস্ত্র বলে। তাহাও দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত।

দুঃখ নিবৃত্তি জন্য, সন্দেহ নিরাসন জন্য ও জ্ঞানালোচনা বা বিজ্ঞানাবৃত্তির চরিতার্থতা জন্য আমাদের তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়োজন হয়। বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনা জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। প্রমাণ ও যুক্তি অবলম্বনে বেদান্তাদি উক্ত তত্ত্ব স্থির করাই মনন। দর্শন শাস্ত্রে এই মনন ক্রিয়ার সাহায্য করে।

শ্রুতিতে আছে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫)'। এই জন্য যে শাস্ত্রের দ্বারা আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন হয়, যাহাতে মানুষ দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, তাহাকে দর্শন শাস্ত্র কহে। আমাদের দেশে দর্শন শাস্ত্রের ইহাই মুখ্য অর্থ।

অতএব যাহাতে জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডাত্মক শ্রুতি উক্ত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়, যাহাতে সাধারণ তত্ত্ব বিস্তার সাহায্য করে, যাহাতে সন্দেহ নিরাসন হয়, জিজ্ঞাসার উত্তর মিলে, জ্ঞান-প্রবৃত্তির চরিতার্থ হয়, জীবজগৎ ও ব্রহ্ম তত্ত্ব জ্ঞান হয়, আত্ম বা ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহাই দর্শন শাস্ত্র। দর্শন শাস্ত্র—ব্রহ্ম বা আত্ম-বিজ্ঞান শাস্ত্র।

দর্শনের ইংরাজী কথা ফিলজফি। এই কথার মূল অর্থ ধরিলে এই বুঝা যায় যে, মানুষ বিদ্যা বা জ্ঞান অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া

* পণ্ডিত সপেনহর বলিয়াছেন :—

"A man becomes a philosopher by reason of a certain perplexity from which he seaks to free himself,—and the perplexity arises from the contemplation of the world."

সেই জ্ঞান বা তত্ত্ব লাভ করিবার জন্য যে চেষ্টা করে, সেই চেষ্টার গতি ও ফল যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই ফিলজফি। সুতরাং মূল অর্থে দর্শন ও ফিলজফি একই। তবে দর্শন বলিলে অন্তর দৃষ্টির যতটা প্রাধান্য বুঝায়, ফিলজফি বলিলে ততটা বুঝায় না * পাশ্চাত্য মেটাফিসিকস্ বলিলে, অনেকটা দর্শন শাস্ত্র বুঝায়।

প্রসঙ্গ ক্রমে, দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করিতে হয়। পূর্ব্বে এ পার্থক্যের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু প্রভৃতি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) দ্বারা যে সকল বাহ্য ও আন্তর বিষয় প্রত্যক্ষ করি—এবং পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনার দ্বারা যে প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া ধারণা করি ও অনুমানাদি প্রমাণ ও যুক্তি বলে তাহা হইতে যে তত্ত্ব নিশ্চয় করি, প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুর স্বরূপ, গুণ, ক্রিয়া, জাতি ইত্যাদি সম্বন্ধে যে নিয়ম আবিষ্কার করি, তাহাই বিজ্ঞানের বিষয়। বিজ্ঞান কেবল এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থের তত্ত্বালোচনা করে। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান—অর্থাৎ প্রাকৃত বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও পরিণতি। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ ব্যতীত কেবল শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপে আর এক বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। সেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তু আত্মা বা পরমাত্মা। এই অন্ত দর্শন করিতে পারিলে আত্মবিজ্ঞান ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং বিজ্ঞান দুই রূপ—বাহ্য বিজ্ঞান ও আত্ম বিজ্ঞান বা ব্রহ্ম বিজ্ঞান। আমাদের জ্ঞানে দুইটী তত্ত্ব যুগপৎ প্রতিভাত হয়—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। আত্মা এই জ্ঞাতা আর আমাদের দেহ ও বাহ্য জগৎ জ্ঞেয়। এই বাহ্য জগৎ ও দেহ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানই বাহ্যবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত নহে। ইহা বিজ্ঞানের অন্তর্গত।

এই যে ব্রহ্ম বা আত্মবিজ্ঞান—ইহা অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। কিন্তু আর্য্য পণ্ডিতগণ এই আত্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞানেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহারা বাহ্যবিজ্ঞান হেয় বোধে প্রায়ই ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের অভিমত এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্র ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন :—

"সিদ্ধ বস্তু হইলেও ব্রহ্ম প্রমাণান্তরের বিষয় নহেন। ...ব্রহ্ম বিজ্ঞানে অনুমান প্রমাণের কারণতা নাই। ...ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বহিঃপ্রবৃত্ত, এবং তাহাদের বিষয়ও বাহিরে। সেই জন্যই সর্ব্বান্তরতম ব্রহ্ম উহাদের অগ্রাহ্য বা অগোচর। ...দৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্ম সম্বন্ধ থাকিলেও তাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃষ্ট বা অনুভূত হয় না। ইন্দ্রিয় কেবল কার্য্যভাগটা দেখে, তাহার কারণ কি, তাহা দেখে না বা দেখিতে পায় না।"

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"ব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞানকে পূর্ব্ব প্রদর্শিত সম্পৎ জ্ঞান বা অধ্যস্তাদি জ্ঞান বলা যায় না এবং তৎকারণে তাহাকে পুরুষ ব্যাপারের অধীনও বলা যায় না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ীভূত বস্তুর জ্ঞান যেমন বস্তু স্বরূপের অধীন, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানও ব্রহ্মবস্তুর অধীন।"

অন্যত্র আছে :—"জ্ঞান প্রমাণ নিষ্পাদ্য, প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করিয়া জন্মে। তজ্জন্য তাহা বস্তুর অধীন, বিধানের বা আজ্ঞার অধীন নহে। পুরুষের অধীনও নহে। অগ্নিবুদ্ধি প্রত্যক্ষীভূত

* জর্ম্মান পণ্ডিত ক্যাণ্ট যাহাকে transcendental philosophy বলিয়াছেন, তাহাই অন্তরদৃষ্টিমূলক প্রকৃত দর্শন শাস্ত্র।

অগ্নি বস্তুরই অধীন। অগ্নি স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলেই তাহা হইবে।"

(বেদান্তদর্শন ১।১।৪ সূত্রের) ভাষ্য

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, প্রকৃতি ব্রহ্ম আত্মজ্ঞান বিজ্ঞানেরই বিষয়। আন্তর প্রত্যক্ষ হইতে জ্ঞানে যে সত্যের অনুভূতি বা দৃষ্টি হয়, তাহাই এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত। এ বিজ্ঞানের অর্থ তত্ত্ব দর্শন। সুতরাং বস্তুর স্বরূপ দর্শনই (ইহাকে ইংরাজিতে perceptive knowledge বলে) বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান। বাহ্য বিষয়ের স্বরূপ দর্শন হইতে প্রাকৃত বিজ্ঞান; আর আন্তর বিষয়ের স্বরূপ দর্শন হইতে আত্ম বিজ্ঞান লাভ হয়।

দর্শন—এ বিশেষ জ্ঞানের বিষয় নহে—ইহা দ্বারা তত্ত্ব প্রত্যক্ষ বা অনুভূত হয় না। তবে দর্শনশাস্ত্রে প্রমাণ ও যুক্তি বা চিন্তার দ্বারা যে সত্য অনুমিত হয়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ সত্যই (ইহা ইংরাজীতে যাহাকে (abstract knowledge) বলে, তাহা হইতে জাত) প্রধানতঃ দর্শনের বিষয়। * কিন্তু অনেক স্থানে দর্শন শাস্ত্র বিজ্ঞানের অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বিজ্ঞানও অনেক সময় দর্শনের অধিকারে আসিয়া পড়িয়াছে। দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরও অনেক পার্থক্য আছে, তাহা এস্থলে ইঙ্গিত করা কর্ত্তব্য। দর্শনের প্রমাণ প্রণালী ও বিজ্ঞানের প্রমাণ প্রণালী বিভিন্ন। দর্শনের আলোচিত বিষয় ও বিজ্ঞানের আলোচিত বিষয় বিভিন্ন। বিজ্ঞান বলিলে প্রধানতঃ বাহ্য বিজ্ঞানই মনে হয়। যাহা হইক, এখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিজ্ঞান জগৎতত্ত্ব কখনবা মনস্তত্ত্ব আলোচনা করে, দর্শন আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব মীমাংসা করে, বিজ্ঞান সসীমের বিষয় আলোচনা করে, দর্শন অসীমের অনুসন্ধান করে। বিজ্ঞান বহুত্বের ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত থাকে—দর্শন এই বহুত্বের মধ্যে একত্ব অনুসন্ধান করে। বিজ্ঞান কার্য্য আলোচনা করে—দর্শন তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করে। বিজ্ঞান প্রতিলোম যুক্তি a posteriori অবলম্বন করে, দর্শন অনুলোম যুক্তি a priori যুক্তি অবলম্বন

---

* জর্ম্মন পণ্ডিত সোএগ্‌লার (Schwegler) বলিয়াছেন—

"Philosophy is reflection, the thinking consideration of things.....By what does philosophy distinguish itself from those sciences?...not certainly by the difference of its matter.....but by its form, by its method—so to speak by its mode of knowing". History of Philosophy, p. I.

পণ্ডিত কুঁজে বলেন—

"Philosphy is the complete development of thought.....(it) is the understanding and explanation of all things."

Cousin's History of Philosophy, vol. I. p. 23.

জর্ম্মান পণ্ডিত ইউবারউইগ্‌ বলিয়াছেন,—

"Philosophy is the science of principles." History of philosophy, vol. I. p. 1.

জর্ম্মান দার্শনিক হার্কট্‌ বলিয়াছেন,—

"Philosophy is the elaboration of conceptions".

পণ্ডিত হর্বার্ট স্পেনসার বলিয়াছেন,—

"Science is partially unified knowledge, Philosophy is completely unified knowledge".

একত্ব জ্ঞানে উপনীত হওয়া দর্শনের চরম উদ্দেশ্য। অতি অল্প দর্শনেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

পণ্ডিত সপেনহর বলিয়াছেন,—

"Philosophy bgins where science ends. Sience cannot proceed from the known to unknown, as every thing is unknown to philosophy. Philosophy is most general rational knowledge, the first principles of which cannot be denied by other principles".

এই অর্থে বিলাতি ফিলজফি আমাদের দর্শন শাস্ত্রের অনুরূপ। সপেনহর অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"Philosophy is the sum total of general judgments—of that which is to be found in human consciousness...Its taste is to state in the abstract, the nature of the whole world and its parts".

করে। বিজ্ঞান ইহকালে মানুষের সুখ বৃদ্ধি বা দুঃখ হ্রাসের জন্য চেষ্টা করে, দর্শন মানবকে সুখ দুঃখের পারে লইয়া তাহার সকল বন্ধন ঘুচাইয়া তাহাকে নিত্য আনন্দ দিতে চাহে। বিজ্ঞান ইহকালের কথা ভাবে—দর্শন পরকালের কথা ভাবে। বিজ্ঞান জড় ও শক্তি তত্ত্ব আলোচনা করে—দর্শন শক্তিমানকে অনুসন্ধান করে।

এইরূপে বিজ্ঞান আপনার পূর্ব্বাধিকার চ্যুত হইয়া এক্ষণে অনেক সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—দর্শনের পরিসর বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে বিজ্ঞান বলিলে আমরা প্রাকৃত বিজ্ঞান ব্যতীত আর কিছু বুঝি না। যাহা হউক, এ বিষয়ের অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় কি, তাহা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। দর্শনের প্রথম আলোচ্য বিষয় জগৎ, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। যখন মানুষের জ্ঞান প্রথম প্রস্ফুটিত হয়, তখন জগৎই তাহার জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। যত দিন জগতের নিয়ত পরিবর্ত্তন মধ্যে নানা রূপ শক্তি অথবা শক্তিমানের ক্রিয়া দেখিয়া মন অভিভূত থাকে, যত দিন সেই সকল শক্তিকে অসীম—এই জগৎকে অনন্ত অসীম বলিয়া, আমাদের জ্ঞান তাহা ধারণা করিতে পারে না—যতদিন জগৎকে অসীম করিয়া আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করাইতে পারেনা, তত দিন দর্শন শাস্ত্রের আরম্ভ হয়না। অসীম ও সসীমের সীমা নির্দ্ধারণ করাই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। জ্ঞানরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানাতীতের রাজ্য আরম্ভ হয়। জ্ঞান এই জ্ঞানাতীতের রাজ্যে প্রমাণ ও যুক্তি বলে কখন যাইতে পারেনা। সে রাজ্যে যাইবার উপায় দর্শন কখন স্থির করিয়া দিতে পারেনা। দর্শন কেবল জ্ঞান ও জ্ঞানাতীতের মধ্যে সীমা কি, তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের ক্রম বিকাশের সহিত জ্ঞানের সীমা ক্রমেই বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। জ্ঞানাতীতের রাজ্য—অজ্ঞেয় রাজ্য জয় করিয়া দর্শন ক্রমেই জ্ঞান বিস্তার করে। জ্ঞানের সীমা যতই বিস্তর্ণ হউক, তাহার পারে অসীমের রাজ্য থাকিবে। জ্ঞান পরিধির পূর্ণ বিস্তার হইলেই দর্শন শাস্ত্র শেষ সীমায় উপনীত হয়—তাহার পর দর্শনের আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা থাকে না। তাহার পর ব্রহ্ম বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। এই বিজ্ঞান বা আন্তর প্রত্যক্ষ মূল সত্য উপলব্ধির শেষ উপায়—ইহাই দর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত। আর এই জন্যই দর্শন নামের স্বার্থকতা। সে কথা এস্থলে উল্লেখ করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই।

মানুষ প্রথমে সমস্ত জগৎকে জ্ঞানের সীমার মধ্যে আনে। তখন দর্শনের আরম্ভ হয়। তখন এই সসীম জগতের মধ্যে অসীমের বা জ্ঞানাতীতের রাজ্য কোথায় আরম্ভ, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। জগৎ জ্ঞানের সীমা কোথায়, তাহা স্থির করিবার জন্য দর্শন আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। কারণানুসন্ধান বৃত্তি মানুষের অত্যন্ত প্রবল। ইহাই প্রকৃত জ্ঞানবীজ। এ বৃত্তি না থাকিলে মানুষে ও পশুতে বিশেষ পার্থক্য থাকিত না। এই বৃত্তি বশে, প্রথমে এই প্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে যে নিয়ত ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, সে ক্রিয়ার আধার কি এবং তাহার কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করিতে প্রথম প্রবৃত্তি হয়। এই অনুসন্ধান ফলে জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি হইতে থাকে। কেন না কার্য্য কারণের অন্তর্গত—কার্য্য অপেক্ষা কারণের পরিসর অধিক। এইরূপে কারণের কারণ দেখিতে দেখিতে, জ্ঞানের রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে দর্শন অগ্রসর হয়। জগতের মধ্যে যে নিয়মের শৃঙ্খল জ্ঞানে ধারণা হয়—যে নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য বলিয়া জ্ঞান সিদ্ধান্ত করে, তাহা হইতেই কারণের কারণ অনুসন্ধান সম্ভব হয়। যে স্থানে শেষকারণে উপনীত হয়—সেই স্থানেই এইরূপ দর্শনালোচনার সীমা, বুদ্ধি আর তাহার পারে যাইতে পারে না। এই স্থানে সাধারণতঃ দর্শনের একরূপ শেষ হয়। তাহার পর জ্ঞানাতীতের রাজ্য। এই জ্ঞানের পরিধি সকলের সমান নহে—জ্ঞানরাজ্য বিস্তারের সামর্থ্য সকলের

সমান নহে। এই জন্য বিভিন্ন দার্শনিকের শেষ সিদ্ধান্ত বিভিন্ন। এই জন্য দর্শনে মত ভেদ আছে। তাহা পরে উল্লিখিত হইবে।

যাহা হউক, যখন এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপ কি, তাহা জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়, তখন এই নিয়ত গতিশীল বা পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে কোন অপরিবর্ত্তনীয় সত্ত্বা বা উপাদান আছে কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা হয়। এই অনন্ত দেশকালে স্থাপিত জগত নিত্য কি সৃষ্ট—এই দেশ কালের স্বরূপ কি, ইহা জানিতে কৌতুহল হয়। যাঁহারা এইরূপে জগতের উপাদান অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন যে, জগতের সত্ত্বা আছে—পরিবর্ত্তন আবরণে আবৃত বলিয়া তাহার স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। কেহ বলেন, এই পরিবর্ত্তন ব্যতীত জগতের আর কোন নিত্য সত্ত্বা নাই। কেহ বলেন, এই সত্ত্বা জড়, কেহ বলেন, ইহা শক্তি। (১)

কেহ এই নানা রূপে প্রতীয়মান জগতের মধ্যে এক মাত্র সত্ত্বা আছে, ইহা ধারণা করেন। কেহ বলেন, এই জগত মূল পাঁচ ভূত হইতে গঠিত; কেহ বলেন, এই পাঁচ ভূতের মধ্যে একটী মূল ভূত—অপর চারিটী সৃষ্ট। কেহ আকাশকে, কেহ বায়ুকে, কেহ তেজকে, কেহ জলকে, কেহ বা অন্ন বা পৃথিবীকে এই মূল ভূত বা মূল উপাদান বলিয়া ধারণা করেন। কেহ বলেন, পরমাণুই জগতের মূল সত্ত্বা—কেহ বলেন, মূল পরমাণু একরূপ—কেহ বলেন বহুরূপ। কেহ বলেন, এই পরমাণু বা ভূত—যাহাই জগতের আদি সত্ত্বা হউক, তাহা কোন এক অনন্ত মূলশক্তির বিকাশ মাত্র। যাহা হউক, যাঁহারা জগতের মূল উপাদান অনুসন্ধান করেন,—তাঁহাদের মত সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। কাহারও মতে জগতের মূল উপাদান জড়; কেহ বলেন, এই মূল উপাদান শক্তি।

জগতের মূল উপাদান যাহাই হউক, তাহাই জগতের মূল কারণ বা তাহা হইতেই জগতের সৃষ্টি—ইহা ধারণা হয়। এই জন্য কেহ জড়কে, কেহ বা শক্তিকে জগতের মূল কারণ বলেন এবং তাহা হইতেই জগতের সৃষ্টি, ইহা ধারণা করেন। সকল দার্শনিক এরূপ মূল কারণ থাকা সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, কার্য্য উৎপাদন করিয়াই কারণের নাশ হয় এবং কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন ধর্ম্মযুক্ত, তাঁহারা জগতের কোন নিত্য উপাদান থাকা স্বীকার করিতে পারেন নাই। এই জন্য বৌদ্ধদর্শনে শূন্যবাদ ও ক্ষণিকবাদ আসিয়াছে। যাঁহারা কার্য্যকে কারণের স্বরূপ বা রূপান্তর মনে করেন, যাঁহারা কার্য্য ও কারণের মধ্যে একই সত্ত্বা থাকা স্থির করিতে পারেন, তাঁহারাই জগতের মূল কারণ কি, তাহা জানিতে প্রবৃত্ত হন। এই জন্য কারণের স্বরূপ কি, তাহা এই সকল দার্শনিকদিগকে প্রথমেই সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হয়। এ বিষয় এস্থলে আর বুঝিবার আবশ্যক নাই।

অতএব জগতের মূল পদার্থ বা মূল উপাদান বা নিত্য সত্ত্বা কি? আর জগত কোন্ উপাদান হইতে উৎপন্ন? এই দুই প্রশ্নই এক। জগৎ তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে কার্য্য হইতে কারণের অনুসন্ধান করিতে হয়—কারণের অর্থ কি, তাহা স্থির করিতে হয়। কারণের কারণ কি, তাহাও যুক্তি দ্বারা বা প্রমাণের দ্বারা স্থির করিয়া লইতে হয়। এইরূপে অবশেষে এক আদি কারণে গিয়া উপনীত হওয়া যায়। চিন্তা তখন আর এই আদি কারণ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। এই খানেই অসীমের রাজ্য আরম্ভ হয়। অতএব কারণ তত্ত্ব স্থির করা ও জগতে কারণ অনুসন্ধান করা—এই সময়ের দার্শনিকদিগের প্রথম কার্য্য। ইহাই দর্শনের প্রথম স্তর।

কারণ তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া দার্শনিক পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ দুই রূপ কারণ উপলব্ধি করেন। এক নিমিত্ত কারণ, আর এক উপাদান কারণ। জগতের উপাদান বা উপাদান কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করিয়া পরে জগতের নিমিত্ত কারণ কি, তাহাই অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই দর্শন শাস্ত্রের দ্বিতীয় স্তর। (১) যাঁহারা জগৎতত্ত্ব আলোচনা করিয়া নিমিত্ত ও এই উপাদান কারণ এক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন—তাঁহারা দর্শনের এই দ্বিতীয় স্তরে আসিতে পারেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যখন জগতের মূল বা নিমিত্ত কারণ নানা-বিধ—জগত নানা শক্তির কার্য্য ও নানা শক্তিমানের আশ্রয়ীভূত, এইরূপ ধারণা থাকে, ততদিন এ বিষয়ে কোন দার্শনিক তত্ত্ব নির্ণয় হয় না। যখন এই জগতের এক নিমিত্ত কারণ উপলব্ধি হয়—তখনই এই তত্ত্ব আলোচনা দর্শন শাস্ত্রের বিষয় হয়।

জগতের নিমিত্ত কারণ আলোচনা করিয়া কেহ বলেন, উপাদান ও নিমিত্ত কারণ এক—তাহারা স্বতন্ত্র নহে। কেহ উপদানকেই নিমিত্ত কারণ বলেন, কেহ নিমিত্ত কারণকেই উপাদান কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কেহ বলেন সসীম জগতাতিরিক্ত অসীম ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ, কেহ বলেন, জগতের জড় বা শক্তি উপাদানই স্বতঃসিদ্ধ শক্তি বলে এই নিমিত্ত কারণ হইয়াছে। কেহ বলেন, ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ। যাঁহারা নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ পৃথক্ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ এই নিমিত্ত কারণকে শক্তিময়, কেহ চৈতন্যময় ইহা সিদ্ধান্ত করেন। এইরূপে জগৎতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে ঈশ্বর তত্ত্বের ধারণা হয়। জগৎকে সসীম সিদ্ধান্ত করিয়া কখন তাহার অসীম আধার ঈশ্বর—ইহা স্থির করা যায়। অন্য দিকে জগৎ যে কঠোর অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম বলে চালিত হইয়া ক্রমে পরিণত হইতেছে, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া এই জগতের জ্ঞানময় নিয়ন্তা, কল্পনা করা হয়। এইরূপে ঈশ্বর তত্ত্ব আলোচনা করাই দর্শনশাস্ত্রের দ্বিতীয় স্তর। (২)

এইরূপ ঈশ্বর ও জগৎতত্ত্ব আলোচনা করিবার পর দার্শনিক পণ্ডিত ক্রমে আত্মতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আমার স্বরূপ কি, আমার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি, আর আমার সহিত জগতের সম্বন্ধই বা কি ইহা জানিবার জন্য দর্শন অগ্রসর হয়। ইহাই দর্শনের তৃতীয় স্তর। এই স্তরে প্রধানতঃ আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা হয়। এই আমি কি—আমি কি জানিতে পারি—আমি জগৎ কিরূপে জানিতে পারি—জগতের কতটুকু জানিতে পারি—তাহা স্থির করিবার চেষ্টা হয়। আমি কি উপাদানে গঠিত—আমি নিত্য কি সৃষ্ট—মৃত্যুতে আমার ধ্বংস হয় কিনা—আমি জগৎ উপাদানে গঠিত—কি আমার সত্ত্বা স্বতন্ত্র—আমি জড়ের পরিণতি কি চৈতন্যের অভিব্যক্তি, তাহা সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্তি হয়। আমার দুঃখের পরিণাম কি—আমার সুখ

(১) সপেন্সর বলিয়াছেন,—

"Because something permanent is present along with what changes (*i.e.* the permanent changes in form and quality with action) the idea of permanence (*i.e.* the idea of matter) first appears." Through space and time matter is reached as the possibility of coexsistence and permanence." "Matter is more than causation. Its true being is in action cause and effect constitute the whole nature of matter."

(১) জগতে শৃঙ্খলা ও নিয়ম দেখিয়াই নিমিত্ত কারণের অনুমান হয়। আমরা যেমন নিজে কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে বা নিমিত্তে কোন কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত হই—জলাধারের প্রয়োজন হইতে, জলাধারের ধারণা করিয়া, তাহা প্রস্তুত জন্য মৃত্তিকা উপাদান লইয়া তাহাকে ঘটরূপে পরিবর্ত্তন করি—সেইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত জগৎও কেহ কোন অভিপ্রায় বিশেষ হইতে বা কোন নিমিত্তে—ইহাকে উপাদান হইতে প্রস্তুত করিয়াছেন—এইরূপ ধারণা হইতে নিমিত্ত কারণের অনুমান। কেবল উপাদান স্বতঃপ্রবর্ত্তিত হইয়া বিনা নিমিত্তে এরূপ কৌশলপূর্ণ জগতের উৎপত্তি করে—এরূপ ধারণা হয় না। এবং নিমিত্ত কারণ আপন উপাদান সৃষ্টি করিতে পারে—আপনিই উপাদান কারণ হয়, এরূপ ধারণা হয়।

(২) এই দুই রূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া যে ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, সেই দুই যুক্তিতে ইংরাজিতে—Cosmological proof এবং Teleological অথবা Physico-theological proof বলে। জগতের উপাদান কারণ হইতে মূল সত্ত্বার ধারণা ও তাহা হইতে ঈশ্বর ধারণা—Cosmological proof, আর নিমিত্ত কারণ হইতে নিয়ামক ঈশ্বরের ধারণাই Teleological proof.

চেষ্টার সীমা কোথায়—আমি স্বাধীন কি প্রকৃতির লীলা-পুত্তলি, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। এই আত্মতত্ত্বজানিবার চেষ্টা হইতেই প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের অভিব্যক্তি হয়—ইহা হইতেই দর্শনের মূল ভিত্তি স্থাপিত।

এই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আত্মার স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। ইহা শঙ্করাচার্য্যের কথাতেই বলিতেছি ঃ—

"প্রাকৃত লোকেরা অর্থাৎ জ্ঞানচর্চ্চা বিহীন অজ্ঞ মানবেরা এবং চার্ব্বাকেরা নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছে যে, এই চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা অর্থাৎ অহমাস্পদ। আবার তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মবুদ্ধি লোকেরা বলে, ইন্দ্রিয় সমষ্টিই চেতন, সুতরাং ইন্দ্রিয় সমষ্টিই আত্মা। অন্য এক সম্প্রদায় নির্ণয় করে, মনই আত্মা—মন ভিন্ন আর কোন পৃথগাত্মা নাই। আবার বৌদ্ধেরা বলেন, ক্ষণবিনাশী বিজ্ঞান প্রবাহই আত্মা; পৃথগাত্মা নাই। উহাদের অন্য সম্প্রদায় বলেন, আত্মা কোন পদার্থ নহে, শূন্যতারই অন্য নাম আত্মা। তার্কিকেরা বলে, আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত অথচ দেহাশ্রয়ী ও সংমরণশীল। সেই সংমরণশীল আত্মা কর্ম্মনিবহের কর্ত্তা ও কর্ম্মফলের ভোক্তা। অন্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে আত্মা অকর্ত্তা তিনি কিছু করেন না, প্রকৃতির কর্তৃত্ব তাঁহাতে ছায়ারূপে অনুক্রান্ত হয়, তাই তিনি ভোক্তা, কর্ত্তা নহেন। অন্যে বলেন, এই দেহাশ্রয়ী সংসারী আত্মা ছাড়া অন্য এক স্বতন্ত্র, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর নামক আত্মা আছেন। এ সম্বন্ধে এ পক্ষের মত এই যে, সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরাত্মাই ভোক্তাত্মার বা সংসারী আত্মার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ।"

(বেদান্ত দর্শনের ১।১।১ শ্লোকের ভাষ্যানুবাদ)

এই রূপ তত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে দর্শনশাস্ত্র তিনরূপ স্তর দিয়া অগ্রসর হয়। এবং অবশেষে দর্শনের পূর্ণ পরিণতি হয়। আমাদের দেশের দর্শনের পরিণতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া এ তত্ত্ব পাওয়া যায় না। কেন না, আমাদের দেশে যে সময় দর্শনের প্রথম আলোচনা হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। যখন এখানে দর্শন ধারাবাহিক রূপে আলোচিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন সকল দার্শনিক মতেরই বিকাশ হইয়াছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্ত দর্শনই দর্শন শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ, বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও সে সময় সকলরূপ দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়া, সকলতত্ত্বগুলিই একরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা বেদান্ত দর্শন হইতেই জানিতে পারা যায়, এ কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং আমাদের দেশের দর্শন শাস্ত্রের ক্রমোন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া এই তত্ত্ব পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ যুক্তি অবলম্বন করিয়া ও ইউরোপের দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই তত্ত্ব সহজেই উপলব্ধি হইবে। এইরূপ দর্শনের ক্রমোন্নতির কারণ মানব দৃষ্টির উন্নতি। অর্থাৎ মানুষ প্রথমে বাহ্যজগৎ আলোচনা করিতে আরম্ভ করে—যতই জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হয়, ততই অন্তর্দৃষ্টি স্পষ্টতর হইতে থাকে। অন্তর্দৃষ্টি হইতেই আত্মতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের জ্ঞানে দুইটী বিষয় প্রতিভাত হয় 'অহং' ও 'ইদং' বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। প্রথমে এই 'ইদং' এর তত্ত্ব আমি ব্যতিরিক্ত অন্যতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ হয়। সে আলোচনা পরিণত হইলে তবে 'অহং' তত্ত্ব আলোচনার সময় হয়। তাহার পর যখন অহং ও 'ইদং' এই উভয় তত্ত্ব একীভূত করিয়া তাহার উপরের তত্ত্ব জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, তখনই ব্রহ্ম আলোচনার সময় আইসে। জগৎ হইতে যে ঈশ্বর ধারণার কথা বলিয়াছি, সে স্রষ্টা ঈশ্বরের ধারণা। শঙ্কর ইহাকেই সংসারী আত্মা ছাড়া স্বতন্ত্র সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়াছেন। এই ঈশ্বর ও ব্রহ্ম ভিন্ন। জগৎতত্ত্ব হইতে ঈশ্বর ধারণা হয়, কিন্তু ব্রহ্ম ধারণা হয় না। ব্রহ্মধারণাই দর্শনের শেষ পরিণতি—ইহাই দর্শনের চতুর্থ স্তর। আত্মতত্ত্ব আলোচনা হইতেই এই ব্রহ্মের ধারণা হয়। (১)

(১) আত্মতত্ত্ব আলোচনা হইতে যে ব্রহ্মের সিদ্ধান্ত হয়, ইহাকে ইংরাজিতে ontological proof বলে।

যখন দর্শন শাস্ত্র এইরূপে পূর্ণ পরিণত হয়, তখন দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় জগৎতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব এবং এই তিনের মধ্যে সম্বন্ধ তত্ত্ব; অর্থাৎ জগতের সহিত জীবের সম্বন্ধ, জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ, আত্মার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ এবং জগত আত্মা ও ব্রহ্ম এই তিনের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ। একথা আরও বিশদ করিবার জন্য একটী ত্রিভুজের ধারণা করিব।

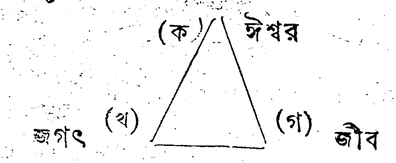

এই ত্রিভুজের উচ্চ কোণে ব্রহ্ম ও নিম্ন দুই কোণের মধ্যে এক কোণে জীব ও অপর কোণে জগৎ ধারণা করিব। আর এই ত্রিভুজের এক একটী রেখাকে ইহাদের মধ্য সম্বন্ধ ধারণা করিব। এবং জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ ক, খ রেখায়, জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ খ, গ রেখায় এবং ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ ক, গ রেখার অনুমান করিব। আর এই ব্রহ্ম জীব ও জগত ও তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ একত্রে এই ত্রিভুজে ধারণা করিব। এইরূপে সমগ্র দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় আমরা বুঝিতে পারিব। কোন দার্শনিক কেবল জগৎ তত্ত্ব আলোচনা করেন, কেহ জীবতত্ত্ব আলোচনা করেন; কেহ জগত ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ তত্ত্ব আলোচনা করেন। তাহার পর দার্শনিক পণ্ডিত যখন ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হন, তখন ব্রহ্মই তাঁহার আলোচ্য বিষয় হয়। তাহার পর, ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ তত্ত্ব অথবা ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ তত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ হয়। তাহার পর দর্শনের শেষ পরিণামে এ সকল তত্ত্বই (ক,খ,গ) দার্শনিক পণ্ডিতের আলোচ্য বিষয় হয়। বলিয়াছি ত, এই সময়েই দর্শনের পূর্ণ পরিণতি হয়।

এই স্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, দর্শনের এই কয় প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যতীত আরও এক অবান্তর বিষয়ও দর্শনের আলোচ্য। এই বিষয় আত্মতত্ত্বের অন্তর্গত। কেবল জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বিষয় বা তাহাদের তত্ত্ব আলোচনা করিয়াই দর্শন ক্ষান্ত হয় না। জ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহাও আলোচনা করিতে হয়। জ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহার প্রামাণ্য কি, কি উপায়ে আমাদের জগৎ, আত্মা ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাও দর্শনের আলোচনার বিষয়। কি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কোন্ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত তত্ত্বের কতদূর জানা যায়—প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধিতে কিরূপে নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, প্রকৃত তত্ত্ব কিরূপে বা কি উপায়ে লাভ করা যায়, তাহাও দর্শনের আলোচ্য বিষয়। জ্ঞান নিজের স্বরূপ বুঝিয়া—নিজের কতদূর ক্ষমতা বুঝিয়া, তবে আপনার পরিসর বৃদ্ধি করিতে ও অজ্ঞেয়তার রাজ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। এই জন্য জ্ঞান তত্ত্ব ও প্রমাণ তত্ত্ব আলোচনা করাও দর্শনের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে এই প্রয়োজন হইতে প্রধানতঃ ন্যায় দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে। ইউরোপে পূর্ব্বে ন্যায় শাস্ত্র দর্শনের অন্তর্গত ছিল না। জর্ম্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট অসাধারণ প্রতিভাবলে এই ন্যায়কেই তাঁহার দর্শনের মূল ভিত্তি করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার দর্শনে প্রধানতঃ এই জ্ঞানতত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে।

যাহা হউক, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সম্পূর্ণ দর্শন শাস্ত্রে এ সকল বিষয়েরই আলোচনা থাকে। যে সকল দর্শন শাস্ত্রে এ সকল বিষয়ের প্রকৃত আলোচনা না থাকে, সে সকল দর্শন শাস্ত্রই অসম্পূর্ণ বা আংশিক। আমাদের দেশে একমাত্র বেদান্ত দর্শনে এই সকল তত্ত্বই পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়াছে, এই জন্যই বেদান্ত পূর্ণ দর্শন। বেদান্ত ব্যতীত আর কোন দর্শন এরূপ সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন নহে। বেদান্ত দর্শনে আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, ইহাতে জগৎ তত্ত্বেরও আলোচনা আছে। ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ, ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ, জগত ও জীবের সম্বন্ধ, সকলই মীমাংসিত হইয়াছে। কি প্রমাণের দ্বারা এ সকল তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, তাহাও বেদান্তে ইঙ্গিত করা

আছে। তাই বলিতেছিলাম, বেদান্ত তুল্য দর্শন শাস্ত্র আর নাই। (১) বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে এস্থলে আরও এক কথা বলা উচিত যে, ইহাতে সকল বিরোধীবাদ তন্ন তন্ন করিয়া খণ্ডন করিয়া অপূর্ব্ব যুক্তি বলে ইহার নিজ প্রতিপাদ্য মত স্থাপন করা হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য মূল বিষয় "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইহাই সকল দর্শনের শেষ প্রতিপাদ্য। অদ্বৈত ব্রহ্ম সিদ্ধান্তই দর্শনের পরিণাম।

"জীবতত্ত্বং জগত্তত্ত্বমীশতত্ত্বং তৃতীয়কং।
স্থিত্বৈকাদশতন্ত্রেষু ততস্তাক্ত্বা নিরূপিতং॥
পশ্চাৎ বেদান্ত সদ্যুক্ত্যা অদ্বৈতশ্রুতিমানতঃ।
অদ্বয়ং ব্রহ্ম সংসিদ্ধং দ্বৈতস্যাবসরঃ কুতঃ॥"

অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি—উপসংহার।

অর্থাৎ (বেদান্ত ব্যতীত অপর) একাদশ প্রকার তন্ত্র (বা মত) অবলম্বন করিয়া জীবতত্ত্ব, জগৎ তত্ত্ব ও ঈশতত্ত্ব, এই তিন তত্ত্ব সেই মত যুক্তির দ্বারা নির্ণয় পূর্ব্বক বেদান্তোক্ত সদ্‌যুক্তি অনুসরণ করিয়া ও অদ্বৈত শ্রুতি প্রমাণ হইতে অদ্বয় ব্রহ্ম নিরূপণ করা হইলে আর দ্বৈত জ্ঞানের অবসর থাকে না।

অতএব জীবতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণই দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। জর্ম্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট ইহাদিগকে Ideals of reason বলিয়াছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

শেষ।

বড় সাধ মনে ছিল—মরণের বেলা,
ধীরে ধীরে কাছে তুমি বসিবে আসিয়া;
ছিল সাধ—জীবনের সে সায়াহ্ন-খেলা,
অই মুখে চেয়ে চেয়ে যাইবে ভাঙ্গিয়া!
বড় সাধ মনে ছিল, প্রাণের যাতনা
খুলিয়া দেখাব সব অন্তিম শয্যায়;
নীরবে নিভেছে কত পবিত্র কামনা,
কি মহত্ত্ব বলি দিছ নীচতার পায়!
কতই আনন্দ আশা কত হাহাকার,
লুকায়েছি হৃদি-তলে শত সাবধানে,
একটী পেলেনা ঠাঁই চরণে তোমার
গেল না প্রাণের ক্ষত সুধা-পরশনে!
স্বরগে রহিলে তুমি, আমি ধরাতলে,
সব সাধ ডোবে আজি নয়নের জলে।

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

হোলি।

প্রাণ চায় আজি ফের গান গাহিবারে,
যমুনার শ্যামতটে, চারু বৃন্দাবনে!
বাঁশরী লইয়া এস ব্রজ বনমালি,
আমরা সকলে ঘিরে দিব করতালি।
বনফুলে বনমালা বনমালি গলে,
শিখি পাখা বামে বাঁকা,—পদ পাবে বলে!
যুগল রূপেতে এস, মম রাধা-শ্যাম;
শ্রীদাম, সুদাম আর সখা বলরাম,
সকলে আসিবে আজ পরি পীতবাস,
চন্দন কুঙ্কুম চুয়া ছড়াবে সুবাস।
কুঞ্জে কুঞ্জে, কুঞ্জে আজি নীল যমুনায়,
লাল লীলা, লাল খেলা,—লাল বাসনায়!
সোণালী সন্ধ্যায় পুনঃ কুঙ্কুমে আবিরে,
শ্রীরাধা সাজায়ে দিল নীল বংশীধরে!

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

(১) বেদান্ত দর্শন কয়টী মাত্র সামান্য সূত্রে গ্রথিত। ইহাতে কিছু কম ছয় শত মাত্র সূত্র আছে। এই অল্পায়তন গ্রন্থ যে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ, ইহা অনেকের বিশ্বাস না হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সূত্র যুগে অতি অল্প কথায় তত্ত্ব সকল আলোচিত হইত। তখন আচার্য্যের সাহায্যে এই সকল সূত্রের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইত। তখন শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হইত না—কেবল সূত্র সাহায্যে স্মরণ করিয়া রাখিতে হইত। সেই জন্য, ইহা অল্পায়তন ছিল। আজকাল দর্শন শাস্ত্রে যেরূপ বিস্তারিত ভাবে তত্ত্বালোচনা হইয়া থাকে, সেরূপ ভাবে বেদান্ত শাস্ত্রে তত্ত্বালোচনা থাকিলে ইহা অতি বিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া পড়িত। শঙ্করাচার্য্য এইরূপে বেদান্ত দর্শন বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার সে গ্রন্থ বড় বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি তাহা সাধারণের বোধগম্য হয় নাই। শাঙ্করভাষ্য বুঝা যে কত কঠিন, তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। তাহা আরও বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইলে গ্রন্থ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় (২৩৮ পৃঃ) বলিয়াছেন, "পূর্ব্বকার লোকগুলিকে তোমরা বুদ্ধিমান বল আর নির্ব্বোধই বল, কিন্তু তাঁহাদের এই একটী ক্ষমতা ছিল যে, তাঁহারা অল্প কথায় এক একটী বিষয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন। * * তখনকার কালেরই এরূপ নিয়ম ছিল যে, তখন একটী কথার মধ্যেই অনেকগুলি কথা পূরিত থাকিত।" এখন একটী তত্ত্ব বুঝিতে তাহার সম্বন্ধে অনেক অবান্তর বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহা প্রস্ফুটিত করিতে হয়। সপেনহর একটী মাত্র বৈদান্তিক তত্ত্ব বুঝাইতে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য ব্যাখ্যা করিতে "World as will and idea নামক অতি বিস্তৃত তিন খণ্ডে এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সুতরাং বেদান্ত দর্শন অল্পায়তন বলিয়া উহা উপেক্ষনীয় নহে, অথবা উহা সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন নহে, এরূপ বলা সঙ্গত হয় না।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৮। সত্যবেদ—শ্রীলক্ষ্মণ মজুমদার সঙ্কলিত। All rights reserved. সাম্য যন্ত্র। সত্যবেদে শয়তান ও এক রকম অপার্থিব গদ্যের অস্তিত্ব সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মজুমদার মহাশয় একাধারে Manichæan এবং গদ্য মেঘনাদবধ। এ বড় কম প্রশংসার কথা নহে।

৩৯। Keshub—The Reconciler of Pure Hinduisn and Pure Christianity. A paper read by Pandit Gour Gobind Roy Upadhaya, New Dispensation Church, at the Albert Hall, on Thursday, the 19 July, 1900. এই পুস্তিকার অধিকাংশই মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের নিজোক্তিতে সুবাসিত। ঈসার ধর্ম্ম কেশবচন্দ্র যে ভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহার সহিত হিন্দু ধর্ম্মের বিরোধ নাই—কোনও ধর্ম্মের বিরোধ হওয়া উচিত নহে। গৌর গোবিন্দ বাবুর গ্রন্থ পড়িয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি।

৪০। আমিত্বের প্রসার—১ম খণ্ড। কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য। শ্রীযদু নাথ মজুমদার এম্ এ, বি এল্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা। হিন্দু পত্রিকা প্রেস। "অন্তর্জগতে আমিত্ব বস্তুটী যেন মায়া-নির্যাস-নির্ম্মিত স্থিতি স্থাপকপদার্থ বিশেষ। অতি প্রসারণেই ইহার বিনাশ।" মন্বাদি-শাস্ত্র বিহিত চতুরাশ্রমে তিল তিল করিয়া কিরূপে এই সম্প্রসারণ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, এই গ্রন্থে তাহা বুঝান হইয়াছে। বিষয়টী নিতান্ত নূতন না হইলেও, ইহার আলোচনায় প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সূক্ষ্ম দর্শিতার পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এ গ্রন্থের আর একটী বিষয় চাতুর্ব্বর্ণ্য। গ্রন্থকারের ব্যাখ্যান-ভঙ্গীতে বোধ হয়, চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা আধ্যাত্মিক মাত্র;—সমাজে যাহাকে শূদ্র বলি, সে যদি সত্ত্ব গুণভূয়িষ্ঠ হয়, তবে সেও দ্বিজাতিলভ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী। "কোন অধিকারের স্ফুরণ দেখিলেই তৎশিক্ষা-সাধনায় প্রবিষ্ট করাইবার কোন বাধা নাই।" কিন্তু এ উক্তি কি শাস্ত্রসম্মত? আমাদের মনে পড়ে, শারীরকভাষ্যে সাধনসম্পদ্বিশিষ্ট শূদ্রেরও ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা যদি আধ্যাত্মিক মাত্র হয়, তবে নিষেধের কারণ কি? গ্রন্থকার হিন্দু বলিয়াই এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।

৪১। গৃহস্থের আদর্শ-দেহ-ত্যাগ।—শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বাসন্তী প্রেস ময়মনসিংহ এই পুস্তকে ভক্ত লেখক তাঁহার পরলোকগতা পুণ্যশীলা জননীর চরিত কীর্ত্তন করিয়াছেন। পুস্তক পড়িয়া আমরা অনেক স্থলেই বিগলিত হইয়াছি।

৪২। বৌদ্ধযুগে ভারত মহিলা বা বিশাখার উপাখ্যান। বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান প্রণেতা শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক পালিভাষা হইতে অনুবাদিত। মূল্য ।৵৹ আনা। পারসিভিয়ান্স যন্ত্র। ধর্ম্মপদ নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে এই উপাখ্যান অনুবাদিত হইয়াছে। উপাখ্যানটী তেমন মনোহর না হইলেও, দুর্ব্বুদ্ধি শ্বশুর সমক্ষে বুদ্ধশিষ্যা বিশাখার সে প্রখর তেজঃস্ফূর্ত্তি—ধ্যান করিবার সামগ্রী বটে। কিন্তু অনুবাদের বাঙ্গালা ভাল হয়

নাই। অনেক স্থলেই ভাষা কর্কশ অথচ অশুদ্ধ।

৪৩। আর্য্য-জাতি।—শ্রীসতীশচন্দ্র সান্যাল (Author of Notes on History of England and Children's Arithmetic) প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। হরসুন্দর যন্ত্র। সতীশ বাবু স্বরাষ্ট্রেই তো বেশ শোভা পাইতেছিলেন, তবে আবার এ ছাই পররাষ্ট্রের লোভ ছাড়িতে পারিলেন না কেন? কিন্তু হায়, পেট ছোট হউক আর বড় হউক, যশঃক্ষুধা কার নাই? সে জন্য কাহাকেও মন্দ বলিতে পারি না। তবে দুই একখানা গ্রন্থ পড়িয়া গ্রন্থকারের জন্য বড় দুঃখ হয়। আর্য্য জাতি সেইরূপ গ্রন্থ। হণ্টার সাহেব, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—এই তিন লেখকের লিখিত স্কুলপাঠ্য ইংরেজী ভারতেতিহাস তিনখানি পুঁজি করিয়া সতীশচন্দ্র এই পুঁথিটুকু লিখিয়াছেন। কিন্তু হায়, ঐ সকল ইতিহাসে ইংরেজী অক্ষরে যে সমস্ত নাম লিখিত আছে, সতীশচন্দ্র সে নামগুলিও ঠিক্ করিয়া পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। পতঞ্জলি যে "পাতঞ্জলি" অথবা চাতুর্মাস্যযাগ যে "চতুর্মাস্য" হইয়াছেন, তাহা তো বলাই বাহুল্য। যাজ্ঞবল্ক্য-শিষ্যা গার্গী বাচক্নবী—গার্গী "ভাকনাতি" হইয়াছেন। দর্শপূর্ণমাস নামক প্রসিদ্ধ হবির্যজ্ঞ "দশপূর্ণামাসা" এবং ঋগ্বেদীয় কল্পসূত্রকার আশ্বলায়ন মুনি সংক্ষেপে "আশ্লায়ন" হইয়াছেন। দুঃখেও পোড়া হাসি যায় না, মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত একেবারে "ময়ূর বংশীয়" হইয়াছেন! বই, অথচ তার নাম ব্রাহ্মণ—জিনিষটা কি ঠাওরাইতে না পারিয়া বেচারা একটা ফুট্ নোটে সরল হৃদয়ে ইংরেজীতে যেমন দেখিয়াছেন, তেমনই লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মণাম্ পাঠে জানা যায়" ইত্যাদি! একস্থানে মাথা মুণ্ডু একটা শব্দই ভুলিয়া গিয়াছেন; তাই দৃষ্টান্ত দিতেছেন, "যেমন Uranus সংস্কৃতে ঊষা" ইহাতেও সাঙ্গ হইল না—"মৎস্যগন্ধার পুত্র বিশ্বামিত্র" প্রভৃতিও আছে। সতীশ বাবু, কেন এ ঝক্মারী করিয়াছিলেন? আর্য্যজাতির ইতিহাস তো Children's Arithmetic নয়!

৪৪। পাঁঢ়ী দর্ পাঁঢ়ী।—নবাবিষ্কৃত ভারতের ইতিহাস। দেবনাগরী অক্ষরে মূল ও বঙ্গানুবাদ। পুঁথির আবিষ্কারক ও তাহার বঙ্গানুবাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, এম্ আর্ এ এস্ ইত্যাদি। মূল্য ৸০ আনা। "ধুন্ধার রাজ্যের অন্তর্গত 'সবাই' জয়পুর সদৃশ সবাই মাধোপুর নামক এক নগর আছে।" নগেন্দ্র বাবু সেই নগরের কোনও বৃদ্ধ হিন্দুর নিকট এই পুঁথি প্রাপ্ত হন। পুঁথিখানি ঝাড়সাহী বা জয়পুরী হিন্দী ভাষায় রচিত। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলম্গীর্ বাদশাহ নিহত হন; এই ঘটনার পরে—কত পরে, বলা যায় না—গ্রন্থখানি রচিত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর অতি ক্ষুদ্র—বার পেজী তের পাতায় ইহার বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। "পাঢ়া দর্ পাঁঢ়ার অর্থ পুরুষানুক্রমিক ইতিবৃত্ত বা বংশাবলী"। কিন্তু ইহা এক দিল্লীর রাজবংশাবলীরই সংগ্রহ—তবঁার বংশ, চৌহান বংশ এবং ঘোরী প্রভৃতি মুসলমান বংশাবলী। নামের তালিকাই ইহাতে আছে, ইতিহাসের কথা বড় বেশী নাই। সেই সকল তালিকা প্রভৃতিও আবার প্রায়শঃ প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের বিসংবাদী। ইতিহাসের হিসাবে এরূপ গ্রন্থের কোনও মূল্য আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না।

৪৫। নির্ম্মলা। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী প্রণীত। মূল্য ।/০ আনা। বগুড়া রায় প্রেস। গ্রন্থের নাম করণটা ঠিক্ হয় নাই—কেন না, উপন্যাসের শক্তি-কেন্দ্র নির্ম্মলা নহে, ছিদাম দত্ত। লেখকের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু উপন্যাস ভাল হয় নাই। সন্ন্যাসী আর ভগবদ্গীতাই আজ কাল উপন্যাসের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে।

সংবাদপত্র ও থিয়েটার।

সাধারণ লোকশিক্ষার প্রধান অবলম্বন—সংবাদপত্র ও থিয়েটার। জিনিস দুইটি খাস বিলাতী। আগে যাহা ছিল, তাহার কথা তুলিয়া ভারতের প্রাচীন-তত্ত্ব আবিষ্কার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু বর্ত্তমানে ঐ দুইটি বস্তু যে ভাবে আছে এবং যেরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার গতি, ক্রিয়া-পদ্ধতি এবং ফলাফল কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য লক্ষ্য।

বিলাতী সভ্যতার আলোকে যেমন আমরা অসংখ্য বস্তু লাভ করিয়াছি, তেমনই সংবাদপত্র ও থিয়েটার জিনিস দুটিও পাইয়াছি। সাধারণ লোকশিক্ষার হিসাবে, এ দুইটি জিনিসই অমোঘ বলশালী। যাহার প্রভাবে, একদিনেই সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠিতে পারে, তাহার শক্তি ও প্রভাব, বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সাধারণতঃ, অল্প শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয় ও মন লইয়া জিনিস দুইটি গঠিত। এ কথায় কেহ এমন না মনে করেন যে, তবে বুঝি আমরা সংবাদপত্র ও থিয়েটারের পরিচালকগণকে প্রকারান্তরে অশিক্ষিত সমাজের নেতা প্রতিপন্ন করিতেছি, এবং ঐ দুই বস্তুর রসাস্বাদনকারীগণকেও নিম্নস্তরে ফেলিয়া দিতেছি। বস্তুতঃ সেরূপ প্রতিপন্ন করাও দূরে থাক্, আমরা নিজেই এ দুই জিনিসের অনুরক্ত এবং ভক্ত। অশিক্ষিতের উপভোগ্য বলিয়া যে, সেই জিনিস সুশিক্ষিতেরও আদরণীয় হইবে না, এমন কোন অর্থ নাই। এই দেশে এবং প্রায় সকল দেশে এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা পণ্ডিতে ও মূর্খে সমান আগ্রহে উপভোগ করিতে পারে। এই সংবাদপত্র ও থিয়েটার হইতেও তাহা পারে। কারণ সংবাদপত্রেও ডিলানী ও ষ্টেড সাহেবের ন্যায় কৃতবিদ্য উদ্যমশীল শক্তিধর পুরুষ ছিলেন এবং আছেন, এবং থিয়েটারেও গ্যারিক ও আরভিংএর ন্যায় প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন এবং আছেন। এমত অবস্থায় ঐ দুই বিষয় বা বিষয়ের পরিচালক যে, সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তবে, আসল কথাটা হইতেছে এই যে, সংবাদপত্র ও থিয়েটার জিনিসটা প্রধানতঃ Mass বা দল লইয়া পরিচালিত। দলের রুচি অনুযায়ী সাময়িক আন্দোলন হুজুগ সংস্কার ও প্রবর্ত্তন,—প্রধানতঃ এই লইয়াই ঐ দুইটি জিনিস চলিয়া থাকে। সুতরাং অনেকটা আড়ম্বর ও দোকানদারী ঐ জিনিস দুটায় করিতে হয়। না করিলে আসর জমে না, খরিদদার জুটে না। এদেশের কথা দূরে যাউক, এখনও—এই শিক্ষা-সভ্যতার পূর্ণ আধিপত্য কালে, খাস ইংলণ্ড এবং আমেরিকায়ও ঐ অবস্থা। তবে, সেখানে ঐ ব্যবসাদারীর সঙ্গে সঙ্গে, লোকহিতের প্রতি একটু দৃষ্টি থাকে, এখানে অনেক স্থলে তাহাও নাই। নাই বলিয়াই আমাদের দুঃখ এবং নাই বলিয়াই ঐ দুই বিষয়ের পরিচালকগণের নিকট আমাদের কিঞ্চিৎ অনুযোগ।

যাঁহারা দেশের ও দশের এবং তৎসহিত আপনার কথা দিনান্তেও একবার ভাবেন,

তাঁহারা অবশ্যই জানেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব, যে ভাবে আমাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেছে, তাহাই পর্য্যাপ্ত। তাহার সহিত আবার সংবাদপত্র ও থিয়েটাররূপ প্রবলশক্তি,—এ শক্তিও ঐ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম রূপ—মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ-শরীর (যে টুকু এখনও আছে) আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। ইহার ফল ভাল কি মন্দ, তাহা ভবিতব্যতাই জানেন। তবে,কালের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা ফলিতেছে এবং ফলিবেও। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদিগকে একেবারে স্রোতে গা-ভাসান দেওয়া কোন ক্রমে যুক্তিযুক্ত নহে। সমাজের অধঃস্তন সম্প্রদায় সর্ব্বকালে—সর্ব্ব সময়েই গড্ডালিকা-প্রবাহবৎ চলিয়া থাকে বটে, কিন্তু যাঁহাদিগের একটুখানি মাত্রও পুরুষার্থ, মনুষ্যত্ব কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, তাঁহাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্টভাবে থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কর্ত্তব্য নহে বলিয়াই আমাদের এই প্রস্তাবের অবতারণা এবং কর্ত্তব্য নহে বলিয়াই, আমাদের দেশের আধুনিক সংবাদপত্র ও থিয়েটারের এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সাধারণের হৃদয় ও মন লইয়া সাধারণতঃ সংবাদপত্র ও থিয়েটার পরিচালিত। সুতরাং সাধারণ যাহার প্রাণস্বরূপ, তাহার শক্তি ও প্রভাব অসীম। কারণ সাধারণ লইয়াই দেশ, সাধারণ লইয়াই সমাজ, সাধারণ লইয়াই ধর্ম্ম, সাধারণ লইয়াই সাহিত্য ও সাধারণ লইয়াই যা কিছু। সেই সাধারণের সহিত যাহার এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, সে জিনিসের উচ্চ আদর্শ আমরা সর্ব্বদা দেখিতে চাই; পরন্তু তাহার ব্যভিচার দেখিলে মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করি।

দুঃখের বিষয়, এই সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া, আমাদের দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র ও থিয়েটার, ক্রমেই বড় অবনতির পথে যাইতেছে। কথাটা উল্টাইয়া বলিলে ইহাই বলা হয় যে, সাধারণ লোকের মতিগতি ক্রমশই বড়ই নিম্নগামী হইতেছে। সংবাদপত্র ও থিয়েটার সমাজের দর্পণ স্বরূপ; সাধারণের প্রতিবিম্ব অনেক সময় সেই দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। একজন বিদেশী পর্য্যটক কোন দেশে উপনীত হইয়া যদি সর্ব্বাগ্রে সেই দেশের সংবাদপত্র পাঠ করেন এবং থিয়েটার দেখেন, তবে তিনি অল্পায়াসে সেই দেশের রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি, শিক্ষা ও মনের গতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভ দেখিয়া, যেমন সেই দেশের অভাব অনুযোগ উপলব্ধি হয়, সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিয়াও তেমনই সেই দেশের শিক্ষা দীক্ষা, রুচি প্রবৃত্তি এবং মানসিক গঠন জানা গিয়া থাকে। পক্ষান্তরে থিয়েটার দেখিতে গিয়াও দেশের অবস্থা খানিকটা বুঝা যায়। সাধারণ লোক কি চায়, কি ভালবাসে, কোন্ রসের বেশী ভক্ত, তাহা সেই দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের মুখের তৎকালীন ভাব দেখিয়া জানা যায়। আর জানা যায়, রঙ্গভূমির পরিচালক বা অধ্যক্ষের বিষয় নির্ব্বাচন দেখিয়া এবং অভিনীত অংশে নট নটীর অঙ্গভঙ্গী ও নেত্রবক্ত্র-বিকারাদি দর্শন করিয়া। বলা বাহুল্য, শ্রোতা ও দর্শকের মনের ভাব বুঝিয়া অধিকাংশ অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় করিয়া থাকে। সাধারণতঃ 'বাহবাই' তাহাদের সম্বল; সমবেত দর্শক ও শ্রোতার তুষ্টি সাধনই তাহাদের লক্ষ্য; আর রঙ্গমঞ্চের অধিকারী বা অধ্যক্ষের ইঙ্গিত-উপদেশ পালন করাই তাহাদের কার্য্য। তাঁহার বেশী তাহারা বড় একটা যায় না, যাইতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম, দেশের অবস্থা এবং সাধারণের মতি গতি ও রুচি প্রবৃত্তি বুঝিতে হইলে, সংবাদপত্র ও থিয়েটার দ্বারা তাহা স্বল্পায়াসে বুঝা যায়। এই জন্য সংবাদপত্র ও থিয়েটারকে আমরা সমাজের দর্পণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

যাহা সমাজের দর্পণ এবং যাহার শক্তি ও প্রভাব অতি প্রবল, সে জিনিসের অধোগতি দেখিলে, স্বভাবতই মনে বড় কষ্ট হয়। আমাদের দেশের আধুনিক সংবাদপত্র ও থিয়েটারের অবস্থা দেখিয়া আমরা কষ্ট অনুভব করিয়াছি, এবং তৎপক্ষে দেশের সহৃদয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইতেছি। বস্তুতঃ যিনি দিনান্তেও একবার আত্মসমাজ এবং সমাজরূপী আত্মপরিবারের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহার পক্ষে অন্যান্য চিন্তার সহিত এই দুই বিষয়ের চিন্তা করাও এক্ষণে নানা কারণে বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ সংবাদপত্র ও থিয়েটার, দেখিতে দেখিতে আমাদের সদরে অন্দরেও প্রবেশ লাভ করিতেছে। সংবাদপত্রের ভাব ও চিন্তা, এখন অনেকের নিত্য আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আপিসের স্বল্প বেতনভোগী কেরাণী হইতে মুদি-পাকারী পর্য্যন্ত এখন সংবাদপত্র পাঠ করে; সম্পাদকীয় আলোচ্য বিষয়ে বাদানুবাদ করে; কোন কোন 'পাবলিক্' বিষয়েও স্বাধীন ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকে। আর মোটা-মাহিনাওয়ালা মুৎসুদ্দি, সদরালা, ডেপুটী, মুন্সেফ, ইহাঁদের ত কথাই নাই; —সকলেই এখন চা ও পান-তামাকের সহিত সংবাদপত্র-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। শুধু সহরে নহে, সুদূর মফস্বলেও এখন সংবাদপত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আদালতেও দেখিবে, বিশ্রাম-মণ্ডপে বসিয়া, উকীল মোক্তার সংবাদপত্রের কথা কহিতেছেন। আবার অন্দরেও,—নিতান্ত সে-কাল-ঘেঁসা স্ত্রীলোক ছাড়া, আধুনিক অনেক মহিলাও নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন, দেশের সকল খবরই রাখেন। সুতরাং সংবাদপত্রের প্রভাব, কেবলই যে পুরুষ পাঠকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা নহে, অনেক পুর-মহিলা পাঠিকাও সংবাদ পত্রের প্রভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন।

পক্ষান্তরে, থিয়েটারের প্রভাব ও আকর্ষণ, সংবাদ পত্র হইতেও অনেকাংশে অধিক। সংবাদপত্রের কোন কোন বিষয় পাঠে একটু ভাবিতে হয়, তাহা আয়ত্ত করিতে একটু বেগ পাইতেও হয়; পরন্তু থিয়েটারে একেবারে সমস্তই খোলাখুলি। সেখানে হাবভাব বিলাসিতা ভরপুর; নৃত্যগীত সুপ্রচুর; সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট নয়ন রঞ্জন; এবং আমোদ-উল্লাস চরম মাত্রায় বিদ্যমান। বিশেষ, কোনরূপ প্যাণ্টমাইম্ বা কমিক্ অপেরা অথবা প্রহসন হইলে ত আর কথাই নাই—সে সময় আর আদৌ আব্রু থাকে না। নট নটীর মধ্যেও নয়, বুঝি দর্শক-শ্রোতার মধ্যেও নয়! সকলেই তখন ভাবে ভোর;—হো হো হাসি, ঘন ঘন করতালি, আর রসাল বোলচালে রঙ্গমঞ্চ

প্রকম্পিত হইতে থাকে।—সে সব দেখিয়া শুনিয়া নীরবে নিশ্বাস ফেলিতে হয়; চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়; অন্তরে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিতে হয়।

অথচ এই থিয়েটারই, এখন সমাজের একটা দিক্ রাখিয়াছে। ইস্তক ইস্কুলের ছাত্র হইতে, নাগাইদ অন্তঃপুরচারিণী কুলবধূ পর্য্যন্ত, এখন সমান আগ্রহে থিয়েটার দেখিয়া থাকেন। থিয়েটার-গৃহ লোকে লোকারণ্য হয়।—ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত,—সকল শ্রেণীর লোকের এখানে সমাগম হইয়া থাকে। এই কলিকাতা সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত পুর-মহিলা, থিয়েটারের নিয়মিত দর্শক। থিয়েটার দেখা তাঁহাদের প্রায়ই ফাঁক যায় না। তাঁহাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দেখিয়া মনে হয়, থিয়েটারের প্রভাব তাঁহাদের হৃদয়ের উপর বড় বেশী পরিমাণে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে।

কথাটা যখন পাড়িলাম, তখন একটু খুলিয়াই বলি। থিয়েটার সংশ্লিষ্ট আমার একটি বন্ধু একদিন আমায় বলিলেন, "মহাশয়, আর দেখেন কি? এখন ঘরে ঘরে সজীব থিয়েটার হইতে চলিল। সে দিন বেলা দুইটার সময় আমি একস্থানে যাইতেছি, একটা গলির মধ্যে একটা বাড়ীর সাম্‌নে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ভদ্র পল্লী, গৃহস্থ বাড়ী। দিব্য পরিষ্কার অভিনয়-স্বর, আমার কাণে গেল। অনুভবে বুঝিলাম, বামা-কণ্ঠস্বর। দুইটি স্ত্রীলোক নায়ক-নায়িকা হইয়া, যথারীতি আমাদের থিয়েটারী সুরে, আমাদেরই অভিনীত একখানি নাটকের কথোপকথন আবৃত্তি করিতেছেন। তারপর একজন মৃদুস্বরে যথানিয়মে গানও ধরিলেন। আমি অবাক্ হইলাম।"—কথাটা সত্য বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল। কারণ এইরূপ এবং অনুরূপ প্রমাণ আমি আরও পাইয়াছি, এবং স্থলবিশেষে তাহা প্রত্যক্ষও করিয়াছি। তরুণবয়স্ক যুবক যুবতীর, কাব্য ও উপন্যাস পড়িয়াই যখন Hero ও Heroine সাজিতে সাধ যায়, তখন যে থিয়েটারের অভিনয় দেখিয়া তাঁহাদের মনে ঐ ভাবের আবির্ভাব হইবে এবং সুবিধা পাইলেই যে তাঁহারা ঐ অভিনয়ের একটু আধটু "কেরামৎ" দেখাইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? ফল কথা, থিয়েটারে, প্রলোভন ও আকর্ষণ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। সুতরাং থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্ব, এক হিসাবে সংবাদপত্র-পরিচালক অপেক্ষাও অধিক। সংবাদপত্র-পরিচালক একটা 'ছক্'—ভাষায় আঁকিয়া দেন; আর থিয়েটারের কর্ত্তা, সেই 'ছক্', সজীবভাবে, দর্শক ও শ্রোতার হাড়ে হাড়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন।

অথচ, থিয়েটার একেবারে হেলাফেলার সামগ্রীও নহে। আমোদের সহিত লোক-শিক্ষা দিবার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা পুথিগত বিদ্যায় তেমন অভ্যস্থ ও সন্তুষ্ট নহে; কিন্তু যাত্রা, থিয়েটার ও কথকতার উপদেশে অতি শীঘ্রই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এখন, সময় শিক্ষা ও রুচিভেদে—যাত্রা ও কথকতা দেশ হইতে একরূপ উঠিয়া যাইতেছে;—থিয়েটার তাহার স্থানে স্থায়ী আসন লইতেছে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে থিয়েটারের সংস্কার ও উন্নতি, বিশেষ প্রয়োজন।

থিয়েটারের সংস্কার ও উন্নতি করিতে হইলে, থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণকে একটু

উদার ও উন্নত প্রণালীতে থিয়েটার চালাইতে হইবে। তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে এমন সব উচ্চ আদর্শ লোক-চক্ষুর সম্মুখে ধরিতে হইবে, যাহাতে লোকের নৈতিক বল বৃদ্ধি পায়; চরিত্র সুগঠিত হয়; এবং ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব ও জাতীয়তা অর্জ্জিত হইতে পারে। এজন্য প্রথম প্রথম তাঁহাদিগকে একটু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে; একটু পয়সার মায়া কাটাইতে হইবে;—একবার দেশের ও দশের পানে তাকাইয়া, সমাজের মঙ্গল স্মরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে এক সোপান উচ্চে উঠিতে হইবে। কারণ তাঁহারা যখন আনন্দ প্রদানের সঙ্গে লোক-শিক্ষকের আসন লইয়াছেন, তখন লোককে একটু উন্নত করিতে না পারিলে, আর কি হইল? বিশেষতঃ কাব্য-সাহিত্যের ন্যায়, রঙ্গ-সাহিত্যও সমাজের কল্যাণসাধন করে। মহাকবি সেক্সপিয়রের রঙ্গ-সাহিত্য,—তাঁহার অদ্ভুত নাটকাবলী,—ইংরেজী সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টি সাধন করিয়াছে, এবং সাহিত্যের পুষ্টির সহিত, ইংরেজ-সমাজেরও অনেক উন্নতি করিয়াছে। আমাদের বাঙ্গলা দেশের রঙ্গালয়ের এখন শিশুকাল; এখানে অবশ্যই এখন সেক্সপিয়রের মহানাটকের ন্যায় রঙ্গ-সাহিত্যের আশা করিতে পারি না বটে; কিন্তু তা বলিয়া ছাই ভস্ম যাহা ইচ্ছা তাহাই যে রচিত ও অভিনীত হইবে, এবং তাহার ফলে দেশ উৎসন্ন যাইবে, এরূপ অভিমতিও প্রকাশ করিতে পারি না। তদপেক্ষা যদি দেশ হইতে থিয়েটার একেবারে উঠিয়া যায়, তাহাও মঙ্গল। —দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়ালও ভাল।

পরন্তু আমাদের এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে অভিনয়ের উপযোগী বহু বিষয় ত রহিয়াছে? রামায়ণ ও মহাভারত যে দেশের আদর্শ কাব্যগ্রন্থ; রাম সীতা যে জাতির উপাস্য দেবতা; শ্রীকৃষ্ণ যে দেশে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান বলিয়া পূজিত; সে দেশের এবং সে জাতির অভিনয়োপযোগী আদর্শ-মূলক কাব্য বা নাটক, বড় বেশী খুঁজিতে হয় না। রামায়ণ মহাভারতের পুঁজি ফুরায়, বিশাল রাজস্থান রহিয়াছে;—তাহাই ভাঙ্গিয়া অভিনয় কর। তাহাও নিঃশেষিত হয়, উচ্চ ভাবাপন্ন পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ গ্রহণ কর, এবং তাহাই সুকৌশলে ও নিপুণতা সহকারে জাতীয় চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়া নাট্য-কাব্য রচনা করিতে থাকো। এই জীবন-সংগ্রামের দিনে, বাঙ্গালী-জীবনে এখন ঘাত-প্রতিঘাত আসিয়াছে, এখন বঙ্গীয় সংসার বা সমাজ অবলম্বনে নাটক রচিত হইতে পারে।—যদি নিজেদের সে শক্তি বা সৌভাগ্য না থাকে,—তবে বঙ্গের কৃতবিদ্য শক্তিশালী সাহিত্যসেবীগণকে আহ্বান কর;—উপযুক্ত পারিশ্রমিক দাও,—নিশ্চয়ই উত্তম উত্তম নাটক বাহির হইবে;—নিশ্চয়ই সৎ গ্রন্থের অভিনয়ে দেশ এক সোপান উচ্চে উঠিবে।

তা নয়, যদি কেবলই কুৎসিত নাচ-গানের প্রলোভন দেখাইয়া এবং অশ্লীল প্যান্টমাইম্ প্রহসনের বুক্‌নি দিয়া, দেশকে রসাতলে দিতে চাও, ত আর কথা কি,—সাহিত্য, সমাজ, জাতীয়তা এবং ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব, এখন কিছু কালের জন্য চাপা পড়িল; আর দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী জাতি স্বভাবসুলভ পঙ্কিল আদিরসে আরও অর্দ্ধ শতাব্দী কাল হাবুডুবু খাইতে রহিল।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ,—হিন্দুর পবিত্র

অন্তঃপুরেও, ধীরে ধীরে ঐ বিষের বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। বলিতে লজ্জা হয়,—অন্তঃপুরচারিণী কুলমহিলাগণও তোমাদের রঙ্গালয়ে-অভিনীত কুৎসিত নাটকপ্রহসনের নায়ক নায়িকার অনুকরণে এখন বেশ ভূষা ও অঙ্গরাগ করিতে অভিলাষিণী! তাঁহাদের হীনবুদ্ধি স্বামিগণও তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিতেছেন! এ দৃশ্য আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।—আমাদের অধঃপতনের আর বাকী কি?

অথচ এই থিয়েটারের শক্তি এত অধিক যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহার প্রভাবে এক দিনেই দেশ মাতিয়া উঠিতে পারে। মনে পড়ে, "চৈতন্যলীলা" "প্রহ্লাদ চরিত্র" "বিল্বমঙ্গল" প্রভৃতি অভিনয় দেখিয়া একদিন সমগ্র বঙ্গ মাতিয়া উঠিয়াছিল। দেশে ধর্ম্মের বেশ একটা সুবাতাসও বহিয়াছিল। সহস্র উপদেশ এবং ধর্ম্ম-বক্তৃতায়ও যাহা হয় নাই, এক থিয়েটার হইতেই তাহা হইয়াছিল। এখন বোধ হয় ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। তাই আর ভাল নাটক হইতেছে না, ভাল অভিনয়ও হইতেছে না। অভিনয়ের সে মর্ম্মস্পর্শী গভীর ভাব গিয়াছে; এখন কেবল কথার গাঁথুনি ও পট-পোষাকের বাহার আছে। বলা বাহুল্য, থিয়েটারের এই সংক্রামতা কেবল সহরেরমধ্যে পরিব্যাপ্ত নহে,—সুদূর পল্লীগ্রামেও ইহার টান গিয়াছে। অজ পাড়াগাঁয়েও এখন থিয়েটার হয়। সুতরাং সেখানকার স্ত্রী পুরুষের মধ্যেও থিয়েটারী ঢং অল্পে অল্পে প্রবেশ করিতেছে।

থিয়েটারের অবস্থা ত এই; আর সংবাদ পত্রের? এদিকে চাহিলেও অন্ধকার দেখিতে হয়;—বাঙ্গালী-জীবনে ধিক্কার জন্মে। এখন অধিকাংশ সম্পাদকের মনের আর সে তেজ নাই, সে স্বাধীন ভাব নাই, সে উচ্চ লক্ষ্য নাই, সে সত্যপ্রিয়তা ও নিরপেক্ষতাও নাই,—কিসে কাগজ জমে, কিসে খরিদদার জুটে, কিসে হৈ চৈ পড়ে, কিসে নাম জাহির হয়, কেবলই সেই চেষ্টা ও মতলব। ব্যক্তিগত কুৎসা ও গালাগালি, বৈরতা ও দলাদলি,—এখন কোন কোন কাগজের একমাত্র অঙ্গ। সাধারণ শিক্ষা ও লোকহিত কিরূপে হইবে; সমাজ ও দেশ কিরূপে উন্নত হইবে; দেশের অভাব ও অভিযোগ কোন্ উপায়ে প্রশমিত হইবে; প্রজার প্রতি রাজার সহানুভূতি কিসে আকৃষ্ট হইবে,—সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। লক্ষ্যের মধ্যে আছে, কিসে পাঠকের মনোরঞ্জন হইবে,—কিসে নিজের দুই পয়সা লাভ হইবে, আর কিসে গ্রাহক জুটিবে। অথচ ইহাঁরাই এখন লোক-শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত! ইহাঁরাই এখন দেশের "বড়লোক!"

যে বিলাতের আদর্শে আমাদের দেশের বর্ত্তমান সংবাদ পত্র ও থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কি এই দুই প্রবল শক্তির এইরূপ অপব্যবহার হয়? বিলাতের লোকও ব্যবসাদার বটে; কিন্তু তাহারা জাতীয়তা ভুলে না, দেশ ভুলে না, সমাজ ভুলে না; মনুষ্যত্ব ভুলে না,—দেশের ও দশের উন্নতির জন্য তাঁহারা জীবন পণ করিয়া থাকেন।—তাহার সহিত আবার ব্যবসায়ও রক্ষা করেন।—ব্যবসা-বুদ্ধি কি ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত জড়িত হয় না? স্বার্থ কি পরার্থের পূর্ব্বসূচনা নয়?

এমন দিনে সেই চিরস্মরণীয় "সোমপ্রকাশ" (পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-

সম্পাদিত,) নব-বিভাকর, সাধারণী এবং হরিশ্চন্দ্রের সেই "হিন্দু পেট্রিয়টের" কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, সেই কি দিন ছিল, আর এখন কি দিন আসিয়াছে! সেই সময়েই যেন সংবাদপত্রের মধ্যে একটা "মাহেন্দ্র-ক্ষণ" আসিয়াছিল। সে "ক্ষণ" এখন গিয়াছে,—যেন একটা যুগ বহিয়া গিয়াছে! এখন এটা বিজ্ঞাপনের যুগ।

সত্যই বিজ্ঞাপনের যুগ! যার যত বিজ্ঞাপন, তার তত জয় জয়কার! ধর্ম্ম মানিবে না, মনুষ্যত্ব দেখিবে না, সমাজের পানে চাহিবে না,—যেন তেন প্রকারেণ টাকা আসিলেই হইল। সর্ব্বত্রই কেবল —"টাকা, টাকা, টাকা"-রব। এই টাকার মোহেই সাধারণ লোকশিক্ষার প্রধান দুটি অঙ্গ, এখন একেবারে ধ্বংসমুখে পতিত।

সংবাদ পত্র ও থিয়েটার,—এই দুই প্রবল শক্তি ক্রমেই লোকের মন হইতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইতেছে। সংবাদ পত্রের সকল কথা এখন আর লোকে বিশ্বাস করে না। কাহারও সম্বন্ধে প্রশংসা বা নিন্দা প্রকাশ হইলে, পাঠক স্পষ্টই বলিয়া থাকেন,—ঐ লোকটার সঙ্গে এই কাগজওয়ালার কোনরূপ স্বার্থের সম্বন্ধ বা মনোবিবাদ আছে। এইরূপে বিশ্বাস হারাইতে হারাইতে সংবাদপত্রের অস্তিত্ব,—শেষে বিজ্ঞাপনেই পর্য্যবসিত হইবে। আর ব্যক্তিগত কুৎসা ও গালাগালির আধিক্য দেখিয়া, লোকের সেই "রসরাজ" ও গুড়গুড়ে ভট্চাজ্জির কথা মনে পড়িবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংবাদপত্র ও থিয়েটার সমাজের দর্পণ স্বরূপ। যে দর্পণে বাঙ্গালী-জীবনের এমন কুৎসিত প্রতিবিম্ব উঠে, সে দর্পণ ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল। সে দর্পণকে নির্ম্মল ও উজ্জ্বল করিতে না পারিলে, তাহার অস্তিত্ব লোপ করিয়া, অন্ধকারে চক্ষু মুদিয়া থাকাই প্রশস্ত।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত)

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস।

(সপ্তদশ বৎসর পূর্ব্বে)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ভক্তসঙ্গে—বেদান্তবিচারে]

আজ রবিবার। এইমাত্র ভোগারতির সময় সানাই বাজিতেছিল। ঠাকুরঘর বন্ধ হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও প্রসাদ প্রাপ্তির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়াছেন। বিশ্রামের পর সেই মধ্যাহ্নকালে তিনি তাঁহার ঘরে ছোট তক্তাপোশের উপর বসিয়া আছেন। এমন সময়ে মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, অষ্টাবক্র সংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে। আত্মজ্ঞানীরা বলেন, সোঽহং, অর্থাৎ 'আমি সেই পরমাত্মা।' এ সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এ মত ঠিক নয়।

সবই করা যাচ্ছে,অথচ 'আমিই সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা' এ কিরূপে হতে পারে ?

"বেদান্তবাদীরা বলে, আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য এ সব আত্মার কোনও অপকার করতে পারে না—তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। যেমন ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে, কিন্তু আকাশের কিছু করতে পারে না।

"কৃষ্ণকিশোর বোল্‌তো, আমি 'খ'—অর্থাৎ আকাশবৎ। তা'সে পরমভক্ত, তার মুখে ও কথা বরং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয়।

পাপ-পুণ্য।

"কিন্তু 'আমি মুক্ত' এ অভিমান খুব ভাল। 'আমি মুক্ত' এ কথা বল্‌তে বলতে সে মুক্তই হয়ে যায়। আবার 'আমি বদ্ধ,' 'আমি বদ্ধ', এ কথা বল্‌তে বল্‌তে সে ব্যক্তি বদ্ধ হয়ে যায়। যে কেবল বলে, 'আমি পাপী' 'আমি পাপী,' সেই শালাই পড়ে যায়। বরং বল্‌তে হয়, আমি তাঁর নাম করছি, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি !

মায়া না দয়া ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে, হৃদে চিঠী লিখেছে,তার বড় অসুখ। একি মায়া, না দয়া ?

মাষ্টার কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়া কাকে বলে জান ? বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী,স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগ্‌নী, ভাইপো-ভাইঝি এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে—সর্ব্বভূতে ভালবাসা। আমার এটা কি হোলো, মায়া না দয়া ? হৃদে কিন্তু আমার অনেক করেছিল—অনেক সেবা করেছিল—হাতে করে গু পরিষ্কার কোর্‌তো। আবার তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল। এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ কর্‌তে গিছলুম। কিন্তু অনেক করেছিল—এখন কিছু (টাকা) গেলে আমার মনটা স্থির হয়। কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার বল্‌তে যাব ? কে বলে বেড়ায় ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(অধর সেন ও বলরামের প্রবেশ)

বেলা দুটা তিনটার সময় ভক্তবীর শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বলরাম বসু আসিয়া উপনীত হইলেন ও পরমহংসদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "হাঁ শরীর ভাল আছে, তবে আমার মনে একটু কষ্ট হয়ে আছে।" তিনি হৃদয়ের * পীড়া সম্বন্ধে কোন কথারই উত্থাপন করিলেন না।

বড়বাজারের মল্লিকদের সিংহবাহিনী দেবীবিগ্রহের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সিংহবাহিনী আমি দেখ্‌তে গি'ছিলুম। চাষাধোপা পাড়ার একজন মল্লিকদের বাড়ীতে ঠাকুরকে দেখ্‌লুম। পোড়ো-বাড়ী। তারা গরিব হয়ে গেছে। এখানে

* হৃদয় ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে পরমহংসদেবের সেবা করিয়াছিলেন। সম্পর্কে হৃদয় তাঁহার ভাগিনেয়। তাঁহার জন্মভূমি হুগলী জেলাস্থিত সিওড় গ্রাম। ঐ গ্রাম ঠাকুরের জন্মভূমি ৺ কামার পুকুর হইতে ২ ক্রোশ। ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে দ্বিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁর জন্মভূমিতে পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।

পায়রার গু, ওখানে শেওলা,এখানে ঝুর্ ঝুর্ করে বালি সুর্‌কি পড়্‌ছে ; অন্য মল্লিকদের বাড়ীর যেমন দেখেছি, এ বাড়ীর সে শ্রী নাই। (মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা, এর মানে কি,বল দেখি ?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, যার যা কর্ম্মের ভোগ আছে, তা তার কর্‌তে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ, এ সব মান্‌তে হয়।

"মৃন্ময় অধারের চিন্ময়ী দেবী"।

(মাষ্টারের প্রতি) আর পোড়ো বাড়ীতে দেখ্‌লুম যে, সেখানেও সিংহ-বাহিনীর মুখের ভাব জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে। আবির্ভাব মান্‌তে হয়।

"আমি একবার বিষ্ণুপুরে গে'ছিলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ী আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্ত্তি আছে, নাম মৃণ্ময়ী। ঠাকুর বাড়ীর সম্মুখে বড় দীঘি। (মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা, দীঘিতে আবাঠার (মাথা ঘসার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি ? আমি ত জানতুম না যে, মেয়েরা মৃণ্ময়ী দর্শনের সময় আবাঠা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাব সমাধি হ'ল, তখন বিগ্রহ দেখিনি, আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃণ্ময়ী-দর্শন হ'ল—কোমর পর্য্যন্ত।"

ভক্তের সুখ দুখ।

এতক্ষণে আর সব ভক্ত আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। কাবুলের রাজ-বিপ্লব ও যুদ্ধের কথা উঠিল। একজন বলিলেন যে, ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তিনি পরমহংসদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! ইয়াকুব খাঁ কিন্তু একজন বড় ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, সুখ-দুঃখ দেহ ধারণের ধর্ম্ম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গি'ছিলো। তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহ ধারণ কর্‌লেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে।

"শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন, কিন্তু সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ! মশানে কাট্‌তে নিয়ে গি'ছিলো। একজন কাঠুরে —পরম ভক্ত—ভগবতীর দর্শন পেলে, তিনি কত ভাল বাস্‌লেন—কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচ্‌লো না।

মাষ্টার। শুধু কারাগার ঘোচা কেন ? দেহই ত যত জঞ্জালের গোড়া, দেহটা ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ। তাই যে ক'দিন আছে, দেহ ধারণ কর্‌তে হয় যেমন এক জন কাণা গঙ্গাস্নান কর্‌লে তার পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কাণা চোক আর ঘুচ্‌লো না। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মভোগ।

মাষ্টার। যে বাণটা ছোড়া গেছে, সে বাণের উপর আর কোনও আয়ত্ত থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেহের সুখ দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান ও ভক্তির ঐশ্বর্য্য থাকে, সে ঐশ্বর্য্য কখন ও যাবার নয়। দেখনা,—পাণ্ডবদের অত বিপদ। কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মত জ্ঞানী, তাদের মত ভক্ত কোথায় ?

"বেঙ্গল্ গেজেট" ও "সমাচার-দর্পণ"।

(নব্যভারত, বর্ত্তমান বর্ষের (১৩০৭ সালের) আষাঢ়, ১৪০ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।)

"বেঙ্গল্ গেজেটকে" সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা বার্ত্তাবহ বলিয়া সপ্রমাণ করিবার কামনা ও প্রয়াস, প্রকৃষ্ট প্রণালীতেই চলিয়াছিল। "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া"-নাম্নী ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রিকায়, "কলিকাতা রিভিউ" নামক মাসিক ইংরাজি পত্রে, "সমাচার-দর্পণ"-নামক ইংরাজি ও বাঙ্গালা-বার্ত্তা-বিষয়ক পত্রে এবং "সমাচার-চন্দ্রিকা"-নামিকা পত্রিকায় সেই স্মরণাতীত সময়েও কত-মত প্রকারেই আন্দোলন ও অনুশীলন হইত, তাহার গণনা হয় না, বলিলেও চলে। বিশেষতঃ, শেষোক্ত পত্রিকা-দ্বয়ে তুমুল, বহুল ও বিপুল কোলাহল, প্রচলিত ছিল। এক বারের ঘটনা, পশ্চাৎ নিবদ্ধ করা যাইতেছে।

এক জন সংবাদপত্রিকার পাঠক, "সমাচার-চন্দ্রিকা"-নামক চতুর্থ সমাচার-পত্রে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন,—

"শ্রীযুক্ত "চন্দ্রিকা"-প্রকাশক মহাশয়েষু।—

"বাঙ্গলা-সমাচার-পত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম, গত ৬৮০ (ছয় শত আশি) সংখ্যক "দর্পণে" অনেক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে এক কথা লেখেন যে,—

"এই অপূর্ব্ব 'সমাচার-দর্পণাবতারের' পূর্ব্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল না যে, 'বাঙ্গালা-সমাচার-পত্র'-নামে কোন পদার্থ আছে।"

"উত্তর।—ঐ লেখক মহাশয়, বুঝি, এতন্নগরবাসী না হইবেন। কেন না, ৺ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, যিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবি সহিত ছাপা করেন, তিনি "বাঙ্গলা গেজেট" নামক এক সমাচার পত্র সর্জন করিয়াছিলেন। তাহা, নগরে প্রায় সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছিল। কিন্তু ঐ প্রকাশক, সাংসারিক কোন বিষয়ে বিশেষ বাধিত হইয়া, তাঁহার নিজ ধাম বহরা গ্রামে গমন করিলে, সে পত্র, রহিত হয়। তৎপরে দর্পণাবতার, ঐ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন। অতএব এ পদার্থ, প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

—সমাচার-চন্দ্রিকা (১)।

"সমাচার-চন্দ্রিকা" হইতে উল্লিখিত অংশ, "সমাচার-দর্পণ"-সম্পাদক মহাশয়, স্বীয় পত্রিকায় ১৯১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তিনি ১৯৪ পৃষ্ঠায় স্বীয় (সম্পাদকীয়) অভিপ্রায়, এইরূপে ব্যক্ত করেন,—

"চন্দ্রিকার এক পত্র-লেখক, "দর্পণে" প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন—"দর্পণ" যে, প্রথম বঙ্গিলা ভাষায় প্রকাশিত হয়, ইহা তিনি স্বীকার করেন না। এবং তিনি কহেন যে, "দর্পণ" প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্তি, প্রথম "বাঙ্গালা গেজেট" নামক সম্বাদ-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন।"

"সমাচার-চন্দ্রিকার" পত্র-লেখক, মহাশয়, "বেঙ্গল্ গেজেটের" সম্পাদক গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য-স্থলে-"গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য" করিয়াছিলেন। ইহাই, তাঁহার একমাত্র ভ্রম। তাঁহার অন্য কোনই ভ্রম নাই যিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে "সমাচার-দর্পণের" সম্পাদকের পদে ব্রতী ছিলেন, তিনি কেবল "দর্পণের" প্রাথম্য ও প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। "সমাচার-দর্পণের" প্রথম সম্পাদকবর্গের সে মত ছিল না। ইহার তিন বৎসর পর (১৮৩৪ খ্রীঃ) য

(১) "সমাচার-দর্পণ"—১৮৩১ খ্রীঃ, ১১ই (১২৩৮ সাল, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ), ১৯১ পৃষ্ঠা।

"সমাচার-দর্পণের" বন্ধ হইবার কথা উঠিয়াছিল, তখনও "সমাচার-চন্দ্রিকার" সম্পাদক মহোদয়, "সমাচার-দর্পণের" তিরোধান-নিবন্ধন বিস্তর বিলাপ ও আক্ষেপ সহকারে দৃঢ়তা পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন,—

"সমাচার-দর্পণ" উপকারক কাগজ। ইহার পূর্ব্বে-"বাঙ্গালা গেজেট" নামক এক সমাচার পত্র সর্জন হইয়াছিল বটে; অতি শৈশব-কালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয়। অতএব "সমাচার-দর্পণ" প্রাচীন এবং বিবিধ-সংবাদ প্রদ"।—'চন্দ্রিকা'। (২)

"ইহাতে আমাদের এই উত্তর যে, আমাদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে, "বাঙ্গালা গেজেট" নামে পত্র প্রকাশ হয়। কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে। 'চন্দ্রিকার' পত্র-প্রেরক মহাশয়, যদ্যপি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ বাঙ্গালা গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তবে "দর্পণের" প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপৌর্য্যের মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যদ্যপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে, তবে ১৮১৮ সালের যে ইংলণ্ডীয় সম্বাদ-পত্রে তৎপত্রের ইশ্তেহার প্রকাশ হয়, তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতু ভারতে বঙ্গের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয়, তন্মধ্যে "দর্পণ" আদিপত্র, ইহা আমরা জ্ঞাত হইয়া তৎ সম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে, অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।" (৩)

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, যখন "সমাচার-"দর্পণের" প্রথম প্রকাশ হয়, তাৎকালিক সম্পাদক মহাশয়, ভ্রম-ক্রমে বা স্বপ্ন-দর্শনেও ঐ কথা, লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার লেখনী কলঙ্কিত করেন নাই। প্রথমাবধি চতুর্থ বৎসরের প্রাচীনতম 'ফাইল্' সকল আমরা দেখিয়া, এই কথা বলিতেছি।

কোন কোন ঐতিহাসিকও, ঐ ভ্রমের বিষম আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল মহাশয়ের "প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসেও" বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উক্ত ভ্রান্তিময় উক্তি, বিরাজিত! প্রস্তাবিত অংশ এইরূপ,—

"ঁাহারই (লর্ড ময়রারই) উৎসাহদানে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা, প্রথম বাঙ্গলা সংবাদপত্র, সমাচার দর্পণ" মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন। (২৩শে মে, ১৮১৮)"। (৪)

"সমাচার দর্পণ" যে, প্রথম বঙ্গীয় বার্ত্তাবহ নহে, তাহার প্রমাণ, পশ্চাৎ প্রদত্ত হইতেছে।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিলে ডব্লিউ গর্ডন্ ইয়ঙ্ সাহেব, পাদরিপুঙ্গব লঙ্ সাহেবকে বঙ্গীয় পুস্তকাবলী ও বার্ত্তাবহ-সমূহের ইতিহাস-সঙ্কলনে অনুরোধ করেন। প্রথমোক্ত সাহেবের ন্যায়ানুগত প্রার্থনায় লঙ সাহেব, যাহা লিখিয়াছিলেন, পরে তাহা উদ্ধৃত হইবে।

প্রমাণান্তরও প্রদর্শিত হউক না কেন? সুতরাং মূল ইংরাজি তুলিয়া দিতে না পারিলে, আমাদের নিজের উক্তিতে লোকের আস্থা-স্থাপনার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব লঙ্ সাহেবের প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত ঐ ঘটনার প্রসঙ্গ, উপস্থিত ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হইল। সেই বৃত্তান্তটী এই,—

(২) সমাচার দর্পণ, (১৮৩৪ খ্রীঃ) ৫৪৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত।

(৩) সমাচার দর্পণ—১৮৩১ খ্রীঃ, ১১ই জুন, (১২৩৮ সাল, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ) ১৯৪ পৃষ্ঠা।

(৪) প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস, উনষষ্টিতম সংস্করণ, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ৭৫ পৃষ্ঠা।

"In 1816 the 'Bengal Gazette' was started by Gangadhar Bhattacharji who had gained much money by popular editions of the Vidya Sundar, Betal and various other works, illustrated with woodcuts; the paper was short lived." (5)

এখন সকলেই, বুঝিতে সমর্থ হইলেন—"বেঙ্গল্ গেজেট্"প্রথম সংবাদ পত্র। যথা—

পত্রিকার নাম।	প্রকাশাব্দ।	সম্পাদকের নাম।	বক্তব্য।
১। বেঙ্গল গেজেট (সপ্তাহিক)।	১৮১৬ খ্রীঃ (১২২৩ সাল)	গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য।	ইহার মাসিক মূল্য ১৲ টাকা। ১ (এক) বর্ষ স্থায়িত্ব।
২। সমাচার দর্পণ।	১৮১৮ খ্রীঃ (১২২৫ সাল)	মার্শম্যান কে'রি; ওয়ার্ড প্রভৃতি।	মাসিক মূল্য—ঐরূপ
৩। সংবাদ কৌমুদী।	১৮১৯ খ্রীঃ, জুলাই	রাজা রামমোহন রায়।	ইহা, বহু কাল ব্যাপিয়া চলিয়াছিল।

অতঃপর দ্বিতীয় পত্রিকার কথা বলিতে হইবে।

"সমাচার-দর্পণ।"

(দ্বিতীয় সংবাদপত্র)।

১। প্রকাশ সময়— { ১২২৫ সাল, ১০ই জ্যৈষ্ঠ। / ১৮১৮ খ্রীঃ, ২৩শে মে। } শনিবার।

২। বন্ধ হওয়ার কাল—১২৫৮ সাল (১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ।)

৩। সম্পাদকগণ। যথা,—

(ক) ডাক্তার কেরি
(খ) ,, মার্শম্যান্
(গ) ,, ওয়ার্ড

} শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত। ১৮১৮ হইতে ১৮৪২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত (৬)

(ঘ) কলিকাতান্তর্গত সান্‌কিভাঙ্গার এক ব্যক্তি। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ।

(ঙ) অজ্ঞাতনামক কোন ব্যক্তি, ১৮৪৪ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

(চ) পুনরায় শ্রীরামপুরের পাদরিবর্গ। ১৮৫১ হইতে ১৮৫৮ খ্রীঃ।

৪। মাসিক মূল্য—১৲ (এক টাকা)। সুতরাং বার্ষিক মূল্য ১২৲ (বার) টাকা।

৫। স্থায়িত্ব, ৩৭ (সাঁইত্রিশ) বৎসর।

৬। "সমাচার-দর্পণের" মুকুট-শ্লোকঃ—

"দর্পণে মুখ-সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ।
বৃত্তান্তানিহ জানন্তু, 'সমাচারস্য দর্পণে' ॥"

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকার উদ্ভব। ঐ অব্দ, তিন প্রধান কারণ-নিবন্ধন খ্যাতিমান্ ছিল। যথা ঃ—

১ম। শ্রীরামপুর-কলেজের প্রতিষ্ঠা।

২য়। স্কুল্‌বুক্ সোসাইটির স্থাপন।

৩য়। এই "সমাচার-দর্পণের" উৎপত্তি।

৪র্থ। শ্রীরামপুর হইতেই ইংরাজি ভাষার বহুল প্রচার হয়।—প্রথমটী দ্বারা তদঞ্চলীয় মানব-নিচয়ের অশেষ উপকার ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় বিষয়ে ভারতের—

(5) Descriptive Catalogue of Bengali works, by Rev. J. Long, 1855, p 66.

(৬) তৃতীয় সম্পাদক মহাশয়, এই সময় পর্য্যন্ত পত্রিকা সম্পাদনে ব্রতী ছিলেন।

বিশেষতঃ, বঙ্গের—বিবিধবিষয়িণী, উপকারকারিণী একটী মহতী সমিতির সূচনা করিয়া দিয়াছিল। তৃতীয় বা শেষোক্ত ব্যাপারে বঙ্গ-সাহিত্য, কতই উপকৃত, প্রবন্ধের অনুশীলনে তাহারই প্রতীতি করিয়া দিবে।

"সমাচার-দর্পণের" উৎপত্তির পূর্ব্বকথা, কথঞ্চিৎ কৌতূহলোদ্দীপক। হিন্দু মুসলমান, জৈন বৌদ্ধ, শিখ মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভারতীয়-প্রজা সাধারণের বিষয় বলিব না। কেন না, তাহারা একে বিজিত, তাহাতে আবার বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী। কিন্তু রাজপুরুষগণের সজাতীয়, সুশিক্ষিত, অথচ তাঁহাদের পুরোহিত-সম্প্রদায়ী পাদরী-পুঙ্গবপুঞ্জেরও গবর্ণমেণ্টের প্রতি কীদৃশ ভয়ের ভাব ছিল, তাহার পরিচয় জ্ঞাত করিতেছি।

এতক্ষণের পর প্রকৃত ইতিবৃত্ত বিবৃত করিবার অবসর ঘটিল। বর্ষান্তে উক্ত "সমাচার-দর্পণেই" যে ইতিহাস, প্রকাশ পাইয়াছিল, আমরা অশেষ আয়াসে, প্রভূত প্রয়াসে তাহার সারোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছি। এই বার সেই অংশটী, বিদ্যমান ক্ষেত্রে উত্থাপিত হউক। যথা,—

১২২৫ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠে (১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে) তারিখে শনৈশ্চর বাসরে 'সমাচার-দর্পণ'-তরুর প্রথম বীজ বপন হয়। তদনন্তর উক্ত "বৃক্ষ, অঙ্কুরিত হইয়া, দ্বি-পত্র—ত্রি-পত্র—শাখা, পল্লব, পুষ্পাদি দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া ও দৃঢ়মূল হইয়াক্রমে ক্রমে সংবৎসরে ফলবান্ হইয়াছে এবং নিকটস্থ—দূরস্থ—ভাগ্যবান্ বিদগ্ধ লোকেরা ও তৎ-সহবর্ত্তী শিষ্ট লোকেরা, আদর পূর্ব্বক তাহার ফলভোগ করিতেছেন। ইহাতেই আমাদের ("সমাচার-দর্পণ"-সম্পাদক-বৃন্দের) পরিশ্রমের সার্থক্য হইল।

"কিন্তু 'সমাচার-দর্পণের' প্রথমারম্ভকালে আমাদের মানসিক উদ্বেগ এই ছিল যে, এতদ্দেশে এই রীতি, কখন ছিল না (৭)। তৎপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা, "সমাচার-দর্পণ" গ্রহণ করিবেন না।

"এখন আমাদের সে উদ্বেগ শান্তি হইল। আমরা এই বলবতী আশা করি যে, এ বিষয়ে আমরা কখনও অকৃত্য হইব না ও ইহাতে নিবৃত্তও হইব না। এই "সমাচারদর্পণে"—

(১) কেহ, কেবল 'রাজনীতির সমাচার' জানিতে চাহেন।

(২) কেহ, কেবল প্রাচীন ইতিহাস,

(৩) কেহ, চোর-ডাকাতির সমাচার,

(৪) কেহ, যুদ্ধাদির সমাচার,

(৫) কেহ, নানা দেশের সমাচার জানিতে বাসনা করেন।

"অতএব নানা লোকের নানা অভিপ্রায়। এক ব্যক্তির অভিমত সমাচার দিলে, অন্যের অনভিমত হয়। এই প্রযুক্ত সকলের অভিমত সকল প্রকার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সমাচার লিখিয়াছি। এই এক বৎসরে এই "সমাচার-দর্পণে" যাঁহারা যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, সে অনুগ্রহ, আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না এবং আগামী বৎসরে এমন পরিশ্রম করিব যে, তাঁহারা অনুগ্রহানুরূপ তুষ্টিপ্রাপ্ত হন।" (৮)

তৎকালে শ্রীরামপুরই, খ্রীষ্টান মিসনরি-

(৭) কথাটা ভুল। যেহেতু, এই ঘটনার সংঘটনের অগ্রেই সংবাদ পত্র চলিত। সমাচার-পত্রিকা প্রচারের রীতি, ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ছিল। কেন না, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে "বেঙ্গল গেজেটও" উদ্ভূত হইয়াছিল।

(৮) "সমাচার-দর্পণ"—১ম বর্ষ, ৫২ সংখ্যা। ১২২৬ সাল, ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৮১৮। ১৫ই মে) দেখুন।

দিগের নিবাসের প্রধান স্থান ছিল। শ্রীরামপুরই, তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র। এই শ্রীরামপুরই—ডাক্তার মার্শম্যান্, ডাক্তার ওয়ার্ড, ডাক্তার কেরি প্রভৃতি বিদ্যা-ধন পাদরি-পুঙ্গবগণের লীলা-খেলার কেন্দ্র বলিলেই হয়। বহুকালাবধি বাঙ্গালা ভাষায় একখানি বার্ত্তাবিষয়িণী পত্রিকার প্রচারের বলবতী বাসনা, ব্যাকুল ভাবে তাঁহাদের হৃদয়-মধ্যে বিহার করিতেছিল। ইতঃপূর্ব্বে "বেঙ্গল্ গেজেটের" প্রসঙ্গ, কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার আয়ুঃ শেষ না হইলে, হয় তো তাঁহাদের এতটা ব্যগ্রতাই ঘটিতে পাইত কি না, সংশয় হয়। কিন্তু বাঙ্গালা অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে পাদরিদের আন্তরিক আতঙ্ক, অত্যন্তই অধিক। "রাজনীতি-তন্ত্র" বঙ্গভাষায় সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশিত হইতে থাকিলে, পাছে রাজপুরুষদের সরোষ বিষ-দৃষ্টিতে নিপতিত হইতে হয়, এই এক আত্যন্তিকী আশঙ্কা, তাঁহাদের অন্তর অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল কল্পনা-মূলক মানসিক বিভীষিকায় তাঁহাদিগকে বিচলিত করে নাই। সেটী, তাঁহাদিগের আন্তরিক আশঙ্কা। তাঁহাদিগের অন্যতম উদ্যোগ-কর্ত্তা ডাক্তার কেরি সাহেবকে একাদিক্রমে ২৫ (পঞ্চবিংশ) বৎসর-ব্যাপক কালে প্রধান প্রধান রাজপুরুষ পুঙ্গব-পুঞ্জের সমক্ষে ও পরোক্ষে এক প্রকার নজরবন্দী ভাবে যাপিত করিতে হইয়াছিল। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা তিনি অধিকতম ভীত, চকিত, এবং ত্রস্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অধ্যবসায়ী পাদরিপুঞ্জ, পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। যথা :—

(ক) তাঁহারা তৎকাল-প্রচলিত সংবাদ-পত্রিকা-সমূহে তদা-ভবিষ্য এই "সমাচার-দর্পণের" উদ্দেশ্যের ও উহা কি প্রকারের উপকরণে পরিপুষ্ট হইবে, তাহার তাৎপর্য্য, বিজ্ঞাপনভাবে মুদ্রিত করিতে থাকিলেন। কিন্তু কি বিস্ময়েরই বিষয়—তাঁহারা দেখিতে পাইলেন,—কার্য্য-কালে উক্ত বিজ্ঞাপকদিগকে তিরস্কৃত, শাসিত বা কোনরূপেই দণ্ডিত হইতে হইল না। এইটীই প্রথম উপায় ছিল। দ্বিতীয় উপায়ের বিষয়, পরে উল্লিখিত হইতেছে। (খ) পত্রিকা-প্রচারের পূর্ব্ব-রজনীযোগে (১২২৫ সাল, ৯ই জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ১৮১৮ খ্রীঃ ২২ শে মে, শুক্রবার) কেরি সাহেব, শেষ প্রুফ সন্দর্শন-সময়ে সান্ধ্য সমিতিতে পুনরায় পূর্ব্বতন বিভীষিকার কথা উত্থাপিত করিলেন।

ডাক্তার মার্শম্যান সাহেব, সেই সংস্রবাধীন কথা-প্রসঙ্গে ধীর ভাবে স্বীয় মানসিক ভাব অভিব্যক্ত করিয়া এই প্রস্তাব করেন যে,—

"আগামী কল্য শনিবার প্রাতঃকালেই গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিকে "সমাচার-দর্পণের" সূচীগুলির সহিত একখণ্ড পত্রিকা, আদর্শ (নমুনা)-স্বরূপ প্রেরণ করা যাউক।" সেই প্রস্তাব, যথারীতি কার্য্যেই পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু, কি সৌভাগ্য দেখ, উচ্চপদস্থ কোন রাজপুরুষই (কর্ম্মচারীই), কোন প্রকার আপত্তি বা অসম্মতি বিজ্ঞাপিত করিতে সাহসী হন নাই! বরং গবর্ণর-জেনারেল, স্বহস্তে সেই সুযোগ্য সম্পাদক-প্রবরকে একখণ্ড পত্র লিখিলেন। সেই চিঠিতে তিনি সরল অন্তরেই প্রকাশ করিয়াছিলেন;—

"It is salutary for the Supreme authority to look to the control of Public Scrutiny."

"সমাচার-দর্পণে" উহার যে ইতিহাস প্রকাশিত হয়, যথাস্থানে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

পার্শী ও ইংরাজী ভাষা, যখন "দর্পণের" অঙ্গে প্রতিফলিত হইত, তখনকার এক রূপ ব্যবস্থা ছিল। তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

ইতঃপূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, কেরি সাহেব, এই পত্রিকা-প্রচারে ব্রতী হইয়া প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, বঙ্গভাষায় লিখিত রাজনীতি-সংক্রান্ত এরূপ সংবাদপত্র ("সমাচার-দর্পণ") রাজপুরুষদিগের প্রীতিপ্রদ হইবে না। কেন না, উহা বঙ্গভাষায় আলোচিত হইতেছে। এইরূপ রাজনীতিক আলোচনায় আপামর ব্যক্তি, রাজনীতির আস্বাদ পাইয়া এদেশে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ইত্যাদির সৃজন করিতে পারে।

লঙ সাহেব, ভ্রম-ক্রমে "সমাচার-দর্পণ" না লিখিয়া "শ্রীরামপুর-দর্পণ" লিখিয়াছেন। এই ভ্রান্তির হেতু কি, নির্দ্দেশিত হইতেছে। "কলিকাতা রিভিউ" (৯) পত্রে "দর্পণ অব্ শ্রীরামপুর" অর্থাৎ 'শ্রীরামপুরের দর্পণ' লিখিত আছে। এখানে "সমাচার-দর্পণ"-কে সংক্ষিপ্ত ভাবে কেবল "দর্পণ" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার পরে ৫(পাঁচ) বৎসর অতীত হইলে "দর্পণ অব্ শ্রীরামপুর" শব্দটী, সাহেব কর্ত্তৃক "শ্রীরামপুর দর্পণ" আকার ধারণ করে, এই পত্রিকা (সমাচার-দর্পণ) খানি, ফলতঃ শ্রীরামপুরেরই "দর্পণ" হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"সমাচার-দর্পণ" সাধারণ পাঠকগণের এমন কি, হিন্দুভাবাপন্ন গ্রাহকবর্গের বরাবর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামটী, গ্রাহকশ্রেণীর তালিকার শীর্ষ স্থান অধিকার করায়, ইংরাজ-সমাজ, বঙ্গবাসিবৃন্দের বদন-মণ্ডল উজ্জ্বল দেখিলেন। তখন রাজধানী ও ইহার বেষ্টনকারী স্থান-সমূহে সংবাদপত্রের ডাক মাসুল ।০ (চারি) আনা ধার্য্য ছিল। লর্ড হেষ্টিংস্ সমীপে উক্ত ডাকমাসুল কমাইবার জন্য আবেদন প্রেরিত হইলে, তিনি রাজধানীতে (কলিকাতায়) আসিয়া উহার সুবিধা করিয়া দেন। ৵০ (এক) আনার মাশুল দিলেই, প্রতি সংখ্যা বিলি হইবে, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল (১০)।

শ্রীরামপুরের অন্যতম পাদরী, উক্ত মার্শম্যান (সমাচার দর্পণের প্রথম সম্পাদক), সাহস করিয়া উহার প্রথম সংখ্যা, লর্ড হেষ্টিংসের গোচর করিলে, তিনি রাজোচিত অভ্যর্থনায় তাহার সমাদর করিয়াছিলেন।

"সমাচার-চন্দ্রিকা" "দর্পণের" প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেও, "দর্পণের" অন্তর্দ্ধানের প্রস্তাবে কিরূপ দুঃখিত, ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, বক্ষ্যমাণ বিবরণ, তাহাই সপ্রমাণ করিয়া দিবে।

"সমাচার-দর্পণের রহিতের কল্পবিষয়ক" এক প্রবন্ধে চন্দ্রিকা-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন;—

(৯) Calcutta Review, 13th vol, 1850 A. D.

(১০) এই বৎসরেই ডাক্তার মার্শম্যান সাহেব কর্ত্তৃক "ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়ার" প্রচার আরম্ভ হয়। প্রথমে উহা প্রত্যেক মাসে প্রচারিত হইত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দেও উহা ঐরূপেই প্রচারিত হয়। কিয়দ্দিনানন্তর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে উহা ত্রিমাসিক আকার ধারণ করিয়া লোকনয়নের গোচর হয়। তৎপরে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দেই সপ্তাহে সপ্তাহে "ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া" গৃহে গৃহে উপস্থিত হইয়া বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিয়া যাইত। এই ভাবে ইহা বহু কাল চলিয়া "ষ্টেটস্‌ম্যানের" অঙ্কে স্থান লাভ করিয়াছে।

"সমাচার-দর্পণ"রহিতের কল্প। "আমরা অবশ্য স্বীকার করি—"সমাচার দর্পণ "উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে, এ সকলের অগ্রজ, অনুমান হয়। ইহার পূর্ব্বে "বাঙ্গালা গেজেট" নামক এক সমাচার পত্র, সর্জন হইয়াছিল বটে, কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয়। অতএব "সমাচার দর্পণ" প্রাচীন এবং বিবিধ সংবাদপ্রদ। যেহেতুক, এক্ষণে ইংরাজ বাহাদুর, দেশাধিপতি। তজ্জাতি, সর্ব্বত্র বিচারপতি ইত্যাদি নানাবিধ প্রধান প্রধান পদস্থ। বঙ্গদেশস্থিত ইংলণ্ডীয় মহানুভবদিগের দ্বারা "দর্পণ"-কার, যে প্রকার সমাচার-সংগ্রহ করিবার সমর্থ, তাদৃশ প্রকার অন্যের হওয়া ভার। অপর, "সমাচার দর্পণের" প্রতি, পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের যে প্রকার আশঙ্কা ছিল, তাহা কালে অনেক লোপ হইয়াছে। অর্থাৎ মৃত বিজ্ঞবর ডাক্তার "কেরি" সাহেব, ঐ কাগজের স্রষ্টা। তিনি হিন্দু ধর্ম্মের দ্বেষ্টা, এই প্রধান কারণ। দ্বিতীয়, পূর্ব্বে মিসনরি সাহেবেরা, অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া, পথে ঘাটে, হাটে মাঠে, যেখানে লোক-জনতা হইয়াছে, সেই খানেই বিতরণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাহাতে ক্ষান্ত হন নাই; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে বাহুল্য রূপ নাই। যথা কথঞ্চিৎ আছে। সে যাহা হউক, সমাচার দর্পণ প্রকাশ হইলে অনেকেরি মনে উদয় হইল, কেরি সাহেব, এই এক ফিকির করিয়া খ্রীষ্টিয়ান মত লওয়াইবার উপায় করিয়াছেন। এই সকল কারণে সমাচার দর্পণ সর্ব্বত্র বিশেষরূপে মান্য হয় নাই। শেষে চন্দ্রিকাদি কাগজ হইলে, নানা প্রকার বাদানুবাদ হওয়াতে এবং ঐ কাগজে মানাধিপতি শ্রীযুত জান্ মার্সমেন্ সাহেবের বিশেষ পরিশ্রম ও বিদ্যা বুদ্ধি-প্রকাশে, কাগজের পূর্ব্ব-রাষ্ট্রীয় দোষ, অনেক মোচন হইল; এবং গ্রাহকের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যদ্যপিও আমারদিগের ধর্ম্ম পক্ষের বরাবরি বিপক্ষ, তথাচ "দর্পণ" সকলেরি পাঠ্য। যে হেতুক এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিচার করা হয় মাত্র। পরে "চন্দ্রিকা" কাগজ, বারত্রয় প্রকাশ হওয়াতে, "দর্পণে" কিঞ্চিৎ 'চিতি' পড়িয়াছিল। তৎপ্রকাশক মহাবিবেচক, তৎক্ষণাৎ অম্লরসে "চিতি"-রূপ কলঙ্ক মোচন না করিয়া, অপূর্ব্ব মিষ্টরসে "দর্পণের" দোষ দূর করিলেন, অর্থাৎ ইংরেজী ও বাঙ্গালা এতদুভয় ভাষায় প্রকাশ হওয়াতে, ইংরেজ বাঙ্গালি, উভয় জাতীয়ের নিকট সমাদৃত হইল। ইহাতে গ্রাহক বৃদ্ধি হইবায় প্রকাশক মহাশয়, মহাসাহসিক হইয়া বার-দ্বয় "দর্পণ" দর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে অর্দ্ধ চন্দ্রের উর্দ্ধ মূল্যাধিক হইল না। যদ্যপি সে তরজমায় পরিশ্রম ও ক্ষমতা লোক বিবেচনা করেন,: তবে "দর্পণের" মূল্য তিন টাকা দিলেও, ক্ষতি বোধ হয় না। যদিও আমারদিগের চিরকালের বিরোধী, তথাপি আমরা স্বরূপ কথা অবশ্যই কহিব। এমত সুদৃশ্য "দর্পণ", রহিত হইবার সংবাদ শুনিয়া, আমরা, মহা দুঃখিত হইলাম। "দর্পণ"-কার মহাশয়, গত ৫ই নবেম্বর ২১শে কার্ত্তিক বুধবাসরীয় "দর্পণে" লিখিয়াছেন যে, ডাকমাশুল বৃদ্ধি হওয়াতে, অনেক গ্রাহক, "দর্পণ"পরিত্যাগ করিয়াছেন। এজন্য এক্ষণে বুধবারে যে এক তক্তা কাগজ প্রকাশ হইত, তাহা রহিত হইবেক। পরে এক টাকা মূল্যে এক বার অর্থাৎ কেবল শনিবারে প্রকাপ করা যাইবেক। ইহাতেও যদি গ্রাহকগণের আনুকূল্য বোধ না হয়, তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের সঙ্গে "দর্পণ," দর্শকতা-সম্পর্ক রহিত করিতে হইবে।

এতদ্বিষয়ে "দর্পণ"কারের খেদোক্তিতে আমরাও, মহা-খেদিত হইলাম। কেন না, "দর্পণ"কার, অতি দূরদর্শী এবং এক প্রকার আমারদিগের সকলেরি পরামর্শী। যেহেতুক, "দর্পণ", যে ধারায় প্রথমতঃ প্রকাশ হয়, তদ্দৃষ্টে আমাদিগেরও কাগজ প্রকাশ পাইল। অপর, "দর্পণের" মূল্য অধিক করিলে অনায়াসে করিতে পারিতেন। কিন্তু বিচক্ষণ প্রকাশক, দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দুই টাকা মূল্য করিলেও, কেহ, দুর্মূল্য-বোধে ত্যাগ করিতেন না। তথাচ তাহা না করিয়া ১৷৷০ টাকা করিয়াছিল, তাহার বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইল। ইহা, অতি খেদের বিষয়। কাগজ-প্রকাশকেরা, গবর্ণমেণ্টের নিকট অতি দীন, তাহার সন্দেহ কি? এই দীন, ধনহীন ব্যক্তিগণ, আপনাদিগের লভ্য ত্যাগ করিয়া কেবল কাগজ-প্রকাশোপযুক্ত ধন লইয়া, দেশের লোকহিতার্থ সমাচারের কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট, দেশাধিপ হইয়া কিঞ্চিৎ ডাকমাশুল ন্যূন, স্বীকার করিতে পারিলেন না। ন্যূন করা দূরে থাকুক, দ্বিগুণ করিবার কি আবশ্যক হইয়াছিল? কি গবর্ণমেণ্টের এক্ষণে কোষশূন্য হইয়াছে? যে কোন প্রকারে হউক না কেন, ধনসঞ্চয় অবশ্যই কর্ত্তব্য। তাদৃশ সময় এক্ষণে উপস্থিত হয় নাই। অতএব প্রার্থনা, এতদ্দেশীয় ভাষায় যে একটা কাগজ প্রকাশ হয়, ইহারদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিলে, ইহার প্রকাশকেরা এবং তৎপাঠকবর্গ, বিশেষ উপকৃত হইবেন। গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি এক শত টাকাও, প্রতি মাসে সম্ভব নহে। এই অল্প ধনের নিমিত্ত কেন রাজ্যশুদ্ধ লোককে দুঃখিত করিবেন? আমরা অনুমান করি, শ্রীশ্রীযুক্ত লর্ড উয়িলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর, এ রাজধানীতে আগমন করিলে, অবশ্যই ইহার বিহিত হইতে পারিবেক।"—(চন্দ্রিকা)। * (ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

বার-ভূঞা।

লক্ষ্মণ মাণিক্য।

ভুলুয়া অবস্থিতি কালে, রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য সম্বন্ধে যে যে বিষয় জানিতে পারিয়াছি, তাহার কতিপয় সারাংশ পাঠকগণের অবগতি জন্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

* সমাচার দর্পণ, ১৮৩৪। ১৫ই নবেম্বর (১২৪১ সাল, ১লা অগ্রহায়ণ) ৫৪৭ পৃষ্ঠা।

বঙ্গীয় যে দ্বাদশ ভৌমিক আকবর বাদসাহের সমকালে অভ্যুদিত হইয়া বঙ্গে স্বাধীনতা ধ্বজা প্রোথিত করিবার জন্য, বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, মহাত্মা লক্ষ্মণ মাণিক্য তাহার অন্যতম। মেঘনার পূর্ব্বতটবর্ত্তী ভুলুয়া প্রদেশে তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য বর্ত্তমান ছিল, অধুনা তাহা নোয়াখালি জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিয়া অন্য ভূস্বামীর জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে।

আইন আকবরী গ্রন্থে উহার 'বালাজোয়ার' নাম দৃষ্টি হয়, ঐ জোয়ার সরকার সোণার গাঁয়ের অন্তর্গত একটী মহাল ছিল। উহার বাৎসরিক রাজস্ব ছিল ১৩৩০৪৮০ দাম অর্থাৎ ৩৩২৬২ টাকা। বালা শব্দটী ভুলুয়ার অপভ্রংশ হইবে। নোয়াখালির ও বাখরগঞ্জের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী স্থানগুলি পূর্ব্বে ভাটি নামে অভিহিত হইত। প্রায় ৮০।৮৫ বৎসর অতীত হইল, নোয়াখালির অন্তর্গত বাবুপুরের চৌধুরীদের একটা দাঙ্গা উপলক্ষ করিয়া, 'চৌধুরীর লড়াই' নামে যে একখানা গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত চৌধুরিরা আপনাদের সম্পত্তির গৌরব উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, "আমাদের মতন জমিদার আর ভাটির বাঙ্গালায় নাই।" এই বাবুপুর ভুলুয়ার এক অংশ। অতএব আইন আকবরীর বালাজোয়ার ও ভাটি, আধুনিক ভুলুয়া প্রভৃতি দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানগুলি যে একই, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আইন আকবরী হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল, উহাতে এ বিষয়ের মীমাংসা আরও সুন্দররূপে হইতে পারিবে। "সুই আফগান নামে একজন সেনাপতি পূর্ব্বদিকে ভাটি নামে একটী দেশ জয় করিয়া, সুবে বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করেন। এই নব্য সংযুক্ত দেশের আম্র বৃক্ষ সকল, একজন মনুষ্যের ন্যায় দীর্ঘাকার; মনুষ্যের অপেক্ষা উচ্চ নহে। এই ভাটি দেশের সীমান্তেই ত্রিপুরা রাজার বিস্তৃত রাজ্য।" ভুলুয়া, বাবুপুর প্রভৃতি পরগণা গুলি ত্রিপুরা রাজ্যের সংলগ্ন ও দক্ষিণাংশে অবস্থিত। অতএব প্রতীতি হয় যে, ঐ ভূভাগই ভাটি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কখন ত্রিপুরার রাজা, কখন বা আরাকানাধিপতি উহা হস্তগত করিয়া শাসন করিতেন। সুই আফগান্ সম্ভবতঃ আরাকান রাজার হস্ত হইতে, ভাটিদেশ উদ্ধার করিয়া, মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরা ও সমতট বঙ্গের পূর্ব্বদক্ষিণবর্ত্তী স্থানগুলি, সাগরশাখামধ্যে নিমজ্জিত ছিল। পরে জল সরিয়া পড়ায়, উহা চরাতে এবং তৎপশ্চাৎ জননিবাসে পরিণত হয়। চন্দ্রদ্বীপ উদ্ভব সম্বন্ধে চন্দ্রশেখর শর্ম্মার ও দনুজ মর্দ্দন রায়ের যেরূপ একটা কাহিনী চলিয়া আসিয়াছে, ভুলুয়ার উদ্ভব সম্বন্ধেও সেইরূপ একটী কিংবদন্তী শ্রুত হওয়া যায়। আমরা উহা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহার সারমর্ম্ম এইস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

প্রবাদ, মিথিলানিবাসী ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব আদিশূর বংশীয় বিশ্বম্ভর শূর স্বজনগণ সহ, নৌকারোহণে চন্দ্রনাথ তীর্থ সন্দর্শন মানসে তথায় যাইতেছিলেন। ক্রমে মেঘনা নদ অতিসঙ্কুল স্থানে কোনরূপে বাস তাঁহাদের হারা ভিন্ন স্থানের হিন্দুগণের কিনারা না পাইয়া তাঁহারা ভয়ে অভিভূত হইয়া, ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে থাকেন। যখন ত্রিযামা অতীতাপ্রায়, তৎসময়ে শূর

মহাশয়ের নিদ্রাকর্ষণ হয়। তদবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখিতে পান, এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "বৎস, তোমার আর ভয়ের কোনও কারণ নাই, এই যে বিস্তীর্ণ জলরাশি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, বিভাবরী অবসানের সহিত উহাও অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। তখন তোমার এই বৃহৎ যান মৃত্তিকাসংলগ্ন হইলে পর, সেই ভূমিতে অবতরণ করিয়া উহা কিঞ্চিত পরিমাণে খনন করিও তবেই আমার বারাহী মূর্ত্তির অনুকৃতি এক পাষাণময়ী প্রতিমা প্রাপ্ত হইবে। পরে উহা উত্তোলন করিয়া, যদি এইস্থানে সংস্থাপিত কর, তবে তুমি নিশ্চয়ই এই স্থানের অধিপতি হইবে। এবং বহুপুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশধরেরা এই প্রদেশের রাজা বলিয়া পরিগণিত থাকিবে। অন্যথা আমার কথা অবহেলা করিয়া যদি প্রস্থান করিতে চাহ, তাহা হইলে কখনই সফলকাম হইতে পারিবে না।" দেবীর অন্তর্দ্ধানের সহিত শূর মহাশয়েরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। ইষ্টনাম স্মরণানন্তর তিনি স্বপ্নের যাবতীয় বিবরণ সঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ নিকটে বলিতে লাগিলেন। তাহারা 'শুভ শুভ' বলিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে নিশি অবসান হইয়া গেল। এই সময়ে দৃষ্ট হইল, বহু দূর পর্য্যন্ত স্থল ব্যতীত জল বিদ্যমান নাই। বিস্তীর্ণ বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে, নৌকা চড়ায় সংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। সূচনাতেই স্বপ্নের সত্যতা লক্ষ্য করিয়া মৃত্তিকা খনন করা শনে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ পরাজিত ব্যক্তি হইতে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সকলেই আনন্দে মাতিয়া গেল, ঠিক হইল, ঐ দিবসেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

যে দিবস প্রতিমা সংস্থাপন করা হইল, ঐ দিবস দিনমণি একবারও উদিত হইলেন না। নিবিড় কুজ্ঝটিকাজালে মেদিনীমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। পরদিন যখন সুপ্রভাতে সূর্য্যদেব স্বশরীরে আবির্ভূত হইয়া গগনে সমুদিত হইলেন, তখন দেখা গেল, দেবীকে পূর্ব্বাস্য করিয়া সংস্থাপিত করা হইয়াছে। দক্ষিণ অথবা পশ্চিমাস্য করিয়া দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করা নিয়ম। এই স্থলে ভ্রমে পতিত বলিয়া, শূর মহাশয় ঐ স্থানের নাম রাখিলেন, "ভুলুয়া" (ভুল-হুয়া হইতেই ভুলুয়ার নামের উৎপত্তি, এইরূপ কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে)। আবার কেহ কেহ বলেন, ঐ প্রদেশের পূর্ব্বাধিপতিকে অল্প পরিমিত স্থান এই বলিয়া ভুলাইয়া বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের আধিপত্য লাভ করায়, উহার নাম করা হয় ভুলুয়া। বাস্তবিক গল্পাংশে, প্রথমটীই মনোরম এবং সমীচীন বোধ হয়।

রাজা আদিশূর বংশীয় এই বিশ্বম্ভর শূরের বংশে রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের জন্ম হয়। এই স্থলে যে আদিশূরের কথা লিখিতে হইল, ইনি বঙ্গদেশের স্বাধীন নৃপতি বৈদ্যজাতীয় আদিশূর নহেন। ইনি মিথিলার ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, পরে তদ্বংশীয়েরা কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন।

বিশ্বম্ভরের তিন কি চারি পুরুষ অন্তর রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের অভ্যুদয় হয়। বঙ্গদেশে থাকিয়া ক্ষত্রিয়েয় সহিত আদান প্রদান সম্পাদন সুকঠিন বিবেচনায়, লক্ষ্মণ কায়স্থ সম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলন লাভের প্রয়াস পান। এই সময়ে গাভার ঘোষবংশের পূর্ব্ব পুরুষ, পরমানন্দ ঘোষের সহিত আপনার এক তনয়াকে বিবাহ দিয়াছিলে। কিন্তু ঘোষ মহাশয় সস্ত্রীক স্বালয়ে প্রস্থান করিলে

পর, চন্দ্রদ্বীপ সমাজস্থ অপরাপর সামাজিকেরা তাঁহার সহিত সমাজ সামাজিকতা করিতে স্বীকৃত হইল না। পরমানন্দ অনন্যোপায় হইয়া বনিতা সহ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ভুলুয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লক্ষ্মণ মাণিক্য তৎপ্রতিকার মানসে বদ্ধপরিকর হইলেন। তৎকালে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে চারিজন দলপতি ছিলেন। তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প নারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্র, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায়, এবং ভূষণার মুকুন্দ রায়, ইঁহারা স্ব স্ব সমাজের অধিপতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ভুলুয়াধিপতি এই চারি দলপতির অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়ায়, তাঁহার সহায়তা সকলেই করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের বাড়ীতে কোন এক বিবাহ ব্যাপারে, এই সকল দলপতিরা নিমন্ত্রিত হইয়া, স্ব স্ব দলবল সহ ভুলুয়াতে আগমন করেন। কিন্তু বিক্রমপুরের সকল সামাজিক তাহাতে যোগদান করিলেন না। এই নিমিত্ত রাজাদেশে ঘটকগণ এই উদ্ধত সমাজিকগণকে কুলচ্যুত করিয়া তৎক্ষণাৎ একটী শ্লোক রচনা করিলেন, যথা—

"বেজগ্রাম স্থিতাঃ সর্ব্বে
যে চাতুর্ম্মস্থলে স্থিতাঃ।
চান্দনী চাকুলীমেব
নাস্তি তেষাং কুলং বুধাঃ।"

এইরূপে বিক্রপুরস্থ বেজগাঁ চন্দুর্ম্মণ্ডল, চান্দনী, চাকুলী গ্রামবাসীরা, কুলভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। অপরদিকে ভূষণা সমাজের অন্তর্গত উজানীর রাজবংশও এইরূপ ক্ষত্রিয় হইতে কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। তৎসম্বন্ধে তেলীহাটী ও ভুলুয়ার এই বিষয় লইয়া, ঘটক মহাশয়গণ দ্বারা, অপর আর একটী শ্লোক বিরচিত হয়। যথা—

"গঙ্গায়ং পূর্ব্বভাগে চ ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
ইচ্ছামত্যা দক্ষিণেষু বিশাখাসু তদুত্তরে॥
কায়স্থাঃ অত্রবৈনস্তাঃ ভিন্ন দেশনিবাসীণাং।
ভুলুয়াতেলীহাটীয়ৌ সুরা দিত্যৌ প্রশস্তকৌ॥
অপিচ।
সিংহ গ্রামেস্থিতঃ সিংহশির্খায়ে গুহকঙ্কীশ।
ভুলুয়ায়াং তেলিহট্টে সুরাদিত্যৌ নৃপাবুভৌ॥

ভুলুয়ার রাজারা শূর বংশীয় এবং ফরিদপুরান্তর্গত তেলিহাটী পরগণার মধ্যবর্ত্তী উজানীর রাজগণ আদিত্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা পরে ক্ষত্রিয় সমাজ হইতে কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই রাজগণ যে কোন্ জাতি বা সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, তাহা নিরাকরণ করা সুকঠিন।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের রাজত্বের সময়ে আরাকানের মগেরা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরের তীরস্থিত স্থানগুলিকে মথিত করিয়া তুলিয়াছিল। তৎস্থানীয় হিন্দুরা এই সময়ে আপনাদের জীবন ও সম্পত্তি মহাবিপজ্জনক বলিয়া বিবেচনা করিত। অধিকাংশ স্থান জনশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। মহত্মা মিঃ গ্রাণ্ট বলেন, ১৫৪৮ খ্রীঃ অব্দের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিশেষতঃ মগদের দৌরাত্ম্যে সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানগুলি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম হইতে শেষোক্ত কারণটী সমধিক ভয়ানক বলিতে হইবে। তৎকালে যাহারা ঐ সকল বিঘ্নসঙ্কুল স্থানে কোনরূপে বাস করিত, তাহারা ভিন্ন স্থানের হিন্দুগণের নিকট, জাতিচ্যুত বলিয়া বিবেচিত হইত। এমন কি আরাকানের মগেরা এই সময়ে

যাহাদের বাড়ীর উপর দিয়া চলিয়া যাইত, সর্ব্বসাধারণে তাহাদিগকেও জাতিচ্যুত মনে করিয়া, মগীয় অপবাদ দিতে লাগিল। এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গে বহু 'মগীয়' তিলি, বারুই, কামার প্রভৃতি উপাধিযুক্ত দলের সৃষ্টি হয়, উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া, মগদিগের অত্যাচারের পরকাষ্ঠার নিদর্শন স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

সন্দীপ আক্রমণ করিয়া আরাকানীরা অধিকার করিয়া লয়, পরে ভুলুয়ায় আপতিত হইয়া উহাও লুণ্ঠন করিতে থাকে। লক্ষ্মণ মাণিক্য ২।৩ বার আক্রমণকারী আততায়ীদিগকে দূরীভূত করিয়া দিলেন, কিন্তু পরে রাজার গৃহশত্রু কর্ত্তৃক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া আরাকানরাজ ভুলুয়ার রাজাকে স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। এই শত্রু আর কেহই নহেন, লক্ষ্মণ মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পাপিষ্ঠ রাজানুজ রাজ্যলোভে অবিভূত হইয়া, আরাকানরাজের সহায়তা প্রার্থনা করে। সুযোগ পাইয়া আরাকানরাজ গৃহবিচ্ছেদে ব্যতিব্যস্ত লক্ষ্মণ মাণিক্যকে আক্রমণ করিয়া, পরাস্ত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ মাণিক্য অনন্যোপায় হইয়া খিজিরের ঈশাখাঁ মসনদ আলির সহায়তা প্রার্থনা করেন। ঈশাখাঁ বারভূঞাদলের অন্যতর, খিজিরপুর তাঁহার বাসস্থান ছিল। একবার রাজা মানসিংহ, বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া খিজিরপুর অবরোধ করেন, (১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দে) পরে তাঁহার বীরত্ব সন্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ পরাজিত ঈশাখাঁকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। তথায় তাহার বীরত্বের কথা ও কতিপয় মহত্বের বিবরণ বাদসাহকে অবগত করান। গুণগ্রাহী আকবর সাহ, সন্তুষ্ট হইয়া ঈশাখাঁকে মুক্তি প্রদান এবং সোণার গাঁয়ের শাসনভার তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত করেন। ঈশাখাঁ অতঃপর, বাদসাহের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। এই কারণে এবং অন্যান্য বারভূঞার অন্যান্য দলপতির সহিত, তাঁহার মনান্তর ঘটিয়াছিল। লক্ষ্মণমাণিক্য উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার সহায়তা করেন।

ঈশাখাঁ আরাকানবাসিগণের এই সকল দৌরাত্ম্যের বিবরণ বাদসাহকে লিখিয়া পাঠান। আকবরসাহ উহাদিগকে দমন জন্য সাহাবাজ খাঁ নামক সেনাপতিকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন (১৫৮৫--১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দে)। যদিও বারভূঞা দলের নেতারা বাদসাহের প্রতিকূলাচারী ছিল, তথাপি এই সময়ে তাহারা, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কারণ, মগের দৌরাত্ম্য সকলের রাজ্যমধ্যেই সমভাবে প্রসারিত হয়। এই জন্য উহাদের উচ্ছেদ সাধন সকলের পক্ষেই শ্রেয়স্কর বিবেচিত হইয়াছিল। এই সময়ে সাহাবাজ খাঁ, বঙ্গীয় সমুদয় ভূম্যধিকারীগণকে, তাঁহার সহায়তা জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। সাধারণের শত্রু মগদিগকে উচ্ছেদ করিতে, কাহারও কোন আপত্তি রহিল না। জমিদারগণ সকলেই বাদসাহ সেনাপতির সাহায্য জন্য তন্নিকটে উপস্থিত হইলেন।

সাহবাজ খাঁ মেঘনা নদীর মোহনায় এক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া, তন্মধ্যে সৈন্য সংস্থাপন করেন। ঐ দুর্গাধিষ্ঠিত স্থান তদবধি তাঁহার নামানুসারে সাহাবাজপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, পরিণামে উত্তর ও দক্ষিণ সাহাবাজপুর, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

সাহাবাজ সমবেত সৈন্যদল সহিত মগদিগের অন্যতর কেল্লা সহর কসরা আক্রমণ করেন। এই স্থান ভুলুয়া পরগণার অন্তর্গত, অধুনা হুদা ভুলুয়া' নামে প্রসিদ্ধ। লক্ষ্মণ মাণিক্য তাড়িত হইলে পরে, ঐ স্থানেই আরাকানীরা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সৈন্য সংস্থাপন করিয়াছিল। মোগল সেনাপতির সহিত, ঐ স্থানে মগদের ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়, বারভুঞা দল পৃষ্ঠপোষক থাকিয়া, মোগল পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করেন। এই সমবেত সৈন্যদলের নিকট আরাকানিরা পরাজিত হইয়া, সন্দীপের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভুলুয়াতে তাহাদের আর কোন আধিপত্য রহিল না।

ভুলুয়া অবস্থিতি সময়ে, আমি এই সহর কস্‌বায় বহুদিন বাস করিয়াছি। ঐ যুদ্ধের নিদর্শনযোগ্য কতিপয় উপকরণও আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী কামান, ঐ যুদ্ধের নিদর্শন স্বরূপ, আজিও তথায় প্রোথিত দেখা যায়। শুনিলাম, আরও ৩।৪ টী কামান ইতিপূর্ব্বে ঐ স্থান হইতে নোয়াখালির ম্যাজিষ্ট্রেট উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মৃত্তিকা খনন করিলে, তন্মধ্য হইতে গোলাগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ একটী গুলি আমি দেখিয়াছি। উহা মৃত্তিকা নির্ম্মিত, কিন্তু অগ্নিতাপে বিশেষ দৃঢ়ীভূত করা হইয়াছে। তত্রত্য মুসলমানেরা বলিল, এই গুলি, গুলাল বাঁশে ব্যবহৃত হইত। তৎকালে বন্দুক, কামান অপেক্ষা, তীর ও গুলাল বাঁশের সমধিক চলন ছিল। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি মুসলমান জায়গিরদার ও পোর্ত্তুগিজ খ্রীষ্টীয়ান আজিও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছে। যে সকল সৈনিকেরা এই যুদ্ধে গমন করিয়াছিল, এবং যুদ্ধান্তে প্রত্যাগমন না করিয়া মগদের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য তথায় অবস্থান করে, তাহাদিগকে কতকগুলি নিষ্কর ভূমি প্রদান করা হয়। ঐ সম্পত্তি খোসবাস নামে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণ মাণিক্য পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এই জায়গিরগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তদবধি ব্রিটিশ অধিকার পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তির উপর কোন রাজস্ব ধার্য্য হয় নাই, উহা নিষ্কর চলিয়া আসিতেছে।

সাহাবাজ খাঁর সহিত নবী সাহেব নামে একজন ফকির বা গাজী এই যুদ্ধে গমন করেন, যুদ্ধান্তে আর ঐ ফকির স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তিনি তথায় এক দরগা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। উহা আজ অবধিও নবী সাহেবের দরগা বলিয়া প্রসিদ্ধ। একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের উপর নবী সাহেবের পদচিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এতদ্ভিন্ন লক্ষ্মণ মাণিক্য তথায় একটী দীর্ঘিকা ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সহর কসবায় ঐ সকল দৃষ্টিগোচর হয়।

লক্ষ্মণ মাণিক্য পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া আপন ইষ্টদেবী বারাহী দেবীর প্রচুর বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এই দেবীমূর্ত্তিই বিশ্বম্ভর শূর ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার স্বপ্নাদেশেই ভুলুয়াতে রাজ্য সংস্থাপন করেন। বারাহী দেবী অধুনা আমিশাপাড়া গ্রামে রাজপুরোহিতগণের বাড়ীতে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার আট হাত, তিন মুণ্ড এবং বাহন বরাহ। ঐ রাজপুরোহিতেরা যে ধ্যান পাঠ করিয়া দেবীর অর্চ্চনা

করিয়া থাকেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বারাহী চাষ্টভুজাং দেবী ত্রিনেত্রাং বরহায়িকাং।
পাশাঙ্কুশ ধনুর্ব্বাণাং মধ্যে শ্রীবদনাম্বুজাং॥
দক্ষকর্ণে মুখং দুর্গা বামকর্ণে বরাহকং।
বরাহবাহিনী মাদ্যাং সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধয়ে॥"

পূজক মহাশয়েরা যেরূপ বলিলেন, অবিকল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি; কিন্তু ধ্যানটী বড়ই অশুদ্ধ। একে দেবীর আট হাতের মধ্যে মাত্র চারি হাতের বর্ণনা আছে, ছন্দের দোষ আছে, তাহাতে দক্ষ কর্ণে মুখং দুর্গা, প্রভৃতির অর্থও অবোধ্য; যদি কেহ বারাহী দেবীর বিশুদ্ধ ধ্যান অবগত থাকেন, তবে ঐ পুরোহিতদিগকে জানাইলে তাঁহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের গুরু ও পুরোহিতের বংশধরেরা সকলেই আপনাদিগকে মৌথিলী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। চৌপল্লী, বাবুপুর প্রভৃতি স্থানের গুরুবংশ ও আমিশাপাড়ার পুরোহিতেরা অদ্যাপি প্রচুর ভূবৃত্তি ভোগ করিতেছেন। বর্ত্তমান জমিদারেরা উহার অধিকাংশ বাজে আপ্ত করিয়া কর ধার্য্য করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ মাণিক্য পুনঃ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি আনয়ন করিয়া ভুলুয়াতে সংস্থাপন করেন। মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব তট পাণ্ডব বর্জ্জিত স্থান বলিয়া পরিচিত। সেই স্থানে সমাজ সংস্থাপিত করিয়া, সকল সম্প্রদায় হিন্দুর সমাবেশ করা কম ক্ষমতার পরিচায়ক নয়।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের মৃত্যু সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথমটী এই যে, ভুলুয়াধিপতি যে বিবাহ-সভায় অন্যান্য কায়স্থ সমাজপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বালয়ে আনয়ন করিয়াছিলেন; সেই সময় যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা প্রদর্শন করা হয়। বাকলাধিপতি রামচন্দ্র তৎকালে বালক থাকিলেও তাহার ধারণা ছিল যে, সমাজ মধ্যে চন্দ্রদ্বিপাধিপতিই সকলের শীর্ষস্থানীয়; এই স্থলে প্রতাপাদিত্যকে অধিক সম্মান করায় রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের উপর অসন্তুষ্ট হন। পরেও কোন কোন ঘটনায় ভুলুয়ারাজ রামচন্দ্রকে বালক বলিয়া ততটা গ্রাহ্য করেন নাই। এই সকল কারণে আপন ক্ষমতার পরিচয় প্রদর্শনার্থে চন্দ্রদ্বীপরাজ, লক্ষ্মণ মাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া, সহসা কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া ভুলুয়া আক্রমণ করেন।

অচিরে এই কথা ভুলুয়ারাজ জানিতে পারিয়া; ক্রোধে অধীর হইয়া কতিপয় সৈনিক সহিত, বালক রামচন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার রণতরীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এইরূপ উন্মত্তাবস্থায় লক্ষ্মণ অন্যের সাহায্য লওয়া অনাবশ্যক মনে করিয়া স্বয়ং বাকলার রণতরীর নিকটবর্ত্তী হন, পরে রামচন্দ্রকে ধৃত করিবার জন্য যেমন লম্ফ প্রদান করিয়া বিপক্ষের রণযানে পতিত হইলেন, অমনি প্রচণ্ড বলশালী রামমোহন তাঁহাকে ধৃত করিয়া নৌকার নিম্নে ফেলিয়া দিলেন। ভুলুয়ারাজ এইরূপে ধৃত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে নীত হইলেন; রামচন্দ্র শত্রুকে পাইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন, ঐ রাজ্য আর আক্রমণ না করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণ মাণিক্যের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলে তাঁহার মাতা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রকে এই বীরবিনাশন

পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র মাতৃআদেশ লঙ্ঘন না করিয়া, লক্ষ্মণ মাণিক্যকে কারাবরুদ্ধ করিয়া রাখেন।

কোন সময়ে লক্ষ্মণ মাণিক্যের বীরত্বের পরিচয় জন্য, তাহাকে মল্লযুদ্ধে আনয়ন করা হয়; পরে তাঁহাকে শৃঙ্খলচ্যুত করা হইল; এই সুযোগে লক্ষ্মণ সর্ব্বাগ্রে রাম চন্দ্রের হত্যার প্রয়াস পান, কিন্তু চন্দ্রদ্বীপাধিপতির দেহরক্ষকেরা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিয়া ফেলে; এই সংবাদ রাজা রাম চন্দ্রের মাতা জানিতে পারিয়া লক্ষ্মণ মাণিক্যের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন; তৎক্ষণাৎ ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের মৃত্যু সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, তিনি আরাকানের মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়া লোকান্তরিত হন। আমাদের বিশ্বাস, এটী প্রবাদ নয়, সত্য ঘটনা। ১৬০২ খ্রীঃ অব্দে মোগল পক্ষাবলম্বী হইয়া বারভুঞাদল মগদের বিরুদ্ধে সুন্দিপে যে লোকবিস্ময়কর যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালীর বীর-জীবনের শেষ পরিচয় প্রদান করেন, তন্মধ্যে লক্ষ্মণ মাণিক্যও উহার একতম ছিলেন। সেই লোকবিস্ময়কর যুদ্ধে বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায় যে অমানুষিক সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা কোথায়? তাঁহার এই বীরত্ব সন্দর্শনে মোগল সেনাপতি এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, মগদিগকে বিদূরিত করিয়া সুন্দিপের শাসনভার রাজা কেদার রায়ের হস্তেই ন্যস্ত করেন। ডাক্তার মিঃ জেকব লিখিয়াছেন, পর্টুগীশ সৈন্যের সহায়তা লইয়া কেদার রায় সুন্দীপ শাসন করিতেন। যুদ্ধবীর লক্ষ্মণ মাণিক্য এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি অব্যবস্থিত চপল বালকের ন্যায় ধৃত হইয়া যে চন্দ্রদ্বীপে নীত হইয়াছিলেন না, তাহা নিশ্চয়। আমরা বারান্তরে লক্ষ্মণ মাণিক্য ও তদ্বংশীয়দের অপরাপর বিষয় পাঠক মহোদয়গণকে জানাইতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (২১)

পূর্ব্বে প্রকাশিত চারি সংখ্যায় আমরা মায়াবাদের যেরূপ বিবরণ দিয়াছি, তাহাই শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত মায়াবাদ। এই জগতের স্থূলভাব অপগত হইয়া, যখন সমগ্রজগৎ সূক্ষ্ম শক্তিরূপে ব্রহ্মে অবস্থিত থাকে, তাহারই নাম মায়া। এই মায়া যে অলীক পদার্থ নহে, ইহা আমরা শঙ্করের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পরে দেখাইব। এইরূপ প্রক্রিয়া যে বিজ্ঞান-সম্মত, এখন আমরা তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইতেছি।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, হিন্দু দর্শন দুইটী মাত্র তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ১। ব্রহ্মতত্ত্ব; ২। ব্রহ্মশক্তি বা জড়াণু। এই দুইটীই অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দুইই নিত্য। কেবল জড়াণু, ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হয় মাত্র। সৃষ্টির পূর্ব্বে অতীব সূক্ষ্ম শক্তিমাত্র রূপে ব্রহ্মে নিহিত থাকে বলিয়া, ব্রহ্মের একত্বের ব্যাঘাত হয় না। প্রাদুর্ভাবের অর্থই হিন্দুদর্শনের "সৃষ্টি"। নতুবা কোন বিশেষ কালে সমস্ত নূতন সৃষ্ট হইয়াছে, একথা হিন্দুদর্শন কুত্রাপি স্বীকার করে নাই।

কালবিশেষে সৃষ্ট হইয়াছে—একথা বলিলে, Law of continuity নামক নিয়মের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে, এই দৃশ্যমান জড় ও দৃশ্যমান জীব দেখা দিয়াছে—প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহারা অকস্মাৎ আইসে নাই, ইঁহারা পূর্ব্বে সূক্ষ্ম ভাবে ছিল, তাহাই স্থূলভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানও একথা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। সূক্ষ্ম, চক্ষুর অদৃশ্য পরমাণু সকল অন্তর্নিহিত শক্তিবলে, পরে ক্রমশঃ একত্র মিলিত হইয়া যে দৃশ্যমান জড়পুঞ্জের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। এই জড়বর্গ ও জড়ান্তর্ভূত শক্তি (energy) উভয়েই, সূক্ষ্ম (latent, potent) অবস্থায় ছিল, তাহাই স্থূলভাব ধারণ করিয়াছে।

শক্তি বা ক্রিয়ার যতই ক্ষয় হইতে থাকে, ততই পরমাণুবর্গ ঘনীভূত হয় ও স্থূলপিণ্ড (aggregate) রূপে অভিব্যক্ত হয়। শক্তির স্বভাবই এই যে, উহা নিয়ত ক্ষয় হইয়া যাইতেছে,—অর্থাৎ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিণত হইতেছে। বাহ্য ক্রিয়ারূপে, কখনও তাপাদিরূপে এবং কখনও বা সূক্ষ্ম (latent) ভাবে পরিণত হইয়া পড়িতেছে। অদৃশ্য, সূক্ষ্ম পরমাণু সমূহে ক্রিয়া (energy) সূক্ষ্মরূপে অদৃশ্য ছিল, তাহাই যত তাপাদিরূপে ক্ষয়িত (dissipated) হইতে লাগিল, ততই উহারা চক্ষুর দর্শনের যোগ্য হইল। এই পরিদৃশ্যমান প্রত্যেক নক্ষত্রাদি জড়পিণ্ড ও তদন্তর্গত ক্রিয়া,—সেই অদৃশ্য পরমাণু ও অদৃশ্য শক্তি হইতেই অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবার, এই যে সূর্য্যাদি হইতে অনবরত তাপ ও আলোকরূপে ক্রিয়া সঞ্চারিত হইয়া যাইতেছে,—ক্রমশঃ এইরূপ ক্রিয়া-ক্ষয় হইতে হইতে, সমস্ত জড়বর্গ চূর্ণ হইয়া চক্ষুরাদির অদৃশ্য হইয়া পড়িবে। এইরূপ ভাবে দেখিতে গেলে স্থূল জড়বর্গের আদি ও অন্ত আছে বটে, কিন্তু ইহারা পূর্ব্বেও (দর্শন যোগ্য হইবার আগে) সূক্ষ্ম ভাবে ছিল এবং পরেও অদৃশ্য সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া মনুষ্যদেহ সম্বন্ধেও ঠিক্ এই মত। এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। হক্সেলি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, মানুষের প্রত্যেক চিন্তাতে (thought) মস্তিষ্কের অণুর অবস্থান্তর বা স্থানচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে। স্মৃতি কি? স্মৃতি ক্রিয়া এই যে,—পূর্ব্বে কোন একটা বস্তু বা ঘটনার অনুভব-কালে, সেই অনুভূতি-শক্তি তোমার মস্তিষ্কের পরমাণু সকলের কিঞ্চিৎ স্থান-পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর ঘটাইয়াছিল। পরমাণুনিবহের এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তন, সূক্ষ্মরূপে সেই সেইরূপে মস্তিষ্কে অবস্থিত ছিল। এবং তৎকালীয় চিন্তা ও কাজেই তন্মধ্যে নিহিত ছিল। যদি তৎকালীয় চিন্তা (consciousness) ও পরিবর্ত্তিত-পরমাণু সমূহ সূক্ষ্মভাবে সেই সেই ভাবে তোমার মস্তিষ্কে অবস্থিত না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই আজ্ সেই পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি তোমার জন্মিতে পারিত না। অতএব জ্ঞানের ক্রিয়া যে সর্ব্বদাই হইতে থাকিবে, এরূপ নহে; জ্ঞান সূক্ষ্মভাবেও অনেক দিন থাকিতে পারে। মনুষ্যজ্ঞানের আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, প্রত্যেকটী জ্ঞানের (thought) সঙ্গে সঙ্গেই, মস্তিষ্কের কতকগুলি পরমাণুরও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর ঘটিয়া যায়। সেই

পরিবর্ত্তিত পরমাণুগুলি সেই সেই ভাবে কিছু দিন থাকিয়া যায়। "Each specific thought denotes some specific waste of brain-matter. * * * * In like manner, memory is looked upon as dependant upon traces, left behind in the brain, of the state in which it was when the sensation remembered took place." "Those motions, which give rise to sensation leave on the brain *changes of its substance*" (Huxly), "The sensation which has passed away, leaves behind molecules of the brain competent to its production which constitute the physical foundation of memory" (Fait and Stewart). এইরূপে দৈহিক ক্রিয়ামাত্রেরই কতকাংশ সূক্ষ্মরূপে, অদৃশ্যরূপে, দেহের অদৃশ্য, সূক্ষ্ম পরমাণুপুঞ্জে লুকায়িত থাকিয়া যায়; কালে প্রকাশিত হয়। ঐ ক্রিয়া দ্বারা পরিবর্ত্তিত বা কথঞ্চিৎ অবস্থান্তরিত হইয়া সেই পরমাণু গুলিও সেই সেই ভাবে সূক্ষ্মরূপে থাকিয়া যায়। যদি বৈজ্ঞানিকদিগের এ কথা সত্য হয়, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, শক্তি যখন একেবারে ধ্বংস পায় না এবং পরমাণুও যখন একেবারে ধ্বংস পায় না,—তখন মনুষ্যের চিন্তরাশি ও (a kind of energy) ধ্বংস পাইবে না এবং সেই চিন্তা দ্বারা পরিবর্ত্তিত পরমাণুগুলিও ধ্বংস পাইবে না। সুতরাং Law of continuity মানিতে গেলেই, ইহাও অবশ্য মানিতে হইবে যে, মানুষের দেহ মৃত হইলেই, সমস্ত ফুরাইয়া যায় না। ইহা অবশ্য সূক্ষ্মরূপে থাকিবেই। ইহারই নাম হিন্দুদর্শনের "সূক্ষ্ম-শরীর"। স্মৃতি ও স্মৃতির যন্ত্র, চিরকালই মানুষের থাকিবে। থাকিবে বলিয়াই, মৃত্যুর পরও ইহা অদৃশ্য হয় মাত্র, কিন্তু একান্ত ধ্বংস হয় না। মনুষ্যশরীর সম্বন্ধে যে নিয়ম, অন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহেরও সেই নিয়ম। এইজন্যই হিন্দুদর্শন সূক্ষ্ম শরীরকে অবিনাশী ও স্থূল দেহকে বিনশ্বর বলিয়াছেন। এইজন্যই হিন্দুদর্শন সৃষ্টির একটা নির্দ্দিষ্ট কাল স্বীকার করিতে পারেন নাই। এ সমস্ত কথা আর একটু বিশদভাবে বলিতে হইবে। বারান্তরে সে চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

সুলভ সাহিত্য।

নব বঙ্গসাহিত্যের নেতা বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিবার পরে, যখন কর্ণধারহীন তরণীর মত, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, সেই সময়ে কবি হেমচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন:—

"হায় কি হল বঙ্কিম দিল বঙ্গদর্শন ছেড়ে
হায় কি হল দেশটা গেল সাপ্তাহিকে জুড়ে।"

মাসিকের গৌরব, বঙ্গদর্শনের তিরোভাবেই অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তখনও দেশ সাপ্তাহিকে প্লাবিত হয় নাই। দু তিন খানি নূতন সুলভ সাপ্তাহিক প্রচারিত হইয়াছিল মাত্র; কিন্তু সেই গুলির রচনাভঙ্গী প্রভৃতি দেখিয়াই কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সাহিত্যের অধোগতি হইতেছে।

ঈশ্বরকৃপায় বঙ্কিমচন্দ্রের অর্থাভাব ছিল না; অর্থলাভের জন্য তিনি কখনও সাহিত্য-সেবা করেন নাই। তাঁহার লিখিবার অনেক ছিল, শিখাইবার অনেক ছিল; তাহাই তিনি অনেক লিখিয়াছেন এবং অনেক শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার পর, যে দেশ হিতৈষণার উত্তেজনায় সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র প্রচারিত হইতে

আরম্ভ হইল, অধিকাংশ স্থলেই তাহার অপর নাম "কাণা ফকির ভিক মাঙ্গেরে বাবা"। যে উপায়েই হউক, কিছু উপার্জ্জন করিতে হইবে বলিয়া, সাধারণ লোকের রুচির অনুসরণ করিয়া সম্পাদকগণ যাহা খুসী লিখিতে লাগিলেন। সুশিক্ষিত বা সুবিবেচক লোকের অসন্তুষ্টিতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তাঁহারা সংখ্যায় ক জন? যাহাদিগের নিকট হইতে তিল সংগ্রহ করিয়া সম্পদের তাল গড়া যায়, তাহারা সন্তুষ্ট হইলেই হইল। ইহাতে সরলতা ও স্বাধীনতা চলিয়া যায়, এবং সাহিত্যের নামে অপাঠ্য পদার্থেরই সৃষ্টি হয়। পেটের দায়ে রচিত সাহিত্য, পাঠকের কৃপার ভিখারী বলিয়া, পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের ভাষায় সনাতন ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত হইতেছে; এবং যাত্রাওয়ালারবিরহ যাতনার ভাষায় "হায়রে সেকাল" বিষয়ে রচনা-বাহুল্য দৃষ্ট হইতেছে। দেবী সরস্বতীকে সপত্নীর দাসী করিবার প্রয়াস করাতে, কোথাও কোথাও লক্ষ্মী ঠাকুরাণী প্রসন্না হইতেছেন দেখিতেছি; কিন্তু অভিমানিনী ভারতী দূরে পলায়ন করিতেছেন।

অর্থের প্রত্যাশায় সাহিত্য রচিত হইলে তাহা প্রায়শঃ অপাঠ্য হয়; কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা সাহিত্যের সেবা করিবেন, তাঁহারা বিনামূল্যে সাহিত্য বিতরণ করিতে বসিবেন, এ কথা বলি না। বরং সাহিত্যের কিছু অধিক মূল্য নির্দ্দিষ্ট হওয়াই উচিত বলিয়া মনে হয়। সস্তা সাহিত্যের গৌরবে আমার আস্থা নাই। শূকরে মুক্তা চিনিবে, এ কথায় বিশ্বাস হয় না। সাহিত্য সস্তা করিয়া কুশিক্ষিতের হস্তে দিলে কোন পক্ষই লাভবান হইবেন না। যাঁহারা গরিব শিক্ষার জন্য উদ্যোগী, তাঁহারা লাইব্রেরী করিয়া, সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন। যাঁহারা অর্থব্যয় করিয়া, পুরস্কার গ্রন্থের দ্বারা দাম তুলিয়া না লইয়া, কোন গ্রন্থ বা পত্রিকা ক্রয় করেন, তাঁহারা ক্রীত সাহিত্যে অনুরাগী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে গ্রন্থাদিরও গৌরব পরীক্ষিত হয়, ক্রীত সাহিত্যও পঠিত হয় বলিয়া আশা করা যায়।

আমি জানি যে, অনেক কৃতী লেখক অর্দ্ধমূল্যে বা সিকি মূল্যে পূজার হাটে গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া যশ হারাইতেছেন। যদি প্রকৃত পক্ষে সাহিত্য সুরচিত হইয়া থাকে, তবে এক দিন না এক দিন তাহার আদর হইবেই। যদি তাহা না হয়, তবে সে সাহিত্য বিলুপ্ত হইলেই বা ক্ষতি কি? সাধারণ শ্রেণীর লোকের নিকট ক্ষণস্থায়ী যশের জন্য লোলুপ না হইয়া বরং শ্রীকণ্ঠ ভবভূতির পাদানুধ্যান করিয়া এক একবার তাঁহার কথা আবৃত্তি করা ভাল—

যে নাম কেচিদিহনঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতিনৈষ যত্নঃ
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমান ধর্ম্মা
কালোঽয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।

সঙ্গীতে কুশিক্ষিতা হইয়াও যে উপায়ে "জোলার" 'নানা,' দর্শকগণের চিত্তরঞ্জনে সক্ষমা হইয়াছিলেন, বিদ্যাশূন্য হইয়াও যে কৌশলে শঙ্করকবি বা বল্লনকবি রাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করিতেন; সেই উপায় এবং কৌশল প্রভাবে যদি এ কালের রঙ্গমঞ্চ এবং সাহিত্য খ্যাতিলাভ করে, তবে তাহা দেখিয়া কৃতী লেখকগণ বিচলিত হইবেন কেন?

কেবল মাত্র কুপরিচালিত বলিয়াই সাপ্তাহিকের বাহুল্য, সাহিত্যের পক্ষে অনিষ্টকর তাহা নহে; অন্যান্য কারণে উপযোগী হইলেও, সাপ্তাহিক জিনিসটা

প্রায়ই অনেক পরিমাণে সাহিত্যের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। বিলাতের রাজ্যশাসন পদ্ধতি যে প্রকারে প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পলিটিক্‌স্ নামক একটা জিনিস আছে। প্রধানতঃ সেই পদার্থ লইয়াই দেশের সংবাদ পত্র। আমরা পরাধীন জাতি, কাজেই আমাদের পলিটিক্‌স্ নাই বলিলেই চলে। অথচ ইহারই আধিক্য লইয়া আমরা সংবাদ পত্র পড়ি। পলিটিক্সের অতিরিক্ত কোলাহলে বিলাতের সাহিত্যও ম্লান হইতেছে। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের স্বার্থময় কর্ম্ম প্রভাবে ইউরোপের ব্রাহ্মণ্যও হীনপ্রভ হইতেছে। একালে রবার্টস্ প্রমুখ ক্ষত্রিয়দল, স্পেন্সারাদি ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা সমাজে অধিক পূজ্য। দেখিতে দেখিতে গত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, শিক্ষাপ্রদ স্থায়ী সাহিত্য আর বিকশিত হইতেছে না। কাব্যকুঞ্জে পিকধ্বনি নীরব হইয়াছে, এখন কিপ্‌লিং এর দর্দ্দুর রবে বিশ্ব মুগ্ধ। আমাদের দেশের দুর্গতির ত সীমা পরিসীমা নাই। ভূদেববাবুর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইয়াও এডুকেশন গেজেট লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই; অথচ সেই সময়ে, কত অসার পত্রিকার সম্পাদক কুবেরের ভাণ্ডার হস্তগত করিয়াছেন। কেবল অনুকরণ গৌরবে, যাহা নাই, সেই পলিটিক্‌স্ লইয়া আন্দোলন করিয়া, শূন্যধ্যানরত সাহিত্য, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতেছে।

বিলাতের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের পক্ষে যেমন পলিটিক্‌স্, আমাদের দেশের পক্ষে সেই প্রকার সামাজিক অবস্থার আন্দোলন। যদি মিথ্যা পলিটিক্‌স্ পরিহার করিয়া সামাজিক কথার বিচারে সাপ্তাহিকগুলি মনযোগী হয়েন, তাহা হইলে এতটা দুর্গতি না হইতে পারে। কিন্তু দেশের মধ্যে সুপরিচালিত মাসিক পত্রাদি না থাকিলে, কেবল দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সাহিত্যে একটা বিষম অনিষ্ট সাধিত হয়। এমন পাণ্ডিত্য বা চিন্তাশীলতা কোন মনুষ্যেই সম্ভবপর নহে, যে প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে তাঁহার অবিরত উদ্গীরিত বিজ্ঞতা, সারবত্তা প্রকাশ করিতে পারে। এই সপ্তাহ-সুলভ বিজ্ঞতার বাণী, অবিশ্রান্ত পাঠ করিলে, চিন্তাহীনতা এবং অগভীরতা ব্যাপ্তিলাভ করিবেই করিবে। সাপ্তাহিকের প্রচার বাহুল্যের সঙ্গেসঙ্গে মাসিক প্রত্রও অনেক প্রচলিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অল্পসংখ্যক সুলেখক দ্বারা এত বিস্তৃত সাহিত্য শাসিত হইতে পারে না। এই জন্যই কবির আক্ষেপ পড়িয়া মর্ম্মবেদনা হয় যে, এ দেশে আর বঙ্কিমের মত নেতা আসিল না এবং উপরন্তু, "হায় কি হল দেশটা গেল সাপ্তাহিকে জুড়ে।"

এখনও এই কোলাহলের মধ্যে যে সকল কৃতী লেখক তপস্যানিরত, আশা করি, সম্পদলিপ্সারূপিণী উর্ব্বসী তাঁহাদের তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সমস্যাকল্পলতা। *

৫৫ বৎসর হইল, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশপ্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছাত্রেরা সমস্যাপূরণচ্ছলে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। সমস্যাকল্পলতা

* সমস্যাকল্পলতা। ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতি কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, জয়ন্তী প্রেস।

সেই শ্লোকগুলির সংগ্রহ। এরূপ গ্রন্থকেও কাব্য বলিতে বাধা নাই। আলঙ্কারিকেরা বলিবেন, কোষকাব্য।

যে কাব্যই বলুন, সমস্যাকল্পলতার অনেক কুসুমই মনোহর নহে। অনেকগুলিই কৃত্রিম। অনেকগুলিই মান্ধাতার আমলে সুগন্ধি লাগিয়া থাকিবে, কিন্তু এখন বড় পর্য্যুষিত—অতএব একটু পূতিগন্ধি। যেমন প্রেমচন্দ্রের—

শশাঙ্কঃ সাশঙ্কং নিশি চরতি বক্ত্রেন্দুবিজিতঃ
সরোজানাং রাজির্ভজতি জলদুর্গাশ্রয়মিমম্।

অথবা যদুনাথের—

নাসৌ চন্দ্রঃ কীর্ত্তিরাভাতি শুভ্রা
কোষাগারো নৈব তে কল্পশাখী।

কয়েকটা খাস্ গৌড়ীরীতির শিমুলফুল—খুব মোটা মোটা, খুব নির্গন্ধ, খুব সখ্‌ত। যথা প্রেমচন্দ্রের—

সূত্রামোদ্দামধামোর্জ্জিতজয়জয়শশচন্দ্রসান্দ্রাবদাত-
প্রদ্যোতদ্যোতমানত্রিভুবনজনিতোদ্গীর্ণগান্ডীর্য্য-
বীর্য্যঃ।

দুই একটার দুই গুণই আছে—যেমন পচা, তেমনই কাঁটা। যেমন শ্রীশচন্দ্রের—

সম্ভ্রাম্যদ্ভূরিভূমিধরবরবিজয়োপার্জ্জিতোজোবিড়োজা-
নিস্তেজোবৈরিনারীবদনবিধুকলাম্লানিমধ্যাহ্নসূর্য্যঃ।

সংস্কৃত কাব্যের চিত্রশালায় বিজিতবৈরিনারীর রঙ্গ বরঙ্গ চিত্র আছে। কিন্তু সকল চিত্রে হূণনারীর সে কপোলপাটলিমা বা যবনীমুখপদ্মের সে মধুমদ কই?

গৌড়ীরীতিমাত্রেরই নিন্দা করিতেছি না। কথাগুলা পুরাণ হইলেও, নিবিড় রচনার গুণে নিম্নোদ্ধৃত অর্দ্ধশ্লোকে একটা উদাত্ত ভাবের অপূর্ব্ব আরোহ অবরোহ হইতেছে—

রাজন্ রাজস্ব রাজাবলিবলিতশিরঃশেখরন্যস্তপাদো
নাবদ্যাদ্যুম্নদানপ্রবিদলিতমহাদীনদারিদ্র্যদৈন্যঃ!

বাঁচিয়া থাকিলে প্রেমচন্দ্র এ শ্লোকে আজ জয়পুরপতিকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতেন।

সমস্যাকল্পলতায় সুরভি কুসুমেরও অভাব নাই। গৌড়ীরীতি দেখিয়াছি। লাটীরীতির একটা নমুনা দিই। রচনা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের—

ন তত্র দিবসদ্বয়াধিকমেব নেয়ং প্রিয়ে
ময়েতি শপথেন মাং প্রতি নিবেদ্য যাতো হরিঃ।
প্রবৃত্তিরপি লভ্যতে সখিন তস্য মাসেন কিং

* * *

উক্তি বিরহোৎকণ্ঠিতার। মধুরে এমন প্রসন্ন রচনা সংস্কৃতকাব্যে কিছু বিরল।

দুই একটী শ্লোক পুরাণ হইলেও পুরাণেও একটু নূতন। যেমন প্রেমচন্দ্রের—

ধ্রুবমেষ্যতি সৌরভোৎসবে
কথমাবিষ্কুরুষে মনোব্যথাম্।

নারীকে যে "সৌরভোৎসবা" বলিয়া ভাবিয়াছিল, সে কবি বটে।

যেমন শ্রীশচন্দ্রের—

কোকিলালিকুলকাকলীরুতৈ-
রাকুলীকৃতহৃদব্জবন্ধনা।
মঞ্জুমঞ্জুলনিকুঞ্জমঞ্জসা
কামিনী ব্রজতি যামিনীমুখে।

কামিনী অভিসারিকা। "আকুলীকৃতহৃদব্জবন্ধনা"—কথাটীর অর্থধ্বনি বড় মোহকর।

দুই একটা শ্লোকে ভারবির আওয়াজ শুনিতেছি বলিয়া ভ্রম হয়—

জলধির্ন চ বাড়বানলং
নহি সত্যাদ্বিচলন্তি সাধবঃ।

প্রেমচন্দ্রের একটা উচ্ছ্বাস একটু Byronic—

কলয়সি কঠিনে তথাপ্যভীক্ষ্ণং
হরি হরি মে হরিণাক্ষি দূষণানি!

একটা অপদার্থ শ্লোকে একটী চরণ একটা কুৎসিত স্তূপে কুশলকারুৎকীর্ণ এক-খণ্ড bass relief এর মত ফুটিয়াছে। রচনা রামকৃষ্ণের—

যৎ পদ্মা.....

শ্যামাঙ্গং বনমালিনং বৃতবতী তীরে সুধাবারিধেঃ।

রিলীফে রঙ্গ হয় না, কাব্যে একটু রঙ্গও ফলিয়াছে। দূরদূরগামিনী স্মৃতি বাকীটুকু পূরাইতেছে।

প্রেমচন্দ্রের একটা শ্লোকে রঙ্গের বড় চটক—

পিশঙ্গবসনোজ্জ্বলঃ সজলনীরদশ্যামলঃ।

তার পরে আর রঙ্গ নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহা অত রঙ্গেও ফলে নাই—

স্ফুরৎকুটিলকুন্তলাকুলিতমুগ্ধভালস্থলঃ।

শ্রীশচন্দ্রের একটা শ্লোকে চক্ষের জলের রঙ্গ আছে। রঙ্গ মৃদু, কিন্তু খাঁটি—

তবাদ্য কুচমণ্ডলে মরকতাচ্ছহারশ্রিয়ং
দধাতি সখি পদ্ধতির্গলিতকজ্জলাশ্রুজ্জলা।

ফোঁটা ফোঁটা ফটিক জলে কজ্জলের নীলিমা লাগিয়াছে!

বিনা রঙ্গেও চিত্র হয়, একবার দেখিয়াছি। আর একবার দেখাই—

আকর্ণ্য গৌতমবধূমনুজত্বলাভং
ভীতেন নাবিকজনেন নিবারিতোঽসৌ।
সৌমিত্রিমাহ মুদিতো রঘুবংশচন্দ্রো
ভ্রাতঃ পদং কথয় কুত্র নিবেশয়ামি॥

রাম, লক্ষ্মণ, ঐ নাবিক—সব যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। নাবিকটার চিত্রে একটু প্রহসনও আছে।

প্রেমচন্দ্রের তুলি আরও সরু—

মুষিতললিতহাসং রোষমেতং জহীহি।

কয়েকটী শ্লোকখণ্ড যোড়াইলে পশ্চিম সন্ধ্যার এক মোহিনী ছবি জাগিয়া উঠে—

মন্দং মন্দং বহতি পবনো হন্ত সায়ন্তনোঽয়ং
কোকাঃ শোকাকুলিতহৃদয়াঃ কিঞ্চ মুঞ্চন্তি জায়াঃ।

* * * * *

মন্দং মন্দং গলিতকিরণো ভানুমানস্তমৈতি।

* * *

বালা জালবিলাবলম্বিতমুখী মার্ত্তণ্ডমালোকতে।

পশ্চিমাকাশ রাঙ্গা করিয়া সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইতেছে। প্রেমচন্দ্র দুই দিগ্বধূর খেলা দেখিতেছেন—

সায়ন্তনোঞ্চকরপাটলিতাংশুজাল-
পিষ্টাতমুষ্টিমসকৃৎ কুতুকাৎ কিরন্তীম্।
রক্তাম্বরোজ্জ্বলরুচীমভিতঃ প্রতীচীং
প্রাচীবধূঃ ক্ষিপতি কন্দুকমিন্দুবিম্বম্॥

উষায় চন্দ্র অস্ত যাইতেছে। প্রেমচন্দ্র সাগরে সূর্য্যোদয় দেখিতেছেন—

অঙ্কোৎসঙ্গিতরঙ্গশঙ্কিতমনস্যস্তাচলপ্রান্তরা-
রণ্যানীং নিবিড়াং ভয়াদিব রয়াদিন্দৌ সমুৎসর্পতি।
সাটোপং হরিণা সমুত্থিতবতা বারাংনিধেঃ কন্দরাৎ
সংক্ষোভাদিব পূর্ব্বপর্ব্বততটীমাক্রম্য বিক্রম্যতে॥

শ্লোকটী পড়িতে পড়িতে যেন একটা গ্রীক মূর্ত্তি চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে। দিক্‌কালশৃঙ্খলাচ্ছেদী এ বলিষ্ঠ কল্পনা যবনশিল্পীরই যোগ্য বটে।

একটী মালিনীশ্লোকে ফুলগন্ধের গোলমাল হইতেছে। রচনা প্রেমচন্দ্রের—

দরবিদলিতযূথীবীথিসঞ্চারলব্ধৈ-
র্দিশি দিশি মধুগন্ধৈরন্ধয়ন্ পার্থসার্থান্।

খোশ্‌বূটুকু ধরিতে পারি না, কিন্তু গুল্‌জার্‌টার টের পাইতেছি। পার্থশব্দে ময়ূর।

গোধূলিতে বালক কৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছে। প্রেমচন্দ্র যশোদাকে ডাকিতেছেন—

ক্ষণং গৃহবিধানতো বিরম নন্দসীমন্তিনি।

বনং বনমনুভ্রমন্নুপদং গবাং তে শিশুঃ
সমেতি যদতিস্ফুটং রণতি নূপুরং গোপুরে॥

শ্লোকে কৃষ্ণের নূপুরধ্বনি শুনিতেছি।

শুনিতেছি বলিয়াই উহা উৎকৃষ্ট কাব্য। বহিঃপ্রকৃতির প্রতিবিম্ব এ কাব্যে কিরূপ জাগিয়াছে, দেখাইলাম। অন্তঃপ্রকৃতির একটা দৃষ্টান্ত দিই। কুরুসভায় কৃষ্ণার অবমাননা দেখিয়া ভীমসেন ভাবিতেছেন—

অরুন্তুদং ভোঃ কিমিতোঽস্তি লোকে
যদ্ ভীমসেনস্য মমোগ্রশক্তেঃ।
পুরোঽন্ধপুত্রেণ বিমানিতেয়ং
মধ্যেসভং রোদিতি যাজ্ঞসেনী॥

বজ্রলেপে রুদ্ধমুখ বহ্নিগিরি আপনারে আপনি খাইতেছে! কাব্যে তার ঝাঁজ লাগিয়াছে।

এক স্থানে বড়মানুষ বাঁদর দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাসিতেছেন—

নিঃস্বঃ শাস্ত্রবিশারদোঽপি ধনিভির্মূর্খোঽয়মিত্যুচ্যতে
কিং কার্য্যং পরিশিষ্টমস্তি ভবতো জানামি
নাহং কলে।

হাসি না হায়হায়, বলিতে পারি না।

পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া থাকিবে। একটী মঙ্গলশ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। শ্লোকটী রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক এবং আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যা-রত্নের। ভাবের ইঙ্গিতটা তিনি গুরু নানকের প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ হইতে পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু তারও বীজ বেদে—

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে।

কালিদাসও মেঘকে উজ্জয়িনীর সন্ধ্যার অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন,

কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়াম্।

হেমচন্দ্রের শ্লোক এই—

স্থৈরং শৈলবনাবলীং বিঘটয়ন্ সংক্ষোভয়ন্
সাগরং
প্রধ্মাতৈর্গিরিকন্দরান্মুখরয়ন্ ব্রহ্মাণ্ডমুদ্বোধয়ন্।
বায়ো ত্বং শুভশঙ্খচামরভবাং প্রীতিং বিধেহি
প্রভোঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপকোঽয়মুদগাদ্যোম্নি স্ফুরত্তারকে॥

বিশ্বে বিশ্বেশ্বরের সন্ধ্যারতি হইতেছে।

ঠেকিয়া আমাকে এ গ্রন্থের এইরূপ অসম্বদ্ধ সমালোচনা করিতে হইয়াছে। বত্রিশ জনের রচিত পাঁচশতের অধিক বিশ্লিষ্ট শ্লোকরাশির অন্য সমালোচনা সম্ভবে না। তবে সংস্কৃতকাব্যের সমালোচনা অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত রীতিতে করিলাম না কেন, তার কৈফিয়ৎ এ কালে লাগিবে না। নকলে আসল নষ্ট হইবে ভাবিয়া আমি উদ্ধৃত শ্লোক ও শ্লোকাংশগুলির অনুবাদ দিই নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

মলিনা?

বিমনা বিবসা এক বিধুরা ললনা,
বসে আছে বাতায়নে হ'য়ে আনমনা,
কভু আকাশের পানে,
চাহিতেছে দুনয়ানে,
আবার সন্নত আঁখি
মাটীর পানেতে রাখি
নখরে কি লিখি যেন করিছে গণনা,
আত্ম কির্ণ-অদৃষ্টের রহস্য মন্ত্রণা।

আলু থালু কেশ পাশ নীবির বাঁধন,
দলিত নলিণী সম মলিন বদন;
সজল নয়ন দুটী,
ম্লান ভাবে আছে ফুটি,

নাহিক জ্যোতির কণ,
মধুভরা দিঠি ঘন,
ক্লান্তি ভরে সদানত যুগল নয়ন,
আলু থালু কেশ পাশ নীবির বাঁধন।

প্রীতি ভরা কলেবর—আশা নিকেতন,
এবে রুদ্র নিরাশার হয়েছে ভবন;
চিবুক-কুহরে আর,
বহেনা লাবণ্য ধার,
বাঁধুলি জড়িত ওঠে
হাসি ফুল নাহি ফোটে,
কপোলের পদ্মরাগ হ'য়েছে বিলীন,
অশ্রুসিক্ত মুখ খানি নিষ্প্রভ মলিন।

প্রদোষের স্বর্ণাঞ্চল দোলাইয়া ধীরে,
বাসন্তী সমীর এলো কোথা হ'তে ফিরে;
আইল কুসুম গন্ধ,
পিকের পঞ্চম ছন্দ,
ঝঙ্কারী সঞ্চরী বধূ,
ধাইল খুঁজিতে মধু,
কিশোরী চাহিয়া দেখে সম্মুখে তাহার,
প্রীতি, প্রেম, আনন্দের পূর্ণ অবতার।

দৃপ্ত যৌবনের কোন অজানিত স্রোত,
করিল মলিনা চিত্ত তূর্ণ ওতঃপ্রোত—
নয়ন দীপতি মালা,
করিল বদন আলা,
ললিত লাবণ্য কলা,
অখণ্ড অমৃত গলা
সুপ্তাধরে শুভ্র হাসি, দিল দরশন,
দেহ মাছে রূপোচ্ছ্বাস জাগা'ল মদন।
সম্মুখে দাঁড়াল পান্থ নির্ব্বাক নীরব,
দিঠি হ'তে বাহিরিল মন্দার সৌরভ
বাসনার গ্রন্থি গুলি,
ছায়া স্পর্শে গেল খুলি,
আঁখির আদর জলে,
প্রথালিয়া কুতুহলে,
সোণার লতায় ধীরে করিল বেষ্টন,
সুখ, যেন স্পর্শ মূর্ত্তি করিল ধারণ।

ভাষায় নাহিক স্বর নাহিক নিক্কণ,
প্রেমের অমৃত সরে ভাষা নিমগন,
প্রীতির পরশে চিত,
তরলিত, তরঙ্গিত,
স্বপ্ন যেন জেগে উঠে,
দাঁড়াইয়া করপুটে,
মণি মন্ত্রে মায়া পুরী করিল সৃজন,
বিরহ শ্মশানে, আজ মধুর মিলন।

স্বপনে বাজিল বাঁশী; স্তব্ধ রজনীর,
শেষ পান্ত হ'তে মৃদু মলয় সমীর,
মধুর কুসুম স্নেহ—
পরাগে, রঞ্জিয়া দেহ,
স্পর্শাতুরা বল্লরীরে,
দোলাইয়া অতি ধীরে,
করিছে সরসস্পর্শে, অশ্রান্ত নবীন,
মলিনা, সুরভি ভরা প্রভাত নলিন।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

প্রতিবাদ।

গত পৌষ মাসের "নব্যভারতে", শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয় "বর্ণ সাম্য ও ধর্ম্ম সাম্য" শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহার মধ্যে "বর্ণ সাম্য" আংশিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি। হিন্দুর দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, হিন্দু সমাজের ভিতর অবস্থান করিয়া, এক জন হিন্দু নামধারী শিক্ষিত ব্যক্তি যে এমন অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব যুক্তি পরম্পরা প্রদর্শনে অগ্রসর হইতে পারেন, এরূপ ধারণা ইতিপূর্ব্বে ছিল না। "অপরম্বা কিম্ভবিষ্যতি।"

নূতন মত গঠনে, নূতন বিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে, একটা বাহাদুরী আছে, সন্দেহ নাই; যদি সে মত যুক্তিযুক্ত হয়, যদি সে মত বিজ্ঞ-জন-সমাদৃত হয়।

মধুসূদন বাবু একটী সব ডিভিজনের দুই শত স্কুলের ছাত্রের গাত্রবর্ণ হইতে আর্য্যেনার্য্যের জাতীয়ত্বের হিসাব করিয়াছেন। এবং তাহাতে তাঁহার যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন,—

"বর্ত্তমান ইংরেজের বর্ণ আর্য্যবর্ণ (শ্বেতবর্ণ)। সাঁওতালদিগের বর্ণ অনার্য্য বর্ণ—কৃষ্ণবর্ণ। এক্ষণ যদি ইংরেজের বর্ণ বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ ব্যক্তির শরীরে শত ফোঁটার শত ফোঁটাই আর্য্যরক্ত আছে, বিবেচনা করা যায় এবং সাঁওতালের বর্ণানুরূপ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির শত ফোঁটার এক ফোঁটাও আর্য্যরক্ত নাই, ধরা যায়, তবে হিন্দুজাতি (caste) সকলের মধ্যে আর্য্যানার্য্য রক্তের অনুপাত কি, তাহা স্থিরীকৃত হইতে পারে।"

সরকার মহাশয় উক্ত স্বতঃসিদ্ধমত অনুসারে যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মণকে ২৩·৫, কায়স্থকে ২১·৬, বৈদ্যকে ১৬·৮, ডিক্রীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

জাতিভেদের এই যে আর্য্যানার্য্যের রক্তের তালিকা, ইহা দেখিলে হঠাৎ একটা বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে, ইহা যুক্তিসঙ্গত ও নির্ভুল। কিন্তু উহার ভিতর তলাইয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহাতে না আছে যুক্তি, না আছে বিজ্ঞতা, না আছে বিধি-বাদ।

পারদ-নির্ম্মিত জ্বরের উষ্ণতা পরিমাপক ও পরিবোধক থার্ম্মোমিটারে কত ডিক্রী জ্বর হইয়াছে, তাহা জ্বরগ্রস্ত রোগীর শরীর হইতে পরীক্ষিত হয়। কিন্তু জাতিভেদের,—বর্ণ-ভেদের আর্য্যানার্য্য রক্তের অনুপাত নির্ণয় করিবার কোন যন্ত্র থাকিলে, অবশ্যই বিশ্বাস করা যাইত যে, ব্যক্তি বিশেষের শরীরে এত পরিমাণে আর্য্যরক্ত আছে; এত পরিমাণে অনার্য্য রক্ত আছে। এরূপ কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র যখন নাই, তখন নজর পছন্দে সংগৃহীত তালিকায় কিরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায়? উহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত হইবে। বিশেষতঃ উক্ত তালিকার সিদ্ধান্ত এরূপ ভ্রমসঙ্কুল যে, তর্কস্থলেও উহা স্বীকার করা যায় না!

আর্য্যগণ এদেশের—বঙ্গ দেশের আদিম অধিবাসী কিনা, এ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আর্য্যগণের অধিবাস যে হিমপ্রধান প্রদেশে ছিল, ইহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের সমসাময়িক কালে আর্য্যগণ হিমপ্রধান প্রদেশে বাস করিতেছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তাঁহাদের যে শ্বেত-বর্ণ ছিল, তাহাই হিন্দু ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে, প্রাচীন পুরাণে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, আর্য্যগণ উচ্চ প্রদেশ হইতে ক্রমশঃ সমতল ক্ষেত্রে—হিমপ্রধান স্থান হইতে উষ্ণ প্রধান স্থলে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

জল বায়ু, প্রাকৃতিক শৈত্য উষ্ণতাই যে মানুষের আকৃতি প্রকৃতি বল বর্ণের মূল কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। শীতপ্রধান দেশবাসীর অধিকাংশই, শ্বেত বর্ণের। গ্রীষ্ম-

প্রধান দেশবাসী কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণ ও গৌরবর্ণের। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম অনুসারে বল বর্ণের গঠন বিধাতার নিয়ম, ইহার উপর মানুষের হাত নাই, সুতরাং অস্বীকারও করাও কর্ত্তব্য নহে।

মধুসূদন বাবু একস্থলে বলিয়াছেন,—

"যদি জল বায়ু বশতঃ (Climatic influence) বশতঃ এই বর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিত, তবে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কৃষ্ণবর্ণ হইল না কেন? বিশেষতঃ এমন ঘটনা অনেক পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, যেখানে পিতা-মাতা যথাক্রমে গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ, সেখানে প্রথম সন্তান কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিতীয় গৌরবর্ণ, তৃতীয় কৃষ্ণবর্ণ এবং চতুর্থ গৌরবর্ণের হইয়াছে।"

মধুসূদন বাবুর উপরিদ্ধৃত কথাগুলি, তাঁহার যুক্তিবিরোধী। তিনিইত দেখিতে পাইতেছেন, পিতা মাতা গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু সন্তান একবার গৌরবর্ণ, অন্যবার কৃষ্ণবর্ণের হইতেছে। সেস্থলে আর্য্যানার্য্যের কল্পনা আইসে কোথা হইতে? এ স্থলে সন্তানের এক দিক কৃষ্ণ ও অন্য দিক গৌর বর্ণের হইলে, মধুসূদন বাবুর যুক্তির সহিত মিল হইত।

মধুসূদন বাবু যে উদাহরণ দিয়াছেন, আমরা বহু স্থলে উহার বিপরীত অবস্থা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। পিতামাতা উভয়েই গৌরবর্ণ, সন্তান হইতেছে কৃষ্ণ বর্ণের। আবার পিতা মাতা উভয়েই কৃষ্ণ বর্ণ; সন্তানগুলির মধ্যে কোনটী গৌরবর্ণ, কোনটী শ্যাম বর্ণ, কোনটী নিভাজ কৃষ্ণ বর্ণের হইতেছে। অন্যস্থলে পিতামাতা ফিট গৌরবর্ণ; সন্তান আবলুসের বর্ণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। এ সকল বিসদৃশ অবস্থার মূলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যে বৈজ্ঞানিক মীমাংসা রহিয়াছে, মধুসূদন বাবু যদি তাহা আলোচনা করিতেন, তবে আর এরূপ অজ্ঞতা অন্ধকারে তাঁহাকে পড়িতে হইত না। মধুসূদন বাবুর কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই, কেবল স্বীয় মত সমর্থনের জন্য দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন; তাহাতেও স্বমত সমর্থিত হয় নাই। আমরাও কয়েকটী উদাহরণ দিয়া এবার আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

একজন ইংরেজ বহুকাল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করিলে এবং একজন বাঙ্গালী দীর্ঘকাল শীতপ্রধান দেশে অবস্থান করিলে, উভয়ের বল বর্ণের বিপর্য্যয় অবশ্যই হইবে। বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থলেই দেখিয়াছি, বাল্যকালে যে শ্যামবর্ণ, যৌবনে সে গৌরবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে; বাল্যকালে যাহাকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়াছি, যৌবনে দেখি, তাহার বর্ণের পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—সে গৌবরর্ণ ধারণ করিয়াছে, এইরূপ বিসদৃশ চিত্র যখন সর্ব্বদাই দেখিতেছি, তখন কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে, আর্য্যানার্য্য রক্তের সংশ্রবেই বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটে।

ব্রাহ্মণের মধ্যে যেমন কৃষ্ণবর্ণের মানুষ আছে, মেথর ডোমের মধ্যেও তেমনি গৌরবর্ণের মানব আছে। যদি এস্থলে সরকার মহাশয়ের তালিকার আর্য্যানার্য্যের রক্তের পরিমাণই ধরা যায়, তবে তাহার ফল কি দাঁড়ায়? এস্থলে তাঁহার তালিকার প্রণালী কখনই থাকিবে না। কারণ কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণের আর্য্যরক্ত, ডোমের গাত্রের আর্য্যরক্ত অপেক্ষা অনেক কম সাব্যস্ত হইবে। সুতরাং ২৩·৫ নিশ্চয়ই পুছিতে হইবে।

বর্ত্তমান সুসভ্য ইউরোপীয়গণ আর্য্যবংশসম্ভূত, সুতরাং তাঁহাদের বর্ণ গৌর, শ্বেত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভুটিয়া পাহাড়ীয়া ম্যাচ্ জাতীয় লোকের বর্ণও ত শ্বেত, তাহারাও কি আর্য্য জাতি বলিয়া অভিহিত হইবে? বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বর্ণ ধরিয়াই যদি আর্য্যানার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে পশুর মধ্যে, শ্বেত হস্তি, শ্বেত ভল্লুক্, শ্বেত বরাহ, ও পক্ষী জাতির মধ্যে রাজহংস, শ্বেত পারাবত্, বলাকা প্রভৃতিও আর্য্যত্বের দাবী উপস্থিত করিতে পারে। বাস্তবিক্ শ্বেতবর্ণ ধরিয়া মধুসূদন বাবু আর্য্যজাতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক, সুতরাং সর্ব্বথা ঐ মত পরিত্যাজ্য। মানুষ শ্বেত বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ কেন প্রাপ্ত হয়, বৈজ্ঞানিক মতে আলোচনা করিলে, মধুসূদন বাবুর আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত হইবে না মনে করিয়াই বুঝি এ সকল বিসদৃশ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

উচ্চ নাসিকা সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, উহাতে এমন কিছু মনে করিতে হইবে না যে, হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ নাসিকা আর্য্যত্বের পরিচায়ক। যে সময় উচ্চ নাসিকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সে সময় কেবল আর্য্য ও অনার্য্য, এই দুই শ্রেণীর লোকের একত্র সমাবেশ ছিল বলিয়াই, উচ্চ নাসিকার ব্যাখ্যা ছিল। আর্য্যগণের উচ্চ নাসিকা ও অনার্য্যগণের নীচ নাসিকা ছিল।

পূর্ব্বকালের আর্য্যজাতির সহিত বর্ত্তমান আর্য্য জাতির—হিন্দু জাতির শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক অবস্থার তুলনা করিলে, এক মহা সমস্যায় উপনীত হইতে হয়। সে কালের আর্য্যগণ দীর্ঘ ও দৃঢ়কায়, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ, সাহসী, অমিত পরাক্রমী, জ্ঞানের আধার, ধর্ম্মের অবতার ছিলেন, আর একালের আর্য্যগণ—হিন্দুগণ কবির বর্ণিত

"ক্ষীণ দেহ ক্ষীণ মন, ক্ষীণ ধন, ক্ষীণ প্রাণ,
* * ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী" বলিয়া পূর্ণ ভাবে অভিহিত। এক ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের মানুষের আকৃতি, বল, বর্ণ আলোচনা করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, মধ্যস্থলের অধিবাসিগণের আকৃতি, বল, বর্ণ আলোচনা করিলে, প্রতিপদেই বিসদৃশ পরিলক্ষিত হইবে।

হিন্দু জাতির ভিতর যাঁহারা আর্য্য জাতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদের অনার্য্য সংশ্রব স্বীকার করার এখনও তত দরকার হইয়া উঠে নাই। জাতিভেদ স্বীকার না করা, অনার্য্যত্ব স্বীকার করা, এক কথা নহে, এ কথা যেন মধুসূদন বাবু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখেন।

ভড়ার মেয়ের বিবাহ—অসবর্ণ বিবাহ এখনও ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ সমর্থন করে না। এখনও ওগুলি সামাজিক ব্যভিচার বলিয়া কথিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি জাতির মধ্যে যে শ্রেণীভেদ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা উঠাইয়া দিলে বিবাহাদি ব্যাপারের কাঠিন্য অনেক কমিয়া যাইতে পারে। তাহাই যখন হইতেছেনা, তখন অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলন সামাজিক মতে ব্যভিচার।

শ্রীগোপালনারায়ণ মজুমদার।

টমাস্ কার্লাইল্।

সংসারে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক আছে, সংসারে কি রূপে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তাঁহারা কেবল তাহারই চিন্তা করেন; মানসিক উন্নতি ইঁহাদের চিন্তার বিষয় নহে। কিরূপে বৈষয়িক উন্নতি করা যায়, কিসে স্বার্থ-সাধন হয়, ইহাই তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। ঈপ্সিত কার্য্য উদ্ধারের জন্য এরূপ লোমহর্ষণ কোন উপায়ই নাই, যাহা তাঁহারা অবলম্বন করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দিগ্ধ। সংসারে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; সংসারের অধিকাংশ লোকই এই শ্রেণীর লোকের বাধ্য, এবং তাঁহাদিগকেই প্রশংসা করিয়া থাকে; কারণ, তাঁহারা ধনী, ক্ষমতাশালী এবং পরাক্রমশীল। কিন্তু সংসারের লোকও অন্তরের সহিত ইহাদিগকে ভক্তি করে কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়; কারণ, স্বার্থসিদ্ধি হইবার আশা না থাকিলে সেই সকল লোকই তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বৈষয়িক উন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকিলেও, তাহাই যে মানব-জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, এরূপ মনে করেন না; সুতরাং এই উন্নতিকল্পে তাঁহারা গুরুতর অধর্ম্ম করিতে প্রস্তুত নহেন। মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে তাঁহারা লক্ষ্য রাখিয়া চলেন। ইঁহাদের সংখ্যা প্রথম শ্রেণীর অপেক্ষা অনেক কম। অপর আর একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইতেই সংসারকে এক নূতন চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন, ভগবান্ মনুষ্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া সৃজন করিয়াছেন; মানব-জীবন এক প্রহসন বা ধূলাখেলা নহে; যে সকল উপাদানে মনুষ্যের দেহ, মন গঠিত, তাঁহাদের মতে, তাহার যথাযথ ব্যবহার করাই মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য—একমাত্র উদ্দেশ্য। যে সকল বৃত্তি লইয়া মনুষ্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার যথাযথ পরিচালনাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, এবং অপব্যবহারই পশুত্ব। এই মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য তাঁহারা আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। সংসারকে তাঁহারা পরীক্ষাস্থল মনে করেন; এই পরীক্ষায় যাঁহারা অনাহত শরীরে উত্তীর্ণ হয়েন, তাঁহাদের মতে তাঁহারাই মনুষ্য পদবাচ্য। তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের "লজ্জা' ঘৃণা' 'ভয়' তিন থাকতে নয়"—এই মন্ত্রের উপাসক। সুতরাং তাঁহাদের চাল্‌চল্‌তি একটু বেয়াড়া, অর্থাৎ সংসারের অবলম্বিত পন্থার বিপরীত। তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য, সুতরাং তাঁহারা অন্যের প্রদর্শিত পন্থা—তাঁহাদিগের অনুমোদিত না হইলে অনুসরণ করেন না। এই জন্য তাঁহারা সংসারে লাঞ্ছিত এবং পদদলিত; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহারা সক্রেটিসের মত প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু নিজের ধ্রুব বিশ্বাস হইতে একপদও বিচলিত হইতে প্রস্তুত নহেন। সংসারের লোকে তাঁহাদিগকে পাগল বলে, কিন্তু ভগবানের এমনি বিধান যে, কালে তাঁহাদের প্রলাপ বাক্যই এই দুর্নীতি-প্রবণ সংসারের একমাত্র পথপ্রদর্শক বলিয়া গণ্য হয়। টমাস্ কার্লাইল্ এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোক।

টমাস্ কার্লাইল্ এক ধর্ম্মপ্রবণ দরিদ্র কৃষক পরিবারে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মনুষ্যের চরিত্রের উপর পিতা-মাতার চরিত্রের যে অসাধারণ আধিপত্য, এই বিশ্বাস আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে; টমাস্ কার্লাইলের চরিত্রে এই বাক্যের সার্থকতা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহাদের পরিবারের সকলেই পবিত্রতা, ধর্ম্মানুরাগ এবং সরলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই পরিবার সম্বন্ধে কার্লাইল স্বয়ং বলেন, "They had to scramble for their very clothes and food. They knit, they thatched for hire, they hunted. My father tried all these things almost in boyhood." তাঁহার পিতামহের বিষয়ে কার্লাইল্ বলেন, "He did not drink, but he was a fiery man, irascible, indomitable, of the toughness and springiness of steel." কার্লাইল তাঁহার মাতার সম্বন্ধে বলেন "a woman of to me the forest descent, that of the pious, the just and the wise." তাহার পিতার সম্বন্ধে কার্লাইল লিখিয়াছেন, "More remarkble man than my father I have never met in my journey through life, sterling sincerity in thought, word, and deed, most quiet, but capable of blazing into whirlwinds when needful, and such a flash of just in right and brief natural eloquence and emphasis, true to every feature of it as I have never known in any other." কার্লাইল যখন কারকেলডি (Kirkaldey) স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে এক পত্রে নিম্নোদ্ধৃত উপদেশ দিয়াছিলেন "Oh Tom, mind the golden season of youth, and remember your Creator in the days of your youth. Seek God while He may be found. Call upon him while he is near. We hear that the world by wisdom knew not God. Pray for his presence with you and His counsel to guide you. Have you got through the Bible yet? It you have, read it again. I hope you will not weary, and may Lord open your understanding." যাঁহার পিতামাতা এইরূপ, তাঁহার স্বভাব কিরূপ হইবে, তাহা পাঠক কতক পরিমাণে অনুমান করিতে পারেন। কার্লাইল শৈশবাবস্থায় অত্যন্ত লাজুক এবং নির্জ্জনতাপ্রিয় ছিলেন। যাহার তাহার সহিত মিলিতে ভালবাসিতেন না; তাঁহার মনের মত লোক সহস্রের মধ্যে একটী মিলিত। তিনি অধিক কথা কহিতেন না, কিন্তু যদি কিছু কহিতেন, সকলই সুসার। ক্রোধ-প্রবণতা কার্লাইল পরিবারের একটী বিশেষত্ব; কার্লাইলও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। বাচালতা ও চাঞ্চল্য তাঁহার চক্ষুর শেল ছিল। সরলতার সহিত সততার অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, কার্লাইল স্বয়ং ইহা বলিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে ইহার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখা গিয়াছে। যাহা অন্তরের সহিত বিশ্বাস না করিতেন, মুখে এরূপ কোন কথা বলা তিনি পাপ বোধ করিতেন, এবং যখন কার্য্য করিতেন, তখনও বিশ্বাসানুযায়ী চলিতেন; লোকের মতে বা স্বার্থের অনুরোধে কখনও বিচলিত হইতেন না। বিলাসিতাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ইহার সহিত নৈতিক শিথিলতা ওতঃপ্রোত ভাবে মিশাইয়া আছে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইতে সংসারকে এবং জীবনকে তিনি বিশেষ ভাবে দেখিতে লাগিলেন। জীবন একটী ঘোরতর সমস্যা, সংসার সেই জীবনের পরীক্ষা-ক্ষেত্র। 'হেসে খেলে নাওরে যাদু' ইহাকে তিনি জীবনের লক্ষ্য মনে করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সংসারের প্রত্যেক লোকেই কোন না কোন বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সে আসিয়াছে, তাহা আত্মপরীক্ষার দ্বারা সময়ে সে বুঝিতে পারিবে। অলসতা বা আপাত সুখের অভিলাষ নিবন্ধন যে এই কর্ত্তব্য

হইতে বিচলিত হয়, তাহার জীবন বৃথা। যাঁহারা সৎ এবং চরিত্রবলবিশিষ্ট এবং ভ্রমেও কখন যাঁহারা গর্হিত কার্য্য করেন নাই, তাঁহাদের ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা অনেক সময় দাম্ভিকতাপূর্ণ; কিন্তু ঐ দাম্ভিকতা অহঙ্কার-প্রসূত নহে, সৎবিশ্বাস-জাত। সক্রেটিশ্ তাঁহার মৃত্যুকালে আত্ম সমর্থনের সময়ও এই দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; কারণ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার শত্রুগণ ভ্রমপ্রমাদ বশতঃই তাঁহার প্রতি এই অন্যায় শাস্তিবিধান করিয়াছে। কার্লাইলের কথোপকথনে এবং পুস্তকে এইরূপ দাম্ভিকতার আভাস পাওয়া যায়। তিনি জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না, কিন্তু সাংসারিক আর সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন; সুতরাং সাংসারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য প্রতিপালনে তিনি অনেক সময় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই এবং তদ্বিষয়ে ত্রুটীও স্বীকার করেন নাই। কার্লাইল-পরিবারের সকলেই স্বাধীনচেতা ছিলেন; টমাস্ কার্লাইলের দারিদ্র্য-নিবন্ধন অনেক সময় গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তিনি নিজে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই, অর্থাগমের জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিতে কখনই লেখনী-ধারণ করেন নাই। যিনি সংসার-বিরাগী অথচ সংসারেই থাকেন, তাঁহাকে ঘোর সাংসারিক লোক এক অদ্ভুত জীব বলিয়া মনে করে। কার্লাইলের আচার ব্যবহার, আকৃতি প্রকৃতি, সকলই অদ্ভুত ছিল। তিনি তাঁহার নিজভাবে এবং তত্ত্বানুচিন্তনে সর্ব্বদাই বিভোর থাকিতেন, সংসারের ধার ধারিতেন না; বোধ হয়, সংসারের ক্ষুদ্র চিন্তায় মনে নিবেশ করিলে, তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা রাখিতে পারিতেন না। কিন্তু যখন তিনি দারিদ্র্যের সহিত ঘোর সংগ্রামে রত ছিলেন, তখনও তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিতেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা এতই প্রবল ছিল যে, তাঁহার অন্য কোনও পিপাসা ছিল না, এই কথা বলা অত্যুক্তি বোধ হয় না; এই জন্য তাঁহার জীবনে ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য-ত্রুটি-দোষ দেখা যায়; কিন্তু তাঁহার নিজের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না, বোধ হয়, তাহা চিন্তা করিবার সময়ও ছিল না। প্রতিবেশীর বাটীর কুকুর ডাকিলে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত; কিন্তু যে সকল বিপদে মনুষ্যের স্থৈর্য্য বিচলিত হয় এবং চিত্তের স্বাভাবিক শান্তভাবের বিপর্য্যয় ঘটে, তিনি তাহাতে পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল থাকিতেন। আধুনিক সভ্যতা এবং তাহার আনুষঙ্গিক বিলাসিতা, কপটতা, ব্যভিচার এবং অধর্ম্মের প্রতি তিনি অনেক সময়ে ভ্রুকুটী প্রদর্শন করিয়াছেন; তাহাতে সময়ে সময়ে তাঁহাকে মনুষ্য-বিদ্বেষী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি সেরূপ ছিলেন না। যাঁহাদের সততা অধিক, তাঁহারা অসৎ মনুষ্য এবং অসৎ কার্য্য দেখিলে ধৈর্য্যচ্যুত হন এবং তদ্ধেতু মনুষ্য-বিদ্বেষসূচক গ্লানিকর বাক্য বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের অন্তর মানব-প্রেমে মাখা। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ-জীবনেও ঐরূপ মনুষ্যবিদ্বেষ ভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণ পরিলক্ষিত হইত; কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা এই দেশের মনুষ্যের হিতকারী আর কে আছে? কার্লাইল পার্থিব কোন বস্তুকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, পদার্থ মাত্রেরই মধ্যে এক গূঢ় অভিপ্রায় নিহিত রহিয়াছে, সেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারাই প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর প্রধান কার্য্য।

কার্লাইল্ প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রবেশ করেন। তথায় তাঁহার শিক্ষকগণ অচিরেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি এনান্ (Annan) গ্রামার স্কুলে প্রবেশ করেন। তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া দুর্দ্ধর্ষ বালকদিগের প্রকৃতিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১৪ বৎসর বয়সে তিনি এডিন্বরা কলেজে প্রবেশ করেন। এডিন্বরা বিশ্ববিদ্যালয়েও গণিত ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে ভালরূপ শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই এবং তথাকার শিক্ষকদিগের বিদ্যাবত্তা বিষয়েও তাঁহার ধারণা ভাল ছিল না। এইস্থলে একাদশটী বয়স্যের সহিত তিনি বন্ধুতা সূত্রে বদ্ধ হন। ইঁহারা সকলেই বিদ্যা, বুদ্ধি এবং চরিত্র বিষয়ে সাধারণ ছাত্রদিগের অনেক উপরে ছিলেন। তাঁহারা সকলেই কার্লাইল্কে তাহাদিগের নেতা বলিয়া মনে করিতেন, এবং তিনি যে উত্তরকালে প্রতিভাবলে একজন অসাধারণ মনুষ্য হইবেন, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেন। ১৮১৪ খ্রীঃ কলেজের পাঠ্য সমাপ্তি না হইতেই কিরূপে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিবেন, তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন এবং Annan School এর গণিত শিক্ষকের পদ শূন্য হইলে প্রতিযোগিতায় তিনি মনোনীত হইলেন। এই সময়ে কার্লাইল-পরিবার ইক্লিফিকান্ (Ecclefechan) মেন্হিলে (Mainhill) গিয়া তাঁহাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি শিক্ষকতা কার্য্য ভালবাসিতেন না। এনান্ স্কুলে অবস্থান কালে, অধিকাংশ সময়ই পুস্তক পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন। এই সময়ে তিনি Edward Irving এর সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। Irving স্কট্ল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কার্লাইল Kirkaldy বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; Irvingও তথায় শিক্ষকতা করিতেন। Irving এর সহিত বন্ধুতা ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল এবং Irvingও কার্লাইলকে অতি সহৃদয় ভাবে দেখিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে তাঁহারা উভয়েই উক্ত Kirkaldy স্কুল পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে কার্লাইলের মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন এবং সন্দেহ উদিত হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি ইহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না। কার্লাইলের মাতা কার্লাইলকে সময়ে সময়ে যে সকল নৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয়ের উপদেশ দিতেন, তাহা দ্বারা তাঁহার প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল। প্রথমে তিনি ধর্ম্মযাজক হইবেন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, এবং কিছু দিন অতি যত্ন সহকারে ব্যবহার শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু সময়ে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সাহিত্যই তাঁহার প্রকৃত ক্ষেত্র। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। কোন কোন সময় Bunyan এর ন্যায় তিনি মনে করিতেন যে, তিনি অত্যন্ত পাপী—পাপ-নিরয়ে নিমজ্জিত—তাঁহার আর পরিত্রাণের সম্ভাবনা নাই। অবশেষে তাঁহার সে সন্দেহ দূরীভূত হইল—তিনি শান্তিরাজ্যে পদার্পণ করিলেন।

তিনি স্থির বুঝিলেন যে, মনুষ্য স্বাধীন, তাহার আত্মা স্বাধীন; সে ইচ্ছা না করিলে পাপ এবং শয়তান্ তাহার আত্মার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না; মনুষ্য তাহার স্বীয় কর্ম্মবশেই সুখ দুঃখ ভাগী হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁহার ভাবী সহধর্ম্মিণী জেন ওয়েল্‌শের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার বন্ধু Irvingই জেন ওয়েল্‌সের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। জেন্ ওয়েল্‌শের পিতা ধনী ছিলেন এবং জেন্ ও তাঁহার অতি আদরের কন্যা ছিলেন। প্রতিভার উজ্জ্বল রেখা তাঁহার সুচারু বদনকমলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। শৈশবেই তিনি সঙ্গীত-বিদ্যা, চিত্র-বিদ্যা এবং আধুনিক ভাষায় বিশেষরূপে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা কার্লাইলের ন্যায় বলবতী ছিল। কার্লাইল তাঁহার কিশোরাবস্থা বর্ণনা সময়ে বলিয়াছিলেন,—

"Feel that figure with electric intellect, love and general vivacity of all kinds, where in nature will you find a prettier"? Edward Irving কিছু দিনের জন্য জেন্ ওয়েলশের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জেন্ ওয়েলশের বিবাহের পূর্ব্বে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে তাঁহার সকল সম্পত্তি কন্যাকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। জেন ওয়েলশ্ ও প্রথম হইতেই সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত হইবেন, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, এই জন্য সর্ব্বদাই তিনি নানা বিষয়ক পুস্তক পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য, বিদ্যা-বুদ্ধি এবং নানা গুণপণায় বিমোহিত হইয়া, অনেকেই তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলে ; কিন্তু সকলকে তিনি আলাপ ব্যবহার দ্বারা সুখী করিলেও, কখনও বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতিদান করিতেন না। তাহার শিক্ষকের প্রতি প্রথম হইতেই তাহার কথঞ্চিৎ পরিমাণে আকর্ষণ জন্মিয়াছিল, কিন্তু Edward পূর্ব্ব হইতেই Miss Martinএর নিকট পরিণয়-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন বলিয়া, জেন্-ওয়েল্‌শ্ এবং এডওয়ার্ড কেহই পরস্পরের পরিণয় সম্ভাবনা মনেও স্থান দেন নাই। নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা হেতু, এড ওয়ার্ড জেনের শিক্ষাবিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিতেন না, সুতরাং শিক্ষার সৌকর্য্যার্থ তিনি টমাস্ কার্লাইল্‌কে তাঁহার শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করিতে বলেন। কার্লাইল্ তদনুযায়ী তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত হন। উভয়েই উভয়ের প্রতিভা সন্দর্শনে প্রথম হইতেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। কারলাইল জেন ওয়েলশের বিচারশক্তির এত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন যে, তিনি অতঃপর তাঁহার জীবন সমস্যায় সকল বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এই সময় তিনি Life of Schillerও লিখিয়াছিলেন এবং গেটে (Goethe) কোন গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই দুই পুস্তক ছাপা হইবার পূর্ব্বে তিনি জেনকে দেখিতে দিয়াছিলেন। কারলাইল জেনের নিকট প্রেমিকের ভাবে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, জেন তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিছুদিন এইরূপ ভাবে চলিয়াছিল, পরে ইহাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই আসক্তি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ এবং পবিত্রতা পূর্ণ। কারলাইল

প্রথমে বিবাহ প্রস্তাব করেন, জেন তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। জেনের মাতা প্রথম হইতে এই বিবাহের বিরোধী ছিলেন। তিনি জানিতেন, কার্লাইলের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলে জেনের চিরদিন দুঃখে কালাতিপাত করিতে হইবে। জেন তাহা শুনিলেন না ; বিবাহের কথা স্থির হইল। দেশীয় প্রথানুযায়ী জেন তাহার ভাবী শ্বশুর এবং শাশুড়ীকে দেখিতে মেন্‌হিলে (Main hill) গমন করিলেন। কার্লাইলের পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনীগণ পূর্ব্ব হইতেই জেনের আগমন সংবাদ পাইয়াছিলেন। দরিদ্র কৃষকের গৃহে রাজনন্দিনী আগমন করিবেন, কিছু অভ্যর্থনা আবশ্যক। কার্লাইলের ভগিনী মারগারেট (Margaret) টেবেলের উপর একখানা শাল বিস্তার করিলেন ; তিনি কোন বন্ধুর নিকট হইতে উহা উপহার পাইয়াছিলেন। জেন কার্লাইলের গৃহে উপস্থিত হইলে কারলাইল-পরিবারের অনেকেই উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইয়াছিলেন—'কাঙ্গালের দুয়ারে হাতীর পারা'। কেহ কেহ দূর হইতে উকী মারিয়া জেনকে দেখিয়াছিল ; কারলাইলের পিতা তখন ক্ষেত্র হইতে কৃষকের মলিন পরিচ্ছদে জেনকে দেখিতে আসিলেন; বোধ হয়, কিছু লজ্জিত হইয়া জেনকে দেখা মাত্র সরিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে পুনরায় জেনকে দেখিতে আসিলেন। জেনের সরল ব্যবহারে কার্লাইলের পিতা মাতা প্রভৃতি সকলেই সুখী হইয়াছিলেন, এবং প্রাসাদবাসিনী সুখাঙ্কলালিতা ধনী-দুহিতা নির্ধনীর কুটীর সন্দর্শনার্থ আগমন করিবেন, এই সংবাদ শ্রবণে কার্লাইল-পরিবারের যে উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল, জেনের সরল স্নিগ্ধ ব্যবহারে তাহা বিদূরিত হইল। জেনও আনন্দচিত্তে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জেন কার্লাইলের মাতার নিকট পত্রে একস্থানে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"I have never been so happy since ; though I have been at several fine entertainments, where much thought and pains and money were expended to assemble the ingredients, of enjoyment ; and this no wise strange, since affection is the natural element of my soul and that I found in your cottage warm and pure while in more splendid habitations it is chilled with vanity, affectation and selfishness. For there is nothing but a mixture of good and evil in this world, mother ; and thus some have the 'dinner of herbs wbere love is,' others "the stalled ox and hatred therewith."

বিবাহের কথা স্থির হইল। জেনের মাতার নিতান্ত ইচ্ছা কার্লাইল এবং জেন্ তাহাদের বিবাহের পরে তাঁহার সহিত তাহাদের হ্যাডিংটনস্থ (Hadington) বাটীতে বাস করেন। জেন তাহার একমাত্র কন্যা। কার্লাইল তাহাতে রাজী নন। কার্লাইলের গৃহে অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। তিনি তথায় তাঁহার আপন রুচি মত থাকিবেন। তিনি বলেন, "two households could not live as if they were one, and he would never have any right enjoyment of his wife's company till she was all his own." এই জন্য কমলি-ব্যাঙ্কে (Comely Bank) তাঁহাদের জন্য একটী বাটী ভাড়া করা হইয়াছিল। ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে বিনা আড়ম্বরে জেন এবং কার্লাইলের বিবাহ হইয়া গেল ; তৎপরে কিছু দিবস তাঁহারা ঐ বাটীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। অনেক লোক বাটীতে আসা যাওয়া করে, কার্লাইল ইহা ভালবাসিতেন না। এই সকল (Nauseous intrusions) হইতে দূরে এবং নিরূপদ্রবে থাকিবার

জন্য সহর হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত Craigenputtock এ থাকিবার সংকল্প করিলেন। তথায় প্রকৃতির নিভৃত কন্দরে বসিয়া তাহার শোভা সন্দর্শন এবং সাহিত্য সেবা করিবেন। এই স্থানে মহামতি এমারসন (Emerson) আসিয়া নির্জ্জন প্রান্তবাসী যোগীবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এমারসন স্বয়ং রত্ন, তাই কার্লাইল-রত্নকে দেখিবার জন্য সাগর ভূধর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন। পরস্পর সাক্ষাৎ হইল, উভয়ই মুগ্ধ হইলেন। জেন ওয়েলস্‌কে এই Gaigenputtock এ অবস্থান কালীন সামান্য পরিচারিকার ন্যায় দুগ্ধ দোহন হইতে বাসন মাজা পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই করিতে হইত। কার্লাইল তাঁহার নিজ ভাবে বিভোর থাকিতেন, কখন কখনও পাইপ-মুখে জগতত্ত্ব-অনুচিন্তনে আত্মহারা হইতেন। কোমলি ব্যাঙ্কে (Comely Bank) অবস্থান কালীন সুধীবর গেটে (Goethe) কার্লাইল ও জেনকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। গেটে কারলাইল লিখিত Life of Schiller পাইয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, নৈতিক জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতে এক লোক জন্মিয়াছে,—"a new moral force, the extent and effects of which it was impossible to predict." কার্লাইল গেটে প্রদত্ত 'Faustus' পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহাদের পরস্পরে আত্মবিনিময় হইয়াছিল। কার্লাইলের স্ত্রীর জন্য গেটে এক ছাড়া 'Iron Necklace' পাঠাইয়াছিলেন। কার্লাইল এবং তাঁহার স্ত্রী জেন গেটের জন্য নানা প্রকার সুন্দর উপহার পাঠাইয়াছিলেন। এই জন-শূন্য নিবিড় পর্ব্বতোপরি এক কুটীরে এই দম্পতি প্রায় সাত বৎসরের অনূর্দ্ধ কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহারা এক সময় কিছু দিবস লণ্ডনে যাপন করেন। লণ্ডনে যাঁহাদের সহিত কার্লাইলের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে তিনি জন-ষ্টুয়ার্ট মিলকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তাহা বন্ধুতার পরিপন্থী হয় নাই।

শ্রীকুলচন্দ্র রায় চৌধুরী।

যুগান্তরে।

সময়ে কত পরিবর্ত্তন হয়! রাজধানীকে লোকে বৃত্তের কেন্দ্রের সহিত তুলনা করে। পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে রাজধানী পরিধিস্থ বিন্দু এবং কেন্দ্র দূরে, অতি দূরে। পরিধি যখন দ্রুত ঘোরে, কেন্দ্র সন্নিকটে তখন মন্দ গতি। পরিবর্ত্তন রাজধানীতে যত দ্রুত হয়, দূরস্থ পল্লিগ্রামে তত শীঘ্র হয় না। সহরের পথে লোক ছোটে, ধীরে কেহ যায় না। দেহের মত মনটাও ছোটে। পল্লিগ্রামে সকলই মন্থর। নগরে সকলি অস্থির। বন্ধুতা অস্থির, শত্রুতা অস্থির, ভাব অস্থির—কেবল অকালপক্কতা। পল্লিগ্রামে বটবৃক্ষ বড় ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু চিরদিন থাকে। নগরের বৃষ্টি-বৃক্ষ বে'র জল পাওয়া কণের মত লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়িয়া উঠে, কিন্তু এক ঝড়েই চূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং রাজধানীর নিকটে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া পল্লিগ্রামের পরিবর্ত্তন কেহ অনুমান করিবেন না।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন ব্রাহ্মণীকে

একটী শেমিজ পরাইয়াছিলাম। ননদেরা সব আয়া বলিয়া ব্রাহ্মণীকে প্রশংসা করিলেন, প্রতিবাসীরা খ্রীষ্টান বলিয়া অভিহিত করিলেন, ব্রাহ্মণী মণ্ডল ঘাটের মেয়ে, শেমিজ ফেলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। এখন নদে শান্তিপুর, কুমিল্লা হিজলী, হাটে ঘাটে, বাটে মাঠে শেমিজ জ্যাকেট ছড়াছড়ি।

ব্রাহ্মণীর বাপের বাড়ীর দেশে তখনও বাঁকমল ও তাড়ু খাড়ুর চলন ছিল। আমরা সহুরে, অর্থাৎ কলিকাতা হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে আমাদের বাড়ী। আমাদের দেশে মাথায় সিঁথি, কাণে মাকড়ী, গলায় মাদুলী বা সাতনর, হাতে বালা, মরদানা, যবদানা, মুড়কী মাদুলী ও বাজু ও তাবিজ; কোমরে গোট বা চন্দ্রহার, পায়ে পায়জর ও মল পরিত। তখনও বাউটী সুটের চলন হয় নাই। আমার ভাগ্যে ব্রাহ্মণীর নানা সংস্করণ হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে বাউটী সুট, তৃতীয়ে মুক্তামালা যশমের সঙ্গে ইয়ারিঙ্গ ও ব্রেসলেট। চতুর্থ সংস্করণে হার ও চুড়ী। অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি? প্রথম সংস্করণে—বাড়ীতে যুগীর সাড়ী, বাহিরে শিমলা, দ্বিতীয়ে—বাড়ীতে বিলাতী, বাহিরে ফরাসডাঙ্গা, তৃতীয়ে—বাড়ীতে ফরাসডাঙ্গা, বাহিরে বারাণসীর তিন পাড় নীলাম্বরী। চতুর্থের দুই পাড় অনুবীক্ষণ সাপেক্ষ, তবে বোম্বায়ের কিছু বাড়াবাড়ী। বাবার মাথা কামান, মাঝখানে একটী টিকী, বাড়ীতে নপোয়া বহরের থান, বাহিরে আড়াই হাতী। বাড়ীতে খড়ম, বাহিরে খালি পা বা চটী জুতা। কাছারী যাইবার সময় মাথায় হাতে বাঁধা পাগড়ী থাকিত। গায়ে আঙ্গরাখা বা বেনিয়ান, তাহাতে ভুঁড়ীর অর্দ্ধেক ঢাকিত না, পায়ে চটী জুতা। কর্ত্তারা ছাতি ব্যবহার করিতেন না। বাড়ীতে একটী ছাতি থাকিত। ছেলেরা তাহা ব্যবহার করিত। সব বাড়ীতে ছাতি থাকিত না। সাধারণ লোকে গোল পাতার ছাতি ও টোকা ব্যবহার করিত। আমার জেটা মহাশয় গ্রামের প্রধান জমিদার। তিনি যখন কোথায় যাইতেন, একটা প্রকাণ্ড ছাতা তাহার রূপার বাঁট চাকরে তাঁহার মাথায় ধরিত। আমরা ধূতি পরিতাম, কোথায় যাইতে হইলে গায় পিরাণ দিতাম। এক টাকায় এক জোড়া পিরাণ চেতলার হাটে কেনা হইত। স্কুলে যাইবার সময় গায়ে জামাও দিতাম না, পায়ে জুতাও থাকিত না। কুটুম্ব বাড়ী যাইতে কি কলিকাতায় যাইবার সময় জুতা পায়ে দিতাম। এক জোড়া জুতা ও এক জোড়া পিরাণে বছর কাটিত। শীতকালে গায়ে দোলাই দিতাম। তখন রেপার উঠে নাই। ১৮৬৯ সালে রেপারের প্রথম আমদানী হয়। এক একখানি রেপারের দাম দশ বার টাকা। ছেলে বেলা দিশী ছিটের ও বড় হইলে লক্ষ্ণৌ ছিটের দোলাই গায় দিতাম। কর্ত্তারা বনাত গায়ে দিতেন। কোথায় যাইতে হইলে শাল বাহির করিতেন। শালের ভিতর একখানা সরু চাদর ঢাকা দিতেন।

মা শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছিলেন বেতের পেঁড়ায় কাপড় ও সিঁদুর চুপড়ী সঙ্গে লইয়া। আমার জীবনের প্রভাত কালে ঘরে প্রকাণ্ড এক কাঁটাল কাঠের সিন্দুক ও

A bed by night and a chest of drawers by day

প্রকাণ্ড এক তপ্তকোষ তাহার তলায় জোড়া বাক্স। সে বাক্সে মার গহনা-পাঁটী

থাকিত, আমাদের তিন ভাই ও দুই বোনকে লইয়া মা সেই তপ্তকোষে শুইতেন।

ঘরে একটী কড়ির আনলায় কাপড় রাখা হইত। কড়ির শিকায় চিত্র করা হাঁড়ীতে মিষ্টান্নাদি রক্ষা করা হইত। কর্ত্তারা প্রায় চৌকিতে বসিতেন। আমরা বালা-ন্দার মাদুর পোতিয়া বসিতাম। কুটুম্ব আসিলে কাটীর মাদুর পাতা হইত। বিশেষ বড় লোকের উপলক্ষে সতরঞ্চী পাতিয়া চাদর ঢাকিয়া তাহার উপর দু চারিটা তাকিয়া রাখা হইত। আরো বড়লোক হইলে গালিচা বা দুলিচা পাতা হইত। ঘরে একটী জলচৌকীর উপর পিতলের পিলসুজ, পানের বাটা ঘটী গেলাস ইত্যাদি সাজান থাকিত। এক পার্শ্বে গাড়ু ঝক ঝক করিত। গাড়ুর উপর গামছা পাট করিয়া রাখা হইত। পিলসুজের উপর রাত্রে প্রদীপ জ্বলিত। প্রাতঃকালে প্রদীপগুলি জলে ভিজান হইত। বিকাল বেলা মেয়েরা প্রদীপ মুছিয়া নূতন শলিতা তৈয়ার করিয়া প্রদীপে তেল শলিতা দিয়া পিলসুজের উপর রাখিয়া দিত। তখন সারিষার তেলেই প্রদীপ জ্বলিত, পরে রেড়ীর তেলের চলন হয়। কোচড়ার তেল আমদানী হয় নাই। কেরোসিন কাহাকে বলে, সাধারণ লোকে জানিত না। মজলীসে সামাদান বাতি জ্বলিত। আমার মেয়েরা খুব উল বুনিতে জানে, সে দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সলিতা পাকাইতে কেহ জানে না।

বাবা তামাক খাইতেন না। তামাক খাওয়া ভদ্রতার ও হিন্দুয়ানীর বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কাকা তামাক খাই-তেন। কুটুম্বদের জন্য বাঁধা হুঁকা তাঁহার ঘরে সাজান থাকিত, কিন্তু নিত্য ব্যবহারের জন্য কলি হুঁকা ছিল। চকমকি বাক্সে তামাক টিকে ও চকমকি পাথর থাকিত। ঘরে প্রতি রাত্রে তুঁষ ঘুঁটে দিয়া আগুন রাখা হইত। ম্যাচেস উঠে নাই। পাকাটীতে গন্ধক লাগাইয়া বাড়ীতে দিয়াশলাই তৈয়ার করা হইত। চেয়ার, টেবিল, কোচ লোকে চিনিত না। হাত বাক্সে খাতা পত্র, খরচের টাকা কড়ি থাকিত। তখন বাজার করিতে কড়ির খুব ব্যবহার ছিল।

আমরা বনিয়াদী বংশ। আমাদের গ্রামে অধিকাংশই কোটা বাড়ী ছিল। সাধারণতঃ পল্লিগ্রামে জমিদারের বাড়ী ভিন্ন পাকা বাড়ী প্রায় দেখা যাইত না। ভদ্র-লোকের বাড়ীতে একখানি চণ্ডীমণ্ডপ, এক খানি কি দুখানি শোবার ঘর, রান্না ও ভাড়ার ঘর, ঢেঁকীশালা, গোশালা, গোলা ও আঁতুড় ঘর থাকিত। শোবার ঘর ও চণ্ডীমণ্ডপের পোতা খুব উচু করা হইত, এবং দাওয়া রাখা হইত এবং চালগুলি বেতের বা শণের বাঁধনে বাঁধা হইত ও উলুখড়ে ছাওয়া হইত। চালে রঙ্গ দিয়া চিত্র বিচিত্র করা হইত। অন্যান্য ঘরগুলি বিচালী বা গোলপাতা দিয়া ছাওয়া হইত। গোলাঘর বাঁশের মাচার উপর উচুঁ করিয়া তৈয়ার করিয়া উলু দিয়া ছাওয়া হইত। আতুড় ঘরটী সব ঘরের অপকৃষ্ট। কোন ঘরের বাহিরের দিকে প্রায় জানালা থাকিত না। উঠানের দিকে একটী দ্বার ও দুটী জানালা থাকিত। প্রত্যেক ঘরের সামনে দাওয়ার নীচে আঁস্তাকুড় থাকিত। সকল বাড়ীতেই দু একটী গরু থাকিত। আমি ছেলে বেলা কয়েকটী পায়রা পুষিয়াছিলাম, জেটা-মহাশয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন। হিন্দুর বাড়ীতে মুরগী পোষা কেন?

গৃহস্থ বাড়ীতে ক্বচিৎ একটী চাকর বা খানসামা থাকিত। চাকরাণী প্রায় রাখা হইত না। মেয়েরা তখনও তাস খেলিতে শিখে নাই। থিয়েটার যাওয়া কি উলবোনা আরম্ভ হয় নাই। কর্ত্তারা বাজার করিতেন। রান্না বাড়না, ঘসনা মাজনা মেয়েরা সব করিত। কয়লা জ্বালান আরম্ভ হয় নাই। ঘুটে ও কাঠে রন্ধনকার্য্য সম্পাদিত হইত। চন্দ্রপুলী, ক্ষীরের ছাঁচ তৈয়ার করিতে, আলপনা দিতে, শিকা বুনিতে, দড়ী বা পৈতা পাকাইতে গৃহস্থের মেয়েরা কারুপণা দেখাইত। তখন হলুদ মাখা উঠিয়া গিয়াছিল, সাবান মাখা আরম্ভ হয় নাই। মাখাঘসা দিয়া মাখা পরিষ্কার ও বেসম দিয়া গা পরিষ্কার করা হইত। রন্ধন কার্য্যে পটুতা স্ত্রীলোকের আবশ্যক গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। মাছের তরকারী এখন যত রকম হয়, তখন এত রকম হইত না। মাংস মহাপ্রসাদ বৎসরে পূজা উপলক্ষে আস্বাদ করা হইত। মাংস না খাইলে গায়ে বল হয় না, এ কথা লোকেরা শিখে নাই। হিন্দুর ঘরে পলা-ণ্ডুর এখন যথেষ্ট প্রচলন, তখন পেঁজ ছুইলে জাতি যাইত। পাঁউরুটী বিস্কুট হিন্দুরা ছুইত না। নিরামিষ রন্ধনে ও বহুবিধ পিষ্টক প্রস্তুত করিতে মেয়েরা সুদক্ষ ছিল। এখনকার মেয়েরা পাক প্রণালী প্রভৃতি পড়িয়া যত প্রকার বিভিন্ন স্বাদের মাছ মাংস রাঁধিতে ও আচার তৈয়ার করিতে পারেন, তখনকার মেয়েরা তাহা পারিত না। কিন্তু এখন রন্ধন অভি-রুচি সম্মত, তখন কর্ত্তব্য ছিল। তখন লেফ কাঁথায় যে কারিগরী দেখান হইত, এখন পাড় ও বুটী তুলিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কারিগরী দেখান হয়।

আমার পিতা ও পিতৃব্যগণ কুস্তী শিক্ষা অত্যাবশ্যক বলিয়া জানিতেন। আমাদের সময়ে কুস্তী শিক্ষার তেমন প্রাদুর্ভাব ছিল না। ছেলেরা ডাঙ্গগুলি, কুপাটী প্রভৃতি খেলা করিত, যুবারা তাস খেলিত, প্রৌঢ়েরা পাশা ও দাবা খেলিতেন। পুরুষের দাতে মিশি দেওয়া, হাতে বাজু ও কোমরে গোট পরা প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। ৮।৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি হাতে বাজু ও বালা এবং কাণে মাকড়ী পরিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বে অনেক দিন মল পায় দিয়াছিলাম। আমরা প্রথম যৌবনে মাথায় সোজা সিঁথি কাটিতে, চওড়া পেড়ে ও তেপেড়ে কাপড় পরিতে শিখিয়াছিলাম। আমাদের আগে বাউরী চুলের চলন ছিল, আলবার্ট টেরীর চলন ছিল না। মেয়েরা মাথাঘসা ও তেলের মসলা পাইলে সুখী হইতেন, দোল দুর্গোৎসবে একটু আতর গোলাপজলের খরচ হইত। কলিকাতায় পড়িতে আসিয়া ১৮৬৭ সালে যখন একশিশি পমেটম লুকাইয়া ব্রাহ্ম-ণীকে উপহার দিয়াছিলাম, ননদের তাড়নায় শূকরের চর্ব্বিটা ব্রাহ্মণী ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তখন গুল বসান ঢাকাই শাড়ীর বড় আদর ছিল, তাহার পর কেরেপ, তাহার পর বেণা-রসীর আদর হয়। এখন বেণারসী বরুণার জলে বিসর্জ্জন দিয়াছি।

সংসারে স্বচ্ছলতা। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় ছয় সের করিয়া চাউল কিনিতে হইয়া-ছিল, তাহাতেই লোকে ত্রাহি ত্রাহি করিয়া-ছিল। এখন ছয় সের নিত্য। চাসের ধান, পুকুরের মাছ, গাইএর দুধে স্বচ্ছলে সংসার চলিত। তখন স্কুল মাষ্টার ও একজামিনে-

শনের তাড়া আরম্ভ হয় নাই। পাল পার্ব্বণে যাত্রার বড় ধূম হইত। কবিওয়ালারা তখন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, হাফ আকড়াই ক্বচিৎ শুনা যাইত। সখের পাঁচালী ও যাত্রা লোককে পরিতৃপ্ত করিত। গোবিন্দ অধিকারী ও গোপালে উড়ের তখন বড় প্রাদুর্ভাব, দাসু রায় ও সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী প্রায় পেনসন লইয়াছেন। সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তীর অশ্লীল খেউড় ভাই বোন মাতা পুত্র এক আসরে বসিয়া তখন শ্রবণ করিত। তখন অশ্লীলতার কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। ভদ্র লোকের পরিবারের মধ্যে মেয়ে পাঁচালীর গান হইত।

বাড়ীতে বিপদ হইলে, বিশেষতঃ কাহাকে গঙ্গাযাত্রা করিতে, কি সৎকার করিতে হইলে, সাহায্যের অভাব হইত না। না ডাকিতে প্রতিবাসীরা দৌড়িয়া আসিত। শ্রাদ্ধের সময় প্রতিবাসীদের বাড়ী যাইয়া দায় জানাইবার প্রথা ছিল। দায়গ্রস্তকে শুদ্ধ করিয়া দেওয়া প্রতিবাসীরা কর্ত্তব্য মনে করিতেন। মোকদ্দমা মামলা গায়ের জোরে বা শালিসী দ্বারা মিটান হইত। বিশেষ আবশ্যক না হইলে কেহ কাছারী দৌড়িত না। হপ্তম ও পঞ্চমের নামে প্রজা থরহরি কাঁপিত, হুকুড়ী পাঁচ আইনের এত জোর বাড়ে নাই। প্রজা জমিদারকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, ভূদেব বলিয়া সম্বোধন করিত, খাজানা দিতে না পারিলে কাঁদিয়া পড়িত, মাছট দিতে দ্বিরুক্তি করিত না, "রাজা প্রজা সম্বন্ধ নাই" বলিয়া জবাব দিতে শিখে নাই। ভৃত্য প্রভুকে পিতা বলিয়া জানিত। পণ্ডিত সাহেব ও মৌলবী সাহেব তখন অদৃশ্য হইয়াছিলেন, ডেপুটীর দল দেখা দিয়াছিল, কিন্তু ডেপুটী মেজেষ্টর অপেক্ষা ডেপুটী কালেক্টার নামের গৌরব অধিক ছিল। ঘুস লওয়া এখন খুব বেশী থাকিলেও তখন যত ছিল, এখন তত নাই। মেজেষ্টরী কাছারীতে তখন বি-এল পাশ করা উকিলেরা আড্ডা করে নাই, মোক্তারদের সেস্থান একচেটিয়া ছিল। জজ আদালতে বি-এল দের অপেক্ষা সাবেক উকিল এল-এল্ ও কমিটী পাশদের পসার বেশী ছিল। শামলার চেয়ে সাদা পাগড়ীর খাতির বেশী হইত।

বর্দ্ধমানের গুরু মহাশয়েরা অন্তগত প্রায়, জল বিছুটী ও নাগরদোলা পণ্ডিত মহাশয়েরা কখন আদর করেন নাই। বড় বড় ভদ্র গ্রামে বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হইতেছিল। ইংরাজী শিখিতে হইলে সহরে রাজকীয় বিদ্যালয়ে ও পাদরীদের স্কুলে ছেলেরা পড়িতে যাইত। বড় বড় গ্রামে ক্বচিৎ একটী লোক দেখা যাইত,-যে সাহেবের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা কহিতে পারিত। ইংরাজী পড়িলে ছেলেরা খ্রীষ্টান হয়, এই ভয়টা বড় বেশী ছিল। বড় মানুষের ছেলেরাই ইংরাজী শিখিত। পণর ষোল বৎসর বয়সের কমে কেহ ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিত না।

গ্রামে গ্রামে চৌকিদার থাকিত, পাহারাওয়ালার সৃষ্টি হয় নাই। থানা ছিল,ফাড়ী হয় নাই, ছেলেবেলা ফাঁড়ী বলিলে খোঁয়াড় বুঝিতাম। আট দশ খানি গ্রাম একটী থানার অধীনে ছিল। থানার দারোগা বলিলে দাড়ীওয়ালা ভূড়ীওয়ালা মুসলমান বুঝিতাম, থানা বসিবার পূর্ব্বে চৌকিদার গ্রামের জমিদারের অধীন ছিল। জমিদারকে চোর ডাকাইত ধরিয়া দিতে হইত। এবং এলাকার মধ্যে কোন অকু হইলে

মেজেষ্টার সাহেবকে খবর দিতে হইত। জমিদারের আমামোক্তার কাছারিতে নিত্য হাজির থাকিতেন। দারোগার সৃষ্টি হইলে জমিদার সুরথালের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু সুরথাল করিতে দারোগাকে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে হইত। দারোগার বদলাবদলী বড় বেশী হইত না। দারোগার ঘুশ লওয়া ও অত্যাচার করা এখনকার অপেক্ষা অধিক ছিল। চুরি ডাকাইতিও অধিক হইত। তবে চুরির অপেক্ষা ডাকাইতি কিছু বেশী হইত। দরিদ্র লোকের সংখ্যা এত অধিক হয় নাই এবং মধ্য শ্রেণী লোকে এত দরিদ্র হয় নাই। ছাতা জুতা, থালা বাসন তখন নিম্ন শ্রেণীর ঘরে দেখা যাইত না বটে, কিন্তু মাছে ভাতে দিন কাটিত, একবেলা খাওয়া কি অনশন করার আবশ্যক হইত না। গৃহস্থের দাতৃত্ব অধিক ছিল। এখন ভিখারীর সংখ্যা যেমন বাড়িয়াছে, দাতৃত্ব তেমনি কমিয়াছে। আয় বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু ব্যয় তদপেক্ষা বাড়িয়াছে। দারোগারা কবুল করাইবার জন্য প্রকাশ্যভাবে পীড়ন করিতে সঙ্কুচিত হইত না। পীড়নকালে যে সকল বীভৎস কাণ্ড করা হইত, এখন কল্পনা করিতে হৃৎকম্প হয়।

গতায়াতের খুব অসুবিধা ছিল। পাকা রাস্তা প্রায় ছিল না। ঘোড়ার গাড়ী অতি অল্প ছিল,সে গাড়ীর চেহারাও ভিন্ন ছিল—এখনকার পাল্কী গাড়ীর মত নহে। জমিদারেরা পাল্কী চড়িত। ডাক্তার ছিল না, ডিস্পেনসরী ছিল না। কবিরাজেরা ডুলি করিয়া রোগী দেখিতে আসিতেন। একটা পিতলের বড় ডিবায় ঔষধ সঙ্গে করিয়া আনিতেন। সাধারণ লোকে দশ বার ক্রোশ হাটিতে ক্লান্ত হইত না, যাহাদের আবশ্যক হইত, গরুর গাড়ী চড়িত। তখন হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল চলিয়াছিল। কিছু দিন পরে শিয়ালদহ হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত রেল চলে। তখন শিয়ালদার নাম ছিল শিবাদহ।

খবরের কাগজের নাম লোকে জানিত না। মাসিক পত্রের প্রচার ছিল না। অন্য জাতির কথা দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে শতকরা দশজন লোকে নাম সহি করিতে পারিত না। সাহিত্যের চর্চ্চা ও আদর ছিল না। বৃদ্ধেরা কখন কখন কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশী দাসী মহাভারত শুনিতেন, একজনে পড়িত, আর দশজনে কেহ বসিয়া, কেহ শুইয়া শুনিত। কথকথার বড় আদর ছিল। দাঁড়া রামায়ণ ও মনসার গানের খুব আদর ছিল। যুবকেরা কেহ কেহ লয়না মজনু, নবনারী, বিদ্যাসুন্দর ও পাঁচালী পড়িত। পরন্তু মাছ ধরার সুখের তুলনায় পড়াশুনা নগণ্য ছিল।

লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে
মৎস্য ধরিব খাইব সুখে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

তারা মা'র প্রতি।

খেলিব না ব্রহ্মময়ি! এ খেলা তোমার,
ক্ষণে কাঁদা ক্ষণে হাসা,
এ নৈরাশ্য, পুনঃ আশা,
মরে বাঁচা, বেঁচে মরা—পারিনাতো আর!
যে জন খেলিতে চায়,
তারেই খেলাও হায়,

আমি মা চরণতলে করি নমস্কার ;
আমি খেলিব না তারা, এ খেলা তোমার !

অক্ষম দুর্ব্বল আমি, তবু এ সংসার,
তিলেক করে না ক্ষমা,
তুমি তো দেখ না ওমা !
রাক্ষসের মত করে কত অত্যাচার !—
লয়ে মম সরবেস্ব,
বিনিময়ে দেয় ভস্ম,
কাঁদিয়া পড়িলে পা'য় দয়া নাহি তার ;
আমি খেলিব না মাগো, এ খেলা তোমার !

খেলিবনা ব্রহ্মময়ি ! এ খেলা তোমার—
মরমের যা' মহত্ত্ব,
উদারতা মনুষ্যত্ব,
ক্রমে হারাইনু সব, বলিব কি আর !—
"মানব বঞ্চক-জাতি
কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতী"
হেন পাপে পাপী হয়ে আছি অনিবার !
এ দারুণ খেলা হায়,
কেবা খেলিবারে যায়,
বুক ভেঙে মুখে রক্ত নাহি উঠে কা'র ?—
কি বিষম বিড়ম্বনা,
আমি তো মা খেলিব না,
"জয় পরাজয়" সাধ নাহি গো আমার !—
ভেঙে এ নিঠুর খেলা,
ঘরে চল এই বেলা,
চরণকমলে এই ভিক্ষা অভাগার—
আমি খেলিব না মাগো ! এ খেলা তোমার।

শ্রীমানকুমারী দাসী,
সাগর দাঁড়ি।

বসন্ত প্রভাত।

এস এস মধুময় নবীন অতিথি,
কোলে মলয়ের ডালা, কুন্তলে কুসুমমালা,
শ্রীঅঙ্গে আনন্দ মাখা, আঁখি ভরা ভাতি,

১
নব রূপে রূপবতী গরীয়সী ধরা
কোমল কুসুম কোলে, কিরণে পরাগ জ্বলে,
বিশ্ব-প্রেমে সমীরণ সুখে আত্মহারা।

২
বিক্ষিপ্ত আলোকরাশি নীলীম আকাশে
পাখী গায় জয়-গাথা,
সুখে ভোর ফুল-লতা,
কম্পিত বাঁধূলি-বধূ মৃদুল বাতাসে।

৩
মুখরিত—কোকিলের অশ্রান্ত কূজনে
কোমল কুসুমারণ্য, অতীত কালের পুণ্য,
প্রকৃতির এই সুখ বিধির বিধানে।

৪
গুচ্ছ গুচ্ছ নবীন মুকুলে মুগ্ধ অলি
মৃদু গুঞ্জরিয়া ফিরে, পত্র-পুষ্প শোভা করে,
আঁকা বাঁকা শ্যাম শাখা, লতা আছে ঝুলি।

৫
পল্লবিত শ্যামতরু শিশিরাশ্রু ভরা,
নবীন কিরণটুক, ধীরে ধীরে তোলে মুখ,
প্রাণভেদী ফোটে যেন সুখের ফোয়ারা।

৬
দিকবধূ সাজ করে পুষ্প-হার গাঁথি।
ভ্রমবার ভোঁ ভোঁ গান, মাতাইয়া তোলে প্রাণ,
ফুলবনে ফুল আছে মধু শয্যা পাতি।

৭
আকাশের নিরজনে ঢালে শোভারাশি,
নবীন নীরদমাল, প্রকৃতির কেশজাল,
প্রভাতের শুভ্রহাসি তাহে আছে মিশি,

৮
লোহিত উজ্জ্বল আভা নীল নভে জ্বলে
নদীটি প্রফুল্ল মুখ, ক্রীড়া চঞ্চলিত বুক,
তরীটি আরোহী নিয়ে ধীরে যায় চলে।

৯
স্নাত হয়ে সিন্ধু-নীরে তরুণ তপন,
আপন আহ্নিকাগারে, প্রবেশিছে শোভা করে,
তার রূপে চরাচরে ঝরিছে কিরণ।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৪৬। যূথিকা। শ্রীকালীচরণ মিত্র প্রণীত। মূল্য ১ টাকা। গ্রন্থখানি কতক-গুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। নবন্যাস-রস তাতিয়া সরাসর ফুটন-বিন্দুতে পঁহুছিলে, উন্মাদ বল, মৃত্যু বল, সকলই কিছু হঠাৎ হঠাৎ হইয়া যায়। এ গল্প গুলিতেও অবি-কল তাহাই হইয়াছে। কালীচরণ বাবু ভাল লেখক, তবুও এরূপ হইল !

৪৭। পুরাণ কাগজ বা নথীর নকল। শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা। কতকগুলি দলীল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রের আকারে এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে। কিন্তু উপন্যাসও কাব্য। কাব্যের প্রাণ—রস। এরূপ দেহে সে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা সহজ নহে। অম্বিকা বাবুও তাহা পারেন নাই। তাঁহার আখ্যানের বস্তুও যেমন বিচিত্র নহে, তার সমাবেশও তেমনই মনোহর হয় নাই।

৪৮। জল। রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এফ্ সি এস্ কর্ত্তৃক সাহিত্য সভার ৪র্থ অধিবেশনে অভিব্যক্ত, সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা, লরেন্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্। মূল্য ।০ আনা। বিশেষজ্ঞ ছাড়া উপদেশে কাহারও অধি-কার নাই—থাকিলেও অন্ততঃ সেরূপ উপ-দেশের প্রামাণ্য কম। চুণী বাবু যে বিশে-ষজ্ঞ, তাহা আর বলিতে হইবে না। তাঁহার এ গ্রন্থের ভূয়ঃপ্রচারে মূর্খতা ও মৃত্যু, দুই হ্রাস প্রাপ্ত হইবে, এরূপ ভরসা করিতে পারি।

৪৯। সুধা-সঙ্গীত। প্রথম খণ্ড। শ্রীকরুণাকান্ত বসু প্রণীত। মাদারিপুর শান্তি যন্ত্র। মূল্য ৵০ আনা। "কতিপয় বন্ধুবর্গের অনুরোধে বাধ্য হইয়া" করুণা বাবু এই গানগুলি ছাপাইয়াছেন। তাঁহার বন্ধুপ্রীতি দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। এরূপ সুধার দ্বিতীয় খণ্ড না দেখিলে আমরা আরও সুখী হইব।

৫০। হরিকথা। শ্রীশ্রীপ্রভু জগ-দ্বন্ধু কৃত। ঢাকা আদর্শপ্রেস। মূল্য ৷৷০ আনা। পদকর্ত্তা এই জগদ্বন্ধু কে, আমরা বলিতে পারি না। হরিকথা তাঁহার রচিত কতকগুলি বৈষ্ণব পদের সংগ্রহ। সংগ্রহের দুই একটী পদ বড় উজ্জ্বল—

যমুনা জীবনে মায় কনক তরণী।
নবীন নাবিক ভাষে এস সুবদনী ॥
... ...
আপন কিঙ্কিনী ধটি নৌকায় বিছায়।
ও রাজকুমারী প্যারী এস এই নায় ॥
... ...
উজান উত্তাল বারি পুলিন বহিয়া।
হাঙ্গর মকর মীন নেহারে রহিয়া ॥
... ...
ললিতার করে ধ'রে রাই মৃদু যায়।
কোকনদ পদ ধনী রাখে হেম নায় ॥

এরূপ পদ হরিকথায় আর খুঁজিয়া পাই নাই। অনেক পদেই অতি দুঃশ্রাব্য পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু কবিত্ব নাই।

৫১। বিজনবালা বা আদর্শ-নারী। শ্রীস্বর্ণময়ী দাসগুপ্তা প্রণীত। মা দারিপুর, শান্তিযন্ত্র। মূল্য ৸০ আনা। বলা বাহুল্য, এখানি উপন্যাস। ইহাও বোধ হয় বলা বাহুল্য যে, বিজনবালার বিষয় হতাশ প্রণয়। উপন্যাস খানি ভাল নহে, তবে ইহার

সপ্তদশ পরিচ্ছেদটীর একটু উল্লেখ করিতে হয়। বিবাহে শুল্ক গ্রহণ প্রথার উন্মূলন করিবার জন্য লেখিকা সেখানে শিক্ষিত যুবকগণকে অনুনয় করিতেছেন। সে অকপট অনুনয়োক্তি নিষ্পীড়িত হৃদয়েরই পরিস্রুতি বলিয়া বোধ হয়—এমন উষ্ণ, এমন ঊর্জ্জস্বল, এমন প্রচুর, এমন অস্থির। নারীর এ মুখরতা কিছু অপূর্ব্ব বটে। বাঙ্গালার আসুর সমাজে এ দিব্য মুখরতা জয়যুক্ত হউক।

৫২। চাণক্যশ্লোক। অভিনব সংস্করণ। হিন্দী ভাষানুবাদ সহিত। শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন সম্পাদিত। জয়ন্তী প্রেস। মূল্য /১০ আনা। নীতিশাস্ত্র নামে একটা শাস্ত্রের কয়েকখানা প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, যেমন শুক্রনীতি, কামন্দকীয় নীতি, চাণক্য নীতি। চাণক্য নীতি আবার দুই আকারে প্রচলিত, বৃদ্ধ চাণক্য ও লঘু চাণক্য। এই লঘুচাণক্যই চাণক্য শ্লোক নামে আবাল বৃদ্ধ অনেকেরই কণ্ঠস্থ।

নীতি শাস্ত্র Ethics নহে। Ethics বলিতে যাহা বুঝি, সংস্কৃতে তাহা আছে কি না, এরূপ সন্দেহ করিলে অপরাধ হয় না। বস্তুতঃ নীতি শাস্ত্রের বিষয় তত্ত্ব নহে, লোক-ব্যবহার। রাজা হউক, প্রজা হউক, লোক যাত্রা নির্ব্বাহ কল্পে যাহার যাহাতে ইষ্টলাভ হইতে পারে, এ শাস্ত্রে তৎ তাবতের উপদেশ থাকে। নীতিশাস্ত্র তাই তেমন ধর্ম্মের শাস্ত্র নহে, যেমন অর্থকামের শাস্ত্র। যাহাকে আমরা বৈষয়িক বুদ্ধি বলি, নীতি শাস্ত্রের উপদেশে সেই বুদ্ধির অনেক পাকা পাকা কথা আছে। কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধি অনেক সময়েই কুবুদ্ধি, পাকা কথাও কখন কখন আবার একটু অশ্লীল। [illegible] নীতিতেও তার নমুনা আছে।

বহু হিতোপদেশ সত্ত্বেও এই [illegible] চাণক্যশ্লোক বড় সুপথ্য নহে, বিশেষ শিশুগণের পক্ষে। বিজ্ঞ তারাকুমার তা[illegible] শ্লোকগুলি ছাটিয়া ফেলিয়া, তাহাদের স্থানে মনুস্মৃতি মহাভারত বৃদ্ধ চাণক্য প্রভৃতির ভাল ভাল নূতন শ্লোক বসাইয়া চাণক্য-শ্লোকের এই "অভিনব সংস্করণ" করিয়াছেন। এ পুস্তক পাঠে অনেকেরই বিশেষ উপকার হইবে। কিন্তু চোর বাছিতে গাঁ উজাড় হওয়ার ন্যায় প্রচলিত চাণক্যশ্লোকের আট আনাই বদলাইতে হইয়াছে। চাণক্য-শ্লোক বলিতে চাণক্য কৃত শ্লোক বা চাণক্য সংগৃহীত শ্লোক বা ইহার দুইই বুঝি। এ "অভিনব সংস্করণে" তার কোনও লক্ষণই নাই। তবে আর ইহাকে চাণক্যশ্লোক বলি কিসে? আমরা দুর্নীতি প্রচারে পরাঙ্মুখ, কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থের পক্ষপাতনের পক্ষপাতী নাই। এ পুস্তিকার নাম চাণক্য-শ্লোক না রাখিয়া আর একটা কিছু রাখিলেই হইত।

৫৩। শান্তি-স্তোত্র। ব্রহ্মোপাসক-পরিবারে নিত্য-পাঠ্য। শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন সঙ্কলিত। জয়ন্তী প্রেস। মূল্য /০ আনা। সিটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুরোধক্রমে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ব্রাহ্ম পরিবারে পাঠোপযোগী কতকগুলি স্তোত্র এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে একটী মাতৃস্তব, একটী পিতৃ স্তব, একটী গুরুস্তব, এবং স্তবকে স্তবকে, আটটী ব্রহ্মস্তব আছে। সাধক চিত্তের সকল ভাবপ্রতিবিম্বিনী বলিয়া এই ব্রহ্মস্তোত্ররাজি আমাদের বড়

[illegible] তারাকুমারের [illegible] শিক্ষিতে এদেশে [illegible] পারে না। পু[illegible] মোহন রায় ইন্[illegible]

৫৪। এ[illegible] হোসয়ন। [illegible] প্রেস। মূল্য ১ [illegible] নিরক্ষর হিন্দুতে [illegible] হোসেনের পুণ্য [illegible] হিন্দুও জানেন ন[illegible] দের প্রাণাধিক [illegible] চতুর্থ খলীফা আ[illegible] সহধর্ম্মিণী ফতেমা [illegible] ও এমাম্ হোসয়[illegible] চরিত্র বড় দুঃখম[illegible] নয়, সংসারকে ইহ[illegible] ধার্ম্মিকের দুঃখ ঘ[illegible] মৃত্যু কথার মত [illegible] ছাড়া আর ফাহার[illegible] হয় নাই। হেজর[illegible]র ৬১ সালে, মোহররম্ মাসের দশম [illegible]বসে, এরাক্-এ-অরব্ দেশের ফোরাৎ ন[illegible]তীরস্থ কর্‌বলা নামক মরুক্ষেত্রে, প্রাণান্ত পিপাসায় বিশীর্ণ হইয়া যেরূপে হোসেন্ প[illegible]ষণ্ড শত্রুর হস্তে প্রাণদান করিয়াছিলেন, ব[illegible]রশত বৎসর পরে আজিও তার জাজ্বল্যমা[illegible] স্মৃতি লইয়া উন্মত মুসলমান জনত[illegible] মোহররমের দশমীতে কোজাগর করিয়া[illegible]াকে—আজিও মুসলমান ভিস্তী জলপূর্ণ মশ[illegible] লইয়া সে দগ্ধতিথিতে হোসেনের কণ্ঠ[illegible]োষ দূর করিতে চায়! মেকলে সত্যই ব[illegible]য়াছেন,

"The history of Islam contains nothing more touching than the event which gave rise to the solemnity."

ছ। ইহার অনেক শ্লোক [illegible] বক্তৃতি। এরূপ মধুর কথা [illegible] তাঁহার ন্যায় আর কেহ [illegible] স্তকার উপস্বত্ব রাজা রাম-[illegible]টিউট্ ফণ্ডে যাইবে।

[illegible]াম হুসন ও এমাম [illegible] কলিকাতা, মঙ্গলগঞ্জ মিশন [illegible]াকা। নাম দুইটী অনেক [illegible] ও শুনিয়াছে, কিন্তু হসন্ [illegible] চরিত অনেক শিক্ষিত [illegible]। এই গ্রন্থ হজরৎ মোহম্মদোহিত্র, এস্‌লাম্ ধর্ম্ম রাজ্যের [illegible]লি ও তাঁহার পুণ্যশ্লোক [illegible]র পুত্র, সেই এমাম্ হসন্ [illegible]নের চরিতাখ্যান। সে [illegible]। অথবা এ দুঃখ দুঃখ [illegible] বুঝাইবার জন্যই বুঝি [illegible]য়া থাকে। হোসেনের মর্ম্মছেদিনী কথা খ্রীষ্টান ও ধর্ম্মেতিহাসে কীর্ত্তিত [illegible]

গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম নাই, কিন্তু সে নাম বিলুপ্ত দেখিতে ইচ্ছা হয় না। গ্রন্থকার আরবী ও পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত, কোরান্ ও হদিস শেকাতের চিরস্মরণীয় বঙ্গানুবাদক, নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন। এ গ্রন্থখানিও তিনি বিবিধ আরবীয় ও পারসীক গ্রন্থ হইতেই সঙ্কলিত করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থের প্রামাণিকত্বে সংশয় নাই। গিরিশ-বাবুর ভাষা বিশুদ্ধ, প্রগাঢ়, স্বচ্ছ। বস্তুতঃ রচনার তেমন বিশুদ্ধি বাঙ্গালা সাহিত্যে এখান আর বড় দেখিতে পাই না। তবে গিরিশ বাবুর রীতির দোষ এই যে, সে রীতি কিছু শব্দভারস্তম্ভিতা। যে রীতির দ্রুতি নাই, সে রীতি কারুণরসের নিরন্তর বাহিনী হয় না।

৫৫। মানসকুসুম। শ্রীতারিণীচরণ মিত্র প্রণীত, মূল্য ।৵০, জলপাইগুড়ি প্রেসে মুদ্রিত। সাধারণত যেরূপ কবিতা পুস্তক আজ কাল প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ একখানি পুস্তক। আমাদের দেশের লোকের প্রধান দোষ এই, কিছু লিখিলেই তাহা ছাপাইবার জন্য সকলে ব্যস্ত হন। অনুশীলন বা সংযম বিনা কৃতিত্বের সোপানে কি আরোহণ করা নয়? তারিণী বাবু সংযম শিক্ষা করিলে সময়ে কৃতী লেখক হইতে পারিতেন।

৫৬। ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী। তৃতীয় ভাগ, শ্রীকালীনাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ।০। কালীনাথ বাবুর অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা বিশেষ ভাবে অনেক কথা লিখিয়াছি। এই পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি ছত্রে সেই শক্তির স্ফূরণ রহিয়াছে। ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের নিকট এই পুস্তক বিশেষরূপ আদৃত হইবে, আমরা আশা করি।

৫৭। The contact of the East and the West, by Nagendra Nath Ghosh. Published under the auspices of the Sahitya Sabha. নগেন্দ্র বাবুর সমতুল্য চিন্তাশীল ইংরাজি ভাষার বাঙ্গালী লেখক এ দেশে এখন আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রতি সপ্তাহে Indian Nation নামক পত্রিকায় যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা পড়িয়া মোহিত হয় না, অতি অল্প লোক। পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের সংবর্ষে এ দেশের কি ইষ্টানিষ্ট হইতেছে, এবং কি হইলে অনাবিল শান্তি সুখ ও উন্নতির সুপ্রভাত হইতে পারে, এই পুস্তকে অতি সুন্দর রূপে তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সাহিত্য সভা ধীর এবং স্থির ভাবে, উত্তেজনা, গৌরব-আস্ফালন এবং অহঙ্কার-গরিমার পথ পরিত্যাগ করিয়া যে সকল মহানুষ্ঠান করিয়া দেশের উপকার করিতেছেন, তন্মধ্যে এই পুস্তক প্রকাশ একটী। ইহা একটী সামান্য কার্য্য বটে। কিন্তু এই সামান্য কার্য্য দ্বারাই সাহিত্য সভার মহত্ত্বের বিশেষ আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই পুস্তকখানি যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই উপরোক্ত কথা সমূহের যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন।

৫৮। চিত্রা ও গৌরী। দুটী চিত্র। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, কলিকাতা কালিকা প্রেস, মূল্য ৸০। অতি সুন্দর বাঁধাই ও সুন্দর ছাপার পুস্তকে দুটী অত্যাশ্চর্য্য অস্বাভাবিক গল্প। এরূপ গল্প রচনা করিতে হারাণ বাবুর ন্যায় শিল্পী কেন প্রবৃত্ত হইলেন, বুঝিলাম না। বুঝি বা চিন্তা-সংযমের অভাব।

৫৯। মহামতি রানাডে—শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। চেরি প্রেস; মূল্য ৵১০। লেখক এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"তাঁহার উদ্যমশীলতা এবং অগাধ জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার স্বদেশবাসিগণের মধ্যে অনেকে মিঃ গ্লাড-ষ্টোনের সহিত তাঁহার তুলনা করেন। অপরে তাঁহাকে ভূতপূর্ব্ব সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র রাজমন্ত্রী নানা ফড়নবীসের ন্যায় কোনও স্বাধীন রাজার প্রধান মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। [illegible] ন্যায় ধীর স্বভাব, অধ্যবসায়সম্পন্ন, [illegible] পটু ও নিষ্কপট স্বদেশ-বন্ধু ভারতে অল্পই [illegible]। উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও তাঁহার হৃদয়ে [illegible] আড়ম্বরপ্রিয়তা বা অহঙ্কার স্থান পায় [illegible]। তিনি আজীবন স্বদেশীয় নিরাড়ম্বর পরিচ্ছদের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। আপাদমস্তক দেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া তিনি প্রত্যহ হাইকোর্টের বিচারাসনে উপবিষ্ট হইতেন।"

যে সকল স্বদেশ-ভক্ত [illegible] সংস্কারকের অভ্যুদয়ে এই ভারতভূমি পবিত্র এবং ধন্য হইয়াছে, রানাডে তাঁহাদের অন্যতম। শিক্ষা এবং স্বদেশানুরূপ, চরিত্র এবং সুসংস্কার, ধর্ম্ম এবং জাতীয়তা এই তেজস্বী মহাত্মার জীবন-ভূষণ ছিল। এরূপ কীর্ত্তিমান রত্নকে হারাইয়া ভারতভূমি মলিন এবং নিষ্প্রভ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের এই সংক্ষিপ্ত পুণ্যময় কাহিনী পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইলাম।

৬০। শ্রীনিবাস আচার্য্য রচিত। শ্রীঅঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৷৷০। ভক্তচরিতামৃত, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া অঘোর বাবু এদেশের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য চৈতন্য দেবের পরিষদগণের মধ্যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মধ্যে চৈতন্য দেবের প্রেমভক্তি বিশেষ ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এহেন সাধু পুরুষের জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া অঘোর বাবু বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে সরস ভাষায় সার উদ্ধার করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রভূত অধ্যবসায় এবং গবেষণার পরিচয়ে আমরা মোহিত হইয়াছি। ইহাকে তদানীন্তন কালের সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অঘোর বাবুর এই গ্রন্থ বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচলিত হউক।

এ বৎসরের প্রাপ্ত তিন খানি পুস্তকের সমালোচনা কেবল বাকী রহিল।